ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল

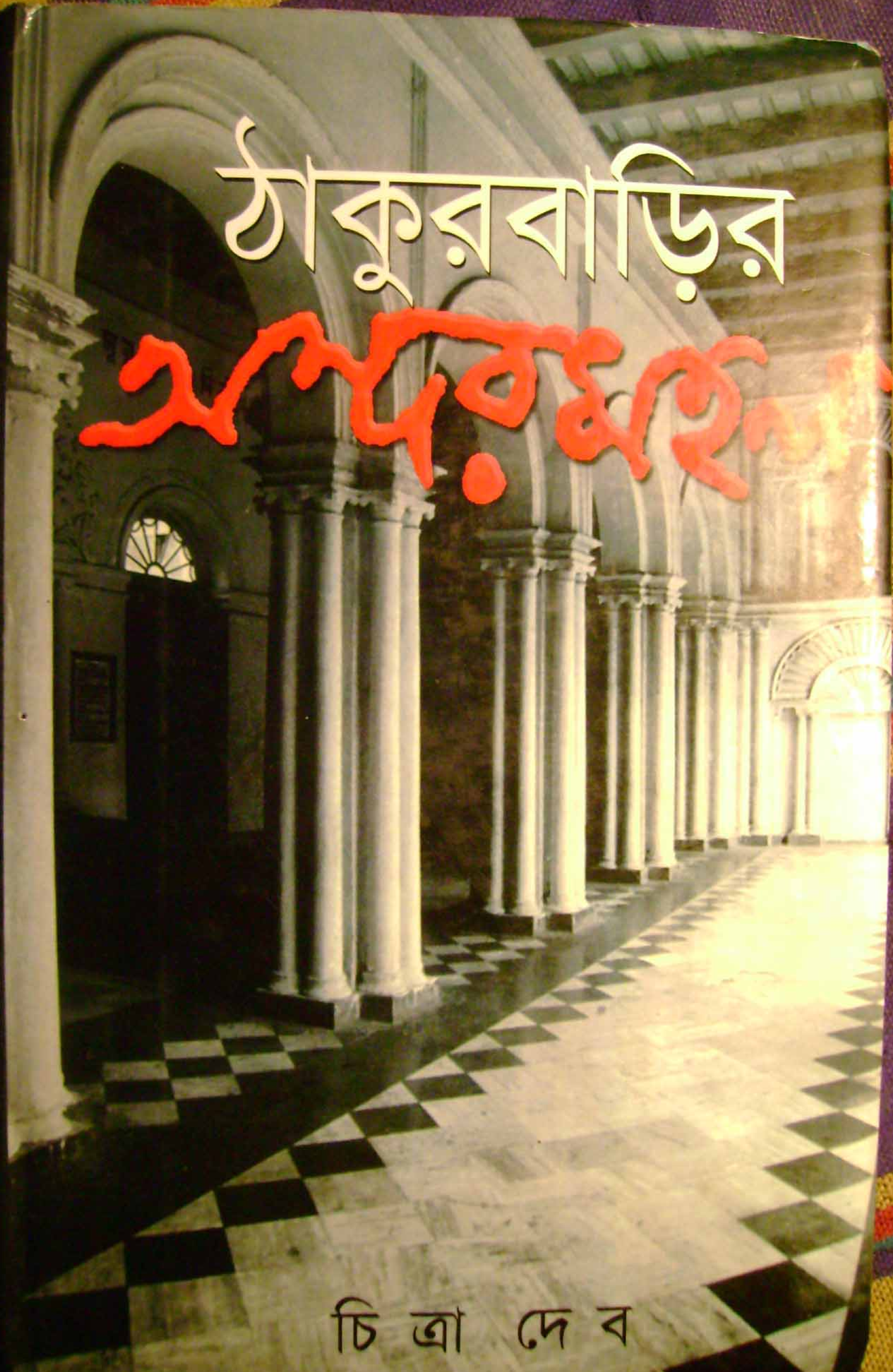

চিত্রা দেব

CONVERTED TO PDF

BY

---RoNy

E-mail: tanvir_ahmad_rony@yahoo.com

(c) **Tanvir Ahmad rony**

Mechanical Engineering , Batch -2004

KUET

‘উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে নারী-উন্মেষের যে-অধ্যায়টি রচিত হয়েছিল, তাতে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির অবদান সবচেয়ে বেশি। ঘেরাটোপের রহস্য ছিঁড়ে, রক্ষণশীল সমাজের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে, ঠাকুরবাড়ির মহিলারা জীবনচর্যার সমস্ত ধারায় যেভাবে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন, তা যেমন চমকপ্রদ তেমনই বিস্ময়কর। নারীমুক্তির সেই জাগ্রতপর্বে, ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরের অবিস্মরণীয় ভূমিকা নিয়ে এমন অনুসন্ধানী গ্রন্থ এর আগে লেখা হয়নি।’

পশ্চিম দিগন্তের একটুখানি আলো এসে পড়ল পুবের আকাশে। সেই নবজাগরণ। তার আকস্মিক সম্পাতে যখন অনেকে দিগভ্রান্ত, কেউ বা পথচ্যুত কিংবা বিদ্রোহী, তখন প্রথম উষার সবটুকু উষ্ণতা গ্রহণ করে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি যেন সারা দেশের ঘুম ভাঙাবার ভার নিয়েছিল। নবজাগরণের সেই পর্বে নারীজাগৃতির যে-আয়োজন শুরু হয়েছিল, এই বাড়ির মহিলারা সেই কাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সামাজিক বিধিনিষেধ আর ঘেরাটোপের রহস্য ছিন্ন করে তাঁরা ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন। অন্ধকার ঘরে সহসা প্রদীপ জ্বলে ওঠার মতো তাঁদের সেই আত্মপ্রকাশ আজও অবিশ্বাস্য। স্মৃতি-বিস্মৃতির অন্তরালে লুকিয়ে থাকা ঠাকুরবাড়ির সেইসব অঙ্গনাদের গৌরবময় ভূমিকা কখনওই হারিয়ে যাওয়ার নয়। চিত্রা দেব এই গ্রন্থে ঠাকুরবাড়ির ভিতরমহলে আলো ফেলে উদ্ভাসিত করেছেন সেদিনের চমকপ্রদ ইতিহাস। ইতিমধ্যে বিপুল জনপ্রিয় এই গ্রন্থ এবার আরও পরিবর্ধিত কলেবরে, আরও চিত্র সমাহারে। ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরের এমন অন্তর্মুখী কথা এর আগে আর লেখা হয়নি।

ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল

চিত্রা দেব

আ ন ন্দ

SHANKALAN

প্রথম সংস্করণ ২৫ বৈশাখ ১৩৮৭ মুদ্রণ সংখ্যা ৩১৯০০
দ্বিতীয় পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ মার্চ ২০০৩ মুদ্রণ সংখ্যা ২০০০

© চিত্রা দেব

ISBN 81-7756-332-7

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড
৫২ রাজা রামমোহন সরণি কলকাতা ৭০০ ০০৯
থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ২৫০.০০

বাবা ও মাকে

ভূমিকা

ঠাকুরবাড়ির মহিলাদের নিয়ে আমাদের মনে অজস্র কৌতূহল আজও রয়েছে বলে এই পরিবর্ধিত সংস্করণের প্রয়োজন অনুভব করি। ইতিপূর্বে আর একবার সামান্য কিছু সংযোজন করা হয়েছিল কিন্তু এবারে গ্রন্থটির সময়সীমা বিস্তৃত হয়েছে গত শতকের শেষ পর্যন্ত অবশ্য সংক্ষেপে। তাছাড়া, মহিলাদের কথা লিখতে বসেও ইতিপূর্বে অনুসরণ করা হয়নি ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের নিজস্ব পরিবারগুলির কথা। কিন্তু পুত্র যেমন একটি পরিবারের প্রতিনিধি, কন্যাও তাই। এবারে সেই বংশধারাগুলিকে যথাসম্ভব খুঁজে নিয়ে সেই পরিবারের মেয়েদের কথাও জানাতে চেষ্টা করেছি। লক্ষ করেছি, ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে আত্মীয়তার যোগসূত্র এঁদের জীবনে যোগ করেছে ভিন্ন মাত্রা। খুঁজে পাওয়া গেল অনেককে, যাঁদের আমরা মনে রাখিনি কিংবা ভুলতে বসেছি। জানা গেল, রবীন্দ্রজীবনের কয়েকটি অচেনা দিক। এই বিশাল পরিবারটি এখন টুকরো টুকরো হয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। একক চেষ্টায় সবার কাছে পৌঁছনো এবং তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তবু এই পরিবারের সদস্যরা আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। মায়া গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেও তাঁর কবিতাগুলি 'সন্দেশ' পত্রিকা থেকে দেখার কোনও সুযোগ পাইনি বলে আলাদাভাবে তাঁর কথা কিছুই লিখতে পারলাম না বলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণতা রয়ে গেল। শুনেছি, সুষমা দেবীর সম্বন্ধে আরও নতুন তথ্য পাওয়া গিয়েছে, যা আমি সংগ্রহ করতে পারিনি। ভাল লাগল, ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের নিয়ে আরও অনেকে কাজ করছেন এবং ভবিষ্যতে নিশ্চয় আরও অনেকে উদ্বুদ্ধ হবেন। অজানা খনির নতুন মণির মতো অনেক কিছুই উদ্ধার হবে। গবেষকদের আগ্রহ দেখেও বোঝা যায়, এই পরিবার সম্বন্ধে আরও জানার আছে এবং লেখাও প্রয়োজন। একদিন এভাবেই আমরা নারীপ্রগতির সব কটি পৃষ্ঠা খুঁজে পেতে পারি। তবে যত দিন যাচ্ছে ততই হারিয়ে যাচ্ছে মূল্যবান পারিবারিক স্মৃতিগুলি। অবনীন্দ্রনাথের আঁকা সুহাসিনী দেবীর প্রতিকৃতিটি পেয়েছি সুমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৌজন্যে। আর্য চৌধুরীর তোলা অশোকা দেবীর আলোকচিত্রটি পেয়েছি স্মিতা চৌধুরীর সংগ্রহ থেকে। এই গ্রন্থের অধিকাংশ আলোকচিত্রই পারিবারিক সংগ্রহ থেকে পাওয়া।

যদিও বংশলতিকা সংগ্রহ করবার সময় খুবই অসুবিধে হয়েছে পুরনো পরিবারগুলিকে যথাযথভাবে খুঁজে না পেয়ে। পূর্ববর্তী বিশালাকার বংশলতিকা এবারে বর্জন করা হল। তার বদলে খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করে দেওয়া হল পরিবারগুলিকে। এ যেন আমাদের যৌথ পরিবার ভাঙারই প্রতীক। যাই হোক, বংশলতিকাগুলি বিভক্ত হলেও সংক্ষিপ্ত হয়নি, বহুক্ষেত্রে সমৃদ্ধ হয়েছে। অতিরিক্ত সংযোজন করা হয়েছে পাথুরিয়াঘাটা, চোরবাগানের ঠাকুরবাড়ির বংশলতিকা, যা একসময় খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রস্তুত করেছিলেন। তবে চাটুজ্যেমশাই বংশতালিকা থেকে মেয়েদের নাম নির্মমভাবে বর্জন করেছিলেন, আমি তা করিনি। পারিবারিক সূত্রে, বিশেষ করে কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দেবপ্রসাদ ঠাকুর প্রমুখ কয়েকজনের সাহায্যে ঠাকুর পরিবারের কন্যা ও দৌহিত্র বংশের তালিকা, আংশিক এবং অসম্পূর্ণ হলেও যা সংগ্রহ করতে পেরেছি সেগুলি এখানে যুক্ত করা হল। একই সঙ্গে এবারে দ্বারকানাথ ঠাকুরের বোনেদের স্বতন্ত্র বংশলতিকাও এখানে যুক্ত করা হল। এর ফলে পরিবারটির বিশালত্বের সঙ্গে আত্মীয়তার বিচিত্র জটিলতা চোখে পড়বে। ভুল করার সম্ভাবনা পদে পদে। আমিও একবার

রচনাকে সুনয়নীর কন্যা বলে ফেলেছি, আসলে তিনি তাঁর পৌত্রী। নামের বানান সম্পর্কেও একথা বলা চলে।

বংশলতিকায় একটু মনঃসংযোগ করলেই তাদের অনুসরণ করা সহজ হবে। আমাদের আলোচ্য জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির বংশতালিকাগুলি বিস্তৃত। অন্যান্য পরিবারের ক্ষেত্রে পুনরুক্তি বর্জন করা হয়েছে * চিহ্ন দিয়ে। অর্থাৎ অন্যত্র এই পরিবারগুলির পূর্ণ বিবরণ রয়েছে। আশাকরি, ভবিষ্যতে এই বংশতালিকা সংযোজন ও সংশোধন করতে এগিয়ে আসবেন ঠাকুরবাড়ির সদস্যরাই।

এই বংশলতিকা প্রস্তুত করার কাজে দেবব্রত সাউ অপরিসীম ধৈর্য ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। মুদ্রণের ক্ষেত্রে গ্রন্থটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করতে চেষ্টা করেছেন বিমলকুমার পাল, রাতুল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্যামলী সরকার। বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সাহায্য করেছেন মানসী দাশগুপ্ত। নির্দেশিকা প্রস্তুতির সময় বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন অনিতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাই। যাঁদের নিয়ে লিখেছি তাঁদের এবং সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলির সঙ্গে যাঁদের জন্যে লিখেছি তাঁদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আশা করব, ভবিষ্যতেও তাঁদের সাহায্যে এবং আগ্রহে ঠাকুরবাড়ির সবার কথাই যথাযথভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হবে।

চিত্রা দেব

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

ঠাকুরবাড়ির মহিলাদের নিয়ে এখনও অনেক কৌতূহল আমাদের মনে জমে আছে। বাংলার নারীজাগরণের কথা ভালভাবে জানতে গিয়ে দেখলুম, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির মহিলারা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। একক বা সম্মিলিত উভয়ভাবেই তাঁরা এসেছেন অন্ধকার ঘরে হঠাৎ প্রদীপ জ্বেলে দেবার মতো। পুরনো কাগজপত্র নেড়েচেড়ে দেখা যাচ্ছে, ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের সম্বন্ধে এখনও অনেক কিছুই আমরা জানি না, অথচ ছড়ানো-ছিটোনো হলেও তথ্যের অভাব নেই। তাই এখানে বাংলার সংস্কৃতিজগতে তাঁদের যথার্থ ভূমিকা নির্ণয় করার একটা প্রাথমিক চেষ্টা করা হল।

আলোচ্য বিষয়টি গুরুগম্ভীর ও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হলেও আমরা কিছুটা সরস করে বলার চেষ্টা করেছি, যাতে সব ধরনের পাঠকই তা উপভোগ করতে পারেন। লেখাটি প্রথমে সংক্ষিপ্ত আকারে বার্ষিক সংখ্যা 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। তখন অনেকের আগ্রহ ও অভিনন্দনে উৎসাহিত হয়ে বিষয়টিকে আরও পূর্ণাঙ্গ করার ইচ্ছা জাগে। বর্তমান গ্রন্থ তারই ফসল।

এই গ্রন্থ পরিকল্পনার কথা সর্বপ্রথম শ্রীরমাপদ চৌধুরীকে জানালে তিনি আমাকে উৎসাহিত করে ব্যাপক অনুসন্ধানের নির্দেশ দান করেন। তাঁর আগ্রহ, সক্রিয় সাহায্য ও প্রয়োজনীয় উপদেশ না পেলে কোনওদিনই এ গ্রন্থ লেখা সম্ভব হত না।

কাজে নেমে সবচেয়ে বেশি সাহায্য পেয়েছি, যাঁদের নিয়ে লিখছি তাঁদের এবং তাঁদের আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে। গ্রন্থের শেষে তাঁদের নাম উল্লেখ করেছি বলে এখানে আর পুনরুক্তি করা হল না। তাঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। তাঁরা এত অকৃপণভাবে সাহায্য না করলে বাংলার নারীজাগরণের এই ইতিহাস অলিখিত থেকে যেত। বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রসদনে অবস্থিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ব্যবহার করবার অনুমতি দান করেছেন উপাচার্য সুরজিৎ সিংহ মহাশয়।

গ্রন্থশেষে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির একটি বংশলতিকা দেওয়া হয়েছে। এই দীর্ঘ ও বিস্তৃত বংশলতিকা নির্মাণে সক্রিয় সাহায্য করেছেন ঠাকুরবাড়ির সকলেই। বিশেষভাবে সাহায্য পেয়েছি শ্রীকল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। বংশলতিকা বিন্যাসে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন শ্রীসঞ্জয় দে। এঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। যথাসম্ভব চেষ্টা সত্ত্বেও সমস্ত নাম সংগ্রহ করতে না পারায় বর্তমান সংস্করণে কিছু কিছু অসম্পূর্ণতা রয়ে গেল। আশা রাখি, পরবর্তীকালে সেই ত্রুটি সংশোধন করে নেওয়া সম্ভব হবে।

চিত্রা দেব

ভোরের আলো আকাশের সীমা ছাড়িয়ে সবে নেমে এসে পড়েছে বাড়ির ছাদে, অন্ধকারের আবছা ওড়নাটা তখনও একেবারে সরে যায়নি, এমন সময় শিশিরভেজা ঘাস মাড়িয়ে রুক্ষ পথের বুকে এসে নামে দুটো আরবি ঘোড়া। সদর ছাড়িয়ে জোর কদমে এগিয়ে চলে গড়ের মাঠের দিকে। দারোয়ান কাজ ভুলে যায়। প্রতিবেশীরা হতভম্ব। রাজপথের লোকেরা অবাক। এ কী কাণ্ড? বিস্ময়ে গালে হাত দিয়ে তাকালে একে অপরের দিকে। সবাই চেয়ে আছে। কিন্তু সেদিকে তাকাবার সময় কই আরোহীদের। না, ভুল বলা হল বুঝি। দুজন আরোহী কোথায়? একজন যে আরোহিণী! আরোহিণী? চোখের ভুল নয় তো? কলকাতার রাস্তায় ঘোড়ায় চড়া মেয়ে? তাও মেমসাহেব নয়, বাঙালি। পথিকেরা থমকে দাঁড়ায়। শুনে চোখ কপালে ওঠে পড়শিনীর। না, আর কোনও ভুল নেই। ওই তো আঁটসাঁট পোশাকে দৃপ্ত ভঙ্গিতে ঘোড়ার পিঠে বসে আছেন কাদম্বরী, ঠাকুরবাড়ির জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী। ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে চলেছেন স্বামীর সঙ্গে, ময়দানের দিকে।

আজও মনে হয়, যেন গল্প শুনছি। তবু গল্প নয়, একেবারে সত্যি ঘটনা। চার দেওয়ালের গণ্ডি ছাড়িয়ে সবকিছুতে বড় হয়ে ওঠা এক আশ্চর্য মায়াপুরীর কথা। জোড়াসাঁকোর কর্কশ হইহট্টগোলের মাঝখানে প্রায় হারিয়ে যাওয়া ছোট্ট একটা গলির শেষে যে সেকেলে মস্ত বাড়িটি দাঁড়িয়ে আছে, বাইরে থেকে তাকে বিশেষত্বহীন মনে হলেও বাংলার নবযুগের বিকাশ হয়েছিল এই ঠাকুরবাড়িতেই। ঝিমিয়ে-পড়া সমাজের বুকে একটার পর একটা আঘাত হেনে যাঁরা তার জড়তা ঘোচাতে চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদের অনেকেরই স্থায়ী ঠিকানা ছিল সেদিনকার জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়ি। পুরনো দিনের দু-চারটে পুঁথি-পত্র, পাঁচালী-কবিগান আর বিকৃত বাবু-কালচারের সংকীর্ণ খাতে দেশের শিল্প-সাহিত্য যখন কোনওরকমে নিজেদের টিকিয়ে রেখে চলছে, সেই সময়কার কথা। পশ্চিম দিগন্তের একটুখানি আলো এসে পড়ল পুবের আকাশে। সেই নবজাগরণ। লজ্জার মতো গোলাপি আভাটাই শেষে আগুন হয়ে উঠল একদিন। তার আকস্মিক উত্তেজনায় যখন অনেকে দিগ্‌ভ্রান্ত, কেউ বা পথচ্যুত কিংবা বিদ্রোহী, তখন প্রথম উষার সবটুকু লালিমা নিজের গায়ে মেখে এই ঠাকুরবাড়িই সারা দেশের ঘুম ভাঙাবার ভার নিয়েছিল। তারই সামান্যতম নজির ওপরের ওই গল্পের মতো ঘটনাটি।

কাগজপত্রের খুঁটিনাটি বিবরণের মধ্যে না গিয়ে রেনেসাঁসের সমসাময়িক ঘটনাগুলোর ওপর হালকা নজর বুলিয়ে নিলে দেখা যাবে তখনও তেমন কোনও সমবেত চেষ্টা শুরু হয়নি। সর্বত্র শুধু তামসী রাতের গাঢ় ছায়া। তারই মধ্যে এখানে সেখানে দু-একটি প্রদীপ সবে জ্বলেছে, কোথাও বা সলতে পাকাবার আয়োজন চলছে। কিন্তু একটার সঙ্গে আরেকটার কোনও যোগ নেই। নবজাগরণের পটভূমি থেকে ঠাকুরবাড়িকে সরিয়ে নিলে এই হবে সেকালের বাংলাদেশের খাঁটি ছবি। এইরকম দু-একটা প্রদীপের আলো সম্বল করে আমাদের জীবনে নব রেনেসাঁস কি আজকের রূপ নিয়ে আসত, না ষোড়শ শতকের চৈতন্য রেনেসাঁসের মতো স্মৃতি হয়ে থাকত, কে জানে? সেইসব দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে মাথাব্যথা করে লাভ নেই। আমরা শুধু বলতে চাই যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবসংঘাতের যুগে ঠাকুরবাড়িতেই প্রথম একটা সহিষ্ণু সমন্বয়িতার ক্ষেত্র গড়ে ওঠে। তাই সহজেই এ বাড়ির প্রতিটি মানুষের কল্পনার ঢেউ দুলেছে পশ্চিমের সমুদ্র, ভাবনা ছুঁয়েছে হিমালয়ের শিখর। আধুনিক বাংলার সুরুচি ও সৌন্দর্যবোধের প্রায় সবটাই তো ঠাকুরবাড়ির দান। ছোট্ট একটা প্রশ্ন এসে পড়েই—ঠাকুরবাড়ির এই স্পর্শমণিটি

কি রবীন্দ্রনাথ? স্বাভাবিকভাবেই মনে হবে তাঁর কথা। শুধু ঠাকুরবাড়িকে কেন, সারা বাংলাদেশকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে যিনি একাই যথেষ্ট। তবু একথাও তো সত্যি, ঠাকুরবাড়ি কোনওদিনই আর পাঁচটা সাধারণ বাড়ির মতো আটপৌরে ধরনের ছিল না। অনেকদিন, সম্ভবত দ্বারকানাথের আমল থেকেই এ বাড়িতে জীবনযাত্রার নিজস্ব একটা সংস্কার গড়ে উঠেছিল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের কোনও অনুভূতি, কোনও চিন্তাই সেখানে বাধা পায়নি। তাই একই পরিবারে ব্রহ্মবিদ মহর্ষির সঙ্গে সিভিলিয়ান অফিসারের সহাবস্থান যেমন বেমানান হয়নি, তেমনি কবি-সংগীতজ্ঞ-নাট্যকার-শিল্পরসিক-দার্শনিক-চিন্তাবিদের একত্র সমাবেশও সম্ভব হয়েছিল।

এই সোনালি-সফল পর্বে ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা আবছা পর্দার আড়ালে অস্পষ্ট আভাস হয়ে থাকেননি। নবযুগের ভিত গড়বার কাজে হাত লাগিয়েছিলেন। কখনও প্রত্যক্ষভাবে আবার কখনও পরোক্ষে—পুরুষের প্রতিভার প্রদীপে তেল-সলতে জোগানোর দায়িত্ব নিয়ে। অবশ্য যত সহজে লেখা গেল ঘটনাটা তত সহজে ঘটেনি। মনুর বিধান এবং মুসলমানি আবরু রক্ষার তাগিদ অনেকদিন থেকেই মেয়েদের একেবারে ঘরের আসবাবপত্রে পরিণত করেছিল। ঠাকুরবাড়িতেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি। অন্দরমহলে নিঃসম্পর্কিত পুরুষ প্রবেশ করতেন না, বাইরে বেরোতে হলে মেয়েরা চাপতেন ঘেরাটোপ-ঢাকা পালকি। হাতে সোনার কাঁকন, কানে মোটা মাকড়ি, গায়ে লাল রঙের হাতকাটা মেরজাই-পরা বেহারার দল কাঁধে করে নিয়ে যেত। সঙ্গে সঙ্গে ছুটত দারোয়ান, হাতে লাঠি নিয়ে। ঘেরাটোপের রং দেখে শুধু বোঝা যেত কোন বাড়ির পালকি যাচ্ছে। জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়ির পালকির ঘেরাটোপ ছিল টকটকে লাল আর পাড়টা গাঢ় হলুদ। পাথুরেঘাটা-ঠাকুরবাড়িরটা ঘোর নীল আর ধবধবে সাদা পাড়। আর পাঁচটা বনেদি বাড়িরও এ রকম এক এক রঙের ঘেরাটোপ ঢাকা পালকি ছিল।

যাক সেকথা, মেয়েরা পালকি তো চাপতেন কিন্তু যেতেন কোথায়? কালেভদ্রে গঙ্গাস্নানে যাবার অনুমতি পেলে বেহারারা তো একেবারে পালকিসুদ্ধ জলে চুবিয়ে আনত। এটাই ছিল সেকেলে দস্তুর। এছাড়া তাঁরা মাঝে মাঝে যেতেন আত্মীয়-কুটুম্বের বাড়িতে বিয়ে-পইতে-অন্নপ্রাশন-শ্রাদ্ধের মতো সামাজিক অনুষ্ঠানে। তখন পালকি একেবারে উঠোনে গিয়ে দাঁড়াত। জোড়াসাঁকোর পাঁচ নম্বর এবং ছ' নম্বর বাড়ির মধ্যে দূরত্ব আর কতটুকু, তবু সেখানেও এবাড়ি-ওবাড়ি যেতে হলে মেয়েদের পালকি চাপতে হত। সুতরাং অসংখ্য বাধানিষেধের গণ্ডি পার হয়েই মেয়েদের, এমনকী ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের আত্মপ্রকাশ করতে হয়েছিল। সহজে হয়নি। প্রথমদিকে এ বাড়ির মেয়ে এবং বউয়েদের অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন সাহিত্য ও শিল্পক্ষেত্রে বিশেষ শক্তির পরিচয় রেখে গিয়েছেন, কিন্তু যাঁদের নাম বিশেষ ছড়িয়ে পড়েনি, পড়বার কারণও নেই, তাঁদের ভূমিকাও নেহাত কম ছিল না। চলবার বাঁধা-পথ তাঁরা পাননি, পথ তাঁদের তৈরি করে নিতে হয়েছিল। খুব সোজা পথও প্রথম পথিকের কাছে দুর্গম। পরেও সেই ধারাটিকে নিরন্তর রসপুষ্ট করে বাঁচিয়ে রাখা কম কৃতিত্বের কথা নয়। সমাজের চোখরাঙানি উপেক্ষা করে ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা যে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে পুরুষের পাশে এসে সম্মানের সঙ্গে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সাহস অর্জন করেছিলেন, সেটাই পরম গৌরবের কথা। স্মৃতি-বিস্মৃতির অন্তরালে লুকিয়ে-থাকা হারিয়ে-যাওয়া সেই মেয়েদের নিয়েই এ প্রসঙ্গের অবতারণা।

অবশ্য নবজাগরণের অনুকূল হাওয়ায় পাল তুলে এগিয়েছিলেন অনেকেই। স্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহী ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার ও আরও অনেকে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর পুত্রদের উৎসাহও কম ছিল না। সত্যেন্দ্রনাথ বিলেতে বসে বাড়ির সমস্ত কাঠের ঝরকা ভেঙে মেয়েদের স্বাধীনতা দেবার স্বপ্ন দেখতেন। হেমেন্দ্রনাথ বাড়ির মেয়ে-বউদের নিয়ম করে লেখাপড়া শেখাতেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শোনাতেন দেশ-বিদেশের ভাল ভাল গল্প। শেখবার তাগিদ ছিল মেয়েদেরও, নতুন কিছু করার সাহস এবং শক্তিও তাঁদের কম ছিল না।

তবু কেন এই একটি পরিবারের মেয়েরাই এতখানি স্বাধীনতা পেয়েছিলেন? পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচার করে মনে হয়, হিন্দুসমাজের বাধানিষেধ ও তার কড়াকড়ি ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের খুব বেশি অসুবিধেয় ফেলতে পারেনি। কারণ তৎকালীন হিন্দু ব্রাহ্মণদের চোখে ঠাকুরবাড়ি ছিল 'পিরালী'—খানিকটা 'একঘরে'র মতো স্বতন্ত্র। তার ওপর দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলে শাসনের গিট আপনিই শিথিল হয়ে এসেছিল। এই অনুমানের কারণ, প্রায়ই দেখা গিয়েছে পিরালী ব্রাহ্মণের মেয়েকে বিয়ে করার পরে কোনও ছেলে আর স্বগৃহে সসম্মানে ফিরে যেতে পারেননি। সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনীর বাবা অভয়াচরণ মুখোপাধ্যায় রাগ করে বাড়ি থেকে চলে এসে ঘটনাচক্রে যশোরের পিরালী রায় বংশের মেয়েকে বিয়ে করেন। তাঁর বাবা বিবাগী সন্তানের খোঁজ করতে করতে এসে যেই শুনলেন তাঁর ছেলের সঙ্গে পিরালী বামুনের মেয়ের বিয়ে হয়েছে অমনি রাগে-দুঃখে ভেঙে পড়ে পইতে ছিঁড়ে অভিশাপ দিয়ে গেলেন 'অভয়াচরণ নির্বংশ হোক' বলে। এমন উদাহরণ আরও আছে। মহর্ষির পাঁচ জামাইয়ের মধ্যে চারজন ছিলেন ঘরজামাই। সবাই কুলীনের ছেলে। কিন্তু পিরালী ঘরে বিয়ে করে আর নিজেদের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারেননি। জ্ঞানদানন্দিনী শুনেছিলেন, 'একজনের বাপ গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে ছেলেকে শাপ দিয়েছিলেন।' আর যিনি ঘরজামাই হননি অর্থাৎ স্বর্ণকুমারীর স্বামী জানকীনাথ ঘোষাল, তিনিও 'পিরালী দেবেন্দ্রনাথের কন্যাকে বিবাহ করে' পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার হারিয়েছিলেন সাময়িকভাবে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিয়ের সময়ও দেখা যাবে মহর্ষি লিখছেন, 'জ্যোতির বিবাহের জন্য একটি কন্যা পাওয়া গিয়াছে এইই ভাগ্য।' কেন? না 'একে তো পিরালী বলিয়া ভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা আমাদের সঙ্গে বিবাহেতে যোগ দেয় না তাহাতে আবার ব্রাহ্মধর্ম-অনুষ্ঠান জন্য পিরালীরা আমাদিগকে ভয় করে।' অথচ জ্যোতিরিন্দ্রের বিয়ের সময় ধনে মানে শিক্ষায় যোগ্যতায় ঠাকুরবাড়ির সমতুল্য বাড়ি কলকাতায় ক'টাই-বা ছিল? সমাজের অন্যান্য বাধা এ বাড়িতে শেকলের বাঁধন হয়ে ওঠেনি বরং তারই মধ্যে একটু ফাঁক রেখে গেছে। শৈথিল্যের অবকাশে গড়ে উঠেছিল ঠাকুরবাড়ির একেবারে নিজস্ব সংস্কৃতি, সকলের দেখে নকল করা নয়, নিজেরা নতুন কিছু করা।

সাহিত্য, সংগীত বা শিল্পের দিক থেকে নতুন কিছু পাবার আগে প্রকৃতপক্ষে বাঙালি মেয়েরা ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের কাছে পেল আত্মবিশ্বাসের শক্তি আর এগিয়ে যাবার একটি প্রশস্ত পথ। তাই তাঁদের ময়দানে ঘোড়া ছোটানো, কালাপানি পেরিয়ে বিলেত যাওয়া, লাটভবনের নিমন্ত্রণ রাখা, আমেরিকায় বক্তৃতা দেওয়া, স্কুলে পড়া, ছবি আঁকা, গান গাওয়া, অভিনয় করা, বই লেখা, স্বদেশসেবা, সমিতি-প্রতিষ্ঠা সবই অর্থবহ হয়ে উঠেছে। সমাজের ধীর-স্থির বুকে নানা আকারের আন্দোলন তুলে বাঙালি মেয়েদের লজ্জাভীরু মনে সাহস জোগাবার জন্যেও এর দরকার ছিল। শুধু তাই নয়, কিশোর রবীন্দ্রনাথের জন্যে বাড়ির মধ্যে একটা সাহিত্যিক আবহাওয়া গড়ে তুলতেও তাঁর দিদি-বউদিদিরা দাদাদের চেয়ে কোনও অংশে কম সাহায্য করেননি। আবার পরিণত বয়সে নৃত্য-গীত-অভিনয়-সংক্রান্ত নিজস্ব ভাবনাকে রূপায়িত করবার সময়েও কবি বারবার ডাক দিয়েছেন বাড়ির মেয়েদের। শুধু এই জন্যেও ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের, কখনও কখনও সামান্য ভূমিকা থাকলেও ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

একটু আগেই দেখেছি যে, ঠাকুরবাড়িতে সমাজের প্রত্যক্ষ বাধা খুব বেশি ছিল না। কিন্তু কী সেই বাধা, যা এবাড়ির মেয়েদের অচল করে তোলেনি? সেকালে মেয়েদের জীবন কেমন করেই বা কাটত? তখনকার দিনে মেয়েদের জীবন বিশেষ সুখের ছিল না। কয়েকশো বছরের 'পুঁথিপ্রমাণ' আর দলিল দস্তাবেজের বস্তাপচা পুরনো সাক্ষীসাবুদ জড়ো না করেও এটুকু বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, আমাদের সমাজে নারীসম্পর্কিত মূল্যবোধের প্রচণ্ড অবনতি হয়েছিল।

পুরুষের কাছে সেদিন নারী ছিল তাঁদের সম্পত্তি, শুধু ভাত-কাপড় দিয়ে পোষা বিনা মাইনের দাসীমাত্র। ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা তাদের কথায় খুশি হয়ে দেওয়া চলত। সমাজের সমস্ত নিয়ম-শৃঙ্খলা নারীর ক্ষেত্রে পদে পদে কঠোরভাবে প্রযুক্ত হয়ে উঠেছিল খুব সহজে, কারণ সকল সমাজের মূল অর্থ এবং আর্থিক স্বাধীনতার একমাত্র উপায় ছিল পুরুষের হাতে। শিক্ষার দ্বারে যা নারীর শক্তি প্রকাশ নারীর অধিকার উদ্ধার হয়নি। মেয়েদের এই নিরুপায়তার সুযোগ নিয়েই পুরুষেরা অধিকারের নামে তাদের ক্ষেত্রভাবে করে রেখেছে। তাই দেখা যাবে উনিশ শতকে সমাজ-সংস্কারের প্রধান কথাই ছিল নারীমুক্তি—আধুনিক অর্থে নয়, তখন নারীশিক্ষা, নারীর অধিকার এবং নারী প্রগতির দিকেই মনীষীদের দৃষ্টি পড়েছিল।

আসলে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কৌলীন্যবিবাহ, সতীদাহ প্রভৃতি গোটা কতক বড় বড় সামাজিক অভিশাপ মেয়েদের ঘাড়ে সেদিন পাথরের মতো চেপে বসে ছিল। তার ওপরে ছিল হাজার রকমের আচার আর সংস্কার মেয়েদের পক্ষে নিষিদ্ধ—লেখাপড়া শেখা, জামা জুতো পরা, বাইরে বেরোনো, গান গাওয়া, গাড়ি চড়া, অন্দরের বাইরে পুরুষের সঙ্গে কথা বলা, সবই পাপ। তাই মনে হয় মেয়েরা তা হলে সারাদিন কী করত? ঘর-সংসার? সে তো একজন করলে হবে! তীর্থে যাওয়া আর বাড়ির পাশে 'তীর্থ' নিয়েই কি তাদের দিন কাটত? নাটকে প্রচুর উদাহরণ খুঁজলে দেখা যাবে নিষেধ-নিয়মের এটাই কথাই বলেছিল, 'অবলার মন কাতর হইলে বাজায়, না-না-না'। 'নীলদর্পণ' নাটকের 'বিধবাদের কিছুমাত্র উপায় নাই' কেমন পাঁচজন সখী নিয়ে বাগানে যাওয়া, শহরে বেড়াতে যাওয়া মেয়েদের পক্ষে সম্ভব না। তাদের ছিল কলেজ নেই, কাছারি নেই, সভাসমিতি নেই, একেবারে 'নেই'-রাজ্যের বাসিন্দাদের দিনগুলো প্রকৃতপক্ষে নেই—অন্দরে পেতে কিছুই নেই। ঘুম যে কখন হয় তা নয়, পিছিয়েছিল সবাই। হঠাৎ ঠাকুরবাড়ি থেকে যদি এক ঝলক দক্ষিণী হাওয়া এসে তাদের ঘুমিয়ে না দিত হয়তো আরও অনেকদিন এমনি করেই কাটত, শুধু অবকাশ পেলে মাঝে মাঝে শুনতে উঠত ক্রন্দন।

খুব নিশ্চিত হয়ে না পারলেও মনে হয়, মেয়েরা সর্বত্র সমানভাবে নিঃশব্দে জীবন যাপন করছিল না, তা কারও পক্ষেই সম্ভব হয় না। অন্দরে পর্দার আয়োজন চলছিল, ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা এসে দিলেন নবজাগরণের প্রতিনিধিত্বের। একটু আগে যে আন্দোলনের কথা বলা হল তার অনেকগুলোই ঠাকুরবাড়িতে শুরু হয়, তবে লেখাপড়া শেখার ব্যাপারে এ বাড়ির কর্তাব্যক্তিরা প্রথম থেকেই উদার ছিলেন। মেয়েদের লেখাপড়া শেখার কোনও বাধা যে নেই তিনি বলে উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দিয়ে উৎসাহ দিয়েছিলেন। দ্বারকানাথের পিতার আমল থেকেই এ বাড়ির মেয়েরা লেখাপড়া শিখতে শুরু করেন বৈষ্ণবীর কাছে। দ্বারকানাথ যখন পাঠশালায় বর্ণমালা শিখছেন তখনই তাঁর দশ বছরের দিদি রাসবিলাসী বাংলায় কাব্য পড়েছেন কৃত্তিবাসীর ইতিবৃত্ত ছন্দ। এর মূলে পাওয়া গেল অতীতেই। এ বাড়ির পুরুষদের মতো মেয়েরাও বাংলাদেশের সমস্ত মেয়ের কাছে আদর্শ হয়ে রইলেন চিরকালের জন্যে।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের পূর্বকথা আজ আর কারও অজানা নেই। রূপকথার রাজপুরীর মতো রহস্যময় বাড়িটি যে বহুদিন ধরেই সমস্ত বাঙালির কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে আছে। পুঁথি-পত্র খুলে বসলে আজ অনেকেই বলে দিতে পারবেন, সেই কবে পুরুষোত্তমের বংশধর পঞ্চানন এসেছিলেন কলকাতার ঘাটে গোবিন্দপুর কিংবা তাঁর নাতি নীলমণি কোন হুকুমে কলকাতার এপারে বসবাস শুরু করলেন। আমাদের প্রধান লক্ষ্য জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি। পুরনো যার জন্ম-ইতিহাসের কারণে মূল কুশারী বা ঠাকুর পরিবার নানা শাখায় ভাগ হয়ে যেতে শুরু করেছিল বেশ কিছুদিন ধরে। পাথুরিয়াঘাটার পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে ১৭৮৪ সালের জুন মাস নাগাদ নীলমণি চলে আসেন জোড়াসাঁকোয়। স্ত্রী ললিতাদেবী, তিন পুত্র ও কন্যা কমলমণিকে নিয়ে। তখন এ অঞ্চল মেছুয়াবাজার নামে পরিচিত। নীলমণির ভাই দর্পনারায়ণ থেকে গেলেন পাথুরিয়াঘাটার সাবেক বাড়িতেই। অবশ্য

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে শুরু করে আরও কয়েক বছর পরে, প্রিন্স দ্বারকানাথের আমলে। ঠাকুরবাড়ির ঐশ্বর্য-প্রতিপত্তি-আদবকায়দা-শিল্পরুচি সবকিছুর মূলেই তিনি। অপরিমিত ধনসম্পদের সঙ্গে সঙ্গে তিনি চেয়েছিলেন সুরু-সম্পদের বিলাস ঘটাতে, সফল হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই, না হলে অন্য ধনীদের সম্বন্ধে যেমন বলবার কিছু থাকে না, তাঁর সম্বন্ধেও সেইরকম কিছু বলার থাকত না। কিন্তু তাঁর কথা থাক, আমরা অন্তঃপুরের কথায় ফিরে আসি।

সেযুগে ঠাকুরবাড়ির মতো ধনী এবং অভিজাত বাড়ি বা পরিবার আরও অনেক ছিল। খুব কম করেও আমরা আরও ত্রিশটি পরিবারের উল্লেখ করতে পারি যাঁরা ধনে-মানে ঠাকুরবাড়ির চেয়ে কোনও অংশে হীন তো ছিলেনই না বরং আরও খ্যাতি লাভ করেছিলেন। পরবর্তীকালে এইসব পরিবারও নানাভাবে শিল্পরুচি কিংবা প্রতিপত্তির পরিচয় দিয়েছেন। তবু এতগুলি বাড়ির মধ্যে ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের বেছে নেবার প্রধান কারণ, প্রথম পর্বে এই বাড়িটিই ছিল সবার পুরোবর্তিনী।

ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী ও জ্ঞানদানন্দিনীর নাম সকলেই জানে। কিন্তু ইতিহাসেরও ইতিহাস থাকে, তাই তাঁদের প্রপিতামহী অলকাসুন্দরী ও পিতামহী দিগম্বরীকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

দ্বারকানাথ মাত্র তেরো বছর বয়সে পিতৃহীন হন। অলকাসুন্দরীকে তখন শক্ত হাতে সংসারের হাল ধরতে হয়েছিল। নাবালক দ্বারকানাথকে উইলে রামলোচন নির্দেশ দিয়েছিলেন, '...যাবত তুমি বয়ঃপ্রাপ্ত না হও...সহী দস্তখত বা মোকদ্দমা ও হুকুমনামা সকলি তোমার মাতা করিবেন তুমি প্রাপ্তবয়স হইলে...যাবত তোমার মাতা বর্তমান থাকিবেন তাবত পরগনার মুনাফা ওগয়রহ যে কিছু আমদানির হইবেক তোমার মাতার নিকট যেমন আমি রাখিতাম তুমিও রাখিবা।' এ নির্দেশের মধ্যেই অলকাসুন্দরীর কর্তৃত্বশক্তির কথা জানা যায়। ধর্মে তাঁর অগাধ নিষ্ঠা ছিল। প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করতেন কিন্তু 'ধর্মের অন্ধ বিশ্বাসের সহিত একটু স্বাধীনতাও ছিল।' মহর্ষি লিখেছেন, 'তিনি মা-গোঁসাইদের সকল ব্যবহার সহ্য করিতে পারিতেন না।' রামলোচনের দীক্ষাগুরু ছিলেন হরিমোহন গোস্বামী, তাঁর স্ত্রী [illegible] দেবী ছিলেন অলকাসুন্দরীর দীক্ষাগুরু। মৃত্যুর সময়েও অলকাসুন্দরী তাঁর স্বাধীনচিত্ত ব্যক্ত করেছিলেন, গঙ্গা যাত্রায় সম্মতি দেননি। সেযুগে কেউ তাঁর কথা শোনেনি। আঠারো বছরের যুবক পৌত্র দেবেন্দ্রনাথও বাধা দেননি। ক্ষোভের সঙ্গে অলকাসুন্দরী বলেছিলেন, 'যদি দ্বারকানাথ বাড়ি থাকিত, তবে তোরা কখনই আমাকে লইয়া যাইতে পারিতিস নে।' তিনি আরও বাঁচতে চেয়েছিলেন। এই জীবন পিপাসা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

সূর্যোদয়ের অনেক আগে যেমন ঊষার আলো ফুটে ওঠে, দিগম্বরীর ধর্মনিষ্ঠা এবং নির্ভীক তেজস্বিতার মধ্যেও তেমনি ঠাকুরবাড়ির নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার ছাপটুকু চোখে পড়ে। যে যুগে মেয়েদের 'স্বামী বই গতি' ছিল না সেই সময়ে দিগম্বরী ম্লেচ্ছসংস্রবী স্বামীকে ত্যাগ করা উচিত কি উচিত নয় জানতে চেয়েছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজের কাছে। সেই পুরুষশাসিত সমাজে তাঁর একক প্রতিবাদ—তবু তিনি নিন্দায় কলঙ্কিত হননি। বরং হিন্দুসমাজ তাঁকে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছিল।

কিন্তু তিনিই বা হিন্দু শাস্ত্রজ্ঞদের কাছে এমন একটা বিধান জানতে চেয়েছিলেন কেন? তিনি কি মুক্তি চেয়েছিলেন সাত-পাকে-বাঁধা বিবাহ বন্ধন থেকে, নাকি স্বামীর অনাচার তাঁর স্ত্রীর অভিমানকে বড় বেশি আঘাত করেছিল? এই 'কেন'র উত্তর খুঁজতে হলে বাংলার-অন্তঃপুরে দেখা দিগম্বরীর অলৌকিক জীবনের কথা জানতে হয়।

লোকে বলে, অপরূপ লাবণ্যময়ী দিগম্বরী এসেছিলেন ঠাকুরবাড়ির লক্ষীশ্রী হয়ে। যশোরের নরেন্দ্রপুরে তাঁর জন্ম। মাত্র ছ' বছর বয়সে দ্বারকানাথের ধর্মপত্নী হয়ে তিনি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এসে পা দিলে ঠাকুরবাড়ির শ্রীবৃদ্ধি হতে শুরু করে। দিগম্বরীর রূপ এখন প্রবাদে পরিণত হয়েছে। বোধহয় তখন থেকেই ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের রূপের খ্যাতি। শোনা যায়, দিগম্বরীর মুখের আদলেই ঠাকুরবাড়ির জগদ্ধাত্রী প্রতিমা গড়া হত। প্রত্যক্ষদর্শীরা তাঁকে বলতেন, 'সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী'। বলবে নাই বা কেন? দুধে-আলতা মেশা গায়ের উজ্জ্বল রং, পিঠে একঢাল কোঁকড়া কালো চুল, চাঁপাকলির মতো হাতের আঙুল, দেবী প্রতিমার পায়ের মতো দুখানি পা—মৃত্যুর পরে তাঁকে শ্মশানে নিয়ে যাবার সময় অনেকে তাঁর পা দুটি থেকে এক অপূর্ব জ্যোতি বেরোতে দেখেছিল। অতুলনীয় রূপের সঙ্গে দিগম্বরীর ছিল প্রচণ্ড তেজ। শাশুড়ি অলকাসুন্দরীও এই ব্যক্তিত্বময়ী বউটিকে সমীহ করে চলতেন।

আর দ্বারকানাথ?

স্ত্রীকে তিনি সত্যিই ভালবাসতেন। কিন্তু এ তো গল্প। গল্পই তো। গল্পই তো জীবন। তারই টানাপোড়েনে বোনা হয়েছে অন্দরমহলের বালুচরী আঁচলার নকশা, গৌরবময় নারীজাগরণের ইতিহাস।

তখনকার দিনে এঁরা ছিলেন গোঁড়া বৈষ্ণব। পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুররা ব্যঙ্গ করে বলতেন 'মেছুয়াবাজারের গোঁড়া'। পেঁয়াজ ঢুকত না বাড়িতে। মাছ-মাংসের তো কথাই নেই। পাছে কুটনো-কোটা বললে হিংস্র মনোভাব জেগে ওঠে তাই বলা হত 'তরকারি বানানো'। গৃহদেবতা লক্ষ্মীজনার্দনের নিত্যসেবা নিজের হাতে করতেন দ্বারকানাথ। পুজোর উপকরণ হয়তো জুগিয়ে দিতেন দিগম্বরী। নীলাম্বরী শাড়ির আঁচল-ঘেরা দুধে-আলতা মেশা সুন্দর মুখে ভক্তির আবেশ মাখা—যে দেখত শ্রদ্ধায় আপনিই নুয়ে পড়ত। না, সেদিন কোথাও বিরোধের কালো মেঘ বাষ্প হয়েও দেখা দেয়নি।

হঠাৎ ঝড় উঠল, কেঁপে উঠল যুগলের সংসার। ফাটল ধরল সনাতন হিঁদুয়ানির ভিতে। মা লক্ষ্মীর পদ্মের অনেকগুলো পাপড়ি উড়ে এসে পড়ল দ্বারকানাথের ঘরে। আর ব্যবসায়িক সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে বিলাসিতা ও বাবুয়ানির ছদ্মবেশ পরে নবযুগের ভাবনা বাসা বাঁধল দ্বারকানাথের মনে। হিন্দু শাস্ত্রে বলা হয়েছে, বিধর্মীর সংস্পর্শে এলে দেহ অপবিত্র হয়। সেই নিয়ম অনুযায়ী দ্বারকানাথ যখন সাহেবসুবোর সঙ্গে মেলামেশা শুরু করলেন তখন থেকে তাঁকে নিজের হাতে পুজো-করা ছাড়তে হল। নিত্য পূজা ও অন্যান্য ক্রিয়াকর্মের জন্যে তিনি আঠারোজন শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণকে মাইনে দিয়ে সেই কাজে নিযুক্ত করলেন। শুধু তাই নয়, তিনি নিজে এর পরে ব্যবসায়িক কাজকর্মের প্রয়োজনে মাংস এবং 'শেরি' খাওয়া অভ্যাস করলেন। দিগম্বরী ও দ্বারকানাথ বয়ে চললেন ভিন্ন খাতে।

প্রথম প্রথম দ্বারকানাথ বেপরোয়া খুশির প্রমোদে গা ঢেলে দেননি। যদিও তাঁর মনটি ছিল সেযুগের বিলাসী বাবুদের মতোই দিলদরিয়া। সেই সঙ্গে ছিল শিল্পরুচি। তাঁর বেলগাছিয়ার বাড়িটিতে ছিল নানারকম প্রমোদের আয়োজন। এক প্রহরের আমোদে কত যে ঐশ্বর্য নষ্ট হয়েছে তার সীমা নেই। নিজের মনের মতো জীবন-যাপন করবার জন্যে ৫ নং বাড়ি তৈরি করেছিলেন দ্বারকানাথ। কী তার কারুকাজ! ফোয়ারা, রঙিন টালি-ঘেরা বাগান, ঝাড়লণ্ঠন, বিলিতি আসবাবে নিজের রুচিমতো সাজালেন। তাঁর নতুন 'গৃহসজ্জার'-এর কথা ঘটাপটা করে ছাপাও হল সেদিনকার কাগজে। প্রকাণ্ড ভোজ, নাচ-গান, বিলিতি ব্যান্ডের সঙ্গে ভাঁড়ের সং-এরও আয়োজন হয়েছিল, তার মধ্যে 'একজন গোবেশ ধারণপূর্বক ঘাস চর্বণাদি করিল।' সুতরাং দ্বারকানাথের বিলাসিতায় সেযুগের বাবুয়ানির ছাপ পুরোমাত্রায় বজায় ছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

এই বাড়িটি তৈরি হয় ১৮২৩ সালে। এসময় দ্বারকানাথ গভর্নমেন্টের দেওয়ান, পরে আরও

উন্নতি হয়। প্রথমদিকে দিগম্বরীর চোখে এত পরিবর্তন ধরা পড়েনি। নিজের জপ-তপ ঠাকুরসেবা নিয়ে তিনি সদাব্যস্ত। ভরা সংসার। বড় ছেলে দেবেন্দ্রর সবে বিয়ে হয়েছে। ছেলের বউ সারদাও এলেন যশোর থেকে। ওখানে যে পিরালীবংশের অনেকেই থাকেন। ছ' বছরের মেয়ে সারদা এসেছেন দক্ষিণডিহি থেকে। বিয়ের আগে তাঁর নাম ছিল শাকম্বরী। সেকালে অনেক পরিবারেই মেয়েদের নাম বদলে নতুন নাম দেওয়া হত। দিগম্বরীর অন্য দিকে তাকাবার সময় কই? ভোর চারটে থেকে দিগম্বরীর পুজো শুরু হত। লক্ষ হরিনামের মালা জপ ছাড়াও তিনি নিয়মিতভাবে পড়তেন ভাগবত-রাসপঞ্চাধ্যায়ের বাংলা পুঁথি। দয়া বৈষ্ণবী পড়ে শোনাতেন নানারকম ধর্মগ্রন্থ। পরাণ ঠাকুর তাঁর পুজোর উপচার ও রান্নার উপকরণ গুছিয়ে রাখত। দিগম্বরী স্বপাকে আহার করতেন। একাদশীতে খেতেন সামান্য ফলমূল। চারটি একাদশীতে করতেন নিরম্বু উপবাস। প্রচলিত বিশ্বাস, একাদশীতে সধবার উপোস করতে নেই। অলকাসুন্দরী বধূকে মৃদু আপত্তি জানালে দিগম্বরী তাঁকে বুঝিয়ে বলেন, 'তাঁহার উপবাসে তাঁহার স্বামীর কোনই অমঙ্গল ঘটিবে না।'

মাঝে মাঝে শোনেন অনেক কথা। অনেকে অনেক কিছু বলে। কিছু শোনেন, কিছু মনে থাকে না, মালা জপতে জপতে ভুলে যান। মন বলে, এ সবই অহেতুক রটনা। কৃতী পুরুষের গায়ে কালি ছিটোবার সুযোগ কে না খোঁজে? কিন্তু খুব বেশিদিন নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকা সম্ভব হল না। ওদিকে বাগানবাড়িতে পানভোজন হাসিহল্লা চলে নিয়মিত। ঘরগুলো আলোতে, আরশিতে, মির্জাপুরের কার্পেটে, লাল জাজিমে, সবুজ রেশমে, ফুলের তোড়ায় ঝলমল করে। গুজব ছড়ায়। শেষে সবই শুনলেন দিগম্বরী, শুনলেন দ্বারকানাথের ভোজসভায় নাকি মদের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। শোনেন ছড়ার গান বাঁধা হয়েছে :

'বেলগাছিয়ার বাগানে হয় ছুরিকাঁটার ঝনঝনি,
খানা খাওয়ার কত মজা আমরা তার কি জানি?
জানেন ঠাকুর কোম্পানি।'

বাগবাজারের রূপচাঁদ পক্ষী আরও শোনালেন :

'কি মজা আছে রে লাল জলে
জানেন ঠাকুর কোম্পানি।
মদের গুণাগুণ আমরা কি জানি
জানেন ঠাকুর কোম্পানি।"

প্রথমে বিশ্বাস হয়নি তবু নিঃসংশয় হবার জন্যে দিগম্বরী স্থির করলেন, তিনি স্বয়ং যাবেন সেই ম্লেচ্ছ ভোজসভায়। স্বচক্ষে দেখে আসবেন কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যে। পতিব্রতা দিগম্বরীর এই অতর্কিত অভিযান চিরস্মরণীয়। বিপথগামী স্বামীকে ফেরাবার জন্যে তিনি নিজেই গেলেন, সঙ্গে রইল ভীতাত্রস্তা তরুণী সারদা ও আরও কয়েকজন আত্মীয়া। মনে ক্ষীণ আশা, যা শুনেছেন তা ভুল। এতদিনের চেনা মানুষ কি এভাবে বদলে যেতে পারে?

অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে বৈঠকখানাবাড়িতে প্রবেশ করতে গিয়ে কুলবধূ দিগম্বরী কেঁপে উঠেছিলেন কিনা কে জানে? সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তটিকে কেউ কোনওভাবে ধরে রাখেনি। সত্যিই কি তিনি সেখানে যেতে পেরেছিলেন, পারিপার্শ্বিক ঘটনা তো তাই বলে। চোখের সামনে দেখলেন, আলো-ঝলমলে ঘরে সাহেব-বিবিদের সঙ্গে একাসনে পানাহারে মত্ত তাঁর স্বামী। মুসলমান বাবুর্চির রান্না টেবিলে পরিবেশন করা হচ্ছে। এ কী দুঃস্বপ্ন! তা হলে যা শুনেছেন সব

সত্যি! বুকটা যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। তবু কর্তব্য ভোলেননি; বিপথগামী স্বামীকে ফিরিয়ে আনার জন্যে অনেক চেষ্টা অনেক কাকুতি-মিনতি করেছিলেন। কর্ণপাত করেননি দ্বারকানাথ। এ ঘটনা অলকাসুন্দরীর মৃত্যুর পরে ঘটে। মায়ের মৃত্যুর আগে দ্বারকানাথ বিজাতীয় খাদ্য স্পর্শ করেননি।

অন্য মেয়ে হলে এ সময় কী করতেন? হয় কেঁদে-কেঁদে নিঃশেষে হারিয়ে যেতেন, নয়তো থাকতেন আপনমনে। যেমন থাকত সেকালের অধিকাংশ ধনী গৃহিণীরা। দিগম্বরী এর কোনওটাই বেছে নিলেন না। তাঁর মতো তেজস্বিনী নারীর কাছে ধর্ম আর কর্তব্য সবার আগে। তাই মনের দুঃখ মনে চেপে তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মতামত চেয়ে পাঠালেন। কী করবেন তিনি? স্বামীকে ত্যাগ করে কুলধর্ম বজায় রাখবেন, না স্বামীর সহধর্মিণী হয়ে কুলধর্ম ত্যাগ করবেন? দ্বারকানাথ অবশ্য ধর্মত্যাগী নন। কিন্তু ম্লেচ্ছদের সঙ্গে যে একত্রে খানা খায় তার আর ধর্মত্যাগের বাকি কী আছে? পণ্ডিতেরা ভাল করেই বিচার করলেন। বহু বিতর্কের পর উত্তর এল, 'স্বামীকে ভক্তি ও তাঁহার সেবা করা অবশ্য কর্তব্য, তবে তাঁহার সহিত একত্র সহবাস প্রভৃতি কার্য অকর্তব্য।'

পণ্ডিতদের রায় শুনে দিগম্বরী নিজের কর্তব্য স্থির করে নিলেন। শুধু সেবা ছাড়া আর সব ব্যাপারে তিনি স্বামীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। অবশ্য বাইরের কেউ কিছু জানতে পারল না। কারণ তাঁর স্বামীভক্তি ছিল প্রবল। তিনি প্রতিদিন দ্বারকানাথের শয্যার কাছে গিয়ে মাটিতে একটি প্রণাম রেখে আসতেন। দ্বারকানাথ সম্পূর্ণ নির্বিকার। বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচিয়ে তিনি বাস করতে লাগলেন বৈঠকখানা বাড়িতেই। বাড়ির দক্ষিণে আলাদা একটা বাবুর্চিখানাও তৈরি হল। বৈষয়িক ব্যাপারে কিংবা অন্য কারও প্রয়োজনে দিগম্বরী যখনই স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে বাধ্য হতেন তারপরই সাত ঘড়া গঙ্গাজলে স্নান করে নিজেকে শুদ্ধ করে নিতেন। দিনরাতের বিচার ছিল না। দুঃসহ অত্যাচারের ফলে কয়েকদিনের জ্বরবিকারে নিভে গেল দিগম্বরীর জীবনদীপ। তাঁর জ্যোতির্ময়ী মূর্তিটি শুধু অম্লান হয়ে রইল মহর্ষিপুত্রের আধ্যাত্মিক ধ্যান-স্মৃতিতে। দ্বারকানাথেরও কি মনে পড়েনি তেজস্বিনী দিগম্বরীকে? স্ত্রীর মৃত্যুর পরে তিনি বারবার অনুভব করেছেন গৃহলক্ষ্মীর অভাব, তাই তো যেদিন কার-টেগোর কোম্পানির একটি মূল্যবান জাহাজ অকূল সাগরে ডুবে গেল সেদিন দ্বারকানাথের বুকভাঙা নিশ্বাসের সঙ্গে শুধু বেরিয়ে এল দুটি কথা, 'লক্ষ্মী চলিয়া গিয়াছেন, অলক্ষ্মীকে এখন আটকাইবে কে?'

সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে দিগম্বরী যে সাহস দেখিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর ছেলের বউয়েদের মধ্যে সেই তেজ সেই শক্তি দেখা যায়নি। দেবেন্দ্রনাথের স্ত্রী সারদার সমস্ত কাজকর্মই ছিল স্বামীকেন্দ্রিক। বরং গিরীন্দ্রনাথের স্ত্রী যোগমায়ার মধ্যে শাশুড়ির সনাতন ধর্মনিষ্ঠার অনেকটাই লক্ষ করা গেছে। দেবেন্দ্রনাথের ছোট ভাই নগেন্দ্রনাথের স্ত্রী ত্রিপুরাসুন্দরী, তিনি এসেছিলেন অনেক পরে।

সারদা এবং যোগমায়ার প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলা চলে যে, তাঁরা কিছু লেখাপড়াও শিখেছিলেন। মাইনে-করা বৈষ্ণবী এসে 'শিশুবোধক', 'চাণক্যশ্লোক', 'রামায়ণ', 'মহাভারত' পড়াত। আর কলাপাতায় চিঠি লেখা মকশো করাত। এ নিয়ম যে শুধু ঠাকুরবাড়িতে ছিল তা নয়, অনেক বাড়িতে ছিল। সারদা এবং যোগমায়াও পড়তে পারতেন; শুধু তাঁরা নন, বাড়ির অন্যান্য মেয়েরাও লেখাপড়া জানতেন। বই পড়লে বিধবা হবার ভয় কোনওদিনই তাঁদের ছিল না। গ্রামাঞ্চলে এই জাতীয় বিধিনিষেধ চলত।

সারদা অবসর সময়ে প্রায়ই একটা না একটা বই খুলে বসতেন। সংস্কৃত 'রামায়ণ', 'মহাভারত' পড়ে শোনাবার জন্যে মাঝে মাঝে ডাক পড়ত ছেলেদের। হাতের কাছে অন্য কোনও বই না থাকলে অভিধানখানাই খুলে বসতেন। চাণক্যশ্লোক তাঁর অতি প্রিয় ছিল।

যোগমায়াও নানারকম বই পড়তেন। মালিনী আসত বটতলার ছাপা বইয়ের পসরা নিয়ে। সেখান থেকে বেছে বেছে বই কিনতেন মেয়েরা। 'নবনারী', 'লয়লা-মজনু', 'হাতেমতাই', 'আরব্য রজনী', 'লাম্বস টেল', 'পাল ও বর্জিনিয়া'—সবই জোগাড় করেছিলেন যোগমায়া। তাঁর স্বামীর লেখা কাব্যোপন্যাস 'কামিনীকুমার'ও থাকত মালিনীর পসরায়। এই বইটি সম্বন্ধে স্বর্ণকুমারী লিখেছেন, 'কবিত্বে বা উপন্যাসিক রহস্যে কামিনীকুমারের মূল্য অধিক, এরূপ বলিতে পারি না—তথাপি সাহিত্য সমাজে ইহার নাম রক্ষা হওয়া উচিত। চলিত বঙ্গসমাজে স্ত্রীপুরুষ লইয়া নায়ক-নায়িকা রচনার ইহা সর্বাদি পুস্তক।' মালিনী আরও আনত 'মনভঞ্জন', 'প্রভাস-মিলন', 'কোকিল দূত', 'অন্নদামঙ্গল', 'রতিবিলাপ', 'বস্ত্রহরণ', 'গীতগোবিন্দ', 'গোলেবকাওলী', 'বাসবদত্তা'র মতো কিছু বই। যোগমায়া বেশ ভালই বাংলা জানতেন। সত্যেন্দ্রনাথের ভাষায় তিনি ছিলেন 'আমাদের একপ্রকার শিক্ষয়িত্রী।'

সারদা এবং যোগমায়া দুজনের কথাই জানতে ইচ্ছে করে কিন্তু জানার খুব সুবিধে নেই। ধর্মশীলা বউদুটির জীবন বয়েছিল দুটি খাতে। সরলপ্রাণা কোমলহৃদয়া সারদা মহর্ষি স্বামীর সহধর্মিণী হবারই চেষ্টা করেছিলেন, যদিও ব্রাহ্মধর্মের প্রতি তাঁর কোনও আকর্ষণ বা আসক্তি ছিল বলে মনে হয় না। আমরা তাঁকে যে রূপে দেখি সেটি সতী-সাধ্বী পতিব্রতার সনাতন রূপ। দেবেন্দ্রনাথের জন্যে তাঁর ভাবনার সীমা ছিল না। একবার শ্রাবণমাসের ভরা বর্ষায় তিনি গঙ্গাভ্রমণে বেরোলে কাঁদতে কাঁদতে সারদাও ছোট ছোট ছেলেদের নিয়ে স্বামীর সঙ্গী হয়েছিলেন, 'আমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইবে? যদি যাইতেই হয়, তবে আমাকে সঙ্গে করিয়া নাও।' হিমালয়ে রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে চিঠি লেখানোর ঘটনাটি তো সবাই জানে। স্বামীর মঙ্গলের জন্যে ব্রহ্মোপাসনা এবং হিন্দুমতে পূজার্চনা কোনওটিতেই তাঁর কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না। সৌদামিনী লিখেছেন, 'গ্রহাচার্যেরা স্বস্ত্যয়নাদির দ্বারা পিতার সর্বপ্রকার আপদ দূর করিবার প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহার কাছ হইতে সর্বদাই যে কত অর্থ লইয়া যাইত তাহার সীমা নাই।'

জ্ঞানদানন্দিনীর পুরাতনী কথা পড়ে আরও জানা যায়, সারদা বেশি নড়াচড়া করতে পারতেন না। সংসারের নিত্যকাজ দেখাশোনা করবার প্রয়োজনও হত না। একখানি তক্তপোশের ওপর তিনি বসে থাকতেন আর দাসীরা ছেলের বউয়েদের রূপটান মাখাত তাঁর সামনে বসে। এ ছিল সেকেলে ধনী পরিবারের দস্তুর। বাবুদের মতো অন্দরমহলের বিবিরাও তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসতেন। শুধু দেবেন্দ্রনাথ বাড়ি ফিরলে সারদা নিজে রান্নাঘরে গিয়ে বসে থাকতেন। জ্ঞানদানন্দিনী বলেছেন, 'আমার মনে পড়ে বাবামশায় যখন বাড়ি থাকতেন আমার শাশুড়িকে একটু রাত করে ডেকে পাঠাতেন, ছেলেরা সব শুতে গেলে। আর মা একখানি ধোয়া সুতি শাড়ি পরতেন, তারপর একটু আতর মাখতেন। এই ছিল তাঁর রাত্রের সাজ।' সেকালে গিন্নিরা ছোট থেকে বড় অবধি পরিপাটিরূপে সাজ করে, আতর মেখে, সিঁদুর আলতা পরে, কনেটি সেজে, ফুলের গোড়ে মালাটি গলায় দিয়ে তবে ঘরে ঢুকতেন। বলেছেন অবন ঠাকুর। তুলনায় সারদার সাজ ছিল সাদাসিধে।

সত্যি কথা বলতে কী, ঠাকুরবাড়িতে সারদার ছবিটি খুব স্পষ্ট নয় কিন্তু বড় স্নিগ্ধ। ভাবতে ভাল লাগে, তিনতলায় পঙ্খের কাজ-করা একটি ঘরে, মেঝেতে কার্পেট পাতা, সেই ঘরে বসে আছেন সারদা বালুচর শাড়ি পরে। ঘরের কোণে জ্বলছে একটি প্রদীপ, সেই আলোয় জ্বলজ্বল করছে সাদা চুলের মাঝে টকটকে লাল সিঁদুর। যদিও পাকা চুলে সিঁদুর পরার মতো বয়সে পৌঁছোবার আগেই তিনি মারা গিয়েছিলেন। তবু বর্ণনাটি সুন্দর। কত লোক আসছে যাচ্ছে, প্রশংসা করছে তাঁর জ্ঞানী গুণী ছেলেমেয়েদের, মায়ের লজ্জারুণ মুখে গভীর সুখের আবেশ—কিছু পাছে কেউ দেখে, দেখে ভাবে গরবিনী, তাই ছেলেমেয়েদের প্রশংসা শুনলেই মাথাটি নিচু করে নিচ্ছেন কুণ্ঠাভরে।

যোগমায়ার ছবিটিও কম সুন্দর নয়। তাঁকে আমরা শুধু পুরনো কথার মধ্য দিয়ে পেয়েছি।

তাঁর গায়ের রং ছিল সোনার মতো আর 'পাশ দিয়ে চলে গেলে গা দিয়ে যেন পদ্ম গন্ধ ছাড়াত।' শিশুদের খুব ভালবাসতেন। সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'আমাদের আসল আড্ডা ছিল মেজকাকীমার ঘর; সেই আমাদের শিক্ষালয়, সেই বিশ্রামস্থান।...আমাদের অন্তঃপুরে মহিলাদের মধ্যে সেকালে উচ্চশিক্ষার প্রচার ছিল না, তবুও কাকীমা প্রভৃতি বাড়ির মেয়েরা কেহ কেহ বাঙ্গলা বেশ জানিতেন, তাঁহারাই আমাদের একপ্রকার শিক্ষয়িত্রী ছিলেন।' দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার পরে বাড়িতে লক্ষ্মীজনার্দনের নিত্য পূজা বন্ধ করতে উদ্যত হলে যোগমায়া চাইলেন গৃহদেবতা লক্ষ্মীজনার্দনকে। তাই হল। যোগমায়া দুই ছেলে ও দুই মেয়েকে নিয়ে রইলেন দ্বারকানাথের বৈঠকখানা বাড়িতে। মহর্ষি পরিবার ৬ নং বাড়িতে। সেই থেকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি দুটি বাড়িতে পরিণত হয়; তবে দুই বাড়ির পুরুষদের মধ্যে মতের অমিল বা মনের অমিল কখনও হয়নি। এই ঘটনার পর দুই পরিবারের মেয়েদের গতিবিধি স্বাভাবিক রইল না, শুধু পালাপার্বণে দেখাসাক্ষাৎ ঘটত।

যোগমায়ার সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হওয়ায় মহর্ষির ছেলেমেয়েরা খুব দুঃখ পেয়েছিলেন। বড় মেয়ে সৌদামিনীর দুঃখই যেন বেশি। তিনি স্বামী পুত্র কন্যা নিয়ে জোড়াসাঁকোর বাড়িতেই জীবন কাটিয়েছেন। কাকিমা ছিলেন তাঁর সুখ-দুঃখের সঙ্গিনী। এবার মহর্ষিপরিবারের সব ভার পড়ল একা সৌদামিনীর ওপর। বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের একেবারে গোড়ার দিকে সৌদামিনী একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন, যদিও এর জন্যে তাঁর নিজের কৃতিত্ব খুব বেশি ছিল না।

আগেই বলেছি, ঠাকুরবাড়ি এবং আরও পাঁচটা সম্ভ্রান্ত পরিবারে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো হত। গ্রামাঞ্চলে সে সুযোগ ছিল না। দু-একজন দুঃসাহসিকা ছাড়া কেউ সাহস করে পুঁথিপত্র নিয়ে বসতে পারত নাকি? মনে তো হয় না। সুদূর পল্লীগ্রামের গৃহবধূ রাসসুন্দরী একটু-আধটু লেখাপড়া শিখেছিলেন। তিনি ঠাকুরবাড়ির কেউ নন, এমনকী এই পরিবারের সংস্পর্শেও আসেননি, তবু বাঙালি মেয়েদের মধ্যে তিনিই লিখেছিলেন প্রথম আত্মজীবনী। এই প্রথম নিজের কথা লেখার মতো বিশেষ ঘটনাটি আমরা ঠাকুরবাড়িরই কোনও মহিলার কাছে আশা করেছিলাম। যাই হোক, রাসসুন্দরীর পক্ষে লেখাপড়া শেখা সহজ ছিল না, ঘরের দরজা বন্ধ করে শিখতে হত। না হলে শোনা যেত বৃদ্ধাদের খেদোক্তি, 'বুঝি কলিকাল উপস্থিত হইয়াছে দেখিতে পাই। এখন বুঝি মেয়েছেলেতে পুরুষের কাজ করিবেক। এতকাল ইহা ছিল না। একালে হইয়াছে।' এই তিক্ত মন্তব্য শুনতে শুনতে রাসসুন্দরীর মনে হত, 'যেন বিদ্যার আর কোনও গুণ নাই, বিদ্যায় কেবল টাকা উপার্জন হয়।' রাসসুন্দরীর মতো লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তে হয়েছে সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনীর মাকেও। তিনি রাত্রিবেলা দরজা বন্ধ করে 'হিসেব কিতেব চিঠিপত্র লিখতেন।' শিবনাথ শাস্ত্রীর মা গোলকমণি দেবীও নানা উপায়ে লেখাপড়া শিখেছিলেন। পাবনার প্রমথ চৌধুরীর দিদি প্রসন্নময়ী তো ছোটবেলায় 'বালকবেশে' কাছারি বাড়িতে সরকারের কাছে পড়তে যেতেন। তাঁর পিসিদের মধ্যে তিনজন ভগবতী, কৃষ্ণসুন্দরী ও মৃন্ময়ী বেশ লিখতে পড়তে পারতেন কিন্তু ছোট পিসি বালবিধবা কাশীশ্বরী ছিলেন বিদুষী মহিলা। ছোট ছেলেমেয়েরা তাঁর কাছে লেখাপড়া শিখতে যেত। প্রসন্নময়ী লিখেছেন, 'কাশীশ্বরী তীর্থ ভ্রমণ করিয়া হটি তর্কালঙ্কার সাজিয়া মুণ্ডিত মস্তকে গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া এক পাঠশালা খুলিয়া বসিলেন।' এ প্রসঙ্গে হটি বিদ্যালঙ্কার, হটু বিদ্যালঙ্কার কিংবা চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কারের মেয়ে দ্রবময়ীর কথাও স্মরণীয়। কিন্তু এঁদের ব্যতিক্রম হিসেবেই ধরা হত। বেশিরভাগ মেয়েই লেখাপড়া শেখার সুযোগ পেতেন না।

তুলনামূলকভাবে কলকাতার অবস্থা বেশ ভাল। সেখানে পালা করে বৈষ্ণবীরা এসে লেখাপড়া শেখাত। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে সব মেয়েকেই নিয়ম করে নির্দিষ্ট সময়ে পড়তে বা

পড়া শুনতেই হত। পরে উঠত বই পড়ার অভ্যাস। প্রথমে লেখাপড়ার ইচ্ছে না থাকলেও গল্পের লোভে বই পড়ার আগ্রহ গড়ে উঠত। কিছুদিন পরে বৈষ্ণবীর স্থান গ্রহণ করে ইংরেজ গৃহশিক্ষিকারা। রাজা নবকৃষ্ণ, রাধাকান্ত দেববাহাদুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাজা বৈদ্যনাথ রায় নিজেদের অন্তঃপুরে লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। তবে সে শিক্ষা নিভৃতে, অন্তরালে। প্রসন্নকুমারের মেয়ে হরসুন্দরী ও পুত্রবধূ বালাসুন্দরী নানা বিদ্যায় পারদর্শিনী হয়ে ওঠেন। অকালমৃত্যু না হলে হয়তো জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের স্ত্রী বালাসুন্দরীই বাংলাদেশে স্ত্রী-স্বাধীনতার সূচনা করে যেতেন। তিনি সকাল ন'টা থেকে বিকেল তিনটে পর্যন্ত গভর্নেসের কাছে লেখাপড়া করতেন। ইংরেজি বলতে পারতেন। লিখতেও শিখেছিলেন। যদিও অন্তঃপুরের বাইরে তিনি যাননি। মনে মনে তার প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন মাত্র। বৈদ্যনাথ রায়ের স্ত্রীকে পড়াতেন সেন্ট্রাল ফিমেল স্কুলের মিসেস উইলসন। ঠাকুরবাড়িতেও বিদেশিনী শিক্ষয়িত্রী মিস গোমিস এসেছিলেন, কিন্তু বাড়ির মধ্যে এ ধরনের শিক্ষয়িত্রী রাখার মধ্যে বিশেষ সাহসের কিছু ছিল না।

এ সময় তোড়জোড় চলছিল মেয়েদের জন্যে একটা ভাল স্কুল খোলার। জেনানা মিশনের উদ্যোগে একাধিক স্কুল থাকলেও সেখানে পড়তে যেতে পারতেন না অভিজাত পরিবারের মেয়েরা। অথচ স্ত্রীশিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন অনেকেই। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছাড়াও এ ব্যাপারে উৎসাহ ছিল রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, মদনমোহন তর্কালংকার, ও আরও অনেকের। তাঁরা মেয়েদের জন্যে স্কুল খোলার পক্ষপাতী ছিলেন। বাধা এসেছিল প্রচণ্ডভাবে। এই 'গেল গেল' রবের মধ্যেই স্থাপিত হয়েছিল বেথুন স্কুল। প্রথমে স্কুলের নাম ছিল 'হিন্দু ফিমেল স্কুল'। দেশীয় পণ্ডিতদের সাহায্যে স্কুলটি স্থাপন করেন ভারতহিতৈষী জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন। স্কুলটি প্রথমে খোলা হয়েছিল রাজা দক্ষিণারঞ্জনের সুখিয়া স্ট্রিটের বাড়ির বৈঠকখানায়। এই স্কুলেই পড়তে এসেছিলেন পাঁচ বছরের ছোট্ট মেয়ে সৌদামিনী। সেটা ১৮৫১ সাল। তার দু বছর আগে ১৮৪৯ সালের সাতই মে 'হিন্দু ফিমেল স্কুল' প্রতিষ্ঠা হয়েছে। খুব স্বাভাবিক ভাবেই আমরা আশা করতে পারি ঠাকুরবাড়ির কোনও মেয়ে তার প্রথম ছাত্রী হবেন। তা কিন্তু হয়নি। এই স্কুলের প্রথম দুটি ছাত্রী মদনমোহন তর্কালংকারের দুই মেয়ে কুন্দমালা ও ভুবনমালা। মেয়েদের স্কুলে পাঠাবার জন্যে তাঁকে নিজের গ্রামে সমাজচ্যুত হতে হয়। ওই দুজনের সঙ্গে আরও উনিশটি মেয়ে স্কুলে ভর্তি হল।

কিন্তু সামাজিক ঝড় উঠতে দেরি হল না। এসব ঝড় তোলে খবরের কাগজেরা। 'সমাচার চন্দ্রিকা' নানারকম গুজব আপত্তি তুলেছিল। সরলমতি বালিকাদের স্কুলে পাঠানো উচিত নয়, তাতে 'ব্যভিচার সংঘটনের শংকা আছে'। কামাতুর পুরুষেরা সুযোগ পেলেই 'তাহাদিগকে বলাৎকার করিবে, অল্পবয়স্ক বলিয়া ছাড়িয়ে দিবে না, কারণ খাদ্যখাদক সম্বন্ধ।' অথচ 'হিন্দু ফিমেল স্কুলে'র আগেও তো মেয়েদের স্কুল ছিল। ১৮১৯ সালের মে-জুন নাগাদ খোলা হয় 'জুভেনাইল স্কুল'। প্রথমে ছাত্রী ছিল আটটি, পরে দাঁড়ায় বত্রিশটিতে। পরে 'লেডিজ সোসাইটি' অনেক কাজ করে। ১৮২১-এ মেরী অ্যান কুক কলকাতায় এসে কতকগুলো অবৈতনিক স্কুল খোলেন। একবছরের মধ্যেই তিনশো মেয়ে লেখাপড়া শুরু করে। ১৮২২-এ এই সংখ্যা দাঁড়ায় ছ'শোতে। শ্রীরামপুর, ঢাকা, বীরভূম, চট্টগ্রামেও মেয়েদের স্কুল খোলা হল। ১৮৪৭ সালে প্রথম হিন্দু ছাত্রীদের জন্যে খোলা হয় একটি স্কুল, কলকাতার কাছেই বারাসতে। তবু নতুন স্কুলটি নিয়ে যথেষ্ট হইচই হল। এমন কথাও লেখা হল যে, যাঁরা ওই স্কুলে মেয়েদের পড়তে পাঠাচ্ছেন তাঁরা 'মান্য ও পবিত্র হিন্দু কুলোদ্ভব' নাও হতে পারেন। দেখতে দেখতে বেথুনের ছাত্রী সংখ্যা কমে গিয়ে দাঁড়াল সাতটিতে। বিপক্ষদলও চুপ করে ছিলেন না, এমনকী 'সংবাদ প্রভাকর' পর্যন্ত এসব উক্তির প্রতিবাদ জানান। কে মান্য আর কে মান্য নন সে নিয়েও তর্ক চলতে লাগল, তবু কাগজের তর্কাতর্কি এক জিনিস আর বাস্তবে ঘটে আর-এক জিনিস। ধনীমানী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা

ইতস্তত করতে লাগলেন। দু-একটা উদাহরণের প্রয়োজন হলে ডাক পড়ল সৌদামিনীর। পাঁচ বছরের সুন্দর ফুটফুটে মেয়েটি পেশোয়াজ পরে খুড়তুতো বোন কুমুদিনীর সঙ্গে স্কুলে যাবার জন্যে তৈরি হল। দেবেন্দ্রনাথ সৌদামিনীকে স্কুলে পাঠালেন শুধু দৃষ্টান্ত দেখাবার জন্যে। তিনি জানতেন তাঁর দেখাদেখি আরও অনেকে নিজের মেয়েদের স্কুলে পাঠাবেন। তাঁর অনুমানে ভুল হয়নি। ১৮৫১ সালের জুলাই মাসে সৌদামিনী স্কুলে ভর্তি হলেন বাঙালি মেয়েদের পড়াশোনার পথ সহজ করে দেবার জন্যে। বিপত্তি? হ্যাঁ, তাঁকে নিয়েও বিপদ হয়েছিল বইকী! তাঁর ধবধবে ফরসা শ্বেত পাথরের মতো গায়ের রং দেখে একবার পুলিশ এসে ধরেছিল চুরি-করা ইংরেজ মেয়ে ভেবে।

সৌদামিনীর লেখাপড়া ঠিক কতটা এগিয়েছিল জানা যায়নি। মহর্ষি পরিবারে তিনি ছিলেন 'গৃহরক্ষিতা' অর্থাৎ গৃহের রক্ষয়িত্রী। সমস্ত কিছু দেখাশোনা করে তাঁর হাতে সময় থাকত কম। শুধু কি দেখাশোনা? বোনেরা কোথাও যাবে, তাদের নিখুঁত করে চুল বেঁধে দিতে হবে। বাড়িতে কোনও উৎসব হবে, সুন্দর করে ফুল কেটে আলপনা দিতে হবে। সব দিকে মহর্ষির সতর্ক দৃষ্টি। তাই বিশাল পরিবারের আদর্শ গৃহিণী হয়ে সৌদামিনী অন্যদিকে নজর দিতে পারতেন না। সব কাজের মধ্যে মহর্ষির সেবায় নিজেকে ঢেলে দিয়েছিলেন। নিজের হাতে রান্না করতেন মহর্ষির জন্যে। যত্ন করে পরিবেশন ও খাওয়ানোর ব্যাপারে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। মেয়েদের রান্না শেখানোর ব্যাপারে দেবেন্দ্রনাথ একবার আদেশ দিয়েছিলেন মেয়ে বউদের রান্না শেখাবার। সৌদামিনী নিষ্ঠার সঙ্গে সে আদেশ পালন করতেন। তাঁর নিজের লেখা বলতে দু-একটি ব্রহ্মসংগীত আর একটিমাত্র স্মৃতিকথা 'পিতৃস্মৃতি' ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি। 'তোমারে পূজিব অকিঞ্চন' গানটি হয়তো অনেকেই শুনেছেন। 'পিতৃস্মৃতি'ও দুষ্প্রাপ্য নয়। পড়ে মনে হয়, ইচ্ছে করলে সৌদামিনী আরও অনেক কিছুই দিতে পারতেন কিন্তু দিয়েছেন শুধুমাত্র কয়েকটি সেকেলে ছবির টুকরো। বেথুনে পড়ার কথাই ধরা যাক না। সৌদামিনী লিখেছেন:

'কলকাতায় মেয়েদের যখন বেথুন স্কুল প্রথম স্থাপিত হয় তখন ছাত্রী পাওয়া কঠিন হইল। তখন পিতৃদেব আমাকে এবং আমার খুড়তুত ভগিনীকে সেখানে পাঠাইয়া দেন। হরদেব চাটুজ্জ্যেমশায় আমার পিতার বড় অনুগত ছিলেন, তিনিও তাঁহার দুই মেয়েকে সেখানে নিযুক্ত করিলেন। ইহা ছাড়া মদনমোহন তর্কালংকার মহাশয়ও তাঁহার কয়েকটি মেয়েকে বেথুন স্কুলে পড়িতে পাঠাইয়া দেন। এইরূপে অল্প কয়েকটি মাত্র ছাত্রী লইয়া বেথুন স্কুলের কাজ আরম্ভ হয়।'

এ যেন শুধুই খবর। তফাত এই যে, একথা তৃতীয় ব্যক্তির রিপোর্ট না হয়ে বেথুনের একেবারে প্রথম দিকের একটি ছাত্রীর লেখা নিজের কথা। অথচ সৌদামিনী কত খবরই না দিতে পারতেন। বেথুনে-পড়া মেয়েদের নিয়ে তো কম ছড়া আর প্রহসন লেখা হয়নি। বলা বাহুল্য সৌদামিনীকেও কতকটা বিরুদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে দিয়েই এগোতে হয়েছে। যেমন হায়-হায় করে উঠলেন গুপ্ত কবি 'যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে।/ তখন এ. বি. শিখে বিবি সেজে বিলাতি বোল কবেই কবে।' যদিও ঈশ্বর গুপ্ত স্ত্রীশিক্ষা বিরোধী ছিলেন না, বরং উৎসাহীই ছিলেন। লেখা শুরু হল বেথুনে-পড়া অতএব বিপথগামিনীদের নিয়ে নানারকম প্রহসন—'স্বাধীন জেনানা', 'বৌবাবু', 'পাশকরা মাগ', 'শিক্ষিত বউ', 'মাগ-মুখো ছেলে', 'শ্রীযুক্তা বৌবিবি', 'পাশকরা আদুরে বৌ', 'কলির মেয়ে ও নব্যবাবু', 'বরবদল', 'পণ্ডিত মেয়ে', 'ফচকে ছুঁড়ির কীর্তিকাণ্ড', 'হড়কো বৌ-এর বিষমজ্বালা'; 'কলির বৌ হাড়-জ্বালানী', 'মাগসর্বস্ব', 'বেহদ্দ বেহায়া', 'মেয়েছেলের লেখাপড়া আপনা হতে ডুবে মরা'—নামের কি শেষ আছে! বিষয়বস্তু সবারই এক, বক্তব্যও একটাই, 'গেল গেল সব গেল'। এসব লেখা হয়েছে পঞ্চাশ বছর ধরে। এমনকী বিশ শতকের গোড়ার দিকেও।

সৌদামিনী যে এই জাতীয় সামাজিক বাদানুবাদের খবর রাখতেন না তা নয়। তাঁর লেখা থেকেই জানতে পারি জোড়াসাঁকোয় মহর্ষিভবনের সীমানার ওপারেই ছিল দেবেন্দ্রনাথের

পিসতুত ভাই চন্দ্রবাবুর বাড়ি। ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা খোলা ছাদে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখে তিনি একদিন এসে বললেন, 'দেখ দেবেন্দ্র, তোমার বাড়ির মেয়েরা বাহিরে, খোলা ছাতে বেড়ায় আমরা দেখতে পাই, আমাদের লজ্জা করে। তুমি শাসন করিয়া দাও না কেন?' সৌদামিনী জানিয়েছেন, 'আমাদের বাড়িতে যখন দুর্গোৎসব ছিল ছেলেরা বিজয়ার দিনে নূতন পোশাক পরিয়া প্রতিমার সঙ্গে সঙ্গে চলিত—আমরা মেয়েরা সেইদিন তেতলার ছাদে উঠিয়া প্রতিমা বিসর্জন দেখিতাম, তখন বৎসরের মধ্যে সেই একদিন আমরা তেতলার ছাদে উঠিবার স্বাধীনতা পাইতাম।' উদারপন্থী দেবেন্দ্রনাথ এর মধ্যে কোনও দোষ দেখতে পাননি। তার চেয়েও বড় কথা, তিনি বুঝেছিলেন দিন-বদলের পালা শুরু হয়েছে। তাই হেসে বলেছেন, 'আমি আর কিসের বাধা দিব। যাঁহার রাজ্য তিনিই সমস্ত ঠিক করিয়া লইবেন।'

তবে সৌদামিনীর 'পিতৃস্মৃতি' পড়ে দেবেন্দ্রনাথকে নব্যপন্থী ভাবলে ভুল করা হবে। যতক্ষণ না ছেলেমেয়েরা মন্দের দিকে যাচ্ছে ততক্ষণ কিছু বলতেন না। হিন্দু সমাজের বহু সংস্কার তিনি ব্রাহ্ম হয়েও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, মেয়েদের অবাধ স্বাধীনতা কোনটাই তাঁর সমর্থন পায়নি। আবার পারিবারিক প্রথা বা স্ত্রী-আচারকে নির্মূল করার জন্যেও তাঁর কোনও আগ্রহ ছিল না। কারণ তিনি জানতেন, এইসব তুচ্ছ প্রথা আর আচারের তলা দিয়ে বয়ে চলেছে বাঙালির নিজস্ব প্রাণধারা, ওপর থেকে টান দিলে তার মূল যাবে ছিঁড়ে, রস যাবে শুকিয়ে। শুধু যা সত্যিই সমর্থনযোগ্য নয় তাতে বাধা দিতেন। সৌদামিনীই লিখেছেন, 'মা একবার আমার ছোট দুই ভগিনীর নাক বিধাইয়া দিয়া বলিলেন, যাও, কর্তাকে দেখাইয়া নোলক চাহিয়া আন। তিনি নাক বেধান দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, এ কি সং সাজিয়াছ। যাও যাও খুলিয়া ফেল। বন্য বর্বররাই তো নাক কান ফুঁড়িয়া গহনা পরে—এ কি ভদ্রসমাজের যোগ্য।' তখনকার পরিস্থিতিতে স্থির মস্তিষ্কে এই ধরনের চিন্তা করে দুটো বিপরীতমুখী স্রোতের মধ্যে দিয়ে সংসার তরণীখানিকে পার করে নিয়ে যাওয়াই ছিল অসাধারণ কৃতিত্বের কথা। সুখের বিষয়, দেবেন্দ্রজীবনের অনেক অন্তরঙ্গ ছবিই আমরা সৌদামিনীর প্রবন্ধ থেকে পেতে পারি। যেমন পিতৃঋণ শোধ করার পরে দেবেন্দ্রনাথ সামান্যতম ঋণকেও ভয় করতেন। সৌদামিনী তাঁর 'পিতৃস্মৃতি'তে লিখেছেন :

'তিনি সামান্য পরিমাণ দেনাকেও অত্যন্ত ভয় করিতেন। তাঁহার ছেলেরা কেহ ঋণ করিয়া তাঁহাকে সাহায্যের জন্য ধরিলে তিনি বলিতেন, 'আমি কি চিরদিন কেবল ঋণ শোধই করিব?' মহর্ষির ব্যয় সংকোচের কথাও আছে, 'তিনি একবারে চারি আনা মূল্যের অধিক সামগ্রী আহার করিতেন না। যাঁহার পিতার ডিনার তিন শত টাকার কমে হইত না। তিনি চারি আনা মূল্যের ডিনার খাইয়া তৃপ্ত হইতেন।...সমস্ত গাড়িঘোড়া বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন, কেবল বাটির মহিলাদিগের যাতায়াতের জন্য একটিমাত্র পালকি রাখিলেন।' সৌদামিনী না জানালে এর অনেক কথাই জানা যেত না কোনওদিন।

সৌদামিনীর ছোট বোনেদের মধ্যে সুকুমারী অল্প বয়সে মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনিও তাঁর দিদির মতো একটি ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে নিজে কোনও ভূমিকা না নিয়েও জড়িয়ে পড়েছেন। দেবেন্দ্রনাথ সুকুমারীর বিয়ে দিয়েছিলেন ব্রাহ্মধর্ম অনুসারে অর্থাৎ বিবাহ অনুষ্ঠানে শালগ্রাম শিলা বর্জন করে। তখনও ব্রাহ্মবিবাহ আইন প্রচলিত হয়নি। সুকুমারীর বিয়েই প্রথম ব্রাহ্মবিবাহ। এই বিয়ে হয় ১৮৬১ সালের ২৬ জুলাই। তার আগে ব্রাহ্মদের গার্হস্থ্য জীবনের কোনও কাজে স্বতন্ত্র অনুষ্ঠান পদ্ধতি প্রস্তুত করা হত না। এই বিয়ে নিয়ে প্রচণ্ড আলোড়ন শুরু হয়। অনেকে এ বিবাহকে অসিদ্ধ বলে মনে করতেন। এই বিবাহে পৌত্তলিক অনুষ্ঠান ছাড়া সমস্ত হিন্দুরীতি পালিত হয়েছিল। পাত্র দর্পনারায়ণ ঠাকুর বংশীয় শ্যামলাল ঠাকুরের দৌহিত্র হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। রাখালদাস হালদার বিবাহের বিস্তৃত বিবরণ লন্ডনের 'All the year Round' পত্রিকায় (৫.৪.১৮৬২) প্রকাশ করেন। এভাবে মেয়ের বিয়ে দেওয়া এবং হিন্দুমতে

পিতৃশ্রাদ্ধ না করায় দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মীয়-পরিজনদের কাছ থেকে আরও দূরে সরে গেলেন। পাশে রইলেন শুধু গিরীন্দ্রনাথের পরিবার ও তাঁদের তিন দিদি জাহ্নবী, রাসবিলাসী ও শ্রবণী। নারী হলেও তাঁরা সংসারের পতিত ছিলেন। এই পরিবারকে ত্যাগ করতে পারলেন না কাকা রমানাথ ঠাকুর ও দুই জ্যাঠতুতো দাদা। অর্থাৎ নীলমণির পরিবার এক অদৃশ্য বন্ধনে বাঁধা রইলেন।

সৌদামিনী-সুকুমারীর বোন স্বর্ণকুমারী বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক লেখিকা। অবশ্য স্বর্ণকুমারীর আরও একজন দিদি ছিলেন শরৎকুমারী নামে। তিনি রান্নাঘর এবং রূপচর্চাকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। স্বর্ণকুমারীর ছোট বোন বর্ণকুমারীও দু-একটি ক্ষেত্রে অভিনয় করা ছাড়া বিশেষ কিছুই করেননি। কিন্তু স্বর্ণকুমারী সেদিক থেকে এক বিরল ব্যতিক্রম। তাঁর সোনালি হাতে ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল আলোকিত। স্বর্ণকুমারীর সাফল্য ও কৃতিত্বের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন আরও একজন মহিলা, তিনি ঠাকুরবাড়ির মেজো বউ জ্ঞানদানন্দিনী। যদিও তিনি এ বাড়ির মেয়ে নন, বিবাহসূত্রে এসে পড়েছেন ঠাকুরবাড়ির অঙ্গনে। কিন্তু ঠাকুরবাড়ির কৃতিত্ব ও ঐতিহ্য থেকে তাঁকে আলাদা করে দেখবে কে? এখনকার শিক্ষাদীক্ষা চিন্তাভাবনা সবকিছুর সঙ্গেই যে তিনি জড়িয়ে-মিশিয়ে আছেন। সত্যি কথা বলতে কী, জ্ঞানদানন্দিনীই তো সবার আগে সবরকম বাধা-নিষেধের বেড়া টপকে বৃহত্তর জগতে এসে মেয়েদের মুক্তির পথ খুলে দিয়েছেন। তারপর পর্দা আর আবরু ঘোচাতে মেয়েদের বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। তাই স্বর্ণকুমারীর সঙ্গে, বা বলা যায় তাঁর আগেই জ্ঞানদানন্দিনীর প্রসঙ্গ সেরে নেওয়া যেতে পারে। এঁদের কাউকেই আলাদা করে দেখা যায় না, কারণ এঁরা এসেছেন একই সময়ে, একই সঙ্গে এবং একই পরিবারের সদস্য হয়ে।

জ্ঞানদানন্দিনী মহর্ষি পরিবারের মেজো বউ। স্বাভাবিকভাবেই বড় বউয়ের কথা মনে পড়ে। দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথের স্ত্রী সর্বসুন্দরীর ভূমিকা ঠাকুরবাড়িতে খুব স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারেনি। এক-একজনের লেখায় তিনি হঠাৎ হঠাৎ উঁকি মেরে গেছেন চওড়া লালপেড়ে শাড়ির পাড়ের আড়াল থেকে। ঘোমটার সীমানা বুঝি ডিঙিয়ে উঠত না, তাই তাঁর ছোটখাটো দেহটি একেবারে মিশে গেছে অন্দরমহলের থামের আড়ালে। তাঁর স্বল্পায়ু জীবনের অধিকাংশই তো কেটেছে পরের সেবায়। শাশুড়ি-ননদ-জা আত্মীয়স্বজন সবাইকে আপন করে নিতে নিতে এবং ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করতে করতে তিনি হারিয়ে গিয়েছিলেন বিরাট পরিবারের অসংখ্য মানুষের মধ্যে। নটি সন্তানের জননী ছিলেন সর্বসুন্দরী। দুটি জন্মের পরেই মারা যায়। একটি মৃত পুত্রের জন্ম দিয়ে প্রসবজনিত অসুস্থতায় মাত্র একত্রিশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। প্রফুল্লময়ী লিখেছেন, 'মৃত্যুর সময় আমি নিকটে ছিলাম, মৃত্যুর কিছু পূর্বেই সংকেতের দ্বারা আমাকে জানাইলেন যে, তিনি তাঁহার স্বামীকে ও ছেলেমেয়েদের দেখিতে চান। আমি তৎক্ষণাৎ বড় দাদাকে তাঁহার ইচ্ছার কথা জানাইলাম। তিনি আসিবার অল্পক্ষণ আগেই তাঁহার প্রাণ বাহির হইয়া যায়।' সেকালে তো মেয়েদের জীবন এমনি করেই কাটত। কিন্তু জ্ঞানদানন্দিনী হারিয়ে ফুরিয়ে যাবার মতো মেয়ে ছিলেন না। তীক্ষ্ণ জেদি একরোখা মেজাজ ও অদম্য প্রাণপ্রাচুর্য নিয়ে তিনি মেয়েদের অগ্রগতির অনেকটা পথই খুলে দিয়েছিলেন। সব কাজে সহায় ছিলেন তাঁর স্বামী, প্রথম ভারতীয় আই. সি. এস. অফিসার সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জ্ঞানদানন্দিনীর বাবা গৌরীদান করেছিলেন সাত বছরের মেয়েকে। তখন তাঁর অক্ষর-পরিচয় সবে শুরু হয়েছে গ্রামের পাঠশালাতে। তারপর সবার যা হয় তাই হল। পুতুলখেলার ঘর সাজাতে সাজাতে নিজেই একদিন মোমের পুতুলটি সেজে ঢুকে পড়লেন রাজবাড়ির মতো সদর-অন্দর-দেউড়ি-দালানওলা বিরাট বিশাল ঠাকুরবাড়িতে। পায়ে

ঘাগরি-পাজামা, মাথায় একগলা ঘোমটা। সেই ঘোমটাখানি হয়তো দু'হাতে সন্তর্পণে তুলে ধরে ভীত-চকিত হরিণীর দুটি কাজলটানা ব্যাকুল চোখ বারবার পথ খুঁজেছিল পিছন ফিরে চাওয়ার। বলা বাহুল্য পায়নি। ঠাকুরবাড়ির কোন বউ তার পূর্ব জীবনের কথা মনে রাখতে পেরেছে? কিন্তু এগিয়ে যাবার জন্যে নতুন পথ খুঁজে পেয়েছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী। সে এক ইতিহাস।

শুধু প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ান অফিসার নন, বাংলার স্ত্রী-স্বাধীনতার পথিকৃৎ সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর লজ্জাবতী বালিকাবধূটিকে সব বিষয়ে ভারতীয় নারীর আদর্শ করে তুলতে চেয়েছিলেন। বিলেতে গিয়ে তিনি দেখলেন স্বাধীনচেতা বিলেতিনীদের। ঘরে-বাইরে তাদের অবাধ বিহার—স্বচ্ছন্দ, সুন্দর, সাবলীল। কই কোথাও তো ছন্দপতন ঘটছে না। 'সব গেল সব গেল' রব তুলে রসাতলে যাচ্ছে না বিলিতি সমাজ। তা হলে? যে মেয়েরা 'জীবন-উদ্যানের পুষ্প' তাদের আলো-বাতাস থেকে বঞ্চিত করে ঘরের মধ্যে শুকিয়ে মারলে 'কি মঙ্গলের সম্ভাবনা'?

সত্যেন্দ্র স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন। তিনি অন্তঃপুরের কারাগার ভেঙে ফেলেছেন, তাঁর স্ত্রী এসেছেন কালাপানি পাড়ি দিয়ে বিলেতে। মন জানবার আগেই মনের মানুষ বলে তাঁর পাশে আদরের 'জ্ঞেনুমণি' যাঁকে বরণ করে নিয়েছেন, জগৎসভার অধিকারী হয়ে সকলের মধ্যে যোগ দিতে তাঁকেই আবার পরিয়ে দিচ্ছেন প্রেম-পরিচয়ের বরণমালা। শুরু হল স্ত্রীকে গড়ে তোলার সাধনা। লেখা চলল চিঠির পর চিঠি।

'তোমার মনে কি লাগে না আমাদের স্ত্রীলোকেরা এত অল্প বয়সে বিবাহ করে যখন বিবাহ কি তাহারা জানে না, ও আপনার মনে স্বাধীনভাবে বিবাহ করিতে পারে না। তোমার বিবাহ যে তোমার হয় নাই, তাহাকে কন্যাদান বলে। তোমার পিতা কেবল তোমাকে দান করিয়াছেন।' সাগর পার থেকে আসা চিঠি জ্ঞানদানন্দিনীর কানে কানে শোনায় নতুন খবর.

'আমরা স্বাধীনতাপূর্বক বিবাহ করিতে পারি নাই। আমাদের পিতামাতারা বিবাহ দিয়াছিলেন।' জ্ঞানদানন্দিনীর বুক কাঁপে, কী বলতে চায় চিঠি, 'তুমি যে পর্যন্ত বড়, শিক্ষিত ও সকল বিষয়ে উন্নত না হইবে, সে পর্যন্ত আমরা স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করিব না।' এমন চিঠির উত্তরে জ্ঞানদানন্দিনী কী লিখতেন কে জানে? তাঁর লেখা একটি চিঠিও পাওয়া যায়নি। সত্যেন্দ্রের চিঠিতে অন্তরঙ্গ সম্বোধন থাকলেও তার ভাষা কেতাবি ধরনের সাধুভাষা, হয়তো সে সময় দাম্পত্য পত্রালাপের ভাষাও সাধুভাষাই ছিল। হেমেন্দ্রনাথকেও সাধুভাষা ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছে, তবে রবীন্দ্রনাথ চিঠি লিখতেন মুখের ভাষায়। এক একটি চিঠিতে ঝরে পড়ত সত্যেন্দ্রের মনের কথা :

'এখানে জনসমাজে যাহা কিছু সৌভাগ্য, যাহা কিছু উন্নতি, যাহা কিছু সাধু সুন্দর, প্রশংসনীয়—স্ত্রীলোকদের সৌভাগ্যই তাহার মূল।...আমার ইচ্ছা তুমি আমাদের স্ত্রীলোকের দৃষ্টান্তস্বরূপ হইবে কিন্তু তোমার আপনার উপরই তাহার অনেক নির্ভর।'

এসব কথার অর্থ কি, পূর্ণিমার রাতে চাঁদের আলোয় নির্জন ছাতে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে ভাবতেন জ্ঞানদানন্দিনী। তখন তাঁর বয়স তেরো বছর। সত্যেন্দ্রর চিঠি থেকে জানতে পারি, 'আমাদের স্ত্রীলোকের যা কিছু আদর, যত লজ্জা, যত ভীরুতা তুমি যেন তার মূর্তিমতী ছিলে। এখনও কি তোমার সবই সেইরূপ ভাব আছে?' ধীরে ধীরে নিজেকে বদলাতে শুরু করলেন জ্ঞানদানন্দিনী।

অবশ্য সত্যেন্দ্রর স্বপ্ন সফল হল না সেবারে। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করে দিলেন। সব ইচ্ছে কি পূর্ণ হয়? বাড়ির বউ রইলেন বাড়ির মধ্যেই। তাঁর পড়াশোনা নতুন করে শুরু হল সেজো দেওর হেমেন্দ্রনাথের কাছে। বাড়ির অন্য মেয়ে-বউদের সঙ্গে লজ্জায় জড়সড় হয়ে ঘোমটা টেনে বসতেন জ্ঞানদানন্দিনী, হেমেন্দ্রর এক একটা ধমকে চমকে চমকে উঠতেন। এমনি করেই তাঁর পড়া এগোল মাইকেলের 'মেঘনাদবধ' কাব্য পর্যন্ত।

ইতিমধ্যে দেবেন্দ্রনাথ আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ করে ফেললেন। মেয়েদের শিক্ষা ঠিকমতো এগোচ্ছে না দেখে তিনি তাদের পড়াবার জন্যে ব্রাহ্মসমাজের নবীন আচার্য অযোধ্যানাথ পাকড়াশীকে গৃহশিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করেন। সেই প্রথম 'একজন অনাত্মীয় পুরুষ' ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। তিনি বাড়ির ছোট ছোট মেয়ে এবং বউদের স্কুলপাঠ্য বইগুলি বেশ যত্ন করে পড়াতেন। এসময় কেশবচন্দ্র সেন কিছুদিন সপরিবারে ঠাকুরবাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এভাবে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর পদ্ধতিটি তাঁর খুব ভাল লেগেছিল।

জ্ঞানদানন্দিনীর সাফল্যের নেপথ্য ইতিহাসটি খুব পরিষ্কার নয়। সবাই জানি, তিনি স্বামীর স্বপ্নকে সফল করেছিলেন। কিন্তু কী সেই স্বপ্ন? মেয়েরা পুরুষের পাশে এসে দাঁড়াবেন শিক্ষায় যোগ্যতায় সমমর্যাদা নিয়ে, এই তো। আজকের দিনে এর গুরুত্ব অনুভব করা শক্ত। কারণ জ্ঞানদানন্দিনী যা করেছেন তা হয়তো খুব কঠিন নয় কিন্তু প্রথম কাজ হিসেবে অসম্ভব রকমের কঠিন। আজ যখন শুনি, তিনি প্রথম বাঙালিনী, যিনি বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন তখন সবটাই হাস্যকর বলে মনে হয়। কী এমন শক্ত কাজ? সাহসেরই বা দরকার কী? এ নিয়ে এত হইচই করারই বা কী আছে? তবু হইচই হয়েছিল। পরবর্তীকালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখেছেন, '...এখন যে মেয়েরা গাড়ি করে বাহিরে যাচ্ছেন, পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা করছেন—তোমাদের কাছে এ সমস্ত খুবই সহজ ও স্বাভাবিক বলে মনে হতে পারে—কিন্তু বাস্তবিক ধরতে গেলে এ সমস্ত বড় সহজে হয়নি এই নিয়ে অনেক নিন্দাবাদ সহ্য করতে হয়েছে—আপনাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ও মনান্তর হবার উপক্রম হয়েছে—অনেক মনঃকষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। ক্রমে ক্রমে একটু একটু করে—এক পা এক পা অগ্রসর হয়ে এতদূর এসে পড়া গেছে।'

সত্যেন্দ্রনাথ বিলেত থেকে ফিরলেন। তাঁর কর্মস্থল ঠিক হল মহারাষ্ট্র। এখন, সে যুগের নিয়ম ছিল ছেলেরা চাকরি করতে বাইরে যেত, ছেলের বউ থাকত শ্বশুরবাড়িতে। সত্যেন্দ্র স্ত্রীকে কর্মস্থলে নিয়ে যাবার জন্যে অনুমতি চাইলেন। তিনি থাকবেন প্রবাসে, আর চার দেয়ালের অন্ধকূপে বন্দিনী হয়ে থাকবেন জ্ঞানদানন্দিনী? তাও কি হয়? অনেক দুঃখ পেয়েছেন তিনি। প্রগতিবাদী স্বামীর জন্যে তাঁকেই সহ্য করতে হয়েছে সমস্ত পারিবারিক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতিকে। জ্ঞানদানন্দিনীকে লেখা সত্যেন্দ্রর দু-একটা চিঠি থেকে আভাস পাওয়া যায় যে, তাঁর মায়ের সঙ্গে জ্ঞানদানন্দিনীর সম্পর্ক মাঝে মাঝে তিক্ত হয়ে উঠত। মহর্ষি-পত্নী তাঁর মেজো বউমাটির সঙ্গে কথাও বন্ধ করে দিতেন। সত্যেন্দ্রনাথের মেয়ে ইন্দিরার আত্মকথায় দেখা যাবে সত্যেন্দ্র বিলেত গিয়েছেন বলে তাঁর মা মেজো বউয়ের গয়না নিয়ে তাঁর নিজের দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। এই গয়না নেওয়ার প্রকৃত কারণ যাই হোক না কেন, অর্থাভাব নয়, কারণ মহর্ষি একথা শুনে খুব রাগ করেন ও জ্ঞানদানন্দিনীকে একটি হিরের কণ্ঠি পাঠিয়ে দেন। অবশ্য জ্ঞানদানন্দিনীর গয়নার ওপর কোনও ঝোঁক ছিল না, তিনি শুধু ভালবাসতেন গলার গয়না পরতে। এবার সত্যেন্দ্রর প্রার্থনা মঞ্জুর হল। মহর্ষি বাধা দিলেন না।

আপত্তি অবশ্য উঠেছিল। বাড়ির বউ বাইরে যাবে কি? কোনও বাড়ির বউ কি গিয়েছে? তা কি কখনও হতে পারে? বাড়ির পুরুষেরাও যে যখন তখন অন্দরমহলে যেতে পারে না। বিয়ের আগে পর্যন্ত বাইরেই থাকে, বিয়ের পর যখন একখানা আলাদা শোয়ার ঘর হয় তখন রাতে শুতে আসে। নাহলে বহির্মহলের ছোঁয়া-লাগানো অন্তঃপুরের শুচিতা নষ্ট হবে যে। এই সাবেক চালের নড়চড় হত না কোনও বাড়িতে। ধিক্কারের ঘূর্ণিঝড় উঠল। মা আগেকার মতো আরেকবার ধমক লাগালেন ছেলেকে, 'তুই মেয়েদের নিয়ে মেমেদের মতো গড়ের মাঠে বেড়াতে যাবি নাকি?' সত্যেন্দ্রর মনে হয় কীই বা এমন ক্ষতি হয় তাতে? 'এই পর্দাপ্রথা আমাদের নিজস্ব নয়, মুসলমানী রীতির অনুকরণ।' তাছাড়া ঠাকুরবাড়িতে 'কয়েদখানার মতো নবাবী বন্দোবস্তের' দরকারই বা কী?

তাঁর এসব ভাল লাগে না। লাগে না বলেই তো কয়েক বছর আগে সেই হাস্যকর হালকা অথচ দুঃসাহসিক কাজটি করতে পেরেছিলেন। এখন ভাবলেও হাসি পায়। বিয়ের কিছুদিন পরের কথা। সত্যেন্দ্রর তখন অল্প বয়স—ঘোর 'র‍্যাডিক্যাল'। সব কাজের সঙ্গী তাঁদের বন্ধু মনোমোহন ঘোষ। হঠাৎ একদিন তাঁর ইচ্ছে হল বন্ধুর স্ত্রীকে দেখবার। এমন কী অপরাধ?

সত্যেন্দ্র রাজি। কিন্তু দেখাবেন কী করে? জ্ঞানদানন্দিনীর বাইরে যাবার জো নেই, অন্য পুরুষও অন্দরে আসতে পারবে না। এমনকী পুরুষ ভৃত্যও না।

তা হলে? দিনরাত অনেক শলা-পরামর্শ ফন্দি-ফিকির খাটিয়ে শেষে একটা ব্যবস্থা হল। সে যেমনি দুঃসাহসিক তেমনি রোমাঞ্চকর। জ্ঞানদানন্দিনীর মুখেই শোনা যাক:

'ওঁরা দুজনে পরামর্শ করে একদিন বেশি রাতে সমান তালে পা ফেলে বাড়ির ভেতরে এলেন। তারপরে উনি মনোমোহনকে মশারির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজে শুয়ে পড়লেন। আমরা দুজনেই মশারির মধ্যে জড়োসড়ো হয়ে বসে রইলুম; আমি ঘোমটা দিয়ে একপাশে আর তিনি ভোম্বলদাসের মতো আরেক পাশে। লজ্জায় কারও মুখে কথা নেই। আবার কিছুক্ষণ পরে তেমনি সমান তালে পা ফেলে উনি তাকে বাইরে পার করে দিয়ে এলেন।'

খুব সহজ ছিল না ব্যাপারটা। দেউড়ি দালান পার হয়ে সবার চোখ এড়িয়ে বন্ধুকে আনতে হয়েছিল অন্দরমহলে। পদে পদে ধরা পড়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও সত্যেন্দ্র যে এতদূর এগিয়েছিলেন সে শুধু তিনি প্রগতিবাদী ছিলেন বলে।

এবার তো মহর্ষি স্বয়ং অনুমতি দিয়েছেন। মন খুশিতে টইটুম্বুর। প্রাণে খুশির তুফান উঠল। সত্যেন্দ্র স্ত্রীকে বোম্বাই নিয়ে যাবেন, 'স্ত্রী-স্বাধীনতার দ্বার খোলবার এক মহা সুযোগ উপস্থিত।' গোছগাছ শুরু হয়ে গেল। কিন্তু জ্ঞানদানন্দিনী কি পোশাক পরে বাইরে বেরোবেন? ঘরের কোণে বন্দি মেয়েদের সাজপোশাক নিয়ে এতদিন কেউ মাথা ঘামায়নি, শুধু একখানি শাড়ি পরলেই চলে যেত। নিজের পুরনো কথা বলার সময় জ্ঞানদানন্দিনী জানিয়েছেন, শীতকালে তাঁরা এই শাড়ির ওপর জড়াতেন একটি করে চাদর। 'পুরাতনী' থেকে আমরা এরকম আরও অনেক খুঁটিনাটি খবর পেয়েছি। সত্যেন্দ্রনাথ চিঠিতে লিখেছিলেন, 'তোমার যদি কাপড় পরিবর্তন করিতে হয় তাহাতে অসম্মত হইও না। সত্য সত্য বলিতে কি, আমাদের স্ত্রীলোকেরা যেরূপ কাপড় পরে, তাহা না পরিলেও হয়। তাহা পরিয়া কোনও ভদ্রসমাজে যাওয়া যাইতে পারে না।' কিন্তু মনে প্রশ্ন থেকে যায়, এতদিন পর্যন্ত বাঙালি মেয়েরা অন্য কোনও পরিচ্ছদ ব্যবহার করতেন না কেন? সত্যিই কি তাঁরা শাড়ি ছাড়া আর কিছুই পরতেন না? বাংলাদেশে বেশ অনেকদিন ধরেই মুসলমান শাসন শুরু হয়েছিল। নবাব-বাদশাহের দু-একটা ছবিতে মেয়েদের তো রুচিশোভন পোশাক পরতেও দেখা গেছে। সেই পোশাকটি কি বাঙালি মেয়েরা গ্রহণ করতে পারতেন না? সাধারণত দেখা গিয়েছে বাঙালি পুরুষদের চলায়-বলায় পোশাকে-আশাকে রুচিতে-বিলাসে সর্বত্রই মুসলমানি ছাপ পড়েছে। তা হলে মেয়েরা কেন বাদ পড়লেন? পেশোয়াজের ব্যবহার তো ছিল। মহর্ষিও ছোট ছোট মেয়েদের পোশাকের কথা ভেবেছিলেন। যাই হোক, জ্ঞানদানন্দিনীর জন্যে তখনকার মতো ফরাসি দোকানে ফরমাশ দিয়ে বানানো হল কিম্ভূতকিমাকার 'ওরিয়েন্টাল ড্রেস'। পরাও খুব কষ্টকর। জ্ঞানদানন্দিনী তো নিজে নিজে পরতেই পারলেন না। সত্যেন্দ্র সাহায্য করলেন। ওই পরেই কোনওরকমে তৈরি হলেন। প্রথমবারের এই পরিচ্ছদ-সমস্যা জ্ঞানদানন্দিনীকে এত বিব্রত করেছিল বলেই তিনি মেয়েদের সাজপোশাক নিয়ে ভাবতে শুরু করেন। আধুনিকা বাঙালি মেয়েদের রুচিশোভন শাড়ি তাঁর সেই চিন্তার ফসল। সে আরও পরের কথা।

সত্যেন্দ্র প্রস্তাব করলেন, 'বাড়ি থেকেই গাড়িতে ওঠা যাক।' এবারও সবাই ছি ছি করে উঠতে দেবেন্দ্রনাথও রাজি হলেন না। সেকালে মেয়েদের গাড়ি চড়া ভারী নিন্দনীয় ব্যাপার ছিল। তিনি বললেন, 'মেয়েদের পালকি করে যাবার নিয়ম আছে তাই রক্ষা করা হোক।'

পরে তৈরী কোর্টটি পেরিয়ে একটা অন্দরে বেরতেন
অন্তঃপুরিকা কুলবধূ ঠাকুরবাড়ীর সামনে দিয়ে জ্ঞানদানন্দিনীকে বোম্বাইয়ের জাহাজে চাপিয়ে দিল।
মহর্ষির মত মেলেনি। সাহেব মহলেও জ্ঞানদানন্দিনী পদার্পণ করেননি।
এই শেষ। এরপরে তিনি আর কোনোদিন পদার্পণ করেননি।

বোম্বাইয়ে পুরো দু'বছর কাটিয়ে অসুস্থ অবস্থায় সেখান থেকে জ্ঞানদানন্দিনী আবার এক দিন কলকাতায় ফিরিয়ে দিলেন, প্রকৃতপক্ষে সেই দিনটিতেই শুরু হল বাঙালি মেয়েদের অন্দরমহল থেকে বাইরে এক উন্মুক্ততার হাওয়া। তবে বাংলাদেশে তখনও সব বাধা দূর হয়নি। এর বহুদিন পরে যে জ্ঞানদানন্দিনীকে একাই সব পথ অনায়াসে পেরিয়ে যেতে হত সে পথেও দুর্গম ছিল। ঠাকুরবাড়ির অন্য মেয়েরা এবং আত্মীয়-স্বজন বাইরের হাওয়া না বয়, তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন ঠাকুরবাড়ির অন্য মেয়েরা, এবং কয়েকজন প্রতিবেশী মহিলা। অবশ্য যেদিন তিনি বোম্বাই থেকে ফিরলেন সেদিন তাঁর পাশে কেউ ছিল না। স্বর্ণকুমারী সেই মুহূর্তটির একটি ছবি তাঁদের জীবন থেকে তুলেছেন, 'ঘরের বউকে মেমের মতো গাড়ি হইতে নামিতে দেখিয়া সেদিন বাড়িতে যে শোকাভিনয় ঘটিয়াছিল তাহা বর্ণনার অতীত।' বাড়ির পুরনো চাকরদের চোখ দিয়ে জল পড়ে তো পড়েই। জ্ঞানদানন্দিনী এই পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবে বলে গেছেন, 'আমার মনে এসেছিল অজ্ঞতা। জোড়াসাঁকোর এই পরিবর্তন সুন্দরভাবে হবে যেমন—বাড়ির দরজা খুলতে আমি পরে প্রথম দরজা খোলা গাড়ি করে বেড়াতে আরম্ভ করলে—বাড়ির দরজা খুলতে আমি কিছুতেই দিতেন না—ক্রমে একটু একটু খুলে দিতে আরম্ভ করলেম—বিবিজান—আবরণ—ক্রমে খোলা গাড়ি। তখন বাড়িতে কোন পুরুষ আমাদের মেয়েদের দেখলে আমার যেন মাথা কাটা যেত, প্রথমে দরজা বন্ধ ঢাকা গাড়ি, পরে দরজা খোলা ঢাকা গাড়ি—পরে টপ খোলা ফিটন গাড়ি—ক্রমে একেবারে খোলা ফিটন গাড়ি হয়ে গেল।' প্রথম দিকে জ্ঞানদানন্দিনীর নিজের মনেও কি দ্বিধা কম ছিল? নিজেই বলেছেন, 'উনি যেদিন বাড়িতে প্রথম dinner party দিলেন, আমার মনে আছে আমি লুকিয়ে ছিলুম যে খাবার টেবিলে কিছুতেই বসব না, ছবির টেবিলটি সব সাজিয়ে দিয়েছিলুম। সেই একজন সাহেব আমার হাত তার হাতের ভিতর দিয়ে টেবিল পর্যন্ত নিয়ে গেল, অমনি আমি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলুম।' আর একবার 'স্যার বার্টল ফ্রিয়ারের Sir Bartle Frere-এর সঙ্গে প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ানের স্ত্রীর আলাপ করিয়ে দেওয়া হল, তিনি অনেক কথা বলতে চাইলেন কিন্তু আমার তখন যা ইংরেজি বিদ্যার দৌড়, তাঁর এক কথাও বুঝতে পারলুম না।' হার মানলেন না জ্ঞানদানন্দিনী। তিনি নিজেকে বদলালেন তাই নিজের পুরনো সংস্কৃতিতে ফিরেও যেন একেবারে হার মানলেন। সমসাময়িক তরুণ স্বর্ণকুমারী লেখেন 'বাড়ির অন্যান্য মেয়েরা বধূঠাকুরাণীর সঙ্গে একত্রে খাওয়া-দাওয়া করিতে বা মিশিতে ভয় পাইতেন।' সত্যেন্দ্রনাথের একাধিক চিঠিতে পাওয়া যায়, '...বাড়িতে তোমার একলা হয় কি কেহ সাথী থাকে?...'বাবামহাশয় তোমার জন্য কলিকাতার বাড়িতে আসছেন না কে বলিল? তোমার প্রতি তাঁহার কোনরূপ বিরক্ত হইবার কোনও কারণ নাই।...'তুমি দুই বেলাই বাড়ির ভিতরের রান্না খাও তাহা কি ভাল লাগে?'

বোঝা যায়, অন্তঃপুর জ্ঞানদানন্দিনী জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এসেও সকলকে তাঁর সুখ দুঃখের সঙ্গী হিসেবে পাননি। এইরকম পরিস্থিতিতে জ্ঞানদানন্দিনীর আচার-আচরণ দুঃসাহসিক বইকী।

তিনি সত্যেন্দ্রনাথের কর্মস্থল থেকে ফিরেছিলেন লাটভবনে, নিমন্ত্রণ রক্ষাতে। সেখানে তাঁকে দেখে সবাই প্রথমে ভেবেছিলেন 'ভূপালের বেগম', কারণ 'তিনিই তখন একমাত্র বেরোতেন।' ভোজসভায় ছিলেন পাথুরিয়াঘাটার প্রসন্নকুমার ঠাকুর।

তিনি তো ঘরের বউকে প্রকাশ্য রাজসভায় আসতে দেখে রাগে-লজ্জায় দৌড়ে পালিয়ে গেলেন। আগে কোনও 'হিন্দু রমণী' গভর্নমেন্ট হাউসে যাননি। একাই বা যাবার দরকার কী ছিল? সেকথা সমাজনশীল বুঝবেন কী করে? বুঝেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। তাই পুলকিত হয়ে

লিখেছেন, 'এ কী মহাব্যাপার। শত শত ইংরেজ মহিলার মাঝখানে আমার স্ত্রী সেখানে একমাত্র বঙ্গললনা।' তবেই হইচই হোক না কেন কোনোদিন বন্ধ হয়নি। একটি দুটি করে আরও অনেক ঘুরতে শুরু করল।

জ্ঞানদানন্দিনী যে শুধু মেয়েদের পথের কাঁটা ঘুচিয়েছিলেন তা নয়, পুরুষের মনের অন্ধকারটাও দূর করেছিলেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। সত্যেন্দ্রনাথের এই দেবরটি তাঁর অত্যন্ত স্নেহের পাত্র। কিন্তু প্রথমে জ্যোতিরিন্দ্র প্রগতিপন্থী ছিলেন না, বরং একটু রক্ষণশীল ছিলেন বড় দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের মতো। কেশবচন্দ্র সেনকে ব্যঙ্গ করে প্রহসন লেখার মধ্যেই তাঁর মনোভাবটি ধরা পড়েছিল কিন্তু মেজবউঠান আর মেজো বউঠাকুরের সাহচর্য তাঁকে দিয়ে দিয়েছিল নতুন পথ।

জ্ঞানদানন্দিনী আমাদের ঠিক কী দিয়েছিলেন সেটা সবার কাছে যেন স্পষ্ট নয়। বাঙালি নারীর পরিস্ফুট হবার জন্যে তাঁকে অনেক এগোতে হয়েছে। তিনি একাকিনী দু-টি শিশু নিয়ে সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বিলেত গিয়েছিলেন। সেখানে একলা থেকে ছেলেমেয়েদের মুখ চেয়ে উঠত। কালাপানি পার হয়ে বিলেত যাওয়া, সে কি সহজ কথা! দু-একজন কৃতী পুরুষ, রামমোহন আর দ্বারকানাথ গেছেন বিলেতে, কিন্তু ফিরলেন কই? সত্যেন্দ্রকে পাঠাবার সময়েই সবাই ভেবে অস্থির হয়েছিল, আর এ তো বাড়ির বউ। মহামান্য ইংরেজি বিলেত পুঁথি দিয়ে সে কালাপানি পাড়ি দিলে কোন সাহসে? প্রসন্নকুমারের পুত্র প্রথম বাঙালি ব্যারিস্টার জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর জাহাজঘাটে এসে তো হতবাক। অস্ফুটে শুধু বললেন, 'সত্যেন এ কী করলেন? নিজে এলেন না।'

এক এক সময় মনে হয় জ্ঞানদানন্দিনী বিলেত গিয়েছিলেন কেন? শুধু সত্যেন্দ্রর সেই অনিবার্য যৌবনস্বপ্ন সফল করবার জন্যে, না সব দিয়ে ভারতীয় নারীর আদর্শ হয়ে ওঠার জন্যে? বেশ অবাক লাগে যখন শুনি তিনি বিলেত গিয়েছিলেন শুধু স্ত্রী স্বাধীনতার সঙ্গে পরিচিত হতে। দেশে ফিরে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পেরেছিলেন। খুলে দিয়েছিলেন সন্তানদের নতুন উদার বাতায়ন। অবশ্য একথার অর্থ এই নয় যে, আর কেউ সে সময় বিদেশযাত্রা করেননি বা মেয়েদের বিদেশিনীদের দিয়ে আসেননি। ব্রাহ্মসমাজের অন্য পরিবারের এক-ও-অন্য মেয়েরাও গিয়েছেন বিদেশে। সেই কার্পেন্টারের অনুরোধে রাজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায় গিয়েছিলেন। আরও দু-চারজনকে খুঁজে পাওয়া যাবে না তা নয়, তবে তাঁরা বাঙালি-সংস্কৃতির সঙ্গে ঠিক যেন মিশে যাননি। পুরোপুরি 'সাহেব' হয়ে-যাওয়া পরিবারগুলোর সঙ্গে দেশের মানুষের যোগ কম ছিল। রাজকুমারীই প্রথম ভারতীয় কুলীন ব্রাহ্মণ মহিলা, যিনি বেড়াতে বিলেত যান। অকালমৃত্যু না হলে তিনি হয়তো নারীশিক্ষামূলক বিবিধ কাজে জড়িত থাকতেন। বরং কিছুটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী।

সর্বপ্রথম ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন ব্রাহ্মসমাজের মেয়েরা। কিছুদিন হলেই ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে মেয়েরা যোগ দেবার অনুমতি পেয়েছেন। তাঁরা বসতেন চিকের আড়ালে আসনে। হঠাৎ ১৮৭২ সাল নাগাদ কয়েকজন আচার্যকে জানালেন তাঁরা তাঁদের বাড়ির মেয়েদের নিয়ে পর্দার বাইরে বসতে চান। যেমন কথা তেমন কাজ। অন্নদাচরণ খাস্তগির ও দুর্গামোহন দাস তাঁদের স্ত্রী ও মেয়েদের নিয়ে এসে বসলেন সাধারণ উপাসকদের মধ্যে, পুরুষদের সঙ্গে। এতে অন্যান্য ব্রাহ্মদের আপত্তি ছিল না। কেশব সেন বাধ্য হয়ে পরে সব মেয়েদের উপাসনা-মন্দিরে বসবার অনুমতি দিলেন। এইভাবে প্রকাশ্যে পর্দার বিলোপটাও দেখা গেল। জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় ১৮৭৬ সালে প্রিন্স অব ওয়েলসের সঙ্গে নিজের পরিবারের মহিলাদের সাক্ষাতের অনুমতি দিলেন। সে নিয়েও কত কাণ্ড হল।

বাইরে বেরোবার জন্যে জ্ঞানদানন্দিনী বাঙালি মেয়েদের দিলেন একটি রুচিশোভন সাজ। অবশ্য বেশি হাতে শাড়ি পরা যে খারাপ তা নয়, তবে তাতে সৌষ্ঠব ছিল না। বোম্বাইয়ে গিয়ে তিনি প্রথমেই জবরজং ওরিয়েন্টাল ড্রেস বর্জন করে পারসি মেয়েদের শাড়ি পরার রীতি হিসেবে

ধরনটি গ্রহণ করেন। নিজের পছন্দমতো একটু অদল-বদল করে জ্ঞানদানন্দিনী এই পদ্ধতিটাকেই বজায় রাখলেন। স্বর্ণকুমারীর ছোট মেয়ে সরলা দেখেছিলেন ছোটবেলায় তাঁর মা এবং মেজোমামি দেশে ফিরলেন নতুন ধাঁচের শাড়ি পরে, বাড়িসুদ্ধ সব মেয়েই সেটি গ্রহণ করতে ব্রাহ্মিকারাও তার প্রতি আকৃষ্ট হলেন।

বোম্বাই থেকে আনা বলে ঠাকুরবাড়িতে এই শাড়ি পরবার ঢঙের নাম ছিল 'বোম্বাই দস্তুর' কিন্তু বাংলাদেশে তার নাম হল 'ঠাকুরবাড়ির শাড়ি'। জ্ঞানদানন্দিনী বোম্বাই থেকে ফিরে এ ধরনের শাড়ি-পরা শেখানোর জন্যে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। অনেক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মিকা এসেছিলেন শাড়ি-পরা শিখতে, সবার আগে এসেছিলেন বিহারী গুপ্তের স্ত্রী সৌদামিনী। অবশ্য তখনও তাঁর বিয়ে হয়নি। শাড়ির সঙ্গে জ্ঞানদানন্দিনী শায়া-সেমিজ-ব্লাউজ-জ্যাকেট পরাও প্রচলন করেন। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, অন্যান্য ব্রাহ্মিকারাও বাইরে বেরোবার সাজের কথা ভাবছিলেন। মনোমোহন ঘোষের স্ত্রী সরাসরি গাউন পরতেন। ঠাকুরবাড়ির মেয়ে ইন্দুমতী পরতেন গাউন। কিন্তু সব বাঙালিনী গাউন পরতে রাজি নন বলে দুর্গামোহন দাসের স্ত্রী ব্রহ্মময়ী পরতেন একটা জগাখিচুড়ি-মার্কা পোশাক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যেমন স্বদেশি পোশাক তৈরি করবার জন্যে পাজামাতে কোঁচা আর সোলার টুপির সঙ্গে পাগড়ির মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন, তেমনি ব্রাহ্মিকারা 'মেমসাহেবদিগের গাউনের উপরিভাগে আঁচল জুড়িয়া এক প্রকার আধা বিলাতি আধা দেশি পরিচ্ছদ' সৃষ্টি করেন। বোম্বাই দস্তুর নতুনত্বের গুণে সবাইকে আকৃষ্ট করল। তবে এতে মাথায় আঁচল দেওয়া যেত না বলে প্রগতিশীলারা একটি ছোট টুপি পরতেন। তার সামনেটা মুকুটের মতো, পেছনে একটু চাদরের মতো কাপড় ঝুলত। জ্ঞানদানন্দিনীর টুপি পরা ছবি আমি দেখিনি তবে মাথায় শাড়ির আঁচলে ছোট্ট ঘোমটা টানা প্রবর্তন করেন তাঁর মেয়ে ইন্দিরা, তখন সাবেক ধরনে শাড়ি পরার গৌরব আবার ফিরে এসেছে।

এখনকার আধুনিকারা যেভাবে শাড়ি পরেন সেই ঢংটি জ্ঞানদানন্দিনীর দান নয়। 'বোম্বাই দস্তুর'-এ যেসব অসুবিধে ছিল সেগুলো দূর করবার চেষ্টা করেন কুচবিহারের মহারানি কেশব-কন্যা সুনীতি দেবী। তিনি শাড়ির ঝোলানো অংশটি কুঁচিয়ে ব্রোচ আটকাবার ব্যবস্থা করেন। তার সঙ্গে তিনি মাথায় পরতেন স্প্যানিশ ম্যানটিলাজাতীয় একটি ছোট্ট ত্রিকোণ চাদর। তাঁর বোন ময়ূরভঞ্জের মহারানি সুচারু দেবী দিল্লির দরবারে প্রায় আধুনিক শাড়ি পরার ঢংটি নিয়ে আসেন। এটিই নাকি তাঁর শ্বশুরবাড়ির শাড়ি পরার সাবেক ঢং। বাস্তবিকই উত্তর ভারতের মেয়েরা, হিন্দুস্থানি মেয়েরা এখনও যেভাবে সামনে আঁচল এনে সুন্দর করে শাড়ি পরে, তাতে ওই ধরনটিকেই বেশি প্রাচীন মনে হয়। বাঙালি মেয়েরা অধিক স্বাচ্ছন্দ্যগুণে এটিকেই গ্রহণ করলেন, তবে জ্ঞানদানন্দিনীর আঁচল বদলাবার কথাটি তাঁরা ভোলেননি, তাই এখন আঁচল বাঁ দিকেই রইল। কিছুদিন মেমেদের হবল্ স্কার্টের অনুকরণে হবল্ করে শাড়ি পরাও শুরু হয়; তবে অত আঁটসাঁট ভাব সকলের ভাল লাগেনি। শাড়ির সঙ্গে সঙ্গে উঠল নানান ফ্যাশনের লেস দেওয়া জ্যাকেট ও ব্লাউজ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'বিলিতি দরজির দোকান থেকে যত সব ছাঁটাকাটা নানা রঙের রেশমের ফালি'র সঙ্গে 'নেটের টুকরো আর খেলো লেস মিলিয়ে মেয়েদের জামা বানানো হত।'

এই বিচিত্রবেশিনীরা সাধারণ হিন্দুসমাজের চোখে ছিলেন যোগেন বসুর 'মডেল ভগিনী'র মতো বিচিত্র জীব। জ্ঞানদানন্দিনী নিজে এ বিষয়ে কিছু বলেননি, তবে তাঁর দুই ননদ সৌদামিনী আর স্বর্ণকুমারীর রচনা থেকে জানা যায় তাঁদের পথ মোটেই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। তাঁরা যখন সেমিজ, জামা, জুতো, মোজা পরে গাড়ি চড়ে বেড়াতে বেরোতেন তখন চারদিকে ধিক্কারের ঘূর্ণিঝড় উঠত। শুধু ধিক্কার নয়, শাড়ির সঙ্গে জ্যাকেট পরে বাইরে বেরোলে তাঁদের 'বিলক্ষণ হাস্যাভাজন' হতেও হত।

হিন্দুদের সেলাই-করা জামা পরে কোনও শুভ কাজ করতে নেই। সেজন্য পোশাক-পরিচ্ছদ

নিয়ে আরও কিছুদিন গণ্ডগোল চলেছিল। তবে যুগ বদলেছে, তাই মুসলমানি পোশাককে তাঁরা অন্তঃপুরে ঢুকতে না দিলেও ব্রাহ্মিকাদের পোশাককে বাধা দিতে পারলেন না। নতুন ধরনের শাড়ি পরার ঢং-এর নামই হয়ে গিয়েছিল ব্রাহ্মিকা শাড়ি। শুধু বিয়ের সময় সনাতন নিয়মই চলত। গগনেন্দ্রনাথ ১৯০১ সালে যখন তাঁর ন'বছরের মেয়ে সুনন্দিনীকে সম্প্রদান করতে যাচ্ছেন তখনও বরপক্ষের একজন আপত্তি জানিয়ে বলেন, 'সেলাই-করা কাপড় পরে তো মেয়ে সম্প্রদান হয় না।' গগনেন্দ্র জানতেন সে কথা। ঠাকুরবাড়ির ছেলে হলেও তাঁর বাড়িতে সনাতন হিন্দু নিয়মই চলে আসছে। তাই তিনি স্বভাবসিদ্ধ উদারভঙ্গিতে হেসে বলেছিলেন, 'দেখুন মেয়ের গায়ে কোন জামা নেই।' সত্যিই তো! সমবেত বরযাত্রীরা দেখলেন মেয়ের গায়ে জামা নেই বটে তবে শাড়িটা এমন কায়দায় পরানো হয়েছে যে, জামা নেই বোঝাই যায়নি। শিল্পী গগনেন্দ্র নিজস্ব পরিকল্পনা দিয়ে মেয়েকে সাজিয়েছিলেন। কনে সাজাবার এই ঢংটি সবার খুব পছন্দ হয়েছিল।

বেশবাসে আধুনিকতা আনা ছাড়াও জ্ঞানদানন্দিনী আরও দুটি জিনিসের প্রবর্তক—সান্ধ্যভ্রমণ আর জন্মদিন-পালন। এ দুটিই তিনি বিলেত থেকে নিয়ে এসেছিলেন। ঠাকুরবাড়িতে জন্মতিথি পালনের কথা শোনা যায় সুমিতেন্দ্রনাথের লেখা থেকে। যদিও পরবর্তীকালের ঘটনা তবু সেটি পালিত হত তিথি মেনে, তারিখ ধরে নয়। পুরোহিতের হাত থেকে শালগ্রামের চরণামৃত নিয়ে, বাড়ির কুয়োয় জিয়োনো কোনও জীয়ন্ত মাছ স্পর্শ করে, দুপুরে পায়েস খেয়ে তাঁরা জন্মদিন পালন করতেন। মহর্ষি পরিবার ব্রাহ্ম হওয়ায় এসব রীতি পালিত হত না। ধরে নেওয়া যেতে পারে বিদেশি প্রথাটির প্রবর্তক জ্ঞানদানন্দিনী। তাঁর ছেলে ও মেয়ের জন্মদিনে বাড়ির সমস্ত ছোটরা নিমন্ত্রিত হত। আমোদ-প্রমোদে জ্ঞানদানন্দিনী কর্মচারীদেরও বঞ্চিত করতেন না। সুরেন্দ্রের জন্ম বর্ষাকালে, তাই সে সময় বাড়ির সব ভৃত্যের জন্যে আসত ছাতা; আর ইন্দিরার জন্ম শীতকালে, তাই পরিচারকেরা পেত একখানি করে কম্বল। জ্ঞানদানন্দিনীর উৎসাহেই সরলা-হিরণ্ময়ীরা প্রথম রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালন করেন সত্যেন্দ্রের ৪৯ নং পার্ক স্ট্রিটের বাড়িতে। সেই উৎসবের দিন জানা গেল জ্যোতিরিন্দ্রের জন্মদিনও কাছাকাছি কোনও এক তারিখে। পরের বছর থেকে জ্ঞানদানন্দিনীর উৎসাহে তাঁরও জন্মদিন পালনের ব্যবস্থা হয়। তবে এই অনুষ্ঠানে জন্মতিথির সংখ্যা অনুসারে মোমবাতি জ্বালানো শুরু করেন হিরণ্ময়ী।

জ্ঞানদানন্দিনীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আরও একটু পরিচয় আছে। সত্যেন্দ্র বোম্বাই থেকে কলকাতায় ফিরে আসার পরে জ্ঞানদানন্দিনী একান্নবর্তী ঠাকুরবাড়িতে যৌথ পরিবারের একজন হয়ে থাকতে চাননি। তিনিই প্রথম জোড়াসাঁকোর বাড়ি ছেড়ে অন্য বাড়িতে উঠে যান স্বামী-পুত্র-কন্যাকে নিয়ে। বাঙালি জীবনে এর আগে এই স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়নি। তখন মেয়ের বিয়ে হলে জামাইকেও ঘরজামাই করে রাখা হত এবং তাদের জন্যে আলাদা মহলের ব্যবস্থা হত। আমাদের আধুনিক জীবনের পারিবারিক ছকটি জ্ঞানদানন্দিনীই নিজের হাতে গড়ে দিলেন। এটি ভাল না মন্দ সে বিতর্কে না গিয়েও বলতে পারি পারিবারিক গণ্ডির ছোট সীমাকেই আমরা ভালবাসতে শুরু করেছি। তবে জোড়াসাঁকো থেকে চলে এলেও ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে জ্ঞানদানন্দিনীর যোগ কিছুমাত্র শিথিল হয়নি। পারিবারিক যে কোনও কাজে তাঁর অপরিসীম উৎসাহ ছিল। যখন যার যা প্রয়োজন নিঃসংকোচে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন মেজো বউয়ের কাছে। কিশোর রবীন্দ্রনাথ বিলেতে গিয়ে উঠলেন কার কাছে? না, মেজো বউঠানের কাছে। সুশীলা যখন মৃত্যুশয্যায়, জ্ঞানদানন্দিনীই তখন তাঁর পাশে। আবার পাঁচটি নতুন অতিথিকে পৃথিবীর আলো দেখাবার সময়ও মৃণালিনী পাশে পেয়েছিলেন জ্ঞানদানন্দিনীকে। জোড়াসাঁকো প্রফুল্লময়ী বুকভরা কান্নার বোঝা নামিয়ে হালকা হতেন মেজদির কাছে। প্রফুল্লময়ীর স্বামী তখন ধীরে ধীরে উন্মাদ রোগের শিকার হচ্ছেন। নানা দুশ্চিন্তায় 'আমি একটি ঘরে বসিয়া একলা একলা কাঁদিতে থাকিতাম। সে সময় আমার মেজ জা জ্ঞানদানন্দিনী তেতলার ঘরে থাকিতেন।

তিনি আমার এই দুঃখ সহিতে না পারিয়া আমাকে তাঁর কাছে ডাকিয়া মায়ের মতন নানা রকম সান্ত্বনা দ্বারা আমার মনে শান্তি দিবার চেষ্টা করিতেন। ... তিনি যদি তখন উপস্থিত না থাকিতেন তবে কি যে করিতাম বলিতে পারি না।' বলেছেন প্রফুল্লময়ী। রেণুকা অসুস্থ, মাতৃহীন দুটি শিশুকে রবীন্দ্রনাথ কোথায় রেখে যাবেন? কেন, জ্ঞানদানন্দিনী তো রয়েছেন। অবনীন্দ্রকে ছবি আঁকার উৎসাহ দিলেন কে? কে আবার, জ্ঞানদানন্দিনী। প্রতিমার জন্যে আর্টের টিচার খুঁজে দেবেন কে? জ্ঞানদানন্দিনী ছাড়া আর কে আছে? সব দায়িত্ব সব ভার তাঁকে দিয়ে সবাই নিশ্চিন্ত।

শুধু বড়দের নয়, ছোটদের কথাও অত বড় বাড়িতে জ্ঞানদানন্দিনী ছাড়া আর কেই-বা ভেবেছেন? তাদের মধ্যে সুপ্ত প্রতিভার সন্ধান করে তাদের জাগাবার চেষ্টাও তিনি কম করেননি। বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে করে তিনি একটা পত্রিকা বার করলেন 'বালক' নামে। সুধীন্দ্র, বলেন্দ্র, সরলা, প্রতিভা, ইন্দিরা অনেকেরই সাহিত্যচর্চার প্রথম হাতেখড়ি হয় 'বালকে'। স্বয়ং সম্পাদিকা অর্থাৎ জ্ঞানদানন্দিনী নিজে অবশ্য লিখেছিলেন একটিমাত্র রচনা। তিনি 'কনটেম্পোরারি রিভিউ' থেকে জেরাগোরিও মোস্তিয়েভিস-এর সাইবেরিয়া থেকে পলায়নের রোমাঞ্চকর কাহিনীটি অনুবাদ করেন 'আশ্চর্য পলায়ন' নামে।

শুধু পত্রিকা প্রকাশ নয়, ছেলেদের ছবি আঁকায় উৎসাহ দিতে জ্ঞানদানন্দিনী বসিয়েছিলেন একটা লিথো প্রেস। বেশিরভাগ খরচ দিতেন তিনি নিজে। ছোটদের জন্যে তাঁর আরও একটি দান আছে। নাতি সুধীরের জন্যে দুখানি রূপকথার নাট্যরূপ দিয়েছিলেন তিনি। 'সাত ভাই চম্পা' ও 'টাক ডুমাডুম'। রূপকথাকে নাট্যরূপ দেওয়া শক্ত, বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে। কিন্তু শিশুমনে এর আবেদন অপরিসীম। জ্ঞানদানন্দিনী এত সুন্দর করে শিয়ালের নাক কাটার গল্প বলেছেন যে বহুশ্রুত গল্পটিকেও বারবার শুনতে ইচ্ছে করে, আর মনে হয়, আহা, সব রূপকথাগুলো কেন তাঁর হাতের ছোঁয়ায় নতুন হয়ে উঠল না। শিয়াল যখন বলে—'ওগো না গো না—তোমার কিছু ভয় নেই—আর যদিই বা একটু আধটু কেটে যায়, তাতে আমার চেহারা খারাপ হবে না। আমার ত আর মানুষের মতো নাড়া নাক নয়, কাটার দাগ রোঁয়ার ভিতরে দিব্যি ঢাকা থাকবে।' তখন শিশুমন কল্পনার সিঁড়ি বেয়ে উধাও হয়ে যায় রূপকথার রহস্যজগতে। তাই 'নাকুর বদলে নরুণ পেলুম তাকডুমা ডুমডুম' তাদের কাছে হয়ে ওঠে আদি কবিতা।

ছোটদের কথা এমন করে খুব কম মায়েরাই ভেবেছেন। জ্ঞানদানন্দিনীর অন্যান্য প্রবন্ধেও দেখা যাবে শিশু-চিন্তার প্রাবল্য। তাঁর লেখা তিনটে প্রবন্ধ 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে একটির নাম 'কিণ্ডার গার্ডেন'। দ্বিতীয়টির নাম 'স্ত্রীশিক্ষা'। অর্থাৎ প্রথমটি শিশুশিক্ষা ও দ্বিতীয়টিতে নারীশিক্ষার কথা বলা হয়েছে। তবে 'স্ত্রীশিক্ষা'রও মূল উদ্দেশ্য জ্ঞানদানন্দিনীর মতে আদর্শ জননী হওয়া। তৎকালীন চিন্তাও এই খাতেই বইছিল। শিশুকেন্দ্রিক রচনা ছাড়াও তাঁর লেখা আরও দুটি রচনা আমরা পাই। একটি মারাঠি রচনার বঙ্গানুবাদ 'ভাউ সাহেবের বখর'—তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের পটভূমিতে লেখা কাহিনী। আর-একটি হল 'ইংরাজনিন্দা ও স্বদেশানুরাগ' নামক প্রবন্ধ।

জ্ঞানদানন্দিনী ভারতের প্রথম আই. সি. এস অফিসারের স্ত্রী, উচ্চবিত্ত ইঙ্গবঙ্গ সমাজের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা, নিজেও বিলেত ঘুরে এসেছেন। সুতরাং বিলিতি হাব-ভাব রুচি-চিন্তার সঙ্গে তাঁর মিল হওয়াই স্বাভাবিক। একটি নারীর পূর্ণ আত্মবিকাশের জন্যে যতখানি পশ্চিমি রীতি গ্রহণ করা উচিত, তিনি ঠিক ততটুকুই নিয়েছিলেন। তাই গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে কিংবা জামা-জুতো পরে গাড়ি চড়ে বেড়াতে তাঁর যেমন আপত্তি ছিল না, তেমনি বাধা ছিল না স্বদেশের মঙ্গল চিন্তায়। তিনি ভুয়ো ইংরেজনিন্দা করে সারাজীবন ইংরেজের অনুগ্রহ ভিক্ষা করে কাটিয়ে দেওয়াকে তাঁর ভাষায় ভর্ৎসনা করে স্বদেশবাসীকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে বলেছেন। তিনি জানতেন, 'আমাদের জাতীয় যথার্থ স্থায়ী উন্নতি আমরা ভিন্ন কাহারও দ্বারা সাধিত হইতে পারে না।'

সারদা দেবী

সর্বসুন্দরী দেবী

নীপময়ী দেবী

প্রফুল্লময়ী দেবী

রমা দেবী

চিত্রা ঠাকুর

প্রকৃতি চট্টোপাধ্যায়

মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায়

গীতা ও দীপ্তি চট্টোপাধ্যায়

কাদম্বরী দেবী

মৃণালিনী দেবী

শরৎকুমারী দেবী ও তাঁর দুই কন্যা স্বয়ংপ্রভা ও চিরপ্রভা

সৌদামিনী ঠাকুর

সৌদামিনী গঙ্গোপাধ্যায়

স্বর্ণকুমারী দেবী

সরোজাসুন্দরী দেবী

ফেলিসিতা চৌধুরী

মেধা দেবী

অমিয়া ঠাকুর

মেনকা ঠাকুর

গার্গী দেবী

বাণী চট্টোপাধ্যায়

আরতি ঠাকুর

পারুল ঠাকুর

ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

জ্ঞানদানন্দিনীকে আমরা সব কাজেই এগিয়ে আসতে দেখেছি। এমনকী অভিনয় করার বেলায়ও তাঁর ডাক পড়ত। সব কাজেই অনায়াস পটুত্ব। দেওরদের মাথায় পাগড়ি বেঁধে দেওয়ার জন্যে যেমন তাঁর ডাক পড়ত, তেমনি সবাই তাঁকে খুঁজত নাটকের মহলা দেবার সময়। ঠাকুরবাড়িতে নাটক-পাগল লোকের অভাব ছিল না। সেখানে কথায় কথায় 'থিয়েটার দেখার' বা নাটকাভিনয়ের কথা শোনা যায়। জোড়াসাঁকো থিয়েটার উঠে গেল, জোড়াসাঁকোর উঠোনের ঘরোয়া অভিনয় বন্ধ হল, তবু নাট্যামোদী মানুষের মন চাপা রইল না। যখন 'রাজা ও রানী' লেখা হল তখন জ্ঞানদানন্দিনীর বাড়িতেই বসল নাটকের মহলা। ভূমিকাও প্রায় ঠিকঠাক :

রাজা বিক্রম—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রাণী সুমিত্রা—জ্ঞানদানন্দিনী দেবী
দেবদত্ত—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
নারায়ণী—মৃণালিনী দেবী
কুমার—প্রমথ চৌধুরী
ইলা—প্রিয়ম্বদা দেবী

অন্যান্য ভূমিকায় ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য ছেলেরা। অভিনয় দারুণ জমেছিল। সবাই ভাল অভিনয় করেছিলেন। লোকে কাকে ছেড়ে কাকে দেখে? সেই ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে লুকিয়ে অভিনয় দেখে গেল পাবলিক স্টেজের কয়েকজন অভিনেতা অভিনেত্রী। তারপর? এ এক দারুণ ব্যাপারের প্রত্যক্ষদর্শী অবনীন্দ্রনাথ। তিনি জানিয়েছেন, পাবলিক স্টেজে 'রাজা ও রাণী' অভিনয় দেখার নিমন্ত্রণ পেয়ে তাঁরা গিয়েছিলেন সেখানে। গিয়ে একেবারে তাজ্জব বনে গেলেন 'রাণী সুমিত্রা স্টেজে এল, একেবারে মেজো জ্যাঠাইমা। গলার সুর, অভিনয়, সাজসজ্জা, ধরনধারণ হুবহু মেজো জ্যাঠাইমাকে নকল করেছে।' এমারেল্ড থিয়েটারের এই অভিনয় খুব জনপ্রিয় হয়েছিল আর রানি সুমিত্রা সেজে জ্ঞানদানন্দিনীকে নকল করেছিল যে অভিনেত্রী তার নাম 'গুলফম হরি'। রাজার ভূমিকায় মতিলাল সুর, কুমারের ভূমিকায় মহেন্দ্রনাথ বসু ও ইলার ভূমিকায় কুসুমকুমারীর অভিনয়ও ভাল হয়েছিল।

এই অভিনয়কে কেন্দ্র করে অবশ্য আরও একটা ঘটনা ঘটেছিল। ঝড় তুলেছিল 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা। 'ঠাকুর বাড়ির নতুন ঠাট' নাম দিয়ে একটা প্রবন্ধ ছাপা হল, তাতে ওই নাটকের পাত্র-পাত্রীদের তালিকা এবং ব্যক্তিগত জীবনে তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা স্পষ্ট করে লিখে কোন কোন নিষিদ্ধ সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী সাজা হয়েছে সেটা দেখিয়ে দেওয়া হয়। আগেই বলেছি, রাজা ও রানির ভূমিকায় অভিনয় করেন রবীন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনী অর্থাৎ দেবর-বউদিদি আর দেবদত্ত ও নারায়ণী সাজেন সত্যেন্দ্রনাথ ও মৃণালিনী অর্থাৎ ভাশুর-ভ্রাতৃবধূ, কুমার ও ইলার ভূমিকায় ছিলেন প্রমথনাথ ও প্রিয়ম্বদা অর্থাৎ মামা ও ভাগিনেয়ী। কিন্তু এসব ছোটখাটো ব্যাপারের দিকে তাকাতে হলে জ্ঞানদানন্দিনীকে অনেক আগেই থেমে যেতে হত।

নিজে লেখা ছাড়াও অপরকে উৎসাহ দিয়ে লেখানোর দিকে জ্ঞানদানন্দিনীর ঝোঁক ছিল বরাবর। ছোটদের কথা তো আগেই বলেছি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সংস্কৃত নাট্যানুবাদের মূলেও ছিলেন তাঁর এই মেজো বউঠান। তার আগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একটিও সংস্কৃত নাটক পড়েননি। জ্ঞানদানন্দিনীর অনুরোধে তাঁকে 'শকুন্তলা' পড়ে শোনাতে গিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়ে সংস্কৃত নাটক অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথকেও ছোটদের জন্যে লিখতে উৎসাহ দিয়েছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী। তাঁর 'বালকের'র জন্যই কবি ছোটদের লেখায় হাত দিতে বাধ্য হন। কথায় কথা বাড়ে: আমরা আর একটি কথা বলে জ্ঞানদানন্দিনীর প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে যাব। তিনি তো অনেক কাজেই উৎসাহী ছিলেন। একবার বোম্বাই থেকে ফিরে করলেন কি, একরকম জোর করেই একজন ফোটোগ্রাফার ডাকিয়ে শাশুড়ি, জা, ননদ ও বাড়ির অন্যান্য মেয়ে বউদের

ফোটো তোলালেন। সেদিন তাঁর আগ্রহ আর উৎসাহ না থাকলে অনেকেই হয়তো ক্ষণকালের আভাস থেকে চিরকালের অন্ধকারে হারিয়ে যেতেন। ধারণা গড়ে নেবার মতো একটা সামান্য ছবিও আমাদের চোখের সামনে এসে পৌঁছত না। কে বলতে পারে, হয়তো রবীন্দ্রনাথের 'ছবি' কবিতাটা লেখাই হত না কোনওদিন। একাকিনী জ্ঞানদানন্দিনী এভাবেই অনেকটা এগিয়ে দিয়েছিলেন বাঙালি মেয়েদের।

জ্ঞানদানন্দিনীর সঙ্গে সব কাজেই জড়িয়ে মিশিয়ে আছেন স্বর্ণকুমারী, ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। মেয়েরা কেউ কেউ সবে যখন কিছু করবার কথা ভাবছেন তখন স্বর্ণকুমারী এসেছেন একেবারে ঝোড়ো হাওয়ার মতো। লেখাপড়ার পাঠ ভালভাবে শেষ হতে না হতেই তিনি তরতর করে লিখে ফেললেন একেবারে আস্ত একখানা উপন্যাস। সবাই অবাক। তা উনিশ শতকটা তো অবাক হবারই যুগ। কাঁচা ভিতের ওপর পাকা ইমারত গড়তে দেখলে কে না বিস্মিত হয়? এই তো সেদিন, মাঝে দশটা বছর গিয়েছে কি যায়নি, প্রথম সার্থক বাংলা উপন্যাসখানি লিখে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ঔপন্যাসিক জীবন শুরু করেছেন। এখনও সবার মনে 'দুর্গেশনন্দিনী'র অমলিন স্মৃতি। চারপাশে শুধু নাটক-প্রসহন আর নকশার ভিড়। কখন উপন্যাস লেখায় হাত দিলেন এই অষ্টাদশী তরুণীটি? এ তো শুধু প্রথম লেখা নয়। এ যেন আবির্ভাব! আবির্ভাবই বটে। ১৮৭৬ সালে ডিসেম্বর মাস, শীতার্ত সন্ধ্যা উজ্জ্বল হয়ে উঠল এক অনামিকার শুভ আবির্ভাবে। বইয়ের নাম 'দীপনির্বাণ'। সকলেই উলটে-পালটে দেখে। সকলের মনেই নানারকম প্রশ্ন। লেখকের নামহীন বইটি নিয়ে জল্পনা চলছে। কার লেখা বই? কার লেখা হতে পারে? এরই মধ্যে কানাঘুষো শোনা গেল বইখানি একটি মেয়ের লেখা।

মৌচাকে যেন ঢিল পড়ল এবার।

একজন মেয়ের লেখা? পড়ে বিশ্বাস হয় না। ভাষায় এমন বাঁধুনি, লেখায় এমন মুনশিয়ানার ছাপ! মেয়েলি জড়তা-সংকোচ-কুণ্ঠা কোথাও কিচ্ছু নেই। এ কি কোনও মেয়ের লেখা হতে পারে? 'সাধারণী' কাগজ সমালোচনা করল :

'... শুনিয়াছি এখানি কোন সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলার লেখা। আহ্লাদের কথা। স্ত্রীলোকের এরূপ পড়াশোনা, এরূপ রচনা, সহৃদয়তা, এরূপ লেখার ভঙ্গি বঙ্গদেশ বলিয়া নয় অপর সভ্যতর দেশেও অল্প দেখিতে পাওয়া যায়!' প্রশংসা ঠিকই। কিন্তু তারই মধ্যে লুকিয়ে রইল সন্দেহের কাঁটা। খচখচ করে বেঁধে 'মহিলার লেখা'।

সত্যিই কি মহিলার লেখা?

কে সেই মহিলা? কী তাঁর পরিচয়?

মহিলার নামে পুরুষের লেখাও তো হতে পারে।

স্বর্ণকুমারীর মেজদাদা সত্যেন্দ্র তখন বিদেশে; তিনি ভাবলেন এ নিশ্চয় তাঁর ভাই জ্যোতিরিন্দ্রের লেখা। অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি পাঠালেন, 'জ্যোতির জ্যোতি কি প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে?' সত্যিই পারে না। স্বর্ণকুমারীর বর্ণালী দীপ্তিও অজানা খনির নতুন মণির আলোর মতো ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে। সন্দেহের আর অবকাশ রইল না।

স্বর্ণকুমারীকে নিয়ে এত আলোড়ন উঠেছিল কেন? তিনিই কি প্রথম বাঙালি লেখিকা না প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক? ইতিহাস বলবে, এর কোনওটাই ঠিক নয়। ঠাকুরবাড়ির মতো শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকেই প্রথম লেখিকার আবির্ভাব হওয়া অসঙ্গত নয়, অসম্ভবও ছিল না। কিন্তু 'দীপনির্বাণ' প্রকাশের আগেই মার্থা সৌদামিনী সিংহের 'নারীচরিত' কিংবা নবীনকালী দেবীর 'কামিনী কলঙ্ক' লেখা হয়েছে, প্রকাশিত হয়েছে হেমাঙ্গিনী দেবীর 'মনোরমা' কিংবা সুরঙ্গিনী দেবীর 'তারাচরিত'। প্রথম বাংলা কাব্য-লেখিকার নাম কৃষ্ণকামিনী দাসী। তাঁর

'চিত্তবিলাসিনী' ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত হয়। 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'-কে বাদ দিলে এটিই বাঙালি মেয়ের লেখা প্রথম গ্রন্থ। এরপর প্রবন্ধ-জাতীয় রচনা প্রথম লেখেন পাবনার বামাসুন্দরী দেবী ১৮৬১ সালে। তাঁর পুস্তিকাখানির নাম ছিল 'কি কি কুসংস্কার তিরোহিত হইলে এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে'। প্রথম মহিলা নাট্যকার কামিনীসুন্দরী দেবী 'উর্বশী' নাটক লেখেন ১৮৫৬ সালে। অনেকের মতে প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিকের নাম শিবসুন্দরী দেবী। তাঁর 'তারাবতী' প্রকাশিত হয় ১৮৬৩ সালে (মতান্তরে ১৮৭৩ সালে), শিবসুন্দরী ছিলেন পাথুরিয়াঘাটার হরকুমার ঠাকুরের স্ত্রী। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র শৌরীন্দ্রমোহন 'তারাবতী'র ইংরাজি অনুবাদ করে (১৮৮১) নিজের গানের বইয়ের সঙ্গে বিভিন্ন দেশে উপহার পাঠিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে বলে নেওয়া ভাল, পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়ির মহিলারাও কিছু কিছু সাহিত্যচর্চা করতেন। সংখ্যায় কম হলেও আমরা ওই বাড়ির ছ-সাতজন মেয়ে ও বউকে কবিতা কিংবা নাটক লিখতে দেখেছি। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ছোট মেয়ে মনোরমা লিখেছিলেন কবিতায় 'পিতৃদেবচরিত'। এছাড়া 'বিরজামোহিনী' ও 'অনিরুদ্ধ মিলন' নাটক এবং 'গৌরগীতিকা' ও 'মানকুঞ্জ' কাব্যগ্রন্থ। ঘরে বসেই তিনি কাকার কাছে শিখেছিলেন 'সুরকানন' বাজাতে। শৌরীন্দ্রমোহনের দুই মেয়ে শ্রীজয়ন্তী ও জয়জয়ন্তীও কিছু কিছু লিখেছেন, প্রকাশিতও হয়েছিল। জয়জয়ন্তী লিখেছিলেন জয়ন্তী দেবী নামে। তাঁর দুখানি গ্রন্থের নাম 'মহামিলন' ও 'জীবনমুক্তি'। কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের স্ত্রী সৌদামিনী লেখেন 'ভক্তিরসতরঙ্গিনী'। প্রথম মহিলা আত্মজীবনীকার রাসসুন্দরী দেবী (১৮৭৬)। বামা রচনাবলীর প্রথম ভাগেও (১৮৭২) বেশ কয়েকজন লেখিকার সন্ধান পাওয়া যায়। তবে সেগুলির অধিকাংশই প্রবন্ধ। সমাজ, সংস্কার, স্ত্রীশিক্ষা, নীতি প্রভৃতি গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে একসময় প্রবন্ধ লিখেছেন কামিনী দত্ত, স্বর্ণলতা ঘোষ, মধুমতী গঙ্গোপাধ্যায়, বিবি তাহেরণ লেছা, গোলাপমোহিনী দাসী, রমাসুন্দরী ঘোষ, ক্ষীরদা মিত্র, শ্রীমতী সৌদামিনী ও আরও অনেকে। এঁরা কেউই জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। শিবসুন্দরী প্রমুখ কয়েকজন ছাড়া অন্যরা কোনও বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকেও আসেননি। তাঁদের বিদ্যানুরাগ ও সাহিত্যপ্রীতি আমাদের মুগ্ধ করে। ১৮৭৬ সালটিও নানাভাবে উল্লেখ করার মতো। এই বছরে দেরাদুনে চন্দ্রমুখী বসু প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার অনুমতি চেয়েছিলেন। রাসসুন্দরী লিখেছিলেন প্রথম আত্মজীবনী, কুমিল্লার ভূস্বামী নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী লিখলেন গদ্য-পদ্য মেশানো প্রণয়কাব্য 'রূপজালাল', ঠিক এ বছরেই প্রকাশিত হল স্বর্ণকুমারীর 'দীপনির্বাণ'। আত্মপ্রকাশের চেষ্টায় বিচ্ছিন্ন নারীরা এই একটি ক্ষেত্রে যেন সমবেত হয়েছেন। ঠাকুরবাড়ির মেয়ের সঙ্গে প্রবাসী খ্রিস্টান কুমারী, সুদূর পল্লীগ্রামের গৃহবধূ ও মুসলিম ভূস্বামীর চেষ্টা মিলেমিশে এক হয়ে গেল। যাক সেকথা, এই তথ্যের দিকটিকে বাদ দিলে স্বর্ণকুমারীর পূর্ববর্তিনীদের কাউকেই সাহিত্যিক হিসেবে গ্রহণ করা চলে না। পরম গৌরবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করলেও তখন মেয়েদের সাহিত্য ছিল শুধু হাস্যকর এবং অনুকম্পার বস্তু। অথচ বিশ্বসাহিত্যে প্রথম উপন্যাসের স্রষ্টা কোনও পুরুষ নন, একজন মহিলা। তাঁর নাম মোরাসাকিসিকিবু (৯৭৮-১০৩১)। এই জাপানি মহিলাই লিখেছিলেন 'গেঞ্জি মনোগাতারি' নামে প্রথম উপন্যাস। ধীরে ধীরে বাংলা সাহিত্যের আসরে স্বর্ণকুমারী এসে আদায় করে নিলেন প্রার্থিত সম্মান। হাসি আর করুণার বদলে দেখা দিল শ্রদ্ধামেশানো বিস্ময়! মেয়েদের চলার পথ, আত্মপ্রকাশের পথ আরও বুঝি একটু সুগম হল।

উপন্যাস ছাড়াও স্বর্ণকুমারী লিখেছিলেন গল্প, নাটক, প্রহসন, কবিতা, গাথা, গান, রম্যরচনা, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, গীতিনাট্য, স্মৃতিকথা, স্কুলপাঠ্য বই—একজন মহিলার পক্ষে যা প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে। আশ্চর্যের কথা এই যে, তিনি তাঁর পূর্ববর্তিনীদের দ্বারা বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হননি। তাঁর আদর্শ লেখক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, যদিও তাঁর ইতিহাস নিষ্ঠা রমেশচন্দ্র দত্তকেই মনে করিয়ে দেয়। বঙ্কিমের মতো লেখক আদর্শ হওয়ায় স্বর্ণকুমারীর রচনায় লাবণ্যের

কিছু অভাব ঘটেছে। অবশ্য তাতে খুব বেশি ক্ষতি হয়নি। আর যেখানেই হোক সাহিত্যে মেয়েলি ভঙ্গির আদর নেই। অথচ তিনি গল্প-উপন্যাস লিখতে শুরু করেন বেশ অল্প বয়সে। এই বয়সে উপন্যাস লেখার নজির অবশ্য আরও আছে। তরু দত্তের কথাই ধরা যাক না। মাত্র একুশ বছর বয়সে দুরারোগ্য ব্যাধিতে তরুর মৃত্যু হয় কিন্তু সেই স্বল্প ক'টি দিনের মধ্যেই তিনি লিখেছিলেন অনেকগুলো মনে রাখবার মতো কবিতা আর দুটি উপন্যাস, লিখেছিলেন ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায়। সে যুগে ইংরেজি ভাষায় অনেকেই লিখতেন। বিদেশিনী শিক্ষয়িত্রীদের শিক্ষার ফলে ইংরেজি শেখার পথও হয়েছিল সুগম। স্বর্ণকুমারীও তাঁর নিজের গল্প ও উপন্যাসের অনুবাদ করেছেন, তবে সে অনেক পরে।

মাঝে মাঝে স্বর্ণকুমারীকে অসাধারণ সৌভাগ্যবতী বলে মনে হয়। পথের কাঁটাও বুঝি তাঁর পায়ের তলায় ফুল হয়ে ফুটেছে। নতুন কিছু করার জন্যে জ্ঞানদানন্দিনীকে যত ঝড়ঝাপটা সইতে হয়েছিল, তাঁকে সে দুর্যোগ স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি পেলেন শুধুই শ্রদ্ধা, শুধুই সম্মান, শুধুই অভিনন্দন। একেই বলে ভাগ্য! সত্যিই কি কোনও বাধা ছিল না? না, স্বর্ণকুমারী কোনও বাধাকে বাধা মনে করেননি। আপাতভাবে সংসারে উদাসীন হওয়ার জন্যে স্বর্ণকুমারী সবসময় এক নিরাসক্ত দূরত্বের মধ্যে নিজেকে সরিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। সঙ্গে ছিল তাঁর সাধনা। শৈশবেই তিনি পেয়েছিলেন মহর্ষির আশীর্বাদ, কন্যার একটি লেখা পড়ে তিনি লিখেছিলেন, 'স্বর্ণ তোমার লেখনীতে পুষ্পবৃষ্টি হউক।' এর সঙ্গে মিশেছিল দাদাদের স্নেহ। বাকিটুকু ঘিরে রেখেছিল জানকীনাথ ঘোষালের ভালবাসা। স্ত্রীকে তিনি সমস্ত দুঃখ-বিপদের হাত থেকে সরিয়ে চেষ্টা করেছেন সাহিত্যক্ষেত্রে সার্থক করে তুলতে। স্বর্ণকুমারীর সাহিত্যিক খ্যাতি চিড় ধরায়নি তাঁদের দাম্পত্য জীবনে।

স্বর্ণকুমারী যখন নিজেকে লেখিকা হিসেবে তৈরি করে নিচ্ছেন তখন অন্যান্য মেয়েরা কী করছিলেন? অন্যান্য বাড়ির অন্দরমহলের খবর সংগ্রহ করা সহজ নয়। আগের ঠাকুরবাড়িটাই দেখা যাক। স্বর্ণকুমারীর দিদি-বউদিদিরা মগ্ন থাকতেন ঘরের কাজে। সকাল থেকে তাঁদের বসত তরকারি বানানোর আসর, সেইসঙ্গে মেয়েলি আড্ডা—এই আসরে যোগ দিতেন সৌদামিনী, শরৎকুমারী, বর্ণকুমারী, প্রফুল্লময়ী, সর্বসুন্দরী, কাদম্বরী, আরও অনেকে। মহর্ষি বাড়ি ফিরলে তদারক করতে আসতেন সারদাদেবী। এছাড়া বাড়ির অন্যান্য আশ্রিতা মহিলারাও যোগ দিতেন। হাতের কাজের সঙ্গে জমে উঠত গল্প। বাড়ির ছোট ছোট মেয়েরা গল্পের টানে হাজির হত সেখানে। সরলাও প্রায়ই যেতেন কিন্তু নিজের মাকে কোনওদিন সে আসরে যেতে দেখেননি।

শরৎকুমারী ভালবাসতেন রূপচর্চা করতে। সবচেয়ে বেশি সময় নিয়ে রূপটান মেখে চৌবাচ্চার জলে সাঁতার কেটে তিনি অনেকটা সময় কাটিয়ে দিতেন। তাঁর স্বামী যদুনাথ (যদুকমল) মুখোপাধ্যায় ছিলেন সুরসিক ব্যক্তি। শোনা যায়, অনেকেরই কৌতূহল ছিল ঠাকুরবাড়ির ছেলেমেয়েদের রূপ রং নিয়ে। একজন জিজ্ঞেস করেছিলেন যদুনাথকে। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'দুধে আর মদে'। কেউ কেউ মনে করতেন ঠাকুরবাড়ির ছেলেমেয়েদের এই দুটি পদার্থ দিয়ে স্নান করানো হয় জন্মাবার পরই। যদুনাথের রহস্যপ্রিয়তার এই ছোট্ট ছবিটি উপহার দিয়েছেন ইন্দিরা, তাঁর স্মৃতিকথায়। ঠাকুরবাড়িতে মেয়েরা রূপচর্চার সঙ্গে সঙ্গে রন্ধনচর্চাও করতেন, শরৎকুমারী ছিলেন রন্ধন-পটীয়সী। জ্ঞানদানন্দিনী বলেছেন, 'একবার জমিদারির আয় কমে গিয়েছিল। তখন আমার শ্বশুর বলে পাঠালেন বউদের রাঁধতে শেখাও।' প্রায় একই কথা লিখেছেন সৌদামিনী, 'আমাদের রন্ধনশিক্ষার জন্য তিনি নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন প্রতিদিন একটা করিয়া তরকারি রাঁধিতে হইত। রোজ একটা করিয়া টাকা পাইতাম, সেই টাকায় মাছ তরকারি কিনিয়া আমাদিগকে রাঁধিতে হইত।' সেজন্যেই এ বাড়ির মেয়েরা সবাই ভাল রাঁধতেন। অন্যান্য বাড়ির মেয়েরাও অন্যভাবে জীবন কাটাতেন তা নয়। বিনয়িনীর

অপ্রকাশিত আত্মকথা 'কাহিনী' পড়ে জানা যায় তাঁদের বাড়িতে অর্থাৎ অবন-গগন ঠাকুর পরিবারের মেয়েদের অনেক সময় কেটে যেত ঠাকুরঘরে। অন্যান্য বাড়িতেও অধিকাংশ মেয়ে এমনি ভাবেই সময় কাটাতেন। এছাড়া কেউ দিতেন পুতুলের বিয়ে, কেউ খেলতেন তাস-পাশা কিংবা দশ-পঁচিশ। সেকালে অধিকাংশ ধনী পরিবারে মেয়েদের কাজ করার চল ছিল না, কাজেই লেখাপড়া না থাকায় সময় কাটত পরচর্চায়। সেজন্যেই শিক্ষিত পরিবারে নারীশিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহ দেখা যাচ্ছিল। শিক্ষার মধ্যে ছিল সেলাই শেখা, বই পড়া, রান্না, সেবা, এমনকী শিশু প্রতিপালন পর্যন্ত। গৃহকর্মও ছিল শিক্ষার অন্তর্গত। কাজেই সেকালের অশিক্ষিতা মেয়েরা ঘরের কাজ সবই জানতেন বলে আমরা যে ধারণা গড়ে রেখেছি, তা সত্যি নয়। অনেকেরই কর্মহীন জীবন বৃথা অপব্যয় হত। স্বর্ণকুমারী এভাবে জীবন কাটাননি, নিজেকে অন্য সব দিক থেকে সরিয়ে এনে তিনি অনেক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন।

'দীপনির্বাণ' উপন্যাসের পরে প্রকাশিত হল 'বসন্ত-উৎসব', প্রায় একই সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করল 'ছিন্নমুকুল'। এবার যশের মুকুট তাঁর মাথায় পরিয়ে দিলেন পাঠকসমাজ। ইদানীংকালে হয়তো অনেকেই ভুলে গেছেন যে, বাংলায় অপেরাধর্মী গীতিনাটিকা লেখার ব্যাপারে স্বর্ণকুমারী পথিকৃতের গৌরব দাবি করতে পারেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি-প্রতিভা' এমনকী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'মানময়ী'রও আগে রচনা করেন 'বসন্ত-উৎসব'। লেখার সঙ্গে সঙ্গে অভিনয়। ঠাকুরবাড়িতে তখন সুবর্ণ যুগ চলছে। বাড়িতে রয়েছেন স্বর্ণকুমারীর নাট্যরসিক দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও তাঁর সাহিত্যপ্রেমিকা স্ত্রী কাদম্বরী। সত্যেন্দ্র-জ্ঞানদানন্দিনী মাঝে মাঝে আসতেন ঝোড়ো হাওয়ার মতো; 'জীর্ণ-পুরাতন'কে ভাসিয়ে দিয়ে। প্রচণ্ড উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে গেল 'হিন্দুমেলা'। এরপর ঠাকুরবাড়ির ছেলেমেয়েরা মেতে উঠলেন একটা নতুন পত্রিকা প্রকাশের জন্যে। পাঁচ বছর আগে বেরিয়েছে 'বঙ্গদর্শন'। ঘরে ঘরে বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শনে'র আদর। ওইরকম ভাল কাগজ বার করা যায় না কি? মহর্ষির বড় ছেড়ে দ্বিজেন্দ্র একটু প্রাচীনপন্থী, তাঁর ইচ্ছে 'তত্ত্ববোধিনী'কেই আরও জাঁকিয়ে তোলা। নব্যপন্থী জ্যোতিরিন্দ্রের সে ইচ্ছে নয়। পুরনো জিনিসকে নতুন করা যায় না। শেষে তাঁরই জয় হল। ভাই-বোনেরা মিলে খসড়া করেন, পরিকল্পনা হয়, রাত বাড়ে।

কী নাম দেওয়া হবে?

'সুপ্রভাত'?

'নাঃ, কেমন যেন শোনাচ্ছে'। সবচেয়ে বেশি ভোটে যে নামটি গৃহীত হল সেটি যেমন সুন্দর, তেমনি অর্থবহ।

কী নাম?

'ভারতী'।

প্রথমদিকে 'ভারতী' ছিল জ্যোতিরিন্দ্র-কাদম্বরীর মানসকন্যা, পরে স্বর্ণকুমারীই ছিলেন 'ভারতী'র প্রকৃত কর্ণধার। অবশ্য সে অনেক পরের কথা, ১৮৮৪ সালের কথা। তার বছর সাতেক আগে 'ভারতী'র প্রথম সম্পাদক হন দ্বিজেন্দ্রনাথ। প্রথম সংখ্যা থেকেই কিশোর রবীন্দ্রনাথ শুরু করেছিলেন 'মেঘনাদ বধ'-এর কঠোর সমালোচনা। আবার ফিরে আসা যাক পূর্ব প্রসঙ্গে।

ঠাকুরবাড়িতে নিম্নমানের নৃত্য-গীত হত না বটে, তবে রসের ভোজে কেউ কোনওদিন বাদ পড়তেন না, কারণ রসস্রষ্টা ছিলেন তাঁরা নিজেরাই। বাড়ির যে কোনও আনন্দ-উৎসবে নানারকম অনুষ্ঠান হত। এর উদ্যোক্তা ছিলেন স্বয়ং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। বছর দশেক আগেকার জোড়াসাঁকো থিয়েটারের উদ্যোক্তা ছিলেন গণেন্দ্র, গুণেন্দ্র, সারদাপ্রসাদ ও জ্যোতিরিন্দ্র। এখন সে থিয়েটারের পাট চুকে গিয়েছে কিন্তু বদলায়নি নাট্যামোদীর মন। তাই আবার নতুন করে নাটক জমিয়ে তুললেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। পুরনো থিয়েটারি মজলিশ বাড়িতে ঢুকতে পেল না

বটে, তবু নাটক জমে উঠল। জোড়াসাঁকো থিয়েটারের সেই কুশলী অভিনেতা জ্যোতিরিন্দ্র, যিনি নটীর ভূমিকায় অভিনয় করে সবার মন ভুলিয়ে ছিলেন, তিনিই আসর সাজালেন। পুরনো কুশীলবরা নেই, কেউ বা পরলোকে। এবার যোগ দিলেন বাড়ির মেয়েরাও; যদিও ঘরোয়া অনুষ্ঠান, দর্শকরাও আত্মীয়স্বজন। তবু এ ঘটনায় চমকে উঠল সবাই। অভিনয়কে বাড়ির উঠোনে টেনে আনা ও সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের মঞ্চে এসে দাঁড়ানো, দুটোই ছিল অসম্ভব ব্যাপার।

স্বর্ণকুমারীর 'বসন্ত-উৎসব'-এর অভিনয় হয়েছিল ঠাকুরবাড়ির ঘরোয়া আসরে। একদিন বারান্দার জমাট আড্ডায় বসে কথা উঠল, সেকালে 'বসন্ত-উৎসব' কেমন হত? আসর জমে উঠল তর্কে বিতর্কে। সব কাজের উদ্যোক্তা জ্যোতিরিন্দ্র প্রস্তাব করলেন, 'এসো না, আমরাও একদিন সেকেলে ধরনের বসন্ত-উৎসব করি।' কারওর উৎসাহ তো কম নয়। দেখতে দেখতে 'পিচকারী আবির কুঙ্কুম প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সব সরঞ্জাম' এসে গেল। রঙিন আলোয় ছাদের বাগানে খুব আবির খেলা হবে। আমোদ-প্রমোদ বাদ যায় কেন? স্বর্ণকুমারী লিখে ফেললেন 'বসন্ত-উৎসব'। গীতিনাটিকার সূচনা হল স্বর্ণকুমারীর হাতে। এই বিরাট 'আনন্দযজ্ঞে' অবশ্য রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন না। তিনি তখন সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পারে বিলেতে বসে কোন এক 'মরা সাহেবের বিধবা গিন্নিকে বেহাগ-সুরে' শোকগীত শোনাচ্ছেন।

'বসন্ত-উৎসব'-এর নায়িকা লীলা সাজলেন কাদম্বরী। আর যে সন্ন্যাসিনীর কৃপায় লীলা তার প্রেমিককে ফিরে পেল সেই সন্ন্যাসিনী সাজলেন স্বর্ণকুমারী নিজে। গেরুয়া সাজের সঙ্গে তাঁর উদাসিনী প্রকৃতিটি সুন্দর খাপ খেয়েছিল। নায়ক হয়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। তবে 'বসন্ত-উৎসব'-এর পরবর্তী অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথও প্রতিনায়ক হয়ে টিনের তলোয়ার ঘুরিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। এরপর কিছুদিন ধরে তিন ভাইবোনে গীতিনাট্য লেখা এবং অভিনয় নিয়ে মেতে রইলেন। পরে স্বর্ণকুমারী লেখেন 'বিবাহ-উৎসব'।

অবিরাম ঝরনার মতো বয়ে চলল স্বর্ণকুমারীর লেখার স্রোত। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে ঠাকুরবাড়ির আর কেউই বোধহয় এত বেশি লেখেননি। তাঁর সাহিত্য-আলোচনার ক্ষেত্র এটি নয়। বাংলা সাহিত্যে স্বর্ণকুমারী তাঁর যোগ্য আসন আজও পাননি। অথচ একদিকে বঙ্কিমচন্দ্র, অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ এই দুটি ভিন্ন কোটির লেখকের মধ্যবর্তী সেতু হিসেবে আমরা স্বর্ণকুমারীর নাম করতে পারি। ঐতিহাসিক গল্প ও উপন্যাস রচনায় টড কাহিনী অনুসরণ করেও তিনি যে মুনশিয়ানা দেখিয়েছেন, তার তুলনা হয় না।

স্বর্ণকুমারীর ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংখ্যা কম নয়। 'দীপনির্বাণ', 'মিবাররাজ', 'বিদ্রোহ', 'ফুলের মালা', 'হুগলীর ইমামবাড়া'—প্রত্যেকটিই জনপ্রিয় হয়েছিল। ইতিহাসের ফাঁক ভরিয়ে তোলার জন্যে তিনি মাঝে মাঝে যে কৌশল অবলম্বন করতেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। যেমন ধরা যাক, 'কুমার ভীমসিংহ' গল্পের কথা। রাজসিংহের প্রথমা পত্নী কমলকুমারী ও দুই রানির দুই পুত্র ভীমসিংহ ও জয়সিংহের কথা টড কাহিনীতে আছে। তবে রাজসিংহের দ্বিতীয় স্ত্রীর কোনও নাম নেই। কিন্তু স্বর্ণকুমারী যখন গল্প লিখছেন তখন বঙ্কিমের 'রাজসিংহ' উপন্যাস লেখা হয়েছে। কিষাণগড়ের চারুমতীকে বঙ্কিম রূপনগরের বীরাঙ্গনা চঞ্চলকুমারী করে তুললেন। এর পাঁচ বছর পরে গল্প লিখতে বসে স্বর্ণকুমারী অবলীলায় জয়সিংহ-জননীর নাম দিয়ে দিলেন চঞ্চলকুমারী। টডের ইতিহাস একটু ক্ষুণ্ণ হল বটে কিন্তু হোঁচট খেল না পাঠকের মন। কল্পনা-বাস্তবে মেশা ছায়া-ছায়া নামহারা একটা চরিত্র ব্যক্তিত্ব লাভ করল স্বর্ণকুমারীর হাতে।

ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখলেও সামাজিক গল্প-উপন্যাস লিখে স্বর্ণকুমারী নাম করেন বেশি। যদিও ঠাকুরবাড়ির, বিশেষত এ বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে সাধারণ বাঙালি সমাজের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল না বলে তাঁদের লেখায় বাস্তব জীবনের ছাপ বিশেষ পাওয়া যায় না, এমন একটা ধারণা বহুদিন থেকেই আমাদের মনে বাসা বেঁধে আছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন 'পৃথিবীর সঙ্গে যথার্থ পরিচয়ের অভাব তাদের পঙ্গু করে রেখেছে।' তিনি সম্ভবত সেজন্যেই স্বর্ণকুমারীর

রচনাগুলির অনুবাদ-প্রকাশে প্রবল আপত্তি জানিয়েছিলেন। পারিবারিক জীবনের ছোটবড় খুঁটিনাটি ব্যাপারের দিকে চোখ তুলে না তাকালেও স্বর্ণকুমারী বাস্তব জীবন সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না। সমাজ-সংসার সবকিছুর ঊর্ধ্বে যে মানুষের মন, তিনি তার নাগাল পেয়েছিলেন। তাই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ দুটি উপন্যাসই সামাজিক উপন্যাস।

প্রথমে ধরা যাক 'স্নেহলতা'র কথা। বিশ শতকের সমালোচকদের ভাষায়, 'বাঙালি সমাজে আধুনিকতার সমস্যা লইয়া এই প্রথম উপন্যাস লেখা হইল।' আগেই বলেছি, স্বর্ণকুমারী সব বিষয়েই অতি ভাগ্যবতী, নয়তো বিধবা-সমস্যা নিয়ে এর আগে থেকেই তো লেখালেখি চলছে, শুধু স্বর্ণকুমারীর ভাগ্যে অভিনন্দন জুটবে কেন? তবে এ বিষয় নিয়ে স্বর্ণকুমারীকে ভাবতে দেখে একটু অবাক লাগে, কারণ মহর্ষি স্বয়ং বিধবা বিবাহের বিরোধী ছিলেন। বিধবা স্নেহলতাও অবশ্য 'বিষবৃক্ষ'-এর কুন্দনন্দিনীর পন্থা অনুসরণ করেছে কিন্তু 'চোখের বালি'র বিনোদিনীই কি নতুন পথ দেখাতে পেরেছিল? স্বর্ণকুমারী বিধবা-সমস্যাকে দেখেছেন সমাজ-সংস্কারকের দৃষ্টিতে নয়, নারীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। নারীর প্রেম-ভালবাসা-সংশয়-লজ্জা-সংকোচ-ভয়-সংস্কার সবকিছুর মধ্যে দিয়েই তিনি মেয়েদের সমস্যাকে দেখতে চেয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে এই দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য বৈচিত্র্য এনেছিল।

উনিশ শতকে বিধবা-সমস্যা নিয়ে অনেকেই ভাবনা-চিন্তা শুরু করেছিলেন। শুধু ভাবনা-চিন্তা নয়, সক্রিয় হয়ে কাজে যোগ দিয়েছিলেন আরও অনেকে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৫৬ সালের ৭ই ডিসেম্বর প্রথম বিধবা-বিবাহ দেবার পর উৎসাহ-উদ্দীপনা অনেক বৃদ্ধি পায়। বালবিধবা কালীমতীকে বিবাহ করেন ঈশ্বরচন্দ্রের প্রিয়পাত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। এ ব্যাপারে অবশ্য ব্রাহ্মসমাজ অসাধারণ আগ্রহ দেখিয়েছে। আদি ব্রাহ্ম সমাজে বিধবা-বিবাহের প্রবর্তন হয় অনেক পরে, কিন্তু দুর্গামোহন দাস, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ উৎসাহী ব্রাহ্ম যুবকেরা অনেক অসাধারণ দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। আমরা সত্যেন্দ্রনাথের উদার দৃষ্টি ও স্ত্রী-স্বাধীনতাপ্রয়াসী মনটির কথা জানি। দুর্গামোহন দাসের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আরও উদাত্ত, আরও বলিষ্ঠ। সমস্ত প্রতিকূলতা জয় করে তিনি নিজের তরুণী বিমাতার সঙ্গে একজন বন্ধুর বিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী ব্রহ্মময়ীও ছিলেন অসাধারণ মহিলা। শিবনাথ শাস্ত্রীও কম যান না। তিনি প্রথম জীবনে পিতার আদেশে প্রথমা স্ত্রী প্রসন্নময়ী থাকা সত্ত্বেও বিবাহ করতে বাধ্য হয়েছিলেন বিরাজমোহিনীকে। পরে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে স্থির করেন তিনি বিরাজমোহিনীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ না করে আবার তাঁর নতুন করে বিয়ে দেবেন। অবশ্য বিরাজমোহিনীর প্রবল আপত্তিতে ব্যাপারটা বেশিদূর গড়াতে পায়নি। ঠাকুরবাড়িতে এই ধরনের মনোভাব কোনও সময়ই সমর্থন পায়নি। ১৮৭২ সালে কেশব সেন অসবর্ণ বিবাহকে যখন বৈধ ঘোষণা করে 'বিশেষ বিবাহনীতি' (তিন আইন) চালু করলেন, তখন ঈশ্বরচন্দ্র রাজনারায়ণ বসুর মেয়ে লীলাবতী মিত্রের কাছে কয়েকজন অসহায়া বিধবাকে পাঠান, যাতে তিনি তাদের পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা করতে পারেন। লীলাবতীও কম সাহসের পরিচয় দেননি। তিনি ১৮৮৪ থেকে ১৮৯০-এর মধ্যে আটটি বিধবা মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন।

স্বর্ণকুমারীও যে বিধবাদের কথা ভাবেননি তা নয়। তিনি নারীকল্যাণমূলক কাজ আরম্ভ করেছিলেন 'সখিসমিতি'র মধ্যে দিয়ে। নামটি দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। স্বর্ণকুমারী তাঁর বান্ধবীদের নিয়ে এই সমিতি পরিচালনা করতেন! এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিধবা ও কুমারী মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে অন্তঃপুরের শিক্ষয়িত্রী করে তোলা। তখনও মেয়েরা, বিশেষত বিবাহিতরা স্কুলে পড়তে আসত না, অথচ লেখাপড়া শেখার আগ্রহ বেড়ে গিয়েছে। তাই ঘরে ঘরে শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন—তাদের অভাবে শিক্ষক কিংবা বিদেশিনী মিশনারি মেমসাহেব নিয়োগ করা হত। স্বর্ণকুমারী দেখলেন বাঙালি মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে অনায়াসেই এই কাজটি পেতে পারে। অর্থোপার্জনে স্বনির্ভর হলে অনাথা বিধবাদের জীবনযাত্রা

যে সহজতর হবে, তাতে সন্দেহ ছিল না। 'সখিসমিতি' যে এ ব্যাপারে খুব সফল হয়েছিল তা নয়, তবে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে ও মেয়েদের আত্মনির্ভর হয়ে ওঠার জন্য 'সখিসমিতি'র মতো প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল। আজও সে প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি।

আবার দেখা যাক 'স্নেহলতা' প্রসঙ্গে। স্বর্ণকুমারী বিধবাদের লেখাপড়া শিখিয়ে তাদের আত্মনির্ভর করে তুলতে চাইলেও তাদের পুনর্বিবাহ দেবার চেষ্টা করেননি। এভাবে বিধবা-সমস্যার সমাধান সত্যিই হয় কিনা সে নিয়েও চিন্তা করেছিলেন। সেই চিন্তার ফসল 'স্নেহলতা'। তাই স্নেহের মৃত্যুর পরে জগৎবাবুর চিন্তার সূত্র ধরে আমরা যখন লেখিকার ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হই, তখন চমকে উঠি। জগৎবাবু এই উপন্যাসের একটি প্রধান চরিত্র। স্নেহের মৃত্যুর পর তাঁর মনে হয়েছিল, 'স্নেহকে লেখাপড়া না শিখাইলে সে বেশ সন্তুষ্ট চিত্তে আপনার অদৃষ্ট বহন করিতে পারিত, আপনার অসময়োচিত মৃত্যু আপনি ডাকিয়া আনিত না।' একথা লেখিকারও কথা। যুক্তি যদি হৃদয় থেকে মনকে নাড়া দেয় তা হলে উপেক্ষিত জীবনের বঞ্চনা ও ক্ষোভকে অদৃষ্ট বলে মেনে নেবার অপরিসীম শক্তির ভিত আগে দুর্বল হয়। নারী হয়ে স্বর্ণকুমারী এই সত্যকে অস্বীকার করতে পারেননি। তাই বিধবাদের আত্মনির্ভরতা এবং অর্থোপার্জনের পথ দেখিয়ে দিলেই যে সব হল না, সেটা তিনি জানতেন। 'হিরণ্ময়ী বিধবা শিল্পাশ্রমে'র জন্যে লেখা 'নিবেদিতা' নাটিকেও তিনি এই সমস্যার আরেকটি কুৎসিত রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। তবে কোথাও তিনি সমাধানের পথ দেখাতে পারেননি, কোনরকম সে চেষ্টাও করেননি। তিনি বিধবা মেয়েদের সমাজের মধ্যে সসম্মানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। সম্মানের পরিবর্তে শুধু অন্নের সংস্থান, অর্থোপার্জন, শিক্ষা, এমনকী পুনর্বিবাহও তাঁর মতে, কোনও নারীকে পূর্ণ করে তুলতে পারে না। স্বর্ণকুমারীর সমসাময়িক আরও কয়েকজন নারী সামাজিক উপন্যাস লিখে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এঁদের একজনের নাম কুসুমকুমারী দেবী ও অপরজন শরৎকুমারী চৌধুরাণী। কুসুমকুমারীর 'স্নেহলতা', 'প্রেমলতা' ও 'শান্তিলতা' ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসা লাভ করেছে। শরৎকুমারীকে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। অপরদিকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার সময় সুকুমার সেন স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেছেন, 'বাঙালী সমাজে আধুনিকতার সমস্যা লইয়া এই প্রথম উপন্যাস লেখা হইল।' এই উপন্যাসটি হল 'স্নেহলতা'।

স্বর্ণকুমারীর অপর জনপ্রিয় উপন্যাসটির নাম 'কাহাকে'। এখানে স্বর্ণকুমারী শুধু একটি মেয়ের ভালবাসার কথা শুনিয়েছেন। স্বর্ণকুমারীর লেখায় যাঁরা নারীসুলভ রমণীয়তা পাননি, 'কাহাকে' তাঁদের সন্তুষ্ট করেছে। অন্য কোনও সমস্যা এখানে নেই, আছে শুধু একটি আধুনিকার আত্মকথা। শিক্ষিতা আধুনিকা নায়িকা নিজেকে বিশ্লেষণ করে ভালবাসার স্বরূপ সন্ধান করেছে। নারীসুলভ স্বাভাবিক লজ্জা ও সংস্কারকে বর্জন করে স্বর্ণকুমারী যেভাবে নারীমনকে বিশ্লেষণ করেছেন, তার তুলনা এ যুগেও খুব বেশি মেলে না। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে হয়তো তাঁর পরিচয় কিছু কম ছিল কিন্তু মনোবিশ্লেষণ দিয়ে তিনি সেই অভাবকে পূর্ণ করে দিয়েছেন। অনেকেই 'কাহাকে' উপন্যাসে লেখিকার নিজস্ব পরিবেশ অর্থাৎ তৎকালীন শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের পরিবেশ খুঁজে পেয়েছেন। লেখিকার নিজের পরিবেশ বলেই 'কাহাকে' এত জীবন্ত, এ দাবিও অসঙ্গত নয়। স্বর্ণকুমারীর নিজের জীবনের সঙ্গে নায়িকার সাদৃশ্য না থাকলেও এ পরিবেশে তিনি যে খুব স্বচ্ছন্দ সেকথা অস্বীকার করে লাভ নেই। তিনি সমকালীন শিক্ষিত সমাজকে তাঁর উপন্যাসে তুলে আনতে পেরেছেন। দুটি প্রধান চরিত্রে রয়েছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের ছায়া। 'কাহাকে' শুধু বাঙালি পাঠকদের ভাল লেগেছিল তা নয়, বিদেশিদেরও মন ছুঁয়েছিল।

উনিশ শতকে ইংরেজিতে সাহিত্য লেখার একটি প্রবণতা ছিল। সে সময় অনেকেই ইংরেজি উপন্যাস লিখেছেন, কেউ কেউ নিজেদের বাংলা লেখা অনুবাদ করে নিয়েছেন। খুব স্বাভাবিক

সহজেই মনে নেওয়া যায় ইংরেজি আদপেই তখনকার ছেলেমেয়েদের কাছে শক্ত ভাষা ছিল না। যে কোনও ধনী পরিবারে ছোটবেলা থেকেই ছেলেমেয়েদের ইংরেজি পড়ানো হত। পড়ার বইও লেখা হত ইংরেজিতে। গভর্নেস বা শিক্ষয়িত্রী হতেন বিদেশিনী। কাজে কাজেই ইংরেজি ছিল শাসক ইংরেজের মতোই বাঙালির কাছের জিনিস। মহিলারাও ইংরেজি ভাষায় উপন্যাস লিখতেন। এ সময় কতজন বাঙালি লেখিকা ছিলেন, প্রশ্ন জাগতে পারে। ১৮৫৬ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে ১৯৪জন লেখিকার নাম পাওয়া যায়। তা ছাড়া বোধহয় আরও অন্য সম্প্রদায়ের লেখিকা ছিলেন যাঁরা নাম প্রকাশ করেননি।

যাইহোক, উপন্যাসের অনুবাদের ব্যাপারে স্বর্ণকুমারী বেশ উৎসাহী ছিলেন। তাঁর দুটি উপন্যাস, ছোটোছোটো গল্প ও একটি নাটক অনূদিত হয়। সবচেয়ে আগে মিসিস আলফার্ট অনুবাদ করেন 'ফুলের মালা'। 'অভার্ন রিভিউ'-এ 'দি ফ্যাটাল গারল্যান্ড' নামে ছাপা হয়। 'ফুলের মালা' উপন্যাস হিসেবে খুব সার্থক হয়নি। সম্ভবত সেজন্যেই রবীন্দ্রনাথের এই অনুবাদ সম্বন্ধে ভাল ধারণা ছিল না। ১৯১৩ সালে কবি যখন ইংল্যান্ডে, তখন স্বর্ণকুমারী তাঁর কাছে এই বইটি পাঠান, বিদেশের বাজারে একটু পরিচিত হবার জন্যে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিমত জানালেন :

'আমি জানি এ বই প্রকাশ করবার চেষ্টা এখানে সফল হবে না। তা ছাড়া তর্জমা খুব ভালো হয়েছে তা নয়—অর্থাৎ ইংরেজি রচনার উচ্চ আদর্শে পৌঁছয়নি।' [১৮.১.১৯১৩]

তাঁর একই মন্তব্য শোনা গেছে ইন্দিরাকে লেখা চিঠিতেও। কবি তাঁকে লিখেছেন :

'ন'দিদি আমাকে তাঁর 'ফুলের মালা'র তর্জমাটি পাঠিয়েছিলেন। এখানকার সাহিত্যের বাজার যদি দেখতেন তা হলে বুঝতে পারতেন এসব জিনিস এখানে কোন কোনমতেই চলতে পারে না। এরা যাকে reality বলে সে জিনিসটি থাকা চাই।' [৬.৫.১৯১৩]

কবির পক্ষে এ নিয়ে কথা বলা মুশকিল হয়েছিল এইজন্যে যে, তাঁর কবিতা যে সময় বিদেশে যথাযোগ্য সম্মান পেয়েছে। কিন্তু তাঁর সঙ্গে তো আর কারও তুলনা চলতে পারে না। অথচ একথা বলতে গেলে ভুল বোঝার শঙ্কা বেশি। তিনি নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর অনেক বাঙালি লেখকের ধারণা হয়েছিল যে, তাঁদের গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ হলে তাঁরাও উপযুক্ত সম্মান পেতে পারেন। এই ধরনের লেখকদের কথা বলবার সময় রবীন্দ্রনাথ স্বর্ণকুমারী সম্বন্ধেও বাক্যগোপন করেননি। তিনি রোটেনস্টাইনকে লিখেছিলেন :

'She is one of those unfortunate being who has more ambition than abilities. But just enough talent to keep her mediocrity alive for a short period. Her weakness has been advantage of by some unscrupulous literary agents in London and she has had stories translated and published. I have given her no encouragement but I have not been successful in making her see things in their proper light. It is likely that she may go to England and use my name and you may meet her but be mercyful [sic] to her and never let her harbour in her mind any illusion about her worth and her chance. I am afraid she will be a source of trouble to my friends who I hope will be candid to her for my sake and will not allow her to mistake ordinary politeness for encouragement.'

কবি এ চিঠিটা কবে লিখেছিলেন জানা যায়নি। মনে হয়, এ সময় স্বর্ণকুমারীর আর একটি উপন্যাসের অনুবাদ 'অ্যান আনফিনিশড সঙ' লন্ডনে প্রকাশিত হয়েছে। এই উপন্যাসটি 'কাহাকে'র অনুবাদ, অনুবাদিকা স্বর্ণকুমারী স্বয়ং। কোনও কারণেই মনে না নিতে স্বর্ণকুমারী 'কাহাকে' অনুবাদ করেছিলেন। লন্ডন থেকেই বইটি প্রকাশিত হয় ১৯১৩ সালের ডিসেম্বরে। ১৮৭৬-এর ডিসেম্বর থেকে ১৯১৩-র ডিসেম্বর—দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে স্বর্ণকুমারী এলেন লন্ডনবাসী পাঠকের কাছে। তাঁরা জেনেছেন, শ্রীভাবেন শীতেই রজনীর তুষার-কুয়াশা ঢাকা লন্ডনবাসী পাঠকের কাছে।

একটি বিদেশি বই, শেষ করে মনে হল অসমাপ্ত গানের কলি যেন। ঝরে পড়ল মুগ্ধ পাঠকের প্রশংসাবাণী :

'Remarkable for the picture of Hindu life the story is overshadowed by the personality of the authoress, one of foremost Bengali writer to-day.' (Clarion)

আর একটু সোচ্চার প্রশংসা করলেন 'ওয়েস্টমিনিস্টার গেজেটে'র সম্পাদক :

'Mrs. Ghosal, as one of pioneers of the women movement in Bengal, and fortunate in her own upbring, is well qualified to give this picture of a Hindu maiden development.'

রবীন্দ্রনাথ যে কেন এত আশঙ্কা করেছিলেন কে জানে? তাঁর সমস্ত অনুমানকে অমূলক প্রমাণ করে ১৯১৪ সালে 'অ্যান আন্‌ফিনিস্ট সঙ'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ওই একই কোম্পানি থেকে। সুতরাং সাময়িকভাবে হলেও স্বর্ণকুমারী বিদেশিদের আকৃষ্ট করেছিলেন। 'কাহাকে'র আরও একটি অনুবাদ হয়েছিল। সেটি কলকাতা থেকে ১৯১০ সালে 'টু হুম' নামে প্রকাশ করা হয়। টু হুমে'র অনুবাদিকা স্বর্ণকুমারীর ভাইঝি শোভনা। দুটো অনুবাদের মধ্যে স্বর্ণকুমারীর লেখাটিই বেশি স্বচ্ছন্দ। অনুবাদের কাজে তাঁকে কিছুটা সাহায্য করেছিলেন তাঁর আরেক ভাইঝি ইন্দিরা। এছাড়াও 'দিব্যকমল' নাটকটি অনূদিত হয় জার্মান ভাষায় 'প্রিন্সেস কল্যাণী' নামে এবং বেশ কয়েকটি ছোটগল্প 'শর্ট স্টোরিজ' নামে ইংরেজিতে। স্বদেশে-বিদেশে সর্বত্রই স্বর্ণকুমারী লেখিকার সম্মান অর্জন করেছিলেন।

আমাদের দেশে লেখক হিসেবে খ্যাতি তাঁরাই পান, যাঁরা উপন্যাস লেখেন। স্বর্ণকুমারী সফল উপন্যাস রচয়িত্রী হলেও তিনি আরও অনেক কিছু লিখতেন। তাঁর লেখা ছোটগল্পও বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। যদিও বাংলা সার্থক ছোটগল্প প্রথম লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর আগে যাঁরা গল্প লিখেছেন তাঁরা জানতেনও না তাঁদের নতুন রচনাটিকে কী নামে ডাকা হবে। তাই স্বর্ণকুমারীর লেখা গল্প 'কুমার ভীমসিং'কে কখনও বলা হয়েছে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস', আবার কখনও 'ঐতিহাসিক নাটক'। বাংলা ছোটগল্পের যখন এই রকম অবস্থা তখন স্বর্ণকুমারী বাঙালি মেয়েদের নিয়ে বেশ কয়েকটা ছোটগল্প লিখেছিলেন। 'মালতী', 'লজ্জাবতী', 'গহনা'র হেম ও ভাবিনী, 'যমুনা' 'প্রতিদিনের শত তুচ্ছের আড়ালে আড়ালে' লুকিয়ে থাকে, হারিয়ে যায়। স্বর্ণকুমারী আঁকলেন তাদেরই লজ্জানত-দ্বিধাজড়িত মুখের ছবি। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে মেয়েরা অবহেলিত। ছেলেকে বিলেতে পাঠিয়ে মা-বাবা তার হাতখরচ জোগানোর চিন্তায় পীড়িত মেয়ের জন্যে ডাক্তার ডাকতে চায় না। ঠেলে দেয় মৃত্যুর দিকে। সেই অসহায় মেয়েরা উঠে এসেছে স্বর্ণকুমারীর গল্পে। এসব ছবি তিনি সংগ্রহ করেছিলেন সমাজসেবা করতে করতে।

'সখিসমিতি'র কথা আগেই বলেছি। স্বর্ণকুমারী অন্যান্য লেখিকাদের সবসময়েই উৎসাহ জোগাতেন। সেযুগে লেখিকারা প্রায়ই ছিলেন একে অপরের সখি বা 'সই'। পুরুষের ক্ষেত্রে নিশ্চয় প্রতিযোগিতা ছিল কিন্তু শিক্ষিত মেয়েরা ছিলেন মেয়েলি ঈর্ষার উর্ধ্বে। একজন লেখিকাকে কোনও সময়েই অপর লেখিকার কঠোর সমালোচনা করতে দেখা যায়নি। স্বর্ণকুমারীর অনেক সখি—শরৎকুমারী তাঁর 'বিহঙ্গিনী' সই, মহিলা কবি গিরীন্দ্রমোহন তাঁর 'মিলন-বিরহ' সই—এরকম আরও অনের সখি ছিল। 'সখিসমিতি'র উদ্যোগেই সর্বপ্রথম শিল্পমেলা হয়। স্বর্ণকুমারী চেয়েছিলেন মেয়েদের হাতের কাজকে শিল্পের মূল্য দিয়ে সকলের চোখের সামনে তুলে ধরতে। এতদিন হাতের কাজ শুধু ঘরের শোভা বাড়িয়েছে, সমাজে কৌলীন্য পায়নি। শিল্পীও পায়নি প্রাপ্য সম্মান। শিল্পমেলায় সেই সুযোগ এল। বেথুন কলেজ-প্রাঙ্গণে বসল মেলা। রবীন্দ্রনাথ লিখে দিলেন অভিনয়োপযোগী একটা নাটক 'মায়ার খেলা'। মেয়েরাই অভিনয় করলেন তাতে; দর্শকও মেয়েরা। তাঁদের 'সেই উৎসাহ-আনন্দ-উদ্দীপনার বুঝি তুলনা হয় না। অভিনয় ঠাকুরবাড়ির মেয়েরাই করলেন,

বাইরের দু-একজনও হয়তো ছিল। কিন্তু হাতের কাজের পুরস্কার পাবার সময় দেখা গেল ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের হারিয়ে দিয়ে প্রথম পাঁচটি পুরস্কাই পেলেন ভিন্ন পরিবারের মেয়েরা। প্রথম বছর (১২৯৫) যাঁরা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছিলেন তাঁদের নাম ও শিল্পকর্মের বিবরণ পাওয়া গেছে। যেমন :

প্রথম পুরস্কার—মিস মানুক 'রঞ্জিতের বেত্রসেতুর ছবি'

দ্বিতীয় পুরস্কার—শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দাসী 'ক্ষীরের ফুলশয্যা ও খোদিত প্রস্তরছাপ'

তৃতীয় পুরস্কার—শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী 'মাটির গ্রাম্যছবি ও কার্পেটে দেবী চৌধুরানী'

চতুর্থ পুরস্কার—মিস সরকার 'সুতার সূক্ষ্ম কারুকার্য'

পঞ্চম পুরস্কার—শ্রীমতী বসন্তকুমারী দাস 'জরীর কাজ'

এঁদের মধ্যে তৃতীয় পুরস্কার পান কবি গিরীন্দ্রমোহিনী। পঞ্চম পুরস্কারপ্রাপ্তা বসন্তকুমারী 'সখিসমিতি'র কর্ত্রীসভার একজন। ইনি শ্রীনাথ দাসের মেজো ছেলে জ্ঞানেন্দ্রনাথের স্ত্রী। জ্ঞানেন্দ্রনাথ 'সময়' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং স্ত্রীস্বাধীনতার সমর্থক। বসন্তকুমারী কংগ্রেসের প্রথম মহিলা সদস্য হয়েছিলেন। বোম্বাইয়ে কংগ্রেস অধিবেশনে স্বর্ণকুমারী ও ডাঃ কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। 'সখিসমিতি'র অন্যান্য কর্ত্রীরা হলেন স্বর্ণলতা ঘোষ, বরদাসুন্দরী ঘোষ, ললিতা রায়, সরলা রায়, মনোমোহিনী দত্ত, থাকমণি মল্লিক, সৌদামিনী গুপ্তা, প্রসন্নতারা গুপ্তা, হিরণ্ময়ী দেবী, সৌদামিনী দেবী, চন্দ্রমুখী বসু, মৃণালিনী দেবী, বিধুমুখী রায়, প্রসন্নময়ী দেবী, সুরবালা দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী দেবী ও স্বয়ং স্বর্ণকুমারী।

সখি গিরীন্দ্রমোহিনীর মতো স্বর্ণকুমারীও কবিতা লিখতেন, গান লিখতেন আর লিখতেন গাথা। আজকাল গাথা লেখার দিন শেষ হয়ে গিয়েছে কিন্তু উনিশ শতকে একটা কাহিনী নিয়ে কবিতা লেখাকে বলা হত গাথা। শরৎকুমারীর স্বামী অক্ষয় চৌধুরী গাথা রচনার সূত্রপাত করলে রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী ও আরও অনেকে গাথা লেখায় মন দিয়েছিলেন। স্বর্ণকুমারীর গাথা পড়ে দু-একটা পত্রিকা বেশ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। কিন্তু আজকের দিনে সেসব রচনা মোটেই সাড়া জাগাতে পারে না, এমনকী তাঁর সুন্দর গানগুলোও না। তবে এখনও যে স্বর্ণকুমারী কয়েকটা ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে আছেন তার প্রথমটি হল পত্রিকা সম্পাদনা ও দ্বিতীয়টি হল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা। এই দুটি ক্ষেত্রে স্বর্ণকুমারী পুরুষোচিত বলিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছেন।

বাংলায় মহিলা পরিচালিত সাময়িকপত্রের সংখ্যা কম নয়। ১৮৭৫ থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে অন্তত ছাব্বিশজন সম্পাদকের আবির্ভাব হয়েছিল। বলা বাহুল্য সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন স্বর্ণকুমারী। ঠাকুরবাড়ির আরও অনেক নারী পত্রপত্রিকা সম্পাদনার কাজে এগিয়ে এসেছেন, তবে সে অনেক পরে। জ্ঞানদানন্দিনীর কথা আগেই বলা হয়েছে। তিনি ছাড়াও ইন্দিরা, হিরণ্ময়ী, সরলা, প্রতিভা, প্রজ্ঞা, হেমলতা ও আরও অনেকে সম্পাদক হিসেবে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

১৮৭৫ সালের জুলাই মাসে থাকমণি দাসীর সম্পাদনায় প্রথম মহিলা পরিচালিত পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তবে থাকমণি ছিলেন নামে মাত্র সম্পাদক। তাঁর বাবা এই পত্রিকা বার করেছিলেন। এর বছর দুই পরে ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত হয় 'ভারতী'। সাত বছর পরে, কাদম্বরীর আকস্মিক মৃত্যুর পর স্বর্ণকুমারী এই পত্রিকার পরিচালনভার গ্রহণ করেন। তিনি যে একজন ভাল সম্পাদক একথা হয়তো জানাই যেত না, যদি না কাদম্বরীর আকস্মিক মৃত্যু ঘটত। শরৎকুমারীর ভাষায় এই দুর্দিনে তিনি 'নারীর পালন শক্তির পরিচয় দিলেন।' শুধু কি তাই? এই 'ভারতী'র জন্যেই স্বর্ণকুমারীকে লিখতে হল নতুন নতুন প্রবন্ধ, নাটক, প্রহসন, কত কী!

মহিলা নাট্যকারের কথা বলেছি। কিন্তু তাঁরা যে কোনওদিন প্রহসন লিখবেন সেটা অনেকেই আশা করেনি। স্বর্ণকুমারী অনেকগুলো নাটক ছাড়া লিখেছেন দুটি প্রহসন। কারুণিক প্যাটার্নের গল্প-উপন্যাস লিখতে লিখতে তিনি যে হাসাতেও পারেন, তারই দুটি সার্থক উদাহরণ হয়ে

দাঁড়াল 'পাকচক্র' আর 'কনেবদল'। অন্তঃপুরের পুঙ্খানুপুঙ্খ জীবনচিত্র এবং কৌতুক গীতিগুলির জন্যে মূল্যবান। এছাড়া তিনি লিখেছেন অনেকগুলো 'শারাড'! 'শারাড' কথাটা শুনতে যত অপরিচিত লাগছে আসলে তা নয়। খানিকটা রঙ্গকৌতুক পরিবেশনই এর লক্ষ্য। অভিনয়ের মধ্যে দর্শককে হেঁয়ালিটি বার করতে হয়। যেমন ধরা যাক 'পাহাড়' কথাটি। একজন সাজলেন রোগী, তার পায়ের হাড় ভেঙেছে। ডাক্তার এসে তার পা টিপে টাপে দেখলে; দর্শক বুঝল এর মধ্যে 'পাহাড়' কথাটি লুকিয়ে আছে। স্বর্ণকুমারীর 'বৈজ্ঞানিক বর' ও 'লজ্জাশীলা' 'শারাড' হিসেবে অতুলনীয়। রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় রচনার নাম দিয়েছেন হাস্যকৌতুক। প্রথম মহিলা শিশুসাহিত্যিক হিসেবেও স্বর্ণকুমারী স্মরণীয়। তাঁর 'গল্পস্বল্প' (১৮৮৯) ছোটদের মনের কথা সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতো স্বর্ণকুমারীও একসঙ্গে সৃষ্টি ও সংস্কারের কাজে হাত দিয়ে উপন্যাসের রমাজগৎ ছেড়ে নেমে এসেছিলেন প্রবন্ধ লেখার দুরূহ কাজে। তাই 'পৃথিবী'র মতো কষ্টসাধ্য প্রবন্ধ লেখার পিছনেও তাঁর আন্তরিকতাটুকু চোখে পড়ে। এমন বিষয় নিয়ে, এই রকেট নিয়ে গ্রহান্তরে ছুটে যাবার যুগেও, মেয়েরা বড় একটা প্রবন্ধ লেখেন না। অথচ স্বর্ণকুমারী বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ লেখার কাজে হাত দিয়েছিলেন বঙ্কিমের 'বিজ্ঞানরহস্য' প্রকাশের মাত্র সাত বছর পরে, রামেন্দ্রসুন্দর তখনও সাহিত্যের আসরে নামেননি। এমন সময় স্বর্ণকুমারী বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভূবিজ্ঞানীদের মতামত সংকলন করে সাতটা প্রবন্ধ লিখে বাঙালি মেয়েদের মধ্যে বিজ্ঞানালোচনার সূত্রপাত করেন। এসময় স্কুল বুক সোসাইটির উদ্যোগে স্কুলপাঠ্য ভূগোল ও বিজ্ঞানের নানারকম বই বেরিয়েছে। কিন্তু স্বর্ণকুমারী প্রবন্ধগুলি লেখেন নবজাগ্রত বাঙালি-মানসে পৃথিবী সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশ্নের যথাসম্ভব ভাল উত্তর দেবার জন্যে।

বাংলায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখবার সময় স্বর্ণকুমারী একটা কঠিন বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন, সেটি হল বাংলা পরিভাষার অভাব। বাংলায় লাপ্লাস্, হারসেল, টমসন্, নর্মাণ, লাকিয়ার, গডক্রে, বালফোর, ফিগুয়ে প্রভৃতি ভূবিজ্ঞানীর মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে স্বর্ণকুমারী লক্ষ করেছিলেন, 'বাঙ্গালায় বৈজ্ঞানিক পুস্তক সঙ্কলন সম্বন্ধে প্রধান অসুবিধা পারিভাষিক শব্দের অভাব।' তিনি নিজেই কিছু পরিভাষা নির্মাণ করেন। অনেক ভেবেছিলেন পরিভাষা নিয়ে। ভূমিকায় লিখেছেন, 'পুস্তক পূর্ববর্তী লেখক মহাশয়দিগের ব্যবহৃত শব্দ প্রায়ই গ্রহণ করা হইয়াছে তবে দু একটি প্রচলিত শব্দের স্থানে অন্য শব্দও ব্যবহৃত হইয়াছে। সচরাচর অগ্ন্যুৎগারী পর্বতসকলকে আগ্নেয়গিরি বলিয়া উল্লিখিত হয় কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে জ্বালামুখী শব্দে যখন ওই অর্থটি আরও সুস্পষ্ট হয় তখন সে কথাটিও বা বঙ্গভাষায় চলিবে না কেন? ওই উৎকৃষ্ট কথাটি... এ পুস্তকে ব্যবহার করিতে সাহসী হইয়াছি।' স্বর্ণকুমারীর নির্মাণ করা পরিভাষার সংখ্যা কম নয়, তবে তাঁর ঝোঁক ছিল সহজ ও সুশ্রাব্য শব্দের দিকে। যেমন :

ফার্ণ=পর্ণীতরু
পেনাম্ব্রা=উপচ্ছায়া
সেন্সিটিভ=মোহিষ্ণু
সোলার স্পট=সূর্যবিম্ব
পিগমি=বালখিল্য
ট্রায়াসিক=ত্রিস্তর
য়ুনিভার্স=বিশ্বাকাশ
হিপ্নোটিস্ম্=স্বাপ্নিকতা
ডিডাক্সন=অবরোহ

এই জাতীয় পরিভাষা সুনির্বাচিত শব্দচয়নে তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। এ বিষয়ে তাঁর আর একটি প্রস্তাবও আমরা নিজের অজ্ঞাতসারেই গ্রহণ করেছি 'জীব জগতেও যেমন শব্দজগতেও

তেমনি—যাহা যোগ্য তাহাই জীবিত থাকিবে। যদি বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দগুলি সকল ভাষায় একই রাখা যায়—তাহাতে ক্ষতি নাই, বরং ভাষার উন্নতি হয়...' নিজের লেখায় ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে তিনি দেখিয়েছেন এর যৌক্তিকতা।

সাহিত্যচর্চা ও সমাজসেবার সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণকুমারী যোগ দিয়েছিলেন কংগ্রেস অধিবেশনে। তাঁর স্বামী জানকীনাথ ছিলেন ভারতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান নেতা। তাঁর সবচেয়ে প্রিয় কর্মক্ষেত্র ছিল 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস'। কংগ্রেসের জন্ম থেকে আরম্ভ করে অনেকগুলো বছর তিনি এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনিই হয়েছিলেন কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি। স্বামীর সঙ্গে স্বদেশপ্রেমে দীক্ষা নিয়েছিলেন স্বর্ণকুমারী। তিনি কংগ্রেসের পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধিবেশনে যোগদান করেন। ওই অধিবেশনে আরও দুজন মহিলা যোগ দিয়েছিলেন। স্বর্ণকুমারীর স্বদেশচিন্তা তাঁর শেষ জীবনে লেখা উপন্যাসত্রয়ীতে যেমন প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনি প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর ছোট মেয়ে সরলার জীবনে। এমনকী তিনি ভেবেছিলেন সরলার বিয়ে দেবেন না, তাঁকে স্বদেশসেবায় উৎসর্গ করবেন। কেউ কেউ মনে করেন, শেষ জীবনে লেখা ত্রয়ী উপন্যাসে স্বর্ণকুমারীর ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা সবচেয়ে বেশি সক্রিয় হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে জ্যোতির্ময়ী চরিত্রটি তাঁর কন্যা সরলার ছায়াশ্রিত। ঠাকুরবাড়ির আরও অনেক চরিত্র ও অন্তঃপুরের ঘটনা এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে। স্বর্ণকুমারীর স্বদেশচিন্তাও রয়েছে এখানে। তিনি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন না। অনেকের মতো তাঁর নায়িকাও মনে করেছে, 'ভারতবর্ষ বিনা রক্তপাতে অঙ্গুলি তাড়নে তখন স্বরাজ লাভ করবে।' অর্থাৎ সাম্য ও মৈত্রীর পতাকার নীচে যখন 'জাতি বিজাতি এক হয়ে যাবে'। পুলিশের অত্যাচারের মধ্যে প্রতিবাদী সমতার শোভাযাত্রাও সেকালের আইন অমান্যকারী স্বাদেশিক আন্দোলনের প্রতি স্বর্ণকুমারীর পক্ষপাত বুঝিয়ে দেয়। যদিও বিজাতীয় অনুকরণে তাঁর আপত্তি ছিল কিন্তু বিদেশের বিশেষত ইংল্যান্ডে মেয়েদের স্বাধীনতা, আত্মনির্ভরতা, এমনকী রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ সবকিছুই স্বর্ণকুমারীর ভাল লাগত। তিনি জানতেন পুরুষেরা এজন্যে বিরক্তি প্রকাশ করে, ঠাট্টা তামাশা করে কিন্তু 'তাদের সম্মানের চক্ষেই দেখে, তাদের হাতেই কলের পুতুলের মতো নাচে।' ভারতের মেয়েরা কি এভাবে এগিয়ে আসবে না? যদিও স্বর্ণকুমারীর সাহিত্যকৃতি কোনও পুরস্কারের মুখাপেক্ষী ছিল না, তবু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মান জগত্তারিণী স্বর্ণপদক দেওয়া হয়। এই পদকের প্রথম প্রাপক তাঁর ছোট ভাই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। স্বর্ণকুমারীই প্রথম নারী, যিনি এই স্বর্ণপদক লাভ করলেন। ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে স্বর্ণকুমারীর উজ্জ্বলতাই সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে।

যেখানে স্বর্ণকুমারী ও জ্ঞানদানন্দিনীর শিক্ষার গোড়াপত্তন হয়েছিল, সেই ঠাকুরবাড়ির ঘরোয়া স্কুলটিতে আবার ফিরে যাওয়া যাক। এই ঘরোয়া স্কুলে কেউ স্পেশাল ক্লাস যদি করে থাকেন তবে তিনি নীপময়ী। প্রবল বিদ্যানুরাগী হেমেন্দ্রনাথ স্ত্রীকে সর্ববিদ্যায় পারদর্শিনী করে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর সে সাধ পূর্ণ করেছিলেন তাঁর মেয়েরা। নীপময়ীই কি অপূর্ণ রেখেছিলেন স্বামীর মনোবাসনা? জ্ঞানদানন্দিনীর মতো নীপময়ী কোনও হইচই তোলেননি সত্যি, তবু এই বিরাট বাড়িটির অন্দরমহলে নারী জাগরণের কী রকম প্রস্তুতি চলেছিল, কীভাবে তাঁদের স্বামীরা তাঁদের গ্রহণ করতেন জানবার জন্যেই পিছন ফিরে তাকানো যেতে পারে।

নীপময়ী দেবেন্দ্রনাথের প্রিয় বন্ধু হরদেব চট্টোপাধ্যায়ের মেয়ে। তাঁর ছোট বোন প্রফুল্লময়ীও ঠাকুরবাড়ির বউ হয়েছিলেন। হরদেব বন্ধুর অনুরোধে সৌদামিনীর সঙ্গে তাঁর নিজের দুই মেয়েকেও স্কুলে পাঠিয়েছিলেন। অবশ্য যাঁরা বেথুনে পড়তে গিয়েছিলেন, তাঁরা নীপময়ী-প্রফুল্লময়ী নন, তাঁদের দিদি অন্নদা ও সৌদামিনী। মহর্ষি এবং হরদেব দুই বন্ধু হলেও

তাঁদের মধ্যে সামাজিক মর্যাদার দুস্তর ব্যবধান ছিল। তাই নীপময়ীর বিয়ে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়নি। বহু গণ্ডগোল দেখা দিয়েছিল।

গণ্ডগোল হবে নাই বা কেন। হরদেব চট্টোপাধ্যায় কুলীন ব্রাহ্মণ, তিনি ব্রাহ্মমতে পিরালী ব্রাহ্মণের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলে জ্ঞাতি কুটুম্বেরা বিপদগ্রস্ত হবে ভেবেছেন। ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে তাঁদের সমাজেই ঠাঁই হবে। জাতকুল রক্ষার জন্য তোলপাড় করলেন অনেকে। হরদেবের ঘর ছেড়ে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন অন্য জায়গায়। কিন্তু গৌরবের কথা শুধু মেয়েটির নয়। গোপনে সমাজচ্যুত হলেন না হরদেব। দেখেছি যে তাঁর প্রাণের বন্ধু, তাঁর ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন, এখানে সমাজ বাধা দেবার কে? একা সমাজের ক্ষমতা আর তার নেই। এই যে কেশব সেন, এখানে সমাজ বাধা দেবার কী? এক কুলীনের মেয়ে কুলীন বিবাহ বন্ধন করে যোগাযোগ স্থাপন করলেন, কুলীন এক কুলীনের মেয়ে বিবাহ সম্বন্ধে নিতান্তই নিরুপায় বিবাহ দিয়েছেন। সমাজ গোঁড়ামির কথা নয়, তবে ১৮৫৩ সালের ঘটনা। হরদেবের মন পেলেন না।

কী আর করতে পারে। হরদেব তবু ছেড়ে দেননি। একবোঝাই সাজিয়ে নিয়ে তাঁরা ঠাকুর পক্ষে যে বিস্ময়ী হয়ে যান ছিল তা না। একবোঝাই তাঁদের নিয়ে চম্পটি দেওয়া হয়। ঠাকুর বাড়ির মতো এমনই প্রাচীন ঘরে পরস্পর প্রাপ্তি ঘটিয়ে কন্যাকে তুলে নিয়ে চম্পটি দেওয়া যায় না। আসলে হরদেব ছাড়লে নীপময়ীর হয়ে এক বৃদ্ধ কুলীন পাত্রেরও তাঁরা জোগাড় করে রেখেছিলেন, তবে ব্যাপারটা এগোতে পারেনি। কতটা জানাজানি হয়ে যাওয়ায় পুলিশ ডেকেছিলেন, হয়ে ব্যাপারটা এখানে গড়াতে পারেনি। কারণ জানাজানি হয়ে যাওয়ায় হেমেন্দ্রনাথ। কেমন রূপ ছিল পরতে সাজ দিয়েছিলেন। গোধূলি লগ্নে বরবেশে এলেন হেমেন্দ্রনাথ। কেমন রূপ তেমনি সাজের বাহার, চোখ চমকিয়ে দেয় যেন। কেবলী জোড়ের ওপর নানারকম গয়না—গলায় মুক্তার মালা, হিরের কণ্ঠী, হাতে বালা, আঙুলে নানারকম আংটি ঝলমল করছে। বাড়ির বধূবরণীর মেয়ে মনে হয়েছিল স্বয়ং বুঝি মহাদেব এসেছেন তার নিজেকে বিয়ে করতে।

বালিকা নীপময়ী হেমেন্দ্রকে মালার প্রদক্ষিণ করে পরিয়ে দিলেন বরমালা। ব্রাহ্মণেরা শেষ করে তাঁরা বাসরে প্রবেশ করলেন। কৌতূহল হলে সেখানেও একটু উঁকি মেরে আসা যায়, কারণ হেমেন্দ্র 'আমার বিবাহ' পুস্তিকায় সমস্ত খুঁটিনাটি বিবরণ দিয়ে গেছেন। ব্রাহ্ম বিবাহ বলে বাসরে অন্যান্য মহিলারা আসেননি। তাই হেমেন্দ্রকেও 'অত্যধিক পরিশ্রম' সহ্য করতে হয়নি। শুধু তাই নয়, পরে তাঁরা কোনও পরিহাস করলে সেই ঘরে মেয়ের ইংরিজি শিক্ষার প্রসঙ্গ তুললেন এবং তাঁদের বাড়ির অনেক মেয়ে সংস্কৃত ও ইংরেজি পড়তে পারেন বলে সমবেত মহিলাদের অবাক করে দিলেন। হেমেন্দ্রর এই উক্তি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সেকালে সব ব্রাহ্ম মহিলাই উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না। সাধারণত আমরা ব্রাহ্মিকা বললেই যে রুচি তার পরিচয় পাই এরা তার থেকে অনেকে ছিলেন। সুকুমারী ও হেমেন্দ্রর এই ধরনের ব্রাহ্ম বিবাহ দেওয়ার মধ্যে দিয়ে সামাজিক পরিস্থিতি আমরা ফুটে উঠে এল।

ঠাকুরবাড়িতে তখন নতুন ভাবের জোয়ার বইছে। উৎসাহ-উদ্দীপনার দিন আসছে। সেকালের শিক্ষিত সমাজের অন্দরমহলে ঢুকছে হাওয়ার মতো পশ্চিম হাওয়া। বাইরের শিক্ষিত সমাজেও চলছে উৎসাহ উদ্দীপনা। সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন নিয়ে আসছে ব্রাহ্মসমাজ। কেশব সেন একদিন একদল ব্রাহ্ম মহিলাকে নিয়ে বসেছেন, সঙ্গে এক পাদরির বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ রাখতে গেলেন। চায়ের পেয়ালায় তুফান তোলেই ওঠে। হেমেন্দ্রও এই ফাঁকে একটা কাজ করলেন। তিনি স্ত্রীর লেখাপড়া শেখানোর সঙ্গে সঙ্গে গান শেখাবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

একালে মুক্তির মহাদেব কথা তখন কেউ ভাবত না, কারণ ভদ্রঘরের বাঙালি মেয়েরা মোটেই গান শিখতেন না। আগে থেকে এ ব্যবস্থা চালু হল বলা মুশকিল, হয়তো বৈষ্ণবকালের সময় থেকেই গানের চর্চা বন্ধ হয়েছিল। বাবুদের গান শিখতেন পুরুষেরা, গান শিখত বাইজিরাও। নাচ গান নিখুঁত ভাবে শিখতেন বাইজির কোকিল কণ্ঠের কাছে বাবুরা নিজেদের সব বিকিয়ে দিতেন। সমাজের দিক থেকে ভদ্রঘরের মেয়েদের নাচগান শেখানো ছিল বড় নিন্দনীয় ব্যাপার। মেয়েরা গান শোনার শখ মেটাত বৈষ্ণবীদের গান শুনে। এছাড়া ছিল কবিগানের

দাস, কুমুদ ও সৌদামিনীরা, বিধবাদের নারীর প্রথমে এই জাতীয় ভূমিকা গ্রহণ করছেন। ঠাকুর পরিবারের অন্তঃপুরে অবাধে প্রবেশ করছেন এঁরা, নিয়ে আসছেন তাঁদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার পুঁজি। শিক্ষিত পুরুষেরা প্রবল বিরোধিতা করলে এঁদের সঙ্গে ঘরে পরিবারের মেয়েদের যোগাযোগ ক্রমশ কমে যায়। তবে বাড়ির মধ্যে নিজের মত চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেন না এমন কোনোই বিষয় নয়, কারণ স্বর্ণকুমারী আর কাদম্বরী দুজনেই গান জানতেন। যদিও এখানি হিন্দুস্থানি গান কোনও সংগীতজ্ঞের কাছে শেখেননি।

হেমেন্দ্রনাথ এ কথা না জেনে স্ত্রীকে গান শেখাবার জন্য মহর্ষির কাছে অনুমতি চাইলেন। মহর্ষির রক্ষণশীল মন প্রথমটায় খুশি মনে দিতে চায়নি। কিন্তু যা অভিপ্রেত মনে না হলেও তিনি বাধা দেননি কেন? পিতার অনুমতি পেয়ে হেমেন্দ্র বাড়ির গায়ক বিষ্ণু চক্রবর্তীর কাছে নীপময়ীর গান শেখার ব্যবস্থা করে দিলেন।

তারপর কী হল? তিনি একটা বড়মাপের গায়িকা হয়ে উঠতে পারলেন, যাঁকে নিয়ে সমালোচকেরা আর একবার হই হই করে সমাজকে রসাতলে পাঠাতে পারতেন, শ্রোতারা আর একবার গানে হাত দিয়ে তালবার সুযোগ পেতেন, তাঁকে নিয়ে একটা গুজব পর্যন্ত উঠল না। কেন? মেজো বউ জ্ঞানদানন্দিনীর মতো নীপময়ী বাইরে ছড়িয়ে পড়েননি বলে? বিভিন্ন মানুষের মন। দুই ভাইয়ের একজন স্ত্রীকে ভারতীয় নারীর আদর্শ করে তুলতে চেয়েছিলেন, আর একজন স্ত্রীকে অন্তঃপুরের পরবর্তিনী করে রেখেছেন নীরবে নিভৃতে। জ্ঞানদানন্দিনী যদি নারীজাতির আদর্শ হন, নীপময়ীও তো তাই। তবু দুজনের মধ্যে কত প্রভেদ।

নীপময়ী সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল শেষ পর্যন্ত থেকেই যায়। এগারোটি সুযোগ্য-সার্থক সন্তানের জননী নীপময়ী গান জানতেন, ছবি আঁকতেন, নানা ভাষার বই পড়তেন, দেশি বিলিতি রান্না করতেন। আমরা জানি, নতুন বউ এলে তাকে ঠাকুরবাড়ির আদব-কায়দা শেখাবার ভার পড়ত নীপময়ীর ওপরে। মহর্ষির নির্দেশে ফুলতলির ভবতারিণীকেও পাঠশিক্ষায় মৃণালিনী করে তুলেছিলেন আর কেউ নয়, এই নীপময়ী। অথচ কোনওদিন তাঁকে নিজের কথা বলতে শোনা গেল না। বোঝা গেল না, অন্তঃপুরিকা নীপময়ী জীবনকে কীভাবে গ্রহণ করেছিলেন। একথা ঠিক, তিনি বহির্জগতে কোনও প্রভাব বিস্তার করেননি। অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পরিবারের শিক্ষিতা বধূর মতোই তাঁর জীবন কেটেছে।

নীপময়ীর একটি সংবাদ আমাদের সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করে, সেটি হল তাঁর ছবি আঁকা। সেদিন 'পুণ্য' পত্রিকায় নীপময়ীর একটা ছবি চোখে পড়ল। ১৩০৭ সালের 'পুণ্য'তে প্রকাশিত 'হরপার্বতী' অতি সাধারণ একটি ছবি। চিত্রশিল্পী হিসেবে নীপময়ী হয়তো উল্লেখযোগ্য কিছুই হতে পারেননি, তবু জানতে ইচ্ছে করে বইকী। বাংলাদেশে ছবি আঁকার চর্চা প্রায় ছিলই না। পট যুগের পটশিল্প অবহেলায় হারিয়ে যাচ্ছিল। ভারতীয় শিল্পের অবস্থাও খুব ভাল নয়। এ সময় নীপময়ী ছবি আঁকা শিখেছিলেন। তা অমৃতময় মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে তাঁর আত্মজ ক্ষিতীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত একটি খাতা 'মহর্ষিপরিবার'-এর কিছুটা দেখবার সুযোগ হয়েছিল। তাতে ক্ষিতীন্দ্রনাথ তাঁর মায়ের কথা কিছু কিছু লিখেছেন, ছবি আঁকার কথাও আছে:

'মায়ের আঁকা ছবি এখনও আমাদের তিন ভাইয়ের ঘরে কয়েকখানা আছে। কালিদাস পালের শিক্ষকতায় মা ইজিবিবির একটা ছবি এঁকেছিলেন। তা ছাড়া একটা ক্রিশ্চানের ছবি এঁকেছিলেন। White সাহেবের শিক্ষকতায় বিবিধ ছবি এঁকেছিলেন।'

দুঃখের বিষয়, নীপময়ীর আঁকা ছবিগুলি সবই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বিবরণ পড়ে মনে হয় নীপময়ী একাধিক এবং বিদেশি চিত্রশিল্পীর কাছে আঁকা শিখলেও অভিজ্ঞতায় তাঁর নিজস্বতা ফুটে ওঠেনি। নীপময়ীর মেয়েরাও ভাল ছবি আঁকতেন। ক্ষিতীন্দ্রনাথ তাঁর মায়ের শিক্ষকদের কথাও লিখেছেন। কালিদাস পালের মাসিক বেতন ছিল তিন টাকা আর Mr. White পেতেন একশো টাকা।

ছবি আঁকা ছাড়াও নীপময়ী সেকালের সুপ্রসিদ্ধ বেণীমাধববাবুর কাছে শিখেছিলেন বাঁয়া-তবলা ও করতাল বাজাতে। নীপময়ীকে হেমেন্দ্রনাথ শেখাননি এমন বিষয় খুব কম ছিল। ক্ষিতীন্দ্রনাথ তাঁকে মিল্টনের 'প্যারাডাইস লস্ট' ও সংস্কৃত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' পড়তে দেখেছিলেন। তবে নীপময়ীর সংগীতচর্চা, চিত্রচর্চা সবই নেপথ্যে রয়ে গেল। হেমেন্দ্রনাথের অকালমৃত্যুর পরে তিনি পুরোপুরি সরে গিয়েছিলেন আলোর বৃত্ত থেকে। শিক্ষার ফল শুধু দেখা গিয়েছে তাঁর মেয়েদের অসাধারণ গুণাবলীর মধ্যে। হয়তো তাঁর ছোট বোন প্রফুল্লময়ীও এমনি আড়ালে থেকে যেতেন, যদি-না তাঁর স্মৃতিকথাটি আমাদের কাছে পৌঁছে দিতেন সুধীন্দ্রনাথের বড় মেয়ে রমা। তিনিও জ্ঞানদানন্দিনী-স্বর্ণকুমারীর মতো কোনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে বাংলায় মেয়েদের চোখের সামনে কোনও নজির সৃষ্টি করেননি। কিন্তু ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে সর্বসুন্দরী, নীপময়ী, প্রফুল্লময়ীরাও তো ছিলেন।

•

প্রফুল্লময়ীর মতো নারীর সংখ্যা বেশি নেই। নাম তাঁর প্রফুল্লময়ী, কিন্তু সারাটা জীবন তিনি চোখের জল ফেলে ঘরের কোণে বসে কাটিয়েছেন। রূপকথার রাজপ্রাসাদের মতো এই বিশাল ঠাকুরবাড়ির একটা ঘরে যে এত অশ্রুবিন্দু জমাট বেঁধে পাথর হয়ে উঠেছে, সে কথাই বা কে জানত? জীবনের একেবারে শেষ পর্বে প্রফুল্লময়ী ব্যক্ত করলেন নিজেকে। না করলে ঠাকুরবাড়ির সমস্ত আনন্দ-উল্লাস ছাপিয়ে অব্যক্ত যন্ত্রণাক্লিষ্ট একটি অশ্রুসিক্ত অপরূপ মুখশ্রী কি কোনওদিন স্পষ্ট হয়ে উঠত? সুখ-দুঃখ আর হাসি-কান্নার টানাপোড়েনেই বোনা হয়েছে নারীজীবনের সম্পূর্ণ ছবি।

প্রফুল্লময়ীর দুঃখ কোনও সময়েই খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। কী করে উঠবে? হঠাৎ-হারানোর হাহাকার রূপ পেতে পারে, তিল তিল করে জমে ওঠা বুকভাঙা বেদনার তো কোনও রূপ নেই। অথচ প্রফুল্লময়ী পেয়েছিলেন সবই। ছোটবেলায় পুণ্যিপুকুর ব্রত করবার সময় সব মেয়েই যা চায়, সেইসব। দিদির বিয়ে হয়েছে বড় ঘরে। মহাদেবের মতো সুন্দর ভগিনীপতি। মাঝে মাঝে মায়ের সঙ্গে দিদিকে দেখতে যেতেন ছোট্ট প্রফুল্লময়ী। অপার বিস্ময়ে দেখতেন দেউড়ি-দালানওয়ালা তিন মহলা বাড়িটিকে। কত ঘর, কত থাম, জানলা, রেলিং, দাস-দাসী, আসবাবপত্র, আলমারিতে সাজানো কাচের পুতুল—কত কী! তাঁকে দেখেও পছন্দ হয়ে গেল শরৎকুমারী ও স্বর্ণকুমারীর। কেমন স্বর্ণচাঁপার পাপড়ির ফিকে সোনার মতো চমৎকার গায়ের রং, পদ্মের পাপড়ির মতো টানা-টানা ডাগর দুটি ভ্রমরকৃষ্ণ চোখ, নিখুঁত মুখশ্রী, চমৎকার গড়ন, গানের গলাটি ভারী মিষ্টি—আচ্ছা, বীরেন্দ্রের সঙ্গে বিয়ে দিলে কেমন হয়? যেমন ভাবা তেমনি কাজ। দুই বোনে তাড়াতাড়ি মেয়ে দেখার ব্যবস্থা করলেন। বীরেন্দ্র মহর্ষির চতুর্থ পুত্র, অত্যন্ত মেধাবী, বিশেষ করে অঙ্কে অসাধারণ আসক্তি। সুদর্শন। বেশ মানাবে দুজনকে। তাই মেয়ে দেখার প্রস্তাব। এর আগে ঠাকুরবাড়িতে মেয়ে দেখা হত সাবেকমতে। বাড়ির পুরনো ঝি খেলনা নিয়ে মেয়ে দেখতে যেত এবং তারা যাদের পছন্দ করে আসত তাদের সঙ্গেই বিয়ে হত। কিন্তু দিন বদলাচ্ছে, সুতরাং আধুনিক মেয়ে দেখার পদ্ধতি চালু করতে দোষ কী? একদিন প্রফুল্লময়ী আসতেই দুই বোনে মিলে তাঁকে সাজিয়ে বীরেন্দ্রকে দেখাবার জন্যে টেনেটুনে বাইরের দিকের বারান্দায় নিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। গ্রাম্য বালিকা প্রফুল্লময়ী, তখন তাঁর লজ্জাই বেশি। কাজেই কিছুতেই বীরেন্দ্রের সামনে বেরোলেন না। কোনও রকমে ভেতরের দিকে চলে এলেন। তাতে অবশ্য বিয়ে আটকাল না। অতি বৃদ্ধা বয়সে স্মৃতিকথা বলার সময় প্রফুল্লময়ীর সব কথাই মনে পড়েছিল। সেইসব সুখের দিনের স্মৃতি!

এক ফাল্গুনী অপরাহ্ণে দিদির মতোই একহাত ঘোমটা টেনে তাঞ্জামে চেপে প্রফুল্লময়ী এলেন স্বামীর ঘরে। শাশুড়ি-ননদ-জা-দিদির আদরে দিনগুলো শুরু হল স্বপ্নের মতো। ঠাকুরবাড়ি

থেকে নতুন বউ যৌতুক পেলেন গা-ভরা গয়না। গলায়—চিক, ঝিলদানা; হাতে—চুড়ি, বালা, বাজুবন্দ; কানে—মুক্তার গোচ্ছা, বীরবৌলি, কানবালা; মাথায়—জড়োয়া সিঁথি; পায়ে—গোড়ে, পাঁয়জোড়, মল, ছানলা, চুটকী; কোমরে—দশ ভরির গোট, আরও কত কী। মনে হল সুখের বুঝি সীমা নেই।

স্মৃতিচারণের সময় প্রফুল্লময়ী ঠাকুরবাড়ির ছোট ছোট ছবি এঁকেছেন। সে ছবিগুলি আশ্চর্যরকমের ঘরোয়া। বাড়ির মধ্যে যে বিরাট পরিবর্তন হচ্ছিল, নারী পুরুষ সকলেই প্রগতির নেশায় মেতে উঠেছিলেন, প্রফুল্লময়ীর লেখা পড়ে তা বোঝাই যায় না। প্রফুল্লময়ী জানাচ্ছেন অন্যান্য সব বাড়িতে যেমন হয়, তাঁদের বাড়িতেও ননদ-জায়েরা সবাই মিলে একসঙ্গে খেতে বসতেন। গাঁয়ের মেয়ে বলে প্রফুল্লময়ী টানতেন দীর্ঘ ঘোমটা। একহাত ঘোমটার মধ্যে তিনি কী করে খান ভেবে না পেয়ে লুকিয়ে-ঝুঁকিয়ে উঁকি মারতেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং 'খাওয়ার রকম দেখিয়া থাকিতে না পারিয়া নানারকম ঠাট্টা করিতে ছাড়িতেন না।'

এরকম করেই দিন কাটছিল। মিষ্টি গলা বলে তাঁর গান শেখারও ব্যবস্থা হল। মাঝে মাঝে গলা মিলিয়ে গান করতেন কিশোর দেবর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। কিন্তু চার বছর পরে সমস্ত সুখস্বপ্ন মিলিয়ে গেল ক্ষণিক বুদ্‌বুদের মতো। স্নান আহার ত্যাগ করে দিনে দিনে অস্বাভাবিক হয়ে উঠলেন বীরেন্দ্র। ক্রমশই অস্থিরতা বাড়তে বাড়তে রূপ নিল পাগলামির। লোকে বলে অঙ্ক কষতে কষতে বীরেন্দ্র পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। ঘরের চার দেয়ালে বড় বড় অঙ্ক কষে রাখতেন কাঠকয়লা দিয়ে। শোনা যায়, একজন ইংরেজ অঙ্কবিদ সেই অঙ্কগুলি দেখে বিস্ময়ে হতবাক্‌ হয়ে যান। কিন্তু অন্য সময়ে বীরেন্দ্রের মধ্যে এই স্থিরতা ছিল না। প্রচণ্ড সন্দেহের বিষে সবাইকে জর্জরিত করে তুলতেন। জোর করে তাঁকে এক চামচ ভাত বা একটি পটল পোড়া খাওয়াতে হিমসিম খেতে হত। আর পাঁচটা সাধারণ বাড়ির মতো অনেকেই দোষ দিতেন প্রফুল্লময়ীকে। এমনি করে আরও তিন বছর কাটে কিন্তু প্রফুল্লময়ীর ভাঙা কপাল আর জোড়া লাগেনি। ধীরে ধীরে অতি অকালে ম্লান হয়ে আসে তাঁর সদাহাস্যময়ী মুখখানি।

বাড়িতে যখন 'বসন্ত-উৎসব' আর 'পুনর্বসন্তে'র মহড়া চলছে পুরোদমে, প্রফুল্লময়ীর চোখে তখন ঘন বর্ষায় শ্রাবণধারা। মাঝে মাঝে বড় বিস্ময় লাগে। কেন এমন হয়? কী করে হয়? কিন্তু ভরা-ভোগের প্রাচুর্যের মধ্যে বন্ধদুয়ার ঘরে একটি মেয়ের তিল-তিল করে শুকিয়ে যাওয়া চিরদিন কে মনে রাখে? প্রথমে দুঃখ পায়, সান্ত্বনা দেয়। তারপর ভুলে যায়। এ ঘটনা তো যে কোনও বাড়িতে ঘটে। কিন্তু ঠাকুরবাড়ির মতো আলোকপ্রাপ্ত পরিবারেও এর কোনও পরিবর্তন হল না? মহর্ষিও কি এই বিষাদ প্রতিমাটিকে কোনও ভাবে সার্থক হয়ে ওঠার পথ দেখাতে পারতেন না? অবশ্য বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে পুত্রবধূর মনে শান্তি ফিরিয়ে আনবার জন্যে তিনি বিদ্যারত্নমশাইকে নিযুক্ত করেছিলেন। এ ব্যাপারে সায় ছিল রবীন্দ্রনাথেরও। বিদ্যারত্নমশাই এক বছর ধরে তাঁকে গীতা, উপনিষদ পড়ে শুনিয়েছিলেন। প্রফুল্লময়ী সমস্ত শোক তাপের ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন অধ্যাত্ম চিন্তার মধ্যে দিয়েই। সে অবশ্য অনেক পরের কথা।

কেননা এত দুঃখের মধ্যেও প্রফুল্লময়ীর ভাগ্য মাঝে কিছুদিন প্রসন্ন হয়েছিল। না হলে অন্ধের নড়ির মতো রুগ্‌ণ সন্তান বলেন্দ্রনাথের অল্প বয়সেই এত নামডাক হবে কেন? কিছুদিন পরে টুকটুকে বউ হয়ে এলেন সুশীতলা বা সাহানা। এবার বোধহয় দুঃখ ঘুচল। প্রফুল্লময়ী আপনমনে স্বামীর পরিচর্যা করেন। ছেলে ও ছেলের বউকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেন। আবার বাদ সাধলেন বিধাতা। মাত্র ক'দিনের জ্বরবিকারে শয্যা নিলেন বলেন্দ্র। যমে-মানুষে টানাটানি চলে ক'দিন। হিতাহিত জ্ঞান হারালেন প্রফুল্লময়ী। তারপর এল সেই দুর্যোগভরা ভয়ানক রাত্রি। ঘরে-বাইরে অশ্রুর তুফান। বলেন্দ্রের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে আসছে। তার যন্ত্রণা চোখে দেখতে না পেরে বারবার বাইরে গিয়ে বসেছেন হতভাগিনী জননী। এক সময়ে রবীন্দ্রনাথ এসে বললেন, 'তুমি একবার তার কাছে যাও।' প্রফুল্লময়ী জানতেন এ ডাক আসবে। তা বলে 'এত

শীত। পুত্রের মৃত্যুশয্যার পাশে এসে দাঁড়ালেন প্রফুল্লময়ী।

'সব শেষ হইয়া গেল। তখন ভোর হইয়াছে। সূর্যদেব ধীরে ধীরে কিরণচ্ছটায় পৃথিবীকে নবীন করিয়া তুলিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় তাহার জীবনদীপ নিভিয়া গেল।'

প্রফুল্লময়ী সব আঘাত সহ্য করলেন শত দুঃখ, তেজস্বী পুত্রবধূর মুখ চেয়ে। একদিন তাঁর কথায় যে, পুত্রবিয়োগ ব্যথায় তিনি শোকে তাপে ভেঙে পড়েননি বলে বাড়ির সবাই আশ্চর্য, বুদ্ধি-বা বিবেচনা হারান। তবু ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখছেন, 'সংসারের এক কোণে, সংসারের একেবারে নজর না থাকায় শুধু তিনি টাকাকড়ি লেনদেন নিয়ে হিসাবে যে রকম পাকাপুক্ত হয়ে আছেন তাই দেখে সকলেই আশ্চর্য এবং নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে—।' কবি চিঠিটি লিখেছিলেন সম্ভবত কাকেও আলো দিন। প্রফুল্লময়ীর স্মৃতিকথা পড়ে মনে হয় লেনদেনের কাজকর্ম নিয়ে তিনি দুঃখ ভোলার চেষ্টা করছিলেন। 'সংসারে যতকিছু কর্ম তাহাই বুঝিতে সক্ষম হইবে, বরাবর এই পুত্রশোকের তীব্র জ্বালা অনুভব করিয়াছি। তাহার স্মৃতি চারিদিক হইতে আমাকে প্রতি মুহূর্তে দগ্ধ করিতে লাগিল। তাহারই বা সাজাইবার জন্য নানারকম জিনিস কিনিয়া দিয়াছিলাম, এখন মনে হইতে লাগিল তাহাকে চিতার সঙ্গে এইগুলিও ছারখার করিয়া ফেলি। কিন্তু বউটির মুখের দিকে চাহিয়া তাহা হইতে নিরস্ত হইলাম।'

একপাশেও পুত্রবধূর মৃত্যু, স্বামীর মৃত্যু, ভাইয়ের মৃত্যু, বিষয় থেকে বঞ্চিত হওয়ার অর্থাভাব প্রভৃতি নানান বিপর্যয় প্রফুল্লময়ীর জীবনে আনাগোনা করেছে। তিনি তার হিসেব রাখেননি। বৃদ্ধবয়সে স্মৃতিকথা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার পর তিনি যখন 'আমাদের কথা' বলতে বসেছেন তখন আর কারও বিরুদ্ধে তাঁর কোনও অভিযোগ নেই, নেই কোনও বঞ্চনার গ্লানি। নির্জন নিভৃতের মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করে তিনি যে শান্তি পেয়েছেন, দুঃখশোকহীন সুখের তরঙ্গে ভেসে বেড়ালে তা কোনওদিনই পেতেন না। যে স্পর্শমণি পাবার জন্যে মানুষ আকুল হয়ে ঘুরে বেড়ায়, বেদনার সিন্ধু মন্থন করে সেই অমৃতের সন্ধান প্রফুল্লময়ী যেদিন পেলেন, সেদিন তিনি বিশ্বলোকের সবকিছুর মধ্যে বলেন্দ্রকে আবার ফিরে পেলেন। শান্তিনিকেতনে শিবনারায়ণ স্বামীর কাছ থেকে পেয়েছিলেন সৎ উপদেশ ও আহুতি করার নির্দেশ। 'তিনিও বলিয়াছিলেন যে আহুতি দাও মনে শান্তি পাবে।' সেই শান্তি পেলেন তিনি। এই পাওয়াই তাঁর জীবনের চরম প্রাপ্তি। বলেছেন,

'মনে হয়, সে আঙিনায় সেই পূর্বের মতো হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়। পূর্বাকাশে ভোরের আলোতে তাহারই মুখখানি ঝলমল করে। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে সেও যেন ঘুমের অন্ধকারে আমার কোলে ঢলিয়া পড়ে। আমার বলুকে আমি হারাইয়াও হারাই নাই বরং তাহাকে আরও পাইয়াছি বলিয়া মনে হয়। এখন সে আমার বড় হইয়া অহরহ আমার সম্মুখে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আর সে অনন্তরূপে অনন্ত বাহু মেলিয়া আমার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে।'

ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরকে সার্থক করে তোলার জন্যে প্রফুল্লময়ীর এই আধ্যাত্মিক উপলব্ধিরও প্রয়োজন ছিল। নইলে মনে হতে পারে ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরিকারা নানা-কেতার পোশাক পরে, বেড়াতে বেরিয়ে, ঘোড়ায় চেপে, চুল বেঁধে আর রান্না করে বাঙালি মেয়েদের শুধু বহির্মুখী করেই তুলেছেন। কিন্তু তা তো নয়। এ বাড়িতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মহামিলন ঘটেছে। বহির্মুখী ধারার সঙ্গে মিশেছে অন্তর্মুখী সাধনার ধারা। প্রফুল্লময়ীই সর্বপ্রথম শোকসাগর মন্থন করে সেই অমৃতের সন্ধান এনে দিলেন। 'দুঃখশোক যদি জগতে না থাকিত, কেবল সুখের তরঙ্গে ভাসিয়া বেড়াইতাম, তবে কোথায় কেমনভাবে অমৃতের সন্ধান পাইবার প্রবল ইচ্ছা জাগিয়া উঠিত না বা মনের ভ্রম দূর হইত না। যে পরশমণির পরশ লাভের জন্য মানুষ পাগলের ভিখারি হইয়া শূন্যমনে আকাশ পানে চাতকের ন্যায় শূন্য দেখিতে থাকে, জীবনের কোন এক সময় সেই শুভমুহূর্ত আসে যখন সে তাহাকে পাইয়া নিজেকে ধন্য মনে করে। তাঁহারই প্রেরণায় যতটুকু সাধনা তিনি আমার এই ক্ষুদ্র শক্তির দ্বারা করাইয়া লইয়াছেন, সেই আলোকে আজি আমার বলুকে সকলের ভিতর দেখিবার সুযোগ লাভ করিয়াছি।'

কোনও কিছুই কারও জন্য থেমে থাকে না। কিন্তু ঠাকুরবাড়ির এক কোণে যখন অনুকূলমতীর জীবনে দুর্ভাগ্যের কালো ছায়া নেমে আসছে, ঠিক তখনই বাড়ির আর-এক প্রান্ত থেকে উঠেছে খুশির সানাই বাজনার সুর। ঠাকুরবাড়ির ঘরে আর-একটি ছোট মেয়ে 'সোনার পায়ের নিপুর বাজে'-বাজা চেলি পরে প্রবেশ করলেন ঠাকুরবাড়িতে। তাঁর কাঁচা পায়ের ছাপ দেখে মনে হল সেখানে বুঝি, 'গলার মোতির মালা সোনার চরণচক্র পায়ে।' বাড়ির ছোট ছেলেটির মনে হল এতদিন যে রাজার বাড়ি খুঁজে খুঁজে সে হয়রান হয়েছে, খুঁজে পায়নি, সেই বাড়িটির বুঝি খবর নিয়ে এল এই রূপকথার রাজকন্যা, তার নতুন বউঠান। কল্পনার সীমা গেল বেড়ে।

কাদম্বরী যশোরের সেই পরিচিত ব্রাহ্মণের মেয়ে নন। তিনি কলকাতারই মেয়ে। তাঁর বাবা শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির যোগাযোগ অনেকদিন থেকেই ছিল। কাদম্বরীর পিতামহ জগন্মোহনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল দ্বারকানাথের মামাতো বোন শিরোমণির। শ্যামলালের দাদা রামলালের মেয়ে ত্রৈলোক্যসুন্দরীকে বিয়ে করেছিলেন দ্বারকানাথের ভাগনে নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ির সঙ্গেও এঁদের নিবিড় যোগ ছিল। কাজেই এ বিবাহে মহর্ষির আপত্তি ছিল না। বাধ সেধেছিলেন তাঁর মেজো ছেলে সত্যেন্দ্র। তিনি তখন বিলেত থেকে ফিরে এসেছেন, চোখে নব রঙিন স্বপ্ন। ছোট ভাই জ্যোতিরিন্দ্রের বধূ রূপে তিনি মনে মনে মনোনীত করে রেখেছেন ডঃ সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তীর মেয়েকে। শিক্ষিত মেয়ের সঙ্গে ভাইয়ের বিয়ে হবে, তার বদলে কিনা বাজারসরকারের আট বছরের একটি খুকি! তার ওপর শ্যামলালের মেয়ে। জগন্মোহন যে তাঁর দুটি ছোট ছেলেকে নিয়ে দ্বারকানাথের বাড়িতেই আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি তো ছিলেন বাড়ির সন্দেশ পরীক্ষক, কোনটা খাঁটি আর কোনটা তা নয়, চেখে বলতে পারতেন। এই বাজারসরকারের পৌত্রী হবে জ্যোতির বউ? এরপর কি জ্যোতি বিলেত যাবে? যদি যায় তো ফিরে এসে কি এই ছোট মেয়েটিকে জীবনসঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করতে পারবে? শেষে নষ্ট হয়ে যাবে না তো দুটি জীবন। কিছুতেই কিছু হল না। 'একে পিরালী তায় ব্রাহ্ম' ঠাকুরবাড়ির অবস্থা তখন 'একঘরে' হওয়ার মতো, তাই জ্যোতিরিন্দ্রের জন্য যে মেয়ে পাওয়া গিয়েছে তার সঙ্গেই বিয়ে হল। বিয়ের আগে তাঁর নাম ছিল সম্ভবত মাতঙ্গিনী। ঠাকুরবাড়িতে বহু মেয়েরই পূর্বনাম বদলে দেওয়া হত। মাতঙ্গিনীও হারিয়ে গেলেন কাদম্বরীর মধ্যে। শুধু কি তাই? সত্যেন্দ্রের সমস্ত আশঙ্কা মিথ্যে করে দিয়ে কাদম্বরী ঠাকুরবাড়ির যোগ্য বধূ হয়ে উঠলেন।

তিনি এ বাড়িতে এসে তিনতলার ছাদের ওপর গড়ে তুললেন নন্দন কানন। 'জমানো হল পিপের ওপর সারি সারি লম্বা পামগাছ, আশেপাশে চামেলি, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা, করবী, দোলনচাঁপা।' এল নানারকম পাখি। দেখতে দেখতে বাড়িটার চেহারা যেন বদলে গেল। গৃহসজ্জার দিকে নববধূর প্রথম থেকেই সতর্ক দৃষ্টি ছিল। কিশোর রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধকে সবচেয়ে উঁচু তারে বেঁধে দিয়েছিলেন এই কাদম্বরী, সেই বাঁধন কোনওদিন শিথিল হয়নি।

ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলের যা কিছু দান, তার সবকিছুর সঙ্গে জড়িয়ে আছেন কাদম্বরী। অথচ খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, তিনি যখন বালিকাবধূ হয়ে ঠাকুরবাড়িতে প্রবেশ করেন তখন, প্রশান্তকুমার পাল জানিয়েছেন, সে বছরের হিসেবের খাতায় তাঁর জন্য ধারাপাত ও বর্ণপরিচয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ কেনা হয়েছিল। মাত্র কয়েক বছরে এই প্রায় অশিক্ষিত বালিকাটি ঠাকুরবাড়ির মতো বিখ্যাত পরিবারে সাহিত্যসভার কেন্দ্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। যদিও নিজে তিনি কোনও কিছুতেই অংশগ্রহণ করতেন না। শুধু অপরের প্রাণে প্রেরণার প্রদীপটিকে উজ্জীবিত করে তোলাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। আসলে আমরা যাকে বলি রোমান্টিক সৌন্দর্যবোধ, কাদম্বরীর সেটি পুরোমাত্রায় ছিল। ঠাকুরবাড়িতে এসে অনুকূল পরিবেশে হয়তো বৃদ্ধি পেয়েছিল কিন্তু এই চেতনা ছিল তাঁর মনের গভীরে। তাই বাইরে থেকে এ বাড়ির প্রাণপুরুষকে জাগিয়ে দিয়ে তিনি হয়তবা সফল হয়েছেন, আর সেটি তো সাফল্যের

কাদম্বরীকে নিয়ে এত বেশি আলোচনা হয়েছে যে, তাঁর সম্বন্ধে নতুন করে কিছু বলতে চেষ্টা করা বাহুল্যমাত্র। অবশ্য এই আলোচনা-সমালোচনার কারণ রবীন্দ্রনাথ। কিশোর রবীন্দ্রনাথের মনোগঠনে কাদম্বরীর দান অসামান্য। তাঁর অকালমৃত্যু রবীন্দ্রমানসে গভীর ছাপ রেখে যায়। একথা কবি নিজেই অসংখ্য কবিতায় ও গানের মধ্যে প্রকাশ করেছেন। সুতরাং যাঁরা তাঁদের নিয়ে অনেক কল্পনা এবং কষ্টকল্পনা করেন তাঁদের সুযোগ করে দিয়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, একথা বললে খুব ভুল বলা হবে না। কবি নিজেও জানতেন সেকথা। তাই কৌতুক করে শেষ বয়সে বলতেন, 'ভাগ্যিস নতুন বউঠান মারা গিয়েছিলেন তাই আজও তাঁকে নিয়ে কবিতা লিখছি— বেঁচে থাকলে হয়তো বিষয় নিয়ে মামলা হত।'

সত্যেন্দ্রনাথ-জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে কিছুটা গোঁড়ামির পরিচয় দিলেও জ্ঞানদানন্দিনীর প্রভাবে নবভাবের নেশায় মেতে উঠলেন। সাবেক সংস্কার ত্যাগ করে তিনি কাদম্বরীকেও ঘোড়ায় চড়া শিখিয়েছিলেন এবং গঙ্গার ধারে নির্জনে শিক্ষাপর্ব শেষ হলে কাদম্বরী প্রতিদিন স্বামীর সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যেতেন। তাঁদের দেখে অবাক বিস্ময়ে যারা কানাকানি করত, তাদের কথা প্রথমেই বলেছি। কাদম্বরীর অশ্বারোহণ বেশ আলোড়ন জাগিয়েছিল। কাদম্বরী ঠিক কোন সময় ঘোড়ায় চড়তেন সেকথা জানা যায়নি। কেউই সঠিক সময় নির্দেশ করেননি। তবে এ ব্যাপারে কাদম্বরীকে একমাত্র 'অশ্বারোহিণী বঙ্গললনা' বলা চলে না। কারণ আরও কয়েকজনের কথা আমরা শুনেছি। তাঁরা কাদম্বরীর পূর্ববর্তিনী হয়তো নন কিন্তু সমসাময়িক বা অল্প পরবর্তী যে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ইউরোপীয় শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে আধুনিকারা ঘোড়ায় চড়া শিখতেন। সাহেবদের অনুকরণ করতেন দেশি সাহেব অর্থাৎ ভারতীয় আই. সি. এস. অফিসারেরা। সত্যেন্দ্রনাথকে অনেকেই জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, তাঁর স্ত্রী ঘোড়ায় চড়তে পারেন কিনা। সত্যেন্দ্রের পরেই যে তিনজন বাঙালি সিভিলিয়ান অফিসার হয়েছিলেন তাঁরা— রমেশচন্দ্র দত্ত, বিহারীলাল গুপ্ত ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আচার-বিচার চালচলনে পুরো সাহেব হয়ে গিয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের স্ত্রী শ্রীহট্টে ঘোড়ায় চড়ে বিকেলে হাওয়া খেতে বেরোতেন। লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের মেয়ে রমলা এবং কুচবিহারের মহারানি সুনীতিদেবীর মেয়েরাও ঘোড়ায় চড়তে জানতেন। হেমেন্দ্রনাথের মেয়েরাও কেউ কেউ এ ব্যাপারে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তবে এঁরা এসেছেন অনেক পরে। সেকালের আধুনিকা মেয়েরা অনেক ব্যাপারেই অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। এঁদের সবচেয়ে আধুনিকতা ছিল স্বামী বা সঙ্গীনির্বাচনের অভিনবত্বে। ঠাকুরবাড়ির মেয়ে-বউরা ঠিক এই ধরনের মানসিকতার পরিচয় দিতে পারেননি। তাঁরা সনাতন ধারাটিতেই এনেছেন নতুন কালের ছন্দ। বল্গাহীন উন্মত্ত মুক্তির স্রোতে হয়তো উন্মাদনা আছে, কিন্তু ঠাকুরবাড়ির কোনও মেয়েই এমন হালকা হাওয়ার খেয়ালি নেশায় মেতে ওঠেননি। তাই বাঙালি নারীসমাজের ওপর তাঁদের মোহরের ছাপটাই সবচেয়ে গভীর।

কাদম্বরী শুধু ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতেই বেরিয়েছিলেন তা নয়, সাধারণী নারীদের চোখে এঁকে দিয়েছিলেন এক দুঃসহ স্পর্ধার মায়াঞ্জন, অনেকের বুকে তিনি জাগিয়েছিলেন দুঃসাহস। মেয়েরা দেখল হালকা-হাওয়ায় উড়ে আসা বুদ্‌বুদের ফেনার মতো পশ্চিমিধারায় মানুষ হওয়া মেয়ে নয়, পথে ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন তাদেরই মতো এক গৃহবধূ। বাস্তবিকই ঘরের কাজে কাদম্বরীর সুতীব্র আগ্রহ ছিল। সুপুরি কাটতেন নিয়মিত। প্রতিদিনের তরকারি কাটার আসরে তিনি যেমন উপস্থিত থাকতেন, তেমনি দেখাশোনা করতেন বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের। কারও জ্বর হলে আর রক্ষে নেই, কাদম্বরী গিয়ে বসতেন তার শিয়রে। সদ্য মাতৃহারা বালক দেবরটিকেও তিনি পরম স্নেহে কাছে টেনে নিয়েছিলেন, অথচ কতই বা বয়স তাঁর? রবীন্দ্রনাথের চেয়ে মাত্র এক বছরের বড়।

কাদম্বরীর প্রধান পরিচয়, তিনি অসাধারণ সাহিত্য-প্রেমিক ছিলেন। বাংলা বই তিনি পড়তেন

শুধু সময় কাটাবার জন্যে নয়, সত্যিই উপভোগ করতেন। পড়তেন দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণ', বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ', দুপুরবেলায় রবীন্দ্রনাথও পড়ে শোনাতেন তাঁকে। তালপাতা নিয়ে হাওয়া করতেন কাদম্বরী, কারণ আপন মনে পড়ার চেয়ে শুনতে বেশি ভাল লাগত তাঁর। 'ভারতী' পত্রিকা নিয়েও তাঁর ভাবনা ছিল। 'ভারতী'র ছাপার হরফে তাঁর নাম নেই সত্যি কিন্তু তিনিই ছিলেন ওই পত্রিকার প্রাণ। সেকথা বোঝা গিয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পরে। এ সময়ে বাড়ির ব্যবস্থার অদলবদল হয়েছিল কিছুটা। মহর্ষি অন্যত্র বাস করতেন। বাড়ির তিনতলার অর্ধেক পেলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। অন্দরমহলের দরজা আগের মতো অবরোধ সৃষ্টি করে নারী ও পুরুষের জগৎকে পৃথক করল না। তেতলার খোলা ছাদে শুধু বাগানই হল না, নিয়মিত বসত সাহিত্যপাঠের আসর। আসরে যোগ দিতেন বাড়ির অনেকে, বাইরে থেকে আসতেন অক্ষয় চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রী শরৎকুমারী 'লাহোরিণী', জানকীনাথও থাকতেন সেখানে, আর মাঝে মাঝে আসতেন কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও স্বর্ণকুমারী ছিলেন এ সভার স্থায়ী সভ্য। কাদম্বরী বিহারীলালের কবিতা পড়তে খুব ভালবাসতেন ও মাঝে মাঝে তাঁকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন। শুধু তাই নয়, নিজের হাতে একটা আসন বুনে উপহার দিয়েছিলেন। আসনের ওপর, প্রশস্থলে কার্পেটের অক্ষরে লেখা ছিল 'সারদামঙ্গল' কাব্যেরই কয়েকটা লাইন। কবি সে উত্তর দেবার জন্যে আর-একটা কাব্য যখন রচনা করেন, তখন কাদম্বরী ইহলোকে নেই। বিহারীলাল তাঁর উপহারকে স্মরণ করে কাব্যের নাম দিয়েছিলেন 'সাধের আসন'। আসনদাত্রী দেবীর উদ্দেশে লিখেছিলেন :

'তোমার সে আসনখানি
আদরে আদরে আনি,
রেখেছি যতন করে চিরদিন রাখিব;
এ জীবনে আমি আর
তোমার সে সদাচার,
সেই স্নেহমাখা মুখ পাশরিতে নারিব।'

পূর্বোক্ত বাগানে সন্ধ্যাবেলা বসত পরিপাটি গানের আসর। মাদুরের ওপর তাকিয়া, রুপোর রেকাবে ভিজে রুমালের ওপর বেলফুলের গোড়ের মালা, এক গ্লাস বরফজল, বাটা ভরতি ছাঁচি পান সাজানো থাকত। কাদম্বরী গা ধুয়ে চুল বেঁধে তৈরি হয়ে বসতেন সেখানে, জ্যোতিরিন্দ্র বাজাতেন বেহালা, রবীন্দ্র ধরতেন চড়া সুরে গান, সে গান সূর্য ডোবা আকাশে ছাদে ছাদে ছড়িয়ে যেত। 'হু হু করে দক্ষিণে বাতাস উঠত দূর সমুদ্র থেকে, তারায় তারায় যেত আকাশ ভরে।' কিশোর রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক সৌন্দর্য-চেতনাকে জাগাবার জন্যে এই পরিবেশ, এই সৌন্দর্যদৃষ্টি ও কল্পনার একান্ত প্রয়োজন ছিল।

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর নতুন বউঠান কাদম্বরীকে নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। মাঝে মাঝে অনুচিত সন্দেহ এসে যে কাঁটা বেঁধায়নি, তাও নয়। বিশেষত, রবীন্দ্রনাথের বিবাহের কয়েকমাসের মধ্যে কাদম্বরীর মৃত্যু সংশয় সৃষ্টি করেছিল। রবীন্দ্রমানস গঠনে এই অসামান্য নারীর দান চিরস্মরণীয়। তাঁর কবি হয়ে ওঠার কথা পড়ে মনে হয় তাঁর আন্তরিক চেষ্টার মূলে ছিলেন কাদম্বরী। বউদিদির চোখে নিজেকে যত দামি করে তোলার চেষ্টা চলছিল, কাদম্বরী মুখ টিপে হেসে ততই অগ্রাহ্য করে গেছেন দেবরটিকে :

'রবি সবচেয়ে কালো, দেখতে একেবারেই ভালো নয়, গলা যেন কী রকম। ও কোনোদিন গাইতে পারবে না, ওর চেয়ে সত্য ভালো গায়।'

বলতেন :

'কোনোকালে বিহারী চক্রবর্তীর মতো লিখতে পারবে না।' রবীন্দ্রনাথের তখন শুধুই মনে হয় 'কী করে এমন হব যে আর কোনও দোষ তিনি খুঁজে পাবেন না।' বুঝতেন না, সেই সাধনাই করছেন কাদম্বরী, যাতে কেউ কোনওদিন রবির দোষ খুঁজে না পায়। যখন একথাটা বোঝার মতো করে বুঝলেন তখন কাদম্বরী হারিয়ে গেছেন চির অন্ধকারে, প্রতিভার প্রদীপে তেল-সলতে জোগানো সারা, আলো জ্বালার কাজ শেষ। কবির কথায় বারবার এসেছে কাদম্বরীর কথা, 'খুব ভালবাসতুম তাঁকে। তিনিও আমায় খুব ভালবাসতেন। এই ভালবাসায় নতুন বউঠান বাঙালি মেয়েদের সঙ্গে আমার প্রাণের তার বেঁধে দিয়ে গেছেন।' তাই তো সারাজীবন ধরে চলে তাঁর অনুসন্ধান :

'নয়ন সম্মুখে তুমি নাই
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।'

আমরা রবীন্দ্রকাব্য আলোচনায় যাব না, তবে তাঁর বহু কবিতায়, বহু গানে মিশে রয়েছেন কাদম্বরী; ছবিতে ধরা পড়েছে তাঁর চোখের আভাস। সব মিলে কাদম্বরী আজ আমাদের কাছে বাস্তবে-কল্পনায় মেশা একটা অপরূপ চরিত্র হয়ে আছেন। কবি নারীকে বলেছেন, 'অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা'—কাদম্বরীও তাই। রোমান্টিক স্বপ্ন-সঞ্চারিণী নতুন বউঠানের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছেন মানবী কাদম্বরী।

ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে কাদম্বরীর আর-একটি ভূমিকাও স্মরণীয়। তিনি ছিলেন সুঅভিনেত্রী এবং সুগায়িকা। নাট্যরসিক জ্যোতিরিন্দ্রের মন আরও উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল গুণবতী স্ত্রীকে পেয়ে। বাইরে জোড়াসাঁকো-থিয়েটার বন্ধ হয়ে গেলে তিনি নিজেই লিখতে শুরু করলেন নাটক-প্রহসন-গীতিনাট্য, অভিনয়ের ব্যবস্থাও হল। একেবারে ঘরোয়া পরিবেশে, বাড়ির উঠোনে। বাড়ির মধ্যে অভিনয়ে মেয়েদের যোগ দিতে বাধা কী? কাদম্বরীকে কেউ বাধা দিলেন না। তিনি এসে দাঁড়ালেন পাদপ্রদীপের আলোয়। প্রথম অভিনয় স্বর্ণকুমারীর 'বসন্ত-উৎসব', না কি জ্যোতিরিন্দ্রের 'অলীকবাবু'? প্রথমে যার নাম ছিল 'এমন কর্ম আর করব না'। রচনার সময় হিসেবে 'এমন কর্ম আর করব না' পূর্ববর্তী, সুতরাং 'বসন্ত-উৎসবে'র চেয়ে তার দাবি বেশি। যদি ধরে নেওয়া যায় এ প্রহসন লেখার পরই অভিনয়ের ব্যবস্থা হয় এবং রবীন্দ্রনাথ নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, তা হলে প্রহসনটি অভিনীত হয়েছে রবীন্দ্রের প্রথম ইউরোপযাত্রার আগে, এবং এটাই ছিল কাদম্বরীর প্রথম অভিনয়।

প্রথম বা দ্বিতীয় যাই হোক না কেন 'এমন কর্ম আর করব না' মঞ্চসফল নাটক। এই নাটকে বাড়ির অনেকেই সানন্দে যোগ দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অলীকবাবু, দ্বিজেন্দ্রনাথ সত্যসন্ধ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চীনেম্যান, অলীকের বন্ধু অরুণেন্দ্রনাথ, গদাধর শরৎকুমারীর স্বামী যদুনাথ মুখোপাধ্যায়। পিসনি বা প্রসন্নদাসীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন মহর্ষির ছোট মেয়ে বর্ণকুমারী।

রবীন্দ্রনাথের ছোট দিদি বর্ণকুমারী সম্বন্ধে আমরা খুব কম জানি। অথচ তিনি রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরেও অনেকদিন জীবিত ছিলেন। শিল্প বা সাহিত্যের দিকে নজর দিতে না পারলেও বর্ণকুমারী ভাল অভিনয়ের নজির সৃষ্টি করে গেছেন প্রসন্ন চরিত্রাভিনয়ে। বালিকা ইন্দিরার মনে সে অভিনয় দাগ কাটে, তিনি প্রসন্ন সেজে দাসীদের অতি স্বাভাবিক আচরণ অভিনয় করে দেখালেন একদিন। অন্যান্য বড় নাটকে তাঁকে অংশগ্রহণ করতে দেখা না গেলেও অভিনয়ের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল। বহুবার নাটকে রিহার্সালে তিনি উপদেষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাঁর নিজের অভিনয়ের কথা বড় একটা শোনা যায়নি। বর্ণকুমারীর বিয়ে হয়েছিল কবি-সাহিত্যিক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ছোট ভাই সতীশচন্দ্রের সঙ্গে। চিকিৎসক হিসেবে

তিনি দেশ-বিদেশে খ্যাতি লাভ করেন। কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের (আর. জি. কর) অন্যতম প্রতিষ্ঠারূপে তিনি সর্বজন-পরিচিত। জার্মান ভাষাতেও তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল, দুরারোগ্য ক্যানসারে তাঁর অকালমৃত্যু হয়।

স্বর্ণকুমারী শরৎকুমারীর মতোই অতিমাত্রায় সাংসারিক ছিলেন। খুব ভাল রাঁধতে পারতেন, সেলাই করতেন, আবার গানও জানতেন। ভালবাসতেন উপাসনা সেরে দেবেন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীত গাইতে। বঙ্কিম সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক ছিলেন। কিছু কিছু লিখেছেনও কিন্তু লজ্জায় সংকোচে নিজের নামে প্রকাশ করতে পারেননি। তাই আজ পুরনো 'ভারতী'র পাতা থেকে তাঁর বেনামি লেখাগুলো খুঁজে বার করা খুবই কঠিন। খুব বৃদ্ধ বয়সেও ভাইফোঁটার দিন জোড়াসাঁকোয় এসে কবিকে ফোঁটা দিয়ে যেতেন স্বর্ণকুমারী। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু পর্যন্ত তাঁদের যোগাযোগ অটুট ছিল।

আবার ফিরে আসি নাটকের কথায়। 'এমন কর্ম আর করব না'-র সবচেয়ে দুরূহ ভূমিকাটি হচ্ছে হেমাঙ্গিনীর। বঙ্কিম-উপন্যাস পড়া উনিশ শতকের রোমান্টিক নায়িকা হেমাঙ্গিনী। আবেগগর্ভ আদিরসকে পরিহাসতরল হাস্যরসে পরিণত করে আজও সে অমর হয়ে আছে। অনেকেই মনে করেন, এই ভূমিকাভিনেত্রী ছিলেন কাদম্বরী। অথচ ইন্দিরার স্মৃতিতে 'অলীকবাবু'র যে অভিনয়টি স্মরণীয় হয়ে আছে, সেটিতে হেমাঙ্গিনী সেজেছিলেন অক্ষয় চৌধুরীর স্ত্রী শরৎকুমারী। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও ইন্দিরাকে অনুসরণ করে শরৎকুমারীকেই হেমাঙ্গিনীর ভূমিকাভিনেত্রী বলেছেন। অপরদিকে সজনীকান্ত দাস সরাসরি কবিকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'হে' কে? প্রশ্ন করার কারণ, কবি 'ভগ্নহৃদয়' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার সময় সেটি উৎসর্গ করেন 'শ্রীমতী হে—'কে। কবি সজনীকান্তকে পালটা প্রশ্ন করেন, 'তোমার কি মনে হয়?' সজনীকান্ত বলেছিলেন, 'হেমাঙ্গিনী। 'অলীকবাবু'তে আপনি অলীক ও কাদম্বরীদেবী হেমাঙ্গিনী সাজিয়াছিলেন। সেই নামের আড়ালের সুযোগ আপনি গ্রহণ করিয়াছিলেন।'

কবি স্বীকার করেন, 'ইহাই সত্য অন্য সব অনুমান মিথ্যা।'

এই 'শ্রীমতী হে' নিয়েও কম সংশয় নেই। ইন্দিরা মনে করেন 'হে'র পুরো নাম হেকেটি, গ্রিক পুরাণের ত্রিমুণ্ড দেবী, সংক্ষেপে কাদম্বরীর ডাকনাম। তবে ইন্দিরা দেখেননি বলেই যে কাদম্বরী হেমাঙ্গিনীর ভূমিকায় কখনও অভিনয় করেননি তা মনে হয় না। ১৮৭৭ সালে যদি প্রথম অভিনয় হয়ে থাকে তখন ইন্দিরা এদেশে ছিলেন না, পরেও তিনি যে সব সময় ঠাকুরবাড়িতে থাকতেন তা নয়। ঘরোয়া অভিনয়ে আমরা জ্ঞানদানন্দিনীকেও অভিনয় করতে দেখিনি। 'অলীকবাবু'র অভিনয় পরেও অনেকবার হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রযোজনায় পরবর্তীকালের অভিনয়ে কবি গল্পটিকে ঈষৎ বদলে হেমাঙ্গিনীকে সারাক্ষণ নেপথ্যে রেখেছিলেন। অবন ঠাকুর কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, 'তখন মেয়েই বা কই অ্যাকটিং করবার।' অসম্ভব নয়। তবু এক একবার মনে হয় সত্যিই কি শুধু অভিনেত্রীর অভাব? সে অভাব কখনও পূরণ হয়নি? না, কাদম্বরীর সমকক্ষ মনে হয়নি কাউকে? যাক, অলীক কল্পনা করে তো লাভ নেই।

হেমাঙ্গিনীর ভূমিকা নিয়ে সন্দেহ থাকলেও 'বসন্ত-উৎসব' ও 'মানময়ী'তে কাদম্বরীর ভূমিকা স্পষ্ট। এ দুটি অভিনয়ে কাদম্বরী শুধু ভাল অভিনয়ই করেননি, ভাল গানও গেয়েছিলেন। অবশ্য সংগীতে কাদম্বরীর অধিকার ছিল। বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ জগন্মোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের পৌত্রী তিনি, গান তাঁর রক্তে। তিনি আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনতলার ঘরে শুধু পিয়ানো আসেনি, জ্যোতিরিন্দ্র ও রবীন্দ্রের অনুশীলনও শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাঁর 'নন্দনকাননে'র সান্ধ্য-সভাতেও বসত গানের আসর। এসব দেখে মনে হয় অভিনয়, গান, সাহিত্য নিয়ে কাদম্বরী সবাইকে একেবারে মাতিয়ে রেখেছিলেন। 'ভারতী' পত্রিকার কথাই ধরা যাক না। দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পাদক, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দেখাশোনা করতেন, রবীন্দ্রনাথ লিখতেন। কাদম্বরীর কাজ কী ছিল? শরৎকুমারীর ভাষায়, তিনি

ছিলেন 'ফুলের তোড়ার বাঁধন'। সবাইকে একসঙ্গে তিনিই বেঁধে রেখেছিলেন, সবার অলক্ষ্যে। বাঁধন যেদিন ছিঁড়ল সেদিন, শুধু সেদিনই বোঝা গেল কাদম্বরী কী ছিলেন।

নিজের হাতে জীবনদীপটি নিভিয়ে দিয়ে অন্তরালে চলে না গেলে তিনি হয়তো ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরের রসের উৎসটিকে আরও কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারতেন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই জোড়াসাঁকোর বাড়ি থেকে সোনালি দিনগুলি শীতের পাখির মতো বিদায় নিতে শুরু করল। এরপরে ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের সম্মিলিত ভূমিকার চেয়ে একক ভূমিকাই বড় হয়ে উঠেছে। কিন্তু কেন চলে গেলেন কাদম্বরী, এ প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর আজও পাওয়া যায়নি।

রবীন্দ্রনাথের বিবাহের মাত্র কয়েক মাস পরেই কাদম্বরীর মৃত্যু হয়। ঘটনাটি আকস্মিক। তবে একেবারে অভাবনীয় নয় হয়তো। পূর্বেও তিনি একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। এই সুরসিকা, রুচিসম্পন্না, প্রতিভাময়ী নারীর জীবনেও শান্তির অভাব ছিল। রবীন্দ্রজীবনীকারের ভাষায় কাদম্বরী ছিলেন 'যেমন অভিমানিনী, তেমনি সেন্টিমেন্টাল এবং আরও বলিব ইনট্রোভার্ট, স্কিজোফ্রেনিক।' তাঁর মতের সঙ্গে সবাই একমত না হলেও কাদম্বরীকে অভিমানিনী আরও অনেকেই বলেছেন। তাঁর নিঃসন্তান-জীবনের বেদনা অভিমানকে আরও তীব্র করে তুলেছিল। তাই প্রাণের গভীরে লুকিয়ে থাকা দুঃখের ফল্গুধারা হঠাৎ এক আঘাতে নিজেকে হারিয়ে বাঁধভাঙা বন্যার মতো নেমে এল দু কূল ছাপিয়ে।

পরবর্তীকালে এ নিয়ে জল্পনার শেষ নেই। অনেকেই অনেক রকম গল্প রচনা করে ফেলেছেন। তার মধ্যে সবচেয়ে প্রচলিত কাহিনীটি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। বিশেষ করে তাঁর বিবাহ এবং কাদম্বরীর মৃত্যুর মধ্যে একটি যোগসূত্র কল্পনা করে নেওয়া যখন সত্যিই খুব কষ্টকর নয়। কারণ রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীকে কাদম্বরী কীভাবে গ্রহণ করেছিলেন তা কেউ জানে না। কাদম্বরীর সঙ্গে মৃণালিনীর কথাবার্তা বা দেখা-সাক্ষাতের কোনও বিবরণ পাওয়া যায়নি। ভবতারিণীকে মৃণালিনী করে তোলার ভার কাদম্বরী না পেয়ে নীপময়ী মতান্তরে জ্ঞানদানন্দিনী পেলেন কেন, তাও অজানা। রবীন্দ্রনাথের বিবাহের খুঁটিনাটি বিবরণ পাওয়া গিয়েছে হেমলতার প্রবন্ধে, সেখানেও কাদম্বরী আশ্চর্যভাবে অনুপস্থিত। মেয়ে দেখার সময় যাঁর এত উৎসাহ ছিল, তিনি চুপ করে সরে গেলেন কেন? রবীন্দ্রনাথের জন্যে পাত্রী নির্বাচনের সময় কি তাঁর সঙ্গে মতান্তর হয়েছিল অন্য কারও? প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এ জন্যই বোধহয় একবার মন্তব্য করেন 'কাদম্বরীর আকস্মিক মৃত্যুর কারণ হচ্ছে, মহিলাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের পরিণাম'। তবে এই 'মহিলা' কবিপত্নী নন, তিনি তখন বালিকামাত্র। সম্ভবত জ্ঞানদানন্দিনীর সঙ্গেই তাঁর মতান্তর হয়। মনের গভীরে এর হয়তো অন্য কারণ ছিল। তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটল একটা সামান্য ঘটনা উপলক্ষ করে। তাই সমসাময়িক কালে কেউ কেউ এ ঘটনার জন্যে দায়ী করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে।

কাদম্বরীর মৃত্যুসংক্রান্ত যেসব খবর পাওয়া গিয়েছে তাতে নিশ্চিত উত্তর কিছু পাওয়া যায় না। ইন্দিরা আত্মহত্যার কারণ সম্পর্কে লিখেছেন, 'জ্যোতিকাকামশাই প্রায়ই বাড়ি ফিরতেন না। তাঁর প্রধান আড্ডা ছিল বির্জিতলাওয়ে আমাদের বাড়ি। আমার মা জ্ঞানদানন্দিনীর সঙ্গে ওঁর খুব ভাব ছিল।' এরই মধ্যে একদিন অভিমানিনী কাদম্বরী স্বামীকে বলেছিলেন তাড়াতাড়ি ফিরতে। গানে গানে আড্ডায় আড্ডায় সেদিন এত দেরি হয়ে গেল যে জ্যোতিরিন্দ্রের বাড়ি ফেরাই হল না। প্রবল অভিমানে কাদম্বরী ধ্বংসের পথই বেছে নিলেন। বাড়িতে কাপড় নিয়ে আসত বিশু বা বিশ্বেশ্বরী তাঁতিনী। সেই বিশুকে দিয়ে লুকিয়ে আফিম আনিয়ে, সেই আফিম খেয়েই কাদম্বরী মর্তজীবনের মায়া কাটালেন।

আবার স্বর্ণকুমারীকে প্রশ্ন করে অমল হোম শুনেছিলেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জোব্বার পকেট থেকে কাদম্বরী পেয়েছিলেন তখনকার দিনের একজন বিখ্যাত অভিনেত্রীর মতান্তরে নটী বিনোদিনীর কয়েকখানি চিঠি। চিঠিগুলি উভয়ের অন্তরঙ্গতার পরিচায়ক। এই চিঠিগুলি পেয়ে

কাদম্বরী কয়েকদিন বিমনা হয়ে কাটান, তারপর আত্মহত্যা করেন। মৃত্যুর আগে তিনি লিখে গিয়েছিলেন যে, ওই চিঠিগুলিই তাঁর আত্মহত্যার কারণ। মহর্ষির আদেশে সেসব চিঠি ও তাঁর স্বীকারোক্তি নষ্ট করে ফেলা হয়। কাজী আবদুল ওদুদ লিখেছেন যে, তিনি ঠাকুরবাড়ির একজন খ্যাতনামা ব্যক্তির মুখে শুনেছেন, 'যে মহিলার সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গতা জন্মেছিল তিনি অভিনেত্রী নন, তবে সেই অন্তরঙ্গতার জন্য কাদম্বরী নাকি আগেও একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন।'

সমসাময়িক কালের অন্যান্য কবিদের কোনও কোনও লেখা থেকে মনে হয় তাঁরাও জ্যোতিরিন্দ্রনাথকেই দায়ী করেছেন। নিঃসন্তান স্ত্রীর সঙ্গহীন-শূন্যতা ভরিয়ে তোলার জন্যে স্বামীর যতটা মনোযোগী হওয়া উচিত, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তা ছিলেন না। হয়তো এ ব্যাপারে তিনি খানিকটা উদাসীন ছিলেন। নিত্য নতুন সৃষ্টির আনন্দে মেতে ওঠা, হঠাৎ একেকটা খেয়ালের বশবর্তী হয়ে চলা, সত্যেন্দ্র-জ্ঞানদানন্দিনীর সান্নিধ্য, তাঁদের পুত্র-কন্যার সাহচর্য তাঁকে কাদম্বরীর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে এনেছিল। তৎকালীন রুচি ও রীতির পরিপ্রেক্ষিতে জ্যোতিরিন্দ্রর পক্ষে থিয়েটারের অভিনেত্রী বা নটীদের সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনাও বিচিত্র নয়। সেকালে একান্নবর্তী সংসারে বন্ধ্যা নারী ছিলেন উপেক্ষার পাত্রী। তাঁর বিশেষ আদর ছিল না। কাদম্বরী ঠাকুরবাড়ির বৃহৎ সংসারেও তাঁর যথার্থ স্থানটি কোনওদিন পাননি। তিনি শিশুদের খুব ভালবাসতেন বলে জানকীনাথ-স্বর্ণকুমারীর ছোট মেয়ে ঊর্মিলাকে নিজের কাছে রেখে সন্তানস্নেহে মানুষ করছিলেন। সেখানেই সে বড় হচ্ছিল তাঁর মেয়ে হয়ে। একটু বড় হয়ে স্কুলে যাওয়ার দু মাস পরে তেতলার সিঁড়ি দিয়ে একা নামতে গিয়ে সে পড়ে যায় এবং মারা যায়। এই ঘটনাটি কাদম্বরীর কোমল মনে যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করেছিল। যাই হোক, সযত্ন স্বামীসেবা, গৃহ পরিচর্যা, সাহিত্যশিল্প নিয়ে তিনি নিজেকে ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করলেও, শেষরক্ষা করতে পারেননি। সত্যেন্দ্র জ্ঞানদানন্দিনীর কলকাতায় প্রত্যাবর্তন ও তাঁদের পরিবারের আধুনিক পরিবেশ জ্যোতিরিন্দ্র ও রবীন্দ্রকে আকৃষ্ট করায় এবং রবীন্দ্রনাথের বিবাহ ঘটায় তাঁর নিঃসঙ্গতা প্রচণ্ড বৃদ্ধি পায়। সেই অবস্থায় অভিমানিনী কাদম্বরী মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন ও আত্মহননের পথ বেছে নেন। এর পটভূমিতে ইন্দিরা-কথিত বা স্বর্ণকুমারী-কথিত যে কোনও একটি বা দুটি কাহিনীই থাকতে পারে, তবে তৃতীয় কোনও অনুমানের অবকাশ বোধহয় নেই।

এই ঘটনার কিছু আগে এবং পরে লেখা কয়েকটা কবিতার প্রতি এজন্যেই সমালোচকদের দৃষ্টি পড়েছিল। প্রথম কবিতাটির কবি অক্ষয় চৌধুরী। জগদীশ ভট্টাচার্যের মতে, অন্যাসক্ত স্বামীর প্রতি নারীর অভিমানই 'অভিমানিনী নির্ঝরিণী' এবং এই নির্ঝরিণী আর কেউ নন, জ্যোতিরিন্দ্র-পত্নী কাদম্বরী।

'রাখিতে তাহার মন, প্রতিক্ষণে সযতন
হাসে হাসি কাঁদে কাঁদি—মন রেখে যাই,
মরমে মরমে ঢাকি তাহারি সম্মান রাখি,
নিজের নিজস্ব ভুলে তারেই ধেয়াই,
কিন্তু সে ত আমা পানে ফিরেও না চায়।'

প্রভৃতি অংশ পড়ে অবশ্য সেবাপরায়ণা গুণবতী কাদম্বরীর কথাই মনে পড়ে। অপরদিকে রবীন্দ্রজীবনীকার 'তারকার আত্মহত্যা'য় দেখেছেন কাদম্বরীর প্রথম আত্মহননের চেষ্টার প্রতিচ্ছবি। কিশোর রবীন্দ্রনাথ জানতেন তাঁর নতুন বউঠানের মনোবেদনার কথা।

'যদি কেহ শুধাইত
আমি জানি কী যে সে কহিত
যতদিন বেঁচে ছিল
আমি জানি কী তারে দহিত।'...

তাই জ্যোতির্ময় জগৎ থেকে আঁধার জগতে তারকার স্বেচ্ছা নির্বাসন। কাদম্বরীর মৃত্যুর পরেও 'পুষ্পাঞ্জলি'তে কবি লিখেছেন, 'যাহারা ভাল, যাহারা ভালবাসিতে পারে, যাহাদের হৃদয় আছে, সংসারে তাহাদের কিসের সুখ! কিছু না। কিছু না। তাহারা যন্ত্রের মতো, বীণার মতো,— তাহাদের প্রত্যেক শিরা সংসারের প্রতি আঘাতে বাজিয়া উঠিতেছে। সে গান সকলেই শুনে, শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হয়—তাহাদের বিলাপধ্বনি রাগিণী হইয়া উঠে, শুনিয়া কেহ নিঃশ্বাস ফেলে না।' বেশ বোঝা যায় এই বীণাটি আর কেউ নন, কাদম্বরী। কারণ তার পরেই আছে, 'পাষণ্ড নরাধম পাষাণ হৃদয় যে ইচ্ছা সেই ঝন্‌ঝন্ করিয়া চলিয়া যায়, আর মনে রাখে না। এ বীণাটিকে তাহারা দেবতার অনুগ্রহ বলিয়া মনে করে না—তাহারা আপনাকেই প্রভু বলিয়া জানে—এই জন্যে কখনও বা উপহাস করিয়া, কখনও বা অনাবশ্যক জ্ঞান করিয়া, এই সুমধুর সুকোমল পবিত্রতার উপরে তাহাদের কঠিন চরণের আঘাত করে—'

আরও একজন কবি জ্যোতিরিন্দ্রকে শালীনতার আড়াল না রেখেই তীব্র ভর্ৎসনা করেছিলেন। বিহারীলাল তাঁর 'সাধের আসনে' পতিব্রতা সতীকে বললেন 'আর এস না ধরায়' কারণ:

'পুরুষ কিম্ভুতমতি চেনে না তোমায়।
মন প্রাণ যৌবন—
কি দিয়া পাইবে মন।
পশুর মতন এরা নিতুই নতুন চায়'

সমসাময়িক ব্যক্তিদের সাক্ষ্য এবং কবিদের রচনা থেকে বোঝা যায়, কাদম্বরীর মৃত্যুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিবাহকে জড়িয়ে যে অনুচিত কল্পনা মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়, তার কোনও ভিত্তি নেই।

এই মৃত্যুকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কীভাবে গ্রহণ করেছিলেন? এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। কাদম্বরীর মৃত্যুর এক মাস পরেই তিনি জ্ঞানদানন্দিনী, সুরেন্দ্র, ইন্দিরা ও রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সরোজিনী জাহাজে চেপে বেড়াতে গিয়েছিলেন। তাই আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় 'তারকার আত্মহত্যা'র কিশোর কবির অনুমানই বোধহয় ঠিক, 'যেমন আছিল আগে তেমনি রয়েছে জ্যোতি'। কিন্তু প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে আমরা বোধহয় শুধু একটি কথাই বলতে পারি, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চারিত্রিক দুর্বলতার কোনও সুনিশ্চিত প্রমাণ এখনও কেউ দিতে পারেননি। মহর্ষি তাঁর পুত্রকন্যাদের নৈতিক চরিত্র গঠনে সচেষ্ট ছিলেন এবং তাঁর পুত্রকন্যারাও সে আদর্শ অনুসরণ করেছিলেন। যদিও সে সময়কার সমাজে বাবুদের জীবনে নৈতিকতার বালাই ছিল না বললেই হয়। কিন্তু আর পাঁচটা বাড়ির চেয়ে জোড়াসাঁকোর বাড়িটা ছিল আলাদা এবং অন্য ধরনের। কাদম্বরীর জীবনাহুতি জ্যোতিরিন্দ্রকে একেবারে নিঃস্ব করে দিয়েছিল। তাই শুধু বাণিজ্যেই তাঁকে পর্যুদস্ত হতে হল তা নয়, তাঁকে পরাস্ত হতে হল জীবনের কাছেও। না হলে তাঁর মতো প্রতিভাবান নাট্যকার কাদম্বরীর মৃত্যুর পর সব ছেড়ে দিয়ে শুধু অনুবাদ নিয়ে পড়ে থাকবেন কেন? জমাটি আড্ডার মজলিশ ছেড়ে কেন চলে যাবেন দূরে? এ যে নিজেকেই ভুলে থাকা। কাদম্বরীর মৃত্যুকালে তাঁর বয়স মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর, কিন্তু তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেননি। কেন করেননি, একবার সে প্রশ্ন করা হলে তিনি শুধু বলেছিলেন, 'তাঁকে ভালবাসি।'

যুক্তিবাদীরা হয়তো বলবেন, অনুশোচনা। হয়তো সত্যিই তাই। নিজেকে সমাজ-সংসার

থেকে স্বেচ্ছানির্বাসন দিয়ে তিনি তিল তিল করে শাস্তি দিয়েছেন নিজেকেই। শাস্তি দিয়েছেন কাদম্বরীর প্রতি অমনোযোগী উদাসীন কর্তব্যচ্যুত স্বামীকে। দুঃখের বিষয়, আমরা এ বিষয়ে জ্যোতিরিন্দ্রের মনোভাবের কথা একেবারেই জানতে পারি না। শোনা যায় কিছুদিনের জন্যে মানসিক ভারসাম্যও হারিয়েছিলেন তিনি। 'আমার জীবনস্মৃতি' কিংবা শেষ বয়সে লেখা ডায়রি, কোথাও জ্যোতিরিন্দ্রের মনের কথা ধরা নেই। কোথাও নেই কাদম্বরীর কথা। 'জীবনস্মৃতি'তেও দু-একটি সংবাদ ছাড়া কাদম্বরী সর্বত্রই আশ্চর্যভাবে অনুপস্থিত। অথচ রাঁচিতে তাঁর নিজের বাড়ি শান্তিধামের যে নিরাভরণ ঘরখানিতে তিনি থাকতেন তার দেয়ালে ছিল একটিমাত্র ছবি, তাঁর নিজের হাতে আঁকা কাদম্বরীর পেনসিল স্কেচ। অতি সম্প্রতি কেউ কেউ মনে করেন ইন্দিরা যে লিখেছিলেন 'নতুন কাকিমার একটি নিজ হাতে আঁকা পেন্সিলের ছবিই সেই ঘরের একমাত্র সজ্জা ছিল'—তাতে স্পষ্ট হয় না ছবিটা কার আঁকা। ঠাকুরবাড়ির অনেক মেয়ে কিংবা বউ ছবি আঁকতেন, ছবিটা কাদম্বরীর আঁকাও হতে পারে। হয়তো তিনিও স্বামীর কাছে একটু-আধটু ছবি আঁকতে শিখেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্র সে ছবিটিই ঘরের দেয়ালে টাঙিয়ে রেখেছিলেন। সুতরাং এই 'ভুলে থাকা নয় সে তো ভোলা'। জ্যোতিরিন্দ্র সেই নির্জন বিষণ্ণ শান্তিধামের নিরালা অবসরে হয়তো বারবার অনুভব করতে চেয়েছেন সেই অসামান্যাকে, যাঁর প্রেরণায় রবীন্দ্রনাথের কবিমন উজ্জীবিত হয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা কোনও কোনও সমালোচক ভাবতে শুরু করেছেন যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক কোনও এক অজ্ঞাত কারণে ছিন্ন হয়ে যায়। এর কারণ হিসেবেও তাঁরা নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের ক্রমবর্ধমান খ্যাতি এবং নতুন বউঠানের আত্মহত্যা ঘটনাটিকে। কিন্তু দুটি সম্ভাবনাই অসার মনে হয়, কারণ রবীন্দ্রের প্রতি জ্যোতিরিন্দ্র কোনওদিন ঈর্ষান্বিত হননি। বিশেষ করে পরবর্তীকালে যখন তিনি জীবন থেকে সরে গিয়েছেন। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যোগ স্ত্রীর মৃত্যুর পরে তো ছিলই, অন্য সময়েও বিচ্ছিন্ন হয়নি। সরোজিনী জাহাজে ভ্রমণ করা ছাড়াও তাঁরা দুই ভাই বহুদিন সত্যেন্দ্রনাথের বাড়িতে পাশাপাশি ঘরে বাস করেছেন। তাঁর শেষ বয়সের ডায়রিতেও দেখা যাবে দু-তিনবার রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ আছে। রবির বক্তৃতা, দাড়ি রাখা, গান কিছুই তাঁর চোখ এড়ায়নি, এমনকী ছবিও এঁকেছেন। ৬৩ বছরের জন্মদিনে পঁচিশ-ছাব্বিশজন নিমন্ত্রিতের সামনে 'বাল্মীকি প্রতিভা'র গান গেয়ে শুনিয়েছেন। শান্তিনিকেতনে গিয়েছেন। সেখানে বাড়ি কেনার কথাও ভেবেছিলেন। তবে এ সময় জ্যোতিরিন্দ্র সবকিছু থেকেই অনেক দূরে সরে যাচ্ছিলেন।

অপরদিকে রবীন্দ্রনাথের লেখা চিঠিতেও দেখা যাবে অন্তরঙ্গতার সুর। 'ভাই জ্যোতিদাদা'র ছবির অ্যালবাম ছাপার ব্যাপারে তিনিই উদ্যোক্তা এবং আগ্রহী। খোঁজ রাখছেন এবং পড়ছেন সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ। চিঠি লিখছেন, 'আপনি তো সংস্কৃত নাটকশ্রেণী প্রায় শেষ করে ফেললেন।' পরবর্তী জীবনে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি। তাঁর পারিবারিক জীবনেও নেমে এসেছে নিয়তির দুর্বার দণ্ড। স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের মৃত্যু, শান্তিনিকেতনের সমস্যা নিয়ে বিব্রত কবি তখন নিজের কোনও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গেই যোগাযোগ রাখতে পারছেন না, জীবনবিরাগী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তো সেখানে আরও দূরের মানুষ। সুতরাং কাদম্বরীর মৃত্যু দুই ভাইয়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেনি। এই মৃত্যুর মধ্যেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ খুঁজেছেন কাদম্বরীর বিদেহী সত্তাকে, আর রবীন্দ্রনাথ নতুন করে চিনেছেন নিজেকে। কাদম্বরীর দেহহীন সত্তা মিশে রইল তাঁর কবিতায়, গানে, ছবিতে।

কাদম্বরী যখন চলে গেলেন, ফুলতলির ভবতারিণী তখন বালিকা। তাঁকে 'স্বর্ণ মৃণালিনী' হবার আশীর্বাদ করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ। তারপর ভবতারিণী একদিন হারিয়ে গেলেন

মৃণালিনীর মধ্যে। যদিও এই পরিবর্তন কোনও আলোড়ন আনল না বহির্জগতে। একটুও তরঙ্গ তুলল না প্রগতিশীলাদের মনে। তবু মৃণালিনীকে সামান্য বলতে পারা যায় না। মাত্র দশ বছর বয়সে একহাত ঘোমটা টেনে যে ভবতারিণী ঠাকুরবাড়িতে ঢুকেছিলেন, সেদিন তিনি বুঝতেও পারেননি কোন বাড়িতে তাঁর বিয়ে হচ্ছে, কাকে পেলেন তিনি!

রবীন্দ্রনাথ বলতেন, 'আমার বিয়ের কোন গল্প নেই', বলতেন 'আমার বিয়ে যা-তা করে হয়েছিল।' কিন্তু প্রথম দিকে তোড়জোড় শুরু হয়েছিল বড় মাপে। দাসী পাঠিয়ে মেয়ে পছন্দ করা 'পুরনো ব্যাপার, তাই এবার একটা কমিটি তৈরি হল—জ্ঞানদানন্দিনী, কাদম্বরী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। তাঁরা সদলবলে মেয়ে খুঁজতে গেলেন যশোরে—সেখান থেকেই ঠাকুরবাড়ির অধিকাংশ বউ এসেছিলেন। জ্ঞানদানন্দিনীর বাপের বাড়ি নরেন্দ্রপুরে গিয়ে উঠলেও দক্ষিণডিহি, চেঙ্গুটিয়া প্রভৃতি আশেপাশের সব গ্রামের বিবাহযোগ্য মেয়েই দেখা হয়ে গেল কিন্তু বউঠাকুরানিদের মনের মতো সুন্দরী মেয়ে পাওয়া গেল না। তাই শেষকালে ঠাকুর স্টেটের কর্মচারী বেণীমাধব রায়ের বড় মেয়ে ভবতারিণীর সঙ্গেই বিয়ে ঠিক করা হল। অবশ্য দাদাদের মতো রবীন্দ্রনাথ বিয়ে করতে অন্য কোথাও যাননি, জোড়াসাঁকোতেই বিয়ে হয়েছিল।

গুরুজনেরা যে সম্বন্ধ স্থির করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ বিনা দ্বিধায় তাঁকেই বরণ করে নিয়েছিলেন। বন্ধুদের নিজের বিয়ের নিমন্ত্রণলিপি পাঠিয়ে দিলেও এ বিয়েতে ঘটাপটা বিশেষ হয়নি। পারিবারিক বেনারসী 'দৌড়দার' জমকালো শাল গায়ে দিয়ে তিনি বিয়ে করতে গেলেন নিজেদের বাড়ির পশ্চিম বারান্দা ঘুরে। বিয়ে করে আনলেন অজ্ঞ বালিকা ভবতারিণীকে। কবির বাসরঘরের সুন্দর বিবরণ পাওয়া যাবে প্রত্যক্ষদর্শী হেমলতার লেখায়:

'বাসরে বসেই রবীন্দ্রনাথ দুষ্টুমি আরম্ভ করলেন।...ভাঁড় খেলার বদলে ভাঁড়গুলো উপুড় করে দিতে লাগলেন ধরে ধরে। তাঁর ছোট কাকিমা ত্রিপুরাসুন্দরী বলে উঠলেন,

'ও কি করিস রবি? এই বুঝি তোর ভাঁড় খেলা? ভাঁড়গুলো সব উলটেপালটে দিচ্ছিস কেন?'...

রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'জানো না কাকিমা—সব যে ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে কাজেই আমি ভাঁড়গুলো উলটে দিচ্ছি।'...

কাকিমা আবার বললেন, 'তুই একটা গান কর! তোর বাসরে আর কে গাইবে, তুই এমন গাইয়ে থাকতে?' এরপর তাঁর বাসরঘরে একবার উঁকি দিলে দেখা যাবে সেখানে তিনি ওড়নাঢাকা জড়সড় বধূর দিকে চেয়ে কৌতুকভরে গান ধরেছেন 'আ মরি লাবণ্যময়ী...'।

গানটি তাঁর ন'দিদি স্বর্ণকুমারীর লেখা।

শোনা যায়, কথায় প্রচণ্ড যশুরে টান থাকায় ভবতারিণী প্রথমদিকে বেশ কিছুদিন কথা বলতেন না। কবি কি এই অসম বিবাহকে খুশিমনে গ্রহণ করেছিলেন? তাই তো মনে হয়। ছোট ছোট ঘটনায় রয়েছে সুখের আমেজ। এরই মধ্যে শুরু হল ভবতারিণীর মৃণালিনী হয়ে ওঠার শিক্ষা। প্রথমে তিনি মহর্ষির নির্দেশে ঠাকুরবাড়ির আদব-কায়দা-বাচনভঙ্গির ঘরোয়া তালিম নিলেন নীপময়ীর কাছে। তারপর নীপময়ীর মেয়েদের সঙ্গে মৃণালিনী পড়তে গেলেন লোরেটো হাউসে। মতান্তরে তিনি আধুনিকা হবার তালিম নিয়েছিলেন জ্ঞানদানন্দিনীর কাছে। লোরেটোয় তাঁকে অন্যান্য ছাত্রীদের সঙ্গে না পড়িয়ে স্বতন্ত্র শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হয়। ফুলতলির ভবতারিণী হয়তো হারিয়ে গেলেন কিন্তু মৃণালিনী অতি আধুনিকা হয়েও ওঠেননি কিংবা তাঁর স্কুলের ইংরেজি শিক্ষা, পিয়ানো শিক্ষা, সংগীতের শিক্ষা, বাড়িতে হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নের কাছে সংস্কৃত শিক্ষা কোনও সৃষ্টিমূলক কাজেও লাগেনি। যদিও ইংরেজি, বাংলা ও সংস্কৃতের সঙ্গে তাঁর ভালই পরিচয় হয়েছিল। শিলাইদহে বলেন্দ্রনাথ যে বই পড়তেন, তা-ই কাকিমাকে শোনাতেন। ইংরেজি উপন্যাস পড়ে মুখে মুখে অনুবাদ করে তিনি গল্প শোনাতেন, মীরার

শিশুমনে মায়ের গল্প বলার ধরন স্থায়ী ছাপ ফেলেছিল। তবুও তাঁর জীবন সংসারের সকলের সুখে নিমজ্জিত ছিল। চারপাশে অতি সরব এবং সোচ্চার চরিত্রগুলির পাশে তাঁর নির্বাক ভূমিকাটি আমাদের কাছে তেমন স্পষ্ট নয়। অথচ তিনিও বাড়ির অন্যান্য মেয়ে-বউদের মতো অভিনয় করেছেন, রামায়ণ অনুবাদ করেছেন, রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে রূপকথা সংগ্রহ করেছেন, আমোদ-প্রমোদ-দুঃখ-শোকে সবার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী'র প্রথম অভিনয়ে মৃণালিনী সেজেছিলেন 'নারায়ণী' আর 'দেবদত্তে'র ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন তাঁর মেজো ভাশুর সত্যেন্দ্রনাথ। ঘরোয়া অভিনয় নয়, বেশ বড় মাপের আয়োজন হয়েছিল। যদিও প্রথমবার, তবু তাঁর অনাড়ষ্ট সাবলীল অভিনয় ভালভাবেই উতরেছিল। অথচ 'নবনাটকে' অভিনয় করার জন্যে, একটি স্ত্রীভূমিকা গ্রহণ করে, অক্ষয় চৌধুরী আর কিছুতেই স্টেজে এসে দাঁড়াতে পারেননি। মৃণালিনীরও এরকম অবস্থা হতে পারত। বিশেষ করে 'ভাশুরের সঙ্গে অভিনয়' কিন্তু কোনও বিঘ্ন ঘটেনি। অজিতকুমার ঘোষ লিখেছেন, 'নারায়ণীর ভূমিকায় মৃণালিনী দেবী নথ নেড়ে ঝাঁটা ঘুরিয়ে যে অভিনয় করেছিলেন তা নাকি বেশ প্রাণবন্ত হয়েছিল।' তবু রবীন্দ্রনাথের নাটকে কিংবা অভিনয়ে যোগ দেবার আগ্রহও মৃণালিনীর ছিল না, একথা স্বীকার করতেই হবে। 'সখিসমিতি'র দু-একটা অভিনয়ে কিংবা 'মায়ার খেলা'র ছোটখাটো চরিত্রাভিনয়ে যোগ দেওয়া ছাড়া আর কিছুতেই তাঁকে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়নি। আসলে গান-অভিনয়-সাহিত্যচর্চার মধ্যে মৃণালিনীর প্রকৃত পরিচয় খুঁজে পাওয়া যাবে না। স্বামীর মহৎ আদর্শকে কাজে পরিণত করবার জন্যে তিনি যখন রবীন্দ্রনাথের পাশে এসে দাঁড়ালেন, শুধু তখনই তাঁর প্রকৃত পরিচয় প্রথমবার আমরা পেলাম। সামান্যার মধ্যে দেখা দিলেন অসামান্যা। দেখা দিল সনাতন ভারতবর্ষের শাশ্বতী নারী। অবশ্য সে অনেক পরের কথা।

ঠিক সুগৃহিণী বলতে যা বোঝায়, ঠাকুরবাড়িতে মৃণালিনী ছিলেন তাই। জোড়াসাঁকোতে সবার ছোট, তবু সবাই তাঁর কথা শুনতেন। সবাইকে নিয়ে তিনি আমোদ-আহ্লাদ করতেন, বউদের সাজাতেন কিন্তু নিজে সাজতেন না। সমবয়সিরা অনুযোগ করলে বলতেন, 'বড় বড় ভাশুর-পো ভাগনেরা চারদিকে ঘুরছে—আমি আবার সাজব কি?' একদিন কানে দুটি দুল ঝোলানো বীরবৌলি পরেছিলেন সবার উপরোধে। সেইসময়ে হঠাৎ কবি উপস্থিত হলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি দু হাত চাপা দিয়ে বীরবৌলি লুকিয়ে ফেলেছিলেন। গয়না পরায় এতই ছিল তাঁর লজ্জা। তিনি আরও ভালবাসতেন রান্না করতে, আর পাঁচজনকে ভালমন্দ রেঁধে খাওয়াতে। ঠাকুরবাড়িতেও মেয়েদের গৃহকর্মে নানারকম তালিম দেওয়া হত।

নতুন বউদের শিক্ষা শুরু হত পান সাজা দিয়ে। তারপর তাঁরা শিখতেন বড়ি দিতে, কাসুন্দি-আচার প্রভৃতি তৈরি করতে। ধনী পরিবারের বউ হলেও এসব শিক্ষায় ত্রুটি ছিল না। বলা বাহুল্য মৃণালিনী এসব কাজে অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তবে একটা কথা মনে রাখতেই হবে, এ সময় দিন বদলাচ্ছে। পালাবদল চলছে বাড়ির বাইরে, বাড়ির ভিতরেও। না বদলালে কি জ্যোতিরিন্দ্র কাদম্বরী তিনতলার ছাদে 'নন্দন কানন' তৈরি করতে পারতেন? সে সভায় অনাত্মীয় পুরুষেরাও অবাধে আসতেন, অথচ সত্যেন্দ্র-বন্ধু মনোমোহনকে অন্তঃপুরে আনতে কম কাঠখড় পোড়াতে হয়নি। যুগ বদলাচ্ছে। মৃণালিনী যখন লোরেটো স্কুলে পড়তে গেলেন তখন আর কেউ ধিক্কার দিতে এল না। কারণ তার আগেই চন্দ্রমুখী ও কাদম্বরী অসাধ্যসাধন করে ফেলেছেন। অবশ্য অন্দরমহলের ব্যবস্থা বদলাতে বড় দেরি হয়। যাই যাই করেও গ্রীষ্মকালের শেষ-সূর্যের আলোর মতো মেয়েদের চিরকেলে অভ্যাস যেন যেতে চায় না। তাই বাইরের জগতে কয়েকটি মেয়ে বিরাট পরিবর্তন আনলেও ঠাকুরবাড়ির মেয়ে-বউরা তখনও শিখতেন ঝুনি-রাইয়ের ঝাল কাসুন্দি, আমসত্ত্ব, নারকেল চিঁড়ে তৈরি করতে। মৃণালিনী নানারকম মিষ্টি তৈরি করতে পারতেন। তাঁর মানকচুর জিলিপি, দইয়ের মালপো, পাকা আমের

মিঠাই, চিঁড়ের পুলি যাঁরা একবার খেয়েছেন তাঁরা আর ভোলেননি। কবির ফরমাশও ছিল নানারকম। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, জোড়াসাঁকোর বাড়িতে যেদিন খামখেয়ালি সভার অধিবেশন সেদিন 'মাকে ফরমাশ দিলেন...মামুলি কিছুই থাকবে না, প্রত্যেকটি পদের বৈশিষ্ট্য থাকা চাই'। বলা বাহুল্য মৃণালিনী তাঁকে হতাশ করেননি। স্ত্রীর রন্ধননৈপুণ্যে কবিও উৎসাহী হয়ে মাঝে মাঝে নানারকম উদ্ভট রান্নার 'এক্সপেরিমেন্ট' করতেন। শেষে হাল ধরে সামাল দিতে হত মৃণালিনীকেই। তাঁকে রাগাবার জন্যে কবি বলতেন, 'দেখলে তোমাদের কাজ তোমাদেরই কেমন একটা শিখিয়ে দিলুম।' মৃণালিনী চটে গিয়ে বলতেন, 'তোমাদের সঙ্গে পারবে কে? জিতেই আছ সকল বিষয়ে।' পরবর্তীকালে কবি প্রতিমাকে বলতেন, 'বউমা, তোমার শাশুড়িকে আমি কত রান্নার মেনু জোগাতুম, আমি অনেক রান্না তাঁকে শিখিয়েছিলুম, তোমরা বিশ্বাস করবে না জানি।' উপস্থিত অন্যান্য মহিলারা বলতেন, 'তিনিও তো ভাল রাঁধিয়ে ছিলেন, আমরা শুনেছি।' কবি হেসে বলতেন, 'তা ছিলেন, নইলে আমার মেনুগুলো এত উতরত কি করে?'

লেখাপড়া শেখার পর শিলাইদহে বাস করবার সময় মৃণালিনী কবির নির্দেশে রামায়ণের সহজ ও সংক্ষিপ্ত অনুবাদের কাজে হাত দিয়েছিলেন। শেষ হয়নি। কবি সেই অসমাপ্ত খাতাটি তুলে দিয়েছিলেন মাধুরীলতার হাতে, বাকিটুকু শেষ করার জন্যে। অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার আগেই অকালে মাধুরীর জীবনদীপ নিভে যাবার পর আর খাতাটির খোঁজ মেলেনি। রথীন্দ্রের কাছে আর-একটি খাতা ছিল—তাতে মৃণালিনী মহাভারতের কিছু শ্লোক, মনুসংহিতা ও উপনিষদের শ্লোকের অনুবাদ করেন। এছাড়া কবির নির্দেশে তিনি বাংলার রূপকথা সংগ্রহের কাজেও হাত দিয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর সংগ্রহ থেকেই পেয়েছিলেন 'ক্ষীরের পুতুল' গল্পটি। মৃণালিনী ঠিক যেমন করে গল্পটি বলেছিলেন ঠিক তেমনি করেই লিখেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। রূপকথার জাদুকরের সেদিন হাতেখড়ি হল মৃণালিনীর কাছেই। সকৃতজ্ঞ অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'এই আমার রূপকথার আদিকথা।' কিন্তু মৃণালিনীর লেখা আর কিছু কি ছিল? স্বর্ণকুমারীকে এ নিয়ে একবার প্রশ্ন করা হলে তিনি দৃপ্তভঙ্গিতে বলেছিলেন, 'তাঁহার স্বামী বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ লেখক, সেইজন্য তিনি স্বয়ং কিছু লেখার প্রয়োজন বোধ করেন নাই।'

খুবই সত্যি কথা, তবু মনটা খুঁতখুঁত করে বইকী! ঠাকুরবাড়ির এই আমুদে বউটি কি তাঁর মনের মধু সবটাই ঢেলে দিয়েছিলেন নীরব সেবায়? কালের সীমা পেরিয়ে কিছুই কি আমাদের কাছে এসে পৌঁছবে না? দ্বিপেন্দ্রনাথের স্ত্রী হেমলতার লেখা থেকেই শুধু পাওয়া যাবে মৃণালিনীকে? সুরসিকা মৃণালিনীর একটা-দুটো চিঠি অবশ্য রক্ষা পেয়েছে। সেই ছোট্ট সাংসারিক চিঠির মধ্যেও তাঁর পরিহাসপ্রিয় সহজ মনটি ধরা পড়েছিল। সুধীন্দ্রনাথের স্ত্রী চারুবালাকে লেখা একটা চিঠিতে দেখা যাবে মৃণালিনী তাঁকে অনুযোগ করছেন অনেকদিন চিঠি না লেখার জন্যে।* তার মধ্যে যে অনাবিল স্বচ্ছতা আছে তার সৌন্দর্য বুঝি কোনও সাহিত্যিক চিঠির চেয়ে কম নয়:

'...তোমার সুন্দর মেয়ে হয়েছে বলে বুঝি আমাকে ভয়ে খবর দাওনি পাছে আমি হিংসে করি, তার মাথায় খুব চুল হয়েছে শুনে পর্যন্ত 'কুন্তলীন' মাখতে আরম্ভ করেছি, তোমার মেয়ে মাথা ভরা চুল নিয়ে আমার নাড়া মাথা দেখে হাসবে, সে আমার কিছুতেই সহ্য হবে না। সত্যিই বাপু, আমার বড় অভিমান হয়েছে, না হয় আমাদের একটি সুন্দর নাতনী হয়েছে, তাই বলে কি আর আমাদের একেবারে ভুলে যেতে হয়।'

শান্তিনিকেতনে চলে গেলেও জোড়াসাঁকোর একান্নবর্তী পরিবারটির জন্যে মৃণালিনীর আন্তরিকতা কখনও হ্রাস পায়নি। শিলাইদহে তাঁর কাছেই ছুটে যেতেন ভাশুরপো ও ভাশুরঝিরা। বলেন্দ্রনাথ ও নীতীন্দ্রনাথ কাকিমার ভক্ত ছিলেন। শুধু কি আত্মীয়স্বজন? মৃণালিনী সবার সুখেই সুখী, আবার সবার দুঃখেই সমদুঃখী। শিলাইদহে একদিন মুন্না সিং নামে এক পাঞ্জাবি তাঁর কাছে এসে কাঁদতে কাঁদতে নিজের দুরবস্থার কথা জানিয়ে বলল, 'মাইজি, একটি চাকরি দিয়ে আমাকে রক্ষা করুন, নতুবা আমি সপরিবারে মারা পড়িব।' রবীন্দ্রনাথ তখন

শিলাইদহে ছিলেন না, মৃণালিনী তাকে কুঠিবাড়ির দারোয়ানের কাজে বহাল করলেন। কদিন পরে দেখলেন মুলা সিং তখনও বিমর্ষ। মৃণালিনী কারণ জানতে চাইলেন। সে জানাল, তার মাইনের সবটাই খরচ হয়ে যায় দু'বেলা চার সের আটার রুটি খেতে। করুণাময়ী মৃণালিনী সেইদিন থেকে তাঁর সংসার থেকে মুলা সিংয়ের জন্য চার সের আটা বরাদ্দ করলেন। মাইনে বাড়ল তবু আটার ব্যবস্থা আগের মতোই রয়ে গেল। দিনে দিনে তাঁর যে মূর্তিটি বড় হয়ে উঠেছে সে তাঁর জননী মূর্তি। শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় তার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া গেল। 'সীমাস্বর্গের ইন্দ্রাণী' সেখানে হয়ে উঠলেন অন্নপূর্ণা। মৃণালিনী রূপসী ছিলেন না, কিন্তু অপরূপ মাতৃত্বের আভা তাঁর মুখে লাবণ্যের মতো ঢলঢল করত, একবার দেখলে আবার দেখতে ইচ্ছে হয়, এই ছিল প্রত্যক্ষদর্শীর অভিমত। পাঁচটি সন্তানের জননী মৃণালিনীর এই মাতৃমূর্তি আরও সার্থক হয়ে উঠেছিল শান্তিনিকেতনে ঘর থেকে দূরে আসা শিশুগুলিকে আপন করে নেওয়ার মধ্যে।

সহধর্মিণীর কাছে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাশা কী ছিল জানতে ইচ্ছে করে নিশ্চয়ই। কীভাবে তিনি তাঁদের যৌথ জীবন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, সেকথা জানা যায় মৃণালিনীকে লেখা কবির পত্র পড়ে। একটি পত্রে তিনি লিখেছেন, 'আমাকে সুখী করবার জন্য তুমি বেশি কোন চেষ্টা কোরো না—আন্তরিক ভালবাসাই যথেষ্ট। অবশ্য তোমাতে আমাতে সকল কাজ ও সকলভাবেই যদি যোগ থাকত খুব ভাল হত—কিন্তু সে কারো ইচ্ছায়ও নয়। যদি তুমি আমার সঙ্গে সকল রকম বিষয়ে সকল রকম শিক্ষায় যোগ দিতে পার তো খুশি হই—আমি যা কিছু জানতে চাই তোমাকেও তা জানাতে পারি—আমি যা শিখতে চাই তুমিও আমার সঙ্গে শিক্ষা কর তাহলে খুব সুখের হয়। জীবনে দুজনে মিলে সকল বিষয়ে অগ্রসর হবার চেষ্টা করলে অগ্রসর হওয়া সহজ হয়—তোমাকে কোন বিষয়ে আমি ছাড়িয়ে যেতে ইচ্ছে করিনে—কিন্তু জোর করে তোমাকে পীড়ন করতে আমার শঙ্কা হয়। সকলেরই স্বতন্ত্র রুচি অনুরাগ এবং অধিকারের বিষয় আছে—আমার ইচ্ছা ও অনুরাগের সঙ্গে তোমার সমস্ত প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ মেলাবার ক্ষমতা তোমার নিজের হাতে নেই—সুতরাং সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র খুঁৎখুঁৎ না করে ভালবাসার দ্বারা যত্নের দ্বারা আমার জীবনকে মধুর—আমাকে অনাবশ্যক দুঃখকষ্ট থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করলে সে চেষ্টা আমার পক্ষে বহুমূল্য হবে।'

কবির প্রত্যাশা পূর্ণ করেছিলেন মৃণালিনী। জীবনের সবক্ষেত্রে, এমনকী শান্তিনিকেতনে আদর্শ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বাসনা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সেখানে গেলে মৃণালিনীও তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। এই ধরনের কাণ্ডজ্ঞানহীনতায় আত্মীয়স্বজনের উপদেশ, উপহাস, তিরস্কার, বিদ্রূপ সবই সহ্য করতে হয়েছিল। আত্মীয়দের খুব দোষ নেই, সর্বনাশের মুখোমুখি গিয়ে কেউ দাঁড়াতে চাইলে তাকে তো সাবধান করবেনই। নাবালক পাঁচটি সন্তান, তার মধ্যে তিনটি মেয়ে অথচ কবি তাঁর যথাসর্বস্ব ঢেলে দিচ্ছেন আশ্রম বিদ্যালয়ে। লোকে বলবে না কেন? মৃণালিনীর মনেও এ নিয়ে ভাবনা ছিল, তবু তিনি স্বামীকে সব কাজে হাসিমুখে সাহায্য করেছেন। যখনই কোনও প্রয়োজন হয়েছে, তখনই খুলে দিয়েছেন গায়ের এক একটি গয়না। তিনি যদি প্রবল বাধা দিতেন, কবি কি পারতেন বিদ্যালয়ের কাজে মগ্ন হতে? কবির নিজের কথাতেই বোঝা যায়, 'মেয়েরা পরাধীন হলেও পুরুষের উপর কর্তৃত্ব করার অদ্ভুত ক্ষমতা রাখে।' কবিপত্নীর সম্মতি ছিল বলেই তিনি স্বামীকে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর হাতে তুলে দিয়েছেন অজস্র গয়না। মৃণালিনী পেয়েছিলেন প্রচুর। বিয়ের যৌতুকের গয়না ছাড়াও শাশুড়ির আমলের ভারী গয়না ছিল অনেক। রবীন্দ্র লিখেছেন, 'শেষ পর্যন্ত হাতে কয়েক গাছা চুড়ি ও গলার একটি চেন হার ছাড়া তাঁর কোনও গয়না অবশিষ্ট ছিল না।'

শুধু গয়না দিয়ে নয়, আশ্রমের কাজেও মৃণালিনী স্বামীকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন। আধুনিক অর্থে তাঁকে হয়তো প্রগতিশীলা বলা যাবে না, কারণ শিক্ষাদীক্ষায় ঠাকুরবাড়ির

মেয়েদের ছাড়িয়ে অন্যান্য মেয়েরাও ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছিলেন। উগ্র আধুনিকতা এ বাড়ির মেয়েদের রক্তমজ্জায় প্রবেশ করেনি। দীর্ঘকাল ধরে জ্ঞানদানন্দিনীই সেখানে উগ্র আধুনিকতার পরিচয় দিয়ে এসেছেন। কিন্তু মহৎ নারীর পরিচয় মৃণালিনীর মধ্যে আছে। 'চারিত্রপূজা' গ্রন্থ লেখবার সময় রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় লিখেছেন, 'মহাপুরুষের ইতিহাস বাহিরে নানা কার্যে এবং জীবন বৃত্তান্তে স্থায়ী হয়, আর মহৎ নারীর ইতিহাস...তাঁহার স্বামীর কার্যে রচিত হইয়া থাকে; এবং সে লেখায় তাঁহার নামোল্লেখ থাকে না।' এরই মধ্যে আমরা মৃণালিনীর আসল পরিচয় খুঁজে পাব। আজ আমরা ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের কথা খুঁটিয়ে বলতে বসেছি তাই, নয়তো মৃণালিনীকে নিয়ে স্বতন্ত্র প্রসঙ্গের অবতারণা করার সুযোগ বড় কম। তিনি রবীন্দ্রজীবনে, ঠাকুরবাড়িতে, শান্তিনিকেতনের আশ্রম-বিদ্যালয়ে মিশে আছেন ফুলের সুরভির মতো। দেখা যায় না, অনুভবে মন ভরে যায়।

মৃণালিনী আরও কিছুদিন বেঁচে থাকলে রবীন্দ্রনাথের আশ্রম-বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা আরও সার্থক হতে পারত। তিনি ব্রহ্মচর্য আশ্রমের দেখাশোনা করতেন এবং অপরের কচি কচি শিশুদের অপরিসীম মাতৃস্নেহে নিজের কাছে টেনে নিয়ে, তাদের হোস্টেলে আসার দুঃখ ভুলিয়ে দিতেন। বাড়ি থেকে দূরে এসেও ছেলেরা মাতৃস্নেহের আশ্রয় পেত। কিন্তু কঠোর পরিশ্রমের তীব্র আঘাত সহ্য করতে না পেরে, আশ্রম-বিদ্যালয় স্থাপনের মাত্র এগারো মাস পরেই বিদায় নিলেন মৃণালিনী। কবির সমস্ত সেবাযত্ন ব্যর্থ করে দিয়ে শীতের পদ্মটি ম্লান হয়ে এল, হারিয়ে গেল কবির প্রিয় পত্র-সম্বোধনটি 'ভাই ছুটি'। কে জানত এত শীঘ্র এ জীবন থেকে, সংসার থেকে ছুটি নিয়ে তিনি চলে যাবেন! জীবনের প্রতি পদে লোকান্তরিতা মৃণালিনীর অভাব অনুভব করেছেন রবীন্দ্রনাথ 'এমন কেউ নেই যাকে সব বলা যায়—'। 'স্মরণে'র কবিতায় ঝরে পড়েছে মৃণালিনীর জন্যে বেদনা। সংসারে যখন শুধুই কথার পুঞ্জ জমে উঠেছে, তখন তিনি বারবার স্মরণ করছেন লোকান্তরিতা স্ত্রীকে।

'তোমার সংসার মাঝে হায় তোমাহীন
এখনো আসিবে কত সুদিন-দুর্দিন—
তখন এ শূন্য ঘরে চিরাভ্যাস-টানে
তোমারে খুঁজিতে এসে চাব কার পানে?'

অনুভব করেছেন তাঁর আশ্রম-বিদ্যালয় অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছে মৃণালিনীর অভাবে। কারণ 'আমি তাদের সব দিতে পারি, মাতৃস্নেহ তো দিতে পারি না।' এদেশের আরও কয়েকজন আদর্শ জননীর পাশে মৃণালিনীর মাতৃমূর্তিটিও চিরস্থায়ী আসন লাভ করতে পারে।

ঠাকুরবাড়ির বউদের সঙ্গে আরও একজনের কথা এ প্রসঙ্গে সেরে নেওয়া যাক। যোগমায়াকে নিশ্চয় মনে আছে, গিরীন্দ্রনাথের সাহিত্যপ্রেমিকা ধর্মশীলা স্ত্রী, যিনি লক্ষ্মীজনার্দন ঠাকুরকে নিয়ে উঠে এসেছিলেন বৈঠকখানা বাড়িতে। সেদিন থেকে জোড়াসাঁকোর বাড়ি দু'ভাগ হয়ে গেল কিন্তু মনের মধ্যে দেয়াল ওঠেনি। বরং ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে যোগ ছিল না নগেন্দ্রনাথের সন্দেহপরায়ণা স্ত্রী ত্রিপুরাসুন্দরীর। সম্পত্তি সংক্রান্ত নানারকম সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তাঁর ধারণা হয়েছিল, মহর্ষিপরিবার তাঁকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতে চান। তাই তিনি সদর স্ট্রিটের বাড়ি থেকে এ বাড়িতে কদাচিৎ এলেও কিছু খেতেন না। সবসময় তাঁর খাবার অন্য বউদের চেখে দিতে হত। কিন্তু, যোগমায়ার পুত্রদের সঙ্গে মহর্ষির পুত্রদের সৌহার্দ্য ঘোচেনি। মানসিকতার দিক থেকেও গুণেন্দ্রপরিবার এঁদের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। তাই এ দুটি বাড়ি প্রকৃতপক্ষে এক বাড়িই রয়ে গিয়েছে। আবার গুণেন্দ্রপরিবার ব্রাহ্ম না হওয়ায় পাথুরিয়াঘাটা বা কয়লাহাটা ঠাকুরবাড়ির সঙ্গেও তাঁদের যোগ ছিন্ন হল না। এককথায় এঁরা রইলেন দুই

ঠাকুর-পরিবারের ঠিক মাঝখানে। অন্যান্য ঠাকুরদের সঙ্গে রইল সামাজিক যোগ, মহর্ষিভবনের সঙ্গে হল মানসিক যোগ। তাই দ্বারকানাথ লেনের পাঁচ নম্বর আর ছ' নম্বরকে এক বাড়ি বলাই ভাল। আর সত্যিই তো, এক সীমানার মধ্যে ছিল দুটি বাড়ি, এখন অবশ্য নেই। পাঁচ নম্বর বা দ্বারকানাথের সাজানো-গোছানো অমন সুন্দর বৈঠকখানা বাড়িটিকে ভেঙে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে, রক্ষা পেয়েছে শুধু অন্দরমহল সংলগ্ন বেনেবাড়িটি। এই বৈঠকখানা বাড়ির প্রকৃত গৃহিণী ছিলেন যোগমায়া।

পাঁচ নং বাড়ির কর্ত্রী যোগমায়া যশোরের ফুলতলি থেকে বধূ নিয়ে এলেন আট বছরের বালিকা সৌদামিনীকে। মন পাখি হয়ে বারবার উড়ে যেতে চাইত সেই গ্রামে, যেখানে কলসি ভাসিয়ে মেয়েরা পুকুরের এপার ওপার হয়, 'যেখানে ছোট্ট গাঁয়ের ছোট্ট সুখদুঃখের মধ্যে মানুষ তৃপ্ত।' বনেদি বাড়ির ইটের পাঁজর ততই খাঁচা হয়ে উঠত তাঁর কাছে। ক্রমে এই পরিবারের একজন হয়ে উঠলেন সৌদামিনী। শাশুড়ির পদটি অধিকার করলেন একদিন। পরিবার সনাতন নিয়মেই চলত। 'অতীতের দিকে চেয়ে চাপা দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে উথলে উঠত তাঁর ভুলে যাওয়া দিনের কথা।' লিখেছেন সৌদামিনীর নাতনি প্রতিমা।

বৃহৎ পরিবারে পাঁচটি সন্তানের জননী সৌদামিনীর কর্তৃত্বশক্তির পরিচয় প্রথমটায় পাওয়া যায়নি। বোঝা গেল, যেদিন তিনি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে নানান সমস্যার সম্মুখীন হলেন।

যে বিচক্ষণতার সঙ্গে সৌদামিনী ভাঙা সংসারের হাল ধরেছিলেন, তার তুলনা হয় না। গুণেন্দ্রনাথের উদ্দাম-জীবন উৎসবের উন্মত্ততায় এমন আকস্মিকভাবে নিঃশেষ হয়ে গেল দেখে তিনি মনঃস্থির করেছিলেন, তাঁর ছেলেদের তিনি বিলাসের ফাঁস থেকে, যেমন করে হোক রক্ষা করবেন। বল্গাহীন প্রমোদের স্রোতে ভেসে যেতে দেবেন না। এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা যে কত কঠিন, সেকথা আজ আমরা বুঝতে পারব না। উনিশ শতকের শিক্ষা-সংস্কৃতি-নবজাগরণের ফাঁক দিয়ে তখন বয়ে চলেছে বাবুসংস্কৃতির তীব্র পঙ্কিল স্রোত। একদিকে যেমন স্কুল খোলা, পত্রিকা প্রকাশ, সমাজসেবার ধুম, অপরদিকে তেমনি নগরনটীদের নূপুর নিক্কণ আর পেয়ালাভরা সুরার রক্তিম আহ্বান। ধনী সন্তানেরা দেশি বিলিতি উভয় ধরনের বিলাসিতাতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠছেন।

বড়লোকের ছেলে বিলাসী হবে না? সে কি কথা? গোঁফ ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই তো তাঁদের তালিম দিয়ে 'আলালের ঘরের দুলালে' পরিণত করা হত। যখনকার যা দস্তুর! ঠাকুরবাড়িতে ধনের অভাব ছিল না, অভাব ছিল না বনেদিয়ানার। তবে? বাবুয়ানি না দেখালে আভিজাত্য থাকবে কী করে? কলকাতার আর পাঁচটা ধনী পরিবার কী করছে? সৌদামিনী শক্ত হলেন। যেখানে যা হয় হোক। পাশেই তো রয়েছে মহর্ষিভবন। সেখানে তো আনন্দের উপাদানের নীচে বয়ে যাচ্ছে না পঙ্কিল বিলাসের স্রোত। তাই হল শেষ পর্যন্ত। সেকেলে বাবুয়ানির ক্রমাগত হাতছানি অনায়াসে উপেক্ষা করে তাঁর গগনেন্দ্র-সমরেন্দ্র-অবনীন্দ্র মহর্ষিপুত্রদের মতোই নানা গুণের অধিকারী হয়ে উঠলেন। সব দিকে থাকত সৌদামিনীর প্রখর দৃষ্টি। তিনি কখনও নিজের ইচ্ছের কথা জোর করে জানাতেন না, কোথাও ছিল না জেদ বা জবরদস্তির কোনও চিহ্ন। তবু তাঁরই ইচ্ছায়, তাঁরই প্রাণের প্রভাবে ছেলেরা চলেছে। কেউ এতটুকু প্রতিবাদ করতে পারেনি। বাইরে কঠিন ভিতরে কোমল এই অসামান্যা নারী রবীন্দ্রনাথেরও অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। বহুদিন পরে কথাপ্রসঙ্গে কবি রানী চন্দকে বলেন,... 'আমাদের গগনদের মা ছিলেন, যাঁকে ভুলেও শিক্ষিতা বলা যায় না কিন্তু, কী সাহস আর কী বুদ্ধিতে তিনি চালিয়েছিলেন সবাইকে। তিন তিনটি ছেলেকে কীভাবে মানুষ করে তুললেন।...ছেলেরা তাদের মাকে যা ভক্তি করে অমন সচরাচর দেখা যায় না।'

সৌদামিনী শুধু ছেলেদের মানুষ করেছিলেন তা নয়, ঋণের বোঝায় সংকটাপ

জমিদারিকেও একেবারে নতুন করে দিয়েছিলেন। পরামর্শ দেবার লোকের অভাব ছিল না। মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে পাঁচটি নাবালক সন্তানের বিধবা জননীকে অনেকেই গায়ে পড়ে সহানুভূতি দেখাতেন। কিন্তু তিনি স্বাভাবিক বুদ্ধির গুণে সেই শুভাকাঙ্ক্ষীদেরও দূরে সরিয়ে রেখে শক্ত হাতে সংসারের হাল ধরেছিলেন। তাঁর কথা মনে হলেই যেন 'যোগাযোগ' উপন্যাসের 'বড় বউ' অর্থাৎ কুমুর মাকে মনে পড়ে যায়।

সবদিকে নজর রাখতে গিয়ে সৌদামিনী অবশ্য নিজের দিকে একেবারেই তাকাতে পারেননি। ভাল গান গাইতে পারতেন তিনি। বিনয়িনী লেখেছিলেন, 'দুপুরবেলায় খাওয়া দাওয়ার পর' তাঁর মা একটি হারমোনিয়াম বাজিয়ে ব্রহ্মসংগীত গাইতেন। রামায়ণ-মহাভারত বা শাস্ত্রের বইও পড়তেন। অবনীন্দ্রনাথের স্মৃতিতেও ধরা ছিল তাঁর মায়ের বৈকালিক সাজ। অত্যন্ত শৌখিন গুণেন্দ্রনাথ আনতেন নানারকম সুন্দর বস্তু। একবার দিলেন একটি টিউলিপ ফুলের ফুলদানি। 'মা চুল বাঁধতে বসতেন, টিউলিপফুলের ছায়া আর মার মুখের ছায়া, এই দুটি ছায়া পড়ত আয়নাতে।' সাহিত্য বা শিল্পচর্চার অন্য নজির না থাকলেও নানারকম গুণের অধিকারী ছিলেন সৌদামিনী। মনে হয় তাঁর নাতনিদের মধ্যে পরে যেসব গুণের প্রকাশ হয়েছিল সবই তাঁর মধ্যে অঙ্কুরিত ছিল, নাহলে কারও মধ্যে কোনও গুণের সামান্য স্ফুলিঙ্গ দেখলেই তিনি তাকে চিনতেন কী করে। গগনেন্দ্রনাথের ছোট মেয়ে হাসির গান শুনে তিনি তাকে গান শেখাবার ব্যবস্থা করেন। হরিশচন্দ্র হালদারকে দিয়ে আঁকিয়ে নকশি কাঁথা সেলাই করাতে দিতেন নাতনিদের। তাছাড়া তিনি বেশ ভাল চরকা কাটতে পারতেন। তাঁর নিজের হাতে কাটা-সুতোয় বোনা কাপড় শান্তিপুরী কাপড়ের মতো মিহি দেখাত। নাতনিদের সবাইকে তিনি একটা করে চরকা কিনে দিয়েছিলেন। রোজ সুতো কেটে তাঁদের দেখাতে হত। হাতে তৈরি জিনিস বা স্বদেশি কুটিরশিল্পের প্রতিও তাঁর আগ্রহ ছিল। গ্রামাঞ্চল থেকে মেয়েরা তাদের হাতের তৈরি খেলনা বা পুতুল বিক্রি করতে এলে তিনি তাদের উৎসাহ দেবার জন্যে সব কিনে নিতেন। এমনকী স্বদেশি আন্দোলনের প্রতিও তাঁর সহানুভূতি ছিল। অর্থসাহায্য ছাড়াও তাঁর বাড়িতে গোপনে অনুশীলন সমিতির কাজ হত। এরকম ছোটখাটো অনেক ঘটনা দেখে বোঝা যায়, সৌদামিনী প্রগতিশীলা ছিলেন না ঠিকই কিন্তু অসাধারণ এবং দুর্লভ গুণের অধিকারী ছিলেন। তাঁকে এবং তাঁর মতো আরও কয়েকজন বধূকে দেখে জানা যায়, ব্রাহ্মসমাজ বা নারীপ্রগতি, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি নবজাগ্রত-স্বাধীনতার সঙ্গে যাঁদের যোগ ছিল না তাঁরাও কম কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে যাননি। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, সৌদামিনীর দুজন ননদের কথা—কাদম্বিনী ও কুমুদিনী। তাঁরা পাঁচ নং বাড়িতে অনেকদিন বাস করেছেন। কাদম্বিনীর বিয়ে হয়েছিল যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। অত্যন্ত রূপবান পাত্রটিকে হাতছাড়া করার ইচ্ছে ছিল না গিরীন্দ্রনাথের। তারপর কী হল কেউ জানে না। অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, 'আমাদের বাড়ি ছিল গঙ্গার খুব কাছে। তখনকার কালে নিয়ম ছিল বাড়ির ছোট বড় সকলে প্রতিদিন গঙ্গায় স্নান করবে।...নিয়মমত একদিন গঙ্গা স্নান করতে গিয়েই তরুণ যজ্ঞেশপ্রকাশ আর বাড়ি ফিরলেন না। সারাদিন তাঁকে আর বাড়িতে দেখা গেল না। অবশেষে রাত একটু বেশি হতে ঠাকুরবাড়ি থেকে খবর এল। গিরীন্দ্রনাথের কন্যার সঙ্গে যজ্ঞেশপ্রকাশের শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়েছে।' অবনীন্দ্রনাথের 'আপন কথা'য় আছে কুমুদিনীর ঘরটির কথা। 'বিষবৃক্ষে'র সূর্যমুখীর ঘরের মতোই জয়পুরি কারিগরের আঁকা ছবি থেকে আরম্ভ করে, অয়েল পেন্টিং ও কালীঘাটের পট পর্যন্ত সবই ছিল। ছিল প্রচুর বই। কুমুদিনী খুব ভাল সেলাই জানতেন। আসলে তাঁর মধ্যেও লুকিয়ে ছিল একটি শিল্পীমন। তাঁর তৈরি করা 'সোনালি পুঁতির উপরে জিরোজার ফুল বসানো' একজোড়া বালা দেখে মনে হত সেগুলি সোনার বালার চেয়েও সুন্দর। শখ করে প্রচুর পায়রা পুষেছিলেন। ঠাকুরপুজো, কথকতা, সেলাই আর পায়রা নিয়েই দিন কাটাতেন কুমুদিনী। শিশু অবনীন্দ্রের শিল্পীমন কল্পনায় উজ্জীবিত হত পিসিমার সান্নিধ্যে এসে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রতিভাময়ী নাতনিদের সংখ্যাও কম নয়। উপযুক্ত পরিবেশে, প্রতিভাবান পিতামাতার প্রভাবে, তাঁরাও অনেকেই নানান গুণের অধিকারিণী হয়ে উঠেছিলেন। ভিন্ন পরিবার থেকে আসা কয়েকজন নাতবউও যে কৃতিত্বের পরিচয় দেননি, তা নয়। আসলে এ সময় বঙ্গদেশে অভাবনীয় নারীজাগরণের উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল। মেয়েরা নিজেরাই ঠেলেঠুলে বেরিয়ে এসেছিলেন বাইরে। প্রথম পর্যায়ে ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের কাজকর্ম দেখে যেমন মেয়েরা সবাই হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন, এখন ঠিক সে অবস্থা রইল না। মহর্ষির নাতনিদের সমবয়সি অনেকগুলি গুণবতী মেয়ের সন্ধান পাওয়া গেল। অবশ্য ঠাকুরবাড়ির মেয়েরাও যে দূরে সরে গেলেন, তা নয়। তাঁরা এখন অস্পৃশ্য মানবী নন, বরং উঁচু মহলের আভিজাত্যের প্রতীক এবং অনুকরণযোগ্য। সমাজ ধিক্কারের বদলে তাঁদের রুচিবোধের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। শিল্পে-সাহিত্যে ঠাকুরবাড়ির সংস্কৃতির একটা নিজস্ব ছাপ পড়তেও শুরু হল। বস্তুত ১৮৭৫ থেকে ১৯২৫ এই পঞ্চাশ বছরটাকে যদি এক ঝলকে, এক পলকে দেখে নেওয়া যেত, তা হলে ঠাকুরবাড়ির সোনালি-সফল দিনগুলোকেও একসঙ্গে দেখা যেত। বাংলার নারীসমাজেও এই সময় এসেছে যুগান্তর। ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরেও জ্ঞানদানন্দিনী-স্বর্ণকুমারী-মৃণালিনী-সৌদামিনীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন প্রতিভা, ইন্দিরা, সরলা, সুষমা, শোভনারা। সবাইকে আমরা পেয়ে যাচ্ছি একসঙ্গে। কিন্তু আলোচনার সুবিধের জন্যে 'একের পর এক' নীতি মেনে নিতে হল। ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের সঙ্গে এবার পাল্লা দিলেন অন্যান্য মেয়েরাও। সবার দানেই নারীপ্রগতি সার্থক হয়ে উঠেছে।

মহর্ষির নাতনিদের মধ্যে সবার চেয়ে বয়সে বড় সৌদামিনীর মেয়ে ইরাবতী আর হেমেন্দ্রনাথের মেয়ে প্রতিভা। দৌহিত্রীদেরও আমরা ঠাকুরবাড়ির মেয়েই মনে করব। যদিও ইরাবতীর সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির যোগ খুব বেশিদিনের নয়। তিনি রবীন্দ্রনাথের সমবয়সি ছিলেন। বিয়ে হয়েছিল পাথুরিয়াঘাটার সূর্যকুমারের দৌহিত্রের পুত্র নিত্যরঞ্জনের সঙ্গে। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের ভাইপো নিত্যরঞ্জন থাকতেন কাশীতে। গোঁড়া হিন্দু-পরিবার হওয়ায় তাঁরা অনেকদিন ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে যোগ রাখেননি। ইরাবতী বাপের বাড়ি এসেছিলেন বিয়ের দীর্ঘ আঠারো বছর পরে। তবে তাঁর যে একটি কল্পনাপ্রবণ মন ছিল সেটি ধরা পড়ে সেই ছোটবেলাতেই, যখন তিনি 'রাজার বাড়ি'র কথা বলে, সমবয়সি মামাটিকে বোকা বানিয়ে দিতেন। তিনি হঠাৎ এসে তাঁকে বলতেন, 'আজ রাজার বাড়ি গিয়েছিলাম'। বালকের কল্পনা সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো ফুলে ফেঁপে উঠত। তাঁর মনে হত, রাজার বাড়ি খুব কাছে, এই বড় বাড়িটারই কোনও একটা জায়গায়, কিন্তু কোথায় সেটা। বালকের ব্যাকুল প্রশ্ন বুক চিরে উঠে আসত, 'রাজার বাড়ি কি আমাদের বাড়ির বাহিরে?'

ইরাবতী মজা পেয়ে বলতেন, 'না, এই বাড়ির মধ্যেই।' তিনি জানতেও পারেননি এই ছোট্ট কথাটি তাঁর মামার মনে কী আলোড়ন জাগায়। কল্পনার সোপানে সেই প্রথম পদার্পণ! বালক শুধু ভাবতেন, 'বাড়ির সকল ঘরই তো আমি দেখিয়াছি কিন্তু সে ঘর তবে কোথায়?' রাজা কে কিংবা রাজত্ব কোথায় সেকথা তিনি জানতে পারেননি; শুধু মনে হয়েছে, তাঁদের বাড়িটাই রাজার বাড়ি। রবীন্দ্রনাথের শৈশব-কল্পনা উজ্জীবনে ইরাবতীর ভূমিকাটিকে আমরা উপেক্ষা করতে পারি না।

ইরাবতীর ছোট বোন ইন্দুমতীর সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির যোগ আরও কম। তাঁর স্বামীর নাম নিত্যানন্দ (নিত্যরঞ্জন) চট্টোপাধ্যায়। ঠাকুরবাড়িতে দুই জামাই 'বড় নিত্য' ও 'ছোট নিত্য' নামেই পরিচিত ছিলেন। ইন্দুমতী থাকতেন সুদূর মাদ্রাজে। নিত্যানন্দ সেখানকার ডাক্তার ছিলেন। খুব স্বাভাবিক কারণেই সেখানে তাঁরা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সমাজের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করতেন বলে ইন্দুমতী বিদেশি আদবকায়দায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। তাঁর যতগুলি ফোটো আমরা দেখেছি সেগুলো সবই গাউন পরা, বিদেশিনীর সাজে।

প্রতিভা বা প্রতিভাসুন্দরী রবীন্দ্রনাথের চেয়ে মাত্র পাঁচ বছরের ছোট। মহর্ষির তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথের প্রথম সন্তান প্রতিভা। সত্যিই প্রতিভাময়ী তিনি। হেমেন্দ্র তাঁকে সর্বগুণে গুণান্বিতা করে তোলার জন্যে একেবারে উঠেপড়ে লেগেছিলেন। তাই প্রতিভা প্রথম জীবনে অবকাশ পেয়েছেন খুব কম। বাড়ির অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে প্রতিভা ও তাঁর বোনেদের কোনও যোগ ছিল না। তাঁদের মহলের দরজা সবসময় বন্ধ থাকত আর বন্ধ কপাটের ওপারে চলত তাঁদের সাধনা। সাদাসিধে বেথুন স্কুলের বদলে তাঁরা ভর্তি হয়েছিলেন লোরেটো হাউসে। লোরেটোতে প্রতিভাই প্রথম হিন্দু (ব্রাহ্ম) ছাত্রী। তখনও মেয়েদের পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা না থাকা প্রতিভা কোনও পরীক্ষা দিতে পারেননি, তবে ওপরের ক্লাস পর্যন্ত উঠেছিলেন।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রতিভা বা তাঁর বাবা হেমেন্দ্রনাথ কেউই এ সময় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার কথা ভাবেননি, অথচ তখনই বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধ দরজা খোলবার চেষ্টা করছিলেন চন্দ্রমুখী বসু। তিনি সময়ের দিক থেকে প্রতিভার সমসাময়িক। মেয়েদের শিক্ষা প্রসারে চন্দ্রমুখীর দান অসামান্য। তিনি এনট্রান্স পরীক্ষা দেবার জন্যে প্রথমে দেরাদুনের নেটিভ ক্রিশ্চান গার্লস মিশনারি স্কুলের অধ্যক্ষ রেভারেন্ড হেরনের কাছে প্রার্থনা জানালেন। হেরন প্রথমে তাঁকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পরীক্ষা দেবার সংকল্প ত্যাগ করতে বলেন। কিন্তু চন্দ্রমুখীর কাতর অনুরোধে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনুমতিও প্রার্থনা করলেন। সত্যিই তো, ছেলেরা যদি পরীক্ষা দিতে পারে তবে এই মেয়েটি পারবে না কেন? কী তার অপরাধ?

অপরাধ না থাকুক, সহজে চন্দ্রমুখীকে অনুমতি দেয়নি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। অনেক তর্কাতর্কির পর ১৮৭৬ সালের ২৬শে নভেম্বরের সিন্ডিকেট সভা চন্দ্রমুখীকে এই শর্তে পরীক্ষায় বসতে দিতে রাজি হলেন যে, তাঁকে নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করা হবে না এবং পরীক্ষকরা তাঁর খাতা দেখে যদি বা পাশের নম্বর দেন, তবু পাশকরা ছাত্রদের তালিকায় তাঁর নাম থাকবে না। চমৎকার সিদ্ধান্ত! ধন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়! চন্দ্রমুখী তাতেই রাজি হলেন এবং পাশও করলেন। এ সময়ও ঠাকুরবাড়ির কোনও মেয়ে এগিয়ে এলেন না পরীক্ষা দিতে, অথচ ঘরে বসে তখন প্রতিভা চন্দ্রমুখীর মতোই শিক্ষিত হয়ে উঠেছেন। তাই ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা প্রথম স্কুলযাত্রীদের একজন হয়েও, প্রথম কলেজে পড়া ছাত্রীর গৌরব থেকে বঞ্চিত হলেন। অবশ্য ঠাকুরবাড়ির কৃতী সন্তানেরা স্কুলে-কলেজে পড়ার ব্যাপারে কোনওদিনই আগ্রহ দেখাননি। হয়তো প্রতিভার মনেও কাজ করেছিল সেই অনীহা।

প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট হিসেবেও চন্দ্রমুখীর নাম করা যায়। সে সময় তাঁর সঙ্গিনী ছিলেন মাত্র আর একজন, কাদম্বিনী বসু। পরে যিনি মহিলা চিকিৎসক হয়েছিলেন। আর সবটাই যে শুধু এই দুটি মেয়ের চেষ্টায় সম্ভব হয়েছিল তা নয়। এদিকে অনেকেরই দৃষ্টি পড়েছিল। ঢাকার 'অবলাবান্ধব' দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের আপ্রাণ চেষ্টায় মেয়েরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা অতিরিক্ত টেস্ট পরীক্ষায় বসার অনুমতি পেলেন। সাহায্য করলেন নারী হিতৈষী ভাইস চ্যান্সেলার স্যার আর্থার হবহাউস। এবারে পাশ করলেন কাদম্বিনী। তিনি কলেজে পড়ার জন্যে অনুমতি চাইলে শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মতি পাওয়া গেল। ১৮৮০ সালে এনট্রান্স পাশ করলেন চণ্ডীচরণ সেনের মেয়ে কামিনী সেন (রায়) ও সুবর্ণলতা বসু। ১৮৮১-তে পাশ করলেন আরও ছ'জন মেয়ে। অবলা দাস (বসু), কুমুদিনী খাস্তগির (দাস), ভার্জিনিয়া মিত্র (নন্দী), নির্মলা মুখোপাধ্যায় (সোম), প্রিয়তমা দত্ত (চট্টোপাধ্যায়) ও বিধুমুখী বসু। বাংলার নারীপ্রগতি আন্দোলনে পরে এঁরা প্রত্যেকেই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এবং অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। পরের ইতিহাস তো সংক্ষিপ্ত। বেথুন কলেজের একমাত্র ছাত্রী হিসেবে কাদম্বিনী এবং ফ্রিচার্চ অব স্কটল্যান্ড থেকে বি.এ. পড়লেন চন্দ্রমুখী। ১৮৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে পরীক্ষার ফল প্রকাশ হলে দেখা গেল, সমস্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রথম দুটি মহিলা গ্র্যাজুয়েটের নাম চন্দ্রমুখী ও কাদম্বিনী। চন্দ্রমুখী পরে এম.এ. পাশ করেন আর কাদম্বিনী

হন চিকিৎসক। কাদম্বিনীকে অনেক কাঠখড় পুড়িয়েই ডাক্তার হতে হয়েছিল, সহজে হয়নি। ভারতে তিনি পরীক্ষকদের বিচারে 'ফেল' করেছিলেন, তবে তাঁকে চিকিৎসা করবার অনুমতি দেওয়া হয়। তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি গ্লাসগো ও এডিনবরা থেকে চিকিৎসকের ডিগ্রি নিয়ে আসেন। মাদ্রাজে ডাক্তারি পড়েছিলেন অবলা দাস। কলকাতায় ভার্জিনিয়া মিত্র ও বিধুমুখী বসু। এভাবেই উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদের দরজা খুলে দিলেন চন্দ্রমুখী ও কাদম্বিনী। সে যুগে এই দুজনকে দেখবার জন্য রাস্তায় লোকের ভিড় জমে যেত। বিশেষ করে মেয়েরা তাঁদের দেখত শ্রদ্ধা মেশানো বিস্ময় নিয়ে। এঁদের সঙ্গে প্রতিভার নামটি যুক্ত হলেই হয়তো সবদিক দিয়ে সুন্দর দেখাত কিন্তু পরীক্ষার ব্যাপারে ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা বেশ খানিকটা পিছিয়েই রইলেন। এগিয়ে গেলেন শিল্প-সংস্কৃতির জগতে।

সংগীতের জগতে বাঙালি মেয়েদের জন্যে আরেকটি মুক্তির পথ খুলে দিয়েছিলেন প্রতিভা। পুরনো-প্রথা না মেনে হেমেন্দ্র তাঁর স্ত্রীকে গান শিখিয়েছিলেন। প্রতিভা চর্চা করেছিলেন দেশি-বিলিতি উভয় সংগীতেরই। শুধু তাই নয়, চিরকালের ট্র্যাডিশন ভেঙে প্রতিভা তাঁর ভাইয়েদের সঙ্গে ব্রহ্মসংগীত গাইলেন মাঘোৎসবের প্রকাশ্য জনসভায়। আর একটি নতুন নক্ষত্রের আত্মপ্রকাশে খুশি হলেন সুধীসমাজ। মেয়েকে গান শেখানোর ব্যাপারে কার্পণ্য করেননি হেমেন্দ্র। বাড়ির ওস্তাদ বিষ্ণু চক্রবর্তীর কাছে তালিম নেওয়া ছাড়াও বিদেশি গান ও পিয়ানো শিখতেন প্রতিভা। আরও নানারকম বাদ্যযন্ত্রও শিখেছিলেন। ১৮৮২ সালে লেখা হেমেন্দ্রের একটি চিঠিতে দেখা যাচ্ছে, তিনি প্রতিভাকে বিলিতি গান সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছেন:

'...কেবল নাচের বাজনা ও সামান্য গান না শিখিয়া যদি Beethoven প্রভৃতি বড় বড় German পণ্ডিতদের রচিত গান বাজনা শিক্ষা করিতে পার, এবং সেই সঙ্গে music theory শেখ তবেই আসল কর্ম হয়।'

প্রতিভা তাঁর বাবার ইচ্ছা সর্বাংশে পূরণ করে মেয়েদের মধ্যে গানের ব্যাপারে অভিজ্ঞ হয়ে উঠলেন। 'বিদ্যোৎসাহিনী' সভায় তাঁর গান আর সেতার শুনে খুশি হয়ে রাজা শৌরীন্দ্রমোহন তাঁকে দিলেন স্বরলিপির বই, রঘুনন্দন ঠাকুর দিলেন বিশাল তানপুরা। গান ছাড়াও আর-একটা ব্যাপারে ট্র্যাডিশন ভাঙলেন প্রতিভা। চন্দ্রমুখী-কাদম্বিনী যেমন বাঙালি মেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন, প্রতিভা তেমনি সুযোগ করে দিলেন গান ও অভিনয় করার। এই দুঃসাহসিক নজির তাঁর কাকিমাদের ঘোড়ায় চড়া বা বিলেত যাওয়ার চেয়ে খুব কম সাহসের কথা নয়। তাঁর কাকিমা, পিসিমারা অভিনয় করেছিলেন ঘরোয়া আসরে। দর্শক হিসেবে যাঁরা ছিলেন তাঁরা সবাই আপনজন, চেনাশোনা মানুষ; সুতরাং লজ্জা ছিল না, সমালোচনার আশঙ্কাও না। সাধারণ মানুষ, যাদের আমরা বলি পাবলিক, সর্বপ্রথম তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন প্রতিভা। ঠাকুরবাড়ির যে কোনও উৎসবে মানুষ ভেঙে পড়ত। তারা শুনত বাঙালি মেয়েদের গান, অবাক হয়ে দেখত ভদ্রঘরের মেয়েরা আসরে বসে গান গাইছে। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেত। তারপর 'বিদ্বজ্জন-সমাগমে'র সভায় মেয়েরা অভিনয় করতেও এগিয়ে এলেন। সবার আগে প্রতিভা, 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র সরস্বতী হয়ে।

রবীন্দ্রনাথ যখন বিলেত থেকে ফিরে এলেন, তখন ঠাকুরবাড়িতে শুরু হয়েছে গীতিনাট্যের যুগ। স্বর্ণকুমারী ও জ্যোতিরিন্দ্রের লেখা 'বসন্ত-উৎসব', 'মানময়ী'র ঘরোয়া অভিনয় হয়ে গেছে কয়েকবার। এমন সময় রবীন্দ্রনাথ দেশি বিলিতি সুর ভেঙে লিখলেন একটি নতুন অপেরাধর্মী গীতিনাট্য। রামায়ণের সুপরিচিত রত্নাকর দস্যুর বাল্মীকিতে রূপান্তরের কাহিনীটিকে তিনি বেছে নিলেন। এই নাটকে তিনটি নারীচরিত্র রয়েছে। বালিকা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী। নাটক লেখার পরেই যখন রিহার্সাল শুরু হল তখন রবীন্দ্রনাথ সরস্বতীর ভূমিকায় প্রতিভার অপূর্ব অভিনয় দেখে নাটকের সঙ্গে প্রতিভার নামটি জুড়ে নতুন নাম দিলেন, 'বাল্মীকিপ্রতিভা'।

এরপর স্থির হল, 'বিদ্বজ্জন-সমাগম' সভায় 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র অভিনয় হবে। সেদিনটা ছিল

শনিবার। ১৬ই ফাল্গুন, বাংলা ১২৮৭ সাল। সন্ধ্যাবেলা। বসন্তের মৃদুমন্দ দক্ষিণা বাতাস বইছে। দর্শকরা উপস্থিত। এমন সময়ে শুরু হল 'বাল্মীকিপ্রতিভা'। ডাকাতের আনাগোনা। গুরুগম্ভীর পরিবেশ। দর্শকেরা মুগ্ধ। স্তব্ধ। বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়। ক্রৌঞ্চমিথুনের জায়গায় সত্যিকারের দুটো মরা বক। বক দুটো অবশ্য জোগাড় করে এনেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। ছোট ভাইয়ের নাটক মঞ্চস্থ হবে, জ্যোতিরিন্দ্র মহা উৎসাহে পাখি শিকারে বেরোলেন। কিন্তু কোথায় পাখি? সারাদিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে খালি হাতে ফিরে আসছেন, তখন দেখলেন, একজন অনেকগুলো বক বিক্রি করতে যাচ্ছে। তার কাছ থেকে দুটো বক কিনে, মেরে বাড়ি নিয়ে আসেন। সেকালে অনেকেই স্টেজের মধ্যে বাস্তব জগৎকে টেনে আনতে চেষ্টা করতেন। শুধু সেকালে কেন? একালেও রিয়্যালিস্টিক স্টেজ করার চেষ্টা কম হয় না। 'কালমৃগয়া'র অভিনয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের একটা পোষা হরিণকে স্টেজে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। এই জাতীয় জিনিসের সূচনা হয় বেঙ্গল থিয়েটারের 'পুরুবিক্রম' নাটকে। ছাতুবাবুদের বাড়ির শরচ্চন্দ্র ঘোষাল পুরু সেজেছিলেন। তিনি একটা সত্যিকারের সাদা তেজিয়ান ঘোড়ার পিঠে চেপে স্টেজে আসতেন।

'বাল্মীকিপ্রতিভা'র অভিনবত্ব ছিল অভিনেত্রীর আবির্ভাবে। হাত বাঁধা বালিকার ভূমিকায় সত্যিই একটি অনিন্দ্যসুন্দরী বালিকা এসে বসল। প্রতিভাকে চিনতে পারলেন অনেকে। এই মেয়েটিই তো সেবার মুগ্ধ করেছিল গান শুনিয়ে, এবারও মুগ্ধ করল সরস্বতী রূপে। নাটকের শেষে এক অনির্বচনীয় তৃপ্তির রেশ নিয়ে ফিরে গেল সবাই। 'আর্যদর্শন' কাগজে যখন এই অভিনয়ের সংবাদ ছাপা হল, তখন দেখা গেল সমালোচক প্রতিভার অভিনয়ের প্রশংসা করে লিখেছেন, 'শ্রীযুক্ত বাবু হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিভা নাম্নী কন্যা প্রথমে বালিকা পরে সরস্বতীমূর্তিতে অপূর্ব অভিনয় করিয়াছিলেন।' প্রতিভা সৌভাগ্যবতী, তাই প্রথম মঞ্চাবতরণের পর তাঁকে সহ্য করতে হয়নি অপমানের গ্লানি। বরং কলারসিকেরা তাঁকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতিই জানিয়েছেন।

'বাল্মীকিপ্রতিভা'য় কিন্তু আরও একটি নারীচরিত্র ছিল—লক্ষ্মী। এই প্রথমবারের অভিনয়ে লক্ষ্মী হয়েছিলেন শরৎকুমারীর বড় মেয়ে সুশীলা। ইন্দিরা সেরকম ইঙ্গিতই করেছেন। অথচ 'আর্যদর্শনে'র সমালোচক লক্ষ্মীর কথা উল্লেখ করেননি দেখে অবাক হতে হয়। তখনকার দিনের পক্ষে লক্ষ্মীর ভূমিকা দেখেও তো মুগ্ধ হবার কথা। বাইরের রঙ্গমঞ্চে অবশ্য তখন বড় বড় অভিনেত্রীর আবির্ভাব হয়েছে, নটী বিনোদিনীর অভিনয়ে কলকাতা সরগরম। তবু কোনও সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে তখনও অভিনয়ের কথা ভাবতেই পারতেন না। হয়তো সুশীলার অভিনয় খুব ভাল হয়নি। তবু তাঁর প্রথম প্রয়াস অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য। সুশীলার কথা এরপরেও আর শোনা যায়নি। তাঁরা ছিলেন চার বোন। অপর তিনজন সুপ্রভা, স্বয়ংপ্রভা ও চিরপ্রভা। শেষোক্ত দুজনের কথা বিশেষ কিছু জানা যায়নি, তবে সুপ্রভা সম্বন্ধে একথা চলে না। ঠাকুরবাড়িতে বাস করেও এঁরা কেউ চারুপাঠের বেশি লেখাপড়া যেমন শেখেননি, তেমনি শিল্পকলার চর্চা করেছেন বলেও শোনা যায়নি; প্রত্যেকেই ছিলেন গৃহকর্মনিপুণা এবং সাংসারিক কাজ নিয়েই থাকতে ভালবাসতেন। সুপ্রভা তারই মধ্যে অসাধারণ প্রাণপ্রাচুর্যে পূর্ণ এবং সুরসিক ছিলেন। সরলা লিখেছিলেন, 'সর্বনীচের তলার বামুন ও দাসীমহল থেকে আরম্ভ করে সর্বোচ্চতলার বড়দের মহলে কি ঘটছে না ঘটছে, সে সবের খবর তিনি রাখেন।...হাসিয়ে হাসিয়ে কথা কইতে, সভা জমাতে ইনি অদ্বিতীয়।' ব্রাহ্ম হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তীকালে তিনি গুরুমন্ত্র নিয়ে শিবপুজো করতেন। ধর্ম সম্বন্ধে নিজের স্বাধীনতাকে তিনি খর্ব করতে চাননি বলে বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আসতেন। বাড়ির সংস্কার ভঙ্গ করেছেন বলে লজ্জিত বা দুঃখিত হননি। বিখ্যাত শিল্পী অসিতকুমার হালদার তাঁর সন্তান।

ঠাকুরবাড়িতে সুশীলার মতো সুপ্রভাও দু-একবার অভিনয় করেছিলেন। বোধহয় হিরণ্ময়ীর

বিয়ের সময়। স্বর্ণকুমারীর লেখা 'বিবাহ-উৎসবে'র অভিনয়ে সুপ্রভা সাজলেন নায়কের বন্ধু। ঠাকুরবাড়িতে প্রত্যেক বিয়েতে একটা করে থিয়েটার হত। অন্যান্য বড় লোকের বাড়িতে হত বাঈ-নাচ বা পেশাদার যাত্রা ও থিয়েটার। মহর্ষিভবনে বাঈ-নাচ কোনওদিনই হত না। তার বদলে ছেলেরা ও মেয়েরা একটা করে নাটক অভিনয় করতেন। এই অভিনয়ের প্রয়োজন হয়েছিল আরেকটা কারণে। সে সময় ঠাকুরবাড়িতে সব আত্মীয়স্বজন অবাধে আসতে পারতেন না, এমনকী পাঁচ বা ছয় নম্বরের অধিবাসীরাও নয়। ইচ্ছে থাকলেও সামাজিক বাধা ছিল; মহর্ষিপরিবার ব্রাহ্ম, তাঁরা হিন্দু বিয়েতে যেখানে শালগ্রাম শিলা আছে সেখানে যেতেন না। অপরদিকে গুণেন্দ্রপরিবারও ওবাড়ির কাউকে নিমন্ত্রণ করতেন না, পাছে অন্য আত্মীয়েরা ব্রাহ্মদের সঙ্গে পঙক্তিভোজনে না বসেন। অথচ কে না চায় আনন্দ অনুষ্ঠানে সবাই আসুক। তাই বিয়ের পরদিন কিংবা আটদিনের দিন একটা নাটক অভিনয় হত এবং তাতে সবাই নিমন্ত্রিত হতেন। এ সময় মিষ্টান্ন বিতরণ হত হাতে-হাতে, পঙক্তিভোজন না হওয়ায় জাতপাতের বালাই নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতেন না। এইরকমই একটা ঘরোয়া অনুষ্ঠানে সুপ্রভা সাজলেন নায়কের সখা। 'বিবাহ-উৎসব' আরও একবার অভিনীত হয় সুপ্রভার বিয়ের সময়। বিয়ের কনে হয়ে যাওয়ায় সুপ্রভার ভূমিকাটি পান স্বর্ণকুমারীর ছোট মেয়ে সরলা।

'বিবাহ-উৎসবে'র কথায় আরও কয়েকজনের কথা মনে পড়ে। একজন এ নাটকের নায়ক, তাঁর নামও সুশীলা। তবে তিনি ঠাকুরবাড়ির মেয়ে নন, বউ। দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিপেন্দ্রের প্রথমা স্ত্রী। অপরজন এ নাটকের নায়িকা সরোজাসুন্দরী। সরোজাসুন্দরী এবং উষাবতী দ্বিজেন্দ্রনাথের দুই মেয়ে। বিয়ে হয়েছিল রাজা রামমোহন রায়ের পুত্রের দৌহিত্র বংশে—মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় এবং রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। মোহিনীমোহন ভারতীয় থিয়সফিস্ট আন্দোলনের উদ্যোক্তা, পরে তিনি দীর্ঘ সাত বছর আমেরিকায় বাস করেন। তাঁর দার্শনিক চিন্তা, কবিত্বশক্তি আর ইংরেজি ভাষার ওপর চমৎকার দখল সেকালে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। অন্যান্য গ্রন্থ রচনা ছাড়াও তিনি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা। এঁর আরেক ভাই রজনীমোহনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল অবন-গগনের ছোট বোন সুনয়নীর এবং বোন হেমলতার সঙ্গে দ্বিপেন্দ্রনাথের বিয়ে হয় তাঁর প্রথমা স্ত্রী সুশীলার মৃত্যুর পরে।

সরোজা ছিলেন অসামান্য রূপসী। লক্ষ্মীর পদ্মের পাপড়ির মতো টানা টানা দুটি চোখ, বর্ণচ্ছটা দুধে-আলতায়, আর মেঘের মতো একঢাল কালো চুল। সরোজার নাতনি সুরভি লিখেছেন, 'সাধারণ কায়দায় খোঁপা বাঁধতেন, সে খোঁপা ঘাড়ের ওপর এলিয়ে পড়ত। মোগল বাদশাদের বিবিদের অনুকরণে জুলফিও রাখতেন তিনি। তাঁর দুধে-আলতা-রঙের গালে জুলফি মানাতো চমৎকার।' তাঁর মুখশ্রীতে ছিল এক স্নিগ্ধ কোমল মাধুর্য। 'বিবাহ-উৎসবে' তিনি নিয়েছিলেন নায়িকার ভূমিকা। তাঁর গানের গলাটিও ছিল ভাল। পরে অবশ্য সুগৃহিণী হিসেবে তিনি যতটা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, বহির্জগতে ততটা ছড়িয়ে পড়তে পারেননি। মোহিনীমোহন যখন আমেরিকায় যান তখন পাথেয় হিসেবে তাঁর হাতে সরোজা তুলে দিয়েছিলেন তাঁর সমস্ত গয়না। উপার্জন করতে শুরু করে মোহিনীমোহন কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করেছিলেন, সরোজার কোনও ইচ্ছেতেই তিনি বাধা দিতেন না। তবু সরোজার জগৎটা তাঁর পরিবারের সুখেই পূর্ণ ছিল। খুব ভাল রাঁধতেন এবং খাওয়াতে ভালবাসতেন। তা বলে দিনের সব সময়টাই সাবেক রুচি নিয়ে কাটত তা নয়, প্রতিদিন বিকেলে ল্যান্ডো চেপে তিনি গঙ্গার ধারে হাওয়া খেতে যেতেন। উষাবতী গান গাইতেন কোরাসে। একবার 'কালমৃগয়া'য় তিনি ও ইন্দিরা সেজেছিলেন বনদেবী। ঠাকুরবাড়িতে এঁদের অভিনয় বা অন্যান্য ভূমিকা, হয়তো খুব স্মরণীয় নয়। কিন্তু সম্মিলিতভাবে এঁরা

ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলকে যেভাবে আলোকিত করে তুলেছিলেন, সে কথা ভোলা যায় না। তাছাড়া কোনওদিন যদি রবীন্দ্র-নাটকের প্রতিটি অভিনয়ের পাত্র-পাত্রীদের খোঁজ করা হয়, তাহলেও দেখা যাবে তাঁর প্রথমদিকের নাটক এবং গানকে বাড়ির ছেলেমেয়েরাই সবার সামনে তুলে ধরেছিলেন।

আবার 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র কথাতেই ফিরে আসা যাক। একবার বেশ বড় মাপের 'বাল্মীকিপ্রতিভা' অভিনয়ের আয়োজন করা হল। ১৮৯৩ সালে লেডি ল্যান্সডাউনের সংবর্ধনা উপলক্ষে। এর আগে এক যুগ ধরে (১৮৮১-১৮৯২) 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র বহু মঞ্চাভিনয় হয়ে গেছে। প্রতিবারই সরস্বতী সেজেছেন প্রতিভা এবং বাল্মীকি রবীন্দ্রনাথ। এবার আমন্ত্রণ জানানো হল বহু গণ্যমান্য ইংরেজ দর্শকদের। স্টেজ সাজাবার ভার দেওয়া হল দ্বিজেন্দ্রনাথের অন্যতম পুত্র নীতীন্দ্রনাথকে। তিনি প্রাণপণে স্টেজে 'ন্যাচারাল এফেক্ট' আনবার চেষ্টা করলেন। বারান্দা থেকে টিনের নল লাগিয়ে বৃষ্টির জল পড়ার ব্যবস্থাও হল। সাহেবরা খুব খুশি। এবার হাত-বাঁধা বালিকা সাজলেন প্রতিভার সেজো বোন অভিজ্ঞা আর লক্ষ্মী সাজলেন সত্যেন্দ্র-দুহিতা ইন্দিরা। সরস্বতীর ভূমিকা তো প্রতিভার বাঁধা। সাদা সোনার পদ্মফুলে শুভ্র সাজে প্রতিভা যখন অস্ট্রিচ পাখির ডিমের খোলা দিয়ে তৈরি বীণাটি হাতে নিয়ে বসে ছিলেন তখন প্রথমে সবাই ভাবল বুঝি মাটির প্রতিমা। তাই শেষে প্রতিভা যখন উঠে এসে বীণাটি কবির হাতে তুলে দিয়ে মধুর কণ্ঠে বললেন, 'এই যে আমার বীণা, দিনু তোরে উপহার—যে গান গাহিতে সাধ, ধ্বনিবে ইহার তারে।' তখন অডিয়েন্স মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেল। এই অভিনয়গুলি সাফল্য প্রমাণ করল ঠাকুরবাড়ির শিল্পরুচির গভীরতা এবং মাধুর্য। নাটক এবং অভিনয় বললেই যে আদিরসাত্মক একটি কাহিনী বা ভক্তিরসাশ্রিত পৌরাণিক কাহিনী বেছে নেবার দরকার নেই, সেকথাও সকলেই বুঝল।

প্রতিভা পরবর্তী জীবনেও গানের জন্য অনেক সাধনা করেছেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁকে কোনও বাধা পেতে হয়নি। সত্যেন্দ্রর স্ত্রীর মতো প্রতিভার স্বামীও ছিলেন বিখ্যাত ব্যক্তি, রবীন্দ্র-সুহৃদ আশুতোষ চৌধুরী। দ্বিতীয়বার বিলেত যাবার সময় রবীন্দ্রনাথ আশুতোষের সঙ্গে পরিচিত হন। পাবনার বিখ্যাত চৌধুরী পরিবারের সন্তান আশুতোষ এসেছিলেন ভিন্ন পরিবেশ থেকে। মুক্তবুদ্ধি উদার সমাজ-পরিবেশ বা সংস্কৃতির আলো কোনওটাই তিনি প্রথম থেকে পাননি। কিন্তু যা করেছিলেন তারও তুলনা মেলে না। তাঁরা সাত ভাই-ই বিভিন্ন গুণের অধিকারী ছিলেন। বিদ্বান হয়ে আশুতোষ ও প্রমথর তো কথাই নেই। বাংলা সাহিত্যের আসরে আশুতোষকে পাওয়া না গেলেও রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল'কে যথোচিত পর্যায়ে সাজিয়ে তিনিই প্রকাশ করেন। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বছরে বি.এ. ও এম.এ. পাশ করা (১৮৮০)। আশুতোষ বিলেত যাচ্ছিলেন বেশ কাঠখড় পুড়িয়ে। তাঁর দিদি প্রসন্নময়ীর লেখা 'পূর্বকথা' পড়ে জানা যায় আশুতোষের পথ মোটেই সুগম ছিল না। চৌধুরীদের মধ্যে আশুতোষই প্রথম বিলেত গেলেন। তার আগে তাঁদের জেলার আর কেউ বিলেত যায়নি। তাই 'জাত গেল', 'জাত গেল' রব উঠল চারদিকে। চৌধুরীরা কেউ প্রায়শ্চিত্ত করে সমাজে ওঠার চেষ্টা না করায় সমাজপতিরা আক্রমণ করলেন আশুতোষের বিধবা পিসিদের। তাঁদের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হল। প্রত্যেকে পাঁচ কাহন কড়ি দিয়ে মাথা মুড়িয়ে তবে অব্যাহতি পেলেন। প্রসন্নময়ী লিখেছেন, 'তাঁহারা যে বালবিধবা, আজীবন ব্রহ্মচর্য প্রতিপালন করিয়া চলিয়াছেন, অথচ কেন তাঁহাদিগের জাতি লইয়া টানাটানি পড়িয়া গেল, সেটা বুঝিবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না।' সমাজে এই ছিল বাংলাদেশের খাঁটি ছবি। সে সময় হিন্দুর ছেলে বিলেত গেলেই বাড়িশুদ্ধ সকলকে এমনি সামাজিক অত্যাচার সহ্য করতে হত। অথচ সময়ের দিক থেকে ১৮৮১ সাল খুব পুরনো নয়। এর আগে জ্ঞানদানন্দিনী দুটি ছেলেকে নিয়ে

নিয়ে বিলেত ঘুরে এসেছেন। চক্রবর্তী গান গেয়ে গেছেন এবং, কার্তিকের সঙ্গে আসরের হবার জোগাড় করেছেন। ... 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র অভিনয় করতে।

রবীন্দ্রনাথের কোনো বিলেতে যাওয়া হল না। কিন্তু আশুতোষের সঙ্গে প্রতিভার খুব ভাব। তিনি বিলেত থেকে ফিরে আশুতোষ ঠাকুরবাড়ির জামাতাদের সঙ্গে পরিচিত হলেন। তাঁর সাহিত্যানুরাগ ঠাকুরবাড়ির সকলেরই খুব ভাল লাগল। আলাপ হল প্রতিভার সঙ্গে। রূপে গুণে সরস্বতী প্রতিভার সঙ্গে এমন কোনো দুটিতে যোগ্যকে সুন্দর মানাবে, সুতরাং বিয়ের সানাই বাজতেও দেরি হল না। এই বিয়েতে আনন্দে খুশি হয়েছিলেন সকলেই, লিখেছিলেন, 'আশু আমার একটা অর্জন। ...' এ সময় একটা ঘটনা ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কোনও সময় ইন্দিরা, একই গাড়িতে উঠেছিলেন আশুতোষ। এ ঘটনার পরেও কোনো ... ছিল না কিন্তু ভয়ে কাঁটা হয়ে নীপময়ী লেখেছিলেন, 'জ্ঞানদানন্দিনী তুমি তাঁর মেয়ের সঙ্গেই আশুতোষের বিয়ে দিয়ে দাও।' প্রতিভা জ্ঞানদানন্দিনীর সঙ্গে ... ছিল আশুতোষেরই মতি। তাই সম্বন্ধ জ্ঞানদানন্দিনী তো রেগে আগুন। তাঁর মেয়ের নাম নয়, এর সঙ্গে বিয়ে দেবেন কি না সন্দেহ থেকে না। একই সঙ্গে মৃত্যু হয় হেমেন্দ্রনাথের। কিছুদিন পরে প্রতিভার সঙ্গে আশুতোষের বিয়ে হয়ে গেল। অনেকের মনেই প্রশ্ন জেগেছিল আশুতোষের বাড়ির ছয় ভাইয়ের সঙ্গে প্রতিভার ছয় বোনের বিয়ে হবে কিনা? এঁদের মধ্যে তিন ভাইয়ের সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির আরও তিনজন মেয়ের বিয়ে হয়েছিল কিন্তু তাঁরা কেউই প্রতিভার মিলনের মেল ছিলেন না। এই বিয়ে উপলক্ষে দুটি পরিবারের যুবক-যুবতীদের আলাপেই গভীর মেলামেশা ঘটেছিল। অনেকে মনে করেন এর কারণ ঠাকুরবাড়ির শিল্প-সংস্কৃতির টান, আবার কেউ কেউ বলেন এর পিছনে ছিল ঠাকুরবাড়ির রূপবতী-গুণবতী শিক্ষিতা মেয়েদের সঙ্গে পরিচিত হবার বাসনা। কারণ যাই হোক না কেন, বাংলাদেশের সমস্ত শিক্ষিত সমাজই ঠাকুরবাড়ির সমাজে, বিশেষত বাড়ির বিদুষী সঙ্গীতজ্ঞ মেয়েদের সমাজে, আসতে চেয়ে উঠেছিলেন আরো সাগ্রহ চেষ্টা। ইন্দিরা জানিয়েছেন, ঠাকুর এবং চৌধুরী-পরিবারের ঘনিষ্ঠ মেলামেশা সব সময়েই যে সুখ পরিণতি লাভ করেছিল তা নয়। এইসব ছোটোখাটো ঘটনার মধ্যে দিয়ে আমরা মাঝে মাঝে সমসাময়িক সমাজের ছবিটা যেন দেখতে পাই।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রে প্রতিভার অবিস্মরণীয় অবদান হল স্বরলিপি রচনার ব্যাপারে পথপ্রদর্শন। তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বরলিপি পদ্ধতি এবং আকারমাত্রিক প্রয়োগ পদ্ধতিতে যেমন নতুনত্ব এনেছিলেন তেমনি তাকে আরো ফুটিয়েছিলেন সমাজের ব্যবহারের উপযোগী। প্রতিভার আগে কোনও মহিলা স্বরলিপি নির্মাণের ব্যাপারে এগিয়ে আসেননি।

জ্ঞানদানন্দিনীর 'বালক' পত্রিকায় প্রতিভার স্বরলিপি পদ্ধতি প্রকাশ হতে থাকে। 'বাল্মীকিপ্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া' গানগুলিরও প্রথম স্বরলিপিকার স্বয়ং প্রতিভা। শোনা যায়, এক সময় হেমেন্দ্রনাথের নির্দেশে তিনি বহু ব্রহ্মসঙ্গীত ও হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের স্বরলিপি তৈরি করেন। সংখ্যা আমরা খুঁজে দেখিনি তবে প্রতিভার এক ভাই হিতেন্দ্রনাথ ১৩১১-র আষাঢ় সংখ্যা 'পুণ্য' জানাচ্ছেন যে, এই সংখ্যা প্রায় তিনশো-সাড়েশো। কিন্তু শুধু স্বরলিপি নির্মাণ করলেই তো হবে না, গাইবে কে?

প্রতিভা না হয় প্রকাশ্যে গান গেয়ে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করলেন, তাকে নিয়ে নতুন রুচিশিক্ষা আরো এগিয়ে রাখতে হবে তো। সে ভারও নিলেন প্রতিভাই। স্বরলিপি নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে চলল গান শেখাবার চেষ্টা। তারও হাতেখড়ি 'বালকে'। সেখানে তিনি ধারাবাহিকভাবে খুললেন একটি গানের ক্লাস 'সঙ্গীত-শিক্ষা'। 'বালক' ছোটদের কাগজ, ছোটদের দিয়ে শুরু করা ভাল, তাই তিনি প্রথমে ছোটদের গানের জন্য নিজেই গান রচনা করেন। সেই গানেই প্রতিভা গানের

সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন, 'গান মানুষের স্বাভাবিক'। হাসি-কান্নার সময় মানুষের
কণ্ঠস্বরে পরিবর্তন হয়। তাই বোঝা যায় 'নানা ভাবের নানা সুর আছে,' সেই সুরের চর্চা করেই
গানের উৎপত্তি হয়েছে। সংগীতের সম্বন্ধে প্রতিভার এই সংজ্ঞা নির্ণয় তাঁর একান্ত নিজস্ব।
পরিণত বয়সে তিনি আরও মৌলিক সংগীতচিন্তার পরিচয় দিয়েছিলেন।

গান এমন একটা জিনিস যার জন্য শুধু জ্ঞান নয়, রীতিমতো চর্চার প্রয়োজন আছে। প্রতিভা
সেই চেষ্টায় নিজের বাড়িতে প্রথমে 'আনন্দসভা' পরে 'সঙ্গীত-সংঘ' স্থাপন করেন। গান শেখার
স্কুল হিসেবে 'সঙ্গীত-সংঘ' খ্যাতিলাভ করে। এখানে প্রতিভা শেখাতেন খাঁটি ওস্তাদি হিন্দুস্থানি
গান। যদিও বিদেশি সংগীতেও তাঁর ছিল অবাধ অধিকার। শিখেছিলেন Nicolini-এর কাছে।
বাঙালি মেয়েরা ভাল করে গান শেখার সুযোগ পেল। অবশ্য 'সঙ্গীত-সংঘে'র সঙ্গে
'সঙ্গীত-সম্মিলনী' নামটাও অনেকেরই চেনা মনে হবে। সেটিও গানের স্কুল। স্থাপন করেছিলেন
মিসেস বি. এল. চৌধুরী, অর্থাৎ বনোয়ারিলাল চৌধুরীর স্ত্রী প্রমদা চৌধুরী। এই দুটি স্কুলের
সুযোগ হওয়ায় বাঙালি মেয়েরা অনেকেই গান শিখতে শুরু করেন। বিশেষ করে প্রতিভা তখন
লেডি চৌধুরী হিসেবে পরিচিত। বিচারপতি স্যার আশুতোষের স্ত্রীর স্কুলে উচ্চবিত্ত পরিবারের
মেয়েরাও গান শিখতে আসার সাহস পেয়েছিলেন। স্কুলে উচ্চাঙ্গ সংগীতের সঙ্গে যন্ত্রসংগীত
শেখানো হত। বিশেষ করে সেতার ও এসরাজ। প্রতিভার স্কুলটির দেখাশোনার কাজে ইন্দিরাও
এসে যোগ দিয়েছিলেন, ঘটনাসূত্রে তখন তিনিও এসেছেন চৌধুরীবাড়ির বউ হয়ে।

গান শেখানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিভা একটা সংগীত বিষয়ক পত্রিকার কথাও ভাবছিলেন।
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সঙ্গীত প্রকাশিকা' অনেকদিন আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সংগীত চর্চার
জন্য ওইরকম একটা পত্রিকা থাকা খুবই প্রয়োজন। তাই 'আনন্দসভা'র নামে প্রতিভা নতুন
পত্রিকার নাম দেন 'আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা'। তবে কোনও কিছু একা করায় প্রতিভার বড় সংকোচ
ছিল এবারও দলে টানলেন ইন্দিরাকে। যুগ্ম সম্পাদনায় 'আনন্দ সঙ্গীত' আট বছর সগৌরবে
প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় প্রতিভা শুধু নিয়মিত ভাবে স্বরলিপি প্রকাশ করতেন তা নয়,
সেইসঙ্গে চলত লুপ্ত সংগীত পুনরুদ্ধারের চেষ্টা। শুধু কি সংগীত ও যন্ত্রসংগীতের পুনরুদ্ধারের
চেষ্টা? প্রতিভা প্রাচীন সংগীতশিল্পীদেরও বিস্মৃতির অন্তরাল থেকে উদ্ধার করতে লাগলেন—
তানসেন, সা সদারঙ্গ, বৈজু বাওয়া নায়ক, মহারাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও আরও অনেক
সংগীতস্রষ্টার জীবনী রচনা তাঁর সংগীত সম্পর্কিত চিন্তার বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছে। শিল্প ও
শিল্পী উভয়কে না জানলে সাধনা অপূর্ণ থেকে যায়। তাঁর চেষ্টায় বহু সংগীতজ্ঞের জীবন ও
সাধনার লুপ্ত ইতিহাস সংগৃহীত হয়েছে। গানের ক্ষেত্রে প্রতিভা তাঁর কাকা-জ্যাঠাদের মতো
খ্যাতি পাননি বটে কিন্তু সংগীতজগতে তিনি তাঁর গুরুজনদের মতোই সমান কৃতিত্বের
অধিকারিণী। প্রতিভার মৃত্যুর পরে 'সঙ্গীত সংঘে'র পুরস্কার বিতরণ সভায় তাঁর কাকা
রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলেছিলেন তার মধ্যেই প্রতিভার প্রকৃত পরিচয় লুকিয়ে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ
বলেন, 'সংগীত শুধু যে তাঁর কণ্ঠে আশ্রয় নিয়েছিল তা নয়, এ তাঁর প্রাণকে পরিপূর্ণ করেছিল।
এরই মাধুর্যপ্রবাহ তাঁর জীবনের সমস্ত কর্মকে প্লাবিত করেছে।'

রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে প্রতিভার প্রধান কৃতিত্ব স্বরসন্ধিসহ কয়েকটি রবীন্দ্রসংগীতের
স্বরলিপি রচনা করা। এর সার্থক উদাহরণ 'কোন আলোকে প্রাণের প্রদীপ' গানের স্বরলিপি।
সংস্কৃত স্তোত্রে সুর দিয়ে গাওয়ার পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথের একান্ত নিজস্ব। তাঁর দেওয়া সুরে
বেদগানের স্বরলিপিও তৈরি করেন প্রতিভা। মাঘোৎসবের সূচনা হত একটি বেদগানের
ভাবগম্ভীর পরিবেশ দিয়ে। কখনও 'যদেমি প্রস্ফুরন্নিব', কখনও 'তমীশ্বরাণাং', আবার কখনও
'গীতা স্তোত্র' দিয়ে। প্রতিবারই প্রতিভা স্বরলিপি তৈরি করে অন্যদের গান শেখাতেন। তিনি
নিজেও যে দু-একটা গানে সুর দেননি তা নয়, 'ত্বমাদিদেব পুরুষপুরাণ' স্তোত্রে তিনি কেদারা
রাগিণীর সুর বসান। সংখ্যায় কম হলেও প্রতিভার নিজের লেখা গানও দুর্লভ নয়, বিশেষ করে

'সাঁঝের প্রদীপ দিনু জ্বালায়ে' এবং 'দীনদয়াল প্রভু ভুলো না অনাথে' ব্রহ্মসংগীত হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

প্রতিভার জীবনে গানের সঙ্গে মিশে ছিল আরও দুটি জিনিস—ধর্ম ও জ্ঞানস্পৃহা। মহর্ষির অধ্যাত্মসাধনা এবং হেমেন্দ্রের উগ্র ধর্মানুরাগ সঞ্চারিত হয়েছিল প্রতিভার জীবনে। নববর্ষের উপদেশে তিনি বলেছিলেন, 'পৃথিবীতে সকল স্থানেই, অর্থের মান, অর্থের আদর, অর্থের জয়। কিন্তু ধর্মের কাঙালকে চিরদিনই সঙ্গী করিতে হয়। ধর্মের জয় তোমার নিকট। তোমার জন্য ধার্মিক লোক সকলই তুচ্ছ করিয়া তোমা ধনে ধনী হইবার জন্য কতই না সহ্য করেন। এই অর্থ, বিষয় আশয় কিছুই চিরদিনের জন্য নয় কিন্তু তুমি চিরদিনের পিতা, মাতা, গুরু, বন্ধু।'

ঠিক সাহিত্যচর্চা না করলেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ওপর প্রতিভার বেশ দখল ছিল। তিনি ইংরেজি, ফরাসি, ল্যাটিন, সংস্কৃত প্রভৃতি নানা ভাষা যেমন শিখেছিলেন, তেমনি ইতিহাস-ভূগোল ও অন্যান্য বিদ্যাচর্চাতেও আগ্রহী ছিলেন। ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য মেয়েদের দু-চারটে লেখা যেমন ইতস্তত চোখে পড়ে প্রতিভার লেখা সেরকম দেখা যায় না। তাঁর বক্তৃতা সংগ্রহ 'আলোক' ছাপা হয়েছিল অনেকদিন আগে। সেখান থেকে তাঁর বক্তৃতার কিছু অংশ উদ্ধৃত হল। সে অংশটির মধ্যে প্রতিভার রচনারীতির বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। প্রতিভা লিখছেন:

'ভাল চিন্তা হৃদয়কে অধিকার না করিলে ভাল হইবার দিকে অগ্রসর হওয়া যায় না। চিন্তার ভালমন্দ গতি আমাদের আচার ব্যবহারের গতি নিয়মিত করে। চিন্তা সংযত না হইলে আমাদের স্বভাব যথেচ্ছাচারী ও শিথিল হইয়া পড়ে। কিন্তু কাহার চালনায় এই চিন্তাকে আমরা সংযত করিতে পারি? কুপথ হইতে ফিরাইয়া লইতে পারি? সে সারথি কে? সে আর কেহ নয়—জ্ঞান। চিন্তাকে সুপথে চালনা করিবার জন্য আমাদের জ্ঞানের শরণাপন্ন হইতে হইবে।'

এই সংক্ষিপ্ত উক্তিই বিদুষী প্রতিভার জ্ঞানতৃষ্ণা ও সংযত চিন্তার প্রতি আগ্রহ প্রমাণ করে। নববর্ষের প্রীতি উপহার হিসেবে তিনি মাঝেমাঝে ছোট ছোট কবিতাও লিখতেন। একবার লিখেছিলেন 'বর্ষপ্রবেশ':

'বর্ষ এল বর্ষ গেল নিয়তি তোমার,
সুমঙ্গল পাঞ্চজন্য বাজিল আবার
প্রকৃতির ঘরে ঘরে নব অনুরাগে
ভরিয়া উঠিল বিশ্ব নবীন সোহাগে।'

প্রতিভা যখন সংগীতচিন্তায় বিভোর, লুপ্ত সংগীতশিল্পীদের পরিচয় উদ্ধারে তৎপর, ঠিক সেই সময় তাঁর মেজো বোন প্রজ্ঞাসুন্দরী ব্যস্ত ছিলেন আর-একটা চিরপুরনো অথচ চিরনতুন জিনিস নিয়ে। দিদির মতো তিনিও লেখাপড়া শেখা, গান শেখা, স্কুল যাওয়া, ছবি আঁকা দিয়ে জীবন শুরু করেছিলেন কিন্তু নদী যেমন এক উৎস থেকে বেরিয়েও ভিন্নমুখী হতে পারে, তেমনি প্রজ্ঞাও ধরলেন একটি নতুন পথ। ঠাকুরবাড়িতে সবরকম শিল্পচর্চার সুযোগ ছিল। মেয়েরাও শিখতেন নানারকম কাজ। কিন্তু প্রজ্ঞার মন টেনেছিল রান্নাঘর। এমন আর নতুন কি? ঠাকুরবাড়িতে সব মেয়ে-বউই অল্পবিস্তর রাঁধতে শিখতেন; তার মধ্যে পেয়েছেন বেশি নম্বর কাদম্বরী ও মৃণালিনী। শরৎকুমারী ও সরোজাসুন্দরীরও এ ব্যাপারে সুনাম ছিল। সৌদামিনীদের প্রতিদিন একটা করে তরকারি রাঁধা শিখতে হত। তবে আর প্রজ্ঞার নতুনত্ব কোথায়? বলতে গেলে উত্তরাধিকারসূত্রেই তিনি রান্না শিখেছিলেন। তা শিখেছিলেন ঠিকই। প্রজ্ঞার মা নীপময়ীও ভাল রাঁধতেন। মহর্ষিরও এ ব্যাপারে কম উৎসাহ ছিল না। অথচ তাঁদের বাড়িতে রোজকার ব্যঞ্জন ছিল 'ডাল—মাছের ঝোল—অম্বল, অম্বল—মাছের ঝোল—ডাল'। বড়ি

ভাজা, পোর ভাজা, আলু ভাতে ছিল ভোজের অঙ্গ। আসলে এ ব্যবস্থা ছিল বারোয়ারি। তবে তরকারিতে মিষ্টি দেবার প্রচলন হয় ঠাকুরবাড়ি থেকেই। মহর্ষি নিজে মিষ্টি তরকারি খুব ভালবাসতেন। বউয়েরা ঘরে নানারকম তরকারি ও মিষ্টি তৈরি করতেন। প্রজ্ঞার বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি শুধু নিজের হাতে রাঁধা খাবার প্রিয়জনদের মুখে তুলে দিয়ে নিরস্ত হননি। ঠাকুরবাড়ির চিরকেলে রেওয়াজ ছেড়ে নিজেদের আবিষ্কার করা পিঠে-পুলি-পোলাও-ব্যঞ্জন তুলে দিতে চেয়েছেন সকলের মুখে। এখানেই তাঁর অনন্যতা।

বাস্তবিকই রান্না এবং রান্নাঘর নিয়ে, কেতাবি ভাষায় রন্ধনতত্ত্ব ও রন্ধনবিদ্যা নিয়ে তিনি যত মাথা ঘামিয়েছেন, তত চিন্তা আর কোনও মহিলা করেছেন বলে মনে হয় না। ঘরের কোণে বসে রান্নার পরীক্ষা চালাবার সময় তিনি সেগুলো লিখে রেখেছিলেন ভাবীকালের আগন্তুকদের জন্যে। তাই তাঁর 'আমিষ ও নিরামিষ আহার'-এর বইগুলি এত নতুন হয়ে দেখা দিয়েছিল। আধুনিক যুগে গার্হস্থ্যবিজ্ঞানের বহু বই লেখা হয়েছে ও হচ্ছে, কিন্তু প্রায় একশো বছর আগে লেখা প্রজ্ঞার বইগুলি হাতে নিয়ে অবাক হয়ে যেতে হয়। অবশ্য এ ব্যাপারে আরও দু-একজনের নাম করা যায়। কিরণলেখা রায়ের 'বরেন্দ্র রন্ধন' ও 'জলখাবার', নীহারবালা দেবীর 'আদর্শ রন্ধন শিক্ষা' ও বনলতা দেবীর 'লক্ষ্মীশ্রী'ও রান্নার বই হিসেবে জনপ্রিয় হয়েছিল, তবে সে পরের কথা! পুরুষেরাও এ ব্যাপারে দক্ষতা দেখিয়েছিলেন, সংস্কৃত 'পাকরাজেশ্বর' অনুবাদ করিয়েছিলেন বর্ধমানরাজ। বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়ের 'রান্নার বই'ও অনেক আগেই প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু প্রজ্ঞা ভেবেছিলেন বেশি। তাঁর রান্নার বই দুটির ভূমিকাকে আমরা একাধারে রন্ধনতত্ত্ব ও গার্হস্থ্যবিদ্যার আকর বলে ধরে নিতে পারি। বিয়ের পরে বেশ গিন্নিবান্নি হয়েই প্রজ্ঞা এ কাজে হাত দিয়েছিলেন।

প্রতিভার মতো প্রজ্ঞারও বিয়ে হয়েছিল এক বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে। অসমিয়া সাহিত্যের জনক লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া তাঁর স্বামী। বিয়ের আগে লক্ষ্মীনাথের সঙ্গে তাঁর কোনওরকম সাক্ষাৎ হয়নি। লক্ষ্মীনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে জানিয়েছেন যে, ঠাকুরবাড়ির এই গুণবতী, শিক্ষিতা, সুশীলা ও ধর্মপ্রবণা মেয়েটির ছবি দেখেই তিনি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং বিবাহে সম্মত হন। যদিও তাঁর নিজের বাড়ি থেকে এসেছিল প্রচণ্ড বাধা। কারণ তখনকার দিনে ঠাকুরবাড়িতে বিয়ে হওয়া মানেই ছেলেকে হারানো। তাই একমাসের মধ্যে বহু টেলিগ্রাম কলকাতা ও গৌহাটিতে আসা-যাওয়া করলেও বিধির লিখন বদলাল না। ১৮৯১ সালের ১১ মার্চ, স্বপ্নরঙিন বাসন্তী-সন্ধ্যায় সপ্তপদী গমনের পর শুভদৃষ্টি। লক্ষ্মীনাথ দেখলেন প্রজ্ঞা তাঁর দিকে তাকিয়েই ফিক করে হেসে ফেললেন। হাসি ফুটল লক্ষ্মীনাথেরও ঠোঁটের কোণে। পরে অবশ্য তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন প্রজ্ঞাকে, 'শুভদৃষ্টির সময় ওইরকমভাবে হেসেছিলে কেন?' প্রজ্ঞার উত্তর, 'বিয়ের অনেকদিন আগেই তোমাকে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম।' স্বপ্নে দেখা মুখটার সঙ্গে লক্ষ্মীনাথের মুখের হুবহু মিল দেখে হেসেছিলেন প্রজ্ঞা। লক্ষ্মীনাথের আঁকা এইসব ছোট ছোট কথার-ছবি দেখে ধরে নিতে অসুবিধে হয় না, দাম্পত্যজীবনে প্রজ্ঞা কতখানি সুখী ছিলেন। নিজের জীবনে পর্যাপ্ত সুখের সন্ধান পেয়ে তিনি বুঝেছিলেন গৃহকে সুখের আগার করে তুলতে হলে গৃহিণীকে কোন দিকে নজর দিতে হবে। তাঁকে 'মায়ার খেলা'তে অভিনয় করতেও দেখা গিয়েছে, ছবি আঁকতেও দেখা গিয়েছে, কিন্তু সব ছেড়ে তিনি আঁকড়ে ধরেছিলেন আপাত অবহেলিত রান্নাঘরখানিকে। হেমেন্দ্রনাথ রান্নাকে মনে করতেন কলাবিদ্যা। ইচ্ছে ছিল একখানি রান্নার বই লিখবেন নিজে। নানা তথ্যে ভরে ফেলেছিলেন একখানি খাতা। মেয়েদেরও রান্না শিখিয়েছিলেন কিংবা বলা যায় প্রবল উৎসাহ দিতেন। প্রজ্ঞা রান্না এবং আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে ভাবতে শুরু করলে লক্ষ্মীনাথও তাঁকে উৎসাহ দিলেন।

রান্নাঘর নিয়ে প্রজ্ঞা ভাবতে শুরু করেন 'পুণ্য' পত্রিকা সম্পাদনার সঙ্গে সঙ্গে। হেমেন্দ্রনাথের পুত্রকন্যাদের পৃষ্ঠপোষকতাতেই প্রকাশিত হত 'পুণ্য' পত্রিকা। লিখতেন প্রজ্ঞার ভাইবোনেরা,

প্রথম সম্পাদিকা ছিলেন প্রজ্ঞা নিজে। প্রথম থেকেই এর পাতায়-পাতায় হরেক রকম আমিষ ও নিরামিষ ব্যঞ্জনের পাকপ্রণালী ছাপা হতে থাকে। সুগৃহিণীর মতো তিনি আবার তৎকালীন বাজারদরটিও পাঠকদের জানিয়ে দিতেন, যাতে কেউ অসুবিধেয় না পড়েন। কালের সীমানা পার হয়ে আজ সে বাজারদর আমাদের মনে শুধু সুখস্মৃতি জাগায়। মাছের দাম ছিল অবিশ্বাস্য রকমের সস্তা—আধসের পাকা রুই তিন বা চার আনা, চিতল মাছ তিন পোয়া ছয় আনা, বড় বড় ডিমওয়ালা কই আট-ন টার দাম নয় দশ আনা, একটি ডিম একটা পয়সা, ঘি এক সের এক টাকা, দই এক সের চার আনা, টমেটো কুড়িটা দুই আনা—নাঃ, অকারণে মনখারাপ করে লাভ কী? শুধু এটুকু মনে রাখলেই হবে, এই দামগুলো সঠিক বাজারদর কিনা, ধনী গৃহিণী প্রজ্ঞা যাচিয়ে নেননি। দরদাম করলে জিনিসপত্রের দাম হয়তো আরও একটু কমত।

'আমিষ ও নিরামিষ আহার'-এর তিনটি খণ্ড বেরিয়েছিল। প্রজ্ঞা ভেবেছিলেন পাকপ্রণালীর পরে লিখবেন গৃহবিজ্ঞানের বই। কিন্তু সে আর হয়ে ওঠেনি। এর ফলে অপূরণীয় ক্ষতি রয়ে গেল গৃহবিজ্ঞানের। প্রজ্ঞার মতো এত যত্নে রান্নার বই লেখার কথা গার্হস্থ্যবিজ্ঞানের শিক্ষিকারাও ভাবেন বলে মনে হয় না। তিনি বইয়ের প্রথমদিকে খাদ্য, পথ্য, ওজন, মাপ, দাসদাসীর ব্যবহার, পরিচ্ছন্নতা সব ব্যাপারেই প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন। সেইসঙ্গে তৈরি করেছেন রান্নাঘরে ব্যবহৃত শব্দের পরিভাষা। হয়তো শব্দগুলো আমাদের অজানা নয়, তবু এ ধরনের শব্দের সংকলন এবং পরিভাষা থাকা প্রয়োজনীয় তাতে সন্দেহ নেই। কতখানি উৎসাহ এবং নিষ্ঠা থাকলে একাজ করা সম্ভব, পরিভাষার দীর্ঘ তালিকা দেখলেই বোঝা যাবে। প্রজ্ঞা চলিত এবং অপ্রচলিত কোনও শব্দকেই অবহেলা করেননি। পড়তে মজা লাগে যখন কচি লেবু হয় 'কড়াই লেবু' কিন্তু কচি আম হয় 'কড়ুই আম'। 'দাগ দেওয়া' শব্দটির অর্থ রান্নাঘরে গিয়ে দাঁড়ায় 'ঘিয়ে গরম মশলা ছাড়িয়া পাক করা।' রয়েছে আরও কত চেনা-অচেনা শব্দ। যেমন:

বাখরা = পাপড়ি
চুটপুট = ফোড়ন ফাটার শব্দ
হালসে = কাঁচাটে বিস্বাদ গন্ধ
রুটিতোষ = সেঁকা পাঁউরুটি
পিট্নী = যাহার দ্বারা মাংসাদি পেটানো হয়
বালিখোলা = কাঠ খোলায় বালি দিয়া জিনিস ভাজা
সিনা = বুক
চমকান = শুকনা খোলায় অল্প ভাজা
তৈ = মালপোয়া ভাজিবার মাটির মাত্র
তিজেল হাঁড়ি = ডাল রাঁধিবার চওড়া মুখ হাঁড়ি
তোলো হাঁড়ি = ভাত রাঁধিবার বড় হাঁড়ি
খণ্ড কাটা = ডুমা ডুমা টুকরো কাটা
চির কাটা = লম্বাভাবে ঠিক অর্ধেক করিয়া কাটা
ছুঁকা = ফোড়ন দেওয়া

রান্নাঘরে যে এতরকম শব্দ প্রচলিত আছে, প্রজ্ঞার আগে তা কে জানত? বাংলার রন্ধনশিল্পকে যদি লোকশিল্পের মর্যাদা দেওয়া হয়, তা হলেও প্রজ্ঞার নাম সবার আগে উচ্চারিত হবে। তাঁর দেশি রান্নাগুলির অধিকাংশই গ্রামবাংলার লোকজীবন থেকে কুড়িয়ে পাওয়া। আর রান্নাঘরে ব্যবহৃত শব্দের পরিভাষা সংকলনে লুকিয়ে আছে বঙ্গনারীর নিজস্ব ভাষা, যা দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে। এখানে আছে নানারকম বাসনের কথা, সেগুলির সঙ্গে আমাদের দূরত্ব ক্রমশ বাড়ছে। গার্হস্থ্যবিজ্ঞানের সঙ্গে লোকসংস্কৃতি চর্চায়ও প্রজ্ঞার ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না।

এছাড়াও আছে নানারকম 'প্রয়োজনীয় কথা'—গৃহিণীদের জ্ঞাতব্য নানারকম তথ্য—'বিনা

পেঁয়াজে পেঁয়াজের গন্ধ করা' কিংবা 'ধরা গন্ধ যাওয়া'র মতো আরও অনেক কথা আছে। ক'জন আর জানে, আদার রসে হিং ভিজিয়ে রেখে সেই হিংগোলা নিরামিষ তরকারিতে দিলে পিঁয়াজের গন্ধ হয় কিংবা ডাল-তরকারি হাঁড়িতে লেগে গেলে তাতে কয়েকটা আস্ত পান ফেলে দিলে পোড়া গন্ধ কমে যায়? মাছ-মাংসের যত্ন, বাসি-তাজা চেনার উপায় সব আছে 'গঙ্গা হইতে সদ্য ধরা ইলিশ মাছটি দেখিবে নৌকার মতো বাঁকা, যত বেলা বাড়িবে ক্রমশ সোজা হইতে থাকিবে।' তরিতরকারি রোদে শুকিয়ে কীভাবে অনেকদিন রেখে দেওয়া যায় সেকথা জানাতেও প্রজ্ঞা ভোলেননি। এমনকী কবিরাজী আলুইয়ের বড়ি বা নানা উপকরণ দিয়ে শিশুদের জন্যে ওষুধের বড়ি প্রস্তুতের কথাও প্রজ্ঞা জানতেন। একসময়ে যে পথ্য প্রস্তুত করা ছাড়াও শিশুকে ওষুধ দেবার কাজেও মহিলাদের প্রধান ভূমিকা দিল, আলুইয়ের বড়ি তার প্রমাণ।

প্রজ্ঞা আরও একটি নতুন জিনিস বাংলার ভোজসভায় এনেছিলেন। সেটি হল বাংলা মেনু কার্ড বা তাঁর নিজের ভাষায় 'ক্রমণী'। বিলিতি ধরনের রাজকীয় ভোজে মেনু কার্ডের ব্যবস্থা আছে। প্রজ্ঞা স্থির করলেন তিনিও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের জন্যে ক্রমণীর ব্যবস্থা করবেন। ছাপা ক্রমণী যদি হাতে হাতে বিলি করা না যায়, তা হলে সুন্দর করে লিখে খাওয়ার ঘরের দেওয়ালে ঝুলিয়ে দিলেও চলবে। শুধু নামকরণ করেই প্রজ্ঞা কর্তব্য শেষ করেননি। বাংলা ক্রমণী কেমন হবে, এক একবারের ভোজে কী কী পদ থাকবে, কোন পদের পরে কোনটা আসবে, কিংবা কেমন করে লিখলে শিল্পসম্মত হয়ে উঠবে সেকথাও ভেবেছেন। কয়েকটা ক্রমণী দেখলেই বোঝা যাবে ব্যাপারটা। প্রথমে একটা নিরামিষ ক্রমণী:

'জাফরাণী ভুনি খিচুড়ি
ধুঁধুল পোড়া শিম বরবটি ভাতে
পাকা আম ভাতে
পটলের নোনা মালপোয়া
পাকা কাঁঠালের ভূতি ভাজা
কাঁকরোল ভাজা
ভাত
অড়হর ডালের খাজা
লাউয়ের ডালনা
বেগুন ও বড়ির সুরুয়া
ছোলার ডালের ধোঁকা
বেগুনের দোল্মা
আলুবখরা বা আমচুর দিয়ে মুগের ডাল
পাকা পটলের ঝুরঝুরে অম্বল
ঘোলের কাঁড়ি
রামমোহন দোল্মা পোলাও
নীচুর পায়স
নারিকেলের বরফি।'

যেন একটা আস্ত কবিতা। হঠাৎ চোখে পড়লে সেরকম ভুল হবারই সম্ভাবনা। যদিও নিরামিষ তবু সরস হয়ে ওঠে রসনা। সেকালের ভোজসভা সম্বন্ধেও একটা ধারণা গড়ে ওঠে। প্রজ্ঞা প্রতিটি রান্না নিজে হাতে রেঁধে তবে সেগুলি খাদ্যতালিকাভুক্ত করতেন। অনেক রান্নার আবিষ্কর্ত্রী তিনি নিজেই। মাঝে মাঝে সেগুলোর সঙ্গে যোগ করে দিতেন প্রিয়জনের নাম। যেমন, 'রামমোহন দোল্মা পোলাও', 'দ্বারকানাথ ফির্নিপোলাও', 'সুরভি' পায়েস—তাঁর

অকালমৃতা মেয়ের নামে। রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশতম জন্মদিনে ফুলকপি, খোয়া ক্ষীর, বাদাম, কিশমিশ, জাফরানপাতা, সোনা রুপোর তবক দিয়ে বরফি তৈরি করে তার নাম দিয়েছিলেন, 'কবিসম্বর্ধনা' বরফি। খেয়ে কেউ বুঝতে পারেনি সেটি ফুলকপি দিয়ে তৈরি।

আবার অনেক রকম উদ্ভট এবং নতুন ব্যঞ্জনও আছে। খেজুরের পোলাও, লঙ্কাপাতার চড়চড়ি, রসগোল্লার অম্বল, বিটের হিঙ্গি, পানিফলের ডালনা, ঝিঙাপাত পোড়া, মিষ্টা-দই মাছ, ঘন্ট ভোগ, কচি পুঁইপাতা ভাজা, কাঁচা তেঁতুলের সরস্বতী অম্বল, আমলকী ভাতে, পেঁয়াজের পরমান্ন, কইমাছের পাততোলা, কাঁকড়ার খোলা পিঠে, মাংসের বোম্বাইকারী—আরও কত কী। ক্লাসে ওঠার মতো রান্না শেখারও ক্লাস আছে, 'হিঙ্গি করতে শিখিলেই বুঝিতে পারিবে ইহা ঠিক যেন ডালনার এক ধাপ উপরে উঠিয়াছে অথচ কালিয়াতে উঠিতে পারে নাই।' আরও দু-একটা ক্রমণী দেখা যাক। আমিষ ক্রমণীর আকার খুব বড় নয়। যেমন:

'এস্পারোগাস স্যাণ্ডুইচ
শসার স্যাণ্ডুইচ
মাংসের স্যাণ্ডুইচ
মাছের স্যাণ্ডুইচ
পাউণ্ড কেক
স্পঞ্জ কেক
বিস্কুট
সিংয়াড়া
ডালমোট
ঝুরি ভাজা
আইসক্রীম।'

আরেকটা:

'পাতলা পাঁউরুটির ক্রুটোঁ
জারক নেবু
বাদামের সুপ
ভেটকী মাছের মেওনিজ
মুরগীর হাঁড়ি কাবাব
মটনের গ্রেভি কাটলেট
শবজী ও বিলেতী বেগুনের স্যালাড
স্নাইপ রোস্ট
আলুর সিপেট
উফস্ আলানিজ
ডেজার্ট
কফি।'

সে তুলনায় নিরামিষ ক্রমণীর আকার বেশ বড়। আর গৃহিণীর কৃতিত্বও যেন বেশি:

'ভাত
আলু পোড়া, দুধ দিয়ে বেগুন ভর্তা, মূলা সিদ্ধ, আনারস ভাজা
মোচা দিয়া আলুর চপ
মুগের ফাঁপড়া
ডুমুরের ছেঁচকি মোচা ছেঁচকি

কুমড়া দিয়া মুগের ডালের ঘণ্ট
পালম শাকের ঘণ্ট
উচ্ছা দিয়া মসুর ডাল
ওলার ডালনা
ঢ্যাঁড়সের ঝোল
ছানার ফুপু পোলাও
নিরামিষ ডিমের বড়ার কারী
করলার দোল্মা আচার
আলুর দমপক্ত
কচি কাঁচা তেঁতুলের ফটকিরি ঝোল
নারিকেলের অম্বল
পাকৌড়ী
খইয়ের পরমান্ন
কমলী।'

আজকাল খুব বড় ভোজসভাতেও পদের সংখ্যা এত বেশি হয় না। নিরামিষ ভোজসভাও আজকের দিনে অচল। যতরকম তরকারি, পিঠে, পায়েস থালার পাশে সাজিয়ে দেওয়া যেত, ততই সুগৃহিণীর দক্ষতা প্রমাণিত হত। বাঙালি জীবনের শান্ত নিরুদ্বেগ সচ্ছলতার প্রতীক এইসব ভোজসভা। বাঙালি কোনওদিনই ভোজনবীর ছিল না, ছিল ভোজনরসিক। তাদের শিল্পবোধ স্থায়ী জিনিসগুলোকে ছাড়িয়ে অস্থায়ী তাৎক্ষণিকতার মধ্যেও রসের সন্ধান করেছে। আর বাঙালি মেয়েরা রান্নাঘরকে করে তুলেছে শিল্পমন্দির। প্রজ্ঞা যেসব রান্নার কথা বলছেন এত না হলেও অধিকাংশের সঙ্গেই তখনকার গৃহিণীরা পরিচিত ছিলেন এবং নিজেরাও রাঁধতেন। তবে তাঁরা কেউ সেসব পাকপ্রণালী প্রজ্ঞার মতো লিখে অন্যের রান্না শেখার পথ সুগম করে যাননি। এক একটি বড় ক্রমণীতে ফুটে উঠেছে প্রজ্ঞার শিল্পবোধ ও সৌন্দর্যরুচি:

'কলাইশুঁটি দিয়া ফেনসা খিচুড়ি
পলতার ফুলুড়ি
বেশন দিয়া ফুলকপি ভাজা
কাঁচা কলাইশুঁটির ফুলুড়ি
পেঁয়াজ কলি ভাজা
ভাত
ছোলার ডালের দুধে মালাইকারী
বাঁধাকপির ছেঁচকি
তেওড়া শাকের চচ্চড়ি
কচি মূলার ঘণ্ট
লাল শাকের ঘণ্ট
বাঁধাকপির ঘণ্ট
গাছ ছোলার ডালনা
মটর ডালের ধোঁকা
কমলানেবুর কালিয়া
ওলকপির কারী
পেঁয়াজের দোল্মা আচার
ফুলকপির দমপোক্ত

শোভনা দেবী

সুনৃতা দেবী

সুদক্ষিণা দেবী

হিরন্ময়ী দেবী

ঋতা দেবী

স্মিতা চৌধুরী

সুহিতা ঠাকুর

শুভশ্রী ঠাকুর

চিত্রলেখা রায়

নন্দিতা দেবী

উমা দেবী

সুনন্দিনা দেবী

পূর্ণিমা চট্টোপাধ্যায়

সুজাতা মুখোপাধ্যায়

মাধবিকা দেবী

সুরূপা দেবী

সুরমা ঠাকুর

সুশীলা চট্টোপাধ্যায়

সুপ্রভা হালদার

সুহাসিনী দেবী, অবনীন্দ্রনাথের আঁকা

বিনয়িনী দেবী

সুনয়নী দেবী

শ্রীলেখা চক্রবর্তী

কল্পিতা চক্রবর্তী

শর্মিলা ঠাকুর

ঐন্দ্রিলা কুণ্ডু

রত্না চট্টোপাধ্যায়

চম্পা হালদার

বাণী ঠাকুর

গোপা মুখোপাধ্যায়

অতসী বড়ুয়া

সুব্রতা গঙ্গোপাধ্যায়

শেফালিকা দেবী

দেবিকা রানী

অদিতি গঙ্গোপাধ্যায়

অনুভা দেবী

ইরা ঠাকুর

মিলাডা গঙ্গোপাধ্যায়

প্রতিমা ঠাকুর

বেগুন দিয়া কাঁচা কুলের অম্বল
আনারসী মালাই পোলাও
ফুলিয়া।'

কিন্তু সবসময়েই কি এত বড় বড় মাপের আয়োজন হত? ছোটখাটো ক্রমণীও আছে। এখনকার তুলনায় সেও খুব ছোট নয়:

'ডিম দিয়া মুলুকতানী সূপ
ভাত
আলু ফ্রেঞ্চ স্টু
চঁওচঁও, বড় রুইমাছের ফ্রাই
মাংসের হুশনী কারী
পোলাও
ফ্রুট স্যালাড
ফল।'

কিংবা

'অলিভ রুটি
নারিকেলের সূপ
ধূম পক্ব ইলিশ
মুরগী বয়েল, হ্যাম।
মটনের কলার
ঠাণ্ডা জেলী ও ব্লাঁমজ
নারিকেল টফি, আদার মোরব্বা
কফি।'

আর নিরামিষ:

'ভাত
মাখন মারা ঘি, নেবু, নুন
নিমে শিমে ছেঁচকি ছোলার ডাল ভাতে
বেগুন দিয়া শুল্‌ফা শাক ভাজি
ছোলার ডালের কারী কুমড়ো এঁতোর ফুলুরি
পুনকো শাকের শশ্‌শরি
ভর্তাপুরী
পালম্‌ শাকের চড়চড়ি
থোড়ের ঘণ্ট
তিলে খিচুড়ি
ছানার ডালনা পাকা শসার কারী
পটলের দোল্মা
তিল বাঁটা দিয়ে কচি আমড়ার অম্বল
পাকা পেঁপের অম্বল
লক্ষ্মৌ কড়ুই কাঁচা আমের পায়স।'

এই ক্রমণী দেখে বোঝা যায়, ভোজসভায় ফরাসি কায়দায় ইচ্ছা নির্বাচনের সুযোগ সবসময়ই ছিল, না হলে এত ব্যঞ্জন এবং একই সঙ্গে ভাত, খিচুড়ি এবং পোলাওয়ের ব্যবস্থা থাকত না।

খাওয়ার পরেই আসে পান এবং মশলার কথা। প্রজ্ঞা বারোরকম পান সাজার কথা বলেছেন। তার মধ্যে মিঠা পান পোলাও তাঁর নিজস্ব আবিষ্কার বলে লিখেছেন, 'সুহৃদসমিতিতে যখন খাওয়াইয়াছিলাম ইহার নাম এই নামে অভিহিত করিয়াছিলাম।' এছাড়াও জানিয়েছেন নানারকম চুন-খয়ের মশলা তৈরির গোপন কথা।

প্রজ্ঞার রান্নার বই দুটি আমাদের মনে যে কৌতূহল জাগায়, সেটি হল ভাইঝির এই রন্ধননৈপুণ্যে রবীন্দ্রনাথ কত খুশি হয়েছিলেন! 'কবি-সম্বর্ধনা' বরফি দেখে নিশ্চয় খুশি হয়েছিলেন। রান্না এবং নতুন খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে তাঁর উৎসাহ তো কম ছিল না। বহু মহিলাই তাঁদের স্মৃতিকথায় একথা বলেছেন। কবি তাঁদের কাছে কখনও প্রজ্ঞার রান্নার গল্প করেননি, যদিও তাঁর গ্রন্থাগারে প্রজ্ঞাসুন্দরীর 'আমিষ ও নিরামিষ আহার' বইগুলি ছিল। মাধুরীলতা এই বই বাবার কাছে চেয়ে পাঠালে তিনি সুবোধচন্দ্র মজুমদারকে লেখেন, 'বেলা প্রজ্ঞার আমিষ আহারের (দ্বিতীয় খণ্ড) চেয়ে পাঠিয়েছে। সেটা আমাদের লাইব্রেরিতে আছে। খোঁজ করে নিশ্চয় তাকে পাঠিয়ে দিও।' প্রজ্ঞার 'ক্রমণী' আবিষ্কারে কাকার উৎসাহ ছিল কিনা তাও জানা গেল না। রুটিতোষ শব্দটি তিনি ব্যবহার করতেন। সেঁকা পাঁউরুটিকে তিনিই এ নামটি দিয়েছিলেন, না, প্রজ্ঞার নামটিকে সস্নেহে ব্যবহার করেছেন, সে কৌতূহলও রয়ে গেল।

হেমেন্দ্রনাথের মেয়েদের মাঝখানে আমরা আরেকজনকে পেয়েছি। সত্যেন্দ্র-জ্ঞানদানন্দিনীর একমাত্র মেয়ে ইন্দিরা। সময়ের দিক থেকে তিনি হেমেন্দ্রের সেজো মেয়ে অভিজ্ঞার 'বোন দিদি' অর্থাৎ পনেরোদিন আগে জন্মেছেন। সৌভাগ্যবশত তিনিও দীর্ঘ জীবনের অধিকারিণী হওয়ায় ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলের আর-একটি উজ্জ্বল রত্নকে পাওয়া গেল। ছোটবেলা থেকেই তিনি রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত ছিন্নপত্রাবলীর প্রাপক। অন্য কোনও ক্ষেত্রে যদি তাঁর কিছুমাত্র দান নাও থাকত তা হলেও ক্ষতি ছিল না। কেননা, রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে যিনি এই অসাধারণ চিঠিগুলি লিখিয়ে নিতে পেরেছিলেন তাঁর অসামান্যতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগতেই পারে না। আর কেউই কবির 'সমস্ত লেখাটা আকর্ষণ করে নিতে' পারেননি। কিন্তু ইন্দিরার পরিচয় এখানেই শেষ নয়, বরং শুরু। ইন্দিরার সমস্ত কাজকর্মের মধ্যেও বড় হয়ে উঠেছিল তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। অপরূপ লাবণ্যময়ী ইন্দিরা তাই অনন্যা হয়েও সবার অতি আপন 'বিবিদি'-তে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি সেই জাতের মানুষ, যাঁরা শুধুমাত্র তাঁদের জীবনযাপনের মধ্যেই সংসারকে মধুময় করে তোলেন।

জন্ম ১৮৭৩ সালে। সন্তানসম্ভবা জ্ঞানদানন্দিনীর ইচ্ছে এবার মেয়ে হোক। ঘর আলো করা, কোলজোড়া। খুব সুন্দর দেখতে হবে। প্রাণভরে তাকে সাজাবেন। মায়ের ইচ্ছে অপূর্ণ রইল না। মহারাষ্ট্রের কালাদগি শহরে ভূমিষ্ঠ হল ঠাকুরবাড়ির একটি মেয়ে, আকাশ থেকে যেন নেমে এল একটা তারা। কাটা কাটা ধারালো মুখশ্রী, সুন্দর গায়ের রং, বড় বড় দুটি উজ্জ্বল চোখ, রজনীগন্ধার মতো সতেজ সুন্দর দেহলতার অধিকারিণীর নাম রাখা হল ইন্দিরা। কলকাতায় ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের রূপের খ্যাতি কেমন ছড়িয়ে পড়েছিল তার একটি সমসাময়িক সাক্ষী প্রমথ চৌধুরী। বোধহয় ১৮৮৪ সাল। সরস্বতী পূজোর দিন রবীন্দ্রনাথ এসেছেন অ্যালবার্ট হলে বক্তৃতা দিতে, সঙ্গে ইন্দিরা।

প্রমথ তখন ছাত্র। অনেকখানি হেঁটে প্রেসিডেন্সি কলেজের মাঠে বন্ধু নারায়ণচন্দ্র শীলের সঙ্গে দেখা। বন্ধুকে নারায়ণ সোৎসাহে জানালেন রবীন্দ্রনাথ অ্যালবার্ট হলে বক্তৃতা দিচ্ছেন, সঙ্গে নিয়ে এসেছেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীকে। 'চল না, রাস্তাটা পেরিয়ে আমরা অ্যালবার্ট হলে যাই।' প্রমথ রাজি হলেন না বক্তৃতা শুনতে যেতে। বন্ধু বললেন, 'রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা না শুনতে চাও, অন্তত তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীটিকে দেখে আসি চল। শুনেছি মেয়েটি নাকি অতি সুন্দরী।' রেগে উঠে গাছতলায়

শুয়ে পড়ে প্রমথ বলেছিলেন, 'পরের বাড়ির 'খুকি দেখবার লোভ আমার নেই।' কিন্তু অনেকেরই সেদিন সে আগ্রহ এবং কৌতূহল ছিল। পরে এই প্রমথর সঙ্গেই বিয়ে হয়েছিল ইন্দিরার। প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'আত্মকথা'য় এই ঘটনাটির উল্লেখ করায় ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের সম্পর্কে সমসাময়িক কালের আগ্রহ এবং কৌতূহলের একটা ছোট্ট ছবি চোখে পড়ে।

শুধু কি রূপ? ইন্দিরার গুণের সংখ্যাও কম ছিল না। আরও একটা কাজ করেছিলেন তিনি। ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের মধ্যে ইন্দিরাই সর্বপ্রথম বি. এ. পাশ করেন। এই পরিবার কখনও শিক্ষাকে কোনওদিন মূল্য দেননি। কিন্তু ডিগ্রিলাভ? তারও একটি মূল্য আছে বইকী! বিশেষ করে সেযুগে। যখন গ্র্যাজুয়েট মেয়েদের দেখবার জন্যে রাস্তায় ভিড় জমে যেত। চন্দ্রমুখী ও কাদম্বিনী কিছুদিন আগেই ঠেলাঠেলি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধ দরজা খুলে ফেলেছেন। এবার সেই পথে অগণিত মেয়ের ভিড়। অবশ্য ইন্দিরারও আগে গ্র্যাজুয়েট হয়েছেন স্বর্ণকুমারীর মেয়ে সরলা ঘোষাল। এবার খোদ ঠাকুরবংশের মেয়ে ইন্দিরা। তিনি লোরেটো থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে বাড়িতেই বি. এ. পড়েছিলেন ইংরেজিতে অনার্স ও ফরাসি ভাষা নিয়ে। ১৮৯২ সালে বি. এ. পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান লাভ করে ইন্দিরা পান পদ্মাবতী স্বর্ণপদক। তাঁর আগে আরও এক ডজন মহিলা গ্র্যাজুয়েট কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়েছেন, তবে তাঁরা কেউই ফরাসি ভাষা নিয়ে পড়াশোনা করেননি। ইন্দিরার আট বছর পরে আবার ফ্রেঞ্চ পড়েছিলেন তারকনাথ পালিতের মেয়ে লিলিয়ান পালিত, ভারতে প্রথম বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা এনে যিনি খুব চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো কাগজপত্র দেখে জানা গেছে ১৮৮২ থেকে ১৮৯১ সাল পর্যন্ত মাত্র বারোজন মহিলা গ্র্যাজুয়েট হয়েছিলেন। ইন্দিরা তেরো নম্বর। তিনজনের মধ্যে একজন মাত্র ডবল এম. এ. পাশ করেন তাঁর নাম নির্মলবালা সোম। তিনি ১৮৯১-এ ইংরেজি ও ১৮৯৪-এ মর‍্যাল ফিলসফিতে এম. এ. পাশ করেন। তবে এই সংখ্যা যে হু হু করে বাড়ছিল তাতে সন্দেহ নেই। নাহলে ১৮৯২-এর এই সংখ্যা ১৯১০-এ সাতান্নজন মহিলা গ্র্যাজুয়েটে পৌঁছবে কী করে? ১৮৮৪ থেকে ১৯১০-এর মধ্যে এম. এ. পাশ করেছিলেন আটজন মহিলা, এঁদের কেউই ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না।

ইন্দিরা খুব ভাল ফরাসি জানতেন। ভাগ্যক্রমে তাঁর স্বামী প্রমথ চৌধুরীও ছিলেন ফরাসি ভাষায় সুপণ্ডিত। তাঁর লেখায় ফরাসি রুচির ছাপ আছে। তাঁর প্রাক্‌বিবাহ পর্বের চিঠিপত্রের প্রিয় সম্ভাষণটিও ছিল ফরাসি 'Mon ami'. লক্ষ করলে ইন্দিরার চিঠিতেও প্রামথিক গদ্যরীতির কারুকর্ম চোখে পড়বে। গল্প-উপন্যাস না হলেও তাঁর যে কোনও লেখা সরস-সহাস্য ও সুস্মিত লাবণ্যে সমুজ্জ্বল। '...আমার কথা যখন ভাববে তখন কোনও ফরাসি বিলাসী কল্পনা কর না—নিতান্ত ঘরাও বাঙালি মেয়ের মূর্তিতে ভেবো—একেলে অবশ্য, তবু বাঙালি। যাকে ঘরের লক্ষ্মী করতে ইচ্ছে যায়—অন্তরের লক্ষ্মী হতে পারলে আরও ভাল; শুধু তা নয়, আমার ইচ্ছে করে না যে আমদের সাংসারিক জীবনের কোন বিভাগে কোন অসুন্দর বিজাতীয় ভড়ং থাকে—যা কার্যগতিকে অনিবার্য নয়, এবং স্বদেশীয় ভাবের সঙ্গে কতক পরিমাণে সুন্দর রূপে মেশানো না যেতে পারে।'

আরেক জায়গায়,

'...চিঠিতে নিজেকে কতকটা পাঠানোর যে উপায় আছে বলেছ—সেটা আমি বোধহয় বুঝেছি—কিন্তু করব না—বিদেশিনী করত বলেই করব না। তুমি যদি কোনরকম ইন্দ্রিয় সাহায্য ব্যতিরেকে আমাকে ধারণা করতে না পার ত কিসের তোমার ব্রাহ্মণত্বের অহংকার!'

কিংবা,

'...তোমাকে আমার মনে দেখতে পাই কী না জিজ্ঞেস করেচ। দেখা মানে যদি তোমার কথা ভাবা হয়, তা হলে তা ছাড়া আর কী ভাবি আজ কাল সেই প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া বেশি শক্ত। এখন শুতে বসতে উঠতে নাইতে খেতে সজনে বিজনে সকল সময় এই কথাই আমার মাথায়

ঘোরে, অধিকাংশ সময়েই তোমার সঙ্গে কথা কই, তা ছাড়া মাথা-মুণ্ডু তোমার বিষয়ে কত কী ভাবি তার ঠিক নেই—তা লেখবার জো নেই—তার কোন স্পষ্ট রূপ নেই। এই ত তোমার প্রশ্নের উত্তর দিলুম। আমার মনে যে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করেচ এবং অচিরে সবটাই দখল করে নেবার ভাব দেখাচ্ছ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।' প্রমথ চৌধুরীর অসামান্য ব্যক্তিত্বের প্রভাব ইন্দিরার ওপর পড়া অসম্ভব নয় তবে যাকে বলে 'প্রসাদ গুণ', ইন্দিরার নিজস্বতায় সেটি প্রচুর মাত্রায় ছিল। প্রবন্ধ-গান-সমালোচনা-স্মৃতিকথা—বিষয় যাই হোক না কেন, সর্বত্র মিশে আছে তাঁর রম্য ব্যক্তিতার স্বাদ।

নিরপেক্ষভাবে ইন্দিরার কাজের বিচার করতে বসলে মনে হয় যেন থই পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ স্মৃতি-বিস্মৃতির মায়াজাল ছাড়িয়ে যেখানে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, আমাদের নিজের স্বার্থেই সেই বিষয়গুলিকে পুনরুদ্ধার করতে হবে। তিনি যে শুধু কয়েকটা বই লিখেছিলেন কিংবা গানের স্বরলিপি তৈরি করেছিলেন তা তো নয়, বাংলা সাহিত্য ও সংগীতকে তিনি যেভাবে সমৃদ্ধ করে গিয়েছেন তাতে তাঁর তুলনা মেলা ভার। বাংলায় যে কয়েকজন মননশীল প্রবন্ধ লিখতে পেরেছেন, ইন্দিরা তাঁদের অন্যতমা। ভাবতে অবাক লাগে, লেখার আশ্চর্য ক্ষমতা, কলমে অভাবনীয় জাদু থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর পিসিমা স্বর্ণকুমারীর মতো গল্প-উপন্যাস রচনায় হাত দেননি। প্রবন্ধ, সংগীতচিন্তা, স্মৃতিকথা ও অনুবাদ এই চারটি শাখাতেই ইন্দিরার সাহিত্যকীর্তি চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

অনুবাদের কাজটা বেশ কঠিন। অচেনা ভাষাকে রক্তে-চেনা ভাষায় রূপান্তরিত করলেও তাতে প্রাণের রস আনা যায় না। কবির ভাষায় 'তর্জমা মরা বাছুরের মূর্তি', 'তা সেই 'মরা বাছুর'কেই প্রাণ দিতেন ইন্দিরা। রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা তিনি অনুবাদ করেছেন। কবি নিজেও স্বীকার করেছেন সেকথা। ইন্দিরা অনুবাদের ভার নিলে তিনি যতটা নিশ্চিন্ত হতেন ততখানি ভরসা আর কারও ওপর ছিল না। চিঠিতে লিখেছেন, 'তোর সব তর্জমাগুলিই খুব ভাল হয়েছে।... এইমাত্র তোর তর্জমাগুলি অপূর্বকে দেখালুম—সে বললে আমার কবিতার এত ভাল তর্জমা সে আগে আর দেখেনি।' [৬.১.১৯২৯] আবার দেখা যাবে 'জাপান যাত্রী' অনুবাদের ভার কবি ইন্দিরাকে দিয়েই নিশ্চিন্ত হতে চান।

কবে থেকে অনুবাদ করা শুরু করেছিলেন ইন্দিরা? ১২৯২ সালের 'বালকে' রাস্কিনের ইংরেজি রচনা তুলে দিয়ে এক প্রতিযোগিতা আহ্বান করেছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী। পৌষ সংখ্যায় পুরস্কার পেলেন যোগেন্দ্রনাথ লাহা। তাঁর অনুবাদের সঙ্গে আর-একটা অনুবাদও ছাপা হল। অনুবাদিকার নাম দেখা গেল 'শ্রীমতী ইঃ—'। সম্পাদিকা জানালেন, 'একটি অল্পবয়স্কা বালিকার রচনা।' এই 'শ্রীমতী ইঃ' যে ইন্দিরা, তাতে সন্দেহ নেই। তখন থেকেই ইন্দিরার আত্মগোপনের চেষ্টা শুরু হয়েছে। এমনকী তাঁর সমস্ত রচনার একটি তালিকা এখনও তৈরি হয়নি। সাময়িকপত্রের পাতা থেকে সেসব সংগ্রহ করে একটা অখণ্ড গ্রন্থাবলী প্রকাশের চেষ্টা তো অনেক দূরের কথা।

রবীন্দ্র-রচনার অনুবাদ ছাড়াও ইন্দিরা অনুবাদ করেন প্রমথ চৌধুরীর 'চার ইয়ারী কথা'র। 'টেলস্ অব ফোর ফ্রেন্ডস্' বেশ উল্লেখযোগ্য অনুবাদ। এছাড়া সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে যুগ্মভাবে অনুবাদ করেন মহর্ষির আত্মজীবনী 'দি অটোবায়োগ্রাফী অব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ টেগোর'। এ তো গেল বাংলা থেকে ইংরেজি অনুবাদের কথা। ইন্দিরা ফরাসি থেকে বাংলায় অনুবাদের ক্ষেত্রেও অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। প্রমথ চৌধুরীর সান্নিধ্য তাঁকে আরও শাণিত করে তুলেছিল। তাঁর যে চারটি অনুবাদের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা উচিত সেগুলি হল রেনে গ্রুসে-র 'ভারতবর্ষ', পিয়ের লোতির 'কমল কুমারিকাশ্রম', মাদাম লেভির 'ভারত ভ্রমণ কাহিনী' (কলম্বো থেকে শান্তিনিকেতন) এবং আঁদ্রে জীদের লেখা 'ফরাসি গীতাঞ্জলির ভূমিকা'।

ইন্দিরা প্রথম প্রেমে পড়লেন কবে? সে এক মজার ব্যাপার। সেকথা তিনি জানিয়েছেন

একেবারে জীবনের শেষপর্বে নিজের 'জীবনকথা'য়। বিশেষ করে তাঁর আবদারেই রবীন্দ্রনাথ তাদের দুই ভাইবোনকে নিয়ে গিয়েছিলেন হাজারিবাগে। কারণ, তখনকার দিনে কনভেন্টের এক একজন মেয়ের এক একজন সিস্টারের প্রেমে পড়ার রেওয়াজ ছিল। 'বোধহয় ভবিষ্যৎ জীবনের মকস্ স্বরূপ' ইন্দিরা লিখেছেন তাঁর প্রেয়সী ছিলেন সিস্টার অ্যালাইসি। তাঁকে হাজারিবাগের কনভেন্টে বদলি করা হয়েছিল বলেই ইন্দিরার এই অভিযান।

প্রেমের কথা যখন উঠলই তখন ইন্দিরার জীবনের কথাও একফাঁকে সেরে নেওয়া যাক। পূর্ণিমা ঠাকুরের লেখা ইন্দিরার জীবনকথা থেকে জানা যায়, তিনি যখন স্কুলে যেতেন তখন ফটকের বিপরীত দিকের মাঠে এক দর্শনপ্রার্থী যুবক দাঁড়িয়ে থাকত। কোনও রকম আলাপ পরিচয় হয়নি। বাড়িতে হাসির ধুম পড়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ এই ঘটনাটিকে নিয়েই লিখেছিলেন একটা গান—'সখি প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে'। ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা বাইরে বেরোতেন বা অভিনয় করতেন ঠিকই কিন্তু তাঁরা কোনও অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে কথা বলতেন না। বেশ পরবর্তীকালে জসীমউদ্দীন যখন ঠাকুরবাড়ির ছেলেদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে ওঠেন, তখনও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করেছিলেন। যাইহোক, ইন্দিরার এই নীরব দর্শনপ্রার্থীর সঙ্গে আকস্মিকভাবে দেখা হয়েছিল বহুকাল পরে। দুজনেরই বয়স তখন আশি পেরিয়ে গেছে। শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসদনে সেই ভদ্রলোক এসেছিলেন তাঁর ছেলের কাজের আবেদন নিয়ে। গল্পের মতো ঘটনা! তবু! কতদিন কেটে গেছে। দুজনেই অস্বস্তি বোধ করেছিলেন। হয়তো কেঁপে উঠেছিল চোখের পাতা কিংবা গলার স্বর। দুজনেরই। হায়! সেদিন কি আর ফেরে? কোনওরকমে দরকারি কথা তাড়াতাড়ি সেরে উঠে পড়েছিলেন ইন্দিরা।

ইন্দিরার পাণিপ্রার্থীর অভাব ছিল না। তার মধ্যে ছিলেন প্রমথ চৌধুরী এবং তাঁর দাদা যোগেশ চৌধুরীও। ইন্দিরা ভালবেসেছিলেন প্রমথকে। তাঁর লেখা প্রাক্‌বিবাহ পর্বের প্রেমপত্রগুলিই এর সাক্ষী। ইন্দিরা ও প্রমথর বিয়েতে নানারকম বাধা আসে। কিন্তু কোনও বাধাই টেকেনি। বিয়ের প্রস্তাব প্রথমে জানান প্রমথ, তাতে সমর্থন ছিল ইন্দিরার; ঠাকুরবাড়ির আপত্তি তো ছিল না। মহর্ষি অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন। প্রসন্নময়ী তাঁর 'পূর্বকথা'য় জানিয়েছেন, 'ঠাকুর পরিবারে ভ্রাতার বিবাহকালে দেশে আর নূতন কোনও আন্দোলন উপস্থিত হয় নাই, বরং বুদ্ধিমতী পিসিমাতারা এ কার্য অনুমোদনই করিয়াছিলেন ও সুশীলা সুলক্ষণা ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। পয়মন্ত বধূর আগমনে আমাদিগের গৃহের সর্বাংশে মঙ্গল হইয়াছে।' এ ঘটনা আশুতোষ ও প্রতিভার বিয়ের সময়কার। তখন বিয়েতে কোনও বাধা আসেনি। ইন্দিরাকে নিয়ে পারিবারিক মনান্তরের সূচনা হয়েছিল বলে বিয়ের পর নববধূ শ্বশুরবাড়ির পরিবর্তে গিয়ে উঠলেন ছোট ননদ মৃণালিনীর বাড়িতে। তারপর তাঁর নিজের বাড়ি কমলালয়ে। এরপরে তো একটানা কাজের ইতিহাস!

বাংলার নারী জাগরণের অন্যতম নেত্রী ইন্দিরাকে তাঁর মায়ের মতো পদে পদে বাধা পেতে হয়নি। তাই স্ত্রীশিক্ষা, নারীজাগরণ, স্বাধীনতা, স্বেচ্ছাচার, মেয়েদের অধিকার ও কর্তব্য, আত্মরক্ষাসমিতি, সুবিধে-অসুবিধে, কাজকর্ম, এককথায় বলতে গেলে মেয়েদের সামগ্রিক ভূমিকার কথা নিরপেক্ষভাবে ভাববার অবকাশ ইন্দিরা পেয়েছিলেন। সেটা জ্ঞানদানন্দিনী, কাদম্বরী কিংবা অন্য কেউ পাননি। কোনটা সত্যি ভাল আর কোনটার সত্যি প্রয়োজন আছে, আকস্মিক উত্তেজনাটা থিতিয়ে না গেলে সেটা ভাল বোঝা যায় না। ইংয়বেঙ্গল গ্রুপকে যেমন নিছক সংস্কার ভাঙার জন্যে কতকগুলো অর্থহীন কাজ করতে হয়েছিল, তেমনি প্রথম যুগের মেয়েদেরও কিছু সাহস দেখাবার প্রয়োজন ছিল। দরকার ছিল কয়েকটি অমূল্য আত্মাহুতির। মেয়েদের চোখের সামনে নতুন নজির সৃষ্টি করবার জন্যে কাদম্বরীর অশ্বারোহণ, জ্ঞানদানন্দিনীর একলা বিলেত যাওয়া, কাদম্বিনীর ডাক্তারি পড়া, সরলা রায় ও অবলা বসুর শিক্ষা, চন্দ্রমুখীর এম. এ. পড়া, ব্রাহ্মসমাজে চিকের বাইরে এসে উপাসনা করা, জামা জুতো পরে খোলা গাড়ি

চড়ে বেড়ানোর দরকার ছিল বইকী! খুবই দরকার ছিল। নইলে অন্য মেয়েদের মন থেকে অবরোধের পাহাড় নামবে কেমন করে? কিন্তু ইন্দিরা এঁদের পরের যুগের মানুষ। তিনি সেকেলে রক্ষণশীলতা আর একেলে উগ্র আধুনিকতা দুই-ই বর্জনের পক্ষপাতী ছিলেন। সব জায়গাতেই তিনি উগ্রতাবিরোধী এবং মধ্যপন্থাবলম্বী। তাঁর নিজস্ব মত:

'সেকালের ধীরা-স্থিরাদের সঙ্গে একালের বীরা হতে হবে; অথবা সেকালের শ্রী ও হ্রীর সঙ্গে একালের ধী মেলাতে হবে—বঙ্কিমবাবু হলে যাকে বলতেন প্রখরে-মধুরে মেশা! এই সামঞ্জস্যই নারীজীবনের মূলমন্ত্র।'

ইন্দিরার প্রতিটি লেখার স্টাইল ঋজু ও স্বচ্ছ। তাঁর কাকার ভাষায় 'সমুজ্জ্বল'। তিনি ইন্দিরার লেখা প্রবন্ধ পড়েও বুঝতে পারেননি এই 'স্টাইল' ইন্দিরার। কারণ খুব স্বাভাবিক। প্রবন্ধ লেখার ক্ষেত্রে এখনও পুরুষের অগ্রাধিকার সর্বজনস্বীকৃত। মেয়েরা যতই এগিয়ে যাক না কেন, গভীর মনন ও চিন্তার ফসল ফলেছে পুরুষের কলমে, একথা অস্বীকার করে লাভ নেই। বিশ্বসাহিত্য সম্পর্কেই একথা প্রযোজ্য। বাংলাদেশে তো হবেই। তবে এদেশ বড় আশ্চর্য দেশ। এখানে অসম্ভব বলে কিছু নেই। তাই পর্দার আড়ালে, নিতান্ত অন্দরমহল থেকেও মাঝে মাঝে এমন এক একটি কূট বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে, যাতে তাবৎ পুরুষ সমাজেরও তাক লেগে যেত। মননের ক্ষেত্রেও কোনও কোনও মেয়ে এমন পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে পেরেছেন যে, তাঁকে শ্রেষ্ঠ আসনে বসাতে কেউ দ্বিধা করেননি। ইন্দিরা সেই বিরলতমাদের একজন। তাঁর লেখা 'নারীর উক্তি'র ছ'টি নারী সংক্রান্ত প্রবন্ধ, বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

আবার ইন্দিরা যখন স্মৃতিকথা লিখতে বসতেন তখন তাতে মিশত গল্পের রস। প্রখর স্মৃতিশক্তির সাহায্যে তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের বহু গান উদ্ধার করেছেন। নাহলে অনেক গানেরই সুর যেত হারিয়ে। স্মৃতিকথা হিসেবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জড়িত সংগীত, সাহিত্য, নাট্য, ভ্রমণ ও পারিবারিক স্মৃতির কথা বলেছেন। এতে রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের অনেক কথাই জানা যায়। স্মৃতিকথা লেখবার সময় ইন্দিরা সবসময় একটি বিশেষ রীতি মেনে চলতেন, যাতে যাঁর কথা বলতেন, তাঁর ঘরোয়া ব্যক্তিত্বের ছবি ফুটে উঠত। এই ছোট ছোট ব্যক্তিত্বের সমষ্টিকে তিনি বলতেন 'ছোট ফুলের শ্রদ্ধাঞ্জলি'। তাঁর 'জীবনকথা' যেন রূপকথার ঝাঁপি। এটি ইন্দিরার নিজের কথা—শুরু হয়েছে তাঁর জন্ম থেকে আর শেষ হয়েছে দাদা সুরেন্দ্রনাথের পৌত্র সুপ্রিয়ের জন্মবৃত্তান্তের সঙ্গে সঙ্গে। ঠাকুরবাড়ির এবং চৌধুরীবাড়ির বহু খবর এতে পাওয়া যাবে।

ইন্দিরার নিজস্ব ব্যাখ্যাসহ দু-একটা অংশ পড়লেই বোঝা যাবে ব্যাপারটা। '...একটি মনস্তত্ত্বের রহস্য এখানে পেশ করছি, সেটি এই যে, পিসিমারা বড়লোকের মেয়ে হলেও হাত-দরাজ ছিলেন না। অথচ তাঁর ভাইবউরা গরিবের মেয়ে হলেও মুক্ত হস্তে খরচ করতেন। —এমনটি কেন হয়?—আমার একটা সমাধান এই মনে হয় যে, মেয়েরা স্বামীভাগ্যেই ভাগ্যবতী নিজেদের মনে করেন ও সেইভাবে চলেন। সেদিকে ত পিসিদের জোর ছিল না, তাই টেনে চলতেন। তবে বউদের মধ্যে বেশির ভাগ যশোরের মেয়েরাই ওইরকম দিলখোলা হাতখোলা ছিলেন। সকলকে নিয়ে আমোদ করতে, খাওয়াতে দাওয়াতে, দিতে থুতে ভালবাসতেন। নইলে শহুরে এক বউকে ত দেখেছি পানের বোঁটা দিয়ে গুনতি রাখতেন কটা পান সাজা হল, ...তেমনি এক পিসি শুনেছি হলুদ গুনে গুনে ভাঁড়ার বের করতেন। সুতরাং ননদেভাজে কাটাকাটি হয়ে গেল।'

এ ছাড়াও কত যে মজার খবর রয়েছে 'জীবনকথা'য়। ন-পিসেমশায় জানকীনাথ ঘোষালের কথায় বলছেন, '...তিনিও এক রকম গিন্নিপনায় সুপটু ছিলেন তা এই বললেই বোঝা যাবে যে বিলাতে থাকতে অপর তিতো মশলার অভাবে কুইনিন দিয়ে নাকি সুক্তুনি রেঁধেছিলেন শুনেছি।'

সেজো পিসেমশায় যদুনাথ (কমল) মুখোপাধ্যায়ের কথাও কম মজার নয়। '...সেজো

পিসেমশায়ের বড় ভাই নীলকমল মুখুজ্যের বিয়ে হয়েছিল মহর্ষির সেজোভাই গিরীন্দ্রনাথের ৫ নং বাড়িতে; তাই যদুনাথের ছেলেবেলা থেকেই ৬ নং বাড়িতে অবাধ যাতায়াত ও মেলামেশা ছিল। সেই নজিরে বিয়ে হবার পরেও সেজো পিসিমা তাঁকে 'যদু, ও যদু' বলে ডাকছেন শুনে কর্তাদিদিমা নাকি মেয়েকে ধমক দিয়েছিলেন—'যদু, যদু কী রে? যদু কী তোর ফুলবাগানের মালি?'

এঁদেরই মেয়ে সুপ্রভা, অত্যন্ত সপ্রতিভ ও সুরসিকা। সামান্য কলমের আঁচড়ে তিনি স্পষ্ট হয়ে উঠেছেন, 'আমার বোনের নাকটি একটু চাপা ছিল। তাই পরে বিবাহিত জীবনে যদি স্বামী রুচিঘটিত কোনও ভালমন্দ মত প্রকাশ করতে যেতেন ত সুপ্রভাদি তাঁকে হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলতেন—'হ্যাঁঃ তোমার আবার পছন্দ। তুমি ত আমার এই নাক দেখে পছন্দ করেছিলে।'

আর নিজের কথা, 'জন্মের মধ্যে কর্ম একবার 'বাল্মীকিপ্রতিভা'য় লক্ষ্মী সেজেছিলুম। তাতে 'আমারে শুভক্ষণে হের গো চোখে' বলবার সময় বুকে হাত দিয়ে যেমন করে নিজেকে দেখাতুম তা দেখে আমার খুড়তুতো বোন অভি বলত, 'বোন-দিদি অমন কর না, মনে হয় যেন পেট কামড়াচ্ছে।'

ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলের অনেক ছবিই ইন্দিরা ধরে রেখেছেন।

রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে ইন্দিরার ভূমিকা যে কী, এককথায় তা বলা যাবে না। তাঁর দিদি প্রতিভা গানের জগতে মেয়েদের মুক্তি দিয়েছিলেন। আর ইন্দিরা উদ্ধার করেছিলেন প্রায় লুপ্ত প্রথমদিকের রবীন্দ্রসংগীতকে। তাঁর চেয়ে পনেরোদিনের ছোট অভিজ্ঞার কণ্ঠেও রবীন্দ্রসংগীত নতুন রূপ পেতে শুরু করেছিল কিন্তু অকালে মৃত্যু হওয়ায় অভিজ্ঞা স্থায়ীভাবে কিছু রেখে যেতে পারেননি। সে অভাব পূরণ করেছিলেন ইন্দিরা। দেশি ও বিলিতি উভয় সংগীতে তিনিও তালিম নিয়েছিলেন শৈশবেই। এমনকী যন্ত্রসংগীতেও তাঁর হাত ছিল পাকা। সেন্ট পলস্-এর অর্গানিস্ট স্লেটার সাহেবের কাছে পিয়ানো ও সিনর ম্যাঞ্জাটোর (Signor Manzato) কাছে তিনি শিখেছিলেন বেহালা। ওস্তাদি হিন্দুস্থানি গান শেখেন বদ্রীদাস সুকুলের তত্ত্বাবধানে। হেমেন্দ্রর মেয়েরা গান নিয়ে মেতে থাকলেও অভিজ্ঞা ছাড়া আর কেউ রবীন্দ্রসংগীত চর্চা বেশি করেননি। তাই ইন্দিরাকে একাই সব ভার নিতে হয়েছিল। যদিও রবীন্দ্রসংগীত গাইতেন বাড়ির সব ছেলেমেয়েরাই। ইন্দিরা পরিহাসতরল কণ্ঠে বলতেন, 'আমার জীবনের যতদূর পর্যন্ত দেখতে পাই যেন সামনে এক বিস্তীর্ণ স্বরলিপির মরুভূমি পড়ে রয়েছে, তার মাঝে মাঝে রেফ ও হসন্তের কাঁটাগাছ।'

বাস্তবিকই ইন্দিরা যে কত গানের স্বরলিপি করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। শুধু সুর এবং স্বরলিপি রক্ষা করা নয়, তিনি রবীন্দ্রসংগীতের তথ্য ও তত্ত্ব দুটোকেই সমৃদ্ধ করেছেন। একদিক থেকে স্বরলিপি উদ্ধার করে ও গান শিখিয়ে অপরদিকে সংগীত সংক্রান্ত প্রবন্ধ লিখে। 'রবীন্দ্রসংগীতে ত্রিবেণী সঙ্গম' এমনই একটি ছোট্ট বই। এতে ইন্দিরা দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ অপরের সুরে নিজের কথা গেঁথে গেঁথে কত নতুন গান সৃষ্টি করেছেন, আবার পরের কথায় তাঁর সুর দেওয়ার উদাহরণ যে নেই তা নয়। কবির যাবতীয় ভাঙা গানের একটি লিস্ট তৈরি করে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন, সামান্য অদলবদলের মধ্যে কবি কী অসাধ্য সাধন করেছিলেন। সংগীতজগতে এই পুস্তিকা অমূল্য সংযোজন। রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে এ যুগের অনেকেই নানারকম আলোচনা করেছেন। এ ব্যাপারে মহিলাদের সংখ্যা কম হলেও পুরুষদের সংখ্যা নগণ্য নয়। কিন্তু কেউই ইন্দিরার মতো রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে এত ব্যাপক আলোচনা করেননি। যাঁরা করেছেন তাঁদেরও আলোচনারও আকর হিসেবে গৃহীত হয়েছে ইন্দিরার সংগীত চিন্তা। হবে নাই বা কেন? ইন্দিরাকে যে কবি একটি ভূষণের আশীর্বাদ দিয়ে গিয়েছিলেন,

আমার এ গান যেন সুদীর্ঘ-জীবন
তোমার বসন হয়, তোমার ভূষণ।

যাইহোক, ইন্দিরার দেওয়া হিসেব থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথের দুশো সাতাশটা ভাঙা

গানের বারোটির সুর নেওয়া হয়েছে স্কচ ও আইরিশ গান থেকে। রবীন্দ্রসংগীতে হিন্দুস্থানি গানের দানও কম নয়। ভাবতে অবাক লাগে, আমাদের চিরপরিচিত 'বিদায় করেছ যারে নয়ন জলে'র উৎস 'বাজে ঝননন মোরে পায়েলিয়া', 'তুমি কিছু দিয়ে যাও'-এর উৎস 'কৈ কছু কহরে' কিংবা 'শূন্য হাতে ফিরে হে নাথ'-এর উৎস 'রুমঝুম বরষে' হতে পারে। অপরের কথায় কবির সুর দেবার কথাও আছে। বিদ্যাপতির পদ কিংবা বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম'-এর প্রথম স্তবক ছাড়াও কবি অক্ষয় বড়াল, সুকুমার রায় ও হেমলতা ঠাকুরের গানে সুর দিয়েছিলেন।

ইন্দিরার লেখা রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যা অনেক। বহু পত্রিকায় তিনি এ নিয়ে আলোচনা করেছেন। এদের মধ্যে 'সংগীতে রবীন্দ্রনাথ', 'রবীন্দ্রসংগীতের শিক্ষা', 'রবীন্দ্রসংগীতের বৈশিষ্ট্য', 'রবীন্দ্রনাথের সংগীতপ্রভাত', 'স্বরলিপি পদ্ধতি', 'শান্তিনিকেতনে শিশুদের সংগীতশিক্ষা', 'হারমনি বা স্বরসংযোগ', 'রবীন্দ্রসংগীতে তানের স্থান', 'রবীন্দ্রনাথের গান', 'বিশুদ্ধ রবীন্দ্রসংগীত', 'হিন্দিসংগীত', 'আমাদের গান', 'স্বরলিপি', 'দি মিউজিক অব রবীন্দ্রনাথ টেগোর', ইন্দিরার সংগীতচিন্তার পরিচয় বহন করে।

শুধু কাজ দিয়ে ইন্দিরার বিচার করা যায় না। তিনি সারাজীবন নানারকম কাজ, মহিলা সমিতি, প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন। কিছুদিনের জন্যে বিশ্বভারতীর উপাচার্যের পদও তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছিল। পেয়েছিলেন তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়া সর্বোচ্চ সম্মান—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক, বিশ্বভারতীর দেশিকোত্তমা উপাধি। রবীন্দ্রভারতী সমিতি তাঁদের প্রথম ঘোষিত পুরস্কার অর্পণ করেন ইন্দিরাকে কিন্তু যাঁরা তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলেন তাঁরা জানতেন ইন্দিরার তুলনায় এসব সম্মান-উপাধি-স্বর্ণপদক কত সামান্য।

এইখানেই ইন্দিরার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য। কোনও কাজ করে নয়, কোনও কাজের মধ্যে নয়, শুধু উপস্থিতি দিয়েই তিনি ভরে দিতে পারতেন সব শূন্যতাকে। ছোট ছোট কবিতা লিখতেন আশীর্বচনের বদলে। হারিয়ে গিয়েছে কত। দুটি-একটি কারও স্মৃতিতে বেঁচে আছে। সুচিত্রা মিত্রকে একবার লিখেছিলেন,

'আনন্দ বিলাও তুমি
না করি কার্পণ্য।
সুধাকণ্ঠে সুধাগীত
শুনে হই ধন্য ॥
মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতৃবৃন্দ
করি নিবেদন—
বারে বারে এস ফিরে
শান্তিনিকেতন।'

প্রজ্ঞার পাঁচ বছরের মেয়ে সুরভির মৃত্যুতে লেখেন,

'সুরভি ছিল তোমার নাম
তাই বুঝি ফুলের মতন
সৌরভ করিয়া বিতরণ
দুদিনে ত্যজিলে মর্ত্যধাম।
সে সৌরভ চির দিন রাত
রহিল মোদের ঘরে
তুমি থাক দেবতার তরে
অমর অমল পারিজাত।'

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র-প্রয়াণের পর রবীন্দ্র ভাবধারাকে একটানা কুড়ি বছর ধরে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন তিনি। সঙ্গে আরও অনেকে ছিলেন কিন্তু তাঁরা সঙ্গীমাত্র, তার বেশি কিছু নয়। ইন্দিরা একাই সব।

ইন্দিরার কমনীয় ব্যক্তিত্বে যে কমল হিরের দীপ্তি ফুটে উঠেছে তাকেই বলা যায় 'কালচার'। এই কালচারের ছাপ ইন্দিরার উপস্থিতিতে সাজসজ্জায়-বাক্যবিন্যাসে-ঘরসাজানোয়-আচার-ব্যবহারে-প্রেমপত্রে-সাহিত্যচর্চায়-স্বামীসেবায়-গৃহিণীপনায়-সবুজপত্রে-কমলালয়ে-শান্তিনিকেতনের আশ্রম-কুটিরে সর্বত্র পড়েছিল। এই বিশিষ্টতাই তাঁর সবচেয়ে বড় দান। বাংলার নারীদের সামনে তিনি তাঁর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত আদর্শ জীবনটিকে তুলে ধরেছিলেন। তাঁরই মধ্যে ফুটে উঠেছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের নিজস্ব সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

আবার হেমেন্দ্রনাথের মেয়েদের কথায় ফিরে আসা যাক। প্রতিভা ও প্রজ্ঞার আরও ছটি গুণবতী বোন ছিলেন। তাঁদের সেজো বোন অভিজ্ঞাসুন্দরী বেঁচে আছেন সকলের স্মৃতিকথায়। তাঁকে অনেকেই দেখেননি কিন্তু যাঁরা দেখেছিলেন তাঁরা আর ভোলেননি। সবাইকে অবাক করা এই মেয়েটিই রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে প্রিয় ভাইঝি অভি। তাঁর গলায় নিজের গান শুনে মুগ্ধ হয়ে যেতেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। শিলাইদহে থাকতে থাকতে অভিজ্ঞার গান শোনবার জন্যে তাঁর মন উঠত হু হু করে। ইন্দিরাকে লেখা চিঠিতেও সেই ব্যাকুলতার আভাস, 'অভির মিষ্টি গান শোনবার জন্যে আমার এমনি ইচ্ছে করে উঠল যে তখন বুঝতে পারলুম, আমার প্রকৃতির অনেকগুলি ক্রন্দনের মধ্যে এও একটা ক্রন্দন ভিতরে ভিতরে চাপা ছিল।'

কী ছিল অভিজ্ঞার কণ্ঠে? অকালে, নিতান্ত অসময়ে হারিয়ে যাওয়া এই কিশোরীর কণ্ঠে কোন অনির্বচনীয় মাধুরী ধরা পড়ত, কে দেবে উত্তর? যাঁরা দিতে পারতেন তাঁরা সবাই তো পরলোকে। শোনা যায়, রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের গানগুলি অভিজ্ঞার কণ্ঠে মূর্তি লাভ করত। হিন্দি গানও অভিজ্ঞা মর্মস্পর্শী করে গাইতে পারতেন। ছায়ানটের 'ঠারি রহো মেরা আঁখন আগে' গানটি কিশোরী অভির কণ্ঠে শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন প্রমথ চৌধুরী। ঠাকুরবাড়িতে তখন সুবর্ণযুগ চলছে। রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টির আপন খেয়ালে তন্ময়। একের পর এক লিখে চলেছেন 'বাল্মীকিপ্রতিভা', 'কালমৃগয়া', 'মায়ার খেলা'। আর ক্লান্তিহীন কণ্ঠে তাকে রূপ দিয়ে চলেছেন অভিজ্ঞা।

করুণ গানে অভিজ্ঞার জুড়ি ছিল না। 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র পর কবি লিখলেন 'কালমৃগয়া'। বিদ্বজ্জন-সভায় আবার এলেন অতিথিরা। ১৮৮২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর, জমাট কুয়াশাভরা শীতার্ত সন্ধ্যা। তাঁদের সামনে শুরু হল 'কালমৃগয়া'। 'বাল্মীকিপ্রতিভা'য় আত্মপ্রকাশ করেছিলেন প্রতিভা, এবার মঞ্চে অবতরণ করলেন অভিজ্ঞা। লীলার ভূমিকায় অভিজ্ঞার অভিনয় দেখে অনেকেই সেদিন চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি। এই অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ সেজেছিলেন অন্ধ মুনি আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দশরথ। কিন্তু অভিজ্ঞার অভিনয় সবার মনে যতটা দাগ কেটেছিল তাঁর কাকারাও ততটা পারেননি। 'ভারতবন্ধু' কাগজের সমালোচক লিখেছেন, লীলার গান শুনলে 'পাষাণ হৃদয় বিগলিত হয়।'

অভিজ্ঞার পাষাণ-গলানো গান আবার শোনা গিয়েছে 'বাল্মীকিপ্রতিভা' অভিনয়ের সময়ে। হাত বাঁধা বালিকা সেজে তিনি যখন গাইলেন, 'হা কি দশা হল আমার' তখন বাঙালি দর্শকরা 'কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন'—এ একেবারে অবনীন্দ্রনাথের নিজের চোখে দেখা। আরও কিছুদিন পরে অভিজ্ঞা একটু বড় হয়েছেন। কণ্ঠে মাধুরীর সঙ্গে মিশেছে দরদ। ভালবাসার কুঁড়ি ধরল তাতে। রবীন্দ্রনাথ এবার লিখলেন 'মায়ার খেলা'। কথা ও সুরের সত্যিকারের মিলন হল যেন।

তাকে আরও সুন্দর করে তুলল অভিজ্ঞার কণ্ঠ। ইন্দিরা ও তাঁর স্বামী প্রমথনাথের সাক্ষ্যে জানা যায়, অভিজ্ঞা একাসনে বসে 'বাল্মীকিপ্রতিভা' বা 'মায়ার খেলা'-র সমস্ত গান গাইতে পারতেন। 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র সমস্ত গান অভিজ্ঞার মতো মর্মস্পর্শী করে গাইতে প্রমথনাথ আর কাউকে শোনেননি। অপরদিকে 'মায়ার খেলা'-র গান শুনে বহুদিন পরে প্রায়-বৃদ্ধ অবন ঠাকুরের স্মৃতি উদ্বেল হয়ে ওঠে, 'হায়, যে ওসব গান গাইবে সে মরে গেছে। সেই পাখির মতো আমাদের ছোট বোনটি চলে গেছে।...সে সুরে যে গাইত সে পাখি মরে গেছে।' আর রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন, জোড়াসাঁকোর বাড়ির সান্ধ্য মজলিশের কথা। তেতলার ছাদের এই আসরে যোগ দিতেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ। বাড়ির সকলেই ছিলেন গানপাগল। 'সব সময়েই বাড়ির আনাচে কানাচে গানবাজনার মধুর আওয়াজ শোনা যেত।' আগেকার মতো সাহিত্যের আসর না হলেও সংগীতের আসর জমে উঠত। 'বাবাই বেশি গাইতেন ... মাঝে মাঝে দিদিদের গাইতে বলতেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে মিষ্টি ছিল সেজো জ্যাঠামশায়ের মেয়ে অভিদিদির গলা। বাবার খুব আশা ছিল বড় হয়ে তিনি অপূর্ব গাইয়ে হবেন। কিন্তু বাবার সে আশা পূর্ণ হল না, অল্প বয়সেই অভিদিদির মৃত্যু হয়।' অভিজ্ঞা তাই স্মৃতি হয়েও যেন স্মৃতি নন। যে একবার তাঁর গান শুনেছে সে-ই তাঁকে মনে রেখেছে।

'মায়ার খেলা'য় অভিজ্ঞা নিতেন শান্তার ভূমিকা। শান্তার করুণ-মধুর বিষণ্নতা অভিজ্ঞার কণ্ঠে জীবন পেত। পরে বির্জিতলায় আরেকবারের অভিনয়ে ইন্দিরা নিয়েছিলেন শান্তার ভূমিকা, কারণ শান্তার ভূমিকাভিনেত্রী তখন আর ইহলোকে নেই। অভিজ্ঞা ছিলেন শান্ত, গম্ভীর, রোদনভরা বিষণ্ন। 'দেহ বলে তার কোনও জিনিস ছিল না, মুখের মধ্যে দুটি বড় বড় জীবন্ত চোখ ছিল। আর সে চোখ দুটি মাধুর্যপূর্ণ।' নিষ্ঠুর শিকারির অব্যর্থ লক্ষ্যভেদে জর্জরিত হয়েছিল বুঝি পাখির মতো কোমল হৃদয়। কালব্যাধি যে তলে তলে বাসা বেঁধেছে সেকথা কেউ বুঝতেই পারেনি। বিয়ের রাতে ঘটল অঘটন। অনুষ্ঠানের শেষেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। হঠাৎ জ্বর, প্রবল জ্বর। দিনে দিনে অসুখ বেড়ে চলে এবং জানা যায় দুরারোগ্য ক্ষয় রোগ তাঁকে গ্রাস করে ফেলেছে। চিকিৎসার অসাধ্য। কৃশপাণ্ডুর চাঁদের মতোই হারিয়ে গেলেন অভিজ্ঞা। মৃত্যু হল জোড়াসাঁকোর বাড়িতেই। চিকিৎসক স্বামী বধূকে সুস্থ করবার সুযোগই পেলেন না।

অভিজ্ঞার মৃত্যুতে সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে রবীন্দ্রসংগীতের। সেই প্রথম পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগে অভিজ্ঞার মতো প্রতিভাময়ী গায়িকা বেঁচে থাকলে কবি প্রয়োগের দিক থেকেও রবীন্দ্রসংগীতকে প্রতিষ্ঠা দিতে পারতেন। কিন্তু সে বুঝি হবার নয় তাই অকালে ঝরে পড়ল অস্ফুট কোরকটি, অকালে নিভে গেল বাংলাদেশের একটি রত্নপ্রদীপ। অভিজ্ঞার মৃত্যুর পরে কবি চারটি সনেট লিখেছিলেন—'নদীযাত্রা', 'মৃত্যুমাধুরী', 'স্মৃতি' ও 'বিলয়'। নতুন করে কবির যেন মনে পড়েছিল মৃত্যুমাধুরীমাখা দুটি আশ্চর্য সুন্দর চোখ আর প্রভাত-পাখির মতো সুমধুর কণ্ঠের অধিকারিণী অভিজ্ঞাকে।

> 'আঁখি তার কহে যেন মোর মুখে চাহি
> আজ প্রাতে সব পাখি উড়িয়াছে গাহি—
> শুধু মোর কণ্ঠস্বর এ প্রভাতবায়ে
> অনন্ত জগৎ-মাঝে গিয়েছে হারায়ে।'

'কবিমানসী' গ্রন্থের লেখক জগদীশ ভট্টাচার্যের মতে, এই সনেট চারটি কবির 'নতুন বৌঠানের স্মৃতিসুধায় ভরপুর'। কিন্তু একথা মেনে নেওয়া যায় না। ক্ষিতিমোহন সেনের ডায়রিতে যে 'চৈতালি' কাব্য আলোচনার অনুলিখন রাখা আছে, তাতেও দেখা যাবে কবি এই সনেটগুলো সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'আমার ভাইঝি অভির মৃত্যুর পরে লেখা।' অভিজ্ঞার

মৃত্যুর পরে আর-একজনও তাঁর কথায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি আর কেউ নন, প্রমথ চৌধুরী, যিনি কোনওরকম ভাবালুতাকে প্রশ্রয় দেওয়া অনাবশ্যক মনে করতেন। তাঁর কাছেও অভিজ্ঞা একটি বিস্ময়! তাঁর মনে হয়েছিল অভিজ্ঞা 'সেক্সপীয়রের কল্পিত আরিয়েলের সগোত্র। অর্থাৎ অশরীরী সংগীত।' বারো তেরো বছর বয়সের এই কিশোরী তাঁর মনে স্থায়ী ছাপ রেখে গিয়েছিলেন, 'জীবনে কোনও কোনও লোক প্রথম থেকেই আমাদের মনে বিশেষ ছাপ রেখে যায়, যা কখনও বিলুপ্ত হয় না। অভি ছিল সেই দু-চারটি লোকের ভিতর একজন।' প্রমথনাথের মনে হয়েছিল, 'ইংরেজরা বলে whom the gods love die young! অভি ছিল সেই দেবতাদের প্রিয় একটি বালিকা। কেন-না সে কখনও কিশোরী হয়নি।'

সময় কারও জন্যে বসে থাকে না; অভিজ্ঞার ঠিক পরের বোন মনীষাও বড় হয়ে উঠেছেন। তাঁর দিদির রবীন্দ্রসংগীতে এত নাম কিন্তু তিনি বেছে নিলেন বিদেশি যন্ত্রসংগীতকে। বড়দিদি প্রতিভার মতো তিনিও খুব ভাল ইউরোপীয় গান এবং পিয়ানো বাজাতে পারতেন। পরে পিয়ানোর দিকেই ঝোঁক থাকায় এদেশের শ্রেষ্ঠ পিয়ানিস্টদের একজন হয়ে ওঠেন। অন্যান্য বোনেদের মতো তিনিও লোরেটোয় পড়তেন, বাড়িতে চলত ক্লান্তিবিহীন সংগীতসাধনা। ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজ অব মিউজিক থেকে সংগীতবিদ্যার যে পরীক্ষা কলকাতায় নেওয়া হত, তাতে অংশ নিতেন। তাঁদের উত্তীর্ণ হবার খবরও ছাপা হত। মনীষা সব পরীক্ষায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু দেশি গানের সঙ্গে তাঁর অন্তরের যোগ ছিল না বললেই হয়। প্রতিভা গাইতেন বিলিতি গান, পিয়ানোয় বাজাতেন ওস্তাদি বাজনা, পরে তাঁর ঝোঁক পড়ে হিন্দুস্থানি গানের ওপর। কিন্তু মনীষা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পিয়ানোচর্চা করেই কাটিয়েছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের 'পদপ্রান্তে রাখো সেবকে' ও দু-তিনটে গানে পিয়ানোর সঙ্গত বসিয়েছিলেন কিন্তু সেগুলো তেমন জনপ্রিয় হয়নি। যেমন জনপ্রিয় হয়নি 'তমীশ্বরাণাং' বেদমন্ত্রের পিয়ানোসঙ্গত। এর ফলে মনীষা বাঙালিদের গানের জলসায় প্রায় অপরিচিতাই রয়ে গেলেন। আরও একটা কারণও আছে। এক সময় সাহেবিয়ানার অনুকরণে বাঙালির ঘরে ঘরে পিয়ানোচর্চা শুরু হয়েছিল ঠিকই কিন্তু পিয়ানো কোনওদিনই বাঙালির ঘরের জিনিস হয়ে ওঠেনি। এখন বিদেশি যন্ত্র সর্বস্বতার যুগ, তবু পিয়ানো তার বিশাল আকার আর বিশাল দাম নিয়ে অভিজাত ড্রইংরুমের বাইরে বড় একটা এসে পৌঁছয়নি—তার স্থান নিয়েছে পিয়ানো-একর্ডিয়ান, গিটার প্রভৃতি ছোট ছোট বাদ্যযন্ত্র। তাই পিয়ানিস্টরাও সাধারণ সমাজে পরিচিত নন। মনীষা তাঁর যোগ্য সম্মান পেয়েছিলেন বিদেশে।

অভিজ্ঞার মৃত্যুর পরে তাঁর স্বামী দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেই মনীষার বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের কিছুদিন পরেই বিদায় নিলেন অভিজ্ঞা। দেবেন্দ্রের সেবা তাঁকে ফিরিয়ে আনতে পারল না। কিন্তু বোনের মৃত্যুর পর এই উদার উন্নতমনা যুবকটিকে ভালবেসে ফেলেছিলেন অভিজ্ঞার দাদারা। তাঁরা প্রস্তাব করলেন তাঁদের বোন স্নেহবন্ধন ছিঁড়ে চলে গিয়েছেন, কিন্তু দেবেন্দ্র থাকুন। মনীষার সঙ্গে দেবেন্দ্রের আবার বিয়ে দেওয়া হোক। আপত্তির কারণ ছিল না। শুধু একটু বাধা। মহর্ষি নাতনিদের বিয়েতে তিন হাজার টাকা যৌতুক দিতেন। এবার দেবেন্দ্রকে নতুন করে যৌতুক দিতে তিনি রাজি হলেন না। মনে হয়, নাতজামাইকে পরীক্ষা করবার জন্যেই। বিব্রত হলেন হিতেন্দ্র-ক্ষিতীন্দ্র-ঋতেন্দ্র। তাঁরা দেবেন্দ্রকে অনুরোধ জানালেন এ বিয়েতে রাজি হতে, পরে যেমন করে হোক, তাঁরা এ টাকা জোগাড় করে দেবেন। দেবেন্দ্র এসব দাবি করেনইনি, তাই বিয়ে বন্ধ হল না। সব দেখে সন্তুষ্ট হয়ে, মহর্ষিও সমস্ত টাকা দিয়ে দিলেন। ক্ষিতীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত ডায়রি 'মহর্ষি পরিবারে' এ তথ্য পাওয়া গিয়েছে।

মনীষা স্বামীর সঙ্গেই বিদেশে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর পিয়ানোয় নিখুঁত ইংলিশ নোটেশন

শুনে ইউরোপীয়রা যেমন মুগ্ধ হয়েছিলেন, তেমনি বিস্মিত হয়েছিলেন পিয়ানোয় হিন্দু মার্গসংগীতের ভাবপ্রকাশের স্বাচ্ছন্দ্যে। বিদেশে যাঁরা মনীষার পিয়ানো শুনেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মনীষী ম্যাক্সমূলার। মনীষাকে লেখা তাঁর একটি উচ্ছ্বসিত প্রশংসাপূর্ণ চিঠি আজও রবীন্দ্রভারতী মিউজিয়ামে মনীষার নিখুঁত সুরসৃষ্টির নীরব সাক্ষী হয়ে আছে। তাতে জানা যায় শুধু সংগীত নয়, ভারতীয় সংগীত, বিশেষত হিন্দু মার্গসংগীতের বিশুদ্ধ সুরসৃষ্টি দিয়ে মনীষা সমস্ত পশ্চিমি জগৎকে মুগ্ধ করেছিলেন।

অবশ্য এদেশের সংগীতসমাজের সঙ্গেও যে মনীষার যোগ ছিল না তা নয়। প্রতিভা ও ইন্দিরা যেমন 'সঙ্গীত-সংঘে'র প্রাণকেন্দ্র ছিলেন, তেমনি 'সঙ্গীত সম্মিলনী'র সঙ্গে মনীষা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর স্বামীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবেও প্রমদার স্বামী বনোয়ারীলাল চৌধুরী পরিচিত। প্রমদার সঙ্গে ছিল মনীষার গভীর সখ্য। তাঁর স্মৃতিকথা থেকেই জানা যায়, প্রথমদিকে 'সঙ্গীত সম্মিলনী' 'আনন্দ সভার' মতোই একটা ক্লাব ছিল। সেই ক্লাবের সদস্যাদের আগ্রহ আর ইচ্ছেতেই গড়ে ওঠে 'সঙ্গীত সম্মিলনী' গানের স্কুল। স্কুলের পরিচালনভার গ্রহণ করে প্রমদা। মনীষা ছিলেন উৎসাহী সভ্য। মাঝে মাঝে যোগ দিতেন বিভিন্ন সংগীত ও নৃত্যের অনুষ্ঠানে, বাজাতেন পিয়ানো কিংবা বেহালা। মনীষার লেখার হাতও বেশ ভাল ছিল, যদিও তিনি খুব বেশি লেখেননি। তাঁর সাহিত্যচর্চার বিবরণ পাওয়া যাবে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র পুরনো ফাইলে। কয়েকটা প্রবন্ধ ছাড়াও তিনি লিখেছিলেন একটা নাটক, ছোটদের অভিনয় করার জন্যে। কিন্তু লেখার পরে সেটিও আর যত্ন করে তুলে রাখেননি। প্রমদার মৃত্যুর পরে লেখা 'স্মৃতিকথা'টির ভাষাও ঝরঝরে। তিনি লিখেছেন:

'...প্রমদার কথা বলতে গেলে 'সঙ্গীত সম্মিলনী'র কথা না বলে থাকা যায় না। আজ প্রায় চল্লিশ বছরের কথা, আমার সব মনে নেই। প্রথমে, আমরা কয়জন মিলে একটা ক্লাব খুলি....। আমাদের উদ্দেশ্য সংগীতচর্চা। ....এতে ডা. বি এল চৌধুরী, আমার স্বামী ডা. ডি এন চ্যাটার্জি, ও আমার মেজো ভাই ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর খুব উৎসাহ দিতেন ও অনেক রকম সাহায্য করতেন। ওঁদের সাহায্য না পেলে সম্মিলনীর অত শীঘ্র উন্নতি হত না। ক্রমশ স্কুল খোলা হল।

'তারপর আমি শিলং বাস করাতে ক্ষণিক সম্বন্ধ ত্যাগ করতে হল। মাঝে মাঝে চিঠিতেও পরামর্শ দিতুম। সময় সময় প্রমদা সম্মিলনী ছাড়ি ছাড়ি করতেন। কিন্তু আমরা ছাড়তে দিইনি। সম্মিলনী যেন তাঁর অঙ্গ ছিল।...তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। কিন্তু এই সম্মিলনীর ছেলেমেয়েরা তাঁর সন্তানস্বরূপ ছিল। কেউ বা মিঠাপিসী, কেউ বা জেঠিমা, কেউ বা মিঠাদিদি বলে ডাকত। সকলেই তাঁর আদরের ছিল! বিবাহ সম্বন্ধ পাকাতে তাঁর দ্বিতীয় আর কেউ ছিল না।'

মনীষা সাহিত্যচর্চার সঙ্গে সঙ্গে 'পুণ্য' পত্রিকার মাধ্যমে মাঝে মাঝে সেলাই-ফোঁড়াইয়ের কাজও শেখাতেন। বিশেষ করে সেকালে বসবার ঘরে পুঁতির পর্দা ঝোলানো ছিল আভিজাত্যের লক্ষণ। ঠাকুরবাড়িতেও এ প্রথা ছিল। মনীষা সেই পর্দা সেলাইয়ের বা বোনার পদ্ধতি, নকশা প্রভৃতি ছবি এঁকে, ঘর গুনে সেলাই দিয়ে অন্যদের বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। হেমেন্দ্রনাথের অন্যান্য মেয়েদের মধ্যেও নানান গুণের সমাবেশ দেখা গিয়েছে। ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা দেখিয়েছেন, প্রগতির সঙ্গে শাশ্বতীকে বেঁধে রেখে কী করে সমাজকে গড়ে তোলা যায়। শুধু এই কারণেই বাঙালি মেয়েদের ওপর তাঁরা স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন। লিলিয়ান পালিত, রমলা সিংহ, রানি নিরুপমা, সুনীতি দেবী, সুচারু দেবী, মৃণালিনী সেন ও আরও অনেকেই সেদিনকার ধনী সমাজে আলোড়ন জাগিয়েছিলেন, এনেছিলেন নতুন উদ্দীপনার জোয়ার। কিন্তু তাঁদের প্রভাব কি পড়েছিল আমাদের সমাজে? না পড়ার কারণ, তাঁরা ছিলেন আরও অনেক দূরের মানুষ। বরং প্রভাব ফেলেছিলেন সরলা রায়, অবলা বসু, কুমুদিনী খাস্তগির, কাদম্বিনী গাঙ্গুলী, চন্দ্রমুখী বসু—দলে দলে মেয়েরা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মতো লেখাপড়া শিখতে। এঁদের পাশেই ছিলেন ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা।

হেমেন্দ্রনাথের পঞ্চম কন্যা শোভনাসুন্দরী। তিনি আবার গানবাজনার চেয়ে লেখাপড়াতেই বেশি উৎসাহী। ঠাকুরবাড়িতে তখন রসের উৎসে ভাটা পড়তে শুরু করেছে, একেবারে শুকিয়ে যায়নি, এমনি সময়ে শোভনা বড় হয়ে উঠলেন নিজের মনে। দিদিরা ব্যস্ত গানবাজনা, ছবি আঁকা, নতুন রকমের খাবারদাবার তৈরি করতে। ছোট বোনেদেরও হয়তো ওদিকেই ঝোঁক কিন্তু শোভনা স্বপ্ন দেখেন পিসিমার মতো বই লেখার। কী সুন্দর গল্প! কেমন অবলীলায় লেখা। কী করে লেখিকা হওয়া যায়? পড়তে পড়তে শোভনা ভাবেন আর তারই ফাঁকে ইংরেজি শেখার ভিত গাঁথা হয়। হঠাৎ বিয়ে হয়ে গেল নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে, সুদূর জয়পুরের ইংরেজির অধ্যাপক। বাড়ি হাওড়ায়। চার ভাইয়ের বড় ভাই রায়বাহাদুর। নগেন্দ্রনাথ মেজো। সেজো ভাই যোগেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল শোভনার সপ্তম বোন সুষমার। বিয়ের পর শোভনা গেলেন স্বামীর কর্মক্ষেত্রে। এক হিসেবে হয়তো ভালই হল। কলকাতার মেয়েরা তখন এগিয়ে চলেছেন জোর কদমে। দুর্গামোহন দাসের মেয়েরাও উঠেপড়ে লেগেছেন লোককল্যাণের কাজে। সরলা স্থাপন করেছেন গোখেল মেমোরিয়াল, অবলা খুলেছেন ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়। ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা সমাজের মধ্যমণি। প্রতিভা, প্রজ্ঞা, ইন্দিরা তো আছেনই, আরও আছেন হিরণ্ময়ী ও সরলা। আছেন মহারানি সুনীতি, মণিকা, সুচারু, এসেছেন হেমলতা, প্রিয়ংবদা আরও কতজন। এঁদের মধ্যে নতুন কিছু করার কথা ভাবতেই পারতেন না শোভনা। তাই অনেক দূরে, নিভৃতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পরিবেশে গিয়ে শোভনা সংগ্রহ করে আনলেন ডালি ভর্তি মরুকুসুম, সেইসঙ্গে তাঁর লেখার হাতটি গেল খুলে। চোখ পড়ল এমন সব জিনিসের ওপর, যাদের সবাই দেখেছে অথচ কেউ লেখেনি তাদের ওপর।

পত্নীপ্রেমিক নগেন্দ্রনাথ উৎসাহ দিলেন। তাঁর মধ্যেও একটি কবিমন লুকিয়ে ছিল। মাইকেলের অনুসরণে তিনি লিখেছিলেন 'যক্ষাঙ্গনা কাব্য'। তাঁর আরও অনেক লেখা পাণ্ডুলিপি আকারে রয়েছে—'কৃষ্ণা', 'মেনকানন্দিনী কাব্য', 'স্বর্গোদ্ধার কাব্য' এবং 'সোনার ঢেউ' নামে গল্পগুচ্ছ। কিন্তু সেসব এমন কিছু উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠেনি, তার চেয়ে শোভনার কৃতিত্ব অনেক বেশি। কী লিখবেন তিনি? স্বর্ণকুমারীর মতো গল্প? না না, সে যেন অসম্ভব। তার চেয়ে— হারিয়ে যাওয়া-লুকিয়ে থাকা উপকথা-রূপকথাগুলোকে সংগ্রহ করলে কেমন হয়? ঠাকুরবাড়ির মেয়ে, গ্রামবাংলার সঙ্গে—লোকগাথার সঙ্গে পরিচয় কম। তার চেয়ে বরং জয়পুরের গল্প সংগ্রহ করা যাক। আর এমনি করেই শোভনা সত্যিকারের পথ খুঁজে পেলেন। 'পুণ্য' পত্রিকায় ছাপা হল ভিন্ন স্বাদের, ভিন্ন পরিবেশের কয়েকটা গল্প—'ফুলচাঁদ', 'ডালিমকুমারী', 'গঙ্গাদেব', 'লুব্ধবণিক তেজারাম', 'দিলীপ ও ভীমরাজ', 'লক্ষটাকার এক কথা'। সবই জয়পুরি গল্পের ছায়ায় লেখা। প্রথমটা মনে হল, স্বর্ণকুমারীর মতোই শোভনা টডের রাজস্থান থেকে গল্প সংগ্রহ করেছেন। আসলে কিন্তু তা নয়। শোভনা মন দিয়েছিলেন উপকথা সংগ্রহে। পরে তিনি জয়পুরি প্রবাদ বা কহাবৎও সংগ্রহ করেন। সেইসঙ্গে মন দিলেন শিল্প ও সাহিত্য সম্পর্কেও। লেখার জন্যে লোকসাহিত্য থেকে উপকরণ নির্বাচন যে অত্যন্ত সুষ্ঠু ও মনোজ্ঞ হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। তখনকার তুলনায় তাঁর আগ্রহ বেশ নতুন ধরনের, বলা বাহুল্য। কোনও মহিলা তখনও লোককথা সংগ্রহ করবার জন্যে বেরিয়ে পড়েননি, তবে কবির নির্দেশে রূপকথা সংগ্রহের কাজে হাত দিয়েছিলেন মৃণালিনী। সব কাজে অগ্রণী ঠাকুরবাড়ির মেয়ে শোভনাই বা পিছিয়ে থাকবেন কেন? লোককথার সরণি বেয়েই তিনি পৌঁছলেন প্রাচীন ভারতের পৌরাণিক সাহিত্যের জগতে।

জয়পুরি উপকথা সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে শোভনা সংগ্রহ করেছিলেন কহাবৎ বা জয়পুরি প্রবাদ। ১৯০০-১৯০১ সালে প্রবাদ সংগ্রহের দিকে অনেকেই নজর দিয়েছেন। রেভারেন্ড লং এবং আরও কয়েকজন তখন বাংলা প্রবাদ সংগ্রহ করেছিলেন। তবে ভিন্ন প্রদেশের প্রবাদ সংগ্রহ করে তার অর্থ উদ্ধার, অনুবাদ এবং বাংলায় সমার্থক প্রবাদ অনুসন্ধান করে শোভনা সত্যিই

একটু নতুনত্ব আনার চেষ্টা করেন। এইসব কহাবৎ-এ জয়পুর বা রাজস্থানবাসীর বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, ধর্মপ্রবণতা ও এ অঞ্চলের কিছু কিছু স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে। আজকের দিনে অর্থাৎ শোভনার কহাবৎ সংগ্রহের একশো বছর পরেও এই ধরনের প্রবাদ সংগ্রাহকের সংখ্যা খুবই কম। এবার কয়েকটা কহাবৎ শোনা যাক:

মূল: "কাল কি জয়োড়ী গধেড়ী, পরসো কী গীত গাবে"
অনুবাদ: 'কাল জন্মেছে গাধা, পরশুর গীত গাচ্ছে'
অর্থ: গর্দভ জন্মগ্রহণ করিয়াই পূর্বজন্মের অভ্যাসবশত অমঙ্গল ডাক ডাকিতে থাকে।
বঙ্গীয় প্রবচন: রাসভবিনিন্দিত স্বর

মূল: "জয়পুর কি কমাই ভাড়া বলিতা খাই"
অনুবাদ: 'জয়পুরের উপার্জন ভাড়া ও খুঁটেতে ব্যয় হয়'
অর্থ: জয়পুরে ঘর ভাড়া ও রন্ধনকাষ্ঠের মূল্য বেশি

মূল: "শীতলা কুনসা ঘোড়া দে, আপ হী গধা চড়ে"
অনুবাদ: 'শীতলা ঘোড়া কোথা থেকে দেবে, আপনিই গাধা চড়ে'
অর্থ: নিজেই পায় না, পরকে দেবে

জয়পুরের উপকথা-রূপকথা-প্রবাদ-প্রবচন ছাড়াও শোভনাকে আকৃষ্ট করেছিল জয়পুরি শিল্প—একেবারে ঘরোয়া শিল্প। ছেঁড়া কাগজ দিয়ে তৈরি ধামা, চুপড়ি, থালা, বাটি, খেলনা, পুতুলকে ওখানে বলা হয় ডোমলা শিল্প। 'পুণ্য'র পাঠিকাদের তিনি 'ডোমলা'র কাজও শিখিয়েছিলেন। কিন্তু এগুলি সবই উপক্রমণিকা, এরপর শোভনা নামলেন তাঁর আসল কাজে।

বাংলা ভাষা ছেড়ে দিয়ে তিনি ইংরেজিতে লিখতে শুরু করলেন ভারতের বেদ-পুরাণ-ইতিহাস-লোককথার গল্প। শোভনা মনে করতেন গল্প লেখার ইচ্ছে থাকলেও তাঁর কল্পনার দৌড় বেশি নয়, কাজেই সৃজনশীল রচনার চেয়ে অনুবাদেই তাঁর হাত খুলবে বেশি। প্রথমে তিনি সাহস করে অনুবাদ করে ফেললেন স্বর্ণকুমারীর জনপ্রিয় উপন্যাস 'কাহাকে'। ইংরেজি অনুবাদের নাম 'টু হুম'। খুব যে ভাল হল তা নয়, অনুবাদকের তো কোনও স্বাধীনতা নেই। স্বর্ণকুমারী নিজে যখন 'কাহাকে'র অনুবাদ করলেন 'অ্যান আনফিনিস্ট সং' নামে, তখন সে অনুবাদ হয়ে উঠল নতুন বই। যাইহোক, একই সঙ্গে শোভনা অনুবাদ শুরু করেছিলেন পুরনো দিনের গল্পের। এই ধরনের চারটি বই ছাপা হয়েছিল লন্ডনের ম্যাকমিলান কোম্পানি থেকে।

প্রথম বই 'ইন্ডিয়ান নেচার মীথস্'। শোভনা লিখলেন ছোটদের মনের মতো ইংরেজিতে। 'ছোটদের' মানে এই নয় যে, রসবর্জিত নীতিসারসংগ্রহ—আসলে ইংরেজি ভাষাটা লিখলেন সহজবোধ্য ও সবার উপভোগ্য করে। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, বেদ, উপনিষদ এবং লোককথা থেকে পঞ্চাশটি গল্প সংগ্রহ করে শোভনা লিখেছেন 'নেচার মীথস্'—অধিকাংশই সৃষ্টিতত্ত্বের দিকে তাকিয়ে লেখা। যেমন, 'দি অরিজিন অব তুলসী প্ল্যান্ট', 'দি অরিজিন অব ডেথ', 'দি অরিজিন অব ভলকানো', 'দি অরিজিন অব টোবাকো প্ল্যান্ট' ইত্যাদি।

'ইন্ডিয়ান ফেবলস্ অ্যান্ড ফোকলোর'ও একই জাতের গ্রন্থ। শোভনা এ বইয়ের গল্প সংগ্রহ করেছেন মহাকাব্য, পুরাণ, কথাসরিৎসাগর, পঞ্চতন্ত্র ও ভক্তমাল থেকে। সবসুদ্ধ গল্প আছে ঊনত্রিশটা। তার মধ্যে 'মীরাজ ব্রাইড গ্রুম' (ভক্তমাল), 'এ র‍্যাট স্বয়ম্বর' (পঞ্চতন্ত্র), 'একলব্য অ্যান্ড দ্রোণ' (মহাভারত), 'কাউ অব প্লেন্টি' (রামায়ণ) নিশ্চয় বিদেশি পাঠকদের বিস্মিত

করেছিল। প্রায় প্রতিটা গল্পেই শোভনা বিস্ময়ের সঙ্গে আনন্দের খোরাক জুগিয়ে দিয়েছেন।

আর 'দি ওরিয়েন্ট পার্লস' রূপকথা সংকলন। শোভনা জয়পুরি উপকথা সংগ্রহ দিয়ে যে 'সাহিত্যজীবন' শুরু করেছিলেন এখানেও তারই জের চলেছে। এবং এই চারটি বইয়ের ইতিহাস পুরাণ লোককথা সংগ্রহে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। শুধু সংস্কৃত সাহিত্য থেকে পৌরাণিক গল্প সংগ্রহ আর বাংলাদেশের লোকের মুখে মুখে ছড়ানো রূপকথা সংগ্রহ অন্য জিনিস। শোভনা এসব গল্প সংগ্রহ করেন এক অন্ধ ভৃত্যের কাছ থেকে। তিনি এই রূপকথা সংগ্রহ যদি বাংলাতেও লিখতেন, তাও অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকত। সেকালে ইংরেজিতে বই লেখার চল মেয়েদের মধ্যে ছিল। কনভেন্টে পড়া, বিদেশিনী গভর্নেসের কাছে মানুষ হওয়া মেয়েরা ইউরোপীয় ভাবাপন্ন হবেন, এ আর বেশি কথা কি? তারকনাথ পালিতের মেয়ে লিলিয়ান, লর্ড সিনহার মেয়ে রমলা কিংবা কুচবিহারের তিন রাজকুমারী সুকৃতি, প্রতিভা ও সুধীরার কথাই ধরা যাক না, তাঁদের চালচলনে সেদিন বিদেশিয়ানাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এঁরা লেখিকা হলে মনের কথা ইংরেজিতেই প্রকাশ করতেন তাতে সন্দেহ নেই। হেমেন্দ্রনাথের আট মেয়ে এবং ইন্দিরাও অভ্যস্ত ছিলেন বিদেশি চালচলনে। সুতরাং শোভনার পক্ষে ইংরেজিতে বই লেখা খুবই স্বাভাবিক। যেমন ইংরেজিতে কবিতা লিখেছিলেন তরু দত্ত কিংবা সরোজিনী নাইডু। সরোজিনী শোভনার সমবয়সি কিন্তু শোভনার চেয়ে অনেক বেশি পরিচিত, বিশেষ করে রাজনীতিক্ষেত্রে সরোজিনীর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। তাঁর কবিতার বই তিনটি—'দি গোল্ডেন থ্রেসোল্ড', 'দি বার্ড অব টাইম' ও 'দি ব্রোকেন উইঙ' খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। ১৯০৫ থেকে ১৯২০ এই পনেরো বছরে 'গোল্ডেন থ্রেসোল্ডে'র পুনর্মুদ্রণ হয়েছিল সাত-আটবার। শোভনা এভাবে খ্যাতির চূড়া স্পর্শ করেননি, হয়তো সে ক্ষমতা তাঁর ছিল না। কিন্তু যেটুকু তিনি দিয়েছেন তারই বা মূল্য কম কি? একেবারে প্রথম থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত যেসব ভারতীয় রূপকথা-সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে 'দি ওরিয়েন্ট পার্লস'-এর স্থান বেশ ওপরে। বাঙালি মেয়েদের মধ্যে শোভনাই সবার পূর্ববর্তিনী। এর আট বছর পরে ১৯২৩ সালে মহারানি সুনীতি দেবীর 'ইন্ডিয়ান ফেয়ারি টেলস্' লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়।

শোভনার পূর্ববর্তী রূপকথা সংগ্রাহকের সংখ্যা যে খুব বেশি তা নয়, তাঁদের নাম—লালবিহারী দে 'ফোক টেলস্ অব বেঙ্গল' (১৮৮৩), রামসত্য মুখোপাধ্যায় 'ইন্ডিয়ান ফোকলোর' (১৯০৪), কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'পপুলার টেলস্ অব বেঙ্গল' (১৯০৫), দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার 'ঠাকুরমার ঝুলি' (১৯০৭), উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী 'টুনটুনির বই' (১৯১০), ম্যাক কুলক 'বেঙ্গলি হাউসহোল্ড টেলস্' (১৯১২), ডি. এন. নিয়োগী 'টেলস্ অ্যান্ড সেকুলার' (১৯১২)। এর পরেই প্রকাশিত হয় শোভনার 'দি ওরিয়েন্ট পার্লস (১৯১৫)।

শোভনার বইয়ে রূপকথা আছে আটাশটি। সব গল্পই শুরু হয়েছে 'Once upon a time' বলে রূপকথার আমেজে। যেসব গল্প আছে, তার মধ্যে আমাদের পরিচিত ও অপরিচিত উভয় ধরনের রূপকথাই পাওয়া যাবে। 'দি ওয়াক্স প্রিন্স', 'দি গোল্ডেন প্যারট', 'দি হারমিট ক্যাট', 'এ নোজ ফর নোজ', 'আঙ্কল টাইগার', 'দি ব্রাইড অব দি সোর্ড' সকলের খুব ভাল লাগবে। তবে এসব রূপকথা যে বিদেশিদের একেবারে অপরিচিত তা হয়তো নয়, কারণ বিভিন্ন দেশের রূপকথার মধ্যে গল্পের অদৃশ্য যোগ চিরকালই ছিল।

আপাতভাবে স্বল্পপরিচিত 'টেলস্ অব দি গডস্ অব ইন্ডিয়া'তেও নতুনত্ব আছে। এখানে দেবতাদের গল্প নির্বাচন করা হয়েছে ভিন্ন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। ইদানীংকালে বাংলায় 'প্রেমকথা' নাম দিয়ে কয়েকটি পৌরাণিক প্রেমকাহিনী গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে, যেমন—'ভারত প্রেমকথা', 'রামায়ণী প্রেমকথা', 'শাশ্বত প্রেমকথা', 'পুরাণ প্রেমকথা' ইত্যাদি। এই লেখকদের অনেকেই হয়তো জানেন না, তাঁদের অনেক আগে রামায়ণ-মহাভারত- বেদ-পুরাণ থেকে যুগল প্রেমের উৎস সন্ধান করেছিলেন শোভনা। ভারতের দেবদেবী সংক্রান্ত বইটির জন্যে শোভনা

সংগ্রহ করেছেন তিরিশটি গল্প। তিনি কোথা থেকে কোন গল্প নিয়েছেন তার উৎস নির্দেশ করতেও ভোলেননি। নাম নির্বাচনও সুন্দর। ঋগ্বেদ থেকে তিনি নিয়েছেন পাঁচটি গল্প—'দ্যু ও পৃথিবী', 'যম ও যমী', 'ঋভুত্রয় ও উষা', 'অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও সূর্যা' এবং 'বিবস্বান ও সরণ্যু'। মহাভারত থেকে সংগ্রহ করেছেন আরও চোদ্দোটি গল্প। সেগুলি আমাদের খুবই পরিচিত, যেমন, 'পুরুরবা ও উর্বশী', 'সংবরণ ও তপতী', 'রুরু ও প্রমদ্বরা', 'সোম ও তারা', 'বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতী', 'ইন্দ্র ও শচী', 'সাবিত্রী ও সত্যবান', 'বিষ্ণু ও লক্ষ্মী', 'শিব ও সতী', 'মদন ও রতি', 'অর্জুন ও উলূপী', 'ভীম ও তাঁর রাক্ষসী বধূ', 'বলরাম ও রেবতী', 'দময়ন্তী ও তাঁর দেব পাণিপ্রার্থী'। রামায়ণ থেকে নেওয়া হয়েছে 'রাম ও সীতার গল্প', এবং 'অগ্নি ও স্বাহার গল্প'। শতপথ ব্রাহ্মণ থেকে নেওয়া হয়েছে 'চ্যবন ও সুকন্যা' এবং 'মিত্র, বরুণ ও অসির আখ্যান'। কালিদাসের কাব্য থেকে শোভনা নিয়েছেন 'কুমারসম্ভব', 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' এবং 'মেঘদূতের গল্প'। 'যম ও বিজয়ার কথা' নেওয়া হয়েছে ভবিষ্যপুরাণ থেকে এবং 'বেহুলা ও লখীন্দরের কাহিনী' মনসামঙ্গল থেকে তিনি সংগ্রহ করেন। কোন কোন গল্প দু-তিনটে বইয়ে আছে বলে তিনি তাদেরও উল্লেখ করেছেন, যেমন 'বিষ্ণু ও লক্ষ্মী' আছে মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণে, আবার 'শিব ও সতী' আছে মহাভারত ও ভাগবতপুরাণে। গল্প নির্বাচনে এবং তার উৎস নির্দেশে শোভনার এই সাবধানতা বিস্ময়কর। পরবর্তীকালে এই বইটি যতই দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে, এই জাতীয় গল্পের চাহিদাও ততই বেড়েছে।

শুধু ইংরেজি বই লেখা নিয়েই ভুলে থাকেননি শোভনা। শেষজীবনে আবার বাংলা রচনায় হাত দিয়েছিলেন ইউরোপ ভ্রমণ সেরে ফিরে আসার পরে। তাঁর কয়েকটি ভ্রমণবৃত্তান্ত 'ইউরোপে মহাসমরের পরে', 'লন্ডনে', 'রণক্ষেত্রে বঙ্গমহিলা' ও 'মহাযুদ্ধের পর প্যারী নগরীতে' নামে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাছাড়া তিনি মেতে উঠেছিলেন স্কুল নিয়ে। ঠাকুরবাড়ির ছেলেমেয়েদের স্কুল খোলার নেশা এক আশ্চর্য নেশা। সেই নেশা ছিল শোভনারও। তাঁর নিঃসন্তান জীবনের অনেকখানি কেটে যেত 'হাওড়া গার্লস স্কুল'-এর তত্ত্বাবধানে। স্কুলে তিনি পড়াতেন ইংরেজি। এখনও ওই স্কুলে তাঁর নামাঙ্কিত একটি রৌপ্যপদক স্কুলের সেরা ছাত্রীকে প্রতিবছর দেওয়া হয়। এছাড়াও তিনি খুলেছিলেন একটা ছোট্ট গানের স্কুল। বেশ চলছিল। আকস্মিকভাবে সব শেষ হয়ে গেল। সন্ন্যাস রোগে মৃত্যু হল শোভনার। শোকার্ত পত্নীপ্রেমিক নগেন্দ্রনাথের লেখা একটি শোকগাথা 'প্রেমাঞ্জলি' নামে ছাপা হল, রবীন্দ্রনাথ তার ভূমিকায় লিখেছিলেন একটি ছোট্ট কবিতা 'শোভনা'। শোভনাকে দাহ করা হয়েছিল হাওড়ার শিবপুর শ্মশানে। কবির এই কবিতাটি সেখানে একটি প্রস্তর ফলকে খোদাই করে গেঁথে দেওয়া হয়। আজও সেটি রয়েছে। 'স্মৃতিফলকে' এর সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছে। এখানে রইল মূল কবিতাটি:

'অস্তরবির কিরণে তব জীবন শতদল
মুদিল তার আঁখি,
মরমে যাহা রাখা ছিল স্নিগ্ধ পরিমল
মরণে দিল ঢাকি।
লয়ে গেল সে বিদায়কালে মোদের আঁখিজল
মাধুরী সুধা সাথে,
নূতনলোকে শোভনারূপ জাগিবে উজ্জ্বল
বিমল নবপ্রাতে।'

শোভনাসুন্দরী ও সুষমাসুন্দরী—দুটি কর্মব্যস্ত বোনের মাঝখানে একটু ক্ষীণ যতির মতো

ছিলেন সুনৃতা। হেমেন্দ্রনাথের মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে অন্তর্মুখী। তাঁর জীবনদীপও নিভেছিল অভিজ্ঞার মতো নিতান্ত অসময়ে। তবে অভিজ্ঞার মতো অসাধারণী নন তিনি। মৃত্যুর পরেও অভিজ্ঞা বেঁচে ছিলেন সবার স্মৃতিতে, সুনৃতাকে তাঁর শিল্পী আত্মীয়রাও মনে রাখেনি। হয়তো দীর্ঘদিন বেঁচে থাকলে তিনিও কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রতিভার পরিচয় দিতে পারতেন। এখন তাঁর সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা যায় না। তাঁর স্বামী নন্দলাল ঘোষাল ছিলেন বারুইপুরের প্রসিদ্ধ ঘোষাল পরিবারের সন্তান। পরে অবশ্য বিপর্যয়ে তাঁদের চলে যেতে হয় শ্যামবাজারে। সুনৃতার সঙ্গে বাপের বাড়ির যোগ ছিন্ন হয় সবিতা ও সুব্রতের। তাঁর যমজ সন্তানের মৃত্যু হয় জন্মের অব্যবহিত পরেই, তবে সুনৃতা এখনও বেঁচে আছেন 'পুণ্য' পত্রিকার পুরনো কাগজে। আছেন নন্দলালও। তাঁরা দুজনেই সাহিত্যানুরাগী ও 'পুণ্য'র লেখক ছিলেন। তাঁদের প্রাক্-বিবাহপর্বে পরিচয় ছিল কিনা জানা যায়নি। অবশ্য সুনৃতার মন ছিল প্রজ্ঞার মতো গৃহিণীপনায়। তাঁর ইচ্ছে ছিল 'পুণ্য'র মাধ্যমে পাঠিকাদের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবেন নানারকম মুখরোচক আচার। আমের আচার, কুলের আচার, তেঁতুলের আচার প্রভৃতির প্রস্তুত-প্রণালী প্রকাশ করতেন সুনৃতা। সাহিত্যজগতে তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবেশ একটিমাত্র রচনা দিয়ে, 'ব্রহ্মে শূলীনাথ'। বর্মায় শূলীনাথ শিব খুব বেশি পরিচিত নন। সুনৃতা তার খবর পেলেন কী করে? বৌদ্ধ-প্যাগোডার বদলে পুরনো মন্দিরের প্রতি আগ্রহ দেখে মনে হয় তিনি ঝুঁকেছিলেন মন্দির-শিল্প ও তার বৈশিষ্ট্যের দিকে। কিন্তু একটির বেশি প্রবন্ধ লেখা হয়ে ওঠেনি।

সুনৃতার ছোট বোন সুষমার মন প্রথম থেকেই বিদ্রোহী। তাঁর দিদিরা সবাই লোরেটোতে পড়লেও সুষমা বাড়িতেই লেখাপড়া শিখতেন, সেইসঙ্গে স্বপ্ন দেখতেন সব বন্ধন ছিঁড়ে এগিয়ে যাবার। আসলে জোড়াসাঁকোর নিজেদের মহলে প্রায় নির্বাসিতের মতো দিন কাটালেও তিনি স্বপ্ন দেখতেন ভ্রমণের। স্বদেশে-বিদেশে যেখানে হোক, 'from my childhood I had always been keen on travelling....' অগ্রগতির পথে প্রথম বাধা বিবাহ। সুতরাং সুষমা ঠিক করলেন, বিয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবেন। কিন্তু ঠাকুরবাড়ির ট্র্যাডিশন আর মায়ের দৃঢ়তা ষোড়শী সুষমাকে নতুন পথে এগিয়ে যেতে বাধা দিল। শুধু তাই নয়, তাঁর বিয়ে হয়ে গেল সুনৃতার আগে। ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা তখন বিয়ের ব্যাপারে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিতে পারেননি। সুষমার বান্ধবী প্রথম মহিলা ঈশান স্কলার নিনিয়ান পালিত প্রথম বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা এনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন। তাঁর স্বামী ছিলেন ব্যারিস্টার শিশির মল্লিক। বিবাহ বিচ্ছেদের পরে তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন ভাগলপুরের জমিদার দীপনারায়ণ সিংকে। কেশব সেনের নাতনিরাও কম যান না। কুচবিহারের রাজকন্যা প্রতিভা ও সুধীরা বিয়ে করেছিলেন জন মান্ডার ও লেনি ম্যান্ডারকে। সে নিয়েও কি কম হইচই হয়েছে? কিংবা হরিপ্রভা তাকেদা? বুলবুল সোপ ফ্যাক্টরির ওয়েমন তাকেদার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয় ১৯০৭ সালে। ১৯১২ সালে স্বামীর সঙ্গে চলে গেলেন জাপানে। আত্মীয়দের আপত্তি ও অনিচ্ছা অগ্রাহ্য করে। সেদিন সবাই চমকে উঠেছিল। কত আগ্রহ নিয়ে যে বাঙালিরা হরিপ্রভার লেখা 'বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা' পড়েছে, তার তুলনা হয় না। তুলনায় ঠাকুরবাড়ির অনেক মেয়েই বেশ প্রাচীনপন্থী, এমনকী ভিন্ন প্রদেশের যুবকের সঙ্গে বিয়ে হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাতে পূর্বরাগের ছিটেফোঁটা ছিল না।

সুষমার বিয়ে হয়েছিল যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। বুধবার ১৯০০ সালের ৭ই মার্চ। এই সুষমা তখন সবে কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজ থেকে পিয়ানোর পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছেন। এই পরীক্ষা নেওয়া হত কলকাতায়, ইউরোপীয় ছাত্রীরাও পিয়ানোয় সুষমার কাছে হার মেনেছিলেন। কিন্তু গানবাজনা বা সাহিত্য বা রান্নাঘর, দিদিদের তৈরি করা গণ্ডির কোনওটার মধ্যেই সুষমা নিজেকে বেঁধে রাখেননি। তিনি এগিয়ে যেতে চেয়েছেন নারী প্রগতির নতুন পথে।

পায়ে বেড়ি পড়ল। যোগেন্দ্রনাথ ব্যারিস্টার কিন্তু তাঁর মন ছিল অন্যদিকে। তিনি ভালবাসতেন অঙ্ক কষতে। তাঁর 'মডার্ন এরিথমেটিক' খুব জনপ্রিয় স্কুলপাঠ্য অঙ্কের বই। স্ত্রীর প্রগতির পথে কোনও বাধা দেবার প্রশ্নই ওঠে না। তবু সুষমা যেন শান্তি পান না। 'My restless nature hardly allowed me to be contented with a quiet and peaceful homelife.' এগিয়ে যাবার মতো একটা পথ! একটা পথের খবর কি কেউ দিতে পারবে না? চিন্তায় ঘুম আসে না। মনের মধ্যে গুমরে ওঠে বোবা কান্না!

অবশেষে পথের সন্ধান পেলেন সুষমা। কোথা থেকে হাতের কাছে এসে পড়ল 'আঙ্কল টমস্ কেবিন' বইটা। পাতার পর পাতা এগিয়ে যেতে চোখের পাতা ভিজে ওঠে। এই বইয়ের লেখক কে? হ্যারিয়েট বিচার স্টো? তিনি মহিলা। তাঁর কি ঘর-সংসার নেই? তবু কী করে তিনি এমন বই লেখেন? সুষমা মাদাম স্টোর জীবনচরিত পড়তে বসেন আগ্রহ নিয়ে। অসীম আগ্রহ! অবশেষে একটা তৃপ্তির আমেজ নেমে আসে। হাঁ, এই তো। এই তো পথের সন্ধান পাওয়া গেছে। হ্যারিয়েট যদি পেরে থাকেন, সুষমাই বা পারবেন না কেন?

সুষমা মন দিলেন লেখার দিকে। জাগাতে হবে মেয়েদের মন। প্রথমেই তিনি স্থির করলেন 'মেয়েরা জাগো' বা 'মেয়েদের জাগাতে হবে' এসব ধুয়ো না ধরে তাদের সামনে কতকগুলো উদাহরণ তুলে ধরবেন। যাঁরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছেন তাঁদের যদি চোখের সামনে রাখা যায়, তবে সবার পক্ষেই পথ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। তাঁর মনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব যিনি ঘুচিয়েছিলেন সেই মাদাম স্টোর কথাই সবার আগে লিখলেন সুষমা। সমসাময়িক বিচারে সেটা বেশ নতুনও বটে। এর আগে বাঙালিরা কেউ খ্যাতনাম্নী মহিলাদের জীবনী লেখায় তেমন আগ্রহ দেখাননি। আর সেরকম মেয়েই বা তখন কোথায়? আজ আমরা যাঁদের মহীয়সী বা প্রগতিশীলা বলে থাকি, সমসাময়িককালে তো সেভাবে বিচার করা সম্ভব ছিল না। তবে ভক্তিমতী মহিলাদের নিয়ে কিছু লেখা হয়েছিল। তাই সুষমা শুরু করলেন বিদেশিনীদের নিয়ে। ইচ্ছে ছিল বাংলায় বিদেশিনীদের কথা বলে ভারতীয় মহিলাদের নিয়ে লিখবেন ইংরেজিতে। একে একে 'পুণ্যে' ছাপা হল 'হ্যারিয়েট বিচার স্টো', 'হ্যারিয়েট মার্টিনো', 'মাদাম দ্য স্টেল', 'সুইডিস গায়িকা লিন্ডের জীবনী'। এসব জীবনী সংগ্রহ করে সুষমা দেখাতে চেয়েছিলেন সাহিত্যিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংগীতিক ক্ষেত্রে নারীর চরম সাফল্য। নিজের দেশের মেয়েদের চোখ ফোটানোর জন্যে তো বটেই, সেইসঙ্গে সুষমা কলম ধরেছিলেন তাদের জন্যেও 'যাঁহারা বলেন যে স্ত্রীলোকদিগের বুদ্ধি পরিচালনা দ্বারা কোনও কর্ম করিবার শক্তি নাই। মহিলাগণ কেবল সন্তান পালন করিতেই জানেন। স্বীয় বুদ্ধি বিবেচনা দ্বারা কিছুই করিতে পারেন না।' চোখ থাকতেও যারা দেখতে পায় না তাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায়ই বা কী!

সুষমার লেখা এসব বাংলা প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল 'পুণ্য' পত্রিকায়। বাংলা ভ্রমণকাহিনী ছাপা হয় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য়। তাঁর কাশ্মীর ভ্রমণকাহিনীতে পথের বর্ণনা ও সৌন্দর্যের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে কাশ্মীরবাসীর জীবনযাত্রা ও দুঃখদুর্দশার কথা। প্রায় একই সময়ে তিনি ইংরেজিতে লেখা শুরু করেন 'আইডিয়ালস্ অব হিন্দু উওম্যানহুড'। ভারতীয় নারীর আদর্শ রূপে তিনি বেছে নিয়েছিলেন সতী, সীতা, শৈব্যা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ও শকুন্তলাকে। ভারতীয় নারী নির্বাচনে তিনি সনাতন দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচয় দিয়েছেন। ত্যাগ-তিতিক্ষা ও দাম্পত্য প্রেমে যাঁরা উজ্জ্বল সেইসব নারীদের আত্মমর্যাদা ও সম্ভ্রমবোধ তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। দ্রৌপদীর কথা লেখেননি।

সুষমার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া গেল আরও কিছুদিন পরে। ১৯২৭ সালে সাতটি সন্তানের জননী ও গৃহস্থবধূ হয়েও যখন তিনি নারীপ্রগতি ও শিক্ষাধারার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে যাত্রা করলেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। এর প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে জ্ঞানদানন্দিনীও একা গিয়েছিলেন ইংল্যান্ডে। সে যাত্রাও ছিল দুঃসাহসিক, তবে তার সঙ্গে সুষমার যাত্রার তুলনা হয় না। সুষমা গিয়েছেন বিজয়িনীর মতো এবং গিয়েছেন বক্তৃতা দিতে। তাঁর আগে মোহিনীমোহন

চট্টোপাধ্যায়, প্রতাপ মজুমদার, স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় রেখে এসেছেন। শুধু পুরুষেরা নয়, ভারতীয় নারী রমাবাঈও গিয়েছেন আমেরিকায়। এঁদের পরে সুষমা। তবু 'Hindu Poet and Philosopher' রবীন্দ্রনাথের ভাইঝিকে নিয়ে সাড়া পড়ে গেল যুক্তরাষ্ট্রে। হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথকে যুক্তরাষ্ট্রের খবরের কাগজ কবি ও দার্শনিক রূপেই ব্যাখ্যা করেছে এবং সেই সঙ্গে সবসময় যোগ করা হত 'হিন্দু' শব্দটি। সুতরাং 'Niece of Tagore' সবার মনেই প্রচণ্ড আগ্রহ ও উৎসাহ জাগালেন।

কেন সুষমা বিদেশ সফরে গিয়েছিলেন? সুষমার দিদি মনীষা ও শোভনা হয়তো বেড়াতেই গিয়েছিলেন, কিন্তু সুষমার কথা স্বতন্ত্র। ছোটবেলার সেই না-মেটা সাধ সার্থক করতে হবে না? ঘরে-বাইরে সমানভাবে কাজ করবার জন্যে তৈরি হলেন সুষমা। ছেলেমেয়েরা সবাই বড় হতে, বাইরের জগতের দিকে একটু তাকাবার সুযোগ পেলেন এতদিনে। প্রথমে একটা ছোটখাটো স্কুল খুললেন ১৯২২ সালে। একেবারেই মেয়েদের জন্যে। নাম 'বালিকা শিক্ষা সংঘ'। স্কুল খোলার পর সুষমা বুঝতে পারলেন ভারতে অশিক্ষিতার সংখ্যা কত বেশি। এতদিন তিনি চিনতেন শিক্ষিত সমাজকে। এবার দেখলেন দেশের শতকরা নিরানব্বই জন মেয়েই নিরক্ষর। অথচ তখন বিদুষীর সংখ্যা বাংলাদেশে মোটেই কম নয়। চন্দ্রমুখী-কাদম্বিনীর যুগ অনেকদিন কেটে গিয়েছে। অবলা দাসের মাদ্রাজে মেডিকেল পড়তে যাওয়াও পুরনো খবর। বিধুমুখী বসু ও ভার্জিনিয়া মিত্রও কলকাতায় মেডিকেল কলেজে পড়েছেন। ভার্জিনিয়া সমস্ত ছাত্রছাত্রীর মধ্যে প্রথম স্থান পেলেন (১৮৮৮)। তটিনী গুপ্তও (দাস) সম্মিলিত বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার আই এ পরীক্ষায় প্রথম হয়েছেন, লিলিয়ান হয়েছেন ঈশান স্কলার, হিন্দু ঘরের বিধবা সরলাবালা মিত্র শিক্ষণশিক্ষার জন্যে বৃত্তি নিয়ে গিয়েছেন ইংল্যান্ডে। রাজনীতি-ক্ষেত্রে সরলা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, এগিয়ে আসছেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত কিংবা বীণা দাসের মতো সাহসী মেয়েরা। পুলিশের অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করেও দেশের জন্যে হাসিমুখে কারাবরণ করেছেন ননীবালা ও দুকড়িবালা। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে তো চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ারই কথা। সুষমার দিদিরাও শিক্ষিতা। সুতরাং স্কুল খোলার আগে সুষমা বুঝতেই পারেননি নিরক্ষর মেয়েদের সংখ্যা কত বেশি। শুধু স্কুল নয়, এসময় সুষমা জড়িয়ে পড়েন 'উইমেন এডুকেশনাল সোসাইটি অব ইন্ডিয়া'র সঙ্গে। এই সোসাইটির প্রেসিডেন্ট হয়ে তিনি নিরক্ষর মেয়েদের জন্য আরও বেশি ভাবনা-চিন্তা করার সুযোগ পেলেন।

প্রথমেই সুষমার চোখ পড়ল যুক্তরাষ্ট্রের দিকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর স্বাভাবিকভাবেই নিঃস্ব ক্ষতবিক্ষত ইউরোপের চেয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্ব অনেক বেশি। তার ওপর সেখানে গিয়ে স্বামীজী যে উন্নতমনা ও উদারহৃদয় মানুষের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, সেকথাও সবার জানা, বিশেষ করে সুষমার কাকা রবীন্দ্রনাথ সেখানে বক্তৃতা দিয়ে এসেছেন ১৯১৬ সালে। সুতরাং একবার সে দেশের উন্নতি ও নারীপ্রগতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে আসার জন্যে সুষমা প্রস্তুত হলেন। সেখানকার মেয়েদের বহুমুখী জীবনপ্রবাহ এদেশের মেয়েদের যদি বিভিন্ন দিক থেকে প্রভাবিত করতে পারে, তা হলে তো ভালই হয়। আমেরিকায় সুষমা তাঁর পৈতৃক উপাধিটি ব্যবহার করেছিলেন শুধু সহজে পরিচিত হবার জন্যে।

সুষমার বিদেশ সফর সাড়া জাগিয়েছিল আমেরিকানদের মনে। তাঁরা যখন ভারতীয় মেয়েদের সম্বন্ধে একটা ভাসা ভাসা ধারণা গড়ে নিয়েছেন, তখন কোথা থেকে এল এই গ্রহান্তরের মানবী? হিন্দু কবি ও দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ একবার তাঁদের মনকে নাড়া দিয়ে গিয়েছেন। এবার আসছে তাঁরই ভাইঝি; যত না বক্তৃতা শোনার জন্যে, এই ভারতীয় নারীকে একবার চোখে দেখবার জন্যে সবাই মনে মনে উৎসুক হয়ে উঠলেন।

সুষমা যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছলেন ১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। 'I felt I had gone on a pilgrimage to the New world.' আমেরিকার নরনারী অবাক হয়ে দেখল শুচিস্মিত-লাবণ্যে

পূর্ণতনু এক গরীয়সী তেজস্বিনীকে। যেন দীপ্ত অগ্নিশিখা। বক্তার দিকে শ্রোতারা চেয়ে থাকতেন মুগ্ধ হয়ে। ঘনপক্ষ্ম কৃষ্ণভ্রমর বিশাল দুটি চোখ তুলে তিনি সহজ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াতেন মঞ্চের ওপর। বিদেশিদের চোখে পড়ত 'a sari of purple silk with sleeves of green embroidered in gold', আপনিই বুঝি উত্তেজনায় ঝিমঝিম করে উঠত নীল রক্ত। বিস্ময় ঝরে পড়ত কলমের মুখে:

'Miss Tagore is a charming bit of the Orient in an occidental setting. Short of stature, quiet and demure, with lazy dark eyes that can flash fire when the occasion arises, it takes the native garb of India to really do justice to her Hindu beauty.'

এরপর যখন নিখুঁত উচ্চারণে মিষ্টি অথচ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সুষমা বক্তৃতা শুরু করতেন, তখন উল্লাসের হিল্লোল বয়ে যেত শ্রোতাদের মধ্যে। এত সুন্দর, স্পষ্ট উচ্চারণ, এত নিপুণ, নিখুঁত? উচ্চারণ বিভ্রাটের জন্যে অধিকাংশ ভারতীয়ই বিদেশিদের মনে ছাপ ফেলতে পারে না। সুষমা তাঁর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের ছোঁয়া মেশালেন কণ্ঠে। বিদেশি সাংবাদিকরা লিখলেন:

'She speaks softly, with never a trace of bitterness of the lot of her people, and her expression never changes, except when her deep dark eyes seem to smile.'

আসলে সুষমার চোখ দুটি আকর্ষণ করেছিল বিদেশিদের। অনেকেই লিখেছেন:

'Her eyes are very large, and very black.'

'ডেলি টেক্সানে'র সাংবাদিক সুষমার বক্তৃতার প্রশংসা করে শেষে তো বলেই ফেললেন:

'Not only is Miss Tagore ably qualified to discuss this subject (The Ideals of India) through extensive study and experience, but she is also capable of presenting it in clear and forceful English, which none of the people of India can do.'

মার্কিন মেয়েদের নতুন লেগেছিল সুষমাকে। তাঁরা যখন শুনলেন সুষমা লম্বা চুল কাটতে রাজি নন বরং দীর্ঘ কেশকেই নারীর সৌন্দর্য মনে করেন, তখন যেন চমকে উঠলেন। বিস্ময় চরমে উঠল সুষমা রুজ-লিপস্টিক ব্যবহার করেন না শুনে; এমনকী তিনি ধূমপান করতেও রাজি নন। কেননা, এ সবই সুষমার কাছে 'most unladylike'। প্রশ্নের পর প্রশ্ন ছুটে এল। সব উত্তরই তিনি দিলেন হাসিমুখে। হাঁ, তিনি মনে করেন বইকী, শিক্ষার প্রয়োজন আছে। এখানকার শিক্ষাপদ্ধতি দেখতেই তো এসেছেন। তবে তাঁর মতে 'ভারতীয় মেয়েদের বিবাহিত জীবনের জন্যেই শিক্ষা দেওয়া উচিত; কারণ ভাল স্ত্রী ও ভাল মা হবার শিক্ষাই তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা।' অর্থাৎ প্রথম জীবনে বিবাহ সম্বন্ধে তাঁর মনে যত বীতরাগই থাকুক না কেন, পরবর্তী জীবনে তিনি সনাতন ভারতীয় রীতিকেই সত্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। ইংল্যান্ডে এক সময় মেয়েদের ভাল গৃহিণী হবার শিক্ষাকেই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা মনে করা হত। বিশ্বের নানাবিধ সমস্যার সমাধান সম্পর্কে তিনি তাঁর নিজস্ব অভিমত জানিয়েছিলেন আমেরিকার মেয়েদের:

'When women are united as wives, mothers and daughters they have more influence on men than has man on woman. If we would only remember that we are all children of one God, our women united would establish world peace.'

তিনি আরও বলেন:

'The supreme, traditional virtues of the Hindu woman are fidelity, sincerity and self sacrificing love. A wife subordinates her wishes to those of her husband.'

সুষমার মতে:

'Real satisfaction lies in control and self restraint. Let us enjoy the material side of life, but not lose ourselves in its glamour.'

এসব বক্তৃতার কথা প্রকাশিত হয়েছিল আমেরিকার বিখ্যাত কাগজের পাতায় পাতায়। কিন্তু

তাঁর বক্তৃতাগুলির প্রতিলিপি ভারতের কোথাও পাওয়া যায় না। আর-একটু শোনা যাক সুষমার কথা। পশ্চিমের বিবাহপ্রথার প্রতি তাঁর কোনও শ্রদ্ধা ছিল না। নিউ ইয়র্কের এক সভায়, টকটকে রক্ত-লাল শাড়ি পরে দৃপ্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যাতারার মতো দুটি উজ্জ্বল চোখ তুলে যখন বললেন:

'Your idea of marriage, companionate marriage and love seems very strange to us. Your divorces startle us. We believe in the holiness of marriage, considering it a sacred and divine union of two souls. Our marriages are regarded as permanent; separation or divorce unspeakable; we stay married.'

গুঞ্জন উঠল, সে কী! এতদিন যে আমরা শুনেছি ভারতে মেয়েরা পুরুষের হাতের খেলার পুতুল! আর তাদের সম্মান? সে তো নেই বললেই চলে। একথাই তো আমরা জেনেছি। বিদেশিনীদের কথায় হাসি পায় সুষমার। বলেন, 'আমাদের দেশের মেয়েরা অনেক বেশি প্রভাবশালিনী। তারা সৃষ্টির কাজে ঈশ্বরকে সাহায্য করে। তোমাদের কাছে ভগবান পিতা কিন্তু ভারতে আমরা তাঁকে বলি মা।' আর অত দূরে যাবার দরকার কী, সুষমা প্রশ্ন করেন তাঁদের, 'এই যে আমি এত দূরে এসেছি, বাড়ি থেকে চোদ্দ হাজার মাইল দূরে, স্বামীর ওপর প্রভাব বিস্তার করবার ক্ষমতা না থাকলে পারতাম কি?'

তিনি আরও বললেন, ভারতীয় নারী অবরোধের মধ্যে বাস করলেও অশিক্ষিত নয়। এই অবরোধপ্রথার অবসান হবে এবং তাঁরা অচিরেই মুক্ত বায়ুতে বিচরণ করবেন। নারীর সেই অবস্থার জন্যে তিনি প্রতীক্ষা করছেন। হয়তো পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলেই তা ত্বরান্বিত হবে কিন্তু তিনি একই সঙ্গে বিশ্বাস করতে রাজি নন যে, পাশ্চাত্য শিক্ষাই ভারতীয় নারীর একমাত্র আদর্শ।

আমেরিকায় সুষমা যেসব বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার মধ্যে 'ভারতের নারী', 'নারী শিক্ষা', 'ভারতের আদর্শ', 'ভারতের দর্শন', 'বিশ্বভগিনীত্ববোধ' (Universal Sisterhood), 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর', 'মহাত্মা গান্ধীর দর্শন' ও 'বৈদিক সঙ্গীত' খুব জনপ্রিয় হয়। বারবার নানান জায়গা থেকে তাঁর ডাক আসে। শেষদিকে আরও দুটো বক্তৃতা দিয়েছিলেন 'মাই পিলগ্রিমেজ টু আমেরিকা' ও 'অ্যাডভানটেজ অ্যান্ড ডিজঅ্যাডভানটেজ অব ইন্টার ম্যারেজ বিটুইন ইন্দো-এরিয়ানস অ্যান্ড ইউরো-এরিয়ানস'। প্রায় দু বছর ধরে বিদেশ সফর করে ঘরে ফিরে আসেন সুষমা ১৯২৯ সালের জুলাই মাসে। সঙ্গে নিয়ে আসেন শিক্ষণ ব্যবস্থার রীতিপদ্ধতি, মূল্যবান অভিজ্ঞতা ও দুর্লভ সম্মান। যুক্তরাষ্ট্রের আটত্রিশটি জায়গায় সুষমা বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বক্তৃতা দেবার জন্যে তিনি অনারেরিয়াম হিসেবে পেতেন পঞ্চাশ ডলার। নিজের খরচ চালাবার জন্যেও তাঁকে বক্তৃতা দিতে হত। মার্কিন মহিলারা সুষমার কথা শুনত গভীর আগ্রহে। লেডিজ ক্লাবগুলিতে প্রচুর ভিড় হত। কারণ মার্কিন মহিলারা নাগরিক অধিকার, স্বাচ্ছন্দ্য ও শিক্ষার জন্যে যে সংগ্রাম, তাতে জয়ী হয়েছিলেন। এবার তাঁরা জানতে চাইছিলেন মানসিক মুক্তির পথের কথা, ভোগবাদী পশ্চিমি সভ্যতা যা তাঁদের দিতে পারেনি, স্বামীজীর কাছে তাঁরা যার সন্ধান পেয়েছিলেন।

সুষমার বিদেশ যাত্রার মূল উদ্দেশ্য ছিল অবশ্য শিক্ষা। তাই তাঁকে 'ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব ন্যাশনাল এডুকেশনে'র কনফারেন্সেও ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে দেখা গেছে। তিনি সবসময় বলেছেন, শিক্ষার মতো প্রয়োজনীয় আর কিছুই নয়, 'The general education for the masses is more important than any kind of agitation for political change.' তাই রবীন্দ্রনাথের মতোই তিনিও গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করতে পারেননি। বলেছেন, 'A word such as non-co-operation is meaningless to the great majority in India, education being permanent and political condition transitory.'

ভারতে ফিরে এসে সুষমা তাঁর বিপুল অভিজ্ঞতাকে খুব বেশি কাজে লাগাতে পারেননি, কারণ তাঁর স্বামী ও এক কন্যার আকস্মিক মৃত্যু এবং দুই পুত্রের সন্ন্যাসগ্রহণ তাঁকে কঠিন

সমস্যার মুখোমুখি করে দিল। অবশ্য ভেঙে পড়েননি সুষমা। শিক্ষা এবং স্কুল সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির কথা ছাপা হল সংবাদপত্রে। জনশিক্ষার জন্যে তাঁর চিন্তা এবং পরিকল্পনা সত্যিই অভিনন্দনযোগ্য। তাঁর পরিকল্পনায় প্রধান তিনটি পদক্ষেপ হল:

১) ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে অন্তত ২০ জন সদস্য নিয়ে 'ভারতের গ্রাম নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি' নামে একটা সংঘ প্রতিষ্ঠা করা হবে।

২) প্রত্যেক প্রদেশে একটা করে প্রাদেশিক কমিটি প্রতিষ্ঠা করা হবে।

৩) যেখানে যেখানে ইউনিয়ন বোর্ড আছে এবং সেই বোর্ডের অধীনে যত গ্রাম আছে, তাদের প্রত্যেক গ্রামের এক একজন প্রতিনিধি নিয়ে প্রাদেশিক কমিটি খুলবে গ্রাম্য শিক্ষা কমিটি। এছাড়া গ্রামের ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়তে আসছে কিনা সেটা দেখার ভার থাকবে গ্রাম্য শিক্ষা কমিটির ওপর। স্থানীয় চাঁদায় পাঠশালার জিনিসপত্র কেনা হবে, ক্লাস হবে খোলা হাওয়ায়, গাছের নীচে। আর যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত শিক্ষক না পাওয়া যায়, তা হলে তাঁকে সামান্য পারিশ্রমিক অর্থাৎ নগদে না হোক, চাল ডাল জিনিসপত্র দিতে হবে। প্রত্যেক জমিদারকে দিতে হবে পাঁচ বিঘা জমি, আর প্রত্যেক প্রদেশের জন্যে দরকার হবে পাঁচ থেকে দশ হাজার টাকা।

মনে রাখতে হবে, সুষমা যখনকার কথা ভেবেছেন তখন ভারতের শাসক বিদেশি। সুতরাং সরকারি সাহায্যের কথা তিনি ভাবেননি। তাঁর এই পরিকল্পনার মধ্যে পল্লীচিন্তা এবং শিক্ষাবিস্তারের বাস্তবানুগ ধারণার ছাপ স্পষ্ট। মনে হতে পারে, আমেরিকায় ভারত বিষয়ক বক্তৃতা দেবার পরে সুষমা ফিরে এসে এদেশের নারীসমাজকে পশ্চিমের শিক্ষা, স্বাধীনতা, বিশেষ করে নারীমুক্তির কথা শোনাবেন। কিন্তু তা হয়নি। তৎকালীন নারীশিক্ষা তাঁকে হতাশ করেছিল, 'যখন দেখি নারীশিক্ষা বলতে বালিকাদের শিক্ষা, অক্ষর পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে বটতলার গল্প উপন্যাস পড়াতেই সাঙ্গ হয়, তখন দুঃখের সীমা থাকে না।' আধুনিক নারীমুক্তি আন্দোলনের নেত্রীদের তিনি কীভাবে দেখেছিলেন তাও জানার কোনও উপায় নেই।

সুষমা সম্বন্ধে আর-একটি কথা বলে প্রসঙ্গান্তরে যাব। তাঁর লেখা একটি প্রবন্ধ 'আমেরিকায় বেদান্ত ধর্মের প্রভাব ও সমাদর'। এতে সুষমা স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কিত কিছু খবর দিয়েছেন। যদিও এ খবর আমাদের অজানা নয়, তবু ঠাকুরবাড়ির একটি মেয়ে আমেরিকায় গিয়ে স্বামীজীর সংবাদ সংগ্রহ করে এনেছেন জেনে ভাল লাগে। স্বামী বিবেকানন্দের কথা প্রত্যক্ষভাবে তাঁর বক্তৃতার বিষয় না হলেও, ভারতচিন্তায় সুষমা স্বামীজির অনুগামী ছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশন এবং সন্ন্যাসীদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রও রামকৃষ্ণ মিশন থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সুষমার সঙ্গে আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী পরমানন্দ, ভগিনী দেবমাতা ও ভগিনী দয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হয়। ভারতবর্ষের কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ স্বামীজীর আমেরিকাবাস ও ভ্রমণ সম্পর্কে নানারকম কুৎসা রটাচ্ছিলেন। দু-একটি সংবাদপত্রও এ ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ইচ্ছে করেই এসব কুৎসাকে প্রশ্রয় দিতে থাকলেও খবরের কাগজের এসব সংবাদ অধিকাংশ ভারতবাসীকে সেদিন মর্মাহত করেছিল। দুঃখ পেয়েছিলেন সুষমা। তাই আমেরিকায় গিয়ে তিনি এই পূতচরিত্র সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে বহু খোঁজ করেন। সুষমার অনুসন্ধান ব্যর্থ হয়নি। আমেরিকার বিভিন্ন মানুষ, বিশেষ করে মহিলারা জানান স্বামীজীর নামে যা কিছু রটানো হয়েছে সবই মিথ্যা, এমনকী তার পিছনে তদানীন্তন সরকারেরও চক্রান্ত রয়েছে। সুষমার এই অনুসন্ধান সার্থক হয়েছিল। পরম তৃপ্তি নিয়ে তিনি দেশে ফিরে এসেছিলেন।

আট বোনের মধ্যে সবার ছোট বোন সুদক্ষিণা। পোশাকি নাম পূর্ণিমা। জন্মের পরই বাবাকে হারিয়ে সুদক্ষিণা বড় হয়েছিলেন দাদা-দিদিদের আদর যত্নে। বাপের বাড়িতে যতদিন ছিলেন

ততদিন তাঁকে চেনাই যায়নি। চাঁদের ষোলোকলার মতো যখন তাঁর রূপ আর অভিমান দু'কূল ছাপিয়ে বন্যার মতো ছড়িয়ে পড়ল, তখন যেন সবার চোখ খুলল। তাই তো! এ যে রাজরাজড়ার ঘরে যাবার উপযুক্ত। সুদক্ষিণা কি শুধু সাধারণ ঘরের শিক্ষিত ছেলের জীবনসঙ্গিনী হবেন, না হতে পারেন? তাঁর জন্যে খুঁজতে হবে মনের মতো বর। অচিরেই পাওয়া গেল। বুধাওনের অধিবাসী হরইদ জেলার জমিদার পণ্ডিত জ্বালাপ্রসাদ পাণ্ডে। তিনি ছিলেন কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ। জমিদার হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন আই সি এস অফিসার। হিন্দুস্থানি কেতায় পালকি চেপে উত্তরপ্রদেশে স্বামীর ঘর করতে চলে গেলেন সুদক্ষিণা। ঠাকুরবাড়ির একটু স্ফুলিঙ্গ গিয়ে পড়ল অনেক দূরে। তাঁর নাম যখন ছড়িয়ে পড়ল তখন জ্বালাপ্রসাদ পরলোকে।

সুদক্ষিণার কর্মস্থল উত্তরপ্রদেশের হরইদ-বুধাওন-শাহজাহানপুরে, তাই বাংলাদেশে তিনি একরকম অপরিচিতা। আমরা সুনৃতার মতো তাঁকেও পাই 'পুণ্য' পত্রিকার পাতায়। রান্নার 'লক্ষ্ণৌ' প্রণালী লিখতেন তিনি। প্রজ্ঞার মতো হয়তো তাঁরও রান্নার হাতটি ভাল ছিল কিংবা বাপের বাড়ির দেশের লোকের মুখে শ্বশুরবাড়ির দেশের সুখাদ্য তুলে দেবার স্বাভাবিক ইচ্ছেয় তিনি কলম ধরেছিলেন। নয়তো রান্নাঘরের ঘোমটা-ঢাকা বউটির ভূমিকায় তাঁকে মানায় না।

জ্বালাপ্রসাদ সস্নেহে স্ত্রীকে বিষয় সম্পত্তি দেখাশোনার কাজ শিখিয়েছিলেন। তাঁর কাছে সুদক্ষিণা শিখেছিলেন ঘোড়ায় চড়া ও বন্দুক ছোড়া। ইংরেজি বলতেন ইংরেজদের মতো। স্বামীর মৃত্যুর পরে ঘোড়া ছুটিয়ে তিনি গ্রামে-গ্রামান্তরে গিয়ে নিজের জমিদারি দেখে আসতেন। তাঁর নিজস্ব একটি হাতিও ছিল। তার পিঠে চেপেও বেড়াতেন। বিধবা হয়েছিলেন মাত্র সাতাশ বছর বয়সে। কার্বাঙ্কল হয়ে হঠাৎ জ্বালাপ্রসাদের মৃত্যু হয়। সবাই ভেবেছিল স্বদেশ থেকে এতদূরে অল্পবয়স্কা নিঃসন্তান বিধবা—জমিদারি এবার লাটে উঠতে দেরি হবে না। সাহেব-মহলেও আলোড়ন জাগেনি তা নয়। বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী, রূপসী বিধবা, ভরা যৌবন—কিন্তু হতাশ হতে হল সবাইকে। একজন ইংরেজ উচ্চপদস্থ কর্মচারী নাকি পাণিপ্রার্থনা করেছিলেন সুদক্ষিণার। দোষ ছিল না তাতে। কিন্তু সুদক্ষিণা কর্ণপাত করেননি। শোনা কথা। নিশ্চিত কী ঘটেছিল তা জানাবার মতো কেউ আর ইহজগতে নেই। বাসব ঠাকুর লিখেছেন, 'ওই অল্পবয়সী বিধবার কাছে ওখানকার যে সব বিশিষ্ট লোক বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের সকলকেই তিনি ভদ্রভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। সুদক্ষিণা ছিলেন সত্যিকারের দোর্দণ্ডপ্রতাপান্বিত জমিদারের দোর্দণ্ডপ্রতাপান্বিতা পত্নী। তাঁর প্রতাপে ইংরেজ অফিসাররাও তটস্থ হয়ে থাকতেন।'

সুদক্ষিণা ইংরেজ কর্মচারীদের ওপর এত প্রতাপ দেখাতেন কী করে? কেন ভয় পেতেন না কাউকে? শোনা গিয়েছে, জ্বালাপ্রসাদের পিতা সিপাহি বিদ্রোহের সময় কয়েকজন ইংরেজকে আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করেন, তাই এর পুরস্কাররূপে তিনি লাভ করেন একটা বিশেষ অধিকার। তাঁর জমিদারিকে কোনও কারণে নিলামে চড়ানো চলবে না। ব্রিটিশ-আইন তাদের প্রতিজ্ঞা রেখেছিল। ফলে সুদক্ষিণা এবং জ্বালাপ্রসাদের শক্তি অনেক বেড়ে যায়। স্বামীর মৃত্যুর পর জমিদারির ভার হাতে এলেও, সুদক্ষিণা ইংরেজ কর্মচারীদের মনে মনে বেশ অপছন্দ করতেন, প্রয়োজনে তাদের সঙ্গে যোগ রাখতেই হত কিন্তু একটু বাড়াবাড়ি বা বেচাল দেখলে, তৎক্ষণাৎ ওপরে নালিশ জানাতেন। তাই ইংরেজ রাজকর্মচারীরা পারতপক্ষে তাঁকে চটাতেন না।

শোনা গিয়েছে, সুদক্ষিণা তাঁর জমিদারিতে ছিলেন 'মুকুটহীন রানি'। ব্রিটিশ শাসকেরা তাঁকে দিয়েছিলেন C. I. E. খেতাব। দিতে চেয়েছেন 'মহারানি' খেতাব। একবার নয়, তিন তিনবার। প্রতিবারই প্রত্যাখ্যান করেন সুদক্ষিণা। কী হবে ওদের দেওয়া খেতাব নিয়ে? কী সম্মান বাড়বে? 'মাঝ থেকে আমার জমিদারীতে ওদের উৎপাত বাড়বে।' কিন্তু বাসব ঠাকুরের লেখা পড়ে মনে হয়, সুদক্ষিণা জমিদার হিসেবে নয়, সমাজসেবা করে কাইজার-ই-হিন্দ মেডেল পেয়েছিলেন। নিজের চেষ্টায় তিনি শাহজাহানপুরে একটি চিনির কল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি থাকতেন তাঁর নিজের সন্তানতুল্য প্রজাদের নিয়ে। অন্য গ্রামে বা অন্য জমিদারিতে ডাকাতি হত, অনাচার হত।

সুদক্ষিণার জমিদারি এসবের ঊর্ধ্বে। প্রজারা কপালে হাত ঠেকিয়ে বলত, 'রামরাজত্বে বাস করি।' তিনি বেছে বেছে কয়েকটা ডাকাতকে নিয়ে তৈরি করেছিলেন ভয়ানক রক্ষীবাহিনী। নিজে ঘোড়ায় চেপে বন্দুক হাতে যেতেন গ্রাম দেখতে। লোকে বলত অভ্রান্ত নিশানা। রাইফেল শুটিংয়ের প্রতিযোগিতায় তিনি ইংরেজ পুরুষ প্রতিযোগীদের হারিয়ে দিতেন। এমন রণচণ্ডীর মতো তেজস্বিনী মেয়ে বোধ হয় বাংলাদেশেও খুব বেশি নেই। অবশ্য বাঙালি মেয়েরা জমিদারি চালনায় চিরকালই দক্ষ। রানি ভবানী বা রানি রাসমণির কথা আমরা জানি। তাঁরাও বিচক্ষণতার সঙ্গে জমিদারি চালাতেন। সত্যিকারের রানি না হলেও প্রজাদের চোখে, শ্রদ্ধায় সম্মানে তিনি রানির আসনই পেয়েছিলেন। সুদক্ষিণা জমিদারি পেয়েছিলেন খুব অল্পবয়সে, তায় বিদেশে; তবু কোনও অসুবিধে হয়নি। তিনি 'শ্বশুরবাড়ি অথবা নিজের বাপের বাড়ির কারওর কাছেই কোনও রকম সাহায্য নেননি।' জ্বালাপ্রসাদের একটি ভ্রাতুষ্পুত্রকে দত্তক নিয়ে শাহজাহানপুরেই থেকে যান।

জমিদারি দেখা ছাড়াও সুদক্ষিণা মন দিয়েছিলেন জনকল্যাণে ও লোকসেবায়। তার জন্যে বলা বাহুল্য, পারিবারিক ট্র্যাডিশন অনুযায়ী তিনি একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন উত্তরপ্রদেশের অশিক্ষিত ও অনুন্নত মানুষের জন্যে। ওইসব অঞ্চলে তখন মেয়েরা একেবারে অন্ধকারে বাস করত। সুদক্ষিণা তাদের মধ্যেও শিক্ষাপ্রসারের চেষ্টা শুরু করলেন। তবে অসহযোগ আন্দোলনের সময় যখন 'আংরেজি হটাও' আন্দোলন শুরু হল তখন সুদক্ষিণা আপত্তি জানালেন। 'ইংরেজ হটাও' তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু 'ইংরেজি হটাও' কেমন কথা! সে তো একটা দরকারি ভাষা। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ করে দিয়েছে সে। প্রচণ্ড প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি বললেন যে, ইংরেজি না পড়ানো হলে তাঁর স্কুল তিনি তুলে দেবেন। সাহেবি চালচলনে অভ্যস্ত সুদক্ষিণাকে তাই ভুল বোঝা সম্ভব ছিল। অথচ সমসাময়িক সমস্ত ইংরেজ রাজকর্মচারী জানতেন, সুদক্ষিণার মতো ইংরেজবিদ্বেষী আর দুটি নেই।

আগে বলেছি, সুদক্ষিণার পোশাকি নাম ছিল পূর্ণিমা। এই নামে তিনি একটা গানে সুর দিয়েছিলেন। সেই সুরের নাম 'দি ইন্ডিয়ান ভিলেজগার্ল'। রেকর্ডে এই অর্কেস্ট্রা বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল, কিন্তু সুদক্ষিণা এর কৃতিত্ব সবটাই দিতে চাইতেন তাঁর দাদা হিতেন্দ্রনাথকে। সংগীতের প্রতি তাঁর প্রবল আকর্ষণ ছিল। বিশিষ্ট শিল্পীদের তাঁর এস্টেট থেকে মাসোহারা দেওয়া হত। বাসব ঠাকুর ছেলেবেলায় দেখেছিলেন সুদক্ষিণা যখন শাহজাহানপুর থেকে কলকাতায় আসতেন 'সারা সকালটা প্রায় সংগীতচর্চাতেই কেটে যেত। কোনদিন সখিউল্লা বাজাতেন সেতার, আর কোনদিন গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় গাইতেন গান...পিসির ফরমাস অনুযায়ী ওখানে রাগ-রাগিণীর বন্যা বয়ে যেত।' শাহজাহানপুরে তাঁর বাড়িতেও বসত গানের আসর।

মহর্ষির পৌত্রীদের মধ্যে বাকি রইলেন আর তিনজন, রবীন্দ্রনাথের তিন কন্যা। কিন্তু কবির মেয়েদের আগে আরও দুজনের কথা বলে নেওয়া যেতে পারে। এঁরা দুজন আর কেউ নয়, স্বর্ণকুমারীর দুই গুণবতী মেয়ে হিরণ্ময়ী ও সরলা। সময়ের দিক থেকে তাঁরা প্রতিভা, ইন্দিরা, সরোজা, প্রজ্ঞাদের সমসাময়িক। আসলে হিরণ্ময়ী ও সরলা ঘোষাল বংশের মেয়ে কিন্তু তাঁরা ঠাকুরবাড়ির মেয়ে হিসেবেই সর্বজনপরিচিত। সেটাই স্বাভাবিক। হিরণ্ময়ী ও সরলার শৈশব কেটেছে এই বিশাল মায়াপুরীর সোনালি দিনগুলোতে। স্বর্ণকুমারী থাকতেন তিনতলার এক অংশে। মেয়েরা থাকতেন বাড়ির অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে। পরে স্বর্ণকুমারী ও জানকীনাথ যখন অন্য বাড়িতে গিয়েছেন, তখনও তাঁরা প্রতিদিন আসতেন ঠাকুরবাড়িতে কিংবা ঠাকুরবাড়ি থেকে কেউ না কেউ যেতেন তাঁদের বাড়ি।

হিরণ্ময়ী ছিলেন সব কাজেই মায়ের যথার্থ সঙ্গিনী। 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদনায়,

'সখিসমিতি' পরিচালনায় স্বর্ণকুমারী হিরণ্ময়ীর সাহায্য পেয়েছেন সবচেয়ে বেশি। কিন্তু হিরণ্ময়ীর হাতে যখন 'ভারতী' সম্পাদনার ভার এল, তখন তিনি প্রবাসিনী সরলাকেও সম্পাদনার কাজে টেনে নিলেন। হিরণ্ময়ীর সব কাজেই জড়িয়ে আছেন সরলা। এমনকী কর্মজীবনের শুরুতেও তাঁরা দুই বোন মিলে মেয়েদের জন্যে একটা পাঠশালা খুলেছিলেন কাশিয়াবাগানে, তাঁদের নিজের বাড়িতে। এখনকার বয়স্ক শিক্ষার আদিরূপ বলা যায় সেটাকে। তাঁদের বাড়ির পুকুরে জল নিতে আসত পাড়ার বউঝিরা। তাদের মধ্যে থেকে গোটা কুড়ি কুমারী ও বালবিধবা নিয়ে এই স্কুল শুরু হয়েছিল। প্রধান শিক্ষিকা হিরণ্ময়ীর বয়স তখন চোদ্দো-পনেরো বছর। সহশিক্ষিকা সরলা দশে পড়েছেন। দুজনে মিলে ছাত্রীদের শেখাতেন বাংলা, ইংরেজি, গান আর সেলাই। প্রতিদিন বিকেল সাড়ে চারটে থেকে সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত এই স্কুল বসত। জোড়াসাঁকো থেকে যাঁরা আসতেন তাঁরা ছাত্রীদের পরীক্ষা নিতেন। পুরস্কার দেওয়াও হত। একবার রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে প্রাইজ বিতরণ করান তাঁর ভাগনিরা।

হিরণ্ময়ীর কথা কমই জানা যায়। ছোট বোন সরলার স্মৃতিতে তাঁর 'স্নেহ-ভক্তি-প্রীতিময়তার সুবাসই' বেশি। ষোলো বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। 'সিমলার বাড়িতে থাকতেই ফণিদাদা পিসেমশাইয়ের সঙ্গে প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসতেন। তখন থেকেই তাঁর দিদিকে বিয়ে করবার ইচ্ছা হয়' লিখেছেন সরলা। হিরণ্ময়ী মহিলা থিয়োজফিক্যাল সোসাইটির সভ্য হলেন। কিন্তু তাঁর প্রকৃত পরিচয় রয়েছে সমাজসেবার কাজে। বিয়ের পরে হিরণ্ময়ী তাঁর মায়ের 'সখিসমিতি'কে একটু অদলবদল করে 'বিধবা শিল্পাশ্রমে' পরিণত করেন। 'সখিসমিতি'র তখন জীর্ণাবস্থা। ইতিপূর্বে হিরণ্ময়ী শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত বরানগরের একটি বিধবা শিল্পাশ্রমের সঙ্গে পরিচিত হন। তারপর তিনি 'সখিসমিতি'কেও নতুন আদলে গড়ে তৈরি করলেন 'বিধবা শিল্পাশ্রম'। আশ্রমের বিধবাদের জন্যে তাঁর ভাবনার শেষ ছিল না। থাকতেনও খুব সাধারণভাবে। তাঁর মেয়ে কল্যাণী লিখেছেন, 'নিজে সধবা হলেও তাঁকে কোনওদিন রঙিন কাপড় পরতে দেখিনি। হাতে মাত্র দুগাছা বালা ও লোহা ছিল, বাইরে গেলে তবে একছড়া হার পরতেন।' শেষকালে দুঃখ করতেন আশ্রমের ভবিষ্যতের কথা ভেবে। বলতেন, '...এত করলাম, কত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে আজীবন আশ্রমের জন্য খাটলাম কিন্তু কই দেশের লোকের সাড়া পেলাম কোথায়? এ কাজ তো স্থায়ী হল না।' তাঁর মৃত্যুর পরে এই আশ্রমের নাম হয় 'হিরণ্ময়ী বিধবা শিল্পাশ্রম'। মেয়েদের হাতের কাজ, সেলাই প্রভৃতির জন্যে এখান থেকে মেডেল দেওয়া হত। গগনেন্দ্রনাথের ছোট মেয়ে সুজাতাও এখান থেকে মেডেল পেয়েছেন হাতের কাজের জন্যে।

হিরণ্ময়ীর সামাজিক কাজকর্মের আড়ালে লুকিয়ে ছিল একটি শিল্পীসত্তা। বেথুন স্কুল থেকে মাইনর পরীক্ষা পাশের পর হিরণ্ময়ী আর স্কুলে পড়েননি, তবে সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। 'সখা', 'বালক' ও 'ভারতী'-তে তাঁর অনেক লেখা ছাপা হত। সেসব লেখা আজও পুরনো পত্রিকার পাতাতেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। কেউ সযত্নে সংগ্রহ করে প্রকাশ করার চেষ্টা করেননি। 'ভারতী' সম্পাদনা করবার সময় তিনি একাই সবকিছু দেখাশোনা করতেন। প্রবাসিনী সরলা ছিলেন নামেমাত্র যুগ্ম-সম্পাদিকা। কাজ হিরণ্ময়ীকেই করতে হত। তাঁর নিজের লেখা 'ভারতী'তে আছে বোধহয় আশির কাছাকাছি। তার মধ্যে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ রাশিয়া নিয়ে লেখা। প্রবন্ধগুলি মৌলিক নয়, অনুবাদ—তা হলেও ভাষার ওপর তাঁর দক্ষতা ও বিষয় নির্বাচনের ক্ষমতা প্রশংসার যোগ্য। 'রুশিয়া', 'রুশিয়ার কারাগার', 'রুশিয়ার বাণিজ্য', 'রুশিয়ার ভাষা ও বাণিজ্য', 'রুশিয়ার শাসনপ্রণালী' বেশ মননধর্মী রচনা।

হিরণ্ময়ীর মৌলিক রচনা কয়েকটি সনেট। সরলার ভাষায় বলা যায়, যেমন কারও কারও গানের গলা মিষ্টি ও করুণ অথচ সে বড় গাইয়ে নয়, তেমনি হিরণ্ময়ীর কবিতাগুলোও করুণ মধুর। 'ভারতী'র প্রতি ছিল তাঁর আন্তরিক অনুরাগ। তাই তার ভার নিয়েও মনে জমেছিল শঙ্কা।

কী জানি কী হয়? তিনি অনেক চেষ্টা করে 'ভারতী'র ভার তুলে দিলেন তাঁর মামা রবীন্দ্রনাথের হাতে। কবি ভার নিয়েছিলেন মাত্র এক বছরের জন্যে। তারপর কী হবে? সেকথাই হিরণ্ময়ী প্রকাশ করেছেন একটি সনেটে। তাতে তিনি বলেছেন, 'রবি যদি অস্ত যায় আসে অন্ধকার, তবু রব কাছে'। বাস্তবিকই পরম আদরে তিনি রবিহারা 'ভারতী'কে তুলে নিয়েছিলেন বুকে। তাঁর জীবৎকালে 'ভারতী'র সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ হয়নি। 'ভারতী'র প্রয়োজনে কবিতা, রম্যরচনা, হেঁয়ালিনাট্য, প্রবন্ধ, বিদেশি গল্পের অনুবাদ, সবই লিখতেন 'হিরণ্ময়ী'। 'ভারতী' যখন বন্ধ হয়ে যায়, হিরণ্ময়ী তখন পরলোকে।

স্বর্ণকুমারীর মধ্যে যে রাজনৈতিক চেতনা ও দেশভক্তির উন্মেষ দেখা দিয়েছিল, তার পূর্ণ বিকাশ ঘটল তাঁর মেয়ে সরলার মধ্যে। সরলার মতো তেজস্বিনী নারী বিরল—যেন কোষমুক্ত-কৃপাণলতা, বাংলার 'জোয়ান অব আর্ক', 'ভারতের প্রথম চারণী'। সাহিত্য-সংগীত-স্বাদেশিকতার ত্রিধারাকে তিনি বইয়েছিলেন এক খাতে, তবে সংগীত ও সাহিত্য দুই-ই তাঁর স্বদেশচেতনার অনুগামী। সরলার শৈশব কেটেছিল জোড়াসাঁকোতে আর সব বোনেদের মতোই—শুধু মনে ছিল একটা চাপা ক্ষোভ। লেখাপড়ায় মগ্ন মা তাঁকে ভালবাসেন না। বাসেন না কি আর? তবে বহিঃপ্রকাশটা বড় কম। সেকেলে অভিজাত পরিবারের এই তো দস্তুর! একান্নবর্তী বিশাল পরিবার। সেখানে মা কেন মেতে থাকবেন নিজের ছেলেমেয়েদের নিয়ে? তাদের জন্যে তো দেখাশোনা করবার জন্যে ঝি আছে। ঠাকুরবাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে এক বা একাধিক খাস চাকর বা খাস ঝি থাকত। ছেলেদের জন্যে চাকর, মেয়েদের ঝি আর দুগ্ধপোষ্যদের জন্যে দুধ মা—এর নড়চড় হত না। সরলা লিখেছেন, '...ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই মায়ের সঙ্গে আমাদের আর সাক্ষাৎ-সম্পর্ক থাকত না। তিনি আমাদের অগম্য রানির মতো দূরে-দূরে থাকতেন। দাসীর কোলই আমাদের মায়ের কোল হত। মায়ের আদর কী তা জানিনে। মা কখনও চুমু খাননি, গায়ে হাত বোলাননি। মাসিদের ধাতেও এসব ছিল না।' সেকালের বড়লোকদের বাড়িতে শিশুরাই ছিল সবচেয়ে অসহায়। অবশ্য সরলা দেখতেন তাঁর মা-মাসিরা নিজেদের সন্তানদের সম্বন্ধে যতটা উদাসীন ছিলেন, মামিরা অর্থাৎ ঠাকুরবাড়ির বউয়েরা তা ছিলেন না। তাঁরা বাইরে থেকে আসতেন ভিন্ন পারিবারিক ধারা নিয়ে, সন্তানদের টেনে নিতেন বুকে। বিশেষ করে জ্ঞানদানন্দিনী, তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের খুব ভালবাসতেন, তাদের ঘটা করে জন্মদিন হত। তাদের জন্যে দুধ মা বা খাস ঝি-চাকর থাকলেও মাতৃস্নেহে ভাটা পড়ত না। দুঃখ হত সরলার। ক্ষুব্ধ অভিমানে ছোট্ট বুকটা ভরে উঠত।

হয়তো মায়ের উদাসীনতা অভিমানী মেয়ের বুকে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস সৃষ্টি করেছিল, তাই সরলা মন দিয়েছিলেন লেখাপড়ার দিকে। মাত্র তেরো বছর বয়সে বেথুন স্কুল থেকে এনট্রান্স পাশ করে সরলা বোধহয় প্রথম সবার চোখে পড়লেন, এমনকী মায়েরও। চোখে পড়ার কারণও ছিল। এনট্রান্স পরীক্ষার সময়, ইতিহাসের প্রশ্নের মধ্যে মেকলের লেখা 'লর্ড ক্লাইভ' গ্রন্থের ওপর ভিত্তি করে ক্লাইভের বঙ্গবিজয় সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন করা হয়েছিল। সরলা মেকলে-র আঁকা বাঙালি চরিত্রের হেয়তার প্রতিবাদ করে নিজেই বিপরীত মন্তব্যপূর্ণ উত্তর এমন যুক্তি তেজ ও আন্তরিকতার সঙ্গে তুলে ধরেছিলেন যে, পরীক্ষক এন. ঘোষ এই ছাত্রীকে সর্বাধিক নম্বর দিয়ে, খোঁজ করেছিলেন মেয়েটি কে? ইতিহাসের পরীক্ষায় সরলাই সেবার প্রথম হয়েছিলেন। সবাই দেখলেন সরলা রাতারাতি বড় হয়ে উঠেছেন! তাই তো! রূপের প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে থাকা সরলা এগিয়ে গেলেন সবার আগে। ঠাকুরবাড়িতে এর আগে কোনও মেয়ে পরীক্ষায় বসেনি। শুধু এনট্রান্স নয়, সরলা এরপর পাশ করলেন বি. এ. (১৮৯০)। সতেরো বছর বয়সে। বেথুন

কলেজ থেকে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে। ইন্দিরা তখনও পরীক্ষা দেননি। সরলা সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পান পদ্মাবতী স্বর্ণপদক। তিনিই এ মেডেল প্রথম পান। সংখ্যার দিক থেকে তিনি ছিলেন সপ্তম মহিলা গ্র্যাজুয়েট। এরপর তিনি ভেবেছিলেন সংস্কৃতে এম. এ পড়বেন; পড়তে শুরুও করেছিলেন, পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। বিষয় নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য থেকেই সরলার খেয়ালখুশি ও জেদের পরিচয় পাওয়া যায়। বি. এ. পড়বার আগে তিনি স্কুলে পড়েছিলেন সায়েন্স। সে সময় মেয়েদের সায়েন্স পড়ার সুযোগ ছিল না, তাই সরলা জেদ করে দাদাদের সঙ্গে ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ সরকারের সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের সান্ধ্য-লেকচারে যাবার অনুমতি নিলেন। সেখানে সরলা একমাত্র ছাত্রী, তাই তিনি বসে থাকতেন অধ্যাপকদের ঘরে। তাঁরা ক্লাসে এলে সরলাও আসতেন। দুপাশে দুই দাদা—জ্যোৎস্নানাথ ও সুধীন্দ্রনাথ। তিনটে স্বতন্ত্র চেয়ার থাকত সামনের লাইনে, সেখানে বসতেন দুপাশে দুই দাদাকে নিয়ে সরলা, আর বাকি ছাত্ররা বসত বেঞ্চে। আড়ালে ফিসফিস করে দুই দাদাকে দেখিয়ে ছেলেরা বলত 'বডি গার্ডস'। কিন্তু এত কাঠখড় পুড়িয়ে যে সায়েন্স পড়া, সেই সায়েন্সের ওপর কোনও আকর্ষণই ছিল না সরলার। থাকলে তিনি কাদম্বিনী গাঙ্গুলি বা অবলা বসুর মতো চিকিৎসক হতে চাইতেন। কিংবা বিধুমুখী বসু ও ভার্জিনিয়া মিত্রের মতো মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হতে চাইতেন। মনে রাখতেন ওই মহিলাদের অবিস্মরণীয় ডাক্তারি পড়ার কাহিনীকে। এমনকী স্বর্ণকুমারীর মতো বিজ্ঞানমনস্কতা থাকলেও সরলা বিজ্ঞানচর্চায় অনেক উন্নতি করতে পারতেন। কিন্তু ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা বিজ্ঞান-সচেতনতার পরিচয় দিতে পারেননি। পরবর্তী যুগেও বহুদিন তাঁরা শুধু চর্চা করেছেন সাহিত্য ও শিল্পকলার। আর সরলার আগ্রহ ছিল অন্যদিকে, তাই তিনি বিচিত্র বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন করেছেন, খুঁজেছেন ঈপ্সিত পথ।

শুধু লেখাপড়া নয়, গানেও সরলার আগ্রহ কম ছিল না। ছোটবেলা থেকেই তিনি বাংলা গানে ইংরেজি কর্ড ব্যবহার করে ইংরেজি 'piece' রচনা করতে পারতেন। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটা গানের স্বরলিপি তৈরি করা ছাড়াও তিনি কয়েকটা গানকে 'য়ুরোপায়িত' করলে কবি খুব খুশি হন। 'সকাতরে ওই কাঁদিছে' গানটিকে সরলা যখন রীতিমতো একটা ইংরেজি বাজনার 'piece'-এ পরিণত করলেন, তখন সেটা পুরোদস্তুর ব্যান্ডে বা পিয়ানোতে বাজাবার যোগ্য হল। উৎসাহিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বললেন 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'র পিয়ানো সঙ্গত তৈরি করতে। সেও হল। সরলার তখন বয়স মাত্র বারো। কবি তাঁকে জন্মদিনে উপহার দিলেন একটা ইউরোপীয় গান লেখার খাতা। দিয়ে বললেন, 'এইতে লিখে রাখ, ভুলে যাবি।'

সরলার সংগীতচর্চা মহর্ষিরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তিনি তাঁকে হাফিজের একটি কবিতায় সুর বসাতে দিলেন। এক সপ্তাহ পরে সরলা বেহালা বাজিয়ে গেয়ে শোনালেন হাফিজ। দেবেন্দ্রনাথ মজে মজে শুনলেন। খুব ভাল গান না হলে তিনি শুনতে চাইতেন না। বাড়ির লোকদের মধ্যে তিনি ভালবাসতেন রবীন্দ্রনাথের গান আর প্রতিভার পিয়ানো বাজানো শুনতে। যাইহোক, সরলার গান শুনে শুধু খুশিই হলেন না, গায়িকাকে উপহার দেবার ব্যবস্থাও করলেন। এল হাজার টাকা দামের হিরে-চুনি সেট করা জড়োয়া নেকলেস। ঘরোয়া সভায় নেকলেসটি সরলার হাতে তুলে দিয়ে মহর্ষি বললেন, 'তুমি সরস্বতী! তোমার উপযুক্ত না হলেও এই সামান্য ভূষণটি এনেছি তোমার জন্যে।'

গান সংগ্রহ ও সুর সংগ্রহ ছিল সরলার নেশার মতো। বাউল গান, আর দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতে ভরা একটি গানের ডালি তিনি উপহার দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। কবি সেই গানকে ভেঙে ভেঙে অনেক নতুন গান সৃষ্টি করেছেন। ইন্দিরাও এ ঘটনার উল্লেখ করেছেন 'রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসঙ্গমে'। সরলার আনা সুরে রবীন্দ্রনাথ নিজের কথা বসিয়ে যে গান রচনা করেন সেগুলো হচ্ছে, 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে', 'এসো হে গৃহদেবতা', 'এ কি লাবণ্যে', 'চিরবন্ধু চিরনির্ভর' ইত্যাদি। 'আমার সব সংগীতসঞ্চয়ের মূলে তাঁকে নিবেদনের

আগ্রহ লুকিয়ে বাস করত। দিতে তাকেই চায় প্রাণ, যে নিতে জানে। বাড়ির মধ্যে শ্রেষ্ঠ গ্রহীতা ছিলেন রবিমামা। তাই আমার দাবীও পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল তাঁতে।'

এ তো গেল গানের কথা। অনেকেই জানেন না 'বন্দেমাতরম' গানের প্রথম সুর রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে সরলাই দিয়েছিলেন। কবি প্রথম দুটি পদের সুর দিয়েছিলেন। সরলা নিজেও গান লিখতেন এবং সেইসব দেশাত্মবোধক গান প্রচুর উন্মাদনা সৃষ্টি করত। কিন্তু সে প্রসঙ্গ আরও পরে। আপাতত সরলার সাহিত্যচর্চার কথা। এত কাজের ফাঁকে সরলা লিখেছেনও প্রচুর। বারো বছর বয়সেই একটা কবিতা লিখে পুরস্কার পেয়েছিলেন 'সখা' পত্রিকা থেকে। প্রথম প্রবন্ধ 'পিতামাতার প্রতি কি ব্যবহার করা কর্তব্য'। সেই শুরু, তারপর থেকে তো নিয়মিত লিখছেন 'ভারতী'তে। প্রথমবারে যুগ্ম সম্পাদিকা থাকার সময় না হলেও পরে এককভাবে 'ভারতী' সম্পাদনার সময় তিনি লিখেছেন নানা ধরনের লেখা। এ সময় তিনি মহীশূর থেকে ফিরে এসেছেন। বছর কয়েক আগে তিনি এম. এ. পড়া ছেড়ে মহীশূরের মহারানি গার্লস স্কুলে চাকরি নিয়ে চলে যান দক্ষিণ ভারতে। ঠাকুরবাড়িতে এও নতুন ঘটনা। বাইরের অনেকে সরলার চাকরি করতে যাওয়াটা ভাল চোখে নেয়নি। 'বঙ্গবাসী' কাগজ ফোঁস করে মন্তব্য করল, 'এ ঘরের মেয়ের একলা একলা বিদেশে চাকরি করতে যাওয়ার দরকারটা কি? খাওয়া-পরার তো অভাব নেই? কেন খামোকা নিজেকে বিপদগ্রস্ত করা?' এই ছিল সেকেলে দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য। যেন খাওয়া-পরার প্রয়োজনই সব। এঁরা মেয়েদের এগিয়ে যাওয়াকে চিরকাল সন্দেহের চোখে দেখে এসেছেন। আর ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের তো কথাই নেই। তাঁদের কার্যকলাপ এঁদের একেবারে ভাল লাগেনি। মনে হয়েছে সব তাতেই বাহাদুরি দেখানোর চেষ্টা! কিন্তু ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা এগিয়েছেন প্রাণের দুর্বার আবেগে। বিপদকে তুচ্ছ করেছেন সরলা, তিনি কি ঘরে বসে থাকতে পারেন? আর তিনি তো একলা নন, আরও কত মেয়েই এগিয়ে গেছেন। মেয়েদের চাকরি করাও নতুন কিছু নয়। চন্দ্রমুখী বসু বেথুন কলেজের প্রিন্সিপাল হয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন ভারতীয় মেয়েরাও বিদুষী, বিদেশিনীদের চেয়ে কোনও অংশে কম নন। এমনকী সরলা যখন মহীশূরে গেলেন তার আগেই সেখানে গিয়েছেন কুমুদিনী খাস্তগির।

সরলার সাহিত্যরুচি গড়ে উঠেছিল রবীন্দ্র সান্নিধ্যে 'ম্যাথু আর্নল্ড, ব্রাউনিং, কীটস্, শেলি প্রভৃতির রসভাণ্ডার যিনি আমার চিত্তে খুলে দেন—সে রবিমামা।' অবশ্য সেসব অনেকদিন আগের কথা। তার প্রকাশ ঘটল এতদিনে। দেশে ফিরে আবার 'ভারতী' নিয়ে বসলেন সরলা। কাগজে একেবারে বিজ্ঞাপন দিয়ে দিলেন 'আগামী মাসে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি সামাজিক প্রহসন লিখবেন।' কাগজ পড়ে তো রবীন্দ্রনাথের চক্ষুস্থির। সে কী? তিনি কিছুই জানেন না আর বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে গেল! বকতে আরম্ভ করলেন, 'কেন তুই আমাকে না জানিয়ে বিজ্ঞাপন দিলি? আমি লিখব না।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত লিখতেই হল। সরলা নতুন সম্পাদক, তাকে বিপদে ফেলতে মন চাইল না। লেখা হয়ে গেল 'চিরকুমারসভা'। তবে সরলার এইরকম কাজের জন্যে কিংবা লেখার তাগিদে কবি পরবর্তীকালে বেশ বিরক্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারে দেখা যাবে সরলার খুব একটা দোষ ছিল না। সম্পাদক হিসেবে সরলা খুবই বিচক্ষণতার পরিচয় দিতেন। লেখকদের পারিশ্রমিক দেবার প্রবর্তন করেন তিনিই। 'ভারতী'কে নানাভাবে তিনি সার্থক করে তুলেছিলেন। 'বালক', 'সাধনা', 'পুণ্য'র মতো 'ভারতী' শুধু ঠাকুরবাড়ির কাগজ হয়ে যে থাকেনি সে কেবল সরলার গুণে। তিনি গুণী লেখকদের খুঁজে বার করতেন এবং সুযোগ দিতেন। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। শরৎচন্দ্র বোধহয় সবে তখন গল্প লেখা শুরু করেছেন। কুণ্ঠা যায়নি। রয়েছেন বর্মায়। সেই সময় তাঁর মামা 'বড়দিদি' গল্পটির পাণ্ডুলিপি দিয়ে এলেন 'প্রবাসী'-তে, কিছুদিন পড়ে থাকার পর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সেটি ফেরত দিলেন অমনোনীত রচনা বলে। সুরেন গঙ্গোপাধ্যায় আর কী করেন? তিনি সেটি নিয়ে এলেন 'ভারতী'র অফিসে। সরলাকে গল্পটি দেখানো হল। তিনি পড়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে

বললেন, 'চমৎকার! এক কাজ কর, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় তিন মাসে ছাপাও। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় নাম দিও না, সকলে মনে করবে রবীন্দ্রনাথের লেখা। আমাদের [illegible] এবং গ্রাহক-গ্রাহিকা বাড়বে। আষাঢ় সংখ্যায় 'বড়দিদি' শেষ হবে, আর সেই সংখ্যায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লেখকের নাম ছাপবে।' তাই হল এবং দেখা গেল সরলার সব অনুমানই সত্যি। অনেকে রবীন্দ্রনাথকে গিয়ে প্রশ্ন করলেন 'বড়দিদি'র কথা। বিস্মিত রবীন্দ্রনাথ জানালেন লেখক তিনি নন, তবে গল্পটি নিঃসন্দেহে কোনও শক্তিশালী লেখকের লেখা। তিনিও কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। ঔৎসুক্য প্রকাশ করলেন গগনেন্দ্র-অবনীন্দ্র ও আরও অনেকে। নাম না থাকায় 'বড়দিদি' ক্রমশই কৌতূহল বৃদ্ধি করে এবং এরপর শরৎচন্দ্রের প্রতিষ্ঠাও সহজ হয়ে গেল।

শুধু নতুন লেখক আবিষ্কার নয়, সরলা 'ভারতী'-কে সমৃদ্ধ করেছিলেন কয়েকজন মনীষীর দুর্লভ ইংরেজি রচনার অনুবাদ করিয়ে। এই রচনাগুলি হল:

ক) ভগিনী নিবেদিতার—'প্রত্যেক মা ছেলের জন্য কি করতে পারে' (জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬), 'বঙ্গমাতার কর্তব্য' (শ্রাবণ ১৩০৬)

খ) মহাদেব গোবিন্দ রানাডের—'পূর্বকালের সমাজ শাসন' (শ্রাবণ ১৩০৭)

গ) মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর—'দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতোপনিবেশ' (বৈশাখ ১৩০৯)

শোনা যায়, এই 'ভারতী' সম্পাদনাসূত্রেই সরলার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল সাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের। বিপত্নীক, উন্নতরুচি, সাহিত্যপ্রেমিক প্রভাতকুমারের সঙ্গে বোধহয় সরলার বিবাহের কথাবার্তাও হয়েছিল এবং নিজেকে আরও যোগ্য করে তোলার জন্যে প্রভাতকুমার ব্যারিস্টার হবার জন্যে বিলেত যাত্রা করেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বিয়ে হয়নি। প্রভাতকুমারের গোঁড়া হিন্দু জননীর প্রবল বিরোধিতায় বিয়ের প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়। আরও কয়েকজনের নামও শোনা গিয়েছে সরলার 'ভাবী বর' হিসেবে। নিবেদিতা শুনেছিলেন গোখলের নাম। আরেকবার কাগজে ছাপা হয়েছিল ডাঃ প্যারামল-এর কথা। এ সবই অলীক কল্পনা। আমাদের দেশে বয়স্থা অনূঢ়া মেয়েকে নিয়ে জল্পনা করা চিরকেলে স্বভাব। সরলা বহুদিন অবিবাহিতা ছিলেন, প্রায় তেত্রিশ বছর। বিয়ের বয়স হিসেবে বয়সটা আজকের যুগেও বেশি। তাই কথা তো উঠবেই। আসলে এ ব্যাপারে প্রথমদিকে সরলার আগ্রহ ছিল না। মেয়েকে দেশের কাজে কুমারী রাখার আগ্রহ ছিল স্বর্ণকুমারীরও। 'মা বলতেন—সরলার বিয়ে দেব না। ....ছেলেবেলায় মা-বাপ স্রোতের যে মুখে ভাসান, তৃণটি সেই মুখেই চলতে থাকে। আমার মনোবৃত্তিও অ-বিবাহের মুখে চলে চলে তারই তটে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।' এমনকী মহর্ষিও প্রস্তাব করেছিলেন 'সরলা যদি অঙ্গীকার করে জীবনে কখনও বিয়ে করবে না, তা হলে আমি তার তলোয়ারের সঙ্গে বিয়ে দিই।' তাতে সরলা সম্মত হননি। ফলে বয়স বাড়ে। শেষে যার সঙ্গে সরলার বিয়ে হল তিনি সত্যিই সরলার যোগ্য স্বামী, পঞ্জাবের বিপ্লবী নেতা খাপখোলা তলোয়ারের মতো তেজস্বী রামভজ দত্ত চৌধুরী।

'ভারতী'-তে সরলা নিজেও নানারকম লিখতেন। গান-কবিতা-গল্প- উপন্যাস-রম্যরচনা সমালোচনা-অনুবাদ—আর বাকি রইল কি! স্মৃতিকথা? তাঁর শেষ জীবনে লেখা 'জীবনের ঝরাপাতা' একটি অসাধারণ রচনা। সমসাময়িক যুগের দর্পণ বললেও অত্যুক্তি হবে না। এছাড়া তাঁর সংস্কৃত কাব্য আলোচনা করে লেখা কয়েকটা প্রবন্ধ 'রতিবিলাপ', 'মালতীমাধব', 'মালবিকাগ্নিমিত্র', 'মৃচ্ছকটিক' অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীশ মজুমদারকে এই প্রবন্ধগুলো দেখিয়ে বলেছিলেন, 'লেখিকার বয়স বিবেচনা করিলে বলিতে হয় ও বয়সে আমাদেরও অমন লেখা সহজ হইত না। তাঁহার সমালোচনা পড়িয়া নাটকগুলি আবার নতুন করিয়া পড়িতেছি।' সরলার সব রচনার কোনও সংকলন আজও প্রকাশিত হয়নি।

মৌলিক রচনা হিসেবে সরলার প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা 'প্রেমিক সভা'—লেখকের নামহীন লেখাটি বেশ প্রশংসা পায়। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং অভিনন্দন জানিয়ে ভাগনিকে লিখলেন, 'নাম নিমনি

বলে তোর এ লেখার ঠিক যাচাই হল। নতুন হাতের লেখার মতো নয়, এ যেন পাকা প্রতিষ্ঠ লোকের লেখা। এ যদি আমারই লেখা লোকে ভাবত, আমি লজ্জিত হতুম না।' এর চেয়ে বড় কমপ্লিমেন্ট আর কী হতে পারে? এরপর সরলা বেশ কয়েকটা সুখপাঠ্য গল্প লেখেন।

কিন্তু আগেই বলেছি, সরলার জীবনে সাহিত্য বা সংগীত প্রধান নয়। তাঁর জীবনে সবচেয়ে বড় ছিল তাঁর স্বদেশপ্রেম। সাহিত্য বা সংগীত তাঁকে স্বদেশ হিতৈষণার পথে সাহায্য করেছিল কিংবা বলা যায় সরলা তাঁর রাজনৈতিক কাজে এ দুটিকে ঠিকমতো ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। ঠাকুরবাড়ির কোনও ছেলে তখন সরলার মতো চরমপন্থী রাজনীতি নিয়ে মেতে ওঠেননি। সৌম্যেন্দ্রনাথ এসেছেন অনেক পরে। সরলার মধ্যে স্বদেশচেতনার আগ্রহ জাগিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর বাবা-মা। জানকীনাথ ভারতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। স্বর্ণকুমারী প্রথমে হিন্দুমেলায় যোগ দিয়ে মেয়েদের মধ্যে সর্বপ্রথম স্বদেশিয়ানার সূচনা করেন। তাঁর 'সখিসমিতি', 'শিল্পমেলা'র মধ্যেও স্বদেশপ্রেমের বীজ লুকিয়ে ছিল। সরলা সরাসরি এলেন রাজনীতিতে। ১৮৯৫ সাল থেকেই তিনি 'ভারতী'র মারফত বাঙালি যুবমানসকে বীর্যমন্ত্রে দীক্ষা দেবার চেষ্টা করেন। 'মৃত্যুচর্চা', 'ব্যায়ামচর্চা' 'বিলাতি ঘুষি বনাম দেশী কিল' বাঙালির মুমূর্ষু আত্মসম্মানকে জাগিয়ে দিল। সুস্থ সবল জীবন যাপন ও অপমানের প্রতিরোধে মৃত্যুও ভাল এই বোধে সবাই উদ্বুদ্ধ হতে শুরু করল। লিখলেন 'আহিতাগ্নিকা'। সারা দেশে বইল উদ্দীপনার জোয়ার। দলে দলে স্কুল কলেজের ছেলেরা এল সরলার কাছে। সরলা তাদের মধ্যে থেকে কয়েকজনকে বেছে বেছে একটা দল করলেন। ভারতবর্ষের একখানা মানচিত্র তাদের সামনে রেখে প্রতিজ্ঞা করাতেন তনু মন দিয়ে ভারতের সেবা করার। শেষে হাতে একটি রাখি বেঁধে দিতেন তাদের আত্মনিবেদনের সাক্ষী হিসেবে। অবশ্য সরলার এই সমিতি ঠিক গুপ্ত সমিতি ছিল না, তবে মুখে মুখে রটানো বারণ ছিল।

বছর কয়েক পরে এই লাল সুতোর রাখিবন্ধন দেশময় ছড়াল রবীন্দ্রনাথের জন্যে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের দিনে তিনি হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সবার হাতে পরিয়ে দিলেন মিলনরাখি। সরলার রাখিবন্ধনের কথা মনে হলেই মনে পড়ে যায় 'চার অধ্যায়ের' এলাকে। তার হাতের রক্ততিলক ছেলেদের মনে দারুণ উদ্দীপনা সৃষ্টি করত। এই জাতীয় দলনেতৃত্ব ঠাকুরবাড়িতেই প্রথম নয়, বাংলাদেশেও প্রথম। বিদেশেও কি সুলভ ছিল? ইংল্যান্ডে তখন মেয়েরা ভোটাধিকারের জন্যে লড়াই করছেন। কল্পনা করা যায় কি ঠিক সেই সময়ে ছেলেদের বীর্যমন্ত্রে দীক্ষিত করছেন একটি বাঙালি মেয়ে!

'ভারতী' সম্পাদনাসূত্রে সরলা এ সময় পরিচিত হয়েছিলেন আরও দুটি অলোকসামান্য প্রতিভার সঙ্গে—স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা। স্বামিজী চেয়েছিলেন সরলা বিদেশে যাবেন ভারতীয় নারীর প্রতিনিধি হয়ে। প্রতীচ্যের মেয়েদের শোনাবেন প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক বাণী। চিঠিতে লিখেছিলেন:

'যদি আপনার ন্যায় কেউ যান তো ইংলন্ড তোলপাড় হইয়া যাইতে পারে, আমেরিকার কা কথা!'

স্বামিজী নিবেদিতাকেও বারবার বলেছিলেন সরলার কথা। নিবেদিতা লিখেছেন, 'তিনি (স্বামিজী) বলেন—সরলা নারীকুলের রত্ন; অনেক বড় জিনিস করবে।' নিবেদিতা গল্প করেছিলেন সরলাকেও, স্বামিজী তাঁকে বলেছেন—'সরলার education perfect: এইরকম education ভারতের সব মেয়েদের হওয়া দরকার।' এরপরই নিবেদিতা প্রস্তাব নিয়ে এলেন—স্বামিজীর সঙ্গে next trip-এ সরলারও বিলেত যাওয়ার, সেখানে ভারতের মেয়েদের প্রতিনিধি হয়ে প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক বার্তা প্রতীচ্যের মেয়েদের শোনাবার জন্যে।

স্বামিজীর আশা অবশ্য সফল করতে পারেননি সরলা, কারণ তিনি তাঁর সঙ্গে বিদেশ যেতে পারেননি। স্বামিজী ও নিবেদিতার সঙ্গে খুব বেশি যোগাযোগ রাখাও সম্ভব হয়নি সরলার পক্ষে,

তাঁর পিছুটান ছিল ঠাকুরবাড়ি ও ব্রাহ্ম সমাজের। '...আমার এ বিষয়ে যে ততটা উৎসাহ হল না তার কারণ কতকগুলি চিরাগত তামসিক সংস্কারের বশে ও তার দরুন ভীরুতায়।' বরং স্বামিজীর স্বপ্ন আংশিকভাবে সফল করেছিলেন সুষমা।

সরলা স্বামিজীর আশা পূর্ণ করতে না পারলেও তাঁর মনে যে আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল তার সবটাই স্বামী বিবেকানন্দের দান। স্বামিজী দেহরক্ষা করলেন কিন্তু তাঁর প্রভাব কাজ করতে লাগল, 'যেমন একটা ছোট্ট অশ্বত্থ বিচি দেওয়ালের একটা ফাটলে উড়ে পড়ে ক্রমে ক্রমে সে ফাটলকে ঠেলে ঠেলে বাড়িয়ে বাড়িয়ে একদিন ডালপালা বের করে গাছ হয়ে দেখা দেয়। তেমনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পথে চলার আকাঙ্ক্ষা আমার জীবনে অলক্ষ্যে সুড়ঙ্গ কাটতে থাকল।' স্বামিজীর পত্রে পাতঞ্জল যোগসূত্রের উল্লেখ দেখে সরলা বাংলা তর্জমাসমেত সেই সূত্রগুলি পড়লেন। কর্মযোগে গীতার উল্লেখ দেখে সেদিকেও তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হল, '...তার আগে এর একটি শ্লোকও পড়িনি—আমাদের পরিবারে শ্রীকৃষ্ণের গরিমা ছিল না।' সরলার মনে হিন্দুর হিন্দুত্ব জিনিসটি যে কী, তা ভাল করে জানবার আগ্রহ হল। শেষে 'আমার আধ্যাত্মিক পিপাসা আমার শৈশবের গতানুগতিক ব্রাহ্মধর্ম থেকে অনেক দূরের পথে নিয়ে চলছিল।' এ অবশ্য অনেক পরের কথা, সরলা যখন নিজের কথা লিখতে বসেছেন সেই সময়ের কথা। তার আগে, সরলা ঝড় তুলেছিলেন বঙ্গে, পঞ্জাবে, সারা ভারতে।

হঠাৎ একটা সভানেতৃত্বের আহ্বান এল। সরলা ইতস্তত করতে লাগলেন। মহীশূর ঘুরে এসেছেন, তা বলে কলকাতা শহরে প্রকাশ্যে ছেলেদের সভায় যোগ দেওয়া! এ যে কল্পনার অতীত! মাঝে মাঝে স্বামিজীর আশ্রমেও গিয়েছেন কিন্তু তখন সঙ্গে থাকতেন মামাতো দাদা সুরেন কিংবা অগ্নিশিখার মতো অলোকসামান্যা নিবেদিতা। তবু রাজি হতে হল। তাঁর নির্দেশে সভা হল পয়লা বৈশাখ। ওই দিন যশোরেশ্বর প্রতাপাদিত্যের রাজ্যাভিষেক হয়েছিল। উৎসবের নাম হল প্রতাপাদিত্য উৎসব। তাঁর জীবনী আলোচনা করে ছেলেরা দেখাল লাঠি খেলা, কুস্তি, বক্সিং!

দিন বদলেছে বলে সরলাকে বিরূপ সমালোচনা শুনতে তো হলই না, উলটে কাগজে কাগজে সমালোচনার বদলে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শোনা গেল। 'মরি মরি কি দেখিলাম! এ কি সভা! বক্তিমে নয়, টেবিলে চাপড়াচাপড়ি নয়—শুধু বঙ্গবীরের স্মৃতি আবাহন, বঙ্গযুবকদের কঠিন হস্তে অস্ত্রধারণ ও তাদের নেত্রী এক বঙ্গললনা...দেবী দশভুজা কি আজ সশরীরে অবতীর্ণা হইলেন?'

কিংবা, 'কলিকাতার বুকের উপর যুবক সভায় একটা মহিলা সভানেত্রীত্ব করিতেছেন দেখিয়া ধন্য হইলাম।'

কাগজে লিখল, 'সরলাদেবীর সঙ্গে দৌড়ে দৌড়ে হাঁফিয়ে পড়ছি। রোজ ভোরে উঠে মনে হয়—'অতঃ কিম্'?'

আসলে সরলা বাঙালি মানসিকতার গতিপ্রকৃতিকে ঠিকমতো ধরতে পেরেছিলেন। যুক্তির চেয়ে আবেগ উত্তেজনায় তারা মেতে ওঠে বেশি। তাদের জাগাতে হলে তাদের প্রবণতার পথ ধরেই এগোতে হবে। তাই তিনি বীরাষ্টমী, রাখিবন্ধন, প্রতাপাদিত্য উৎসব, উদয়াদিত্য উৎসবের সূচনা করে নিজের বাড়িতে শারীরচর্চার আখড়া খুললেন। তবে এই প্রতাপাদিত্য উৎসব নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সরলার মতবিরোধ শুরু হল। রবীন্দ্রনাথ প্রতাপাদিত্যকে জাতীয় বীর বলে গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন না, কারণ তাঁর চারিত্রিক আদর্শ মহান নয়। 'বৌঠাকুরাণীর হাটে' তিনি প্রতাপাদিত্যকে সেভাবেই এঁকেছেন। অথচ সরলা সেই ব্যক্তিকে নিয়ে, যাঁর ঐতিহাসিক গুরুত্ব সত্যিই আছে কিনা বিচার না করে, মেতে ওঠায় তিনি বিরক্ত হন। সরলার উত্তর, তিনি প্রতাপাদিত্যকে নীতির নিক্তিতে বিচার করেননি। করেছেন রাজনৈতিক মতাদর্শের দিক দিয়ে। 'একলা এক জমিদার হয়ে তিনি যে মোগল বাদশার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বাংলার স্বাধীনতা

ঘোষণা করেছিলেন, নিজের নামে শিক্ষা চালিয়েছিলেন, সে কথা তো সত্যি'।

সব দিয়ে সরলা এক বিশাল কর্মযজ্ঞ চালিয়ে গিয়েছেন। এর জন্যে ছিল তাঁর গান। সে যেন প্রত্যেকের মধ্যে সঞ্চার করা। ১৯০১ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে গাওয়া হয় তাঁর নিজের গান 'নমো হিন্দুস্থান'।

'গাও সকল কণ্ঠে সকল ভাষে
নমো হিন্দুস্থান।
হর হর হর—জয় হিন্দুস্থান।
সৎশ্রী অকাল হিন্দুস্থান।
আল্লা হো আকবর—হিন্দুস্থান।
নমো হিন্দুস্থান।'

প্রবল উদ্দীপনা ছড়িয়ে পড়ল। স্বামী বিবেকানন্দের অনুগামী আয়ারল্যান্ডের অধিবাসী নিবেদিতা সেদিনের গান শুনে সরলাকে বলেছিলেন, 'আর কিছু না, শুধু যদি জাতীয় গান গেয়ে মেয়েরা ঘুরে বেড়ায় নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে, সমস্ত দেশকে জাগাতে পারবে।' কিন্তু সরলা নিজে সশস্ত্রবাদীদের সঙ্গে মিশে যেতে পারেননি। তিনি চেয়েছিলেন যুবকদের গড়ে তুলতে, তাদের ধমনীতে শক্তি সঞ্চার করতে। খুন বা স্বদেশি ডাকাতিতে তাঁর সমর্থন ছিল না। বরদা থেকে অরবিন্দ ঘোষের চিঠি নিয়ে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এসেছিলেন সরলার কাছে, বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি স্থাপনের উদ্দেশ্য। সরলা তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে রাজি হলেন। যতীন্দ্রনাথ ঘোষের নেতৃত্বে প্রকাশ্যে সার্কুলার রোডে ভারত-উদ্ধার দল স্থাপিত হল। যতীন্দ্রনাথ সেখানেই থাকতেন—ও দলে দলে যুবকেরা এসে তাদের ঘোড়ায় চড়া, ব্যায়াম, কসরত প্রভৃতি শেখাতেন। কিন্তু সরলার সঙ্গে তাঁদের মতভেদ হল, 'তখন শুনলুম তাদের দল থেকে ডাকাতি চালানোর হুকুম বেরিয়েছে।' তিনি বিশ্বাস করতে না পেরে পুনায় গিয়ে লোকমান্য টিলকের সঙ্গে বহু কষ্টে দেখা করে জানতে পারলেন, ডাকাতিতে টিলকেরও সম্মতি নেই। তখন তিনি দল থেকে সরে আসেন। মতান্তরে তাঁর বিরুদ্ধে নানারকম অভিযোগ এনে তাঁকে দল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ না থাকলেও সেবামূলক কাজের সঙ্গে সরলা সবসময় যুক্ত ছিলেন।

বাংলার মেয়েরা এ সময় অভূতপূর্ব স্বদেশিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। অন্যান্য ক্ষেত্রে যে তাঁরা খুব এগিয়ে ছিলেন তা নয়, কিন্তু দেশের কাজে সাড়া দিয়েছিলেন সবাই। বেশির ভাগ এসেছিলেন সাধারণ সমাজ থেকে। তুলনায় উচ্চবিত্ত সম্ভ্রান্ত মহিলাদের সংখ্যা কম। সরলা অবশ্য ব্যতিক্রম। তাঁর 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' ভরে উঠল স্বদেশি জিনিসে। সরলা 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' খুলেছিলেন স্বদেশি জিনিস ব্যবহার ও প্রচার করবার জন্যে। তিনি অবাক হয়ে দেখেছিলেন, সে সময় যে-সমস্ত জাপানিরা সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে আসতেন তাঁরা নিজেদের দেশ থেকে যাবতীয় সব কিছু জিনিস আনতেন, এমনকী চিঠি লেখার কাগজ পর্যন্ত। একদিন সরলা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এত কাগজ এনেছেন কেন?' তাঁরা জানালেন, ভারতে কিছুই পাওয়া যায় না জেনে তাঁদের বাড়ির মেয়েরা চিঠি লেখার কাগজ দিয়েছেন যাতে তাঁদের চিঠি লেখা বন্ধ না হয়ে যায়। আশ্চর্য! সরলা ভাবেন, জাপান জানে পরাধীন অসভ্য ভারতবর্ষ—ভারতবর্ষের লোক কিছুই করতে পারে না, করতে জানে না। তিনি স্বদেশি জিনিস ব্যবহার শুরু করলেন। 'ভারতী'র মলাট দিলেন দেশি হলুদ রঙের তুলট কাগজে। খুললেন 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'। যোগেশ চৌধুরী প্রমুখ কয়েকজনের সাহায্যে বউবাজারেও খুললেন 'স্বদেশী স্টোর্স'। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের আগেই তাঁরা স্বদেশি দোকান খুলেছিলেন। 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এ বিক্রি হত

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে সংগ্রহ করা, শুধু মেয়েদের জন্যে, স্বদেশি কাপড় ও জিনিসপত্র। হিরণ্ময়ীর বিধবা শিল্পাশ্রমের সদস্যদের হাতের কাজও এখানে বিক্রি করা হত। কোনও উৎসবে যেতে হলে সরলা আপাদমস্তক স্বদেশি বেশভূষায় সেজে, 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' পরিচালনা উপলক্ষে পাওয়া স্বদেশি মেডেলটি দিয়ে তৈরি করা ব্রোচ বুকের কাছে লাগিয়ে যেতেন। অপরূপ বেশে তাঁর অনুপম লাবণ্য সকলকেই মুগ্ধ করত। দেশের লোকের মনে স্বদেশিয়ানা আনবার জন্যে বাঙালি মেয়েদের মধ্যে টিপ পরা, আলতা পরার চল শুরু করলেন। দেশের পালাপার্বণগুলোকে সাহেবি রূপ দিয়ে সবার গ্রহণযোগ্য করে তুললেন। বসন্তোৎসব, পৌষপার্বণ নতুন রূপে নতুন করে ফিরিয়ে আনলেন। এ সময় তাঁর 'ভারতী' আর সরযূবালা দত্তের 'ভারত-মহিলা' পত্রিকা ভার নিয়েছিল জাতীয়তাবোধে মেয়েদের উদ্বুদ্ধ করবার। তাঁরা সফল হয়েছিলেন নিশ্চয়, নইলে পরে স্বদেশি-আন্দোলনে মেয়েরা এমন গৌরবময় ভূমিকা নেবেন কেন? নাটোরের মহারানি সিদ্ধেশ্বরী দেবী, অবলা বসু, সরোজিনী বসু বা 'বঙ্গলক্ষ্মী', লীলাবতী দেবী, দেশবন্ধুর বোন ঊর্মিলা দেবী, শ্রীঅরবিন্দের ভাইঝি লতিকা ঘোষ—সকলেই এগিয়ে এসেছিলেন স্বরাজের শপথ নিয়ে। মেয়েদের দিক থেকে প্রথম আন্দোলন পরিচালনা করেন সরোজকুমারী গুপ্তা। বিখ্যাত দেশের কর্মী পরিচালনা করে তাদের সজাগ করে তুললেন প্রভাবতী দাসগুপ্তা, সরোজিনী বসু প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যতদিন 'বন্দেমাতরম' ধ্বনির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত না হয় ততদিন তিনি সোনার বালা পরবেন না। আসলে এই স্বদেশি আন্দোলনের যুগে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে বহু নারী নীরবে সকলের অলক্ষ্যে আন্দোলনকে সাহায্য করে গেছেন। একেবারে সামনে এসে প্রত্যক্ষভাবে কাজ না করলেও তাঁদের এই নীরব দানের মূল্য কম ছিল না। তবে এমন ঘটনার সময়ে সরলা আর বাংলার প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে ছিলেন না। চলে গিয়েছিলেন পঞ্জাবে। হায়দরাবাদের সরোজিনী নাইডু, মাদ্রাজের মাজিস্ট্রেট যতীন্দ্রনাথ রায়ের স্ত্রী বিভাবতীও প্রবাসে কিছু কিছু আলোড়ন জাগিয়েছিলেন। সরলা ঝড় তুলেছিলেন পঞ্জাবে। লাহোরে প্রায় পাঁচশ জন বাঙালি যুবক সংগ্রহ করে তিনি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বাঙালি যুবকেরা সৈন্যবিভাগে যোগ দিতে পারেননি। ১৯১৭ সালে সেই বাধা দূর হলে সরলা এবং আরও অন্যান্য স্বদেশি নেতারা বাঙালি যুবকদের দলে দলে সৈন্যদলে ভর্তি হবার জন্য বক্তৃতা দিতেন। সরলা সেই সঙ্গে যে যুদ্ধসংগীত লিখেছিলেন সেগুলি গাওয়াও হত। মনে হয়, তিনি বাঙালি যুবকদের মনে সাহস সঞ্চার করবার জন্যেই সৈনিকবৃত্তি গ্রহণে উৎসাহ দিতেন। কর্তব্যের তাগিদে এই সৈনিকরাই উত্তরে মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনের সহায় হবে।

রামভজের সঙ্গে বিয়ের পরে সরলার কর্মজীবন শুরু হয় পঞ্জাবে। রাজনৈতিক জীবনে রামভজ ছিলেন সরলার মতোই তেজস্বী ও চরমপন্থী। বাংলার বাঘিনী যেন খুঁজে পেল যথার্থ দোসর। তবে পঞ্জাবে সরলা শুরু করলেন সমাজ সেবা। 'অভিনিবিষ্ট' আর 'বিধবা-শিল্পাশ্রমে'র মধ্যে যে অভাব ছিল সেটা পূরণ করবার জন্য তিনি স্থাপন করলেন 'ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল'। সর্বভারতীয় নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে এই প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। মেয়েদের শিক্ষা দেওয়াই ছিল এর মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই, প্রথমে এলাহাবাদে, পরে লাহোরে, অমৃতসর, দিল্লি, করাচি, হায়দরাবাদ, কানপুর, বাঁকীপুর, হাজারীবাগ, মেদিনীপুর, কলকাতা ও আরও কয়েক জায়গায় এর শাখা খোলা হয়। কলকাতা শাখার ভার ছিল কৃষ্ণভাবিনী দাসের উপর। কয়েক বছরের মধ্যে তিনি ও তাঁর সহকর্মিণীরা কলকাতার প্রায় তিন হাজার অন্তঃপুরবাসিনীকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। যে সব পরিবারের মেয়েদের কাছে শিক্ষা পৌঁছতে পারেনি নানা বাধা ও বিধিনিষেধের জন্যে, সেখানেও শিক্ষার আলো পৌঁছে দিলেন কৃষ্ণভাবিনী। অতি সাধারণ পোশাকে, থান পরে অতি-পরিচিত বিধবা নারীদের একজন হয়ে

তিনি সে সব বাড়িতে প্রবেশ করতেন। তাঁর এই চেষ্টা সফল হয়েছিল। বিধবা হবার পর সরলা আবার কলকাতায় ফিরে এসে মহামণ্ডলেরই আরেকটা শাখা স্থাপন করেন 'ভারত স্ত্রীশিক্ষা সদন'। এঁদের চেষ্টায় কলকাতায় পর্দাপ্রথা খুব দ্রুত উঠে যায়। মেয়েদের স্কুলের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রীরাও দলে দলে আসে স্কুলে ভর্তি হতে। শিক্ষার সুবিধের জন্যে মহামণ্ডল থেকে এ সময় বেবিক্রেস আর মেয়েদের ছাত্রীনিবাস খোলার ব্যবস্থাও হয়েছিল।

পঞ্জাবে রামভজের উপযুক্ত সহধর্মিণী হয়ে সরলা 'হিন্দুস্থান' পত্রিকাটির ভার নেন। শোনা যায়, লাহোরের চিফ কোর্ট আদেশ দিয়েছিল যে, পত্রিকার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী হিসেবে রামভজের নাম থাকলে তাঁর ওকালতির লাইসেন্স বাতিল করে দেওয়া হবে। সরলা প্রস্তাব করলেন পত্রিকায় তাঁর নাম দেওয়া হোক। তাই হল। 'হিন্দুস্থানে'র একটা ইংরেজি সংস্করণ বার করে সরলা তাতে জ্বালাময়ী রচনা প্রকাশ করতে থাকেন। রৌলট অ্যাক্ট চালু হলে 'হিন্দুস্থান' বন্ধ করে প্রেস বাজেয়াপ্ত করা হল, রামভজ নির্বাসিত হলেন। একাকিনী সরলা শক্ত হাতে হাল ধরে পঞ্জাবের বিদ্রোহকে নিয়ে গেলেন পরিণতির পথে। পঞ্জাবের ব্রিটিশ অত্যাচার চরমে উঠল জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডে। এ সময় সরলাকেও গ্রেপ্তারের কথা হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

এরপর থেকে সরলা মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের অতিমাত্রায় সমর্থক হয়ে পড়লেন। তাই চরকা-খদ্দর প্রবর্তনেও সরলা গান্ধীজীর ডান হাত। তাঁর একমাত্র পুত্র দীপকের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর নাতনি রাধার বিয়ে হয়েছিল। এই বিবাহ দুটি ভিন্ন পারিবারিক ধারার যোগ ঘটাল। পণ্ডিত রামভজ অবশ্য অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করেননি। এই কারণে দাম্পত্য জীবনে কিছুটা মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল। সরলা কিছুদিনের জন্যে চলে গেলেন মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে। সমাজে হয়তো কিছুটা প্রশ্ন উঠেছিল। সরলা আর্যসমাজ কর্তৃপক্ষকে প্রশ্ন করেন, শাস্ত্রে পুরুষের বানপ্রস্থ অবলম্বনের যে বিধি আছে—নারীর কি সেই অধিকার নেই? তাঁরা বললেন, নারীরও বাধা নেই। সরলা রামভজের অনুমতি নিয়েই আবার চলে গেলেন হৃষীকেশে। কিন্তু স্বামীর অসুস্থতার খবর পেয়ে সেবাপরায়ণা সরলা আবার সংসারে ফিরে আসেন। স্বামীর মৃত্যুর পরেও সরলাকে দেখা যায় সমাজসেবিকারূপে। ১৯২৫ সালে তিনি নিখিল ভারত সামাজিক মহাসমিতির সভানেত্রী হয়েছিলেন। কিন্তু ক্রমেই অধ্যাত্ম জীবনের প্রতি টান অনুভব করায় সরলা সমাজসেবা প্রভৃতি কাজ থেকেও নিজেকে গুটিয়ে নিলেন। অবশেষে হাওড়ার আচার্য বিনয়কৃষ্ণ দেবশর্মার কাছে উপনিষদের ব্যাখ্যা শুনে তাঁকেই গুরু পদে বরণ করলেন,

'গুরো!
চৈতন্যে কর সম্প্রদান!
গোত্রান্তর কর মোরে
হে মঙ্গলনিদান।'

সরলার বহুমুখী প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও বাঙালির কাছে তাঁর প্রথম জীবনের তেজস্বিনী মূর্তিটিই বেশি আদর পেয়েছে।

মহর্ষি ভবনে যখন গুণবতী মেয়েদের ভিড়, তখন পাশের বৈঠকখানাবাড়িতেও দুটি পিঠোপিঠি বোন বড় হয়ে উঠেছেন। তাঁরা গুণেন্দ্রনাথের মেয়ে বিনয়িনী ও সুনয়নী। এখন আর সৌদামিনীর দুঃখ নেই। তাঁর তিন ছেলে বড় হয়েছেন। অবন-গগনের ছবি ফিরিয়ে এনেছে

দেশের সম্মান। অবশ্য তার অনেক আগেই বেজেছিল বিনয়িনীর বিয়ের সানাই, বড় করুণ সুরে। প্রথমে ঠিক হয়েছিল খুব ধুমধাম করে বিয়ে হবে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। গুণেন্দ্রনাথের ছত্রিশ বছরের জীবন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। 'কেউ জানলে না কিসের দুর্দমনীয় বেগ তাঁকে এমন নির্মমভাবে আত্মহত্যার পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।' এ উক্তি গুণেন্দ্র-দৌহিত্রী প্রতিমার। মায়ের অভিমান ও বেদনার স্পর্শ পেয়েছিলেন তিনি, নয়তো মাতামহকে দেখবার কোনও সুযোগই তাঁর হয়নি। মেয়েকে বিনয়িনী শুনিয়েছিলেন আরও একটি গল্প। বোটে বেড়াতে যাবার রেওয়াজ ছিল বড় ঘরের মেয়েদের। একবার গিয়েছিলেন বাবা-মার সঙ্গে ছোট-ছোট দুটি বোন। তখনও বোটে যাওয়াটাই পর্দা থেকে বেরোবার একমাত্র সুযোগ মেয়েদের। মাস খানেক পরে বাড়ি ফেরা 'কোথায় গেল সেই মুক্ত আকাশ আর বাধাহীন গঙ্গার প্রবাহ। বোটের জীবনটা সবসুদ্ধ যেন বৃহৎ বনেদি ভিটের অন্দরের অন্তরালে মিলিয়ে গেল।' এ অনুভব প্রতিমার নয়, বিনয়িনীর। গুণেন্দ্রের আকস্মিক মৃত্যুর পর খুব সাধারণভাবে বিয়ে হল বিনয়িনীর। পূর্ব-নির্ধারিত পাত্র শেষেন্দ্রভূষণের সঙ্গেই।

মসৃণভাবে দিন কেটে গিয়েছে ঘর-সংসার জপ-তপ আর রান্না-বান্না নিয়ে। ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা সবাই বিকেলে গা ধুয়ে পছন্দমতো খোঁপা বাঁধতেন। তারপর শিউলি বা নটকারাঙ্গা শাড়ি পরতেন সুন্দর করে। রূপটান করে মোমরাট, কাজল প্রভৃতি দিয়ে প্রসাধন সেরে আসতেন কর্তাঠাকরুনকে সাজ দেখাতে। তিনি প্রত্যেকের খোঁপায় জড়িয়ে দিতেন ফুলের মালা। এ নিয়ম অন্যান্য বাড়িতেও ছিল। বিনয়িনী খোঁপা বাঁধতে পারতেন সুন্দর করে। বোনঝি-ভাইঝিদের চুলে ফুটে উঠত নানানরকম ছাঁদ—বেনেবাগান, মনভোলানো, ফাঁশজাল, কলকা, বিবিয়ানা আরও কত কী! হয়তো বিনয়িনী চিরকাল এভাবে সবার চোখের আড়ালে থেকে যেতেন যদি না তাঁর নিজের লেখা আত্মজীবনীর পাণ্ডুলিপিটি অকস্মাৎ পাওয়া যেত। এটি এখনও অপ্রকাশিত। যেমন অদেখা রয়ে গিয়েছে তাঁর আঁকা ছবিগুলি। সুনয়নীর মতো না হলেও বিনয়িনীও যে ছবি আঁকতেন, অনেকেই তা জানে না। তিনি শুধু যে ছবি আঁকতেন তা নয়। ঘরোয়া আসরে অভিনয়ও করতেন। 'রত্নাবলী' নাটকে একবার রাজা সেজেছিলেন।

বিনয়িনী তাঁর জীবনী, যার নাম তিনি দিয়েছেন 'কাহিনী', লেখা শুরু করেন পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে। খাতার ওপরে ১৯১৬-১৭ লেখা থাকলেও তিনি নিজের 'কাহিনী' শুরু করেন আরও পরে। ১২৮০ থেকে ১৩৩০-এর জীবনবৃত্তে তিনি 'কাহিনী' লেখেন ১৩২৫ সালে, মৃত্যুর পাঁচ বছর আগে। এ বয়সে তাঁর নিজের কথা বলতে ইচ্ছে করল কেন তা তিনি নিজেই জানেন না। ঠাকুরবাড়িতে আত্মকাহিনী লেখার রেওয়াজ বহুদিনকার। মহর্ষিভবনে পুরুষেরা তো বটেই, মেয়েরাও আত্মকথা লিখতে এগিয়ে এসেছিলেন। অবশ্য আত্মজীবনী রচনায় মেয়েদের পথ দেখিয়েছিলেন রাসসুন্দরী দেবী, তিনি ঠাকুরবাড়ির কেউ নন। প্রমথ চৌধুরীর মনে হয়েছিল, 'বাংলা ভাষায় আত্মজীবনী লেখেন শুধু মেয়েরা।' বলা বাহুল্য এই মন্তব্যের কারণও রাসসুন্দরী। কেশবচন্দ্র সেনের মা সারদাসুন্দরী দেবীর আত্মচরিত আর একখানি উল্লেখযোগ্য বই। বিনয়িনী 'কাহিনী' লেখার আগে সৌদামিনীর 'পিতৃস্মৃতি', স্বর্ণকুমারীর 'সেকেলে কথা' ও আরও অনেক আত্মজীবনী ছাপা হয়েছে। এদের যে কোনও একটা বিনয়িনীর মনে আগ্রহ জাগাতে পারে। তবে লেখবার সময় তিনি কাউকে অনুকরণ না করে নিজের মনে নিজের কথা বলে গিয়েছেন।

নিয়মিত লেখাপড়ার চর্চা না থাকলেও বিনয়িনীর সাদামাঠা আটপৌরে ধরনের লেখার হাতটি ভাল—কৃত্রিমতার স্পর্শ নেই। যেন আপন মনে আয়নায় নিজের মুখ দেখা! সহজ, স্বচ্ছ, স্বচ্ছন্দ। তাঁদের বাড়িতেও লেখাপড়া শেখাতে আসতেন বিদেশিনী শিক্ষিকা 'ঘড়িতে যেই দুটো বাজত মিশনারি মেম স্মিথের গাড়ি এসে যেত। তার দুই খ্রিস্টানি টিচারও এসে উপস্থিত হতেন। বউদিদিরা সব উলের গাদা নিয়ে বসে যেতেন। ইংরেজি নম্বর এক রয়েল রিডার কেউ কেউ পড়তেন। আমিও ফার্স্ট বুক নিয়ে এ বি সি পড়তে বসে যেতেম। খালি মনে হত এরা বিদায়

হলে বাঁচি। এক ঘণ্টা পরেই তাদের চলে যাবার সময় হত। মেম একটু খ্রিস্টের কথা বলে চলে গেলেন। আমার ইংরেজি পড়া একটুও ভাল লাগত না বরং খ্রিস্টের গল্প লাগত ভাল।'

অনেক তথ্য আছে, তবে সব ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে তাঁর ধর্মপরায়ণা ভক্তিনত রূপটি। ধর্মচেতনার উন্মেষ হয়েছিল শৈশবেই। মায়ের কথামতো ভোরবেলায় উঠে বাগান থেকে ফুল কুড়িয়ে আনতে হত তাঁদের দু বোনকে। কার্তিক মাসে হত শ্রীধর ঠাকুরের পুজো। ভোর ছ'টার মধ্যে ফুল নিয়ে তাঁরা হাজির হতেন ঠাকুরঘরে। বড় পিসি কাদম্বিনী নানাভাবে ঠাকুর সাজাতেন। কোনওদিন হলদে কলকে, কোনওদিন রক্তকরবী, কোনওদিন সাদা রজনীগন্ধা দিয়ে সাজিয়ে ভাইঝিদের ডেকে দেখাতেন। পাঁচ নম্বর বাড়ির এই ছবিটি বিশেষ করে কাদম্বিনীকে আমরা পেয়েছি বিনয়িনীর ডায়রি 'কাহিনী' থেকেই। তাতে আরও আছে, 'বাড়িতে সকাল ৯টায় অক্ষয়বাবুর ব্রহ্মসঙ্গীত হত। মা পিসিমারা অন্দরে বসে গান শুনতেন। বিকেলে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হত। সন্ধ্যায় হরিনাম সংকীর্তন।' দুটি বাড়ির মেয়েদের জীবনে এই যে আকাশপাতাল বিভেদ সেটা বেশি করে ধরা পড়ে ইন্দিরা-প্রতিভা-প্রজ্ঞা-সুষমার জীবনযাত্রার সঙ্গে বিনয়িনী-সুনয়নীর জীবনযাত্রার তুলনা করলে। তাঁর শ্বশুরবাড়ি অর্থাৎ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাড়ির কথাও 'কাহিনী'তে আছে। সেখানে দুর্গোৎসব হত ঘটা করে। 'সন্ধ্যায় আরতি আরম্ভ হল, চারজন ব্রাহ্মণব্রতী এসে বসলেন। দুইজন চণ্ডীপাঠ করতে আরম্ভ করলেন আর একজন পুরোহিত ঠাকুরকে পুঁথি দেখে মন্ত্র বলে দিতে লাগলেন। সেই আশী বৎসরের পুরোহিত ভক্তিপূর্ণ হয়ে মাকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালেন। রূপোর প্রদীপদানীতে ১০০৮ ঘৃত-প্রদীপ দিয়ে রূপোর ঘণ্টা বাজিয়ে আরতি আরম্ভ হল। প্রতিমার দু'পাশে মস্ত দুইটা পিতলের প্রদীপ, যার বুক পর্যন্ত উজ্জ্বল। প্রদীপে একসের ঘৃত ধরে। এইরূপ প্রদীপ তিন দিন তিন রাত জ্বলতে থাকল।' নতুন উদ্যমের পাশে পুরনো নিস্তরঙ্গ জীবনের এমন সহাবস্থান আর দেখা যাবে না।

বিনয়িনীর লেখা সর্বত্রই আশ্চর্য রকমের সাবলীল। স্বামীর মৃত্যুর কথাও তিনি ব্যক্ত করেছেন শান্তভাবে। পড়তে পড়তেই বোঝা যায় বিনয়িনী লিখেছেন একেবারে নিজের জন্যে। আর কারও জন্যে নয়। একটু তাঁকে অনুসরণ করা যাক:

'আজ আমার সর্বনাশের দিন। আগের দিন থেকে তাঁর অসুখ বেড়েছে। আমাকে কোথাও উঠে যেতে বারণ করলেন। .....পরদিন বিকেল ছ'টার সময় অকস্মাৎ তিনি চলে গেলেন। হাতে আমার হাত রেখে কি যেন বলে গেলেন সেটি আমি অনেক করেও বুঝতে পারলাম না। জীবনের সমস্ত সুখ এই সঙ্গে শেষ হল। ২২ সালের ২রা বৈশাখ তিনি চলে গেলেন। এক শোকে হৃদয় কাঁদছে। ২০ দিন যেতে না যেতে তিনি আমায় ফেলে চলে যাচ্ছেন। ...তখন আমার যে ধৈর্যগুণ এল, এখন মনে হলে আশ্চর্য হয়ে থাকি। মনে হল এই যে যাওয়া আসা এ তো কতকগুলো তৃণগুচ্ছ নদীর ঢেউয়ে কখনও একত্র হচ্ছে আবার সরে যাচ্ছে। এর জন্যে এত কাতরতা হচ্ছে কেন? কিন্তু অন্তরে বেশ জ্ঞানলাভ করলাম। তখন তাঁকে চিতাশয্যার বেশভূষা করে দিলাম।'

একজন সাধারণ নারীও যে শোকের সময় মাঝে মাঝে নির্বেদ বৈরাগ্যের সন্ধান পান তার দ্বিতীয় প্রমাণ বিনয়িনী। এর আগে পুত্রশোকে আচ্ছন্ন প্রফুল্লময়ীও দুঃখের মধ্যে হারানিধি সন্তানের বিচ্ছেদ ভুলতে পেরেছিলেন। অবশ্য এরপরে বিনয়িনীর ডায়রির অনেক পাতা ভরে আছে ভিন্ন এক অভিজ্ঞতায়, 'বৈশাখে পতি পূজার শেষ হল কিন্তু হৃদয়ের অনন্ত পতি, তিনি জাগ্রত হলেন। কিরূপে না সর্বদাই আমি তাঁকে দেখতে পেতে লাগলাম তখন মনে মনে কেবল জগৎপতিকে ডাকতাম আর বলতাম, এ কী হল আমার। হরি কী করলে, শেষে কী আমার মাথা খারাপ হল।' বিনয়নীর মানসিক পরিবর্তন লক্ষ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথও। মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন দেখা হয়েছিল কবির সঙ্গে। বিনয়িনীর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তিনি প্রতিমাকে সে কথাই লিখেছেন, '...সেদিন তোমার মা যখন শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন

তখন তাঁর মধ্যে এমন একটি গভীরতা দেখেছিলুম, সাধনার এমন একটি সহজ সুন্দর রূপ তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল যে আমি আশ্চর্য হয়েছিলুম। ...এইবার এইদিক দিয়ে বিনয়িনী আমার খুব কাছে এসেছিলেন। এক একদিন আমার কাছে এসে তিনি যখন তাঁর প্রাণের গভীর কথাগুলি বলতেন আমার ভারি তৃপ্তি হত। অন্তরে তিনি এমন একটি মুক্তি পেয়েছিলেন যে, মৃত্যু তাঁর কাছে কিছুই নয়। ভিতরে ভিতরে তিনি সংসার পার হয়ে গিয়েছিলেন। ...তিনি যে একান্ত উপলব্ধির মধ্যে নিয়ত নিমগ্ন হয়েছিলেন তাই দেখে আমার নিজের মনের মধ্যে ভারি শান্তি বোধ হত। ...অন্তরের মধ্যে গভীর শান্তি লাভ করে তবে তিনি যে সুখ দুঃখের পারে চলে গেলেন এ কম সৌভাগ্যের কথা নয়।'

বিনয়িনীর আত্মকথার আরও একটি গুরুত্ব আছে। অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া', 'জোড়াসাঁকোর ধারে' এবং 'আপনকথা' ও প্রতিমা ঠাকুরের 'স্মৃতিচিত্র' লেখার প্রেরণা জুগিয়েছিল বিনয়িনীর খাতাটি। কেউ একজন পুরনো কথা বলতে বসলে সকলেরই স্মৃতি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এখানে সেই পুরনো কথা বলবার দায়িত্ব প্রথমে নিয়েছিলেন বিনয়িনী।

দিদির মতো সুনয়নীও ঘর-সংসার, ঠাকুর-দেবতা নিয়ে থাকতে ভালবাসতেন। তাঁর পুত্রবধূ মণিমালা দেখেছেন, 'ভোরবেলায় স্নানান্তে একটি গরদের কাপড় পরে আমার শ্বশুরের সঙ্গে পূজার আসনে বসতেন। নিত্য হোম করতেন। সামনে চন্দন দিয়ে দুটি চরণ এঁকে তার উপর রাশিকৃত ফুল সাজাতেন। হোমান্তে স্বামীকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে তিনি নিত্য কাজ ও ছবি আঁকা আরম্ভ করতেন। নীচে খাবার ঘরে একটি বৃহৎ তক্তাপোশের একধারে তুলি, রাশিকৃত কাগজ, রং সাজানো থাকত, অন্য ধারে তাঁর হিসেবের বাক্স খাতা সরঞ্জাম।' তিনি আঁকতেন রাধাকৃষ্ণ, হরপার্বতী, বালগোপাল, ননীচোরা, কৃষ্ণযশোদার ছবি। কী করে ছবি আঁকতে হয় সুনয়নী শেখেননি। দুই দাদাকে নিবিষ্ট মনে দক্ষিণের বারান্দায় বসে ছবি আঁকতে দেখে-দেখে একটু বেশি বয়সে আপনমনেই ছবি আঁকা শুরু করেছিলেন। পূর্ণিমা অবশ্য স্মৃতিকথা লেখার সময় জানিয়েছেন, 'ছোট পিসি নিজের বাড়িতে গিয়ে ছবি আঁকতে শুরু করেন। মাঝে মাঝে বাবাকে দেখিয়ে নিয়ে যেতেন। দিন কতক অসিত হালদারের কাছে শিখেছিলেন।' ছবি আঁকা তো নয়, আঁকা-আঁকা খেলা। আগে থেকে কিছু না ভেবে, তুলি বুলিয়ে জলে ডুবিয়ে ডুবিয়ে ধোয়া—তারই মধ্যে কখনও আভাস এল নাদুসনুদুস বালগোপাল কেষ্টঠাকুরের, কখনও লাজুকলতা কনে বউয়ের হেসে ওঠা চোখ দুটির—আগে থেকে কিচ্ছু বোঝা যায় না। কিন্তু শিল্পী দাদাদের কোনও প্রভাব সুনয়নীর ছবিতে নেই। আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার নব উদ্বোধনের যুগে তিন ভাইবোন বেছে নিয়েছিলেন তিনটি পথ। অবনীন্দ্র গ্রহণ করলেন পারশিয়ান ও মোগল টেকনিক। গগনেন্দ্র নিলেন জাপানি ও কিউবিস্টিক ধারা আর সুনয়নী একেবারে জনসাধারণের আর্ট অর্থাৎ পটশিল্পের ভিত্তির ওপর আঁকলেন তাঁর একান্ত নিজস্ব ছবি। পটের ছবির সবচেয়ে বড় আকর্ষণ টানা-টানা দীঘল দুটি কালো চোখের গহিন ছায়ায়। সুনয়নীর ছবিতেও স্বভাবশিল্পী পটুয়াদের আঁকা চোখদুটি চোখে পড়ে। এ ধরনের চোখ আঁকার ব্যাপারে সুনয়নী যামিনী রায়েরও পূর্ববর্তিনী।

সুনয়নী ছবি আঁকতেন আপন খেয়ালে। তিনিই বাঙালি মহিলা চিত্রশিল্পীদের পথিকৃৎ। তখনকার দিনে যে মেয়েরা ছবি আঁকত না তা নয়। বিশেষ করে যাঁরা পশ্চিমের 'ফ্যাশান দুরস্ত' ছিলেন তাঁদের তো কথাই নেই। ঘোড়ায় চড়া, ইংরেজিতে কথা বলা, পিয়ানো বাজানোর মতোই ছবি আঁকাটাও ছিল তাঁদের গুণের নিদর্শন। ঠাকুরবাড়ির ট্র্যাডিশন ভেঙে হেমেন্দ্রনাথও তাঁর স্ত্রী ও মেয়েদের ছবি আঁকা শিখিয়েছিলেন। প্রতিভার আঁকা দু-একটা ছবি ছাপা হয়েছিল

'পুণ্য'। প্রথম আঁকা দু-তিনটি পোর্ট্রেট বেশ ভাল হয়েছিল। সুতরাং ছবি আঁকার চেষ্টা যে সুনয়নীর পক্ষে খুব নতুন তা নয়। নতুন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির নতুনত্বে। এতদিন যাঁরা ছবি এঁকেছেন তাঁরা আঁকার চেয়ে বেশি ওপরে ওঠেননি। মনুষ্য বা প্রতিকৃতি যাই হোক না কেন তারই অনুকরণ করেছেন তাঁরা। দীপময়ী, প্রতিমা, প্রজ্ঞা সম্বন্ধেও একথাই খাটে। কিন্তু সুনয়নী যা দেখলেন তাই আঁকলেন না। ছবির সঙ্গে মিশে রইল এক অধরা সৌন্দর্য। তাঁর ছবিতেই প্রথম দেখা দিল স্বকীয়তা। প্রথম প্রথম তিনি ছবি নিয়ে দেখাতে যেতেন দাদাদের।

'দেখ তো দাদা কেমন হয়েছে!'

দাদারা উৎসাহ দেন। কখনও বলেন 'ভাল'। কখনও বলেন 'বাঃ'। কখনও বলেন 'এঁকে যা, জোর হবে'। সুনয়নী এঁকে চলেন। ঘর ভরে ওঠে ছবিতে। একই সঙ্গে চলে মা, ঠাকুমার মতো খাবার ঘরে খাটের ওপর বিবির মতো বসে সংসারের কাজ দেখা, হিসেব রাখা, মনের মধ্যে ছবি আসে, হাত চলে যায় তুলি আর রঙের দিকে। ভিজে কাগজে ফুটে ওঠে এক একটা আভাস। মণিমালার ভাষায়, 'এক একটি ছবিতে রং দিয়েই শুরু করতেন পরে সেটি বার-বার জলে ভিজিয়ে আনতে আমায় বলতেন। এই ভাবে জলে ভেজা পর-পর ছবিগুলি সাজিয়ে বহুক্ষণ অপলক নেত্রে চেয়ে থাকতেন। একটু মধুর হেসে বলতেন, 'দেখ দেখি এই জলের মধ্যে কী ফুটে উঠছে।' আমি কিছুই দেখতে পেতাম না, কিন্তু তিনি সহজেই বলতেন 'এরই মধ্যে বর-কনের মুখ দেখতে পাচ্ছি।' হালকা রং দিয়ে ফ্ল্যাট ব্রাশ দিয়ে সেই অপরূপ যুগল মূর্তির আবির্ভাব হত। আবার কখনও রং বুলিয়ে ফেলে রাখতেন কাগজগুলি, বারে বারে ধুয়ে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকতেন পরে তারি হালকা নীল রঙের মধ্যে অপরূপ কৃষ্ণমূর্তি ফুটে উঠত।' এর মধ্যে একটা ছবি 'অর্ধনারীশ্বর'। দেখে খুশি হয়ে উঠলেন গগনেন্দ্র। অবনীন্দ্র তখন সরকারি আর্ট কলেজের সঙ্গে যুক্ত। তাঁকে বললেন, 'ওকে একটা সার্টিফিকেট লিখে দাও।'

অবনীন্দ্র অনেকদিন থেকেই লক্ষ করছিলেন সুনয়নীর ছবি। এবার বললেন, 'ও যে ধারার ছবি আঁকছে তার জন্যে আমার আর সার্টিফিকেট লিখে দিতে হবে না। পরে দেশের লোকের কাছ থেকে ও নিজেই সার্টিফিকেট আদায় করে নেবে।'

সত্যিই নিয়েছিলেন সুনয়নী। দেশের সম্মান, বিদেশের সম্মান সবই পেয়েছিলেন। প্রখ্যাত ভাস্কর মীরা মুখোপাধ্যায় একদিন সুনয়নীর আঁকা ছবিগুলি দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। দীর্ঘ তেত্রিশ বছর পরেও সেদিনের সেই অভিজ্ঞতার কথা তিনি ভোলেননি। বলেছিলেন, 'She open our eyes to a world that is simple and innocent. This world of innocence is misterious in a strange way. Today in our world it will be very difficult to find an artist like Sunayani Devi.' একথা বলেও তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, '...It is sorrow that no one will know because the woman and the matriancle in her subdued the artist in Sunayani.' বাস্তবিকই তাঁর জীবন ছিল সহজ ও অনাড়ম্বর।

একান্ন ঘরে গিন্নি ছিলেন তিনি। বিয়ে হয়েছিল সেই বিখ্যাত চাটুজ্যে পরিবারে। যেখানে দুই বউ হয়ে গিয়েছিলেন সরোজা ও ঊষা। সুনয়নীর স্বামী রজনীমোহন অবশ্য পাঁচ নম্বর বাড়িতেই থেকেছেন অনেকদিন, বাপের বাড়িতেই শ্বশুরবাড়ি হওয়ায় সুনয়নী অন্যান্য কাজের ফাঁকে ফাঁকে পিয়ানোয় সুর তুলতেন, ডিকশনারি দেখে ইংরেজি শিখতেন এসরাজ বাজিয়ে গান করতেন। আর ছবি আঁকতেন। আরেকটা কাজেও সুনয়নীর উৎসাহ ছিল। তিনি মেয়েদের দিয়ে থিয়েটার করাতেন। মহর্ষি ভবনের মতো এ বাড়িতে স্ত্রীপুরুষ সবাই মিলে নাটক করতেন না। বরং মেয়েদের নাটকে মেয়েরাই সাজতেন পুরুষ। একবার জ্ঞানদানন্দিনীর উৎসাহে 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় হল। রাজা সাজলেন বিনয়িনী। রানি গগনেন্দ্রের স্ত্রী প্রমোদকুমারী, মন্ত্রী সমরেন্দ্রের স্ত্রী নিশিবালা, বাসবদত্তা সুনয়নী ও চূতলতিকা অবনীন্দ্রের স্ত্রী সুহাসিনী। ছোট মেয়েদের দিয়েও সুনয়নী করাতেন 'আলিবাবা', 'মৃণালিনী' বা অন্য কিছু। মৃণালিনী নাটকের কথা

লিখেছেন পূর্ণিমা। সুনয়নী নিজে অভিনয় করেননি সবাইকে গান শিখিয়েছিলেন। বইয়ের শেষে মনোরমা বিধবা হবে কিন্তু সে দৃশ্য দেখানোও যাবে না। সব মেয়ের শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়-স্বজনরা এসেছে, কাজেই 'পশুপতি মনোরমার হাত ধরে কাশী চলে গেল।' রবীন্দ্রনাথ বা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটক নিয়ে এঁরা এক্সপেরিমেন্ট করেননি, এমনকী অবনীন্দ্রনাথের লেখাও না। তাই বোঝা যায়, এ বাড়ির অন্দরমহলের সুরটি বাঁধা ছিল সাবেক কালের সঙ্গে। সুনয়নীকে ছবি আঁকায় কেউ বাধা দেয়নি। বরং তিনি উৎসাহ পেয়েছেন রজনীমোহনের কাছে। সুনয়নীর আগ্রহ দেখে তিনিই তাঁকে এনে দিয়েছিলেন রং তুলি আর কাগজ। সমাজ এখন উদার হয়েছে। আর সুনয়নীর ছবিও তো ঠাকুর দেবতার ছবি। তারই মধ্যে দেখা দিল তাঁর নিজস্ব ধারা।

সুনয়নীর ছবি বিদেশিদের চোখে পড়েছিল। সর্বপ্রথম এ ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে ওঠেন স্টেলা ক্রামরিশ। তিনি ছবির আলোচনা করলেন সেই লেখা পড়ে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন শ্রীমতী ককশীটার। লন্ডনের উইমেন্স আর্ট ক্লাব থেকে তিনি সুনয়নীর ছবির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করলেন ১৯২৭ সালে। বিদেশিরাও মুগ্ধ হল। তুলির টানে কোনও দুর্বলতা নেই। নেই সংশয়ের অবকাশ। সবচেয়ে সুন্দর দুটি চোখ। দীঘল, মায়াময়, স্বপ্নরঙিন। এ চোখ দুটি পাশ্চাত্য প্রথাসিদ্ধ নয়, তবুও ভীষণরকম বাস্তব। সম্পূর্ণ বিদেশি প্রভাবমুক্ত সুনয়নী যেন নতুন শিল্পরীতিরই প্রবর্তন করলেন। ফ্রান্স এবং জার্মানি থেকেও আহ্বান এসেছিল। একটু বিস্মিত হতে হয়, যখন দেখি সুনয়নীর ছবি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কোনও মন্তব্য করেননি। তিনিও এ সময়ে ছবি আঁকতে শুরু করেছেন। অবনীন্দ্র ও গগনেন্দ্রকে প্রচুর উৎসাহ দিচ্ছেন, সবচেয়ে বড় কথা, ছবি বা চিত্রভাষা নিয়ে ভাবছেন। তিনি কি সুনয়নীর আঁকা কোনও ছবি দেখেননি? বিশেষ করে ভারতীয় চিত্র বিষয়েও যখন তাঁর আগ্রহ ছিল। অবনীন্দ্রকে তিনি পদাবলীর রাধাকৃষ্ণ সিরিজের ছবি আঁকতে উৎসাহ দিয়েছিলেন। আর সুনয়নীর ছবির বেশ কিছু অংশ জুড়ে আছে কৃষ্ণ ও শিব। তবে সুনয়নী এত প্রদর্শনীর কথা ভাবতেন না। ভাল লাগত, মনের খেয়ালে আঁকতেন, বিলিয়ে দিতেন প্রিয়জনদের। এত খ্যাতি, এত সম্মান কিন্তু তাতে সুনয়নীর চিত্রভাষা বদলাল না। সেই রূপকথা, কথকতা, পাঁচালী, পুরাণ, মহাকাব্য, আলপনা, নকশী কাঁথা, বাউল, বোষ্টম, আরব্য-রজনীর গল্পই জুড়ে রইল তাঁর ছবির জগৎ। শিব, কৃষ্ণ, দেবীর ছবির সংখ্যাই বেশি। হরপার্বতী, অর্ধনারীশ্বর এবং রাধাকৃষ্ণেরও একাধিক ছবি আছে। অসংখ্য ছবি, কিন্তু সবার মধ্যেই যেন লৌকিক সারল্যের স্পর্শ মাখানো রয়েছে। তার মধ্যে কেউ পেয়েছেন মুঘল পেন্টিংয়ের সাদৃশ্য, কেউ খুঁজেছেন বেঙ্গল স্কুলের পূর্বাভাস। কেউ বা পেয়েছেন গুহাচিত্রের ছায়া। ভাস্কর মীরা মুখোপাধ্যায়ের মতে, সুনয়নীর ছবিতে কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, দক্ষ হাতের খেলা নেই। কোনও রঙের আড়ম্বর নেই—আছে একটা সহজ সোজা মন ও চোখের দৃষ্টি। একথা আরও মনে হয় সুনয়নীর কবিতা পড়লে। ঠাকুরবাড়ির অধিকাংশ মেয়েদের মতো তিনিও গান জানতেন, কবিতা লিখতেন। প্রকাশ্যে নয়, গোপনে। তাই ঝিনঝিনীর আত্মকাহিনীর মতোই সেগুলো আত্মগোপন করে আছে খাতার পাতায়। আমরা তাঁর পুত্রবধূ মণিমালা দেবীর সৌজন্যে দুটি কবিতা দেখেছি। দুটিতেই রয়েছে অনাবিল সারল্য। সেকেলে শিশুপাঠ্য কবিতার সঙ্গে সুনয়নীর কবিতার মিল আছে। অথচ তিনি রবীন্দ্র-কাব্যের সঙ্গে ভালমতোই পরিচিত ছিলেন। অন্যদের কবিতাও পড়েছেন। কিন্তু তাঁর নিজের কবিতা আশ্চর্যভাবে সরলীকৃত। মাটি-ছোঁয়া। প্রাণবন্ত। শৈশবচেতনায় মগ্ন। এবার কবিতা:

'সারাদিন বসি গগনের মাঝে
আলোকের খেলা করিয়া শেষ
সাঁঝের বেলায় চলে দিনমণি
ক্লান্ত শরীরে আপন দেশ।

গ্রামের পথটি আঁধারে ঢাকিল
ছেলেরা চলিল আপন ঘর
প্রদীপ জ্বালিয়া কে রেখে দিয়েছে
আলপনা দিয়ে দুয়ার পর।
বধূটি চলেছে ঘোমটায় ঢাকি
কলসি ভরিয়া লইয়া জল
সোপান বাহিয়া চলে ধীরে ধীরে
চরণে তাহার বাজিছে মল।
গগন সাজিল নতুন শোভায়
পরনে নীল শাড়ি হিরার ফুল।
জ্বলিল গগনে হীরক প্রদীপ
আর নাহি হবে পথের ভুল।
খেয়া তরীখানি বাহিয়া এখনি
আসিবে যে নেয়ে করিয়া পার
বলিবে কে যাবি আয় ত্বরা করি
নাহি কোনও ভয় ভাবনা আর।'

কিংবা,

'লিখিব লিখিব হতেছে বাসনা
কি কথা লিখিব ভেবে না পাই,
শোভিতেছে গিরি সবুজ বরন
মেঘের ভিতর দেখিতে পাই।
সারাদিন হেথা একলা বসিয়ে
চেয়ে থাকি ওই সুদূর পানে
নয়ন সমুখে রাশি রাশি মেঘ
ভাসিয়া যায় যে আপন মনে।
কোথা হতে আসে যাবে কোন দেশে
পথিকের কিছু ঠিকানা নাই।
তবুও আমার মনের কামনা
আমিও সেথায় চলিয়া যাই।'

সুনয়নীর কবিতাও যেন ছবিতে ভরা। এই প্রকৃতি, এই ছেলের দল, আলপনা আঁকা-প্রদীপ জ্বালা ঘর, ঘোমটা-টানা বধূর মল বাজিয়ে জল আনা, খেয়া তরীর মাঝির আহ্বান মেঘের মধ্যে সবুজ পাহাড়, চোখের সামনে মেঘের আনাগোনা, নিরুদ্দেশ যাত্রী পথিক—এ সবই তো ছবির উপাদান। বাংলার নিজস্ব। এই সুর, এই ভঙ্গি, এই কল্পনা, কালীঘাটের পটশিল্পীর মতো এই তুলির টানও সুনয়নীর একান্ত নিজস্ব। লীলা মজুমদার তাঁকে দেখেছিলেন কয়েকবার। সুনয়নীর নাতি মনীষীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল তাঁর মেয়ে কমলার। সেই সূত্রেই দেখেছিলেন সুনয়নীকে। 'একদিন দেখি চোখ বুজে শুয়ে শুয়ে কেবলই ডান-হাতটা কব্জি থেকে নাড়ছেন। ভারি কৌতূহল হল। জিজ্ঞাসা করাতে, চোখ খুলে, হেসে বললেন, মনে মনে ছবি আঁকছি। হাত তো আর তুলি ধরতে পারে না।'

এত বড় শিল্পী ছিলেন। স্বদেশে বিদেশে নাম ছড়িয়ে পড়েছিল তবু সুনয়নী ছিলেন নিরভিমানী। যেন আর পাঁচজন গৃহিণীর চেয়ে বেশি কিছু নয়। তাঁর পৌত্রবধূ গীতা একবার

'কলাভারতী' নামে এক চিত্রশিক্ষা কেন্দ্রের উদ্বোধনে তাঁর সঙ্গী হয়ে গিয়েছিলেন। জীবনের শেষ দিকে হলেও চিত্র শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ ছিল বলেই তিনি গীতাকে নিয়ে সেখানে গিয়েছিলেন। সুনয়নী অবশ্য দর্শক, সভাপতি ছিলেন যামিনী রায়। হঠাৎ তাঁর দিকে চোখ পড়ায় যামিনী রায় তৎক্ষণাৎ 'আসন ছেড়ে নেমে এসে তাঁর হাত ধরে নিজের আসনে নিয়ে গিয়ে বসালেন এবং বললেন, ইনি থাকতে আমাকে এই পদে বসানো হল কেন?'

এবার রবীন্দ্রনাথের মেয়েদের কথায় আসা যাক। ঠাকুরবাড়ির অন্য মেয়েরা যথেষ্ট বড় হয়েছেন, এমন সময় একে একে এলেন তিন কন্যা—মাধুরী, রেণুকা, অতসী। যেন তিনটি পদ্ম ফুলের কুঁড়ি। বড় মেয়ের নাম মাধুরীলতা, কবির বড় আদরের বেলা, বেলি বা বেলুবুড়ি। কবি বেল ফুল ভালবাসেন বলে জ্ঞানদানন্দিনী তাঁর মেয়ের নাম দিয়েছিলেন বেলা। পোশাকি নাম যে মাধুরী হল তার প্রমাণ মেলে দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'শিশুমঙ্গল' কবিতা সংকলনে। বন্ধুকন্যাকে নিয়ে একটি সনেট লিখেছিলেন তিনি। তাঁর মনে হয়েছিল 'কন্যাটি সাক্ষাৎ মাধুরী।' কবিতার শেষ কয়েকটি পঙ্ক্তি:

'হাসি ফুল্ল মৃণালিনী, 'আদুরী' বলিয়া,
সৌরভে ভরিয়া দিল চুমিয়া চুমিয়া।
আনন্দ-মদিরা করি পিয়ে আঁখি ভরি,
দুহিতার নাম মরি রাখিল 'মাধুরী'।'

ফরসা রং, অপরূপ সুন্দর মুখ। ছাব্বিশ বছরের পিতা রবীন্দ্রনাথের মনের আয়নায় ধরা পড়েছে তার বিচিত্র অভিব্যক্তি। কিছু চিঠিপত্র ও স্মৃতিকথা ছাড়াও বেলার শৈশব চিরকালের মতো ধরা আছে 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের মিনির মধ্যে।

ঠাকুরবাড়ির মেয়ে হয়েও মাধুরীলতা মানুষ হয়েছেন স্বতন্ত্র ধরনে। তা স্বতন্ত্র বইকী! সত্যেন্দ্র বা হেমেন্দ্রের মেয়েদের মতো ধরাবাঁধা বিলিতি স্কুল লোরেটোতে পড়েননি তিনি। এমনকী দেশি স্কুল বেথুনেও না। পড়েছেন বাড়িতে। তিনজন ইংরেজ শিক্ষয়িত্রী মিস পার্সন্স, মিস এলজিও ও মিস লিটেন, লরেন্স সাহেব, শিববর্ধন বিদ্যার্ণব ও হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে শিখতেন লেখাপড়া। এছাড়া পড়তেন বাবার কাছে। কবি মেয়ের শিক্ষার ব্যাপারে পরামর্শ নিয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতার। স্কুলে পাঠাননি বলে তিনি যে মাধুরীকে কিছু শেখাতে বাকি রেখেছিলেন তা নয়। দেশি-বিলিতি গান, সাহিত্য, এমনকী নার্সিং পর্যন্ত শিখিয়েছিলেন। শকুন্তলা, মনুসংহিতা, বিষ্ণুপুরাণ সবই পাঠ্য ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস তুলে দিয়েছিলেন মেয়ের হাতে। বড়দের বই বলে পড়তে বারণ করেননি।

মাত্র একত্রিশ বছর বেঁচে ছিলেন মাধুরীলতা। তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনের ইতিবৃত্ত সকলেরই জানা কারণ তিনি রবীন্দ্র-দুহিতা। পিতা রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপলব্ধি বেলাকে কোলে নিয়েই। তাই তাকে নিয়ে তাঁর কত আশা কত আশঙ্কা! কত স্বপ্ন কত সাধ! পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে বেলা সবচেয়ে প্রিয়। বাবার মন বলে বড় হয়ে বেলি খুব লক্ষ্মী মেয়ে হবে। হয়েছিলেনও তাই। একটু বড় হতেই মাধুরী বুঝেছিলেন, 'আমি যা করব আমার ভাইবোনেরা তাই দেখে দৃষ্টান্ত অবলম্বন করবে। আমি যদি ভাল না হই, তবে ওদের পক্ষে, আমার পক্ষেও মন্দ।' মাধুরী জানতেন তিনি দিদিদের মতো বিশেষ করে ইন্দিরার মতো গুণবতী নন। কিন্তু তাঁর চেষ্টা যদ্দুর পারি ভাল হব।'

শিলাইদহের একঘেয়েমিতে মৃণালিনীর মতোই হাঁপিয়ে উঠতেন মাধুরী। দিন যেন কাটে না।

ছটফট করত কে তার হিসেব রাখে। বিয়ে-শাদী স্থির হলে মেয়েকে ছয় কি সাত মাস রাখা হত অন্ধকার ঘরে। দিন-রাত আটক থাকতে থাকতে কেউ হারাত স্বাস্থ্য, কেউ হারাত জীবন, কেউ হারাত দৃষ্টিশক্তি, তবু পর্দা এতটুকু ফাঁক হত না। এদের ভাল করার সাধ্য একা রোকেয়ার ছিল না। স্বামীর স্মৃতিরক্ষার জন্যে তাঁকে স্কুলটি তুলে নিয়ে চলে আসতে হয় কলকাতায়। তবে ভাগলপুরে মেয়েদের জন্যে কিছু কাজ করতে পেরেছিলেন দীপনারায়ণ সিং-এর স্ত্রী লিলিয়ান বা লীলা। ভাগলপুরের পাশেই তো মজঃফরপুর। সেখানে দুটি সংসার-অনভিজ্ঞা কিশোরী বধূ কী করে স্কুল চালাবেন!

অনুকম্পা হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিতে চান কিন্তু মাধুরীর ধৈর্য অসাধারণ। সখিকে টেনে নিয়ে ঢাকা ঘোড়ার গাড়ি চড়ে মাধুরী বাড়ি বাড়ি ঘুরতে শুরু করলেন। মেয়েরা তখনও অসূর্যম্পশ্যা। তাদের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করবার জন্যে মাধুরীদের লুকোতে হত আড়ালে। গাড়ি থেকে নামার সময় দুদিকে চাদর ধরে আড়াল করা পথ দিয়ে তাঁরা গৃহস্থবাড়িতে ঢুকতেন। কেন এই প্রয়াস? তাঁরা তো অসূর্যম্পশ্যা নন। তবু বিশ্বাস আনতে হবে তো। খণ্ডন করতে হবে বিবিয়ানার অপবাদ। আপনজনের সামনেই তো খুলবে মনের বন্ধ দুয়ার, তাই ছোট শহরে সামাজিক রীতিকে উপেক্ষা করতেন না মাধুরী। একটু একটু করে সত্যিই দরজা খুলতে লাগল। অনুকম্পা লিখেছেন, 'মাধুরী এসে মজঃফরপুরের আবহাওয়া বদল করে দিয়েছিল, সেটা সে সঙ্গে করে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। চরিত্রের প্রভাব খুবই বড় জিনিস, তাতে বড় লোকের মেয়ে, এমন রূপ-গুণ-বিদ্যা-বুদ্ধি সে সবার সঙ্গেই সমান হয়ে আগ বাড়িয়ে মিশতে যায়, এটা আমাদের সেকালের বাঙালি অভিজাতদের জানা ছিল না।' মজঃফরপুরে বেশিদিন থাকলে মাধুরীও নিশ্চয় সেখানে একটি বিশিষ্ট জায়গা করে নিতে পারতেন, স্ফুলিঙ্গ দাবানলে পরিণত হবার আগেই পট পরিবর্তন হল। মাধুরী ফিরে এলেন কলকাতায়। শরৎকুমার ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরলে কবির ইচ্ছানুযায়ী জোড়াসাঁকোর লাল বাড়িতে বাস করে হাইকোর্টে প্র্যাকটিস শুরু করলেন। তাঁরা থাকতেন 'রবিদাদার অংশের এক তলায় কয়েকটি ঘর নিয়ে' বলেছেন দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র অজীন্দ্রনাথ।

মাধুরীর লেখাপড়ার দিকে নজর ছিল রবীন্দ্রনাথের। তাই বোধহয় লেখার হাত খুলেছিল প্রথম থেকেই। চিঠিগুলোই তার প্রমাণ। লেখাপড়ায় আগ্রহ ছিল শরৎকুমারের, তিনি খুব পড়তেন। মাধুরীর ছোট বোন মীরাও লিখেছেন, 'রাত্তিরে শুতে যাবার আগে হলঘরে বসে শরৎবাবুর সঙ্গে দিদি সংস্কৃত কাব্য নাটক পড়তেন। কখনও মেঘদূত, কখনও বা শকুন্তলা।' কবি মৃণালিনীর অসমাপ্ত রামায়ণটি মেয়ের হাতে তুলে দেন। গল্প লেখাও শুরু হয়। অনুবাদ ছাড়া তিনটে গল্পে নতুনত্ব এবং শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এখনও পর্যন্ত মাধুরীর লেখা আটটি রচনার খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। আত্মপ্রকাশে কুণ্ঠিতা মাধুরীকে লিখতে বলতেন অনুকম্পাও। তারপর বাবার উৎসাহে লিখে ফেললেন 'সুয়ো', 'মাতাশত্রু', 'সৎপাত্র', 'অনাদৃতা', 'চোর' প্রভৃতি গল্প। ছাপা হয়েছিল 'ভারতী', 'প্রবাসী' ও 'সবুজপত্রে'। খসড়া দেখে দিতেন মাধুরীর বাবা। কবি প্রশান্ত মহলানবিশকে বলেছিলেন, 'ওর ক্ষমতা ছিল—কিন্তু লিখত না।' 'মাতাশত্রু' বা 'সৎপাত্র' পড়লেই এ কথা বোঝা যাবে। তবে এসব গল্পে রবীন্দ্রনাথ কতখানি কলম চালিয়েছিলেন বলা শক্ত। হয়তো শুধু কাঠামোটাই ছিল মাধুরীর। 'গল্পগুচ্ছে'র প্রথম মুদ্রণে 'সৎপাত্র' তো রবীন্দ্রনাথের রচনা হিসেবেই ছাপা হয়। পরে কবি জানান সেটি তাঁর কন্যার লেখা। এ গল্পে নারীমাংসলোলুপ সাধুচরণের শ্বাপদবৃত্তির যে ছবি আঁকা হয়েছে তা যেমন তীব্র তেমনি ভয়াবহ। গল্পের শেষে একটি মাত্র মন্তব্য 'স্ত্রীর হিসাবে সাধুচরণের ধর্ম আর ভয় নাই'। এই গল্প এবং শেষের মন্তব্যটির অনির্বাচ্য ব্যঞ্জনায় মাধুরীর চেয়ে তাঁর বিশ্ববিখ্যাত বাবার হাতই যে বেশি ছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। 'মাতাশত্রু'ও বেশ নতুন ধরনের গল্প। এক হতভাগিনী মায়ের দুর্জয় লোভ ও তার পরিণতি নিয়ে লেখা। শরৎকুমারীর 'সোনার ঝিনুকে'র সঙ্গে এর

আশ্চর্য মিল রয়েছে। হয়তো মূল গল্পটি কবিই সুরমাকে বলেছিলেন, দুটি গল্পই অবিশ্বাস্য রকম বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা হয়েছে। মাধুরীর বন্ধু অনুরূপার সঙ্গে কবির দেখা হয়েছিল একবার। কবি অনুরূপাকে বলেছিলেন, 'তোমার দেখাদেখি ইদানীং গল্প লিখতে আরম্ভ করেছিল। বেঁচে থাকলে হয়তো তোমার মতো লিখতে পারত।'

নিতান্ত অকালে-হারানো মাধুরীলতার জীবন যেভাবে শুরু হয়েছিল সেভাবে শেষ হল না। ১৯০৯ থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত জোড়াসাঁকোতে কাটলেও তারপর শুরু হয়েছিল ছোট ছোট ব্যাপার নিয়ে ঘোর অশান্তি। কারণটা ঠিক জানা যায়নি। কবি ছিলেন বিদেশে। জোড়াসাঁকোর বাড়ি তদারকির ভার ছিল তাঁর ছোট জামাই নগেন্দ্রনাথের হাতে। শোনা যায়, ওই সময়ে শরতের ওপর নানারকম অবিচার করা হয়। দোষ ছিল না তাঁর। সামান্য খরচের কাগজ কোন জামাইদের কাছে আসে যাবে তা নিয়ে মনোমালিন্য বাড়ে। ধরেই নেওয়া হয় এবং দুপক্ষের ঘটনা দেখেও মনে হয় উদ্ধত স্বভাব নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে অভিমানী শরৎকুমারের সম্পর্ক খারাপ হওয়ার জন্যই মাধুরী ও শরৎ ভিহি শ্রীরামপুরের ভাড়া বাড়িতে উঠে গিয়েছিলেন। কিন্তু সত্যপ্রসাদকে লেখা রথীন্দ্রনাথের চিঠি থেকে বোঝা যায় দুই বোনের সম্পর্কও সে সময় ভাল ছিল না। রথীন্দ্র লিখছেন, 'দিদি ও মীরার মধ্যে এখনও খুঁটিনাটি চলছে শুনে দুঃখ হয়। ...ওরা তো ছেলেমানুষ নয়, যদি না বোঝে ত উপায় নেই।' রবীন্দ্রনাথ যখন সব কিছু সুরেন্দ্রনাথের মুখে শুনলেন তখন ঘটনা সবার হাতের বাইরে চলে গিয়েছে। শরৎ ও মাধুরী কবি দেশে ফিরে আসার আগেই জোড়াসাঁকোর বাড়ি ছেড়ে চলে যান ভিহি শ্রীরামপুরের বাড়িতে। মাধুরী তখন অন্তঃসত্ত্বা। অবশ্য শিশুটির অকালমৃত্যু ঘটে। মানসিকভাবে মাধুরী আরও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। কবি চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের বোঝাতে, '...কাজ কী এ নিয়ে বকাবকি নাই করা গেল একবার এ সব কথা ভুলেই যা না। ...আমি তোকে ভর্ৎসনা করছি নে বেল্— সকারণ হোক অকারণই হোক আমাদের সম্বন্ধে তোদের মনের সমস্ত গ্লানি ধুয়ে ফেলে দে—।' শরৎকুমারকে লিখেছিলেন, '...যদি তোমরা মনে করে থাক যে, তোমাদের প্রতি আমার আন্তরিক স্নেহের অভাব আছে তা হলে তোমরা ভুল বুঝেছ— ...আমার মধ্যে সে রকম ত্রুটি যদি তোমরা দেখে থাক, তা হলে সে কি তোমরা কোনো মতেই ক্ষমা করতে পারবে না।' কিন্তু মাধুরী ও শরৎকুমারের অভিমান ভাঙেনি। এরপর আর কোনওদিন শরতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয়নি। আর মাধুরীলতা?

মৃত্যুসংবাদ ছাড়া তাঁর সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যাবে না? যেবছর বিশ্ববন্দিত পিতার সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটল, সে সময় কে রইল পাশে? কে দিল সান্ত্বনা? এ সময় থেকেই তিনি ধীরে ধীরে রোগশয্যা নিলেন। বছরখানেক পরে একটু সুস্থ হয়ে অনুরূপাকে লিখেছিলেন, 'বন্ধুহারা মন অন্ধ ঘরে, থাকি বসে অবসন্ন মনে।' রোগশয্যায় শুয়ে মাধুরী অনুভব করেছেন,

'একটা আবরণ সরে গেছে, মানুষকে যেন নতুন করে দেখতে শিখেছি। এরকম কঠিনভাবে নাড়া না খেলে হয়ত কখনও জাগত না। ...এই যে গত বৎসর সুদীর্ঘকাল জীবনমৃত্যুর মাঝখানে আন্দোলিত ছিলুম, এই সময় আত্মাকে মনেতে যে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে এতেই কেবল আত্মার সঙ্গে মনের পরিচয় হবার সুযোগ লাভ করেছি, প্রাণে সব বল পেয়েছি, জীবনের কিছু সামান্য সার্থকতা হয়েছে।'

মাধুরী উপলব্ধি করেছেন, তাঁর জীবনে এতদিন যা হয়নি, হয়েছে সুদীর্ঘ রোগশয্যায়, জীবনমৃত্যুর মাঝখানে। এই নতুন উপলব্ধি নিয়ে মাধুরী আর সংসারে ফিরে আসতে পারেননি। অনুরূপা ছাড়াও আর এক বান্ধবীর সঙ্গে এ সময় সখ্যতা করেছিলেন মাধুরী, তাঁর নাম ইন্দুপ্রভা। ইন্দুপ্রভাকে লেখা চিঠিতে অবশ্য সেই তাঁর নতুন উপলব্ধির কথা কি কোনও নিষ্ঠুরতার আভাস। তবে কি মাধুরী তখন সবই ভুলে যেতে চাইছিলেন? তাই চিঠিতে লিখেছেন, 'মেয়েমানুষকে যখন বি. এ ছাড়া অন্য পাশ দিতে হয় না তখন অত লম্বা স্মরণশক্তি রেখে কি ফল?' এ সময় একবার হাজারিবাগে ইন্দুপ্রভার বাড়িতে

যাওয়ার ইচ্ছে ছিল মাধুরীর, লিখেছিলেন কেননা জ্যোতিরিন্দ্রের ডায়রিতে আছে 'আজ
সকালে শরৎ বেলা ...হঠাৎ মোটরে করে হাজারিবাগ থেকে এসে উপস্থিত—কাল সকালে
যাবে।' তারপর শোনা গেল ডাক এসেছে মাধুরীর। যে রোগে মারা গেছেন ছোট বোন রেণুকা,
সেই রাজযক্ষ্মাই বাসা বেঁধেছে স্বর্গীয় মাধুরীমাখা বেলার শরীরে। এ তো বেলার অসুখ নয়। এ
যে মহাকালের পরীক্ষা। কবি রথীন্দ্রকে লিখলেন, 'জানি বেলার যাবার সময় হয়েছে। আমি
গিয়ে তার মুখের দিকে তাকাতে পারি এমন শক্তি আমার নেই।'
সময় যখন সত্যিই ঘনিয়ে এল, তখন কবিকে এসে বসতেই হল মেয়ের পাশে। বিছানায়
মিশে থাকা, তিল তিল করে ক্ষয়ে যাওয়া রুগ্ন শরীর, দুখানি শীর্ণ সাদা হাত বাড়িয়ে মাধুরী
ছেলেবেলার মতো আবদার করেন, 'বাবা গল্প বলো'।
বাবার বুকে শেলাঘাত হয়। এই তো সেদিন, তাঁর অবুঝ চঞ্চল মেজো মেয়ে রাণীও বেলার
মতোই শীর্ণ হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরেছিল তাঁকে, বলেছিল 'বাবা গল্প বলো'। আবার? এত শীঘ্র
গল্প শোনাতে হবে আরেকজনকে, কথাকোবিদ পিতার গল্পের ঝুলিও বুঝি শেষ হয়ে যেতে চায়।
রুদ্ধ হয়ে আসে কণ্ঠ। তবু বলেন। রেণুকা শুনেছিল ছোট ছেলের গল্প—'শিশু'র কবিতা—সে
নিজেও যে শৈশবের সীমানা পার হয়নি। বেলা শোনেন 'পলাতকা'র বিধুর গল্প, 'মুক্তি', হারিয়ে
যাওয়া নারির কথা! এই গল্প শোনাও একদিন ফুরোল। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ সে দিনের কথায়
লিখেছেন, জোড়াসাঁকোয় পৌঁছিয়ে অন্যদিনের মতো আমাকে বললেন, 'উপরে চলো'।
খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'কিছুই তো করতে পারতুম না। অনেকদিন ধরেই জানি যে
ও চলে যাবে। তবু রোজ সকালে গিয়ে ওর হাতখানা ধরে বসে থাকতুম।' কবি শান্তভাবে বেলার
মৃত্যুকে গ্রহণ করতে চাইলেও তাঁর পিতৃহৃদয় যেন ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছিল। রাণুর
স্মৃতিচারণে ধরা পড়েছে সে কথা। '...অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে এক ভিখারির মতো তিনি
আমাদের গৃহের সামনে এসে দাঁড়িয়ে ডাকছিলেন, রাণু রাণু কোথায় গেলে।' রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা
জানেন তাঁরা নিশ্চয় বুঝবেন চরম বেদনার মুহূর্তেই কবির পক্ষে বেলার বিকল্প হিসেবে রাণুকে
দেখতে চাওয়া সম্ভব হয়েছিল। কয়েকদিন পরে তিনি রাণুকে লিখেছিলেন, '...আমার খুব
দুঃখের সময়েই তুমি আমার কাছে এসেছিলে—আমার যে মেয়েটি সংসার থেকে চলে গেছে
সে আমার বড় মেয়ে, শিশুকালে তাকে নিজের হাতে মানুষ করেছি; তার মতো সুন্দর দেখতে
মেয়ে পৃথিবীতে খুব অল্প দেখা যায়। কিন্তু সে যে মুহূর্তে আমার কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেল
সেই মুহূর্তেই তুমি আমার কাছে এলে—আমার মনে হল যেন এক স্নেহের আলো নেবার সময়
আর এক স্নেহের আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেল।'

'পলাতকা'র 'শেষ প্রতিষ্ঠা' কবিতায় লিখেছেন,

'এই কথা সদা শুনি, 'গেছে চলে', 'গেছে চলে।'
তবু রাখি বলে
বোলো না, 'সে নাই।'
সে-কথাটা মিথ্যা, তাই
কিছুতেই সহে না যে,
মর্মে গিয়ে বাজে।'

মাধুরীলতার মৃত্যুপ্রসঙ্গে কিছু তথ্যগত ভ্রান্তি রয়েছে। বেশিরভাগটাই শরৎকে নিয়ে। একথা সত্যি যে, জোড়াসাঁকোর বাড়িতে যে অপ্রীতিকর অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল, মাধুরীর মৃত্যুর মতো বিশাল ঘটনাতেও তার জের মেটেনি। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, কবির সঙ্গে আর শরতের সাক্ষাৎ হয়নি। 'বেলা যখন মৃত্যুশয্যায় তখন কবি কন্যাকে

দেখতে গেছেন দুপুরে—যখন জামাতা আদালতে।' অপরদিকে হেমলতার উক্তি তুলে ধরেছেন মৈত্রেয়ী দেবী। তাতে দেখা যাবে হেমলতা বলেছেন, 'তার অসুখের শেষে বেলা তার মৃত্যুশয্যায়, সব অপমান চেপে তিনি দেখা করতে যেতেন। শরৎ তখন টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে সিগারেট খেত। পা নামাত না পর্যন্ত—এমনি করে অপমান করত। উনি সব বুকের মধ্যে চেপে মেয়ের পাশে বসতেন, মেয়ে মুখ ফিরিয়ে থাকত।'

দুটি উক্তিই আমাদের মনে সংশয় জাগিয়েছে। কারণ রবীন্দ্রনাথ এবং প্রশান্ত মহলানবিশ দুজনেই বলেছেন তাঁরা মাধুরীকে দেখতে গেছেন সকালবেলা। প্রশান্ত তাঁকে নিয়ে গেছেন গাড়ি করে, তাই তাঁর ভুল হবার সম্ভাবনা কম। অপরদিকে রবীন্দ্রজীবনীকার বলেছেন 'দুপুরবেলা'। অবশ্য এই সময়টা বেলা দশটার পর হলে, বোধহয় কোনও সংশয় থাকে না। কাদম্বিনী দত্তকেও কবি লিখেছিলেন মেয়েকে নিয়ে দিনের বেলা ব্যস্ত থাকার কথা। এ সময় শরৎকুমারের সঙ্গে তাঁর দেখা না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি ছিল। অপরদিকে হেমলতার কথাকেও বিনা দ্বিধায় মেনে নেওয়া গেল না, কারণ কবি নিজে বলেছেন মেয়ে তাঁকে বলতেন 'বাবা গল্প বলো'। বেলার মৃত্যুর পরে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লেখা চিঠিতেও দেখা যাচ্ছে, কবি লিখেছেন তিনি তাঁর মেয়ের রোগযন্ত্রণা কিছুই লাঘব করতে পারেননি, পারা সম্ভবও ছিল না 'অথচ পিতার উপর শেষ পর্যন্ত তাহার নির্ভর ছিল।' তাই মেয়ের মুখ ফিরিয়ে থাকার মধ্যে সন্দেহ থেকে যাচ্ছে। বিশেষ করে প্রশান্তকুমার পাল পারিবারিক হিসেবের খাতা থেকে দেখিয়েছেন বেলার জন্য নার্স নিয়োগ, ফুল কেনা, ওষুধ পত্রের জন্য টাকা দেবার কথা। কাজেই এ সময় মাধুরী ও শরৎ কোনও বিরুদ্ধাচরণ করেছেন বিশ্বাস হয় না। শরতের চাপা অভিমানী স্বভাবের সঙ্গেও যেন এই ব্যবহার খাপ খায় না। যেদিন দেখা হতে পারত অর্থাৎ বেলার মৃত্যুর সময়, সেদিন কবি ফিরে গিয়েছিলেন সিঁড়ি থেকেই। স্ত্রীর মৃত্যুর পরে শরৎ চলে গিয়েছিলেন মজঃফরপুরে, একটি পুরনো নীলকুঠি কিনে সেখানে সাহেবানা ফুলের বাগান করে নিরালায় বাস করতেন। অনেকের মতে মাধুরীলতার বিবাহিত জীবন সুখের হয়নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যর্থ-বিড়ম্বিত জীবন থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন 'হৈমন্তী' গল্পের বীজ। হৈমন্তীর সঙ্গে মাধুরীর সাদৃশ্য আছে ঠিকই তবে শরৎ ও মাধুরীর বিবাহিত জীবন ব্যর্থ হয়েছিল মনে হয় না। ইন্দিরা লিখেছেন, 'শরৎ তাঁদের স্বল্পকালস্থায়ী বিবাহিত জীবনে বেলার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন।' যদিও ক্ষুব্ধ অভিমানের দুস্তর সেতু কবি বা শরৎ কেউই কোনওদিন পার হবার চেষ্টা করেননি।।

রবীন্দ্রনাথের মেয়েদের মধ্যে দীর্ঘ জীবনের অধিকারিণী শুধু মীরা বা অতসীলতা। মীরার আগে ছিলেন রেণুকা। কবির মেজো মেয়ে রাণী বা রেণুকার মৃত্যু হয়েছিল কৈশোরে, ফুল হয়ে ফুটে ওঠার আগেই। অত্যন্ত জেদি একরোখা ধরনের মেয়ে রেণুকার কথা সবচেয়ে বেশি জানা যায় মীরার 'স্মৃতিকথা' থেকে। সব ব্যাপারেই তাঁর ছিল সুগভীর ঔদাসীন্য। সাজতে ভাল লাগত না, চুল বাঁধা তো বিরক্তিকর ব্যাপার। খানিকটা নিস্পৃহ অথচ খেয়ালী মেয়ে রেণুকার বিয়ে হয়েছিল মাত্র এগারো বছর বয়সে। বেলার বিয়ের একমাস পরেই। কবি এসে স্ত্রীকে বললেন, 'রাণীর বিয়ে ঠিক করে এলুম...ছেলেটিকে আমার বড় ভাল লেগেছে ছোট বউ, যেমন সুন্দর দেখতে তেমনি মিষ্টি অমায়িক স্বভাব। রাণীটা যে জেদি মেয়ে, ওর বর একটু ভালমানুষ গোছের না হলে চলবে কেন?' বিয়ে হয়ে গেল। রেণুকা কিন্তু এ বন্ধনটা খুব খুশি মনে নিতে পারলেন না, তাঁর ভুরু একটু কুঁচকেই রইল। বিয়ের পরই বর বিদায় হবে শুনে একটু নিশ্চিন্ত হলেন। বিয়ের সব অনুষ্ঠানেই লক্ষ্মী মেয়ের মতো মেনে নিলেন। মায়ের মৃত্যু এবং স্বামী অকৃতকার্য হয়ে আমেরিকা থেকে ফিরে আসায় রেণুকা খুব দুঃখিত হন। মনের ব্যথা পরিণত হয় বুকের ব্যাধিতে। কবি তাঁকে শোনাতেন 'শিশু'র কবিতা। মেয়ের শৈশবের কথা বলতে গিয়ে নিজের

শৈশব উঁকি মেরে যেত বারবার। হাওয়া বদলের জন্যে নিয়ে গিয়েছিলেন হিমালয়ে। আলমোড়ায় পাইনের হাওয়া যক্ষ্মারোগীর পক্ষে উপকারী বলে তাঁকে সারাদিন সেখানে রাখা হত। শেষ দিকে রেণুকা 'বারবার বলতেন, 'বাবা, বাড়ি নিয়ে চলো।' কবি তাঁকে ফিরিয়ে আনলেন জোড়াসাঁকোয়। কিন্তু কিছুতে কিছু যখন হল না তখন কবি তাঁকে প্রতিদিন উপনিষদের মন্ত্রের অর্থ বুঝিয়ে দিয়েছেন, যাতে ছেড়ে যেতে কষ্ট না হয়! তাই হয়তো যাবার সময় রেণুকা বাবার হাত চেপে ধরে বলেছিলেন, 'সব অন্ধকার হয়ে আসছে। কিছু যে দেখতে পাচ্ছি না। বাবা তুমি পিতা নোঽ সি মন্ত্র পড়ে শোনাও।' রেণুকার জীবনে তাঁর বাবাই ছিলেন সব, তাই মৃত্যুর হাতে যখন আত্মসমর্পণ করতে হল তখন তিনি বাবার হাত ধরেই দরজাটুকু পার হতে চেয়েছিলেন।

মীরার পোশাকি নাম ছিল অতসীলতা। কিন্তু মীরা নামেই তিনি সবার পরিচিত। রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা। বাবা-মায়ের স্নেহ, দাদা-দিদিদের ভালবাসায় বড় সুখের মধ্যে শুরু হয়েছিল তাঁর জীবন কিন্তু কয়েকটা বছর পরেই হারিয়ে গেল আনন্দের দিনগুলো। রবীন্দ্র পরিবারে একের পর এক মৃত্যু ঘটতে থাকায় মীরাকে কখনও থাকতে হয়েছে জ্ঞানদানন্দিনীর কাছে, কখনও মাধুরীলতার কাছে, কখনও রাজলক্ষ্মী দেবীর তত্ত্বাবধানে। শেষে তাঁর স্থায়ী ঠিকানা হয় শান্তিনিকেতনের 'মালঞ্চ'।

দিদিদের মতো মীরারও শিক্ষা শুরু হয় বাড়িতে। লরেন্স সাহেবের কাছে ইংরেজি শিখেছেন, কার্তিকচন্দ্র নান শেখাতেন ছবি আঁকতে। সেলাই শেখানোর জন্যে বিদেশি মেমের সন্ধান করা হয়েছে। কবি নিজে মেয়েকে ইংরেজিতে চিঠি লিখতে উৎসাহ দিতেন। কবির বন্ধু জগদীশচন্দ্র বসুর অত্যন্ত আদরের পাত্রী ছিলেন মীরা। তাঁর ইচ্ছে ছিল, নিজের পুত্রপ্রতিম ভাগনে অরবিন্দমোহনের সঙ্গে মীরার বিয়ে দেবেন। কবিপত্নী মৃণালিনী হবেন তাঁর বেয়ান। এমনকী ঠাট্টা করে দেনা-পাওনা নিয়েও আলোচনা চলত। কবি সেই পরিহাসে যোগ দিতেন সানন্দে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। কবিপত্নী বেঁচে থাকলে কী হত জানা নেই, তাঁর মৃত্যুর পরে কবি মীরার জন্যে পাত্র খুঁজেছেন ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভবদের মধ্যে থেকেই। অসমের তরুণরাম ফুকনের সঙ্গেও মীরার বিয়ের কথা হয়েছিল। কবি চরম ভুল করেছিলেন প্রিয়দর্শন তেজস্বী যুবক নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে দেখে। নগেন্দ্র সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি বিলেত যাবার উপায় খুঁজছিলেন। রবীন্দ্রনাথ স্থির করলেন মীরার সঙ্গে নগেন্দ্রর বিয়ে দিয়ে তাঁকে আমেরিকায় পাঠাবেন। আমেরিকাযাত্রার পাথেয় পাওয়া যাবে জেনে নগেন্দ্র আদি ব্রাহ্মসমাজের নিয়ম মেনে মীরাকে বিয়ে করতে রাজিও হলেন। কিন্তু বিয়ের সময়ই বিরোধের বাষ্প ঘনিয়ে ওঠে। আদি ব্রাহ্মসমাজের নিয়ম অনুযায়ী ব্রাহ্মণের উপবীত ধারণ অবশ্যকর্তব্য। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়ম উপবীত বর্জন। নতুন করে নগেন্দ্রকে উপবীত ধারণ করানো হল। কিন্তু তিনি বিবাহ সভায় 'বাবার স্বহস্তদত্ত পৈতা' ফেলে দিলেন। এ কথা লিখেছেন মাধুরীলতা, দূর প্রবাসী ভাই রথীন্দ্রকে বিবাহ-বাসরের বর্ণনা দিতে গিয়ে। এরপরের প্রতিটি অনুষ্ঠানে, গায়ে হলুদ, টোপর পরা, মালাবদল প্রভৃতি লোকাচারের সময় নগেন্দ্র অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করেন। 'বরের অসভ্যতায় আমাদের পর্যন্ত লজ্জাবোধ হয়েছিল। সব কাজেরই সীমা আছে কিন্তু নগেন্দ্রের বেহায়াপনার সীমা নেই' লিখেছেন মাধুরীলতা। মহর্ষি ব্রাহ্ম হওয়া সত্ত্বেও বাঙালির লোকাচার বর্জন করেননি। সেই নিয়মই চলে এসেছিল এতদিন। মীরার বিবাহ বাসরের এই অশান্তিকেই তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের পূর্বাভাস বলা যাবে কিনা জানি না, প্রথমদিকে তাঁদের দাম্পত্য জীবনে কোনও ফাটল দেখা যায়নি। মীরা ছিলেন এ দেশের সবচেয়ে পরিশীলিত পরিবারের সন্তান। তাঁর পিতার শিক্ষা ছিল, স্বামী যে তাঁর চেয়ে সব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, সে কথা মেনে নেওয়া, এ কথা মাধুরীর চিঠি থেকে জেনেছি। মীরাও নগেন্দ্রকে সে কথা জানিয়েছেন, নিজেকে তিনি 'পাড়াগেঁয়ে মেয়ে', 'কুনো', 'মেঠো মেয়ে' প্রভৃতির স্থলাভিষিক্ত করে লিখেছেন, 'আমি কোনও কাজ করবার পক্ষে অযোগ্য

অক্ষম সে জন্যে আমাকে নিয়ে তোমার অনেক ভুগতে হবে। তবে আমার এই একমাত্র আশা আছে যে আমি যতই অযোগ্য হই, অপটু হই তুমি আমাকে শিখিয়ে নেবে।' কিন্তু এই সরল বিনম্র স্বীকারোক্তিকে নগেন্দ্র কোনও গুরুত্ব দেননি, হয়তো বা সত্যি ভেবে নিয়ে স্ত্রীকে অবজ্ঞাই করেছিলেন। ফলে, দুজনের দূরত্ব বাড়তে থাকে। পুত্র নীতীন্দ্রের জন্ম হয়। কন্যা নন্দিতার জন্ম হয়। কিন্তু নগেন্দ্রর কোনও পরিবর্তন হয়নি। দেশে ফেরার পর রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নানা কাজের ভার দিয়েছিলেন, কিন্তু অসম্ভব খরচ করে, ঋণের বোঝা বাড়িয়ে, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে কদর্য ব্যবহার করে সবার জীবনেই অশান্তি নিয়ে আসেন। মাধুরীর সঙ্গে মীরার সম্পর্কও তিক্ত হয়ে ওঠে। বিয়ের আগে পর্যন্ত যে দিদির স্নেহচ্ছায়ায় মীরা ছিলেন, সেই দিদির মৃত্যুও তাঁর মনে কোনও রেখাপাত করল কিনা 'স্মৃতিকথা' পড়ে তা বোঝা যায় না। সেখানে দিদির কথা খুবই কম।

নগেন্দ্রের সঙ্গে মীরার বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। কবি দুঃখ পেয়েছেন। মীরাকে তিনি সব শিক্ষায় পারদর্শী করে তুলেছেন। তাঁকে শিখিয়েছেন, 'মেয়েরা দিন-রাত্রি জীবনকে যে রকম হালকা করে দেখে, যে রকম সংকীর্ণভাব থেকে সমস্ত বড় জিনিসকে বিকৃত করে তোলে, জগতে যে সকল বড় শক্তি কাজ করছে তার সম্পর্কে সম্পূর্ণ অচেতন থেকে দিন-রাত্রি কেবল হাসিগুজব নিয়েই হো হো করে কাটায় তার থেকেই তোদের রক্ষা করার জন্য আমি অনেক চেষ্টা করেছি—আশাকরি আমার সে চেষ্টা ব্যর্থ হবে না।' যদিও ভিন্ন প্রসঙ্গে লেখা চিঠি তবু কবি তাঁর মেয়েদের মনটি যে সব সময় উঁচু তারে বেঁধে দেবার চেষ্টা করেছিলেন তা বোঝা যায়।

প্রথম দিকে তিনি নগেন্দ্রকে হয়তো বোঝাতে চেয়েছেন। নারীর প্রতি পুরুষের অশ্রদ্ধা ও নিষ্ঠুর ব্যবহারের ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন এভাবে, 'মেয়েদের পরে অশ্রদ্ধা ও নিষ্ঠুরতার একটা কারণ, আমাদের মনের বুদ্ধিগত বিকাশের কার্যে তাদের সাহায্য আমরা অল্পই পেয়েছি। কেবল আমাদের খাওয়ানো পরানো, কেবলমাত্র আমাদের দেহের প্রয়োজন সাধনে তাদের সেবা পাই বলেই এক জায়গায় তাদের মূল্য আমাদের কাছে ভিতরে ভিতরে খুব কমে যায়।' অবশ্য কবি একথা সত্যিই বিশ্বাস করতেন কি? ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা কোনওদিনই সামান্যা নারীদের সমপর্যায়ভুক্ত ছিলেন না। কবিও মৃণালিনীর কাছে মানসিক সহায়তা পাননি তা নয়, বরং স্ত্রীর মৃত্যুর পরে বারবার তিনি অনুভব করেছিলেন, 'এমন কেউ নেই যাকে সব কথা বলা যায়।'

মীরা কয়েকবার ফিরে এসেছেন শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথকে চিন্তামুক্ত করার জন্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নগেন্দ্রকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিশিক্ষা ও গবেষণা বিভাগটি গড়ে তোলার চাকরি দিয়েছিলেন। কলকাতায় নগেন্দ্র যখন মীরাকে জোর করে নিয়ে যেতে চেয়েছেন তখন রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, 'মীরার সঙ্গে তোমার লেশমাত্র বিচ্ছেদ হয়, এ আমার কিছুতেই ইচ্ছাসম্মত নয়। এর দায়িত্বও আমার পক্ষে কঠিন। তবু আমাকে পরম দুঃখে এটা স্বীকার করতে হচ্ছে। এবার মাদ্রাজে যখন দেখলুম মীরা তোমাকে ভয় করে, তোমার হাত থেকে প্রকাশ্য অপমানের সংকোচে একান্ত সংকুচিত হয়, তখন স্পষ্ট দেখতে পেলুম, তোমাদের দুজনের প্রকৃতির মূল সুরে মিল নেই।' পিতা হিসেবে রবীন্দ্রনাথ এখানে আশ্চর্য দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন, 'ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওকে কোনো জীবনযাত্রা বহন করতে যদি প্রস্তুত হতে হয় তবে সে চিন্তা আমার পক্ষে দুর্বিষহ।' আবার লিখছেন, 'তোমাদের পরস্পরের মধ্যে যে বিচ্ছেদ ঘটেছে সে তো বাইরের জিনিস নয়। বাইরে থেকে জোর করে শাসন করে ভয় দেখিয়ে জোড়া দেবার চেষ্টা সে আমার দ্বারা কিছুতেই হতে পারে না। কারণ তার মতো নীচতা ও নিষ্ঠুরতা আর কিছু নেই।'

এ সময় থেকেই কবি মীরাকে স্বতন্ত্র সংসার পাততে সাহায্য করতে চেয়েছেন, '...তুই যাতে স্বাধীন স্বতন্ত্র ও স্থায়ীভাবে আপন সংসারের ভার নিতে পারিস এই আমার ইচ্ছা, নইলে আমার মন নিশ্চিন্ত হতে পারবে না।' একই সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শর্ত অনুযায়ী নগেন্দ্রকে

গল্পে তার ছাপ পড়েছে। এছাড়া দাদা মোহিনীমোহনের কাছে তিনি পড়েছিলেন 'কালীসিংহের মহাভারত'। বিয়ের পরও তাঁর পড়ার আগ্রহ দেখে দ্বিপেন্দ্র মিস ম্যাকস্কলকে নিয়োগ করেন। হেমলতাকে দু'বছর নিয়মিতভাবে ইংরেজি পড়ান পিয়ার্সন সাহেব। এন্ড্রুজের কাছে হেমলতা পড়তেন ইংরেজি কবিতা। হেমলতা পড়তেন রবীন্দ্রনাথের কাছেও। কবি দেশবিদেশের বিভিন্ন পত্রিকা থেকে ভাল ভাল প্রবন্ধ বেছে নিয়ে হেমলতাকে অনুবাদ করতে দিতেন। তাঁর উৎসাহেই হেমলতা বাংলায় সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। শুধু সাহিত্য বা ভাষা নয়, হেমলতার আগ্রহ ছিল ধর্ম ও অধ্যাত্মবাদের ওপর। তাঁর বাবা ছিলেন তৈলঙ্গস্বামীর সাক্ষাৎ শিষ্য। দাদা মোহিনীমোহনও প্রথমে থিয়সফিস্ট আন্দোলনের এবং পরে শিবনারায়ণ স্বামীর সংস্পর্শে আসেন। হেমলতাও পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীকেই গুরু হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং বিভিন্ন আধ্যাত্মিক চিন্তা ও ধর্মসাধনার প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল। রাজা রামমোহনের ঐতিহ্য তো ছিলই, বিয়ের পরে এর সঙ্গে যুক্ত হল মহর্ষির জীবনসাধনা। রবীন্দ্রনাথের কাছে তিনি কিছু সুফীবাদের বইও পড়েন। অনুবাদ করেন 'আফ্রিকায় ইসলাম' প্রবন্ধটি। সেটি পড়ে একদিন কবি পড়াতে পড়াতে বলেন, 'তুমি মুসলমান হবে নাকি? তোমার মন যে রকম উজ্জ্বল হয়ে ওঠে দেখি, সুফীদের কথায়।'

হেমলতা তখন নতুন বউ নন। তাই বললেন, 'সুফীরা মহাতাপস, তবে কোনও কিছু হওয়াহওয়ি চলবে না রাজা রামমোহনের যুগে। কোনও একটা কোঠায় ঢোকা যায় কী করে?'

কবি শুনে খুশি হয়েছিলেন, 'কথা ঠিক। তোমার ওপর রাজা রামমোহনের আশীর্বাদ আছে দেখছি।'

পরবর্তীকালে ইউরোপে যাবার সময় দূর থেকে আরবের রাজ্য দেখে হেমলতা সেই মাটি স্পর্শ করবার জন্যে আবেগে আপ্লুত হয়েছিলেন এই ভেবে যে 'এইখানে পয়গম্বর মহম্মদ জন্মেছিলেন, তাঁর জীবনলীলার সব কিছু এইখানেই ঘটেছিল—অবসানও হয়েছিল এই মাটিতে, তাঁর দেহের অণু পরমাণু এখনও হয়তো এই মাটিতে মিশে আছে।' প্রতিটি ধর্মকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন অপরিসীম শ্রদ্ধার সঙ্গে।

মহর্ষির আশীর্বাদও পেয়েছিলেন হেমলতা। বলেন্দ্রের মৃত্যুর পর পারিবারিক ধর্মালোচনার সময় তাঁর আগ্রহ, উৎসাহ এবং পৃথক ধর্মসাধনার কথা মহর্ষি শুনতে পান ও হেমলতার সঙ্গে প্রতিদিন দুপুরে একঘণ্টা ধর্মালোচনা করতে আরম্ভ করেন। এভাবেই কাটে দীর্ঘ সাত বছর। হেমলতার আগ্রহ ও যুক্তি দেখে তিনি তাঁকে হোম করবার অনুমতিও দিয়েছিলেন। কারণ এই হোম শুধু অগ্নিপূজা নয়। সক্রিয় ব্রহ্মশক্তিতে সর্বশক্তিমান পরমাত্মার আবির্ভাব উপলব্ধি করার জন্যই এই অগ্নিসাধনা।

মৃত্যুর আগে নাতবউয়ের ধর্মবিশ্বাস ও ভগবৎ ভক্তির প্রতি আস্থার নিদর্শনরূপে মহর্ষি তাঁকে দিয়ে যান নিজের দীক্ষার আংটিটি। হেমলতা একথা জানতেন না। মহর্ষির মৃত্যুর পরে তাঁর খাজাঞ্চি যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় আংটিটি হেমলতাকে দিয়ে বলেন, 'কর্তামহাশয় ইহা আপনাকে দিবার জন্য আমাকে বলিয়া গিয়াছেন এবং বলিয়াছেন আপনি ইহার প্রকৃত অধিকারী।' হেমলতা অনেকদিন এই আংটি পরেছিলেন, পরে আংটিটি শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে স্থান পায়। এই ঘটনা থেকেই প্রমাণিত হয় হেমলতা ছিলেন সবার থেকে স্বতন্ত্র এবং মহর্ষির জীবন-সাধনার যোগ্যতম উত্তরাধিকারিণী। এ সময় ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা বিভিন্ন দিকে এঁকে দিচ্ছেন সাফল্যের পরিচয় আর হেমলতা নীরবে নিভৃতে দিচ্ছেন ধর্ম উপদেশ। এই উপদেশগুলি পুস্তিকার আকারে ছাপা হয়েছিল। 'পরমাত্মায় কি প্রয়োজন', 'সৃষ্টি ও স্রষ্টা কাহার নাম', 'চৈতন্যময় পূর্ণ ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বর কাহার নাম', 'সত্য লাভের উপায় কি' প্রভৃতি উপদেশে ব্রাহ্মধর্মের সারসত্য নিহিত আছে। ধর্ম সম্বন্ধে হেমলতার যেমন গোঁড়ামি ছিল না তেমনি সর্বধর্মের প্রতি ছিল তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা হেমলতার বক্তৃতা শুনে আনন্দিত হতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মশতবর্ষপূর্তি উৎসবে যোগ দিয়ে তিনি ঠাকুরকে ব্যাখ্যা করেছিলেন, সহজ আনন্দের উৎস শিশু ভোলানাথরূপে।

ধর্মচর্চার সঙ্গে সঙ্গে হেমলতা করেছেন সাহিত্যচর্চা এবং সমাজসেবা। এ কাজেও তিনি কোনও বাধা পাননি। মেয়েদের বাধা ক্রমশই অপসারিত হচ্ছিল। তার ওপরে তিনি ধর্মপ্রাণা, সুশিক্ষিতা এবং ধনী-ঘরনি। সব কাজের মধ্যেও বাড়ির সবার জন্যে সর্বদা ব্যস্ত থাকত তাঁর দুটি সেবানিপুণ হাতের প্রাণঢালা শুশ্রূষা। কী করে যে এত কাজ তিনি করতেন কে জানে? গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ-নাটিকা-শিশুপাঠ্য বই-স্মৃতিকথা-গান বলতে গেলে সবই লিখেছেন হেমলতা। এর ওপর ছিল 'বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রিকা সম্পাদনা, 'সরোজনলিনী' ও 'বসন্তকুমারী' বিধবা আশ্রমের ভার। ছিল শান্তিনিকেতনের ছেলেদের দেখাশোনার ভার। প্রথমে তাঁর সাহিত্যচর্চার কথাটাই সেরে নেওয়া যেতে পারে। ঠাকুরবাড়িতে এসে অনেকেই লেখিকা হয়েছেন কিন্তু হেমলতার সাহিত্যবোধ ছিল সহজাত। এ বাড়ির বউ হয়েও তাঁর নিজস্বতা তিনি হারাননি। তাই তাঁর গল্পে পাওয়া যাবে ভিন্ন সুরের সন্ধান, যদিও প্রবন্ধ-স্মৃতিকথায় তিনি ঠাকুরবাড়ির বিশেষ রচনাভঙ্গিটিকেই গ্রহণ করেছেন।

হেমলতার কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে মাত্র তিনটি—'জ্যোতিঃ', 'অকল্পিতা' ও 'আলোর পাখি'। এছাড়াও অনেক কবিতা এখনও পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হেমলতার কয়েকটা কবিতায় সুর দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সুর দেওয়া গান হল 'ওহে সুনির্মল সুন্দর উজ্জ্বল শুভ্র আলোকে' ও 'বালক প্রাণে আলোক জ্বালি'। জ্যোতিরিন্দ্র সুর দিয়েছিলেন 'আমি আর কিছু না জানি' কবিতায়। এঁরা ছাড়াও হেমলতার গানের সুর ও স্বরলিপি করেছেন ইন্দিরা ও বিখ্যাত গায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'জ্যোতিঃ' নামকরণ করেন রবীন্দ্রনাথ। 'অকল্পিতা' নামটি দ্বিজেন্দ্রনাথের দেওয়া।

হেমলতার অধিকাংশ কবিতাই ভগবৎ-প্রেমে সিক্ত। ছোট ছোট কবিতায় গভীরতার ছাপ স্পষ্ট কিন্তু কোথাও দুর্বোধ্য বা জটিল নয়। কোথাও নেই রূপ ও রূপকের ঠোকাঠুকি, প্রতীক ও ইঙ্গিতের ব্যঞ্জনা কিংবা চিত্রকল্পের সুমিত আভাস। তবু কী যেন আছে। অন্তর ও বাইরের চেতনাকে তিনি এক করে দেখতে চেয়েছেন। এই দেখার মধ্যে আছে তাঁর নিজস্ব অনুভব:

'অন্তরে চেতনা অনুভবে
বাহিরে সে ধরে
নানামত রূপ,
অন্তরে বাহিরে নেহারে যে তারে
ঘুচে তার ভব-
বন্ধনের দুখ।'

হেমলতার কবিতার ভাব এবং কাব্যভাষাতে রাবীন্দ্রিক ছাপই বেশি ছিল। কবি হেমলতার কবিতা পড়তে ভালবাসতেন। 'কাব্য পরিচয়ে' তিনি হেমলতার এই কবিতাটি যোগ করেন।

'যেখানে ফুটিলে প্রেম, রহি সেইখানে
সুগন্ধে ভরিল প্রাণ আনন্দে আকুল
করিলে সবার চিত্ত, তব সমতুল
নাহি এ ধরায়। মৃত্যু হরি লয়ে যায়।
লক্ষ লক্ষ প্রাণ, লুপ্ত করি তমসায়।
যেখানে ফুটিলে তুমি, রহি সেইখানে

হতে পারে না, তা সে প্রেম দেশের প্রতিই হোক, মানুষের প্রতিই হোক, বা অন্তর্যামীর প্রতিই হোক। আসলে, এ তিনটি ভিন্ন বস্তু নয়,—একেবারেই ভিন্ন ভাব।' সব আশ্রমেই তাঁর ডাক পড়ত, হাসিমুখে এগিয়ে যেতেন সবার কাছে। মিশে যেতেন সবার সঙ্গে। মহাত্মা গান্ধী তাঁকে বলতেন, 'দিদিরানি'। আহ্বান জানিয়েছিলেন সবরমতী আশ্রমে। অন্যত্র সবার কাছেই তিনি ছিলেন 'বড়মা',

এখানেও যে মাঝে মাঝে আমরা হেমলতার কথা মনে করি তার কারণ কিন্তু সমাজসেবা নয়, তাঁর লেখা স্মৃতিকথা। না, ঠাকুরবাড়ির ট্র্যাডিশন অনুযায়ী তিনি নিজের আত্মকাহিনী লেখেননি। কিন্তু ঘরোয়া আটপৌরে ভঙ্গিতে এমন কয়েকটা প্রবন্ধ লিখেছেন যার মধ্যে মিশে আছে ব্যক্তিত্বের স্বাদ। নিজের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা লিখে রাখার ইচ্ছে তাঁর ছিল না। যদিও লিখতে পারতেন তাঁর দীর্ঘ কর্মময় জীবনের কথা। সমাজসেবা বা নারীকল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পত্রিকাসম্পাদনার কথাও। 'বঙ্গলক্ষ্মী' ছিল সরোজনলিনী আশ্রমের মুখপত্র। কিন্তু তাকে সাহিত্য পত্রিকায় পরিণত করেছিলেন হেমলতা। নিজের অসংখ্য লেখার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করেছেন অন্যান্য মহিলাদের লেখা। 'সবুজপত্রে'র প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেলে ইন্দিরা হেমলতার হাতে তুলে দিলেন মোহিতকুমারীদেবীর আত্মকথা 'আমুমার কথা'। প্রকাশিত হল পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ির একটি মেয়ের কথা। হেমলতার দুই ভাইঝি গীতা এবং দীপ্তি নারীকল্যাণের কাজ করতেন। দীপ্তি লিখতেনও। তাঁর লেখাও প্রকাশ করেন 'বঙ্গলক্ষ্মী'তে। এসব কিছুই হেমলতাকে আত্মকথা লিখতে উদ্বুদ্ধ করেনি। কিন্তু যাদের সংস্পর্শে এসে তাঁর জীবন ধন্য হয়ে উঠেছিল, সেই স্পর্শমণির মতো কয়েকজন ব্যক্তিকে প্রবন্ধের মধ্যে ধরে রেখেছেন হেমলতা। না রেখে পারেননি। স্মৃতিকথার ছোঁয়া থাকলেও এই প্রবন্ধগুলো লেখবার সময় নিজেকে সম্পূর্ণ অপরিচয়ের দূরত্বে সরিয়ে রাখার কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায় না। 'রবীন্দ্রনাথের বিবাহবাসর', 'বৈশাখের রবীন্দ্রনাথ', 'সংসারী রবীন্দ্রনাথ', 'আশ্চর্য মানুষ রবীন্দ্রনাথ', 'রবীন্দ্রনাথের অন্তর্লীন সাধনার ধারা'—কবিকে বুঝতে খুব বেশি সাহায্য করে। কবি নিজেও স্বীকার করেছেন 'রচনাগুলি অতি সুপাঠ্য'। রবীন্দ্রজীবনসন্ধানীর কাছে হেমলতার প্রবন্ধগুলি অমূল্য সম্পদ হয়ে আছে। হেমলতা লিখেছেন:

'কবিপত্নী একবার সাধ করে সোনার বোতাম গড়িয়েছিলেন কবির জন্মদিনে কবিকে পরাবেন বলে। কবি দেখে বললেন, ছি ছি ছি, পুরুষে কখনও সোনা পরে—লজ্জার কথা, তোমাদের চমৎকার রুচি। কবিপত্নী সে-বোতাম ভেঙে ওপাল-বসানো বোতাম গড়িয়ে দিলেন। দু-চারবার কবি সেটি ব্যবহার করেছিলেন যেন দায়ে পড়ে।'

আর এক জায়গায় হেমলতা লিখছেন,

'বিদ্যালয়-সূচনার পূর্বে শান্তিনিকেতন আশ্রমের সাবেক কুঠিটিতে কবির পরিবার ও আমরা একত্রে বাস করেছি অনেক সময়। গৃহস্থালীর ভার থাকত কবি-পত্নীর হাতে, তাঁকে গৃহকর্মে সাহায্য করার ভার আমার। সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ, খাদ্য ও খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ, ব্যয়ের হিসাব রাখার ভার আমার স্বামীর। ...কবি থেকে থেকে পত্নীকে বলতেন, নীচে বসে লিখতে লিখতে রোজ রুটি চাই ঘি, চাই সুজি, চিনি, ডিম, ময়দা, মিষ্টি তৈরি করতে হবে। যত চাচ্ছ তত পাচ্ছ মজা হয়েছে খুব। আমার স্বামীর নাম করে বলতেন, সে তো কখনও না বলবে না। যত চাইবে, ততই দেবে, তার মতো কর্তা ও তোমার মতো গিন্নি হলেই হয়েছে আর কী, দুদিনে ফতুর। কবিপত্নী ভাশুরপুত্রের নাম করে বলতেন, সে সংসার বোঝে, তার সঙ্গে কাজ করে সুখ, তোমার এদিকে নজর দেওয়া কেন?'

জ্ঞানবৃদ্ধ আপনভোলা চিরশিশু দ্বিজেন্দ্রনাথের কথাও কম নেই। দু'বেলা তাঁর খাবার সময়ে একটা না একটা গোলযোগ লেগেই থাকত। মোচার ঘণ্টে গরম মশলার গন্ধ পেলেই তিনি হুলস্থুল কাণ্ড বাঁধিয়ে দিতেন, 'কোথা থেকে কতকগুলো মাথামুণ্ডু বেটে মোচার ঘণ্টে ঢুকিয়েছে।' কিংবা

'বেকালে গরম লুচি ভেজে সামনে এনে দিয়েছে। লুচিতে হাত ঠেকিয়েই বললেন, এ কী লুচি? ঘি চপচপ করছে লুচির সারা গায়ে, আমার হাতসুদ্ধ এই হল ঘি লেগে। লুচির প্লেট আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, যাও জল দিয়ে লুচি ভেজে আন। ঘি দিয়ে কেউ লুচি ভাজে?'

হেমলতা একটু পরে ঘিয়ের বদলে শুকনো ময়দা দিয়ে বেলে লুচি ভেজে আনলেন। এবার পছন্দ হল। লুচির গায়ে একটুও ঘি লেগে নেই। খুশি হয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ বললেন, 'এই তো ঠিক হয়েছে, দেখলে জল দিয়ে ভেজে কেমন হল।' খাওয়ার পরে হেমলতা গল্প করে শোনালেন লুচিভাজার ইতিহাস। তখন সে কী হাসি, 'তাই তো, গরম জলে ময়দা দিলে অনেক কাই হয়ে যাবে তো বটেই। আচ্ছা কাণ্ড আমার, কী বলতে কী বলি, তোমাদের জ্বালিয়ে মারি। তোমরা যা ভাল বোঝ তাই কর—'

হেমলতা না থাকলে ঠাকুরবাড়ির এমন অনেক ছবিই হারিয়ে যেত। কোনও পুরুষ কি আমাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারতেন পরিবারের এই আটপৌরে অন্তরঙ্গ রূপ?

দ্বিজেন্দ্র পরিবারে সুশীলা ও হেমলতা ছাড়া বধূরূপে এসেছিলেন অরুণেন্দ্রর দুই স্ত্রী চারুশীলা ও সুশোভিনী, নীতীন্দ্রনাথের স্ত্রী সরোজিনী, সুধীন্দ্রনাথের স্ত্রী চারুবালা এবং কৃতীন্দ্রনাথের দুই স্ত্রী সুকেশী ও সবিতা। সুশীলার মতো চারুশীলা, সুশোভিনী, সরোজিনী ও সুকেশী দীর্ঘ জীবন পাননি। পারিবারিক গণ্ডির মধ্যে বা বাইরে তাঁরা এমন কিছুই করেননি যে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা চলে। চারুবালা খুব ভাল গান গাইতেন কোনও আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে না থেকেও তিনি ছেলেমেয়েদের মনে স্বদেশানুরাগ জাগাবার চেষ্টা করতেন। শিশু সৌম্যেন্দ্রনাথ তাঁর মুখেই শুনতেন স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা, দেশপ্রেমের গান। লিখেছেন, 'মা রোজ খবরের কাগজ পড়তেন, তাঁর মুখ থেকেই শুনতুম স্বদেশী আন্দোলনের কথা।' মায়ের কোলে বসেই তিনি স্বদেশপ্রেমের দীক্ষা নেন। সুকেশী অনেক সময় থাকতেন শান্তিনিকেতনে। এই হাসিখুশি মিশুকে বউটি তাঁর মধুর ব্যবহারে সবাইকে আপন করে নিয়েছিলেন। অরুণেন্দ্রনাথের মাতৃহারা ছেলেমেয়েদের অপার স্নেহে মানুষ করেছিলেন সুকেশী। রবীন্দ্রনাথের লেখা একটি চিঠিতে দেখি তিনি মীরাকে লিখছেন, '...আমি এ মাসের শেষাশেষি কলকাতা পৌঁছিব—তখন তোকে সঙ্গে নিয়ে বোলপুর যাব। ততদিন তুই তোর সুকেশী বৌঠানের জিম্মায় থাকিস।' এ সময় রবীন্দ্রনাথ থাকতেন শান্তিনিকেতনে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি ক্রমশই তার পূর্বমহিমা হারাচ্ছিল। সেটাই স্বাভাবিক। উনিশ শতকে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল এই বাড়িটি, বিশ শতকে বিশ্ববিখ্যাত হয়ে উঠলেন এই বাড়িরই একটি মানুষ—একক ব্যক্তিত্ব প্রাধান্য লাভ করল। তিনি এই বাড়িটিকে নয়, নিজের কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিলেন শান্তিনিকেতনকে। সেখানে গড়ে উঠল ঠাকুরবাড়ির ঘরোয়া পরিবেশ। এ বাড়ির মেয়েরাই সেখানে গড়লেন 'আলাপিনী সভা'—'আনন্দমেলা' প্রকাশিত হল হাতে লেখা মেয়েদের পত্রিকা—'শ্রেয়সী', 'ঘরোয়া' আরও কত কী। হেমলতা, কমলা সবাই সেখানে। ইন্দিরা ও প্রতিমা রয়েছেন সেখানে। সুকেশীও ছিলেন, কখনও বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে থিয়েটার করতেন, কখনও নানারকম ঠাট্টার রান্না করে লোক ঠকাতেন। একবার ক্ষিতিমোহন সেনকে ঠকিয়েছিলেন কুমড়ো কেটে তৈরি করা ইলিশমাছ দিয়ে। পৌষ মেলার সময়, মীরার সঙ্গে সুকেশীও নিচু বাংলোয় হেমলতার ঘরের সামনে একটি খেলনার দোকান খুলেছিলেন। মীরা লিখেছেন, '...জিনিস বিক্রি হইল মন্দ নয়। ...সুকেশী দেবীর বালক-ভৃত্য লক্ষ্মণের গলায় ঝুলানো হল এক প্ল্যাকার্ডে 'শীঘ্র আসুন, শীঘ্র আসুন, বউঠাকুরানির হাট' লিখিয়া ছেলেটিকে আসরে ঘুরিতে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। ...অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত সমানে এবং আনন্দে মেলা চলিতে লাগিল।' অল্প কয়েকদিনের ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে সুকেশী চিরবিদায় নেন।

সংজ্ঞার মনে স্বাভাবিকভাবেই ব্রাহ্ম সংস্কার প্রবল ছিল। সব বাধা কাটিয়ে যখন গেলেন তখন দিদির গুরুদেবের সঙ্গে দেখা হল না, হল তাঁর শিষ্যের সঙ্গে। 'তাঁহার দর্শন প্রাপ্তিমাত্র আত্মহারা হইয়া ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম।' তিনি দীক্ষা দিলেন সংজ্ঞাকে, মন শান্ত হল। দীক্ষা নেবার আগে সুরেন্দ্রর অনুমতি নেননি সংজ্ঞা। কিন্তু গুরু দর্শনের জন্যে সংজ্ঞার কাশী যাবার সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন সুরেন্দ্র। দীক্ষা নেবার পরেও অবশ্য সংজ্ঞার বিষণ্ণতা দূর হয়নি। বাঞ্ছিতের সন্ধানে যাঁর যাত্রা শুরু করার কথা, সংসার তাঁকে বাঁধবে কী করে? এমন সময় তাঁর হাতে এসে পড়ল 'সাধন সমর' বইখানি। পড়ে সাময়িক শান্তি পেলেন। আধ্যাত্মিক পথে সংজ্ঞার অনুসন্ধান শেষ হবার আগেই গ্রন্থপ্রণেতা সত্যদেব ঠাকুর, যাঁকে তিনি মনে করতেন শিক্ষাগুরু এবং দীক্ষাদাতা গুরু সচ্চিদানন্দ স্বামী—দুজনেই পরলোক গমন করলেন। ব্যাকুলতা নিয়ে সংজ্ঞা ছুটে গেলেন আরও অনেকের কাছে। সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে সংসারের সব বন্ধন ছিন্ন করে সংজ্ঞা বেরিয়ে পড়লেন পথে। হরিদ্বারে আনন্দময়ী মায়ের কৃপায় ঈপ্সিত সন্ন্যাস পেলেন দীক্ষা নেবার কুড়ি বছর পরে। গৃহজীবনের শেষ বন্ধন নামটি জীর্ণ পাতার মতো খসে পড়ল সংজ্ঞার জীবন থেকে। মুণ্ডিত মস্তক গৈরিকধারিণী স্বরূপানন্দ সরস্বতী হয়ে ঠাকুরবাড়ির বউটি বেরোলেন তীর্থ ভ্রমণে। অনুসন্ধান কি শেষ হয়? কাশীতেই দর্শন পেলেন অসীমানন্দ সরস্বতীর। অসীমানন্দ নিজে এসে তাঁকে সাধন দিলে চমকে উঠলেন স্বরূপানন্দ, লোকের মুখে মুখে তখন তিনি সাধুমা, এ যে সেই একই মন্ত্র, যা পেয়েছিলেন প্রথম দিনে, তা-ই পেলেন জীবনের শেষ প্রান্তে এসে। এই শেষ দীক্ষা, মন শান্ত হল।

সাহিত্যচর্চায় সংজ্ঞার আগ্রহ না থাকলেও কয়েকটি কবিতায় তাঁর প্রাণের তীব্র ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। কবিতাগুলি সংকলিত হয়েছে 'কৃপাকণা'য়। প্রতিটি কবিতাই আধ্যাত্মিক সুরে বাঁধা। সহজ সরল প্রাণের আকুতি বলেই 'পূর্ণমা' পড়তে ভাল লাগে।

'নারীর দেহে এ ভবেতে হে
লভিয়া জনম আজিকে আমি।
মাতৃত্ব যে কি তাহা তো জেনেছি,
এ দেহ সার্থক হয়েছে স্বামী।
রেখ না মোরে ক্ষুদ্র মা করে
ধরণীতে কর গো পরিচিত,
সবারি যে মা হব গো হেথা
সে রূপে হয়ে পূর্ণ বিকশিত।
কল্যাণকামী মঙ্গলকামী
মাতৃরূপিণী আমায় হেরি
ধরার অন্যা পুত্র ও কন্যা
চারিপাশে মোর দাঁড়াক ঘেরি।'

স্বরূপানন্দ সরস্বতীর অবিরাম তীর্থভ্রমণ, আশ্রমবাস ও সাধুসঙ্গের কথা হয়তো জানাই যেত না, যদি না কল্যাণী দত্ত আকস্মিকভাবে তাঁর সাক্ষাৎ পেতেন। নিম্বার্ক আশ্রমে সাধুমার সন্ধান পেয়ে তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। সত্যেন্দ্রনাথের প্রাসাদোপম বাড়ির কথা শ্রীমতী দত্তের জানা ছিল, ভুবনেশ্বরে দেখলেন সাধুমার আস্তানা 'কোনওকালে সেই গোয়ালে গোরু ছিল, তখনও একটা ঘর ঘুঁটে আর খড় বোঝাই, অন্যটায় সাধুমা...ওই ঘুঁটের ঘরের পাশে সাধুমাকে নির্বিকার প্রশান্ত মুখে বসে থাকতে দেখামাত্রই আমি তাঁর ভক্ত হয়ে পড়ি।' লিখেছেন কল্যাণী দত্ত। তাঁর অনুরোধেই সাধুমা তাঁকে পূর্বাশ্রমের কথা বলেন এবং আত্মকথার খাতাটি তাঁর হাতে তুলে দেন।

হেমেন্দ্র পরিবারেও এসেছিলেন কয়েকজন বধূ। হিতেন্দ্রনাথের স্ত্রী সরোজিনী, ক্ষিতীন্দ্রনাথের দুই স্ত্রী ধৃতিমতী ও সুহাসিনী এবং ঋতেন্দ্রনাথের স্ত্রী অলকা কোনওরকম প্রগতিপন্থী কাজের সঙ্গে যুক্ত হননি। তিন ভাইয়েরও কেউই এ সময়ে তাঁদের বাবার মতো স্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহী ছিলেন না। বরং তাঁরা যেন একটু বেশিমাত্রায় রক্ষণশীল হয়ে ওঠেন। এর কারণ কী ছিল তা জানা যায় না। বরং কিছুটা শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন বলেন্দ্রনাথের স্ত্রী সাহানা। মাত্র তেরো বছর বয়সে ঠাকুরবাড়ির বউ এসেছিলেন সুশীতলা। পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবারের দৌহিত্রী তিনি, থাকতেন বাংলাদেশের বাইরে। বলেন্দ্রনাথের মতো গুণবান স্বামীকে পেলেন তিনি, সেই সঙ্গে নতুন নাম সাহানা। মাত্র ষোলো বছর বয়সেই সব সাধ আহ্লাদ ঘুচিয়ে বিধবার শুভ্র সাজে ফিরে যেতে হল তাঁকে। সময় অনেকটা বদলেছে। সাহানার বাবা স্থির করলেন মেয়ের আবার বিয়ে দেবেন। কিন্তু বিধবা বিবাহে মহর্ষির ঘোর আপত্তি ছিল। সম্মতি ছিল না উদারচেতা ঠাকুরবাড়ির একজনেরও। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এলাহাবাদে গেলেন সাহানাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফিরিয়ে আনতে। অথচ এর কয়েক বছর পরেই তিনি বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে নিজের মত বদলান। রবীন্দ্রনাথের কথায় সাহানা তাঁর সঙ্গেই শ্বশুরবাড়িতে ফিরে এলেন। মৃণালিনীকে কবি লিখেছিলেন, '...সুসি এবং তার মার সঙ্গে দেখা হয়েছে। সুসি যেতে রাজি হয়েছে তার মাও সম্মতি দিয়েছেন ...যে রকম বাধা পাব মনে করেছিলুম তার কিছুই নয়। ভাল করে বুঝিয়ে বলতেই উভয়েই রাজি হয়ে গেল।'

জোড়াসাঁকোয় ফিরে এসে সাহানা মন দিলেন লেখাপড়ায়। শিলাইদহে আগেই তিনি লরেন্সের কাছে ইংরেজি শিখেছিলেন, মাধুরীলতার সঙ্গে পড়তেন 'বিসর্জন', 'বাল্মীকিপ্রতিভা' কিংবা 'মায়ার খেলা'। বাড়িতে ফিরে আসার পর প্রফুল্লময়ী বালিকা বধূকে স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। 'ভাবিলাম লেখাপড়ার ভিতর নিজের মনকে নিয়োগ করতে পারিলে মনে অনেকটা শান্তি পাইবে।' সাহানা সম্ভবত পড়তেন লোরেটোয়। স্কুলের পড়া শেষ করে তিনি টিচার্স ট্রেনিং নেবার জন্যে বিলেতেও গিয়েছিলেন। ইচ্ছে ছিল হাতে-কলমে কিছু ট্রেনিং নিয়ে আসার। আসলে সাহানা এক সময়ে বিজ্ঞান পড়তে চেয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে। চিঠি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে, হয়তো মনে পড়েছিল এলাবাহাদের কথা। কবির কথাতেই তিনি চলে এসেছিলেন জোড়াসাঁকোয়, মনে কোনও দ্বিধা না রেখে। কিন্তু এ সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁকে একেবারেই উৎসাহ না দিয়ে লিখলেন, 'আমাদের বিদ্যালয়ে Science পড়াইবার সুবিধা আছে বটে কিন্তু Laboratairy-তে তোমাকে শিক্ষা দিতে গেলে সকলের সামনে তোমাকে বাহির হইতে হইবে—সে কি সম্ভব হইবে?' এ কথার অর্থ বুঝতে রীতিমতো কষ্ট হয়। ঠাকুরবাড়িতে মেয়েরা কি আবার পরদার আড়ালে আত্মগোপন করছিলেন? প্রফুল্লময়ী সাহানার সব আবদার-অনুরোধ রক্ষা করবার চেষ্টা করতেন। সাহানা বেড়াতে ভালবাসতেন বলে পাঠিয়েছিলেন কাশ্মীরে, উচ্চশিক্ষার জন্যে বিলেতে পাঠাতেও আপত্তি করেননি, তাহলে শান্তিনিকেতনে কেন তিনি সকলের সামনে বেরোতে পারবেন না? দুর্বল স্বাস্থ্যের জন্যে সাহানাকে কিছুদিন পরেই ফিরে আসতে হয় বিলেত থেকে। সাহানার কথা ঠাকুরবাড়ির কেউ কিছু ভাবেননি, এমনকী রবীন্দ্রনাথও নয়। শুধু প্রফুল্লময়ী লিখেছেন, 'আমিই তাহার একমাত্র সহায় ছিলাম।' নিতান্ত অসময়েই একসময় নিভে যায় সাহানার জীবন প্রদীপ।

প্রতিমা ঠাকুরবাড়িরই মেয়ে আবার ঠাকুরবাড়ির বউও। এ অবশ্য নতুন কিছু নয়। পিরালি হবার জন্যে এই পরিবারে কাছাকাছি সম্পর্কের অথচ রক্তের সম্বন্ধহীন স্ত্রী-পুরুষের বিবাহ হত। পরেও এ ধারাটি রয়ে যায়। আভিজাত্যের নীল রক্ত স্বভাবতই বিভিন্ন শাখায় ছড়িয়ে পড়তে চায় না। ফলে, ঘরের মেয়েকে বধূ করে নিয়ে আসার প্রবণতা ঠাকুর পরিবারে বরাবরই ছিল।

সঙ্গে। তিনি ঢাকার প্রখ্যাত ব্রাহ্ম নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র। নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের মেয়ে সরলাবালার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের। নবকান্ত নিজেও প্রগতিপন্থী, নারীমুক্তি আন্দোলনে বিশ্বাসী এবং প্রচারক ছিলেন। অবশ্য নগেন্দ্রনাথের বিয়ের সময় তিনি ছিলেন না, ১৯০৪ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু ঢাকায় তিনি ইডেন ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে এবং 'ঢাকা শুভসাধিনী সভা', 'ঢাকা যুবতী বিদ্যালয়', 'অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সভা', 'ঢাকা জনসাধারণ সভা', 'অন্যান্যরূপ হিতকারী সভা' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থেকে সেখানে একটি সুস্থ প্রতিবেশ রচনায় সক্ষম হন। তাঁর পুত্রও একই সাহসের পরিচয় দিলেন।

বিবাহ স্থির হবার পরে নগেন্দ্রনাথ সে কথা রবীন্দ্রনাথকে জানালেন কবি অত্যন্ত খুশি হলেন এবং নিজে আচার্যের কাজ করবেন জানালেন। প্রতিমাকে এ বিয়ে নিয়ে বিশেষ আলোড়ন উঠেছিল কিনা তা জানা যায়নি। নগেন্দ্রনাথ অত্যন্ত সাহসী এবং দৃঢ়চেতা ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যেমন মেয়েদের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী তেমনই বিধবা মেয়েদের আবার বিয়ে দিতেও ভয় পাননি। সামাজিক অবমাননার ভয় যা ছিল তার অনেকটা কেটে গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের সক্রিয় ভূমিকায়।

সুকেশীর দ্বিতীয় বিবাহের ফল ভালোই হয়েছিল। সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে স্বামী-সন্তানদের নিয়ে তাঁর জীবন ছিল পরিপূর্ণ। পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা সংসারের বাইরে বড় একটা বেরিয়ে পড়েননি বলে ঢাকার প্রগতি আন্দোলনে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সুকেশীকে কোনও ভূমিকা নিতে দেখা যায়নি। তবে নিজের সংসারটিকে তিনি সুন্দর আকারে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রতিমার সঙ্গেও পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরদের যোগ ছিল, তাঁর বাবা শেষেন্দ্রভূষণ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র ছিলেন। জোড়াসাঁকোতে প্রথম বিয়ে হল রথীন্দ্র ও প্রতিমার। কবি এর পরে লাবণ্যলেখার বিয়ে দিয়েছিলেন প্রিয় শিষ্য অজিতকুমার চক্রবর্তীর সঙ্গে। গভীর ইচ্ছা ছিল তাঁর নিজের পুত্রবধূ অর্থাৎ সোমেন্দ্রের বিধবা স্ত্রী কুমুদিনীর আবার বিয়ে দেবেন। কুমুদিনীর প্রবল আপত্তিতে তা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া এ ব্যাপারে পাত্রপক্ষের উদারতা ও এগিয়ে আসার সাহস মস্ত বড় ভূমিকা নেয়। প্রতিমার ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল, অন্যদের ক্ষেত্রেই তা হয়নি।

সমস্ত সামাজিক বাধা অগ্রাহ্য করে প্রতিমা রবীন্দ্র পরিবারে গৃহলক্ষ্মী হয়ে প্রবেশ করলেন। সত্যিই তিনি ছিলেন মূর্তিমতী লক্ষ্মীশ্রী। প্রত্যক্ষদর্শীদের চোখে তাঁর রূপের কাছে মাধুরীলতার রূপও নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল। প্রতিমার মুখের শান্ত, শ্রী, সুকুমারতার ভাব ভাল লেগেছিল কবির। কবি চিঠিতে লিখলেন, '...তোমাদের মধ্যে ও আমার সংসারের মধ্যেও সেই পবিত্র পরম পুরুষের আবির্ভাব বাধামুক্ত হয়ে প্রকাশ পাক এই আমার অন্তরের একান্ত কামনা। তোমার মনের মধ্যে সেই অমল সৌন্দর্যটি আছে—যখন তাঁর জ্যোতি সেখানে জ্বলে উঠবে—তখন তোমার প্রকৃতির স্বচ্ছতা ও সৌন্দর্যের মধ্য থেকে সেই আলো খুব উজ্জ্বল ও মধুর হয়ে প্রকাশ পাবে আমার তাতে সন্দেহ নেই— তুমিই আমার ঘরে তোমার নির্মল হাতে পুণ্য প্রদীপটি জ্বালাবার জন্যে এসেছ—আমার সংসারকে তুমি পবিত্র জীবনের দ্বারা দেবমন্দির করে তুলবে এই আশা প্রতিদিনই আমার মনে প্রবল হয়ে উঠছে।' প্রতিমাই রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের 'মা-মণি', তাঁর পরম আদরের '[illegible]' বা বউমা। দীর্ঘ বত্রিশ বছর ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর সেবা করেছেন প্রতিমা। এই সেবার ভার তিনি নিয়েছিলেন স্বেচ্ছায় এবং সানন্দে।

আর রবীন্দ্রনাথ? প্রতিমাকে পেয়ে আনন্দে উচ্ছল হয়ে প্রিয় বন্ধু এবং মীরার স্বামী নগেন্দ্রকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন মনের কথা, 'ভাই নগেন্দ, তোমাকে অনেকদিন লিখতে পারিনি বোধহয় বুঝতে পারছ—বিয়ের গোলমালে বড় ব্যস্ত ছিলুম। আজ কী পরিপূর্ণ আনন্দ নিয়ে তোমায় লিখতে বসেছি। প্রতিমা এখন আমার—সে আমার ঘরে এসেছে—সে কী চমৎকার মেয়ে তোমাকে কী করে লিখি। আমি যদি তার রূপের বর্ণনা করতে যাই তো সব কথা বিশ্বাস করবে না বা আমাকে Lunatic ভাববে।'

এই রূপবতী গুণবতী মেয়েটির শিক্ষা শুরু হল শান্তিনিকেতনে এসে। মহর্ষি পরিবারে

মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে জোর দেওয়া হত। প্রতিমার নিচুপরিবারের আধুনিক শিক্ষার প্রতি মেয়েবেলার আগেই মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেল বলে রবীন্দ্রনাথ প্রতিমার শিক্ষার ভার নিজেই নিয়েছিলেন। তাঁর সর্বকালের সঙ্গিনী শিক্ষয়িত্রী কেমন হবেন, তিনি তাঁহার সঙ্গিনী হইয়া থাকিবেন তাঁহার ছেলেদের সহিত মিশিবার উপযুক্ত সামাজিক ভদ্রতার জন্য বিশেষভাবে একজন আবশ্যক।' তিন চুক্তি কিছুদিন প্রতিমার শিক্ষয়িত্রী হিসেবে ছিলেন। কবি নিজেও দৃষ্টি রাখতেন। একবার শিলাইদহ থেকে প্রতিমাকে লিখেছেন, 'তোমাকে পড়বার জন্যে কবিতাকে বলে এসেছিলুম পৌঁছেছে। তোমার পড়া চলছে তো? ইংরেজি পাঠ অনেকখানি তো শেষ হয়ে গেছে—আর একটা বই তোমার জন্যে ঠিক করে দিয়েছিলুম সেটা বেশ বুঝতে পারছ তো? সে বইটা ইংরেজি পাঠের চেয়ে আর নয় বলে হলেও।' আবার লিখেছিলেন, 'রেবতবর কথা থেকে বাংলা গদ্য ও পদ্য কিছু কিছু পড়ে দেখো। একখানি খাতা করে লিখবার সেই চেষ্টা দেখো।'

এই চিঠি পড়ে বোঝা যায় বিয়ের পরে প্রতিমার শিক্ষার মান কী ছিল। কিন্তু অসাধারণ তাঁর ইচ্ছাশক্তি। মাত্র কয়েক বছরে তিনি সব বিষয়ে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। তাঁর লেখার ভঙ্গিটিও চমৎকার। 'স্মৃতিচিত্র' গ্রন্থে নিজের কথা বলতে গিয়েই তিনি জানিয়েছেন, 'সকল তখন ছেলেমো। আমার স্বামীর বয়স একুশ। পাঁচ বছর মাতৃপ্রতিষ্ঠিত পাশেই হয় বছর দশকেরটি... বাড়ির মধ্যে বেশি কিছু তফাত মনে হল না, কিন্তু ভাবের দিক মনে হল অনেকখানি। জোড়া বাড়ির আবার বাড়ি ও বাগের বাড়ি তখনও হিন্দুসমাজভুক্ত, তাঁদের আচার ব্যবহার সকল, জীবনযাত্রার প্রণালী সবই সনাতনপন্থীদের মতো, ব্রাহ্মসমাজের আবহাওয়ায় পরিপূর্ণ জীবনযাত্রা ও নতুনের আভাস পাওয়া যায়।' প্রতিমার এই কথা থেকেই বোঝা যায়, সেদিন মাত্র বোলো বছরের মেয়েটির চোখেই দুটি সংস্কৃতির ভিন্ন রূপ ধরা পড়েছিল। গ্রহণ করার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর, নতুন ব্যবহারিক আচার করতে কোনও অসুবিধেই হয়নি। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা তাঁর প্রতিভার পাশে নতুন রূপ দিল।

শিল্পক্ষেত্রে প্রতিমার দান কম নয়। তিনি ভাল লিখতে পারতেন, পারতেন ভাল ছবি আঁকতে। সবচেয়ে বড় কথা হল, তাঁর লেখা 'গুরুদেবের ছবি' রবীন্দ্রনাথের চিত্র বিষয়ক প্রামাণ্য গ্রন্থ।

'তাঁর কবিতার ভাব ও ছন্দের যেমন নিজস্ব বিশেষত্ব আছে, ছবির দিক থেকেও তিনি তেমনি কারও। কোনও দিক থেকেই সেগুলি কারও অনুকরণ নয়। ...এই চিত্রে মানুষের অন্তরটি যদি কবি উপন্যাসের আকারে লিখতেন, তাহলে দেখাত সাধীন চিন্তা বিশিষ্ট পরিচিত চেনা মানুষের ছবি ইত্যাদি। সেই তিনি আবা দেখে ছবি আঁকতেন, তখনি তুলির মুখে সেই মানুষজনের রূপ ফুটে উঠত নতুন চরিত্রচিত্রের সমাবেশে। উপরন্তু আটিস্টরা যে রকম নিয়ে ছবি শেষ করেন, তাঁদের সেই শেষের কথা দিয়েই গুরুদেবের ছবি আরম্ভ হয়েছে। সাধারণত আর্টিস্টরা ছবির ভূমিকা থেকে ছবি আঁকেন। চিত্রের চরিত্রসমূহ, পরিস্থিতি এবং রং-এর ভাবনা প্রথম থেকেই মনের মধ্যে চিন্তা করে নেন। তারপর চিত্র রূপ লাভ করে ওঠে, তখনি আছে তাঁদের হাতের কাজ। কিন্তু কবির ছবি তাঁর হাতের মধ্যেই গড়ে উঠে যেত। ছবির আইডিয়া বা কম্পোজিশন তাঁর আঙুলের ডগা থেকেই যেন স্বতঃ উদ্ভাসিত হয়ে বিস্তৃত হত। তার মধ্যে সচেতন মনের কোনও কথা কোনও যোগ্যতা থাকত না। তিনি নিজেই তাই বলতেন, "আমি আঁকি, তখন ছবির প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন চিন্তাই আমার থাকে না। কেবল আঁচড়ের সঙ্গে আঁচড় মিলিয়ে রেখার আনন্দ আমার চিত্রকর করে তুলেছে।" ...বস্তুত আকারে তিনি কোনও আর্টিস্ট বা টেকনিকের অনুসরণ করেননি, তুলিতেও তিনি কারও কোনো অনুকরণ করেননি। তাঁর সর্বতোমুখী প্রতিভার কোনোখানে কিছু ঘাটতি পড়েনি।'

রবীন্দ্র চিত্রকলাকে তিনি ভাল করে চিনিয়ে দিয়েছেন, কবির আঁকা প্রাকৃতিক দৃশ্য ও

জীবজন্তু যেমন ফরাসিজাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তেমনি মানুষের মুখের প্রতিকৃতি মনোহরণ করেছিল জার্মানদের। কিন্তু আসলে এসব ছবিকে বিশ্লেষণ করা যায় না। সৃষ্টির এমন এক সত্যকে এরা অনুভূতি দিয়ে প্রকাশ করছে যার ব্যাখ্যা চলে না। 'দিব্যদৃষ্টি দিয়ে কেউ যদি সে জিনিস ধরতে পারল তো বুঝল। নইলে খনির ভিতর মণির মতো তার দীপ্তি রইল ঢাকা।' রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ বয়সে ছবি আঁকলেন দু' হাজারেরও বেশি। ছবি তাঁর 'শেষ বয়সের প্রিয়া'—জীবন সায়াহ্নে যে আসে সে সবচেয়ে বেশি অভিনিবেশ দাবি করে। কবির চোখের সামনে ফুটে উঠেছিল আর একটা জগৎ, রঙে-রেখায় তিনি তাকে স্পষ্ট করে তুললেন। প্রতিমার মতে, রবীন্দ্রনাথ কবিতায় যেমন একটা সৃষ্টির সম্পূর্ণ চেহারা দিয়েছেন, চিত্রেও তেমনি বস্তুপ্রবাহের আবর্তনের ইতিহাস এঁকেছেন। 'গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে যে ঘূর্ণ্যমান গতি তেজের চাপে রচনার কাজে নিরন্তর নিযুক্ত, তারি জোয়ার-ভাটার টানে রেখা হতে রেখান্তরে প্রাণী ও জড়জগতের চেহারা ছাঁচে ঢালাই হয়ে বেরিয়ে আসছে। শিল্পীর মনে লেগেছিল সেই স্রোতের ঢেউ। ব্যক্তিত্বের রসে মজে তাই তুলির টানে বেরিয়ে এল রূপ হতে রূপান্তরে সৃজিত অপরূপ মানুষ পশুপক্ষী ও দৃশ্য।'

এ তো গেল প্রতিমার চিত্র সমালোচনার কথা। প্রতিমা নিজেও ভাল ছবি আঁকতেন। মামা অবনীন্দ্রনাথের কাছেই হাতেখড়ি। তাঁর মা-মাসি-মামারা সকলেই ছবি আঁকতেন, বিয়ের পর কিছু শিখেছিলেন ইতালিয়ান শিক্ষক গিলহার্ডির কাছে। পরে নন্দলাল বসুর সঙ্গে কাজ করতে করতেও শেখেন। কয়েকটি ছবিতে তাঁর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। কারুশিল্পের প্রতি গভীর টান ছিল প্রতিমার। কবির সঙ্গে বিশ্ব ভ্রমণের সময় যখন যে দেশে গিয়েছেন সেই দেশের হস্তশিল্পের সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করেছেন এবং সেটি নিয়ে এসেছেন শান্তিনিকেতনে। ইন্দোনেশিয়া গিয়ে কাপড়ের ওপর বাতিকের কাজ দেখে সেই শিল্পকে সযত্নে নিয়ে আসেন কলাভবনের শিক্ষাক্রমে। ফ্রান্স থেকে সেরামিকসের কাজ শিখে এসে শ্রীনিকেতনে শেখাবার ব্যবস্থা করেন। রথীন্দ্রনাথের কাঠ ও চামড়ার কাজের সঙ্গে তাঁর নিজের দেখা বিদেশি নকশা মিশিয়ে দিতে চাইতেন, গড়ে উঠত নতুন ধরনের ট্রে, ফুলদানি, নানারকম পাত্র কিংবা ল্যাম্পশেড। আজ কাপড়ে বা চামড়ার ব্যাগে, মোড়ায় বা ঘর সাজানোর উপকরণে শান্তিনিকেতনের বৈশিষ্ট্য বলে যা দেখা যায়, বলতে গেলে তার সবটাই প্রতিমার দান।

ছবির সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল কথার ছবি আঁকা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাম দিলেন কল্পিতাদেবী। এই নামে প্রতিমা অনেক কবিতা লেখেন। প্রতিটি কবিতা লিখে তিনি দেখাতে যেতেন কবিকে। ভয়ে বুক ঢিপঢিপ করত অথচ না দেখিয়েও তৃপ্তি নেই। কবি মন দিয়ে দেখতেন। মাঝে মাঝে কলম চালিয়ে তাতে এনে দিতেন দীপ্তি। আবার কখনও বা প্রতিমার লেখা কবিতাটাকে ভেঙেচুরে নতুন করে লিখে দেখাতেন ভাষা বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে কবিতাটাই কেমন নতুন হয়ে ওঠে। যেমন, 'স্মৃতি' কবিতায় প্রতিমা লিখলেন,

'এই গৃহ এই পুষ্পবীথি
যারে ঘেরি একদিন তোমার কল্পনা
গড়েছিল ইমারত দীপ্তি গরিমার,
উত্তপ্ত কামনা তব যার প্রতি ধূলির কণায়
জীবন্ত করিয়াছিল তব মুহূর্তেরে।
যে বাসনা মনে ছিল পুরিল না
অবসন্ন প্রাণ
গেল চলে ছায়া ফেলে অঙ্গনে প্রাঙ্গণে।'

রবীন্দ্রনাথ তারা বদলে লিখলেন:

'এই ঘর এই ফুলের কেয়ারি
একে ঘের দিয়ে তোমার খেয়াল
বানিয়েছিল পরীস্থানের ইমারৎ।
তোমার তপ্ত কামনা
রাঙিয়েছিল তার প্রত্যেক ধূলিকণাকে
তার প্রত্যেক মুহূর্তকে করেছিল তোমার আবেগ দিয়ে কম্পিত।
তুমি চলে গেলে,
অকৃতার্থ আকাঙ্ক্ষার ছায়া ভেসে বেড়াচ্ছে
অঙ্গনে প্রাঙ্গণে।'

কবির সঙ্গে কল্পিতার এই ধরনের কবির লড়াই প্রায়ই হত। তাঁর গদ্য রচনাতে চোখে পড়বে 'লিপিকা'র বিশিষ্ট ভঙ্গি। সে যেন গদ্য নয়, গদ্য কবিতা। 'নটী', 'মেঘদূত' '১৩ই ফাল্গুন', 'সিনতলা দুর্গ', সবই এক সুরে বাঁধা। প্রতিমার লেখা 'স্বর্গবিলাসী' পড়ে কবি মুগ্ধ হয়ে লেখেন 'মন্দিরার উক্তি'। পুত্রবধূকে অনুরোধ করেন তার পরের অধ্যায় 'নরেশের উক্তি' লিখতে। অর্থাৎ কবি লিখবেন 'নারীর উক্তি' আর প্রতিমা লিখবেন 'পুরুষের উক্তি'। এভাবেই উপন্যাস সম্পূর্ণ হবে। কিন্তু কবির সঙ্গে হাত মিলিয়ে গল্প লেখা? কল্পিতা রণে ভঙ্গ দিলেন।

এ ছাড়া প্রতিমা লিখেছেন কিছু স্মৃতিকথা। মায়ের ডায়রি 'কাহিনী' অবলম্বনে লেখা হয় 'স্মৃতিচিত্র'। এতে পাঁচ নম্বর বাড়ির মেয়েদের কথা আছে। যেমন উৎসবের সাজের কথা। দেবেন্দ্রপরিবারে মূর্তিপুজো বন্ধ হয়ে গেলেও গায়ে লাগানো পাশের বাড়িতে বেশ ঘটা-পটা করেই দোল দুর্গোৎসব হত। হবে নাই বা কেন? তখনকার কলকাতায় এই তো ছিল দস্তুর। প্রতিমা লিখেছেন:

'প্রতি উৎসবেই মেয়েদের তখন বিশেষ সাজ ছিল। বাসন্তী রঙে ছোপানো কালো পেড়ে শাড়ি, মাথায় ফুলের মালা, কপালে খয়েরের টিপ—এই ছিল বসন্ত পঞ্চমীর সাজ। দুর্গোৎসবে ছিল রঙবেরঙের উজ্জ্বল শাড়ি, ফুলের গয়না, চন্দন ও ফুলের প্রসাধন।

'দোল পূর্ণিমারও একটি বিশেষ সাজ ছিল, সে হল হালকা মসলিনের শাড়ি, ফুলের গয়না আর আতর গোলাপের গন্ধমাখা মালা। দোলের দিন সাদা মসলিন পরার উদ্দেশ্য ছিল যে আবিরের লাল রং সাদা ফুরফুরে শাড়িতে রঙিন বুটি ছড়িয়ে দেবে।'

প্রতিমার বিবরণে গয়নার কথা নেই। গগনেন্দ্রের ছোট মেয়ে সুজাতা আমাদের জানিয়েছেন, সে সময় দিনে সোনার গয়না, বিকেলে মুক্তোর গয়না এবং রাতে হিরে জহরতের জড়োয়া গয়না পরার রেওয়াজ ছিল। বিয়েবাড়িতে কিংবা উৎসবের দিনে তাঁরা এভাবেই সাজতেন। দিনের সোনালি আলোয় সোনার জৌলুস বাড়ে, রাতের আলো হিরে জহরতে ঠিকরে পড়ে, শুধু মুক্তোর ভূমিকাটাই যেন স্পষ্ট হল না। বিকেলের আলো-আঁধারি আর মন-কেমন-করা গোধূলি আলোয় মুক্তোই বোধহয় সবচেয়ে ভাল দেখায়।

সম্প্রতি প্রতিমার 'স্মৃতিচিত্র' গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে। এর দ্বিতীয়াংশে রয়েছে প্রতিমার নিজের কথা এবং কয়েকটি প্রবন্ধ ও দুটি গল্প। সম্পাদক সুনীল জানা জানিয়েছেন, 'অদ্যাবধি অপ্রকাশিত এই রচনাগুলির পাণ্ডুলিপি ঘটনাক্রমে হঠাৎ আমার হাতে আসে। ...আমার আগ্রহাতিশয্যে সুনন্দনবাবু তাঁদের শান্তিনিকেতনের 'ছায়ানীড়' বাড়ি থেকে অনেক খুঁজেপেতে দুটো পুরনো ফাইল আমাকে দেন। ফাইল দুটো তাঁর বাবা স্বর্গত গিরিধারী লালামশায়ের। সেই ফাইলের নানা কাগজপত্রের মধ্যে অবিন্যস্তভাবে পেয়ে যাই প্রতিমাদেবীর এই পাণ্ডুলিপিগুলি।'

এর মধ্যে 'গল্প-এক' সম্বন্ধে পাঠকমাত্রেরই আগ্রহ হওয়া উচিত। যদিও সম্পাদকমশাই এ

বিষয়ে কোনও আলোচনা করেননি। এই গল্পটি কি প্রতিমাকে তাঁর 'বাবামশাই' দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অনেককেই গল্পের বীজ জোগাতেন। চারুচন্দ্র, শরৎকুমারী, মাধুরীলতার কথা আমরা জানি, আরও অনেকে থাকতে পারেন। বিশেষ করে পুত্রবধূ প্রতিমা ছিলেন তাঁর কাছের মানুষ। তাঁদের মধ্যে চলত গল্প লেখার খেলা, কবিতা বদলের কারিগরি। একেবারে শেষ বয়সে লেখা কবির 'বদনাম' গল্পটির সঙ্গে প্রতিমার 'গল্প- এক'-এর মিল দেখে চমকে উঠতে হয়। 'বদনাম'-এর প্রকাশকাল আষাঢ় ১৩৪৮। প্রতিমার গল্পের খসড়ায় তারিখ নেই। পার্থক্য আছে খানিকটা। প্রতিমার গল্পে সদু তার স্বামীকে বলেছে,—'আমি পিছিয়ে থাকব না। আমিও সঙ্গে সঙ্গে যাব। তবে এত সাহস কি তোমার হবে যে, তুমি কোর্টে দাঁড়িয়ে বলতে পারবে, এই লোক তোমার স্ত্রীর প্রণয়ী—কাগজে বেরোবে তোমার গৃহিণী সৌদামিনী দেবীর অপূর্ব কীর্তির কথা, পারবে সে সব সইতে?'

'বদনাম' গল্পে সদু স্বামীকে ভয় দেখায়নি। অনিলকে বাঁচাবার জন্যেও বলেনি, শুধু বলেছে, 'খুনি পরেই সমাজের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কিরকম নিন্দায় ভরে উঠবে আমি তা জানি। ...আমি চিরদিন তাঁর পিছন পিছন থেকে শাস্তির শেষ পালা পর্যন্ত যাব। তুমি সুখে থেকো। তোমার ভয় নেই। ইচ্ছা করলেই তুমি নূতন সঙ্গিনী পাবে। ...প্রাণপণে তোমার সেবা করেছি ভালোবেসে, প্রাণপণে তোমাকে বঞ্চনা করেছি কর্তব্যবোধে, এই তোমায় জানিয়ে গেলুম।'

এই অংশে যে পরিমার্জনা রয়েছে তাতে কবির হাত পড়েছে নিঃসন্দেহে। কিন্তু মূল গল্পটি কি প্রথমে প্রতিমা লিখেছিলেন? কিংবা একই বিষয় নিয়ে দুজনেই গল্প লিখতে বসেছিলেন, প্রবণতা অনুযায়ী সদুর উক্তি দুজনের হাতে দু রকম হয়েছে। প্রতিমার সদু রক্ত মাংসে গড়া, মাটির কাছাকাছি, রবীন্দ্রনাথের সদু আদর্শ নারীর আদলে গড়া। 'বদনাম' রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে প্রকাশিত শেষ গল্প এবং তিরোধানের তিন মাস আগে লেখা। সেজন্য হয়তো আলোচনার বৃত্ত থেকে বাইরে থেকে গিয়েছে।

প্রতিমার লেখা দ্বিতীয় গল্পটিও নামহীন 'গল্প-দুই'। সম্পাদকের অনুমান, গল্পটি অসমাপ্ত, 'হয়তো আর লেখা হয়নি। কিংবা পরবর্তী অংশ হারিয়ে গেছে।' এ গল্পটি যুদ্ধ ও মন্বন্তরের পটভূমিতে লেখা। একেবারে অন্য ধরনের গল্প।

'...এই সময় দু-তিনজন ইউনিফর্ম পরা ইয়োরোপীয়ানের সঙ্গে একটি বাঙালি মেয়ে গাড়িতে উঠল। প্রথমটা চিনতে পারিনি। তারপর দেখি, ওমা তাই তো—এ যে আমাদের শীলা। কলেজে একসঙ্গেই পড়েছি। তার সাজ দেখে প্রথমটা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলুম। শাড়ির উপরে খাকি কোট পরা, পিতলের বোতাম লাগানো। কাঁধের পাশ থেকে ঝোলানো ব্যাগ। মাথায় টাররা করে খাকি টুপি। তার উপর ভুরু ও ঠোঁট পেন্ট করা।

শীলার এ মূর্তি চিনব কী করে। কলেজে সে ছিল খদ্দর শাড়ি পরা চূড়ান্ত স্বদেশী। দেশের আবহাওয়া যে যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে কতখানি পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে, তা আমরা বুঝতেই পারছি না। কেবল কলকাতার পথে-ঘাটে তার একটা চেহারা মাঝে মাঝে চোখে পড়ে।'

প্রতিমার আসল দান কিন্তু ছবি আঁকা বা লেখা নয়, শান্তিনিকেতনে মেয়েদের জন্যে নৃত্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা। যদিও বাঙালিদের মধ্যে নৃত্য শেখার একেবারেই কোনও ব্যবস্থা ছিল না। সেকালে স্টেজের ওপর তাল রেখে দু পা চলাও ছিল রীতিমতো লজ্জার কথা। 'বাল্মীকিপ্রতিভা' বা 'মায়ার খেলা'র সবটাই ছিল অভিনয়, সামান্য হাত নেড়ে একটু আধটু নাচের ভাব আনার চেষ্টা করা হত। তবে দিন বদলাচ্ছে। মেয়েরা এগিয়ে এসেছেন সব কাজে উৎসাহ নিয়ে। নৃত্যেই বা পিছিয়ে থাকলে চলবে কেন? শান্তিনিকেতনে তো এই পরীক্ষা চালানোও অপেক্ষাকৃতভাবে সহজ। তাই আগ্রহী হয়ে উঠলেন প্রতিমা। নিজে তিনি মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন খুব কম। তাঁর বিয়ের অল্প পরেই শান্তিনিকেতনে মেয়েদের প্রথম অভিনয় 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা', প্রতিমা তাতে সেজেছিলেন 'ক্ষীরি'। এরপর নিজে অভিনয় না করলেও যে

কোনও রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের তিনিই ছিলেন প্রাণ। রবীন্দ্রনাথের নিজের মতেও 'চিত্রাঙ্গদা', 'পরিশোধ' নিয়ে নৃত্যনাট্য রচনার কোনও পরিকল্পনা ছিল না। প্রতিমাই একটা খসড়া খাড়া করে কবির কাছে নিয়ে গেলে কবি এই নতুন শিল্পরূপ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠেন। নিরঞ্জন কৌশিক লিখেছেন, 'The dance-drama, with its opera-like origins, would be just a poets dream, on paper or in his mind, if Bouthan does not pick it up at its infancy and nourish it with a feminine flair.'

কিন্তু নৃত্য কে শেখাবে? শান্তিনিকেতনে কীভাবে শেখানো হবে? এ দেশের চোখ নৃত্য দেখতে অভ্যস্ত নয়। তাতে কী? প্রতিমা শুরু করলেন দুরূহ সাধনা। তিনি নিজে নৃত্যশিল্পী নন, কোনওদিন নাচ শেখেননি। অসাধারণ শিল্পবোধের সাহায্যে তাঁকে এগোতে হয়েছে। তবে বাঙালিরা যে এ সময় নৃত্য-সচেতন হয়ে উঠেছে তার ইতস্তত প্রমাণ দেখা যেতে লাগল উদয়শংকরের আবির্ভাবে। অবশ্য তখনও তাঁর নৃত্যসঙ্গিনী কোনও ভারতীয়া নন, বিদেশিনী সিমকি। ভদ্রঘরের বাঙালি মেয়েদের নাচের পথ দেখিয়েছেন রেবা রায়। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে বসন্তোৎসবের আয়োজন করেছিলেন সৌমেন্দ্রনাথ ও আরও অনেকে। উৎসবের শেষ গান 'যে কেবল পালিয়ে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায় ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে' শুরু হতেই রেবা হঠাৎ গানের দল থেকে বের হয়ে এসে উল্কার মতো স্টেজের মাঝখানে, গানের হালকা ছন্দের সঙ্গে শুরু করে দিলেন চপল নৃত্য। কাণ্ড দেখে সবাই তাজ্জব! চোখ কপালে উঠে গেল। 'ছি ছি ছি, ভদ্রঘরের মেয়েরা আবার নাচে নাকি?' বিষোদ্গারে কান পাতা দায়। এর উত্তর দিলেন সৌমেন্দ্র আরও কয়েকদিন পরে। জোড়াসাঁকোর বাড়ির উঠোনে 'নূপুর বেজে যায় রিনি রিনি'র সঙ্গে নাচলেন তিনটি মেয়ে চিত্রা, নন্দিতা ও সুমিতা। আরও বছরখানেক পরে রবীন্দ্রনাথ মঞ্চস্থ করলেন 'নটীর পূজা'। এই সময় ভদ্রঘরের মেয়েদের পথ আরও সুগম করে দিলেন কেশবচন্দ্র সেনের নাতনিরা। ১৯২৮ সালে ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশনের সাহায্যের জন্যে মঞ্চস্থ করা হল 'শ্রীকৃষ্ণ'। কৃষ্ণের বাল্যরূপ দিলেন নীলিনা আর তার পরবর্তী জীবন রূপায়ণের ভার পড়ল সাধনার উপর। সাধনা পরবর্তী জীবনে মধু বসুকে বিয়ে করেন ও মঞ্চ-পর্দায় অনেকবার নর্তকীরূপে উপস্থিত হন। সাধনা শিখেছিলেন ভাল কথক নাচ। 'আলিবাবা', 'রাজনর্তকী', 'দালিয়া' তাঁর অভিনয়ের সাক্ষ্য হয়ে আছে। রেবা রায়ও নিয়মিত ভাবে নাচ শেখাতে লাগলেন 'সঙ্গীত সম্মিলনী'তে। বড় বড় নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠান শুরু করলেন কিছুদিন পরে। যাক সে কথা।

প্রতিমা শান্তিনিকেতনে যা শেখাচ্ছিলেন তাকে ভাবনৃত্য বলাই উচিত। 'বর্ষামঙ্গলে'র দু-একটা নাচে কিছু রূপ দেবার পর প্রতিমা কবিকে 'পূজারিণী' কবিতার নৃত্যনাট্যরূপ লিখে দিতে অনুরোধ করেন। শুধু মেয়েদের দিয়ে সেটি অভিনয় করাবেন কবির জন্মদিনে। লেখা হল 'নটীর পূজা'। দিনরাত খেটে প্রতিমা মেয়েদের দিয়ে অভিনয় করালেন। শ্রীমতীর ভূমিকায় অপূর্ব নৃত্যাভিনয় করে চিরস্মরণীয়া হয়ে রইলেন নন্দলাল বসুর মেয়ে গৌরী। অবশ্য এ অভিনয় আরও পরের ব্যাপার।

দীর্ঘ চোদ্দো বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে প্রতিমা রবীন্দ্রিক নৃত্যনাট্যের পাকা রূপ ফুটিয়ে তুললেন 'চিত্রাঙ্গদা'য়। এর আগে এসেছে 'শাপমোচন'। নৃত্য নিয়ে প্রতিমা যে কত ভেবেছেন তার পরিচয় আছে তাঁর লেখা 'নৃত্য' বইখানিতে। 'চিত্রাঙ্গদা'তে যে বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠল তা আরও স্পষ্ট হল 'চণ্ডালিকা'তে। এই বৈশিষ্ট্য কী? যা অন্য নৃত্য থেকে রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যকে পৃথক করে রেখেছে। উদয়শংকরের নাচ তখন অনেকে দেখেছেন, দেখেছেন রেবা রায় ও সাধনা বসুর নাচের ধারা। এমনকী শ্রীমতীও মডার্ন ড্যান্সের আঙ্গিকে পরীক্ষামূলকভাবে রবীন্দ্র কবিতার সঙ্গে পরিবেশন করেছেন তাঁর ভাবনৃত্য। 'চিত্রাঙ্গদা' প্রথম মঞ্চায়িত হল ১৯৩৬ সালে নিউ এম্পায়ারে। এর পর ১৯৪০ সাল পর্যন্ত 'চিত্রাঙ্গদা'র অভিনয় হয় চল্লিশবার। এ হিসেব শান্তিদেব ঘোষের রচনা থেকে পাওয়া, তিনি থাকতেন নাচ ও গানে উভয় দলেই। অর্জুন, প্রথমা ও দ্বিতীয়া

চিত্রাঙ্গদা সাজতেন নিবেদিতা, মঞ্জুলা ও কবির দৌহিত্রী নন্দিতা। অন্তরালে থাকতেন প্রতিমা। সমস্ত পোশাক-পরিচ্ছদ-সাজ তাঁর নির্দেশেই পরানো হত। মঞ্চ-সজ্জাতেও তিনি শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্য গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাটক ও নৃত্যনাট্যে দৃশ্যসজ্জা ও রূপসজ্জায় যে একটি শালীন সৌন্দর্য আছে, প্রতিমা সেটি কঠোর ভাবে মেনে চলতেন। তাই নারী চরিত্রগুলির সুরুচিসম্মত রূপসজ্জা রচনায় তাঁর নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। শেষ দিকে কবির নির্দেশে তিনি নাটকের মঞ্চসজ্জা কেমন হবে তার স্কেচ করে রাখতেন। কবি তাঁর অনুরোধে আর উৎসাহেই নৃত্যনাট্যগুলির খসড়া করেন, আগেই বলেছি। 'মায়ার খেলা'রও নতুন রূপ দিয়েছিলেন তিনি। প্রতিমা আবার 'কথা ও কাহিনী'র 'সামান্য ক্ষতি', 'গল্পগুচ্ছ'র 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'দালিয়া' গল্পকে ট্যাবলো ধরনের মূকাভিনয় আকারে রূপায়িত করে কবিকে দেখাতেন। তাতে অবশ্য অভিনয়ের চেয়ে ভাবনৃত্যের প্রাধান্য ছিল। প্রতিমার নিজের মতে, রাবীন্দ্রিক নৃত্যনাট্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য সংমিশ্রণ। শান্তিনিকেতনের নৃত্য কোনও বিশিষ্ট নৃত্যকলার আঙ্গিককে গ্রহণ করেনি। মিশ্র তাল ও ভঙ্গির সহযোগে বৈচিত্র্য আনা সম্ভব হয়েছে। তাই মণিপুরী আঙ্গিকে গড়ে ওঠা 'চিত্রাঙ্গদা'র নাচ সমস্ত মণিপুরে খুঁজে পাওয়া যাবে না। দক্ষিণী আঙ্গিকে তৈরি 'চণ্ডালিকা'কে চেনা যাবে না দক্ষিণী নাচের মধ্যে। মিশ্রণের এমনি গুণ। এরপর এই মিশ্র নৃত্যকে দাঁড় করানো হল সঙ্গীতের ভিত্তির ওপর। 'সেইটেই হল শান্তিনিকেতনের নতুন দান। এই সঙ্গীতযোগে নৃত্যের পূর্ণবিকাশ আমাদের প্রাচীন নৃত্যে দেখা যায় না।'

রবীন্দ্র-নৃত্যের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য এবং সৌন্দর্য রক্ষার কথাও ভেবেছিলেন প্রতিমা। গানের স্বরলিপির মতো নৃত্যলিপির কথাও তাঁর মনে আসে। শিল্পী হারিয়ে যাবে, শিল্প হারাবে না। শিল্প যে অবিনশ্বর। রবীন্দ্রনাথের চোখের সামনে যে শিল্প নৃত্যরূপ লাভ করল তার মধ্যে আছে আপন স্বকীয়তা। একে যদি ধরে না রাখা হয়, তা হলে যে হারিয়ে যাবে সেই নয়ননন্দন ভঙ্গিমা। তাই প্রতিমা আশ্রমের নতুন মেয়েদের নিয়ে নাচের ক্লাস করতেন। মেয়েদের দিয়ে নাচ তৈরি করিয়ে কবিকে দেখাতেন। কবির অনুমোদন না পেলে সন্তুষ্ট হতেন না। চলত অনুশীলনের পর অনুশীলন। তখন অবশ্য সব নৃত্যই ছিল ভাবনৃত্য। গানের ভাবই প্রকাশ পেত নৃত্যভঙ্গিমায়। প্রতিমা নিজেই নাচের মুদ্রা দেখিয়ে দিতেন; পুরোপুরি নাচ তৈরি করে দিতেন সুন্দরভাবে গানের সঙ্গে গলা মিলিয়ে। নাচের বোল ছাত্রীদের লিখে রাখতে বলতেন এবং কলাভবনের শিল্পীদের দিয়ে নৃত্যের ভঙ্গি আঁকিয়ে রাখার চেষ্টা করতেন।

রবীন্দ্রনাথকে প্রতিমা যত গভীরভাবে বুঝতেন ততখানি বোধহয় কেউ বোঝেননি। রথীন্দ্রের সঙ্গে কবির আদর্শগত মতবিরোধ হত। কিন্তু প্রতিমার সঙ্গে নয়। তাই কবির শেষ জীবনের অনুপুঙ্খ ঘটনায় পূর্ণ 'নির্বাণ' প্রতিমার হাতে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। এমন নির্লিপ্ত মৌখিক ভঙ্গিতে তিনি কবির সর্বশেষ পর্যায়টি বর্ণবিরল পরিচ্ছন্ন কয়েকটি হালকা রেখার টানের মতো ফুটিয়ে তুলেছেন যা নিজে না পড়লে বোঝা যায় না। শান্তিনিকেতনে তিনি নারীশিক্ষা ও নারীকল্যাণের দিকটাও দেখতেন। মেয়েদের নিয়ে গড়েছিলেন 'আলাপিনী সমিতি'। ইন্দিরা ও হেমলতা ছাড়াও সেখানে ছিলেন সুকেশী, কমলা, মীরা ও আরও অনেকেই। মাঝে মাঝে ঘরোয়া এবং পুরোপুরি মেয়েলি অনুষ্ঠানে তাঁরা লুকিয়ে লুকিয়ে নিজেরাই নানারকম নাচের মুদ্রা অভিনয় করতেন, গাই গাইতেন। আবার কখনও কখনও তেঁতুলতলায় ছোট চৌকি পেতে বসে তাঁরা বোলপুরের মেয়েদের শেখাতেন গান, বলতেন গল্প। চারপাশের গ্রামে কাজ করা পছন্দ করতেন রবীন্দ্রনাথ। তাই প্রতিমার ব্যবস্থায় আশ্রম থেকে মেয়েরা পালা করে যেতেন গ্রামে—কখনও হেঁটে, কখনও গোরুর গাড়ি চড়ে। গ্রামে অশিক্ষিতা মেয়েদের তাঁরা শেখাতেন কী করে স্বাস্থ্যকর খাবার তৈরি করা যায়, শরীর ভাল করা যায় কিংবা টুকিটাকি হাতের কাজ করে তা থেকে দু পয়সা উপার্জন করে সংসারের সাশ্রয় হয়—এইসব। '...গ্রামের মেয়েদের মধ্যে শিল্পশিক্ষা প্রচারের ইচ্ছায় যখন গৌরী দেবী ও সুকুমারী দেবীকে নিয়ে গোয়ালপাড়ায় যেতে

শুরু করেছিলাম, তখন দেখেছি কী করে সুচ ধরতে হয়, এখানকার পল্লী-মহিলারা তাও ভাল করে জানতেন না। তারপর সনাতন গোঁড়ামি আমাদের উভয়পক্ষের মাঝখানে একটি আদান-প্রদানের বাধাস্বরূপ হয়ে ছিল। আমরা জাতিবিচার মানি না বলে আমাদিগকে ঘরে ঢুকতে দিতেও গ্রামবাসিনীরা বোধহয় সংকোচ বোধ করতেন।'

গৌরী ও বাসন্তী প্রতিমার দুই ছাত্রী এ কাজে প্রতিমাকে প্রাণপণে সাহায্য করতেন। বিরক্ত হতেন 'অভিমানী মানুষ' সুকুমারী দেবী। তিনি বলতেন, 'বউমার কী শৌক বাপু, যারা শিখতে চায় না, তাদের জন্য এত কষ্ট করা কেন?'

প্রতিমার অভিযান তবু অব্যাহত রইল। প্রতি ঘরে ঘরে গিয়ে মেয়েদের ডেকে এনে ক্লাসে বসাতেন। আলাপ পরিচয়ে ক্রমে সংকোচ কাটল গ্রামের মেয়েদের। আগে যেমন সেলাই শিখতে এসে মেয়েরা ভয়ে ভয়ে ছোঁয়া বাঁচিয়ে আলগোছে সেলাই শিখতেন, সেটাও দূর হল। 'প্রকৃতির আলো হাওয়ার সঙ্গে পৌঁছল আমাদের ডাক তাঁদের প্রাণে।' সুকুমারী দেবী আর গৌরী দেবীর কাছে শিক্ষাদীক্ষা নিতে নিতে গোয়ালপাড়া গ্রাম থেকেই বেরিয়ে এলেন সুভা দেবী। অল্প বয়সের বিধবা—ভারি নৈপুণ্য ছিল তাঁর হাতের কাজে। তিনি কিছুদিনের চেষ্টায় এমন সুন্দর একখানি শাল তৈরি করে ফেললেন যে, কাশ্মীরি শালও সেখানির পাশে রাখলে কিছুমাত্র বেমানান হত না।' ১৯৩৩ সালে মি. এলমহার্স্ট যখন শান্তিনিকেতনে এলেন তখন তাঁর স্ত্রী ডরোথি এই পল্লীমহিলা সমিতির প্রথম সভানেত্রী হয়ে সুভা দেবীকে সূচিশিল্পের জন্য প্রথম পুরস্কার দিয়ে ছাত্রীদের উৎসাহ দেবার জন্য 'সেই পুরস্কারপ্রাপ্ত শালখানি বিশেষ মূল্যে' কিনেছিলেন। আর এভাবেই কবির সমস্ত ইচ্ছেকে সাগ্রহে রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন প্রতিমা।

সরকার পরিকল্পিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যধারার সঙ্গে মতের অমিল হওয়ায় রথীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে যাওয়া স্থির করলেন। কিন্তু প্রতিমা যেতে রাজি হননি। শান্তিনিকেতনেই থেকেছেন জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত।

গুণেন্দ্র পরিবারেও যথাসময়ে এসেছেন তিনটি বধূ। সৌদামিনী ছেলেদের বিয়ে দিয়েছিলেন অল্প বয়সে। অনেক দুঃখে অনেক তপস্যায় তিনি সংসার-তরণীটিকে ভরাডুবি থেকে বাঁচিয়েছিলেন। ছেলেরাও মাতৃভক্ত। প্রমোদকুমারী, নিশিবালা ও সুহাসিনী তিন বউই এসেছেন পরিচিত আত্মীয় পরিবার থেকে। গগনেন্দ্রনাথের স্ত্রী প্রমোদকুমারীর মা সুরসুন্দরী ছিলেন দ্বারকানাথের দাদা রাধানাথ ঠাকুরের পৌত্রী, তাঁর বিয়ে হয়েছিল গাজিপুরের সাব জজ মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। অপরূপ রূপসী প্রমোদকুমারী ন বছর বয়সে বউ হয়ে এলেন পাঁচ নং বাড়িতে। সমরেন্দ্রের স্ত্রী নিশিবালা আর অবনীন্দ্রের স্ত্রী সুহাসিনী পাথুরিয়াঘাটার প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্রের মেয়ে। সুহাসিনী ভুজগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মেয়ে আর নিশিবালা তাঁর ভাই অহীন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের মেয়ে। বিনয়িনী এই পরিবারেই গিয়েছেন বধূ হয়ে, তিনি সুহাসিনীর ছোট কাকা শেষেন্দ্রভূষণের স্ত্রী। নিশিবালা যদিও বয়সে ছোট তবু সম্পর্কে বড় হয়ে এলেন বলে সুহাসিনী তাঁকে দিদি বলেই ডাকতেন। সেকেলে অভিজাত পরিবারের সনাতন নিয়ম মেনেই এঁরা বড় হয়েছিলেন। ঘরকন্নার কাজ শিখতেন শাশুড়ির কাছে। সৌদামিনী কাঠের চৌকিতে পরিপাটি মাদুর বিছিয়ে তাকিয়ায় ভর দিয়ে সব দেখতেন আর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতেন। অতিথি সেবা, দেবপূজা, সংসারের কাজকর্ম সবই দেখতেন তাঁরা, শাশুড়ির সামনে বসে কুটনো কোটাটাও সেকেলে বাড়িগুলোর বাঁধাধরা ব্যাপার ছিল, যদিও তা খানিকটা শৌখিন রান্নার মতো। দাসীরা তরকারি ধুয়ে আলুর খোসা ছাড়িয়ে রেখে যেত, বধূরা নিয়মরক্ষার মতো বসে সৌদামিনীর অভিমত অনুযায়ী ঝালের আলু, ঝোলের আলু, কালিয়ার আলু বা ডালনার আলু কুটতেন। বাড়িতে আমোদ-প্রমোদ লেগেই থাকত। সব কাজেই তাঁরা যোগ দিতেন।

চিকের আড়ালে বসে গান শোনা কিংবা নিজেদের মধ্যে অভিনয় করাও চলত। একবার 'রত্নাবলী' নাটক হল, তিন বউ অংশ নিলেন, সঙ্গে রইলেন দুই ননদ বিনয়িনী ও সুনয়নী।

পাঁচ নং বাড়িতে কারও বিয়ে হলেই উৎসবের অঙ্গ হিসেবে একটা করে থিয়েটার হত, কেননা বিয়ের দিন সবাইকে নিমন্ত্রণ করা যেত না। ভোজের দিনও না। জোড়াসাঁকোর পাঁচ নং বাড়ির অবস্থান একটু অদ্ভুত ধরনের। তার মনের যোগ পাশের বাড়ির কৃষ্টিসম্পন্ন আত্মীয়দের সঙ্গে, কিন্তু আত্মীয়তার যোগ পাথুরিয়াঘাটা, কয়লাহাটা, চোরবাগানের আত্মীয়দের সঙ্গে। ব্রাহ্মরা শালগ্রাম শিলা যেখানে আছে সেখানে আসতেন না আবার অব্রাহ্মণরা তাঁদের সঙ্গে পঙ্‌ক্তিভোজনে বসতেন না। তাই একমাত্র থিয়েটার দেখার সময় সবাইকে নিমন্ত্রণ করা যেত, হাতে হাতে জলখাবারও খাওয়ানো যেত। সবাই সেখানে আসতে পারতেন। পুরনো বাইনাচের ব্যাপারটা জোড়াসাঁকোর কোনও বাড়িতেই ছিল না, বসত গানের আসর আর থিয়েটার। পাঁচ নং বাড়ির মেয়ে-বউরা অবশ্য প্রকাশ্য মঞ্চে অভিনয় করতেন না। তবে আত্মীয়দের সামনে বাধা ছিল না এবং তাঁদের সংখ্যাও কম ছিল না।

তিন বউয়ের মধ্যে প্রমোদকুমারীর সাহস বেশি ছিল, নিশিবালা ও সুহাসিনীর পরম নির্ভর ছিলেন তিনি। গগনেন্দ্রের মেয়ে পূর্ণিমার কথায় মাঝে মাঝে এঁদের দেখা মেলে। পাকা রাঁধিয়ে ছিলেন প্রমোদকুমারী। কিভাবে তাঁদের রান্না সংক্রান্ত জ্ঞান বাড়ত তাও শোনা যায়, 'কাশীর দিদি কলকাতায় এলে ...বাবা তাঁর হাতের বাংলা পাঁঠা খেতে ভালবাসতেন বলে রেঁধে খাওয়াতেন। তাঁর হাতের রান্না খুব ভাল ছিল। মাও তাঁর কাছ থেকে রান্না শিখেছিলেন, খুব রাঁধতে পারতেন। বাবার মামিমার কাছে মা চই দিয়ে যশোরের কই মাছের ঝোল রাঁধতে শিখেছিলেন। মাংসের রান্নাও খুব ভাল হত। ওদের ডালনা আমি খেতে ভালবাসতাম বলে যেদিন রান্না করতেন, বিয়ের পরেও আমাকে গাড়ি পাঠিয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে নিয়ে আসতেন। মাংসের কাবাব, কুচো চিংড়ির অম্বল আর কারও হাতে অমন হত না। একবার খেতে চাইলেই হত। না খাইয়ে আর থাকতে পারতেন না। বয়স হলে ঘোরাঘুরি করতে পারতেন না। তখনও জোগাড় করে দিলে চেয়ারে বসে বসেই রাঁধতেন, কাউকে হাত দিতে দিতেন না' যদিও বাড়িতে ছিল ঠাকুর, বাবুর্চি, চাকর, অনেক দাসী। কাছের-দূরের সবাইকে নিয়ে পরিবারও তো কম বড় নয়। প্রমোদকুমারী খাটতেও পারতেন খুব। সব ধনী পরিবারের গিন্নিদের জানতে হত পরিমাণ এবং হিসেব। ভাঁড়ার থেকে তাঁদের ওজন করে জিনিসপত্র বার করে দিতে হত। শৈশবে মোহনলাল দেখেছিলেন একবার কোনও উৎসবে রাশিকৃত লুচি ভাজার জন্যে প্রমোদকুমারী মাপ মতো ঘি ময়দা ঠাকুরকে বের করে দিলেন। কিছুক্ষণ পরে সে এসে প্রমোদকুমারীর কাছে আরও ঘি চাইলে তিনি অম্লান বদনে বললেন, 'বাকি লুচি জল দিয়ে ভাজো তো। আর যদি না পারো এখনই বিদায় হও। সিংহিবাগান থেকে পাকা লোক আনিয়ে নিচ্ছি।' বিস্মিত মোহনলাল দেখলেন, ঠাকুর সত্যিই সব লুচি ভেজে আনল। ঘিয়ে ভাজা এবং জলে ভাজার স্বাদ এক। নিখুঁত মাপ জানায় প্রমোদকুমারীকে ঠাকুর ঠকাতে পারেনি। শাশুড়ি সৌদামিনী যেমন সব কাজেই তাঁর ওপর নির্ভর করতেন। মাঝে মাঝে বলতেন, 'বউমা, খেয়ে নাও।' প্রমোদকুমারী বলতেন, 'না মা, এখন খেলে আর খাটতে পারব না। সব হয়ে গেলে খাব।' তাঁর কাজও ছিল নানারকম। অত বড় পরিবারের আঁতুরের ভার তাঁর ওপর, কারওর অসুখ বিসুখেও দেখাশোনা করার কাজ তিনি করতেন। কে পড়ে মাথা ফাটিয়েছে ডাক পড়ল প্রমোদকুমারীর, তাঁকেই ব্যান্ডেজ বাঁধতে হবে। নতুন আগন্তুককে পৃথিবীর আলো দেখাবে কোনও কিশোরী মা, পুরনো ধাত্রী সুলতানা রয়েছে তবু সে ডাকছে তার বড় মাকে। আবার কখনও বেড়াতে আসতেন মহর্ষির ছোট ভাই নগেন্দ্রনাথের বিধবা স্ত্রী ত্রিপুরাসুন্দরী। তাঁর ভয়, সম্পত্তির লোভে সবাই তাঁকে বিষ দিতে চায়। তাই চোখ দিতে হবে তাঁর খাবার, তিনিও ডাকতেন প্রমোদকুমারীকে। পাঁচ নং বাড়ি বিক্রি করায় প্রবল বাধা দিয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, 'আমি কিছুতেই এ বাড়ি

বিক্রি করতে দেব না। দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাড়ি, সাত পুরুষের ভিটে রেকে দেবে। আমি থাকতে হবে না।' কিন্তু ভবিতব্য খণ্ডাকে পারে ক'জন?

সুহাসিনীর শৈশবে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাক্ষাৎ পাওয়া অন্যতম বড় ঘটনা। সাংসারিক জীবনে তিনি নির্ভর করতেন প্রমোদকুমারীর ওপর। অবন ঠাকুরও উমারানিকে বলেছিলেন, 'জানিস, কোথা থেকে না আমন্ত্রণ পেয়েছি। ...কেন যাইনি জানিস। তোর মাকে একলা রেখে যেতে হবে বলে। বড় ভীতু ছিল সে।' কিন্তু বেড়াবার প্রচণ্ড নেশা তাঁকে পেয়ে বসেছিল। প্রতিদিন সুহাসিনী বিকেলে বেড়াতে যেতেন। তাঁর পৌত্র সুমিতেন্দ্র লিখেছেন, 'বিকেলে মিসির ড্রাইভার কাপড়ের হুডওয়ালা বুইক গাড়িটা নিয়ে হাজির হত দেউড়ির গাড়িবারান্দার নীচে। নাতি-নাতনিদের নিয়ে দিদিমণি রওনা হতেন সাহেবীপাড়ার দোকান সফরে। ...গঙ্গার ধার ও গড়ের মাঠের ফুরফুরে হাওয়ায় চক্কর খেয়ে মিসির গাড়ি নিয়ে যেত দিদিমণির ইচ্ছা অনুযায়ী—কোনওদিন দোকানে বা কোনও আত্মীয়স্বজনের বাড়ি।' পড়তে পড়তে বোঝা যায়, কী দ্রুত বদলে যায় আমাদের সমাজ এবং সামাজিক জীবন। একদিন, মেয়েরা ঘেরাটোপে ঢাকা পালকি ছাড়া বেরোতেন না বাড়ির বাইরে। তাঁদের জীবন ছিল চার দেওয়ালের চৌহদ্দির মধ্যে বন্দি। বিকেলবেলায় সাজসজ্জা করেই দিন কাটত। তারপর এল বিকেলে বেড়াতে যাবার যুগ। টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া যৌথ পরিবারের সঙ্গে যোগ-রাখার জন্য বৈকালিক ভ্রমণে মিশে থাকত আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ। এই যুগও এখন অতীতে পর্যবসিত। সুন্দর সোনালি বিকেল হারিয়ে যেতে বসেছে আমাদের জীবন থেকে। কাজের অবসরে তার দিকে মেয়েরা তাকান শুধু গৃহে ফেরার তাগিদে। আত্মীয়-পরিবারের সঙ্গে ক্রমশই দূরত্ব বাড়ছে। ঠাকুরবাড়ির মতো বিশাল পরিবারের দিকে তাকালে সে কথা বেশি করে মনে পড়ে।

সুহাসিনীকে নিয়ে অবনীন্দ্র অনেক বেড়িয়েছেন। পুরী, কোনারক, দার্জিলিং, মুসৌরি। আবার কখনও সুহাসিনী পুত্র অলকের সঙ্গে, জামাতা মণিলালকে নিয়েও তীর্থে গিয়েছেন। স্বামীর ছবি আঁকা নিয়ে তিনি কখনও কিছু ভাবতেন কিনা জানা যায়নি, কারণ কেউ লিখে রাখেননি। বরং ছবির সিটিংয়ের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে জামাতা নির্মলকে বাজারে নিয়ে যাওয়া দেখে মনে হয় তিনি এ নিয়ে কিছুই ভাবতেন না। একবার আগ্রা, দিল্লি, জয়পুর, লখনউ ঘুরে এসে অপার বিস্ময় নিয়ে সুহাসিনী স্বামীকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'তুমি কী করে অমন ছবি এঁকেছো? আমি দেখে এলুম সব ঠিক তোমার আঁকা ছবির মতো।'

অবনীন্দ্র স্বভাবসুলভ সরস ভঙ্গিতে বলেছিলেন, 'তুমি চর্মচক্ষে যা দেখে এলে আমি মর্মচক্ষে তা দেখতে পেয়েছি।...তবেই বোঝো, তোমার চেয়ে আমার পুণ্য কত বেশি আছে।'

রঙে রেখায় অবনীন্দ্রনাথের তুলিতে সুহাসিনীর ছবিও এমনই প্রাণ পেয়েছে।

আবার ফিরে আসি মহর্ষিভবনে। অবশ্য ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা অনেক জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছেন, নিয়ে গিয়েছেন আপন আপন সংস্কৃতি। সেইজন্যে এক এক পরিবার ধরেই এগোনো যাক। প্রথমে দ্বিজেন্দ্র পরিবারের কথা। দ্বিপেন্দ্রনাথের পুত্র দিনেন্দ্রনাথ। তাঁর প্রথমে বিবাহ হয় সুনয়নীর মেয়ে বীণার সঙ্গে। তাদের বিয়ের সময়কার কয়েক টুকরো ছবি ধরা আছে 'পরিণয় সঙ্গীতে'। দিনেন্দ্রর বিবাহ উপলক্ষে প্রকাশিত হয়। লেখক হরিশ্চন্দ্র হালদার। ২৯ শে মাঘ শালিখায় বিবাহ বাসর হয়েছিল। কবিতা লেখা হয়েছিল ২৩ শে মাঘ। সাজসজ্জার ভার সম্ভবত ছিল হরিশ্চন্দ্রের হাতে। গগন ঠাকুরের মেয়ে পূর্ণিমা লিখেছেন, তাঁরা পিঁড়েয় আলপনা দিতে শিখেছিলেন হরিশ্চন্দ্রের কাছে। তিনি এঁকে দিতেন। দিনেন্দ্রের বিবাহ বাসর সাজানো হয়েছিল এভাবে:

'বিলাতী আসনে — পশম গাঁথনে
প্রাঙ্গণে বিছান রঞ্জিত বাস।
কত চিত্র আঁকা — নাহি লেখা জোখা
রহিছে পাদুকা হইয়ে দাস।
কাষ্ঠের আসন — সাটিন শোভন
বসা শোয়া খাড়া শোভিছে সারে।
খচিত দেওয়ালে, — সোনারূপা ছালে
জলজলা করে ভিতের ধারে।'

বাহির মহলও কিছুটা সাজানো হয়েছিল। হয়তো হরিশ্চন্দ্রই তার দেখাশোনা করেন:

'থামের তোরণ — ক্রাউন শোভন
বাড়ি থাম তক নিশান আঁকা।
পাতার খিলানে — উড়িছে নিশানে
সারি সারি থাম শোভিছে বাঁকা।
চিনের লাইন — ঝোলে অগণন
কাগজের ফুল ঝাড়ে ঝোড়ে ঝুলে
হাঁকি দড়বড়ি — ঘুড়ি গাড়ি চড়ি
যাইছে চটকে ফটকে পলে।'

দ্বিজেন্দ্রের বিবাহে বাড়ি সাজানো হলেও নহবৎ বাজেনি কিন্তু

'দ্বিজেন্দ্রের বরবেশ, — তাই সভা সমাবেশ
আনন্দের কোলাহল এ দ্বারকাপুরে।
নহবৎ বিনা তাই — বাজিতেছে সুরে।...

দেখা যাচ্ছে, সে সময়ে, হয়তো মহর্ষি জীবিত ছিলেন বলেই জোড়াসাঁকোর মহর্ষি ভবনকে বলা হয়েছে দ্বারকাপুরী। অন্যান্য আয়োজন কম ছিল না,

'দধি মৎস্য ভারে ভার, — আসিতেছে বারেবার
দলে দলে বাহকেরা প্রবেশে আগার,
ঘৃত ক্ষীর মিষ্টান্নাদি গণে সাধ্য কার।
পোলাও কালিয়া কোর্মা — খেয়ে হল লোকে তৃপ্ত
নিবৃত্ত করিল দীপ্তি জঠর অনল
নিমন্ত্রিত রবাহুত নরনারী দল।
পোলাও লাড্ডুর থালা — শুভ্র সন্দেশের ডালা,
কুটুম্ব স্বজন গৃহে যায় সারে সার,
দাস-দাসী চলে দলে কাতারে কাতার।'

বীণার অকাল মৃত্যুর পর দ্বিজেন্দ্রের বধূরূপে ঠাকুরবাড়িতে এলেন কমলা। মধুর স্বভাব, সবার সুখে সুখী, আমুদে মেয়ে হিসেবে কমলার তুলনা মেলে না। আসলে এক-একজন মানুষ থাকেন

যাঁরা অনেক কিছু না করেও জুড়ে থাকেন মনের অনেকখানি। কমলা তাঁদেরই একজন। শান্তিনিকেতনেই বেশিরভাগ সময় থাকতেন তাঁরা। পরিবারের সবার বড় নাতবউ, কবির স্নেহ পেয়েছিলেন খুবই। সম্পর্কের সুবাদে কবি প্রায়ই লজ্জা দিতেন কমলাকে। সভার মাঝে হঠাৎ কমলাকে ডেকে পাশে বসিয়ে বলতে শুরু করে দিতেন,

'কমল তুমি এইখানটিতে বোসো। তোমার সঙ্গে আমার যে খুব ভাব, তা না-হয় ওরা দেখতেই পাবে, না হয় কলকাতায় গিয়েই বলে দেবে।'

'ওরা' হচ্ছেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মেয়ে সীতা ও শান্তা। অনেক দিনের কথা। তারও সাক্ষী সীতা। রবির সঙ্গে কমলের সম্বন্ধটি নিয়ে কবি প্রায়ই ঠাট্টা করেন। তাঁর গানে ঘুরেফিরে যে 'কমল' কথাটা আসে কেন, কে জানে? একজন জানালেন, দিনেন্দ্রনাথ নাকি এতে আপত্তি করতেন, কারণ গান শেখাতে গেলে গানে 'কমল' কথাটি থাকলে ছেলেরা হাসে। কবি জানেন সবই। ছেলেদের হাসির কারণ যে কবি নন, স্বয়ং দিনেন্দ্র, তাও জানেন। তাই কবি গম্ভীর হবার ভান করে বলেন 'দোষটা মেয়েদেরই। তারাই এ কথাটি ছড়িয়েছে।'

'আলাপিনী সমিতি'র সভ্য ছিলেন কমলা। সেই সমিতির নিজস্ব কাগজ ছিল 'শ্রেয়সী'। একদিন শোনা গেল কমলা তার জন্যে একটা গল্প লিখেছেন। কবির মহা উৎসাহ। কেমন গল্প? গল্পের মধ্যে ক'টা বিয়ে আছে? নেই? বিয়ে ভাঙাও নেই? কমলাকে বললেন, "তুমি কোনও কর্মের নয়, একটা বিয়ে দিতে পারলে না?"

এরপর প্রতিমা বলে দিলেন, 'গল্পের নায়ক একজন কবি।' আর যায় কোথায়। কবি অত্যন্ত চটে ওঠার ভান করে বললেন, 'এ নিশ্চয় আমাকে লক্ষ করে লেখা, যাও, তোমার সঙ্গে আর কোনও কথা নয়—'

'শ্রেয়সী' পত্রিকার সবক'টা সংখ্যা আর পাওয়া যায় না। যে ক'টি আছে তাতে কমলার গল্পটি পাওয়া যায়নি, শুধু একটিমাত্র লেখা পাওয়া গেছে। গল্প নয়, ছোট্ট একটি রচনা 'গান'। মনে হয় এতে তাঁর স্বামীর হাতই বেশি। দিনেন্দ্রনাথ শুধু রবীন্দ্র-সংগীতের ভাণ্ডারী ছিলেন না, দিব্যি কবিতা লিখতেন। তাঁর প্রথম কবিতার বইটি প্রকাশিত হল 'নীরব বীণ' নামে। উৎসর্গ করেছিলেন প্রথমা স্ত্রী বীণাকে। বাঁকা মন্তব্য করলেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, 'দাদামশাই আর নাতি এত জোরে নীরব বীণা বাজাচ্ছেন যে দুদিন পরে গড়ের মাঠে আর ব্যান্ড পার্টির দরকার হবে না।' লজ্জায় দুঃখে সব বই লুকিয়ে ফেললেন দিনেন্দ্রনাথ। তাঁর মৃত্যুর পরে সমস্ত অপ্রকাশিত রচনা একত্র করে সেগুলি প্রকাশ করে কমলা তাঁর কর্তব্য পালন করেন। 'গান'-এর ভাষা সহজ, সরল, প্রাণের ভেতরে প্রবেশ করে:

'গানের ভিতর দিয়ে আমরা আপনাকেই উপলব্ধি করতে পারি। আমাদের ব্যথা আনন্দ-বিরহ মিলন এই সকলের সঙ্গেই গানের সুরের অনির্বচনীয়তা মিশ্রিত হয়ে তাদের অসীম সৌন্দর্য দান করে। অন্তরের বাহিরের এই সুরের দেওয়া নেওয়ার ভিতর দিয়েই আমরা বিরোধের মধ্যে ঐক্যকে আর বিচ্ছেদের মধ্যে মিলনকে লাভ করি।'

দিনেন্দ্রর বোন নলিনী। তাঁর বিবাহ হয় আশুতোষ চৌধুরীর ছোট ভাই সুহৃৎনাথের সঙ্গে। কবি এই উপলক্ষে একটি গান লিখেছিলেন, 'উজ্জ্বল করো হে আজি এ আনন্দরাতি।' তিনিও ভাল গান গাইতেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র অরুণেন্দ্রনাথের তিন মেয়ে লতিকা (ললিতা), সাধিকা ও কণিকা। তিনজনেই নানা গুণের অধিকারী, হাসিখুশি, সহজ-সরল। তবুও এঁদের কথা বিশেষ জানা যায় না। তার অন্যতম কারণ হয়তো এঁদের স্বল্পায়ু জীবন, অকালে মাকে হারিয়েছিলেন এঁরা। লতিকার বিয়ে হয়েছিল আসামে, তাঁর এক পিসি প্রজ্ঞাসুন্দরীর মতো। রায়বাহাদুর গুণাভিরাম বরুয়ার কনিষ্ঠ পুত্র জ্ঞানদাভিরাম লতিকাকে বিয়ে করেন ১৯০৬ সালে। ঠাকুরবাড়িতে লতিকা ললিতা নামেই পরিচিত বলে মনে হয়, বিয়ের সময় শ্বশুরবাড়ির আগ্রহে

তাঁর নাম পরিবর্তন করা হয়।

লতিকা ও জ্ঞানদাভিরাম দুজনেই ভাল অভিনয় করতেন। ঠাকুরবাড়ির মেয়ে হিসেবে গানে ও অভিনয়ে লতিকা ও তাঁর বোনেদের নাম কম শোনা গেলেও একবার 'গোড়ায় গলদ' নাটকে তিনি ক্ষান্তমণি সেজে সবাইকে অবাক করে দিয়েছিলেন। যেন বইয়ের পাতা থেকে উঠে এসেছিলেন ক্ষান্তমণি। তাঁর ছোট বোন কণিকাও ভাল অভিনয় করতেন, গান গাইতেন, সেতার বাজাতেন। মেজদিদি সাগরিকার মতো লেখাপড়াতেও বেশ ঝোঁক ছিল। যে 'গোড়ায় গলদ' নাটকে তাঁর বড়দিদি সেজেছিলেন ক্ষান্তমণি, সেই নাটকেই কণিকা সেজেছিলেন ইন্দুমতী। শোনা যায়, 'চিরকুমার সভা'র নীরবালাকে প্রাণ দিয়েছিলেন কণিকা। তাঁর বিয়ে হয়েছিল চোরবাগানের ঠাকুরবাড়িতে। সাগরিকা ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের মধ্যে প্রথম শান্তিনিকেতনে পড়তে গিয়েছিলেন। তাঁর আগে রবীন্দ্রনাথের মেয়েরা ছাড়া কেউ সেখানে যাননি। মীরা ও শমীন্দ্র ছাড়া এ সময়ে সাগরিকা পড়তেন বালিকা বিদ্যালয়ে। তিনি থাকতেন নিচু বাংলায় তাঁর জ্যাঠাইমা হেমলতার কাছে।

অরুণেন্দ্রনাথের পুত্র অজীন্দ্রর মতান্তরে অজিনেন্দ্রর সঙ্গে বিবাহ হয় অমিতার। অমিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ বহুদিনের। অমিতা কবির কন্যাসমা স্নেহের পাত্রী লাবণ্যলেখার মেয়ে। অকাল-বৈধব্যের অভিশাপ থেকে বাঁচাবার জন্যে তিনিই লাবণ্যলেখার পুনর্বিবাহ দিয়েছিলেন। তাই অমিতা একাধারে কবির নাতনি, নাতবউ এবং 'মহিষী'। অভিনয় এবং গান—শান্তিনিকেতনের অনুকূল পরিবেশে সহজেই আয়ত্ত করেছিলেন অমিতা। তবু কুণ্ঠা যেত না। একরকম জোরজার করেই রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথ তাঁকে স্টেজে নামাতেন। নন্দিতাকে লেখা কবির চিঠি পড়লে দেখা যায়, তিনিও লিখছেন, 'বহু কষ্টে অমিতাকে সুদর্শনার পালায় নামাতে পেরেছি। শেষ পর্যন্ত টিঁকলে হয়।'

অভিনয় ভালই করলেন অমিতা। আবার 'নটীর পূজা'য় হয়েছিলেন মালতী। আকন্দ ফুলের মালা জড়ানো বেণী চুড়ো করে বেঁধে, গলায় কুঁচ ফলের মালা, একটু উঁচু করে পরা শাড়ির আঁচল কোমরে জড়িয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আকুল স্বরে তিনি যখন 'যার ডাকে আমার ভাই গেল চলে। যার ডাকে আমার—' বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়তেন তখন সমস্ত দর্শক যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেত। অভিনয় শেখাতেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং।

'তপতী'র অভিনয় হয়েছিল আরও পরে। অমিতা তখন জোড়াসাঁকোয় বউ হয়ে এসেছেন। হঠাৎ ডাক এল শান্তিনিকেতন থেকে। তপতীর ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে। আসলে রানির ভূমিকায় কারওর অভিনয়ই কবির মনোমতো হচ্ছিল না। ঠিক করলেন, অভিনয় করানো বন্ধ করে দেবেন। বাধা দিলেন দিনেন্দ্রনাথ। বললেন, 'রবিদাদা তুমি অমিতাকে আনিয়ে নাও, তুমি যেমন চাইছ, তপতী ও ঠিক পারবে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য প্রথমে ইতস্তত করেছিলেন। 'ও কি পারবে? এ বেশ শক্ত মেয়ের কাজ।' তবু দিনেন্দ্রনাথের প্রস্তাবে দ্বিধান্বিত মন নিয়ে ডেকে পাঠালেন অমিতাকে। অভিনয় দেখে অবশ্য খুব পছন্দ হয়ে গেল। একনাগাড়ে তিন মাস রিহার্সাল চলল। তারপর অভিনয়। রাজা বিক্রম রবীন্দ্রনাথ আর অমিতা তাঁর মহিষী। সে অনবদ্য অভিনয় যাঁরা দেখেছেন তাঁরা ভোলেননি। একজন প্রত্যক্ষ সাক্ষী অবন ঠাকুর। তিনি 'নটীর পূজা'য় নন্দলাল বসুর মেয়ে গৌরীর অভিনয় দেখে যেমন মুগ্ধ হয়েছিলেন তেমন অভিভূত হয়েছিলেন 'তপতী' দেখে। 'অমিতা তপতী সেজে অগ্নিতে প্রবেশ করেছে। সেও এক অদ্ভুত রূপ। প্রাণের ভিতরে গিয়ে নাড়া দেয়।' সেই সঙ্গে স্বীকার করেছেন পরে যত অভিনয়ই হয়ে থাক 'অমন আর দেখলুম না—'।

এর একটা উলটোদিকও ছিল অবশ্য। রবীন্দ্রনাথকে নতুন কিছু করতে বারবার বিরুদ্ধ

সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। 'রাজা ও রাণী'র প্রথম অভিনয়ের সময় হয়েছিল, এবারও হল। এই যুগেও একজন সরাসরি রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করে লিখলেন, 'কবি রবীন্দ্রনাথ নিজে রাজার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রবধূকে রানী সাজাইয়া অভিনয় করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, অন্য সকলে তাহাই করিতেছে মাত্র।' কিংবা 'চুল বাড়িতে কলপ মাখিয়া 'কচি' সাজিয়া তিনি কখনও কখনও কিশোরী কুমারীদের সঙ্গে নাট্যাভিনয় করেন।' সুতরাং যুগ বদলালেও জ্ঞানদানন্দিনীকে যে পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছিল অমিতাকেও সেই পরিস্থিতিতে পড়তে হল। তবে ঠাকুরবাড়ির কেউই এসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাননি, অমিতাও না।

'তপতী' সাজবার পরে কবি অমিতাকে ডাকতেন 'মহিষী' বলে। পাঠাতেন পত্রলিপি:

'মহিষী
তোমার দুটি হাতের সেবা
জানি না মোরে পাঠালো কেবা
        যখন হোলো বেলার অবসান—
দিবস যখন আলোক হারা
তখন এসে সন্ধ্যা তারা
        দিয়েছে তারে পরশ সম্মান।
৩ বৈশাখ ১৩৪৬   পরমবিক্রম।'

অমিতার হাতের সেবা ছাড়াও আরও একটা দুর্লভ গুণ ছিল। তিনি লিখতে পারতেন। কিন্তু বড় সংকোচ। মা বকেন। কতজন এসে কবিকে লেখা দেখায়, শুধরে নিয়ে যায় আর অমিতা পারবে না? শেষে বাধ্য হয়েই ভীরু পায়ে গেলেন গুরুদেবের কাছে। কবি প্রশ্ন করলেন, 'তুই লিখিস, না?'

'কই আর লিখি তবে কবিতা আসে, কখনও লিখতে পারি। কখনও হারিয়ে যায়, না লিখে রাখতে পারায়।'

'হ্যাঁ মেয়েদের এই একটা অসুবিধে। তবে তুই তো পারবিই—তোর বাবার কাছ থেকে পেয়েছিস।'

'একটু শিখিয়ে দেবেন না সংশোধন করে—'

'কবিতা পড়ে খুশি হয়ে বললেন, 'এত সহজ তোর ভাষা যে আমি আর এতে হাত দিতে চাই নে।'

উৎসাহ পেয়ে অমিতার খাতা ভরে ওঠে। ছাপা হয় 'অঞ্জলি' আর 'জন্মদিন'। আশ্চর্য সহজ সরল প্রাণের কবিতা:

'যবে শুধায় সকলে মোরে, তুমি কি পেয়েছ
        কই দেখালে না আজি?
মৌন নতমুখে থাকি, কি দিব উত্তর—
        কি পেয়েছি আমি?...
অন্তহীন পাওয়া সে যে ঋতুতে ঋতুতে
        বর্ণে গানে বিচিত্রিতা মাঝে,
শূন্য পাত্র পূর্ণ করি রাখে সে সদাই
        তাই মোর দুঃখ কিছুই নাই।'

কবিতার মতো অমিতার গদ্য লেখার হাতও ভাল। মনেই হয় না যে প্রবন্ধ পড়ছি। প্রবন্ধ

পড়তে পড়তে স্মৃতিকথা, ছবি আঁকা, গল্প বলা—একটার পর একটায় আপনি মন চলে যায়, পড়া শেষ হলে পর মনের কোণে মিশে থাকে মাধুরীর রেশ। দেখা যায়, অমিতা খুব সংক্ষেপে একটা চরিত্রকে চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। অথচ জীবনী-স্মৃতিকথা-প্রবন্ধ কোনওটাই ভারী হয়ে দাঁড়ায়নি। একবারও স্মৃতি এসে হাত চেপে ধরেনি প্রবন্ধের, তথ্য এসে ঘুলিয়ে দেয়নি মাথা। অমিতার প্রবন্ধ থেকে রবীন্দ্রনাথের অভিনয় এবং অভিনয় সংক্রান্ত অনেক তথ্য পাওয়া যায়। যেমন, কবি কণ্ঠস্বরের ওপর জোর দিতেন। নজর রাখতেন শেষের কথাগুলি অস্পষ্ট বা অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে না যায়। কবি প্রায়ই সংলাপ ভুলে যেতেন বলে সহ-অভিনেতাদের সবসময় কবির সংলাপ মনে রাখতে হত, নয়তো তিনি নতুন কথা বানাতে শুরু করে দিতেন, আর তাল রাখতে হিমসিম খেতে হত অন্যদের। এছাড়া, 'প্রধান অভিনেতা বা অভিনেত্রীর কণ্ঠস্বরের ওপর তিনি গুরুত্ব দিতেন। কণ্ঠস্বর কর্কশ হলে বা ওঁর ঠিক মনে না লাগলে তাকে প্রথম থেকেই বাদ দিতেন। তখন মাইক ছিল না তাই খুব চেঁচিয়ে কথা বলতে হত যাতে একেবারে শেষ শ্রেণী পর্যন্ত শ্রোতারা শুনতে পান। নজর রাখতেন শেষের কথাগুলি অস্পষ্ট বা অত্যন্ত ক্ষীণ না হয়ে যায়। সাধারণত এটা খুব বেশিই হয় দেখেছি। তারপর হাত পা নাড়া মাথা নাড়া। হাত পা নাড়ছি অথচ মাথা একেবারে সোজা করে স্থির করে রেখেছি তা হতে দিতেন না। তিনি বলতেন, মাথা ও ঘাড় নাড়া খুবই প্রয়োজন ভাবকে ব্যক্ত করার জন্য।'

এভাবে অমিতা আরও অনেক খবর দিতে পারতেন আমাদের। তাঁর লেখা থেকেই আমরা জানতে পারি, রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন চরিত্রের গলার স্বর পর্যন্ত বদলাতে পারতেন, 'মুক্তধারায় সুমনের মায়ের অংশে পড়বার সময় কান্নাভরা কাঁপা কাঁপা গলায় সুমন বাবা সুমন ভোলবার নয়। চোখের জল এসে যেত। Creset Moon পড়ছেন—তাতে শিশুর গলায় তার মায়ের গলায় এমন আশ্চর্য পার্থক্য করে পড়ছেন যে চোখ নিচু করে শুনলে মনে হবে আলাদা দুজন লোকই—মা ও শিশুই বুঝি কথা বলছে। এমনিতে তাঁর গলার স্বর একটু সরু ও মিহি ছিল কিন্তু মোটা গলায় আগাগোড়া বলে যেতেও শুনেছি অর্থাৎ যখন যেখানে যেরকম দরকার সেইরকমই পড়তে পারতেন স্বাভাবিকভাবে।' অমিতা বড় করে কোথাও কিছু লেখেননি। ছোট ছোট প্রবন্ধেই অনেক কথা লিখেছেন। গানের বেলাতেও একই অনীহা। রেকর্ডে গেয়েছেন মাত্র একটি গান, 'তোমার মোহন রূপে কে রয় ভুলে' সেও অন্যদের চাপে পড়ে, 'লক্ষ কন্যার গান' বলে একটি লংপ্লেয়িং রেকর্ডে।

দ্বিজেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র সুধীন্দ্রনাথ। এঁর পরিবারেও ছিলেন তিন মেয়ে ও এক গুণবতী বধূ। রমা সকলের বড়। তাঁর গানের গলা ছিল অসাধারণ। কবি তাঁর গাওয়া নিজের গান শুনতে বড় ভালবাসতেন। রমার ভাই সৌম্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'দাদা দিনেন্দ্রনাথ, দিদি রমা আর আমি কত গান যে গেয়েছি বিচিত্রার আসরে তার অন্ত নেই। দিদি রমার গলায় 'এই যে কালো মাটির বাসা', 'মাগো এই যে ধুলা আমার না এ', 'এবার রঙিয়ে গেল হৃদয় গগন সাঁঝের রঙে', 'সন্ধ্যা হল গো—ওমা সন্ধ্যা হল, বুকে ধরো' এই গানগুলো যারা শোনবার সৌভাগ্য লাভ করেছে তারা কখনো ভুলবে না।' কবি নিজেও বলতেন, তাঁর গান রমার গলায় যেমন রূপ নেয় এমনটি খুব কম লোকের গলাতেই নেয়। রমা ও তাঁর বোনেরা শান্তিনিকেতনেই লেখাপড়া শিখতেন বলে গানের চর্চা অব্যাহত ছিল। দিনেন্দ্রনাথের কাছে গান শিখলেও তিনি রাধিকা গোস্বামী এবং ওস্তাদ শ্যামসুন্দর মিশ্রের কাছেও নিয়মিত গান শিখেছেন।

১৯১৭ সালে কলকাতায় যখন কংগ্রেস অধিবেশন হয় তখন রবীন্দ্রনাথ 'দেশ দেশ নন্দিত করি' গানটি রচনা করেন। সৌম্যেন্দ্র লিখেছেন, 'বাড়িতে আমি, আমার দিদি রমা, আর দাদা দিনেন্দ্রনাথ প্রথমে গানটি শিখি ও প্রকাশ্য জনসভায় সর্বপ্রথম সেবারের কংগ্রেসের

অধিবেশনেতেই এই গানটি গাওয়া হয়।' শুধু সৌমেন্দ্র নন আরও কেউ কেউ রমার গানের কথা লিখেছেন। যেমন সুরুচি ভট্টাচার্য লিখেছেন, 'বিচিত্রা হলে 'বর্ষামঙ্গল' দেখতে যেতুম মায়ের সঙ্গে। এর পরে বহুবার 'বর্ষামঙ্গল' ও 'ঋতুরঙ্গ' হয়েছে—তবে এই দিনের অনুষ্ঠানটি মনে আছে এই কারণে যে, এই প্রথম শুনলুম কবিকণ্ঠের আবৃত্তি। ...আর মনে আছে রমাদিদির মধুর কণ্ঠ: আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার, পরাণসখা বন্ধু হে আমার।' দুঃখ হয় রমার গানের কোনও রেকর্ড নেই বলে। যাঁরা শুনেছিলেন তাঁরাই শুধু বলতে পারেন, তাঁর গানে কিভাবে মাধুর্য ও গাম্ভীর্যের মিশ্রণ ঘটত।

লেখা ও লেখানো, গান গাওয়া এবং শেখানো সবেতেই রমার উৎসাহ ছিল। অভিনয়ও করেছেন বারকতক। 'মায়ার খেলা'য় একবার কুমার, আরেকবার শান্তা সেজেছিলেন রমা। দু'বারই সুন্দর হয়েছিল তাঁর অভিনয়। প্রফুল্লময়ীর 'আমার কথা' হয়তো কোনদিনই লেখা হত না, যদি না রমা থাকতেন। আগ্রহ আর উৎসাহ নিয়ে তিনি বসতেন দিনের পর দিন 'বলো দিদি বলো তোমার কথা' বলে। ধীরে ধীরে খুলত স্মৃতির দুয়ার—অনেক চোখের জল মাড়িয়ে প্রফুল্লময়ী এই নাতনির আবদারেই ফিরে যেতেন নিজের কৈশোরে। এ কি কম কৃতিত্ব! নিজেও লিখতেন রমা। শান্তিনিকেতনে বের হত মেয়েদের কাগজ 'শ্রেয়সী'। তাতে তিনি দু একটি ইংরেজি গল্প স্বচ্ছন্দ অথচ সাধু ভাষায় অনুবাদ করেছেন। মেহেরলতা দেবীর একটা গল্প 'সাপুড়ের গল্প' নামে অনুবাদ করেন রমা। ইন্দিরার ভারি ইচ্ছে ছিল রবীন্দ্রনাথের নারী সংক্রান্ত রচনাবলি একত্র করবার। বলেওছেন একে তাকে, 'কেউ যদি সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্য অনুসন্ধান করে মেয়েদের সম্বন্ধে কোথায় কী তিনি লিখেছেন তা একত্র করে প্রকাশ করতে পারেন—তবে মস্ত একটা কাজ হয়।' সেই ভার নিয়েছিলেন রমা। রবীন্দ্র সাহিত্যে নারীর স্থান কোথায় তাই দেখার জন্যে। 'শ্রেয়সী'র কয়েকটা সংখ্যায় 'রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী' নাম দিয়ে অনেক রচনা সংকলনও করেন। তবে সময়ের অভাবে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে পারেননি।

শেষ জীবনে তাঁর মন ঝুঁকেছিল তথাগতের আদর্শের প্রতি। কিছু মানসিক অশান্তি তাঁকে আরও ঠেলে দিয়েছিল মহাবোধি সোসাইটির দিকে। পারিবারিক ট্র্যাডিশন অনুযায়ী তিনি একটি স্কুলও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বাগবাজারে। নাম 'সাবিত্রী শিক্ষালয়'। ঘুরে ঘুরে চাঁদা তুলে অনেক পরিশ্রম করে তিনি এই স্কুলটি গড়ে তোলেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করেন লেখিকা প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, পরে সেখান থেকেও নীরবে সরে এসেছিলেন রমা। নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন মহাবোধি সোসাইটির সৌম্য-শান্ত বুদ্ধের চরণতলে। তাদের জন্য তিনি একটি রচনা সংকলন প্রকাশ করেন 'লর্ড বুদ্ধ অ্যান্ড হিজ মেসেজ' নামে। তাতে তাঁর নিজের লেখা না থাকলেও তিনি সংগ্রহ করেছেন রবীন্দ্রনাথ, ইন্দিরা, অমিত হালদার, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের রচনা। রমার শেষ জীবনের কথা বলেছিলেন তাঁর মেজো বোন এণা। দিদির লেখা-আঁকা সযত্নে তিনি রেখে দিয়েছিলেন। জিনিস হারায় না, মানুষ হারায়।

দিদির মতো গাইতে না পারলেও এণা শিখেছিলেন বাঁশি আর সেতার বাজাতে। বিচিত্রায় যে ট্যাবলো অভিনীত হত তাতে এণাও যোগ দিতেন। একবার সেজেছিলেন শকুন্তলা। এণা বিয়ে করেছিলেন রাজেন্দ্রচন্দ্র রায়কে। বিয়ের ব্যাপারে ঠাকুরবাড়ির ট্র্যাডিশন ভেঙেছিলেন তিনিও। সুরুচি লিখেছেন, 'রেজিস্ট্রেশন বিয়ে বলে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে তাঁদের বিয়ে হয়নি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আর ওই বাড়ির জামাই আমার ঠাকুরদার জোরতর আপত্তি ছিল রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতির বিয়েতে।' 'পরিণয়ে প্রগতি'র লেখিকা শৈলসুতা দেবী তাঁর বইয়ে এই বিয়ের কথা বর্ণনা করেছেন। আধুনিক সমাজকে ব্যঙ্গ করে প্রগতিশীলাদের নিয়ে লেখা অনেকের কথাই 'পরিণয়ে প্রগতি'তে আছে। লেখিকা এণা ও রাজেন্দ্রের প্রসঙ্গে বইয়ের ২১৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন:

'এণা দেবী জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বংশের কন্যা। মিঃ আর. সি. রায়ের পূর্বপুরুষরা হিন্দু ছিলেন,

জাতিতে তাঁরা ইহুদী। মিঃ রায়ের পিতা গোপাল রায় খ্রীষ্টধর্মে আস্থাবান। ...এরা বিদুষী ও রূপবতী। তাঁহার সহিত পরিচয় লাভে আর. সি. রায় মুগ্ধ হইলেন, এরাও তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী হইয়া পড়িলেন। দুজনে বিবাহ সম্বন্ধে পরামর্শ হইল—এই স্থির হইল যে ধর্মগত বিভেদের জন্য তাঁহারা পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিবেন। বিবাহে আবদ্ধ হইয়াও নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস বজায় রাখিবেন।'

বিয়ের পর এরা চলে গিয়েছিলেন ঢাকায়, একেবারে ভিন্ন পরিবেশে। সেখানেও যে অনুকূল পরিবেশ ছিল না তা নয়, তবু এরা ইচ্ছে করেই হাই সোসাইটির কেষ্টবিষ্টু হয়ে ওঠার চেষ্টা করেননি। ঘরের মধ্যে ছোট্ট একটা সুন্দর সংসার গড়তেই তাঁর ভাল লেগেছিল। সুরুচির ছাপ... ভাল লাগত তাঁদের জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে যেতে কারণ 'এই বাড়িতে কোনও পরচর্চা-পরনিন্দা হত না।' রবীন্দ্রনাথ এরা ও তাঁর স্বামীকে খুব স্নেহ করতেন। রাজেন্দ্রের মৃত্যুর পরে তিনি এরাকে একটি কবিতা লিখে দিয়েছিলেন,

'মাটিতে মিলিল মাটি
যাহা চিরন্তন
রহিল প্রেমের স্বর্গে
অন্তরের ধন।

Dust return to dust
Which is imperishable
Dwells in love's heaven
treasured by the Eternal.'

'কবিতা দুটি কবি একই কাগজে লিখে দিয়েছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথের ছোট মেয়ে চিত্রা কিছুদিন ছিলেন শান্তিনিকেতনে। নাচ-গান অভিনয়ের ধারা মিশে ছিল তাঁর রক্তে, তাই খুব সহজেই তিনি এ তিনটি জিনিস আয়ত্ত করে ফেললেন। বিশেষ করে নাচে তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেল। শান্তিনিকেতনে প্রতিমার পরিকল্পনা মতো নাচ শেখানো তখন সবে শুরু হয়েছে। নৃত্যশিক্ষক হিসেবে এসেছেন মণিপুরী শিক্ষক নবকুমার। অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির যে তিনটি মেয়ে এ সময় নাচ শেখেন তাঁরা হলেন চিত্রা, নন্দিতা ও নন্দিনী। অন্য মেয়েদের মধ্যে ছিলেন শ্রীমতী হাতি সিং, গৌরী বসু, নিবেদিতা দেবী, অমিতা চক্রবর্তী, মালতী সেন, উমা দেবী, অমলা রায়চৌধুরী, যমুনা দেবী এবং আরও অনেকে। এঁদের মধ্যে শ্রীমতী ও অমিতা পরে ঠাকুরবাড়ির বউ হয়েছিলেন। চিত্রা নাচের দলে ছিলেন ট্রাডিশন ভাঙার সময় থেকে। ঠাকুরবাড়ির উঠোনে প্রথম যে নৃত্যানুষ্ঠান হয় তাতে 'নূপুর বেজে যায়' গানটির সঙ্গে নেচেছিলেন চিত্রা, সুমিত্রা ও নন্দিতা। তারপর নেচেছিলেন 'ঋতুরঙ্গে' 'আমার রঙে রঙ মেশাতে হবে' গানটির সঙ্গে। নিউ এম্পায়ারে সরলাদেবীর পরিচালনায় যে 'মায়ার খেলা'র অভিনয় হয় চিত্রা তাতে সেজেছিলেন মায়াকুমারী। আলোড়ন জাগিয়েছিলেন। ১৯২৭ সালের ২৮ আগস্টের The Englishman জানিয়েছেন, '......an entirely novel Indian dance by Miss Chitra Tagore and another by Miss Reba Roy... were greatly appreciated by the larger audience.'

'Forward' কাগজের প্রতিনিধিও অনুরূপ কথাই লিখেছেন, 'The Dances formed a salient feature of the play. It was a sheer delight to watch Sm. Reba Ray and Sm. Chitra in their movements... In the magic of Chitra's feet was revealed the enchantment of first

সাহানা ঠাকুর

কমলা ঠাকুর

অমিতা ঠাকুর

শ্রীমতী ঠাকুর

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী

স্বর্ণকুমারী দেবী

জয়শ্রী সেন

পূর্ণিমা ঠাকুর

সাবিত্রী ঠাকুর

লীলা চৌধুরী

অমলা চৌধুরী

প্রতিভা চৌধুরী

উষাবতী দেবী

প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী

অভিজ্ঞা দেবী

মনীষা দেবী

স্মৃতি ঠাকুর

তনুজা দেবী

কল্যাণী মল্লিক

নন্দিতা কৃপালনি

love.'

সরলাদেবীর 'মায়ার খেলা' হয়ে যাবার কয়েকদিন পরে ঠাকুরবাড়ির ছেলেমেয়েদের উদ্যোগে আরেকবার 'মায়ার খেলা' হয়। এই অনুষ্ঠানে চিত্রা পরিবেশন করেছিলেন একটি স্বতন্ত্র জাপানি নৃত্য। 'Forward' কাগজের প্রতিনিধি ১৯২৭-এর ১৩ সেপ্টেম্বর পুনরায় লিখেছেন:

'Srimati Chitra, who excelled in her Japanese dance, came in for the largest share of the "claps". Her quick and "jumpy" steps, though an adaptation from the west, seemed to have a fascination all their own.'

শুধু নৃত্য নয়, অভিনয়েও চিত্রা দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। 'নটির পূজা'য় তিনি সেজেছিলেন বাসবী। 'তপতী' নাটকে নিয়েছিলেন মঞ্জরীর ভূমিকা। এই নাটকের গানের দলেও গান গাইতেন তিনি। এর পরেও অন্যান্য অনুষ্ঠানে চিত্রা যোগ দিয়েছেন। 'চিরকুমার সভা'র অভিনয়ে নৃপবালা সেজে অবাক করে দিয়েছেন সবাইকে কিন্তু পরে খুব বেশি অনুষ্ঠানে তিনি আর যোগ দেননি।

ঠাকুরবাড়ির বউ হবার অনেক আগেই শ্রীমতী রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসেছিলেন। আমেদাবাদের অভিজাত হাতি সিং পরিবারের মেয়ে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে সেখানকার কলেজে পড়া ছেড়ে দিয়ে চলে আসেন শান্তিনিকেতনে। বোধহয়, ১৯২১ সালে। কলাভবনের প্রথম ছাত্রী বলা যায়। তখন কলাভবন ও সঙ্গীতভবন যুক্ত ছিল বলে যাঁরা আসতেন তাঁরা দুই-ই শিখতেন। শ্রীমতী বিশেষভাবে ছবি আঁকা শিখতে এসেছিলেন। শ্রীমতী তাঁর আসল নাম নয়, রবীন্দ্রনাথের দেওয়া নাম, সেই নামের আড়ালে আসল নামটি সম্ভবত সুহাসিনী, একেবারে চাপা পড়ে গিয়েছে। সরকারি কলেজ ছেড়ে তিনি কলাভবনে এলেও তাঁর প্রতিভা বিকাশের মাধ্যম হল চিত্র নয়, নৃত্য।

শান্তিনিকেতনে তখন প্রতিমার তত্ত্বাবধানে ভাবনৃত্য শেখাবার ব্যবস্থা হচ্ছে, মণিপুর থেকে এসেছেন নৃত্যশিক্ষক নবকুমার—তাঁদের দলেই ভিড়লেন শ্রীমতী। ছবি আঁকাও বন্ধ হল না। নৃত্যছন্দে দেহভঙ্গিতে ফুটে উঠল নতুন নতুন রূপ। তবে নন্দিতা-যমুনা- নিবেদিতা-গৌরীর মতো শ্রীমতীকে বোধহয় শান্তিনিকেতনের ছাত্রী বলা যাবে না, কেননা তাঁর নৃত্য ছিল তাঁর একান্ত নিজস্ব আবিষ্কার। তবু তাঁর শিক্ষা শুরু হয়েছিল শান্তিনিকেতনেই কিন্তু প্রচলিত ধরাবাঁধা কোনও নাচের মধ্যেই তাঁর নৃত্যভাবনা সার্থক রূপ নিতে পারেনি। শ্রীমতী নৃত্যকে নতুন রসে পুষ্ট করে সৃষ্টি করলেন নব্য আঙ্গিকের। সেই প্রথম পর্বে, ভদ্রসমাজে যখন নাচ প্রায় পরিত্যক্ত, তখন কিভাবে সম্ভব হল কে জানে, শ্রীমতীর নৃত্য আজও ব্যতিক্রম বলেই মনে হবে।

শান্তিনিকেতনের শিক্ষা শেষ করে শ্রীমতী জার্মানিতে গিয়েছিলেন শিশুশিক্ষা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করতে। কিন্তু সেখানে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে যা শিখলেন তা হল নৃত্য। ইউরোপে তিনি নানা জায়গায় ঘুরেছেন, নাচ দেখেছেন, দেখিয়েওছেন। বিদেশে তিনি দেখাতেন ভারতীয় নৃত্য—যার সবটাই তাঁর নিজস্ব, মণিপুরি আঙ্গিকের ওপর গড়ে তোলা অভিনব নৃত্যভঙ্গিমা। এ সময় তিনি মডার্ন ডান্সের আঙ্গিক আয়ত্ত করেন মেরি উইগম্যানের নাচের স্কুলে, জার্মানিতে। ধরাবাঁধা নৃত্যশিক্ষা তিনি বেশি নেননি, তবে নাচ দেখেছেন প্রচুর। ভারতে ফিরে শ্রীমতী যখন তাঁর নতুন আঙ্গিকের ভাবনৃত্য দেখালেন তখন কবিও খুব খুশি হলেন। ভারতে শ্রীমতী নৃত্য পরিবেশন করলেন রবীন্দ্র-কবিতা আবৃত্তির সঙ্গে। সে এক নতুন ব্যাপার, গানের সঙ্গেও নেচেছেন কিন্তু তেমন আনন্দ পাননি। ছন্দ ও সুরের দোলায় মন যে আপনি নেচে ওঠে। শ্রীমতীর নৃত্যে যে অমিত বিত্ত রয়েছে তার চরম স্ফূর্তি ঘটবে কিসে? প্রথমে 'ঝুলন' কবিতা আবৃত্তির সঙ্গে নিজস্ব আঙ্গিকে নেচে শ্রীমতী সবাইকে মুগ্ধ করলেন।

দেখা গেল, যে কবিতায় সুরের দোলা নেই, সেই কবিতাকে অবলম্বন করেই শ্রীমতীর ভাবনা
রূপের মধ্যে আকার নিয়েছে। 'ঝুলনে'র পর 'শিশুতীর্থ', আরও কঠিন, আরও দুরূহ। তা হোক।
সহজের সাধনায় মন ভরে কই? 'শিশুতীর্থ' কবিতা নৃত্যের পক্ষে বড় কঠিন। কল্পনাটাই কষ্টকর।
শ্রীমতী তাকেই বেছে নিলে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তির সঙ্গে
শ্রীমতী দেখালেন তাঁর নিজস্ব আঙ্গিকে 'ঝুলন' ও 'শিশুতীর্থে'র ভাবনৃত্য। মণিপুরি, কথাকলি
ও হাঙ্গেরীয় নৃত্যের সংমিশ্রণ ঘটেছিল তাতে। এখনও এ পরিকল্পনা অসম্ভব রকমের আধুনিক।
শ্রীমতী লিখেছেন, 'শিশুতীর্থ নাটিকাটিতে শিল্পী নবজীবনের জাগরণকে অত্যন্ত সহজ আর
স্বচ্ছন্দভাবে রূপায়িত করলেন তার অনায়াস গতিভঙ্গির মাধ্যমে, কবি-কণ্ঠস্বর ছাড়া এই নাচের
আর কোনও সঙ্গত ছিল না। নৃত্যের এমন দৃপ্ত সরল ঋজু ভঙ্গিমা সকলের পক্ষে সহজবোধ্য
ছিল না, কিন্তু কবি এই নাচ দেখে বিস্মিত, পুলকে শিহরিত হলেন—ভাব এবং আবেগের প্রকাশ
মাধ্যম হিসেবে নাচের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে দেরি হল না। কবিতার সঙ্গে ভাবনৃত্য পরিবেশনে
শ্রীমতীর সঙ্গে আরেকজনের নামও করা যায়, তিনি অমিয় চক্রবর্তীর স্ত্রী হৈমন্তী। তিনি নৃত্য
পরিবেশন করেন 'কল্পনা'র 'দুঃসময়' কবিতার সঙ্গে। কিন্তু এঁদের উত্তরসূরি হিসেবে কাউকে
এখনও পাওয়া যায়নি। শ্রীমতীর নৃত্যভঙ্গি মুগ্ধ করেছিল কবিকে। মুগ্ধ হয়ে তিনি লিখলেন,

'She takes delight in evolving new dance forms of her own in rythmic representa-
tion of ideas that offer scope to her spirit for revelling in its own everchanging cre-
ations which according to me is the proper function of dance and a sure sign of her
genius. It has often caused me great surprise to see how with perfect truth and force-
fulness she has harmonised her movements with my own recitation of my poems—
a most difficult task requiriung not only a perfect fluency of technique but sympathy
which is creative in its adaptability. Her dance is never languid and suggestive of
allurements that cheapen the art. She is alert and vigorous and the cadence of her
limbs carries the expression of an inner meaning and never are on exhibition of skill
bound by some external canons of tradition.'

শ্রীমতী ঠাকুরবাড়িতে বউ হয়ে আসেন ১৯৩৭ সালে। এই প্রথম ঠাকুরবাড়ির ছেলের সঙ্গে গুজরাটি মেয়ের বিয়ে হল। রাজনৈতিক জীবনে অবশ্য সৌম্যেন্দ্র ও শ্রীমতীর পথ ছিল আলাদা। শ্রীমতী অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেছিলেন আর সৌম্যেন্দ্র প্রথম জীবনে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিলেও পরে ছিলেন চরমপন্থী। বিয়ের পরে শ্রীমতী সরে এসেছিলেন রাজনৈতিক জীবন থেকে, তবে সমাজসেবার কাজ ব্যাহত হয়নি। সংগঠনের কাজে তাঁর দক্ষতা ছিল। চল্লিশের দশকে 'রচনা' নামে একটি নারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দুঃস্থ মেয়েদের হাতের কাজ শেখানো ও সেগুলি বিক্রি করা, দেশভাগের সময় পুরনো কাপড় দিয়ে কাঁথা সেলাই করে বিক্রি করা প্রভৃতির সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল।

সেইসঙ্গে ছিল রবীন্দ্র-কবিতা নিয়ে অবিরত পরীক্ষা-নিরীক্ষা। নৃত্য পরিবেশন করেছেন বহু জায়গায়, মাদ্রাজে, সিংহল বা শ্রীলঙ্কায়। সর্বত্র পেয়েছিলেন অভাবিত সমাদর। নিজে ভালবাসতেন রুক্মিণীদেবীর নাচ দেখতে। তাঁর নিজের 'বিশ্বছন্দ', 'লীলাবৈচিত্র্য' কিংবা 'দি রোড টু ফ্রিডম ব্যালে'ও বেশ নতুন ধরনের। 'অভিসার' কবিতা অবলম্বনে 'বাসবদত্তা' নৃত্যানুষ্ঠান হয় নিউ এম্পায়ারে, ১৯৫০ সালে। সেখানে তিনি সৌম্যেন্দ্রনাথের আবৃত্তির সঙ্গে আর একটি স্বপরিকল্পিত নৃত্য পরিবেশন করেন। এ কবিতাটি একটি অসাধারণ নির্বাচন, কারণ 'বলাকা'র কবিতা 'দূর হতে কী শুনিস মৃত্যুর গর্জন'কে নৃত্যের মধ্যে প্রকাশ করার দুঃসাহস শ্রীমতীর আগে বা পরে কারওরই হয়নি। শিল্পকলার প্রতিটি শাখাই তাঁর স্পর্শে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তাঁর মধুর কণ্ঠে গাওয়া ভজন শুনতে মহাত্মা গান্ধী খুব ভালবাসতেন। পরে ভজনের

কয়েকটা রেকর্ড করেছিলেন। গানের স্কুল 'বৈতানিক' ও নাচের স্কুল 'নৃত্যকলা' তাঁর বাড়িতেই গড়ে উঠেছিল। কিন্তু নাচের সত্যিকারের উৎসাহী ছাত্র না পেয়ে 'নৃত্যকলা' বন্ধ হয়ে যায়। গতানুগতিকের পুনরাবৃত্তি শ্রীমতীর কাছে ছিল অসহ্য।

ছবির ব্যাপারে তাঁর প্রবল উৎসাহ ছিল। 'সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট' তাঁর কর্মদক্ষতার পরিচয় দেয়। চিত্র দর্শন ও সংগ্রহ সম্বন্ধে তাঁর আন্তরিক আগ্রহের একটা ছবি পাওয়া যায় সুরভির লেখায়। তিনি লিখেছেন, 'একদিন শ্রীমতী কাকি আমাকে জানাল, পাথুরিয়াঘাটার মহারাজা প্রবীরেন্দুদের আর্ট কালেকশন দেখতে চায়।' কিন্তু জোড়াসাঁকোর ৬ নম্বর বাড়ির সঙ্গে পাথুরিয়াঘাটার বাড়ির মেয়েদের যোগ ছিন্ন হয়ে গিয়েছে বহুকাল আগে। সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন পুরুষেরাই কিন্তু তার ফল ভোগ করতেন বাড়ির মহিলারা। কেউ কারও বাড়িতে আসা-যাওয়া দূরে থাক, পরমাত্মীয়ের সঙ্গে যদি ওই বাড়ির ছেলে বা মেয়ের বিয়ে হত, যা ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার, তাহলেও তাঁরা সেই বিয়েতে যোগ দিতে পারতেন না। তাই সুরভি প্রমাদ গুনলেন। বললেন, 'তুমি ন দিদিমাকে একবার জিজ্ঞেস কর।' ন দিদিমা হলেন শ্রীমতীর শাশুড়ি চারুবালা। শ্রীমতী বলেছিলেন, 'আরে রেখে দাও তোমাদের ওসব পুরনো ঝগড়ার কচকচি—আমি ওসবের মধ্যে নেই। তুমি ব্যবস্থা করে দাও আমি যাব।' ছবির প্রতি আন্তরিক টানই তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল দুই পরিবারের সাবেক মনান্তর ও মতান্তরের উর্ধ্বে। উভয় পরিবারই শ্রীমতীর আগ্রহে খুশি হয়েছিলেন। সময় বিদ্বেষের ধার কমিয়ে দেয়।

দ্বিজেন্দ্রনাথের দুই মেয়েরই বিয়ে হয়েছিল চাটুজ্জে পরিবারে। সরোজাসুন্দরী বড় মেয়ে। তাঁর স্বামী মোহিনীমোহন বিদেশে যাওয়ায় তিনি ঠাকুরবাড়িতেই অনেকদিন ছিলেন। পরে মোহিনীমোহন দেশে ফিরে রায়বাগানে একটি বাড়ি ভাড়া করে স্ত্রী-পুত্রদের নিয়ে আসেন। শুরু হয় সরোজার নিজের বাড়িতে নতুন ঘর-সংসার। কয়েক বছর পরে মোহিনীমোহন ম্যাকলাউড স্ট্রিটে বাগানসমেত একখানি বাড়ি কেনেন এবং সপরিবারে সেখানে উঠে আসেন। দীর্ঘদিন এই বাড়িটি কলকাতার শিল্প সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র রূপে পরিগণিত হত। ঐতিহ্যমণ্ডিত বাড়িটি আমাদের সচেতনতার অভাবেই বলতে গেলে হারিয়ে গেল। ১৮৩২ সালে বাড়িটি তৈরি হয়েছিল, বিদেশি গড়ন, নির্মাতা সম্ভবত জন পার্কস। যাক সে কথা।

সরোজা ও মোহিনীমোহনের তিন ছেলে, চার মেয়ে। কনিষ্ঠ পুত্র তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় ও ছোট দুই মেয়ে গীতা ও দীপ্তি সুপরিচিত। মোহিনীমোহনের অপর দুই পুত্র মহীমোহন ও নয়নমোহন—এঁদের বধূ হয়ে সরোজার সংসারে এলেন প্রকৃতি ও মমতা। দুজনের সঙ্গেই ঠাকুরবাড়ির যোগ ছিল। দুজনেই এসেছিলেন ৫ নম্বর বাড়ির গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুই কন্যা কাদম্বিনী ও কুমুদিনীর পরিবার থেকে। কাদম্বিনীর মেয়ে নৃপবালার বিয়ে হয়েছিল পাথুরিয়াঘাটায়। মহীমোহন ও প্রকৃতির বিয়ের দিন নতুন মতান্তর ও মনান্তর মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। মোহিনীমোহন প্রথমে ব্রাহ্ম হলেও পরে সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী হয়ে হোম ও অগ্নিপূজাকে প্রাধান্য দিতেন। গোঁড়া হিন্দুরা মনে করতেন শালগ্রাম সাক্ষী না হলে বিয়ে হয় না। ব্রাহ্মরা এর বিপক্ষে। দশ বছরের প্রকৃতি এসবের কিছুই জানেন না। পাথুরিয়াঘাটার রীতি অনুযায়ী তাঁকে সাজানো হল। কনে সাজানোর মধ্যেও সেকালে যে পার্থক্য থাকত সে কথা জানা গিয়েছে আরও পরে। প্রকৃতির সাজকে সাবেক সাজ হিসেবে দেখাই ভাল। সোনালি ফিতে লাগিয়ে সেখনসই খোঁপায় সোনার কাজ করা কাঁটা ও চিরুনি, কপালে ও গালে চন্দনের পত্রলেখা। লাল টুকটুকে বেনারসির সঙ্গে টিকলি, দুল, নথ, বাজুবন্ধ, শাঁখা, চুড়ি, বালা, আলতাপরা পায়ে রুনুঝুনু মল, হাতে লাল কাঠের লক্ষ্মীর চুবড়ি—যেন একেবারে লক্ষ্মী ঠাকরুনটি। বিয়ে অবশ্য নির্বিঘ্নে হল না। বরের বাড়ির একজন জুতো পায়ে দিয়ে সভায় ঢুকতে যাচ্ছেন এমন সময় একজন

বললেন, 'জুতো পায়ে যাবেন না, ঘরে শালগ্রাম শিলা আছে।' আকাশে পি পড়ল। শর্ত ছিল, বিয়েতে শালগ্রাম থাকবে না তবে হোম হতে পারবে। মেয়েপক্ষ সম্মত হলেও পুরোহিত করেছেন। '...বরের বাবা, আত্মীয়স্বজন, মামাবাড়ির ঠাকুররা সবাই উঠে পড়লেন। উঠল না শুধু বর নিজে।' মেয়ের মা প্রণয়িনী অসহায়ভাবে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। 'অনেক কথা কাটাকাটির পর মোহিনীমোহন তাঁর ন'ভাই রজনীমোহনকে বললেন, 'আমি একটা মেয়ের জীবন নষ্ট করতে চাই নে। তুমি উপস্থিত থাকো, থেকে মহীমোহনের বিয়ে দিয়ে নিয়ে এসো।' রজনীমোহন বিয়ে করেছিলেন সুনয়নীকে। প্রকৃতি বধূ হয়ে প্রবেশ করলেন সরোজার পরিবারে। তিনি পরিয়ে দিলেন একগাছা সোনা বাঁধানো লোহা, শ্বশুর আশীর্বাদ করলেন মুক্তোর নেকলেস দিয়ে। বিবাহসভার মালিন্যের লেশমাত্র তাঁদের ব্যবহারে ছিল না। প্রকৃতিও পছন্দ করেননি তাঁর শ্বশুরবাড়ির নিয়ম। তাঁর মেয়ে সুরুচি বড় হয়ে দেখেছেন, তাঁর মা বাপের বাড়ি কিংবা মামার বাড়ির সঙ্গে কোনও যোগ রাখতেন না শুধু বিজয়ার প্রণাম করতে যেতেন একটিবার। মেয়ে জিজ্ঞেস করতেন মাকে, 'মা, তুমি তো পাথুরিয়াঘাটা ও কয়লাঘাটায় বিজয়ার প্রণাম করতে যাবার অনুমতি পেয়েছ। একদিন আগে গেলে তো দশমী পুজোর প্রতিমা বরণ দেখতে পাবে।' প্রকৃতি রাজি হতেন না, বলতেন, 'এতে আমার শ্বশুরমশাইকে অপমান করা হবে। তিনি যা পছন্দ করেন না, এ বাড়ির বউ হয়ে সেটি কি আমি করতে পারি?'

প্রকৃতি খুব ভাল ছবি আঁকতেন। তাঁর বাবা জলধিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শিল্পী ছিলেন, জেমস আর্চারের কাছে ছবি আঁকা শিখেছিলেন। তাঁর আঁকা একটি ছবি ম্যাকলাউড স্ট্রিটের বাড়ির বসবার ঘরে রেখেছিলেন সরোজা, ছবিটা তাঁর বড় বউমার অয়েল পেন্টিং। দুই বউমার সঙ্গে তাঁর অতি মধুর সম্পর্ক ছিল। স্নানাহার ও বিশ্রামের পর কখনও তাঁরা দশ-পঁচিশ খেলতেন, কখনও সাতারাম ভালামলের গয়নার দোকানে যেতেন। বই পড়া এবং গান শোনার অভ্যাস ছিল ঠাকুরবাড়ির মতোই। সৌম্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'আমি গানের পর গান গেয়ে যেতুম সুরের নেশায়। সে আসরের নিত্যসঙ্গী ছিলেন বড় বউঠান আর মেজো বউঠান।' অর্থাৎ প্রকৃতি ও মমতা। বধূ হয়ে এসে প্রকৃতি তাঁর পড়াশোনার শিক্ষক ও সঙ্গী হিসেবে পেয়েছিলেন ছোট দেবর তপনমোহনকে। কিন্তু প্রকৃতির ছবি আঁকার কথা তাঁর মেয়ে কিছুই লেখেননি। মোহিনীমোহন কয়েকটি বিষয়ে কঠোর ছিলেন। তিনি কো-এডুকেশনে বিশ্বাস করতেন না, দুই মেয়ে সীতা ও দীপ্তি অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে বি এ পাশ করলেও তাঁদের এম এ পড়ার অনুমতি দেননি। সুরুচি আর্ট স্কুলে ভর্তি হতে চেয়েও অনুমতি পাননি। প্রকৃতি নিজেও কি এভাবে বাড়িতে ছবি আঁকা শিখতেন? সে সময় বহু পরিবারেই মেয়ে এবং বউয়েরা ছবি আঁকা শিখতেন। ঠাকুরবাড়িতে এর চল ছিল। অসিতকুমার হালদার মমতার জ্যাঠতুতো ভাই এবং তপনমোহনের বন্ধু হিসেবে ম্যাকলাউড স্ট্রিটে আসতেন ঠিকই কিন্তু প্রকৃতি তাঁর কাছে ছবি আঁকার পাঠ নিয়েছিলেন বলে শোনা যায়নি। তিনি জলরঙের মাধ্যমে কৃষ্ণলীলা, বুদ্ধজীবন ও রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও কাহিনী অবলম্বনে ছবি এঁকে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। নব্যবঙ্গীয় রীতির দিকেই তাঁর টান ছিল। 'প্রবাসী', 'বিচিত্রা', 'বঙ্গলক্ষ্মী'তে নিয়মিত তাঁর ছবি ছাপা হত। তেলো পেন্টিং, সিল্কের ওপরে ছবি আঁকা, গালা ও মীনার কাজেও তাঁর পারদর্শিতা ছিল। সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি ও কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট থেকে তাঁর ছবি পুরস্কার পায়। আলপনা ও মূর্তিশিল্পের একটি সংকলন 'চিত্রণ' ও এ সময় প্রকাশিত হয়েছিল। 'চিত্রণে'র ভূমিকা লিখেছিলেন মুকুল দে। তাঁদের আর্ট স্কুলের সঙ্গে প্রকৃতির যোগ ছিল।

মোহিনীমোহন নারীশিক্ষায় বিশ্বাসী না হলেও বাড়ির মেয়েদের অবরোধে রেখেছিলেন তা নয়। সরোজা প্রতিদিন বিকেলে ল্যান্ডো গাড়িতে চেপে হাওয়া খেতে যেতেন, মোটরগাড়ি তাঁর পছন্দের ছিল না। কিন্তু সেখানেও নিয়ম ছিল। তিনি যখন জোড়াসাঁকোয় তাঁর বাপের বাড়িতে মাসে একবার করে যেতেন তখন চাপতেন ঢাকা গাড়িতে 'একসঙ্গে সবুজ দুটি কাচের জানলা

বাড়ি থেকে আসবার সময়ার উপরে 'তুলে দিত ঝরিনা।' সত্যেন্দ্রর বড় বড় বাড়ির মেয়েরা বিশেষ করে ঠাকুরবাড়ির বাড়িতে। আশুতোষ চৌধুরী তখন কলকাতা হাইকোর্টের একজন বিচারপতি। তাঁর বাড়ির পার্টিতে সত্যেন্দ্র মেয়ে এবং বউদেরকে নিয়ে যেতেন বিকেলে। সেই সময় মেয়েদের সাজ কেমন ছিল সুরুচি জানিয়েছেন, 'শাড়ির সঙ্গে জামার বা ব্লাউজের চলন হয় হালকা জেবরনি কিংবা ঢাকাই জামদানি। মাথা খোঁপার সঙ্গে বাঁধা থাকতো বাঁধন খোলা 'বাব খোঁপা'। তখন বিশ্বনির্মিত ব্যবহারের চল ছিল না। তবে যে আসরে অভিজাতী উপস্থিত, সেখানে চটিজুতো পরা নিষিদ্ধ। তাই পায়ে পরা হত মোজা আর হীল দেওয়া জুতো। হাতে থাকত আইভরি শাখির বালকের শাখা। এটি হল ভিক্টোরিয়ান যুগের কায়দা। কপালে সবুজের সিঁদুর টিপ, হাতে লাগানো আতর।' তবে অভিজাত ছিল। শাড়ির মধ্যে সুরুচির ছিল 'বিলিতি প্যারিসিয়ানের উপর মাজন আকর্ষণ।'

অসহযোগ আন্দোলনের সময় এই বাড়ির মেয়েরাই চরকা ও তকলিতে সুতো কাটা শুরু করেছিলেন। বাড়িতে এই ব্যবস্থা করেছিলেন সৌম্যেন্দ্রনাথ, তিনি তখন নিজে ফেরি করতেন বাড়ি বাড়ি। সুরুচি তাঁর কাছ থেকে চরকা নিতেন, শাড়িতে রং করে আবার তাঁকেই উপহার দিতেন। এভাবেই তিনি মিশে গিয়েছিলেন বাড়ির সংস্কৃতির সঙ্গে। তিনি ভাল অভিনয় করতে পারতেন। একবার সুনয়নী বাড়ির মেয়ে বউদের নিয়ে করালেন 'বিসর্জন'। সুরুচি হন সে অভিনয়ে। তাই সুনয়নী ঠিক করলেন, রবিঠাকুরকে দেখাতে হবে। তিনি তখন শিলাইদহে ছিলেন। নাটক দেখে, বিশেষ করে সুরুচির অভিনয় দেখে খুব খুশি হয়ে তাকে আশীর্বাদ করে অবনীন্দ্রনাথকে ডেকে বললেন, 'তোর বউ এত চমৎকার অভিনয় করতে পারে—আর তুই তাকে শুধু সংসারের কাজের মধ্যে আটকে রেখেছিস।'

নবগোপালের স্ত্রী মমতা কুমুদিনীর দৌহিত্রী। ঠাকুরবাড়িতে এইরকম পারিবারিক সম্পর্ক লতার মতো জড়ানো। পিরালি হওয়ায় বাড়াও ধনী পরিবারে যেমন সহজভাবেই যাতায়াত ছিল, তেমনই সম্পর্কিত পরিবার থেকে বউ নিয়ে আসাও ছিল সহজ ব্যাপার। মেয়েদের বিবাহের চিন্তাও এর অন্যতম কারণ। পিরালিদের বিবাহ তো মেয়েদেরই বেশি হত। যদিও এমন হয়েছে ভিন্ন পরিবারের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে সম্পর্কের বাঁধন দৃঢ় করার চেষ্টাও দেখা যেত ঠাকুর পরিবারে আন্তঃপারিবারিক গণ্ডির মধ্যেই বিয়ে হত। মমতা রবীন্দ্রনাথের 'সখীর সংগঠন' গান ও সেতার শিখতেন। তাছাড়া তিনি খুব ভাল সেলাই জানতেন। সত্যাশ্রয়ী নারীশিক্ষা সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন হেমলতা, তিনি সম্পর্কে এঁদের দিদি, তিনিই মমতাকে যুক্ত করেছিলেন আশ্রমের কাজে। মমতা সেখানে সেলাই শেখাতেন। অনাথা বিধবাদের জন্যে যে ক'টি জীবিকার্জনের পথ খোলা ছিল, সেলাই শিক্ষা তার অন্যতম। সেই কাজই করতেন মমতা। নিতান্ত অসময়ে নবগোপালের মৃত্যু হওয়ায় মমতা অনাথা বিধবাদের শিক্ষার কাজে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন।

গীতা ও প্রীতি মোহিনীমোহন ও সত্যেন্দ্রসুন্দরীর বড় দুই মেয়ে। ঠাকুর পরিবারের দুটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। সত্যেন্দ্রর আরও দুটি মেয়ে ছিলেন শকুন্তলা ও সুধা, তাঁরা সুখেন আর রমণীমোহন ও উমানন্দীর দুই ছেলে সুরেশ ও অরুণের বিয়ে দেওয়া হয়েছিল যেন আগুনের সঙ্গেই কিন্তু এঁদের বিবাহিত অল্প বয়সেই মারা যান ও একজন বিধবা হন। তাঁদের পরিবারের মেয়েদের বিবাহিত জীবন সুখের নয় দেখে মোহিনীমোহন স্থির করেছিলেন বাকি দুই মেয়ের আর বিয়ে দেবেন না, তাঁদের লেখাপড়া শেখাবেন। তাঁর ইচ্ছানুসারে কিংবা স্বভাবের গুণে পারেননি বলে, যাই হোক না কেন গীতা ও প্রীতি বিবাহ করেননি। তাঁরা কৃতিত্বের সঙ্গে ডিগ্রিলাভ করেন ও, সমাজসেবিকারূপে সর্বজন পরিচিত হন। এই পরিবারের সব মেয়েই পড়াশুনা

ডায়োসেশন স্কুলে এবং কলেজে। লোরেটোর মতো এই স্কুলটিও অভিজাত বাঙালি পরিবারে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। খ্রিস্টান সন্ন্যাসিনী শিক্ষিকাদের স্নেহ ভালবাসাও ছাত্রীদের আকৃষ্ট করত। ঠাকুরবাড়ির অনেকেই এসময় ডায়োসেশনের ছাত্রী। প্রতিভা, প্রজ্ঞা, সরোজার মেয়েরা এখানেই পড়তেন। গীতা ও দীপ্তি পিঠোপিঠি দুই বোন একসঙ্গেই সব কাজ করতেন। এমনকী একই রকমের সাজে দুজনকে সব সময় দেখা যেত। প্রভূত সম্মানের সঙ্গে দুজনেই স্নাতক হলেন কিন্তু মোহিনীমোহন তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার অনুমতি দিলেন না। দু বোনে ডায়োসেশনেই বি টি পড়লেন এবং পড়াতে শুরু করলেন। মেয়েদের বিয়ে না দিলেও তাঁরা যে চাকরি করে নিজেদের খরচ নিজেরাই চালাবেন এ কথা মোহিনীমোহন ভাবেননি। সেকালে সম্পন্ন ব্যক্তিরা কেউই তা ভাবতেন না। শিক্ষার, বিশেষ করে অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশনের সঙ্গে যে অর্থোপার্জনের অঙ্গাঙ্গি যোগ দেখা যায় এক সময়ে মেয়েদের সেই সংযোগ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার প্রবণতা সকলেরই ছিল। গীতা ও দীপ্তির কর্মজীবন সেজন্য সমাজসেবা হিসেবেই গণ্য হল। তাঁরাও একে একে জড়িয়ে পড়লেন অল বেঙ্গল উইমেন্স অ্যাসোসিয়েশন, জ্যোতির্ময়ী শিশুভবন প্রভৃতির সঙ্গে। যেটুকু সময় রইল, পিসিমা হেমলতা সেটুকু চেয়ে নিলেন সরোজনলিনী আশ্রমের স্কুলের জন্য।

দু বোনের মধ্যে সামান্য পার্থক্য ছিল। দীপ্তি ভাল বেহালা বাজাতেন। অবশ্য বাড়িতে গানের চর্চা হত। দুজনেই গান জানতেন। দীপ্তি লিখতেনও। তাঁর বহু লেখা ছড়িয়ে আছে সাময়িকপত্রের পাতায়। গল্প, উপন্যাস, স্মৃতিকথা, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, নাটিকা, অনুবাদ কী না লিখেছেন তিনি। শেষ জীবনে করেছিলেন নার্সারি রাইমের অনুবাদ—অযত্নে অবহেলায় কোথায় যে হারিয়ে গেল কে জানে? যেগুলি হারায়নি সেই লেখাগুলিকেও সংকলন ও সম্পাদনা করে কেউ প্রকাশ করেননি। স্বাভাবিকভাবেই প্রবন্ধগুলিতে নারীর কথা প্রাধান্য পেয়েছে। ঘরে বাইরে দেখেছেন নারীর প্রতি অবিচার। সেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে দেখেছেন, 'মেয়েদের অধিকার দিন দিন বাড়ছে আর তার সঙ্গে বাড়ছে দায়িত্বের ভার।' তিনি বুঝতে পারছিলেন, 'যে সম্মানটা আদায় করে দেওয়া হচ্ছে সেটা তাদের জন্যে নয় সেটা মানুষের সেবায় নিরত থাকার জন্যে।' অর্থাৎ নারীকে নারী হিসেবে কোনও মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না। তাকে দিয়ে কাজটি করিয়ে নেওয়ার জন্যে সম্মান দেওয়ার ছলনা করা হচ্ছে। 'বলীদ্বীপের বিবাহ প্রথা' লেখার সময়ও দীপ্তির লেখনী ঝলসে উঠেছে, 'পিতাই হলেন কন্যাদের নির্যাতনের প্রধান পাণ্ডা। কন্যাদের তাঁরা তাঁদের সন্তান বলে গণ্যই করেন না। পুত্ররাই হল তাঁদের সর্বস্ব।' এই দৃষ্টিভঙ্গি তো শুধু বলীদ্বীপের নয়, পূর্বদেশবাসীদের সকলেরই। বলীদ্বীপ সম্বন্ধে তিনি লেখেন, 'স্বভাবের সৌন্দর্য ভগবান এখানে দু হাতে বিলিয়েছেন কিন্তু তাঁর রচিত সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দর জীব যে নারী, সেই নারীকে নিয়েই এদেশে পণ্যদ্রব্যের মতো বেচাকেনা চলে। নির্লজ্জের মতো নারীর সৌন্দর্য নিয়ে এরা দরদস্তুর করে।'

দীপ্তির ইউরোপ ভ্রমণের কথা আছে 'পথ চলাতেই আনন্দ' রচনায়। ১৯৩৪ সালে দুই বোনে গিয়েছিলেন প্রথমে ইংল্যান্ড তারপর ফ্রান্স, ইটালি, জার্মানি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে এই ভ্রমণ একটু অন্য ধরনের। দীপ্তিদের জার্মানি যাবার বিশেষ একটা কারণ ছিল। তাঁরা শুনেছিলেন, ওবারঅ্যামারগাওয়ের প্যাশন প্লে-র কথা। দশ বছর অন্তর একবার এই অভিনয় হয়। খ্রিস্ট জীবনচরিতের এই অভিনয় দেখা পরম ভাগ্যের ব্যাপার। ১৯৩৪ সালে এই অভিনয়ের তিনশো বছর পূর্তি উপলক্ষে এই অভিনয় হয়েছিল। দীপ্তি সেই অভিনয়ের অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি অভিনয় দেখে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়েছিলেন। 'ওবারঅ্যামারগাও অ্যামার নদীর উপর অবস্থিত একটি ছোট্ট গ্রাম। ...যেদিকে চাও সেদিকেই কেবল অ্যাল্পসের দৃশ্য। ...এই ক্ষুদ্র ঘুমন্ত গ্রামখানি দশ বছরে একবার জাগে। তখনই তাদের প্যাশন প্লে দেখবার জন্য দেশ-বিদেশ থেকে লোক আসে।' দীপ্তিকে অনুসরণ করে জানা যায়, এই অভিনয় আরম্ভের একটি ইতিহাস আছে। ১৬৩৪

সালে প্লেগের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গ্রামবাসীরা প্রতিজ্ঞা করেছিল দশ বছর অন্তর একবার করে তারা যিশুর প্যাশন বা মানুষের জন্য তিনি যে কষ্ট সয়েছিলেন তার অভিনয় করবে। যাঁরা অভিনয় করেন, তাঁরা সেই গ্রামেরই লোক এবং দশ বছর ধরে পরীক্ষা করে তাঁদের অভিনয় করতে দেওয়া হয়। দীপ্তি লিখেছেন, 'প্লে কেমন দেখলুম তা বর্ণনা করতে পারি না। মনে হল, একটি একটি করে বাইবেলের পাতা উলটে যাচ্ছি। এ যে কেবল অভিনয় তা মনে হয়নি একবারও।' প্রসঙ্গত মনে পড়ে যেতে পারে বাংলায় অনবদ্য 'যিশু চরিত'-এর লেখক তপনমোহন দীপ্তির দাদা।

জ্ঞান হয়ে অবধি দীপ্তি ও গীতা জানতেন, 'আমাদের দুজন দাদামশাই আছেন শান্তিনিকেতনে—দাদামশাই আর রবিদাদা।' রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় গাঢ় হয় ১৯৩৯ সালের ফাল্গুন মাসে। দীপ্তির কাছে এই দিন দশেকের স্মৃতি অমূল্য, মূল্যবান আমাদের কাছেও। এখানে তাঁকে একটু অনুসরণ করা যেতেই পারে। 'দাদামশাই মারা যাবার পর বহু বৎসর আর শান্তিনিকেতনে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। ১৯৩৯ সালে ফাল্গুন মাসে দিন দশেকের জন্য গিয়েছিলুম উত্তরায়ণে।' বিকেলে দেখা হল রবিদাদার সঙ্গে নাতনিদের। কবি বললেন, 'হাতের লেখা সংগ্রহ করার বাতিক তোদের নেই?'

সুযোগ পেয়ে দুই বোনই বললেন, 'হ্যাঁ খুব বাতিক আছে, তুমি লিখে দেবে?'

'তা দেব।'

'ইংরেজিতে কিন্তু লিখে দিতে হবে কারণ আমাদের অবাঙালি বন্ধুদেরও দেখাতে চাই।'

'তা দেব এখন—'

দুই বোন শ্রীনিকেতন থেকে অটোগ্রাফ খাতা কিনে এনে পাঠিয়ে দিলেন কবিকে। পরদিন বিকেলে দেখা হতে কবি বললেন, 'দিয়েছি দু লাইন লিখে, জানি না পছন্দ হবে কি না, না হলে কিন্তু উপায় নেই।'

দীপ্তি লিখেছেন, 'আগ্রহ ভরে যখন লেখা পড়ছি, তখন কবি বললেন, 'তোমাদেরই উদ্দেশ্যে লিখেছি, তোমরা আমার কাছে বড্ড দেরিতে এসেছ—কবি লিখেছিলেন—'You have risen late my cresent moon, but my night bird is still awake to great you.'

বড়মা সেখানে ছিলেন দাঁড়িয়ে, বললেন, 'বাবামশাই, আপনি কি মনে করেন ওরা মেমসাহেব যে ইংরিজিতে লিখে দিলেন—কবি বললেন—'আমি কেন ওদের মেমসাহেব মনে করব, ওদের ফরমাশ মতো ইংরিজিতে লিখেছি।' আমি বললুম, 'জান রবিদা, বাংলায় লিখলে মেজপিসি এখুনি বঙ্গলক্ষ্মীতে ছাপিয়ে দিতেন, ইংরিজি লেখাতে সে সুবিধে হল না'—হেসে বললেন কবি—'ঠিক বলেছিস, বড় বউমা বঙ্গলক্ষ্মীর খোরাক পেলেন না বলেই গিয়েছেন রেগে—'

এমনই ছোট ছোট অনেক ছবি ধরা আছে দীপ্তির স্মৃতিকথায়। নাতনি ও দাদামশাইয়ের মধুর সংলাপে সেগুলি পূর্ণ। দীপ্তির বাংলা অবশ্য একটু আলাদা ধরনের, ইংরেজির সঙ্গে তার মিল বেশি। কবিও বলেছিলেন, 'ইংরিজি স্কুলে পড়ে তোদের ইংরিজিটা হয়েছে দোরস্ত, কিন্তু যেন কেমন একটুখানি বিদেশি ভাবাপন্ন হয়ে পড়ছিস। আমার কাছে থাক কিছুদিন আমি সব ঠিক করে দেব।' দীপ্তি লিখছেন, 'কবি যতই বড় হোন না কেন, ছোটদের সঙ্গে মিশতে তাঁর ছিল না কোনও বাধা। পন্ডিতদের সঙ্গে তিনি হতেন পন্ডিত আবার নাতনি সম্পর্কিয়াদের সঙ্গে হতেন বাংলার চিরন্তন দাদামশাই। এত দ্রুত এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তিত হতেন যে আমরা অবাক হয়ে যেতুম।'

শান্তিনিকেতনে প্রতিদিন সন্ধ্যায় কবির পায়ে তেল মালিশ করা হত। একদিন কেউ আসবার আগে গীতা ও দীপ্তি সেই দাবি নিয়ে হাজির হলেন। কবি বললেন, 'না না তোরা আমার কাছে দুদিনের জন্য এসেছিস, তোদের দিয়ে পা টিপিয়ে নেব কী করে?' নাতনিরা হারবার পাত্রী নন,

বললেন, 'তোমার পা টিপে দেবার সুযোগ তো আমরা বড় একটা পাই না, এ তো আমাদের সৌভাগ্য।' কবি হেসে বললেন, 'সত্যি? তা দে একটু হাত বুলিয়ে—'

রবীন্দ্রনাথ সকলের সেবা নিতে পারতেন না। এ ব্যাপারে তাঁর তীব্র পছন্দ অপছন্দ ছিল কিন্তু আধুনিকা হলেও এই নাতনিদের সেবা তাঁর পছন্দ হয়েছিল। তবু দু-একবার ওজর আপত্তি জানিয়েছিলেন, 'তোদের সব শৌখিন পোশাক, যদি তেল লেগে যায়? তখন কাপড় হয়তো এদেশে কাচাতেই পারবি না, হয়তো আবার কাপড় কাচাতে প্যারিস পাঠাতে হবে।' বললেন, 'তোরা সব আধুনিকার দল, আধুনিকারা যে কারুর পা টিপতে চায় তা জানতুম না।' গীতা বা দীপ্তি হার মানেননি। সঙ্গে চলত কথার মালা গাঁথা। একদিন দীপ্তি তাঁর হাতটি একটু টিপে দেবেন ভেবে ধরতেই বললেন, 'পাণি-পীড়ন করবেই? তা কর—' তারপর 'যখন পা টিপতে বসলুম তখন বললেন, 'ওঃ এইবার পা নিপীড়ন করবে।'

দেখতে দেখতে কেটে গেল কয়েকটা দিন। কবির একটা ফোটো সংগ্রহ করে তাঁরা নিয়ে গেলেন কিছু লিখিয়ে নিতে। কবি বললেন, 'এই সেদিন একটা লিখে দিলেম, আবার এসেছিস? কিছু দেব না লিখে, ভাগ—' শেষে হার মানলেন, 'আচ্ছা রেখে যা, এমন একটা বিশ্রী রকম লিখে দেব, তখন টেরটি পাবি—'। বিকেলেই সেটি নাতনিদের কাছে ফেরত এল, সঙ্গে তাঁর 'বিশ্রী' রকম লেখাটি—

'আলোকের স্মৃতি ছায়া বুকে করে রাখে
ছবি বলে তাকে।'

বিদায় নেবার সময় কবি প্রস্তাব করেছিলেন, 'আবার এস, আসতেই হবে আবার, এই পায়ের টানেই আসবে।' সেবার বিজয়ার আশীর্বাদ পাঠাবার সময়ও লিখলেন,

'গীতা ও দীপ্তি,

যুগল নাতনি, বিজয়ার আশীর্বাদ গ্রহণ করো। আমার পদযুগল করকমলের মিলন প্রত্যাশায় চঞ্চল হয়ে রয়েছে। বিজয়া দশমী ১৩৪৬।

রবিদাদা'

মহাজাতি সদনের ভিত স্থাপনের দিন আবার দেখা। সেখানেই কবি বললেন, 'ও তোমরা, তাই ভাবি পা দুটো কেন আমার এমন অচল হয়ে গিয়েছে।' আবার তাঁদের আহ্বান জানালেন শান্তিনিকেতনে। বললেন, 'আমার কাছে থাকলে তোদের আমি কত বিষয় শেখাতে পারব, এমনটি শেখাতে তোদের আর কেউ পারবে না।'

নাতনিরা জানতেন সে কথা তবু কলকাতায় থাকার দীর্ঘ অভ্যাস তাঁরা ছাড়তে পারলেন না। কবি দুঃখিত হননি। হেসে বলেছিলেন, 'শুধু কি অভ্যাস? না, অন্য কোনও টান আছে। নিজের মুখে যদি বলতে লজ্জা হয় তো তোরা দুই বোন পরস্পরের নামে আমার কানে কানে বলে দে—'।

দীপ্তির স্মৃতিকথাটি পড়তে ভাল লাগে, কৌতুকপ্রিয় রবীন্দ্রনাথকে ঘরোয়া পরিবেশে ফিরে পাওয়া গেল বলে। সেবামূলক কাজের জন্য গীতা ও দীপ্তির সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসুরও যোগাযোগ ছিল। তিনি একবার ম্যাকলাউড স্ট্রিটের বাড়িতে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতেও এসেছিলেন, সঙ্গে ছিলেন মিস ম্যারিলা ফোক নাম্নী এক পোলিশ মহিলা। এই সাক্ষাৎকারের আর কোনও বিবরণ পাওয়া যায়নি।

দীপ্তি প্রচুর লিখেছিলেন কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি কখনও। তাঁর একটি গোয়েন্দা গল্পের চলচ্চিত্ররূপ দেবার চেষ্টা করা হয়েছিল রাধা ফিল্মের পক্ষ থেকে, শুটিংও হয়েছিল

ম্যাকলাউড স্ট্রিটের বাড়িতে খানিকটা। শেষ পর্যন্ত 'লক্ষ্মীদিদির কালো চশমা' মুক্তি পায়নি। অর্ধ পথেই পরিত্যক্ত হয়েছিল। তাঁর বেশ কয়েকটি গল্প-উপন্যাস এখনও সাময়িকপত্রের পাতায় আত্মগোপন করে আছে। কয়েকটিতেই রয়েছে তাঁদের মস্ত বাড়িখানির একটি ভূমিকা। কোনও কোনও গল্পে তাঁদের সময়কার চাটুজ্জেবাড়ির ছোট ছোট ছবি। কোথাও বা সেই সময়। সমাজসেবিকা দীপ্তির সাহিত্যিক পরিচয় আমাদের মন থেকে একরকম মুছেই গিয়েছে।

*

পূর্ণিমার সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির যোগ একদিক থেকে সবচেয়ে বেশি। তিনি দ্বিপেন্দ্রনাথের দৌহিত্রী আবার সুরেন্দ্রনাথের পুত্রবধূ। যদিও ঠাকুরবাড়িতে ঘরের মেয়ে মাঝে মাঝেই বধূ হয়ে এসেছেন কিন্তু মহর্ষি পরিবারে এমন বিয়ে ইতিপূর্বে হয়নি। দ্বিপেন্দ্রনাথের মেয়ে নলিনীর বিয়ে হয়েছিল চৌধুরী পরিবারে। তাঁর তিন মেয়ের মধ্যে দুজনের বিয়ে হয় ঠাকুরবাড়িতে। মেজ মেয়ে অপর্ণা পাঁচ নং বাড়ির নবেন্দ্রনাথের স্ত্রী। পূর্ণিমা এলেন ছয় নং বাড়িতে। যে পরিবেশে মানুষ হয়েছিলেন সেখানে সব মেয়েই অল্পবিস্তর গান জানতেন, অভিনয় করতেন। পূর্ণিমাও সেজেছেন 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র বালিকা, 'মায়ার খেলা'য় অমর, 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'য় লক্ষ্মী, 'চিরকুমার সভা'য় পুরবালা। পূর্ণিমা স্নাতক হবার পর রবীন্দ্রনাথ নলিনীকে বললেন, 'তোর মেয়েকে নিয়ে যাব। আমার স্কুলে ইংরেজি পড়াবে।' স্কুলে পড়ানো ঠাকুরবাড়ির ছেলেমেয়েদের রক্তে আছে। তাই নলিনী কোনও আপত্তি করলেন না। পূর্ণিমা শান্তিনিকেতনে এসে একটানা দেড় বছর ইংরেজি পড়ালেন। বন্ধু পেলেন লীলা মজুমদারকে। লীলা তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন, 'আমার এক সপ্তাহ পরে ...পূর্ণিমা...এসে কাজে যোগ দিল। ...সে মিনি-মাগনা পড়াবে—তার অভিভাবকদের মতে মেয়েদের পরনির্ভরশীল হতে হয়, নইলে তাদের পুরুষ আত্মীয়দের মান থাকে না।' মেয়েদের চাকরি করবার সুযোগ থাকলেও এইসব ট্যাবু বা নিষেধাজ্ঞা অনেকদিন বাঙালি মেয়েদের বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের মেয়েদের নিজের পায়ে দাঁড়াবার সুযোগ খুঁজে নিতে দেয়নি। সেই প্রথমদিকে ঠাকুরবাড়ির মেয়ে হয়ে সরলা চাকরি করতে যাবার সাহস জুগিয়েছিলেন বাঙালি মেয়েদের, কিন্তু সেই এগিয়ে আসার ব্যাপারটা ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা ধরে রাখেননি। শিক্ষাদানকে সেবা ভেবেই সন্তুষ্ট চিত্তে পড়িয়েছেন।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দেশভাগের পরে এই ছবিটা একটু একটু করে বদলাতে শুরু করে।

পূর্ণিমার সঙ্গে সুবীরের বিয়ের কথা ইন্দিরা তাঁর 'জীবনকথা'য় লিখে গিয়েছেন। 'সুবীর এবং
নলিনী দুই খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাইয়ের ছেলেমেয়ে বলে—সুবীর আমাদের বিশেষ বন্ধু হিন্দু
আইনজ্ঞ শ্রীযুক্ত অতুল গুপ্ত মহাশয়ের পরামর্শ নিয়ে বিবাহ রেজিস্ট্রি করে গৌর বিল অনুসারে।
আদি সমাজের বিয়েতে রেজিস্ট্রি করা এতদিন মহর্ষির মত ছিল না এইজন্য যে, ১৮৭২-এর
ধারা অনুসারে বলতে হত, 'আমি হিন্দু নই, মুসলমান নই' ইত্যাদি, অথচ মহর্ষির বিশেষ ইচ্ছা
যে আদি-ব্রাহ্ম সমাজের বিয়ে মূর্তিপূজা বাদে হিন্দু বিয়ে বলেই চলে। গৌর বিলে অবশ্য এখন
এ অস্বীকারোক্তি করতে হয় না। সুরেনেরও হয়তো অন্য কারণে রেজিস্ট্রিতে তেমন মত ছিল
না, কিন্তু ছেলেরা যা করতে চাইত উনি তো কখনও তাতে না বলতেন না।'

সুবীর ও পূর্ণিমা পরস্পরকে নির্বাচন করেছিলেন। ইন্দিরার সরস ধারাবিবরণী, '...তখন
শরীরও যেমন সুগঠিত, চেহারাও তেমনি সুন্দর (সুবীরেন্দ্র) ছিল। সেই সুন্দর চেহারা দেখে
অন্ততঃ একজন তো ভুলেছিল, যার সঙ্গে পরে বিয়ে হল। তখন সুহৃৎরা লালবাংলোর দোতলা
ভাড়া করেছিল, তাই পরস্পর দেখাশুনার সুবিধেও ছিল।' অপূর্ব বর্ণনা। অনাবিল দৃষ্টিতে একটি
অপরূপ কাহিনী মাত্র কয়েকটি শব্দেই বলা হয়ে গেল। সহজেই ধরে নিতে পারি, রবীন্দ্রনাথের
সম্মতি ছিল না, কেননা, ইতিপূর্বে পূর্ণিমার দিদি অপর্ণার যখন গগনেন্দ্রনাথের ছেলে নবেন্দ্রর
সঙ্গে বিয়ে হল তখন কবি এই আন্তঃপারিবারিক বিবাহ নিয়ে কোনও কারণে বিরক্ত হয়েছিলেন,

একটি তারিখহীন পত্রে তিনি রথীন্দ্রকে লিখেছিলেন, 'অপুর বিবাহের নিমন্ত্রণ আমি তো নেব না। কিন্তু দ্বিপুই তো এই বিবাহ নিজে ইচ্ছা করে ঘটিয়েছেন এখন নিমন্ত্রণের কথা নিয়ে এত ভাবছেন কেন?' সুবীর এবং পূর্ণিমার বিয়েতে যদি কবির আপত্তি থাকে তবে তা রেজিস্ট্রি করার জন্যেও হতে পারে। ইন্দিরা লিখেছেন, 'আমাদের সমাজের বাঁধা পুরোহিত কাউকে পাওয়া গেল না, অগত্যা আমরা দুই স্ত্রী-পুরোহিত খাড়া করতে বাধ্য হলুম—হেমলতা বোঠান এবং সরলাদিদি।' সমাজের পুরোহিতদের কাউকে কেন পাওয়া গেল না ইন্দিরা সে কথা লেখেননি তবে ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা যে কোনও কাজেই পিছিয়ে থাকার মেয়ে ছিলেন না, এসব ঘটনায় তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

পরবর্তী জীবনেও পূর্ণিমা পাকাপাকিভাবে শান্তিনিকেতনে বাস করতেন। ১৯৫৩ সালে স্বামীর মৃত্যুর পরে পাঠভবনের শিক্ষয়িত্রী হন। ঘরের কাজ ছাড়াও ছিল 'আলাপিনী সমিতি' ও 'নারী-কল্যাণ সমিতি'। সব কাজেই তাঁর উৎসাহ ছিল, সবচেয়ে বেশি আনন্দ পেতেন তাঁর 'ন-মা' অর্থাৎ ইন্দিরার সাহচর্যে। তিনিও তাঁকে সব কাজে উৎসাহ দিতেন। ইচ্ছে ছিল, ইন্দিরার একটি প্রামাণ্য জীবনী লেখার। কাজে হাতও দিয়েছিলেন। অতি প্রিয়জনের জীবনী লেখা বেশ কষ্টের কাজ, বিশেষ করে লেখিকা নিজেও যখন সেই গ্রন্থের একটি চরিত্র, ইন্দিরার কাছের মানুষ হিসেবে। পূর্ণিমার ভাষাও সাবলীল। অনাবশ্যক গল্পে ভরা নয়, তবে ইন্দিরাকে চিনতে সাহায্য করে। বইটি অবশ্য আজও প্রকাশিত হয়নি। বিশ্বভারতীর উপাচার্য হয়েছিলেন ইন্দিরা। পূর্ণিমার লেখায় সে সময়ের কিছু কথা আছে। যেমন, একবার এক অধ্যাপক বিশ্বভারতীর বিরুদ্ধে মামলা করেন। পুলিশ এনকোয়্যারি ইত্যাদি হলে ইন্দিরা খুব সরস করে অন্তরঙ্গদের বলতেন, 'দেখ্ জীবনে নানারকম অভিজ্ঞতা হয়েছে দীর্ঘায়ু হবার দরুন—কিন্তু এ এক অভিনব পরিস্থিতি। শেষ বয়সে জেলে গিয়ে না লপসী খেতে হয়।'

পূর্ণিমার লেখা 'ঠাকুরবাড়ির রান্না' অবশ্য অনেকেই দেখেছেন। প্রজ্ঞাসুন্দরীর বইয়ের মতো বিশাল বই নয়, বিশেষভাবে বেছে নেওয়া ঠাকুরবাড়ির প্রিয় ব্যঞ্জনগুলিই এখানে স্থান পেয়েছে। ইন্দিরা ভাল রান্নার সমঝদার ছিলেন, যদিও নিজে কোনওদিন রান্নাঘরে ঢোকেননি। কিন্তু 'নেমন্তন্ন বাড়িতে কিংবা যে রান্নাই তাঁর ভাল লাগত, তখনই সেটি কী করে রাঁধা হয়েছে জেনে নিয়ে সুন্দর করে লিখে রাখতেন।' সেই খাতাটি তিনি দিয়েছিলেন পূর্ণিমাকে। অবশ্য পূর্ণিমার মা নলিনীও খুব ভাল রাঁধতেন। তাঁর কাছে পূর্ণিমা শিখেছিলেন অনেক রান্না—সে সব মিলিয়েই তাঁর বই। টোমাটো দিয়ে মাছ, পাঁঠার বাংলা, পোস্ত দিয়ে মাংস, বেগুনের চাটনি, ডিম ফুলকপি, বাঁধাকপি চাল দিয়ে প্রভৃতি রান্না নতুনত্বের জন্যে নিশ্চয় রসিকদের আকৃষ্ট করবে।

পূর্ণিমার আরও তিন জা ছিলেন প্রবীরেন্দ্রর স্ত্রী অণিমা, মিহিরেন্দ্রের স্ত্রী লীলা ও সুপ্রতেন্দ্রের স্ত্রী সতীরাণী। লীলা সংসারের কাজের ফাঁকে ফাঁকে যুক্ত হয়েছেন 'বিধবা শিল্পাশ্রমে'র সঙ্গে। সুগায়িকা হিসেবে সতীরানী যথেষ্ট পরিচিত। তাঁর লেখার হাতটিও ভাল। '...পুরনো কথা ভাবতে বসলে কত কিছুই তো মাথায় ভিড় করে আসে, গুছিয়ে বলা কঠিন। তার কিছু শোনা, কিছু চোখে দেখা। এখন সবই স্মৃতি। সে সময়ের চিহ্ন বলতে এখনও আমার কাছে দ্বারকানাথের ব্যবহার করা একটা ওয়াইন গ্লাস আছে। একটা চেয়ার ছিল রবীন্দ্রনাথের ব্যবহার করা। সেটা রবীন্দ্রভারতীকে দিয়ে দিয়েছি। 'বিসর্জনে'র একটা পাণ্ডুলিপি দিয়েছি বিশ্বভারতীকে। আর থেকে গিয়েছে রবীন্দ্রসংগীত। রবীন্দ্রসংগীতের মধ্যেই আমরা বড় হয়েছি—মুখে বুলি ফুটতেই আধো আধো গলায় আমার রবীন্দ্রসংগীতের শিক্ষা শুরু মার কাছে। আমার কাকিমা সুরূপাদেবীও আমাকে রবীন্দ্রনাথের অনেক গান শিখিয়েছিলেন। পরে সুযোগ পেয়েছি ইন্দিরাদেবীর কাছে গান শেখার। আজ এত বয়সেও সেই গানকে পাথেয় করেই চলেছি। জীবনের প্রতিটি ক্ষণে, প্রতিটি পরিস্থিতিতে ভেতর থেকে উঠে আসে তাঁর গান।' শান্তিনিকেতনে একবার 'চিরকুমার সভা'র অভিনয় হয়। নৃপবালার ভূমিকায় অভিনয় করেন

সতীরানী। সাহারানপুরে প্রবাসী বাঙালিদের নিয়ে করেছেন 'ঋতুরঙ্গ'। পূর্ণিমার মতো সতীরানীও ঠাকুরবাড়ির মেয়ে, আবার ঠাকুরবাড়ির বউ। তিনি ছিলেন ধীরবালার প্রপৌত্রী। তাঁর আর এক দিদি শিবরানীরও বিয়ে হয়েছিল পাঁচ নং বাড়িতে, সমরেন্দ্রনাথের এক পুত্রের সঙ্গে।

সুরেন্দ্রনাথের দুই মেয়ে মঞ্জুশ্রী ও জয়শ্রীর মধ্যে মঞ্জুশ্রী কবির সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন বেশি। তিনি শান্তিনিকেতনের প্রথম দুজন ছাত্রীর অন্যতম। অসামান্য সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন তিনি। বিশ্বভারতী সম্মেলনীর বিভিন্ন অধিবেশনে তাঁর যোগ দেবার খবর পাওয়া যায়। সেখানে কখনও তিনি বীণা বাজিয়েছেন, কখনও বা গান করেছেন। কবির সঙ্গে একবার বিদেশেও গিয়েছিলেন মঞ্জুশ্রী, লন্ডনে ক্লিফটন বোর্ডিং স্কুলে এক বছর থেকে ভারতে ফিরে আসেন। লন্ডনে ভাস্কর মিস বাওয়ার মঞ্জুশ্রীর একটি সুন্দর মূর্তি গড়েছিলেন। ১৯২৩ সালে 'বিসর্জন' নাটকের অভিনয় হয়। রবীন্দ্রনাথ সেজেছিলেন জয়সিংহ। এই নাটকে অপর্ণার জন্যে রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক নির্বাচন ছিল মঞ্জুশ্রী, পরে ঠিক করা হয় অপর্ণা হবেন রাণু অধিকারী। কবি তাঁকে লিখেছিলেন, '...তুমি না এলে মুশকিলে পড়তে হবে। মঞ্জুকে তৈরি করবার জন্য গগনকে বলেছিলুম সে হয়ে উঠল না।' রাণু এলেন যথাসময়ে কিন্তু প্রথম দিনের অভিনয় করতে পারেননি। মঞ্জুশ্রীই অপর্ণার ভূমিকায় সুন্দর অভিনয় করলেন। রবীন্দ্রনাথ বৃদ্ধ হয়েও অসামান্য দক্ষতায় রূপায়িত করলেন পূর্ণ যুবক জয়সিংহকে। গুণবতীর ভূমিকায় ছিলেন সংজ্ঞা। তাঁর অভিনয় খুব ভাল হলেও তিনি তিনদিনই অভিনয় করতে পারেননি। দুদিন অভিনয় করে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর ভূমিকায় অভিনয় করলেন মঞ্জুশ্রীই। পূর্ব প্রস্তুতি ছিল না, একই নাটকে এক দিনের ব্যবধানে ভিন্ন ধরনের দুটি চরিত্রকে দর্শকদের সামনে সার্থকভাবে উপস্থিত করাও অপেশাদার অভিনেত্রীর পক্ষে সহজ নয়। কিন্তু মঞ্জুশ্রী দুটি ভূমিকায় সাবলীল অভিনয় করে সকলকে মুগ্ধ করেন। দর্শকরাও ঘরের মানুষ ছিলেন না। ছিল না শান্তিনিকেতন বা জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির ঘরোয়া পরিবেশ। রীতিমতো টিকিট বিক্রি করে এম্পায়ার থিয়েটারে বিসর্জনের অভিনয় হয়েছিল। তবু কোনও অসুবিধেই মঞ্জুশ্রীর হয়নি। তাঁর অভিনয় প্রতিভার পরিচয় আবার পাওয়া গেল 'ভৈরবের বলি' নাটকের অভিনয়ে। রবীন্দ্রনাথ 'রাজা ও রাণী'কে নতুন রূপ দিলেন 'ভৈরবের বলি'তে। ১৯২৯ সালে দুদিন অভিনয় হয়। মঞ্জুশ্রী সুমিত্রার ভূমিকায় খুব ভাল অভিনয় করেন। এই ভূমিকাতেই অনবদ্য অভিনয় করেছিলেন মঞ্জুশ্রীর পিতামহী জ্ঞানদানন্দিনী। রাজার ভূমিকা গ্রহণ করেন তাঁর স্বামী ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ এ সময়ে বিদেশ গিয়েছিলেন বলে তাঁর দেখা হয়নি।

পরবর্তী জীবনে মঞ্জুশ্রী ভারতের রাজনৈতির আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। তাঁর স্বামী ক্ষিতীশপ্রসাদ ছিলেন কংগ্রেসের অন্যতম নেতা। অসহযোগ আন্দোলনের উদ্যোক্তা। কিন্তু মঞ্জুশ্রী প্রখর রাজনৈতিক চেতনা নিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেননি, দিয়েছিলেন সহানুভূতি ও সমবেদনার দুর্বার আবেগে। এই সমবেদনাই তাঁকে টেনে এনেছিল কম্যুনিস্ট পার্টিতে।

১৩৫০-এর ভয়াবহ মন্বন্তরের সময় মঞ্জুশ্রী রয়েছেন কৃষ্ণনগরে, দুর্ভিক্ষের আঁচে ঝলসে যাওয়া কলকাতার খবর তাঁর অজানা। হঠাৎ কী করে যেন হাতে এসে পড়ল একটা কম্যুনিস্টপন্থী পত্রিকা। আলতোভাবে চোখ বোলাতে গিয়ে শিউরে উঠলেন একটা প্রবন্ধ পড়ে। উঃ কী ভয়ঙ্কর। প্রবন্ধটি হল সোমনাথ লাহিড়ীর 'Queues of Death in Calcutta.' পড়ার পর দু চোখ জলে ভরে গেল। অনাহারে অনুশোচনায় বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে মনস্থির করে ফেললেন মঞ্জুশ্রী। এদের জন্যে কিছু করতেই হবে, পরদিনই কলকাতায় এসে স্বামীর সাহায্যে কিছু অর্থসংগ্রহ করে ফেললেন। আত্মীয়-স্বজনেরাও মঞ্জুশ্রীর ঝুলি ভরে দিলেন সাধ্যমতো। মঞ্জুশ্রী সংগৃহীত অর্থ নিয়ে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পরামর্শ মতো কিছু ওষুধপত্র কিনে নিয়ে ফিরে গেলেন কৃষ্ণনগরে।

মহামারী দূর করবার জন্য বাড়িতেই খুলে ফেললেন রিলিফ সেন্টার। এ সময় তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন স্থানীয় কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যরাও। তখনও পার্টির কোনও মহিলা-সমিতি গড়ে ওঠেনি। মঞ্জুশ্রীই কয়েকজনকে নিয়ে গড়ে তোলেন 'মহিলা আত্মরক্ষা-সমিতি'। এই সমিতিরই মুখপত্র ছিল 'ঘরে বাইরে'। সম্পাদিকাও মঞ্জুশ্রী নিজেই। সমিতির উদ্দেশ্য ছিল, যে সব মেয়েরা সমাজ সংসার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা পায়নি তাদের সংগত অধিকার দাবি করা। তিনি দেখেছিলেন সাধারণত এই ধরনের প্রতিষ্ঠাহীন মেয়েরাই বঞ্চিত হয় সবরকম অধিকার থেকে। তাই তাদের জন্যেই তিনি সংগ্রাম শুরু করেছিলেন:

'আত্মরক্ষা সমিতি সেই মেয়েদেরই প্রতিষ্ঠান,—যারা সমাজে, সংসারে, অর্থনীতি আর রাজনীতি ক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠা পায় না কোনওদিন, বঞ্চিত হয় সকল রকম অধিকার থেকেই। এই মেয়েদের সঙ্গত অধিকারের দাবি নিয়েই আত্মরক্ষা সমিতির আন্দোলন। যে সমাজ এবং শাসনব্যবস্থা নারীর শক্তিকে করে অপচয়, বঞ্চিত করে তাকে মানুষের অধিকার থেকে—সে ব্যবস্থাকে 'সুশাসক' বা সুবিচার বলে মেনে নেয়নি আত্মরক্ষা সমিতি, নেবেও না কোনওদিন। এই বঞ্চিত মানুষের কথাকেই 'ঘরে বাইরে' পৌঁছে দেবে ঘরে ঘরে।'

চার পাঁচ সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর 'ঘরে বাইরে' প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হয়। মঞ্জুশ্রী আর একটা পত্রিকা প্রকাশ করেন 'জয়া' নামে কিন্তু ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে কম্যুনিস্ট পার্টি ভারতে নিষিদ্ধ হলে বঙ্গীয় সরকার পত্রিকাটির প্রচার বন্ধ করে দেন। এই ঘটনার মাসখানেক আগেই মঞ্জুশ্রী 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। তাই সকলের সঙ্গে তিনিও কারারুদ্ধ হন। সঙ্গে ছিলেন মণিকুন্তলা সেন ও আরও অনেকে। মণিকুন্তলা লিখেছেন তাঁর কথা, 'মঞ্জুশ্রীদেবী অত্যন্ত চাপা ও শক্ত মনের মানুষ। ...অমায়িক, স্নেহশীলা ও নীরব কর্মী হিসাবেই মঞ্জুশ্রীকে আমরা এ পর্যন্ত জানতাম। জেলে দেখেছিলাম তাঁর নীরব তেজস্বিতা। ...আমাদের জেল ভিজিটর বোধহয় তাঁর স্বামীর কথা ভেবেই একদিন মঞ্জুশ্রীর কাছে প্রস্তাব করেছিলেন—'আপনি আর এর মধ্যে কেন? ইচ্ছে করলেই তো আপনি বাড়ি যেতে পারেন।' ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে উচ্চৈঃস্বরে শুধু 'না' বলেই উনি ঘর থেকে যেন ছিটকে বেরিয়ে এসেছিলেন। রাগে অপমানে মুখখানা থেকে যেন রক্ত ফেটে পড়ছিল। বেশি কথা উনি বলতেন না।' সমস্ত কম্যুনিস্ট কর্মীরা এ সময় অনশন আরম্ভ করেন। প্রথম পুরুষরা এবং পাঁচদিন পরে মহিলারা এই অনশনে যোগ দিয়েছিলেন। মঞ্জুশ্রীও অন্যান্যদের সঙ্গে একটানা অনশন করেছিলেন তিপ্পান্ন দিন। তাঁর বয়সের কথা বিবেচনা করে সকলেই তাঁকে বারণ করেন কিন্তু কোনও নিষেধই তাঁকে টলাতে পারেনি। প্রায় এক বছর কারাবাস করার পর ১৯৫১ সালে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হলে মঞ্জুশ্রী মুক্তি পান। ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসে চিন যাত্রা করেন 'The First Asian and Pacific Peace Conference'-এ যোগ দেবার জন্যে। এই দলে ছিলেন সয়ীফুদ্দীন কিচলু, ডাঃ জ্ঞানচাঁদ প্রমুখ ব্যক্তি। তাঁরাই মঞ্জুশ্রীকে নির্বাচন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের নাতনি হিসেবে। অবশ্য চিনে গিয়ে মঞ্জুশ্রী সেখানকার রাজনৈতিক বা সামাজিক জীবনের সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিচয়লাভের সুযোগ পাননি, এ ধরনের ভ্রমণে সে সুযোগ পাওয়াও যায় না। তবে নবজাগ্রত চিনের প্রতি সকলেরই তীব্র কৌতূহল ছিল। ১৯৩০-এ যেমন নতুন রাশিয়া মুগ্ধ করেছিল রবীন্দ্রনাথকে। মঞ্জুশ্রী মুগ্ধ হয়েছিলেন ক্যান্টন রেল স্টেশনের একটি সামান্য কুলিকে তন্ময় হয়ে লু সুনের গল্প পড়তে দেখে। একজন সাধারণ শ্রমিকের শিক্ষা, রুচি ও সাহিত্যবোধ তাঁর চোখে নতুন লেগেছিল, ভালও লেগেছিল। যা দেখেছিলেন তা নিয়েই পরে লিখেছিলেন একটি বই 'নয়াচীনে যা দেখেছি'। মঞ্জুশ্রীর লেখার হাতটি ভাল ছিল কিন্তু লিখতেন না। রাজনীতির সঙ্গেও তাঁর যোগ ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছিল। প্রথম দুটি নির্বাচনে তিনি মণিকুন্তলা সেন ও সোমনাথ লাহিড়ীর নির্বাচনী প্রচারের কাজ করেছিলেন। ই এম এস নাম্বুদিরিপাদ যখন কেরালার সমর্থনে কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'হ্যান্ডস অফ কেরালা'র

আয়োজন করেন সেই সভায় মঞ্জুশ্রী গেয়েছিলেন উদ্বোধনী সংগীত 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে'। কম্যুনিস্ট পার্টি বিভক্ত হবার পরে মঞ্জুশ্রী রাজনীতির সঙ্গে আর যোগ রাখেননি।

মঞ্জুশ্রীর ছোট বোন জয়শ্রী আত্মপ্রকাশে ইচ্ছুক নন। ছেলেবেলায় দিদির মতো এবং দিদির সঙ্গে লেখাপড়া শিখেছেন, কোনও কোনও অভিনয়ে যোগ দিয়েছেন যেমন, একবার 'বাল্মীকি প্রতিভা'য় সরস্বতী আর একবার 'ঋতুরঙ্গে' ঋতুরাজ এই আর কী। পিছন থেকে গান করেছিলেন সাহানা দেবী। জয়শ্রী নির্বাচন করেছিলেন কুলপ্রসাদ সেনকে। অসবর্ণ বিবাহ বলে পারিবারিক প্রথা অনুযায়ী আপত্তি উঠেছিল। ব্রাহ্মণে-অব্রাহ্মণে বিয়েতে মহর্ষির প্রবল আপত্তি ছিল। কুচবিহারের রাজকন্যার সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের বিয়ের প্রস্তাবও তিনি নাকচ করেছিলেন এই কারণে। কিন্তু সময় বদলাচ্ছে দ্রুতগতিতে। সুরেন্দ্র স্বয়ং বিয়েতে মত দিয়ে বললেন, 'আমরা সকলেই যখন উচ্চকণ্ঠে প্রচার করে আসছি যে দেশমাতা এক, আমরা সকলেই তাঁর সন্তান, তখন মেয়ে অন্য জাতে বিয়ে করবার ইচ্ছে প্রকাশ করলে কোন মুখে আপত্তি করব? আমাদের বাপ-দাদা তাঁদের পূর্বপুরুষের প্রচলিত পথের বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন, আমরা আবার বাপ-দাদার প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে যাচ্ছি সুতরাং তাঁদের অনুরূপ কাজই করছি।' এই বিবাহে পৌরোহিত্য করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। অসবর্ণ বিয়ে হলেও রেজিস্ট্রি করা হয়নি। আচার্যের কাজ করলেও কবি তখন এই বিয়ে উপলক্ষে কোনও কবিতা লেখেননি। এলাহাবাদে জয়শ্রী কবিকে অনুরোধ জানালেন একটি কবিতা লিখে দিতে। কবিও লিখলেন,

'তোমাদের বিয়ে হল ফাগুনের চৌঠা
অক্ষয় হয়ে থাক সিঁদুরের কৌঠা।
সাত চড়ে তবু যেন কথা মুখে না ফোটে,
নাসিকার ডগা ছেড়ে ঘোমটাও না ওঠে।
শাশুড়ি না বলে যেন, 'কী বেহায়া বৌটা...।'

হেমেন্দ্রনাথের আট মেয়ে ও তিন ছেলে—সকলেই সঙ্গীতানুরাগী, বিদ্যানুরাগী। এঁদের মধ্যে প্রতিভা সবার বড়। তাঁর পুত্র-কন্যারা সকলেই গান ভালবাসতেন। অবশ্য বড় ছেলে আর্যকুমার খুব ভালবাসতেন ছবি আঁকতে, ফোটো তুলতে। তাঁর স্ত্রী লীলা ছিলেন কবি। রমেন্দ্রমোহন ঠাকুর ও সুলাজিনীর একমাত্র মেয়ে। সুলাজিনী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী সুহাসিনীর দিদি, লীলা এলেন চৌধুরী বাড়িতে। আধুনিক শিক্ষা তাঁকে সংস্কৃত কাব্যপাঠে বিমুখ করেনি। ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহও ছিল। ভালবাসতেন কবিতা লিখতে। তাঁর কবিতা পড়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'লীলার কল্পনালীলা এবং রচনালীলা আমার ভাল লেগেছে।' আর্যকুমারের ফোটো সর্বত্র সমাদর পেয়েছিল। তাঁর অনেক ফোটোর মডেল হয়েছিলেন লীলা। এ নিয়ে রমেন্দ্রমোহনের পরিবারে ক্ষোভ ছিল। পরে আর্যকুমার ফোটোগ্রাফীচর্চার জন্যই বিদেশে চলে যান প্রায় কুড়ি বছর পরে ফিরে আসেন। লীলাও সম্ভবত বিদেশে গিয়েছিলেন কিন্তু এ ব্যাপারে স্পষ্ট করে কিছু বলা গেল না।

লীলার কবিতার বইয়ে প্রচুর ছবি ছাপা হয়েছিল লীলার, সবই আর্যকুমারের তোলা। অ্যালবামের আকারে কবিতার বই 'কিশলয়' প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতাগুলির বিশেষত্ব হল বিষাদ। ধনী পিতার আদরের দুলালী, অপরূপ রূপসী, অত্যন্ত গুণবতী, উপযুক্ত পরিবারের বধূ, রূপবান-গুণবান স্বামী, পুত্র-কন্যা—সবই ছিল লীলার, যদিও মেয়েটি অল্প বয়সে মারা যায়, তবু

তাঁর কবিতায় শুধুই বিষন্নতা পাঠককে বিস্মিত না করে পারে না। কালো চিন্তাশিক্ষা ভিত্তিভূমি নিয়ে তিনি কবিতা লিখেছেন,

'হে চির বিরহিণী   হে চির পূজারিণী
গীতরে উন্মাদনা এমন কার?
কাহার মধু বাণী   কাহার কেন বাণী
কাহার অনলে এত জোছনাচার।...
পতিতে তপস্য   তুমি যে চিন্ময়
পাওনি প্রতিভার আলোকে তাঁর
যেখানে সন্ন্যাসী   যে আশা বিলাসী
জীবনের দিন অবসর তাঁর।'

অন্য একটি কবিতায়,

'তোমার সুখের দিনে
উৎসব দিনেতে
ভুলে যদি যাও মোরে ক্ষতি নাহি তাতে
সঙ্গীহীন যবে তুমি
নিরাশ নির্জনে
পাশে পাবে আমায় এ নিশীথ রাতে।
বসন্ত কুসুম আসরে
আনন্দী নিরালে
যদি তোমার ক্ষতি নাই আমার এ পথে
দুঃখ আঁধার রাতে
শূন্য নিরালায়
মোর পাশে অনলের দীপ জ্বেলে যাবো।'

কিংবা,

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

প্রতিভার একমাত্র মেয়ে অশোকা, মায়ের সঙ্গীতানুরাগ সঞ্চারিত হয়েছিল মেয়ের মধ্যে, তিনি শুধু ভাল গান গাইতেন তা নয়, স্বরলিপি তৈরি করতেন। বহু রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি তিনিই প্রস্তুত করেছিলেন। বাড়িতে ছিল সাঙ্গীতিক পরিবেশ, বিচারপতি আশুতোষ চৌধুরীর বাড়ির পার্টিতে প্রায়ই গুণীজনের সমাবেশ। অশোকা সেখানেও কখনও গান শোনাতেন, কখনও পিয়ানো বাজাতেন। ১৯১১ সালে লেডি হার্ডিঞ্জের সংবর্ধনায় প্রতিভা যে পার্টির আয়োজন করেছিলেন সেখানে বাড়ির ছেলেমেয়েরা করেছিলেন 'বাল্মীকিপ্রতিভা'। অশোকা তাতে সরস্বতীর ভূমিকা গ্রহণ করেন। লক্ষ্মী হন তাঁর দিদি শোভনা। ১৯১২ সালে পঞ্চম জর্জ এসেছিলেন। সেই সময় তাঁর সম্মানে যে সভা হয়, অশোকা সেখানেও পিয়ানো বাজিয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরে তিনি যোগ দিয়েছিলেন 'সঙ্গীত সংঘে'। প্রতিভা ও ইন্দিরার সঙ্গে তিনিও হাত দিয়েছিলেন স্বরলিপি ও স্বরসঙ্গতি রচনার কাজে। 'আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা'য় ইন্দিরার সঙ্গে নিয়মিত উপস্থিত। স্বরলিপি করেছেন, 'বড় আশা নিয়ে', 'শান্ত হরে মম চিত নিরাকুল', 'খাঁচার পাখি ছিল', 'তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে' প্রভৃতি রবীন্দ্রসংগীতের। মার্গসঙ্গীতেও তাঁর দখল ছিল—ইমন রাগিণী, খাম্বাজ রাগিণী, মধুমাধবী সারঙ্গ রাগিণী প্রভৃতি রাগ রাগিণীর স্বরলিপি করেছেন। 'সঙ্গীত সংঘ' ভদ্র পরিবারের সামনে সংগীত শিক্ষার যে পথ খুলে দিয়েছিল, তাতে ক্রমশই ছাত্রীসংখ্যা বাড়তে থাকে। অশোকা তাঁদের গান শেখাতেন, পিয়ানো শেখাতেন। তবে মার্গসঙ্গীতেই তাঁর আকর্ষণ ছিল, বিদেশের ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক ছাড়া আর কিছু তাঁকে টানত না।

অশোকার পরবর্তী জীবন কাটে রাঁচিতে। সেখানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ ছাড়াও ঠাকুরবাড়ির অনেকে বাড়ি করেছিলেন, ওঁদের বাড়ির কাছেই ছিল চৌধুরী পরিবারের বাড়ি। বৃদ্ধদিনের সঙ্গী হিসেবে বলা যায় অশোকা সেখানেই কাটিয়েছিলেন অনেকগুলো বছর। তিনি যাননি, বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়ি খাঁচাই দিয়েছিলেন, বিয়ের আগে বাবার সঙ্গে বিলেতে। শারীরিক অসুস্থতাও ছিল কিছুটা প্রতিবন্ধক। রাঁচিতে তিনি বাকি জীবন এক রকম নয়। কাটিয়েছেন ঠাকুরবাড়ির গৃহিণীদের মতো। সকালে নীচে এসে বাপ জেঠাদের ভাঁড়ার দেখা, বাজার সরকারের কাজ বুঝিয়ে দেওয়া, সবার জন্য দুধের সর তুলে রাখা—একেবারে একই নিয়মে বাঁধা। সব ঠাকুরবাড়িতেই বাড়ির কর্ত্রী ঠাকুরদের কাজটি সুচারুভাবে মেয়েদের শেখানো হত। নির্দিষ্ট শিক্ষা তাতে কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটাত না। একই সঙ্গে কেউ ছবি আঁকতেন, কেউ গল্প লিখতেন, কেউ বা সেলাই করতেন। অশোকার হাতের কাজও সুন্দর ছিল, বিশেষ করে খুব ভাল রিপু করতে পারতেন তিনি। ধনী পরিবারের মেয়ে এবং বউ হয়েও অবহেলায় নষ্ট করতেন না পুরনো কিংবা ছিঁড়ে যাওয়া কাপড়ের টুকরো, তাঁর হাতের স্পর্শে তা শুধু নতুন হয়ে উঠত না, সাংসারিক দৃষ্টিকোণ থেকে হয়ে উঠত আরও কাজের। পুরনো পরিবেশ থেকে দূরে সরে আসায় তাঁর নিয়মিত সঙ্গীতচর্চাও বন্ধ হয়ে যায়। রাঁচিতে সে সময় ওয়েস্টার্ন ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক চর্চার সুযোগ ছিল না। অশোকা তাঁর অবসর সময় কাটাতেন বই পড়ে। কলকাতার ব্যস্ত জীবনের বদলে গৃহবধূর নিস্তরঙ্গ সাধারণ জীবন, তবু কোনওদিন বিরক্ত হননি, বিরক্তি প্রকাশ করেননি। ভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবার এই শিক্ষাও ঠাকুরবাড়ির একেবারে নিজস্ব ব্যাপার ছিল। মেয়েরা এই শিক্ষা নিয়ে যেতেন নতুন সংসারে, বধূরা ভিন্ন পরিবার থেকে এসে অভিন্ন হতেন, পরিবারের অন্য শাখা থেকে এসে যে অসুবিধা হত না। ব্যতিক্রম দু-একজন নিশ্চয় ছিলেন, আত্মবিলাসিনী ও ঐশ্বর্যবতী নিয়ে এই ছকবাঁধা গৃহিণীর জীবনে বিশ্বাসী ছিলেন না।

বিশেষ পরিবারের তিনটি গুণবতী মেয়ের সন্ধান পাওয়া যাবে। দুজন মেয়ে গায়িকা ও মেজ হয়ে এক বড় অভিনেত্রী। সবদিক থেকে বিচার করে ঠাকুরবাড়িতে এঁদের আসনও একেবারে

কয়েকজন কিন্তু সেই ধারাবার জন্যে বাড়িটি পরিবার মতে এগোতে হচ্ছে। বাড়িতের জগতে পরিবর্তন হচ্ছে আরও দ্রুতগতিতে। তার সঙ্গে তাল মেলাবার চেষ্টা আর ঠাকুরবাড়িতে কেউ, আমরাই বা পারব কেন? পরিবারের ধারা অনুযায়ী গায়কী গান শিখেছিলেন ঠিকই তবে খুব ভাল পিয়ানো বাজাতেন। তাঁকে পারিবারিক গণ্ডির বাইরে একেবারেই পাওয়া যায়নি। এ সময়ে যে কোনও শিক্ষাই ছিল মূলত আত্মিক বিকাশ ঘটানোর জন্য, সেইসঙ্গে বুদ্ধি বাধা হত, পারিবারিক সুনাম ও সমাজে পরিবারের শ্রীবৃদ্ধির কাজে যে শিক্ষা সাহায্য করবে কিনা তার ওপর। আধুনিক যুগে শিক্ষার এই ধারণা অনেক বদলে গিয়েছে, মেয়ের মধ্যে কোনও গুণের বিকাশ দেখলে তাকে তালিম দিয়ে যোগ্য করে পেশাদার করে তোলার চেষ্টা করা হয়, এক দিনের তা উচিতও। মেনকা নানারকম প্রতিবন্ধকতার মধ্যে আমাদের প্রতিভা বিকশিত হবার সুযোগ পায় না। ঠাকুরবাড়িতে এক সময়ে গুণী মেয়ের ভিড়। উপযুক্ত শিক্ষাও তাঁরা পেতেন কিন্তু বুদ্ধিভিত্তিক তারতম্য থাকায় তাঁদের অনেকেই যেটুকুর শিরোপা পাননি। বরং অন্য পরিবারের মেয়েরা এগিয়ে যেতে পেরেছিলেন।

মেনা খুব ভাল গান গাইতেন। সরল ঠাকুর লিখেছেন, '...তখন বড় অ্যাটেকিনা (যিনি আমার মায়ের বড় বোন) জীবিত ছিলেন। এ বাড়ির বউদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে সুন্দরী। সেরকম সুন্দরী ছিলেন তাঁর ছোট মেয়ে মেনা।' তাঁকে গান শেখাতেন গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। অত্যন্ত মধুর কণ্ঠের অধিকারিণী মেনার গান শুনতে ভালবাসতেন তাঁর পিসি সুনয়নী। তিনি মাঝে মাঝে ভাইঝিকে নিয়ে যেতেন নিজের কাছে। মেনার গানের খুব ভক্ত ছিলেন তিনি খালে। রবীন্দ্রনাথও ভালবাসতেন মেনার গান শুনতে। অতীন্দ্রনাথ প্রিয়ম্বদাদের বাবা ও কবি যখন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আসেন তখন তাঁদের সম্মানে কবি বাড়ির ছেলেমেয়েদের দিয়ে একটি নৃত্যনাট্যের আয়োজন করেছিলেন। 'মায়ার খেলা'র সেই নৃত্যাভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন মেনা। তাঁর সৌন্দর্যে উপস্থিত সকলেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। হাঁসখালি সুনয়নীই মেনার জন্যে সুপাত্রের সন্ধান নিয়ে এলেন। নিজেদের শিক্ষাপ্রাপ্ত এক কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ, অতএব সুদর্শন রাজনাথকে সকলের পছন্দ হল। সহোদরিণী মেনাকে সঙ্গে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে গেলেন সুনয়নী মেনার জন্যে। কে বলে আমার মেয়েদের একজন তো বলেই ফেললেন, 'বাবার কি ভাল জেলার এতই অভাব যে কাশ্মীর থেকে বর আমদানি করতে হয়।' রবীন্দ্রনাথ যে কথার উত্তর এড়িয়ে যেতে চাই ফেলেন, 'ও আমাদের মেয়েকে আর বাড়ির কি অত মান্য করবে।' মেনা তাঁর নাতনি, কবে বললেন, ঠাকুরবাড়ির হাসিকথা করে বলতেই পারেন, কাশ্মীরিদের মধ্যে তাঁকে ছাড়া আর বাড়ির মেনার মান্য করবে না।

রাজনাথের সঙ্গেই মেনার বিয়ে হল। স্বামীর সঙ্গে কলকাতা ছেড়ে চলে গেলেন লখনউ। রাজনাথ ছিলেন লেখাপড়ায় উচ্চশিক্ষিত, সেখানে নানা জায়গায় তাঁরা ঘুরেছেন। মাঝে মাঝে গানের তালিম নিতে এসেছেন বাড়ির কাছে। রবীন্দ্রনাথ আসেন তিনি গান শুনেছেন তাঁর কাছে। মেনার গান শুনে তৈরি হয় নতুন গান। যেমন মেনার মুখে 'আর কেন কেন বল' শুনে কবি সেইসব গান থেকে তৈরি হয় নতুন গান। মেনা সেই গানটি শেখেননি। সেটি শুনে তৈরি করলেন 'আর তাঁর হিন্দুস্তানির ধাঁচের সুর'। মেনা সেই গানটি শেখেছিলেন ঠিকই। তাঁর কণ্ঠটি ছিল মধুর, কাশ্মীরি। অবশ্য তাঁর কণ্ঠ উপযুক্ত 'সেই বর্ষণে'র ঘরিত্রজনের সময়। তাঁর কণ্ঠটি ছিল অনন্য মধুর, কাশ্মীর। আজকালকার উচ্চারণ ছিল না। মেনার কোনও সন্তান ছিল না। ছিল না বলে তাঁর গানের সঙ্গেও সকলের পরিচয় ঘটল না। মেনার ঠাকুরবাড়ির ছেলেমেয়েদের এর একটি সুন্দর প্রকাশ ছিল সমাজসেবার দিকে। ঠাকুরবাড়ির ছেলেমেয়েদের এর একটি সুন্দর ব্যবস্থা। মেনা নিজেও বহু কাজ করেছেন। নিজের সময়েই কোনও না কোনও সময়ে কিছু না কিছু সেবামূলক কাজ করেছেন। তিনি সময় দিয়েছেন মেয়েদের মধ্যে এই ব্যবস্থা অনেক বেশি। তিনি যখন কলকাতায় থাকতেন তখন তাঁর কাছে বহু মেয়েদের হয়ে কোনও কোনও রাজনৈতিক দল তাঁদের প্রতিনিধি হয়ে মেনাকে নির্বাচনে দাঁড়াতে অনুরোধ করেন। কিন্তু আত্মপ্রচারবিমুখ মেনা রাজি হননি। তাঁর কাজ ছিল নিজের আড়ালে থেকে, মেয়েদের উন্নয়নে। তিনি বরাবরের আদর্শে যুক্ত একনিষ্ঠভাবে কাজে এসে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন।

প্রতিবারই গাইতেন। একবার মহোৎসবে গাইলেন, 'কী ধ্বনি বাজে।' এর একটা ইতিহাস আছে। অমিয়া বলেছেন, 'শেষ বয়স পর্যন্ত রবিদাদার প্রধান আগ্রহ ছিল হিন্দি গান শোনার। 'ডোলে ডোলে বাওরে' ভৈরবী সুরের গান শুনতে খুব ভালবাসতেন অথচ সেই গানটা ভেঙে কবি বাংলা গান লিখেছেন বলে জানি না।' আবার একদিন কবি অমিয়ার কাছে একটা হিন্দি গান শুনতে চাইলে তিনি গাইলেন গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে শেখা পূরবীতে 'এ ধনি ধনি চরণ পরসত'। কবি গানটি শুনে কিছুক্ষণের মধ্যে একটা বাংলা গান তৈরি করে ফেললেন, 'সেই অসাধারণ গানটি হল 'কী ধ্বনি বাজে গহন চেতনা মাঝে'। অমিয়ার স্মৃতিকথার নামও সেজন্য 'কী ধ্বনি বাজে'—'আমার গলায় শুনে একটি হিন্দি গান ভেঙে বাংলা গান তৈরি আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় স্মৃতি।'

রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন অমিয়ারা শান্তিনিকেতনে গিয়ে বাস করেন, একবার দিনকতক থেকে এলেও অমিয়ার শাশুড়ি জোড়াসাঁকোয় থাকতেই চেয়েছেন, তাই অমিয়ারও যাওয়া হয়নি। তবে মাঝে মাঝে অনেক গাইতেন। কেউ শিখতে এলে যত্ন করে শিখিয়ে দিয়েছেন। স্বরলিপি দেখে নয়, অমিয়া গান শিখতেন শুনে। কটকে তাঁদের জমিদারি ছিল। সেখানেও 'বর্ষামঙ্গল' বা এই জাতীয় আরও কয়েকটা অনুষ্ঠানে তিনি মেয়েদের গান শিখিয়েছিলেন। একটি রেকর্ড করেছিলেন। শৈলজারঞ্জন মজুমদার খুব যত্ন করে শিখিয়েছিলেন গানদুটি—'হে নূতন' ও 'সমুখে শান্তির পারাবার'। নিয়মিত রেকর্ড করা হয়নি পারিবারিক কারণে। 'এই রেকর্ড যেখানে সেখানে বাজবে সবাই শুনবে এটা তাঁরা ঠিক পছন্দ করতেন না।' অমিয়া সন্ধ্যা সেনকে বলেছিলেন, 'আমার শাশুড়ি কিন্তু খুব লিবারেল ছিলেন। উনি বলতেন, তোমার পিসিমারা স্টেজে অভিনয় করেছেন—তাতে কেউ আপত্তি করেনি। আর ও কোথাকার বউ হয়ে এসেছে বলে রেকর্ড রেডিওতে গাইতে পারে না? এটা কিন্তু খুব অন্যায়।' আড়ালে থাকলেও পরে অমিয়া অডিশন বোর্ডের মেম্বার হয়েছিলেন, আকাশবাণীর সংগীত প্রতিযোগিতার বিচারকও ছিলেন। ছেলেমেয়েদের মানুষ করা, জমিদারি কাজে উড়িষ্যায় যাওয়া প্রভৃতি কাজে তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হয় কয়েক বছর। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছুই বদলাচ্ছিল। কবির সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল সেই সাংগীতিক পরিবেশ। জোড়াসাঁকোর বাড়িও ছাড়তে হল এক সময়। অবশ্য হারিয়ে গেল না অমিয়ার গান। ভাইয়ের মেয়ে কৃষ্ণা রিবু থাকতেন প্যারিসে। তিনি একবার এসে অমিয়ার গান টেপ করে নিয়ে গেলেন প্যারিসে। বললেন, 'নিয়ে যাব। ওখানে শোনাব।' অমিয়ার মনে ছিল সংকোচ, খালি গলায় গাওয়া, তার ওপর বয়স হয়েছে। কী জানি ওদের কেমন লাগবে। কৃষ্ণা শুনলেন না। তারপর ফ্রান্স থেকে এল প্রশংসামুখর চিঠি। ভাষা বোঝে না তবু অমিয়ার সুরেলা কণ্ঠ সাড়া দিল বিদেশি মনকে। এরপর এলেন সত্যজিৎ রায়, তাঁর 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ছবির জন্য একটা গান চাই। খালি গলায় গাইতে হবে। দার্জিলিঙের ম্যালে বসে আপন মনে গানটি গাইবেন করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়। আবার রেকর্ডিং? অমিয়ার অত্যন্ত অপছন্দের কাজ। 'একবার বলে এটা হয়নি, আবার বলে ওটা হয়নি।' তাঁর মামাতুতো বোনেরা নামীদামি অভিনেত্রী—লীলা দেশাই ও মণিকা দেশাই। তাঁরা কতবার বলেছিলেন অমিয়াকে, 'তুমি যদি ফিল্মে গান কর অনেক নাম হবে। অনেক টাকা হবে।' কোনদিনই কান দেননি অমিয়া। শেষকালে অবশ্য গাইতেই হল অমিয়াকে। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র জন্যে 'এ পরবাসে রবে কে' গানের রেকর্ডিং হবার পর দেখা গেল, সে গানও শ্রোতার মন ছুঁয়ে গেছে। একবার এল পি রেকর্ডে 'পঞ্চকন্যা'র গান ধরে রাখা হল, তাতে অমিয়া গেয়েছেন 'বড়ো বিস্ময় লাগে' ও 'শুধু মনে রেখো'। শেষ বয়সেও তাঁর গাওয়া গানে সাবেকি সুরের খোলা গলায় তান-লয়-মীড়ের সূক্ষ্ম কারুকাজ শোনায়। অমিয়া অবশ্য বিশ্বাস করতেন না, বলতেন 'আজ যারা আমার গান শুনতে চায়, তারা শুনতে চায় সে যুগের গায়কী বৈশিষ্ট্য, কবির নিজের শেখানো গান। নইলে এখন কি আর আমার গানে সেই মাধুর্য খোঁজার প্রয়োজন খুঁজে পাওয়া যায়।' এ প্রসঙ্গে একজন সাক্ষীর উল্লেখ করা যেতে

পারে। দেবব্রত বিশ্বাস তাঁর 'ব্রাত্যজনের রুদ্ধসঙ্গীত'-এ লিখেছিলেন, 'অমিয়া ঠাকুর বোধহয় তাঁর ৭০ বছর পার করে ফেলেছেন। তিনি এখনও গান করেন। এখনও তাঁর গলায় যা স্বাভাবিক কাজ বেরোয় তা স্বরলিপি করা তো দূরের কথা, বর্তমান কালের আর্টিস্টরা কেউ তা নিজের গলায় গেয়ে দেখাতে পারবেন না।'

ক্ষিতীন্দ্র পরিবারেও ইতিমধ্যে এসে গিয়েছেন তিনজন গুণবতী, দিনেন্দ্র পরিবারের মতোই দুজন মেয়ে এবং একজন বধূ। একই সময়ে বদলে গেল। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে থাকলেও এখন সব পরিবারই আলাদা, একান্নবর্তী নয়। ক্ষিতীন্দ্রনাথের দুই মেয়ে গার্গী ও বাণীর মধ্যে গান ছিল সহজ স্রোতের মতো। গান শিখতেন দু বোনেই। গার্গী যে কোনও গান শুনলেই সেটি অবলীলায় তুলে নিতে পারতেন নিজের কণ্ঠে। ঘর-সংসারের বাইরে তিনি বড় একটা কিছু করতে পারেননি ঠিকই কিন্তু যখন যেখানে গিয়েছেন সেখানকার পরিবেশে মিশে গিয়েছেন সুর ও ছন্দ। কাজের ফাঁকে ফাঁকে লিখতে ভালবাসতেন। হাতে লেখা পত্রিকা 'কিশলয়ে' লিখেছেন কিছু কিছু। সে সব পত্রিকা এখন আর কোথাও পাওয়া যায় না।

বাণী স্বতন্ত্র প্রতিভার অধিকারিণী। গান তো জানতেনই। পিয়ানো বাজাতেন খুব ভাল। প্রচুর চিন্তা করেছেন সংগীত নিয়ে, ডক্টরেট হয়েছেন গান নিয়ে কাজ করে। ডক্টর বাণী চ্যাটার্জী নামে তিনি স্বদেশে যত পরিচিত, বিদেশেও তাই। বিদেশিদের কাছে রবীন্দ্রসংগীত উপভোগে প্রধান বাধা ভাষা। তাই বাণী হাত দিলেন রবীন্দ্রসংগীত অনুবাদের কাজে। কবির সুর ও ছন্দকে বজায় রেখে তিনি যে গানগুলির অনুবাদ করেছেন সেগুলি বিদেশে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বাণীর কম্পোজ করা 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে'র অনুবাদ 'In the realms of joy and good' যিনি শুনেছেন তিনিই এর গুরুত্ব বুঝতে পারবেন। কবি নিজেও চেয়েছিলেন বাণীর কম্পোজ করা গান শুনতে। বাণীর কম্পোজ করা 'জয় ভারতের জয়' গানের প্রশংসা শুনে কবির ইচ্ছে ছিল তাঁর 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে' গানটিকেও ওয়েস্টার্ন হারমনিতে পরিণত করবার জন্য বাণীকেই অনুরোধ জানাবার। সে আর হয়ে ওঠেনি। এখন তো সেই 'জনগণমনে'র একটা স্তবক জাতীয় সংগীত হয়েছে। অথচ বাণীর বেশ মনে ছিল, অসহযোগ আন্দোলন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনের সময় সংক্ষেপ করার জন্যে 'জনগণমনে'র কিছু অংশ বাদ দিয়ে গাওয়ার অনুমতি চাওয়া হলে কবি সম্মত হননি। তাই গোটা গানটিই গাওয়া হয়। ওই গানের দলে ছিলেন বাণী।

বাণীর সংগীতের জ্ঞান সহজাত। তাই সুরসৃষ্টি করা ছাড়াও বাণী মন দিয়েছিলেন একটা নতুন কাজে। তিনি সংগীতশাস্ত্র ও সংগীতবিজ্ঞান নিয়ে ভাবতে শুরু করলেন। পাশ্চাত্য সংগীতের সঙ্গে পরিচয় তো ছিলই, স্বামী ডঃ শচীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিদেশে গিয়ে সে পরিচয় আরও পাকা করে এলেন। এরপর তিনি কতকটা আপন মনেই মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সংগীতকে বিচার করতে বসেন। বিষয়টি একেবারেই নতুন। পরে তাঁর আলোচনা সমাদর লাভ করে ও তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে বেশ কয়েকটা বক্তৃতা দেবার জন্যে আমন্ত্রিত হন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, তাঁর বিষয়টা কী ছিল। কোনও একটা বিষয় নয় অবশ্য। বাণী সংগীতকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করবার চেষ্টা করেছেন। ভারতীয় এবং ইউরোপীয় উভয় সংগীতের প্রভাবে মনস্তাত্ত্বিক কিংবা অন্য কোনও পরিবর্তন ঘটলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সঠিকই ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টাও করেছেন তিনি। আমরা সব সময় শুনে থাকি কি সম্ভব? বাণীর প্রশ্ন এটাই। গানে পাষাণ গলে, বনের পশু বশ হয়। গানের মতো শক্তিশালী প্রভাবশালী জিনিস আর নেই। প্রশ্ন, সত্যি সত্যি এই পরিবর্তন মানুষের মন? সে তো না বদলালে পাথরকেও হার মানায়। তার বিচার বিশ্লেষণ করা যায় কি না। না গেলে সম্ভব কি না? তা যদি হয়, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে তার বিচার বিশ্লেষণ করা যায় কি না।

ভারতীয় সংগীতজ্ঞরা এক একটা রাগ ও রাগিণীর মানবায়িত রূপ দিলেন কী করে? কী করে বললেন 'দীপক' রাগে আগুন জ্বলে, 'মেঘ' রাগ বৃষ্টি নামায়। বাণীর মতে, গানের শব্দে হাওয়াতে যে কম্পন সৃষ্টি করে তারই সাহায্যে নানারকম পরিবর্তন সম্ভব হয়। ভারতের সংগীতশিল্পীরা এর সন্ধান রাখতেন এবং এর সাহায্যে গড়ে উঠেছিল রাগ দর্শন:

'This encourages us to look forward confidently for the time when the truths underlying the science of Raga-Music should be further unearthed and extricated by scientists from the heap of accoumulated debris of ignorance and colourful interpolations perhaps, the hieroglyphics of the Raga-Music deciphered and the sublime philosophy of the Raga-Music, in all its purity, to its pristine glory restored.'

বাণীর মতে প্রাচ্য বিজ্ঞানের একটা বিরাট সম্ভাবনাময় দিক লুকিয়ে আছে ভারতীয় সংগীতের রাগরাগিণীর মধ্যে। রাগসংগীতের চর্চা এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে হয়তো সেই সম্ভাবনার স্বর্ণদুয়ার খুলে যেতেও পারে, এ নিয়ে বিতর্ক নিশ্চয় আছে। তবু পরীক্ষা-নিরীক্ষার শেষ নেই। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের জার্নালে বাণীর কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধের কিছু অংশ ছাপা হয়। অবশ্য তার আগেই তিনি ইউরোপ সফর করবার সময় এসব বিষয়ের ওপর বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তৃতার প্রধান বিষয় ছিল, 'সাইকোলজি অ্যান্ড মিউজিক' (১৯৩৪), 'সাইকো-মিউজিক ইন ওয়ার অ্যান্ড আফটার' (১৯৪৪) ও 'মিউজিক ইন বেসিক এডুকেশন সাইকোলজি' (১৯৪৯)। পাশের সালগুলো পুস্তিকা প্রকাশের সময়, বক্তৃতাও দিয়েছিলেন এ সময়েই বা একটু আগে।

এখানকার এশিয়াটিক সোসাইটিতে আরও কয়েকটা বক্তৃতার হদিস মেলে, 'ডাইভারসনাল থেরাপি অ্যান্ড মিউজিক', 'টেগোর অ্যান্ড মিউজিক', 'অ্যাপলায়েড মিউজিক', 'কালচারাল কনট্যাক্ট অ্যান্ড মিউজিক', 'দি ভেদিক সঙ্‌স অ্যান্ড দি টেগোর', 'ওয়েস্টার্ন মিউজিক অ্যান্ড রাগরাগিণীজ', 'দি ওয়েস্ট অ্যান্ড দি ইস্ট ইন মিউজিক দে মীট', 'ইন্ডিয়ান মিউজিক অ্যান্ড সিমলটেইনিয়াস হারমনি' ও 'কমপ্যারেটিভ স্টাডিজ অফ মিউজিক'।

শেষোক্ত বিষয় নিয়ে বাণী গবেষণা করছিলেন। তিনি পাশ্চাত্য সংগীতে ভারতীয় রাগরাগিণীর প্রভাব খুঁজছিলেন। মানুষের মধ্যে, মানব প্রবৃত্তির মধ্যে যদি সাদৃশ্য থাকে তবে গানে কেন থাকবে না? ভাষাহীন সুরেই তো দুটি ধারার সাদৃশ্য থাকার কথা। তিনি দেখেছিলেন ভারতীয় সংগীতের মধ্যেও আছে 'Harmony' যা একান্ত ভাবে বিদেশি বলেই পরিচিত। শেষ জীবনে বাণী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংগীতের তুলনামূলক ইতিহাস লিখছিলেন কিন্তু সে আর শেষ হয়ে উঠল না।

রবীন্দ্রসংগীতের অনুবাদের কাজে বাণী দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের বহু গান তিনি অনুবাদ করেছেন সুরের সঙ্গে, ছন্দের সঙ্গে, ভাবের সঙ্গে কথা মিলিয়ে। তাঁর অনুবাদ করা গানই বিদেশিদের আকৃষ্ট করে সবচেয়ে বেশি। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এশীয়-ভাষাবিভাগের অধ্যাপক এডোয়ার্ড ডিমক বাণীর অনুবাদ করা গান শুনে উচ্ছ্বসিত হয়ে একটা অভিনন্দন পত্র পাঠিয়েছিলেন। সেই চিঠিটি পড়লে বোঝা যায় বাণীর কাজের গুরুত্ব কতখানি। তিনি জানিয়েছেন, সমস্ত পৃথিবীর মানুষই এতে উপকৃত হবেন, কারণ রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গান সম্বন্ধে তাঁদের কোনও স্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠতে পারেনি। একটু বড় হয়ে গেলেও ডিমকের পত্রাংশ অনুসরণ করা যাক:

'This is just a note to express appreciation for the work you are doing in translating Rabindranath's song into English. In the first place, anything at all that is done to make the work of that genius more known to the non-Bengali speaking people of the world is that much to the good. Your work, however, goes one step farther. The

world seems to have some idea, however, vague, of Rabindranath's greatness as a poet, and perhaps somewhat less, of his greatness as a lyricist and musician, even though the towers, as high in these fields as in the others.

This gap you will be helping to fill by giving the English-speaking world the opportunity to hear Rabindranath's words in translation, sung in his original music. It seems to me a unique and wonderful thing. I am looking forward very much to the publication of your book, but even more to the first performance of the music. For, as you have shown, songs are meant to be sung and heard and not read. I am grateful to you for your, and when your work becomes known, I will not be alone.'

মেনকা অবন ঠাকুরের নাতনি, উমারানীর একমাত্র মেয়ে। যদিও উমারানীর কথা এখনও বলা হয়নি, ক্রমানুসারে তাঁর কথা আসবে। মেনকার বাবা নির্মলচন্দ্রও ছিলেন সঙ্গীতরসিক। ফলে মেয়ে ছোটবেলা থেকেই গানের তালিম নিতে শুরু করেন। এখনকার দিনে এমন উদাত্ত কণ্ঠ বড় বেশি পাওয়া যায় না। গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও উস্তাদ বচ্চন মিশ্রের কাছে গান শেখার পরে বেনারসে একদিন মেনকার গান শোনেন দিনেন্দ্রনাথ। শুনে মুগ্ধ হয়ে মেনকার বাবাকে বলেন, 'ওকে আমার কাছে দাও—দেখবে এ রত্নকে পালিশ করে কেমন ঝকঝকে করে তুলি।' তুলেওছিলেন। শেখাবার মতো গলা পেয়ে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিলেন নিজের সমস্ত ঐশ্বর্য। মেনকাও শিখেছিলেন প্রাণভরে। গান শুনে কবিও খুশি হয়েছিলেন। উৎসাহ দিয়ে বলতেন, 'মস্ত বড় হবি। নিজেকে তৈরি কর।' কবির দেবদুর্লভ রূপ, গান, কবিতা সব মিলে আকর্ষণ করত মেনকাকে। মনে মনে তিনি প্রার্থনা জানাতেন, 'ওঁর আওতার বাইরে কোথাও না যেতে হয়।' তাই হল, ১১ই মাঘের উৎসবে মেনকার গান শুনে মুগ্ধ হলেন ক্ষেমেন্দ্র। তাঁর ইচ্ছেয় ঠাকুরবাড়ির বউ হয়ে ৬ নং বাড়িতে এলেন। গান শেখা বন্ধ হল না। গলা তৈরি হবার পর রেকর্ড বেরোল 'এসো এসো আমার ঘরে' আর 'শেষ বেলাকার শেষের গানে'। দিনেন্দ্রনাথ সঙ্গে বাজালেন এস্রাজ। আর একটা রেকর্ডও হল 'তোমার বীণা আমার মনোমাঝে' ও 'তোমার সুরের ধারা'—কিন্তু আর নয়। শাশুড়ি সুহাসিনী খুব উদার ও প্রগতিসম্পন্না হলেও পারিবারিক ধারার বিরুদ্ধতা করতে পারেননি। পরে 'পঞ্চকন্যা'র লংপ্লেয়িং রেকর্ডে মেনকা আবার গেয়েছিলেন সেই পুরনো গানটি 'এসো এসো আমার ঘরে'।

রবীন্দ্রনাথের কাছে গান শিখতে না পাওয়ার দুঃখ ঘুচিয়েছিলেন দিনেন্দ্রনাথ। তাই তো দিনেন্দ্রের অভাবটা বড় বেশি লাগে মেনকার মনে। তাঁর নাম যেন লোকে ভুলেই গেল। অথচ কবির সকল গানের ভাণ্ডারী ছিলেন তিনি, কাণ্ডারীও। তাঁকে নিয়ে কেন কিছু হয় না? নিজের গানের স্কুলের নাম 'দিনেন্দ্র শিক্ষায়তন' দিয়ে তিনিই সেই ক্ষোভ খানিকটা মেটাতে চেয়েছেন। মেনকার গানের স্কুল করাও বেশ মজার ঘটনা। জোড়াসাঁকোয় তাঁরা যেদিকটায় থাকতেন সেখানেই ঠাকুরবাড়ির শেষ সীমানা। ওপাশের বাড়ির একটি মেয়ে সকাল-সন্ধ্যা বেসুরো গলায় রবীন্দ্রসংগীত সাধে। বিরক্ত হয়ে উঠলেন ক্ষেমেন্দ্র। দিনের পর দিন এ নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে স্ত্রীকে অনুরোধ করলেন মেয়েটিকে গান শেখাতে। অর্থাৎ নিজেদের কানের দুঃখমোচনের জন্যেই মেনকাকে গানের ক্লাস খুলতে হল।

তারপর দিনে দিনে বড় হয়েছে তাঁর প্রতিষ্ঠান। তিনিও যুক্ত হয়েছেন 'বৈতানিক' ও 'পারাপি' গানের স্কুলের সঙ্গে। ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ দেখে রবীন্দ্রসংগীত ছাড়াও ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য গীতিকারের গান শেখাতে শুরু করলেন। সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ, সৌম্যেন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী, ইন্দিরা, প্রতিভা—আরও অনেকেই তো গান লিখেছেন। চর্চা না

রাখলে হারিয়ে যাবে যে। জীবনে অনেক সম্মান পেয়েছেন মেনকা।

'কিছু-না-কিছু না করেও মেনকা কিন্তু আরেকটা কাজ করেছেন। সেটা হল ওড়িশায় তাঁর 'টেগোর ভবনে' বহু ছাত্র-ছাত্রীকে রবীন্দ্রসংগীত শেখাবার চেষ্টা। কটক-ভুবনেশ্বরে ঠাকুরবাড়ির সম্পত্তি ছিল। সেখানে কিছুদিন থাকার সময় তাঁর আগ্রহে ও উৎসাহে বেশ কিছু ওড়িয়া ও প্রবাসী বাঙালি ছেলেমেয়ে এসেছিল গান শিখতে। দশ বছরে প্রায় চল্লিশজনকে রবীন্দ্রসংগীত শিখিয়েছিলেন মেনকা। তারপর তারা আবার কতজনকে শিখিয়েছেন তিনি তা জানেন না, তবে রবীন্দ্রসংগীত শেখার আগ্রহ ওড়িয়াদের মধ্যে খুব বেশি। এ কথা ভেবে শেষ বয়সে তৃপ্তি পেতেন মেনকা। কলকাতায় অনেককে তিনি শিখিয়েছিলেন দিনেন্দ্রনাথের গান। ঠাকুরবাড়ির আরও অনেকেই তো গান লিখতেন, সুর দিতেন। রবীন্দ্রসংগীতের আড়ালে তারা হারিয়ে যাক, তা তিনি চাননি। পরে 'ইন্দিরা সংগীত শিক্ষায়তন' এ কাজের ভার নিয়েছে।

ঋতেন্দ্র পরিবারে কোনও মেয়ে নেই কিন্তু কয়েকটি বধূ এসেছিলেন। সুভো ঠাকুরের স্ত্রী নির্মলা ও তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে আরতি, সিদ্ধিন্দ্রনাথের স্ত্রী পারুল ও বাসব ঠাকুরের স্ত্রী স্মৃতি। সুভো ঠাকুর ছিলেন মজার মানুষ। জীবনটাকে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে পারতেন। গল্প বলতেন সুন্দর ভঙ্গিতে। সংসার চালাবার জন্যে কোনও নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলতেন না। হাতে টাকা এলে রাজার মতো বিলাসী, হাতে টাকা না থাকলে অদ্ভুত উদাসীন, সব মিলে দারুণ অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাতে হত আরতিকে। একটি পরিচয় পাওয়া যায় সুরভি ভট্টাচার্যের স্মৃতিকথায়। সেবার সুভো বম্বে গিয়েছেন, ভারতীয় শিল্পসম্ভার নিয়ে মিশরে যাবেন, তার প্রস্তুতি চলছে। একটা প্রদর্শনী করে এবং বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে সুরভির সাহায্যে কিছু টাকা তোলা হল। হঠাৎ সুরভির স্বামী এসে সুরভির কাছে তিনশো টাকা চাইলেন। সুরভি বললেন, 'মাসের শেষে আমি কোথায় পাব তিনশো টাকা?' কোনও কথা না বলে সুদেব আলমারি খুলে একজিবিশনের টাকা থেকে তিনশো টাকা বার করে নিয়ে একটি পোস্টকার্ড সুভোর হাতে দিয়ে আপিসে চলে গেলেন। বাধা দিয়ে সুরভি বললেন, 'এ কী করছ—কী করে আমি হিসেব মেলাব?' উত্তরে সুদেব বললেন, 'তোমরা খুড়ো-ভাইঝি দুজনেই জেলে চলে যাও।' সুভো অবশ্য কোনও প্রশ্নও করেননি, কোনও উত্তরও দেননি। সুরভি দেখেছিলেন, চিঠি লিখেছিলেন আরতি, তিনি টাকাও চেয়ে পাঠিয়েছিলেন।

সেদিন বিকেলে হয়তো সামান্য অনুশোচনা নিয়ে একটু আগেই ফিরলেন সুদেব। বয়সে ছোট শ্বশুরকে তিনি নাম ধরেই ডাকতেন। বললেন, 'আচ্ছা সুভো, আমরা একটা বিয়ে করেই হিমসিম খাচ্ছি। তুমি কী সাহসে দু'বার-দু'বার বিয়ে করলে?' স্মিতহাস্যে সব অভিযোগ মেনে নিয়ে সুভো বললেন, 'সাহেব, আরতির বাবা একজন সাহিত্যিক—একটি অসমিয়া পত্রিকা 'আবাহনে'র সম্পাদক। আমি তাঁরই বন্ধু ছিলুম। তাঁরই কন্যা আরতি যে আমার প্রেমে পড়ে ছাদ থেকে লাফাতে যাবে তা আমি কী করে জানব? অগত্যা বিবাহ।' গল্পটি সত্য না সুরসিক সুভোর রঙ চড়ানো সে কথা জানা নেই। অবশ্য আরতির মেয়ে চিত্রলেখা তাঁর কঠোর পরিশ্রমের কথায় বলেন, মায়ের নিশ্চয় কষ্ট হত কিন্তু তিনি সব সময় আমাদের বলতেন, 'এই রকম কর্মময় জীবনই তো আমি চেয়েছিলাম।'

আরতি নিজেও লিখতেন অসমিয়া ও বাংলা উভয় ভাষায়। 'সুন্দরম' পত্রিকায় ইতস্তত কিছু লেখা ছাড়াও রয়েছে 'ছায়ারঙ্গ', স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে লেখা আধুনিক উপন্যাস, তাতে তাঁর নিজের কথাও কিছুটা আছে। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার 'আমার জীবনস্মৃতি' ও লক্ষ্মীনন্দন বরার 'গাঙচিলের ডানা' অসমিয়া থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন আরতি। অত্যন্ত সুখপাঠ্য সাবলীল অনুবাদ, পড়বার সময় একবারও মনে হয় না মূল বইটি বাংলায় লেখা হয়নি। আরতি দীর্ঘজীবন

লাভ করলে আরও হয়তো কিছু উৎকৃষ্ট অসমিয়া সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটত। আরতি টাইমস অফ ইন্ডিয়ায়, লিংকে নিয়মিত শিল্পসংস্কৃতি ও চলচ্চিত্র বিষয়ক ফিচার লিখতেন। যুক্ত ছিলেন বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে। গান গাইতেন, তাছাড়া বেতার জগতের অসমিয়া সংস্করণ 'আকাশি'র সম্পাদক ছিলেন। ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের সদস্যাও হয়েছিলেন।

সিদ্ধিন্দ্রনাথের স্ত্রী পারুল প্রথম যুগের চিত্র পরিচালক ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বা ডি জি-র মেয়ে। পারুলের মা প্রেমিকাদেবীর সঙ্গেও পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ির যোগ ছিল। তাঁর বাবা ছিলেন ওই বাড়ির দৌহিত্র। ধীরেন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন ভদ্র পরিবারের মেয়েরা যদি অভিনেত্রী হিসেবে চিত্রজগতে আসেন তাহলে চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নতি সম্ভব। কিন্তু সে সময় ভদ্র পরিবারের মেয়ে চলচ্চিত্রে অভিনয় করবেন এ কথা কেউ ভাবতেই পারত না। এক বন্ধু তাই ডি জি-কে ঠাট্টা করে বলেছিলেন যে, তাঁর ঘরেই যোগ্য অভিনেত্রী আছেন। তাঁদের কথা না ভেবে অপরকে বললে কী হবে? কথাটি ডি জি-র পছন্দ হয়। সত্যিই তো প্রেমিকাদেবী রূপে গুণে অতুলনীয়া, তাঁকেই নায়িকা করে ছবি করা যেতে পারে। ধীরেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের স্নেহচ্ছায়ায় লেখাপড়া শিখেছিলেন। তাঁর মেজদাদা নগেন্দ্রনাথ ছিলেন কবির ছোট মেয়ে মীরার স্বামী। মীরা ও নগেন্দ্রনাথের সম্পর্কের অবনতি হলেও ধীরেন্দ্রনাথ তাঁদের স্নেহবঞ্চিত হননি। আপত্তি নিশ্চয় উঠেছিল তবু ডি জি প্রেমিকাদেবীকে রমলাদেবী নামে চিত্রজগতে নিয়ে এলেন। তাঁদের বড় মেয়ে পারুল ও ছোট মেয়ে মণিকাও শিশুশিল্পী হিসেবে এলেন চলচ্চিত্রে। তখন নির্বাক ছবির যুগ। আট বছরের পারুল আরব্য উপন্যাসভিত্তিক 'মরণের পরে' ছবিতে ক্যামেরার সামনে এসে দাঁড়ালেন। এর পরে আরও দুটো ছবি 'টাকায় কি না হয়' এবং 'পঞ্চশর' সবই ১৯৩১ সালে। অভিনয় কেমন হয়েছিল তা জানার উপায় নেই। পারুলের নিজেরও তা মনে নেই। তখন ভদ্র পরিবারের মেয়েদের চলচ্চিত্রে অভিনয় করাটাই একটা মস্ত বড় খবর, প্রায় একশো বছর আগে পাঁচ বছরের মেয়ে সৌদামিনীর বেথুন স্কুলে পড়তে যাওয়ার মতো। দেবিকারানি তখনও আসেননি। সাধনা বসুও না। পারুল অবশ্য আর অভিনয় করেননি। কেননা প্রেমিকাদেবী মারা গেলেন নিতান্ত অসময়ে, মাত্র বাইশ বছর বয়সে। এক সময়ে মীরার চেষ্টাতেই পারুলের বিয়ে হয়ে গেল ঠাকুরবাড়িতে। সেখান থেকে চলচ্চিত্রে অভিনয় করার কথা পারুল ভাবতেই পারলেন না। খুব যে আগ্রহ ছিল তাও নয়। তাঁর বোন মণিকা বহু ছবিতে অভিনয় করেন। সেকালে তাঁকে বলা হত বাংলা ছবির শার্লি টেম্পল।

পারুলের বিয়ের কয়েক মাস পরেই বিয়ে হল নন্দিতার। সম্পর্কে তিনি পারুলের দিদি। কাজেই জোড়াসাঁকো থেকে পারুলও এলেন শান্তিনিকেতনে। মীরা নিয়ে গেলেন তাঁকে কবির কাছে। নাতবউকে দেখে কবি খুব খুশি হলেন। বললেন, 'কী সুন্দর তোর চোখ। আমার কাছে থাক। আমি তোর ছবি আঁকব।'

মীরা আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'তা কি করে হবে? নতুন বউ। শ্বশুরবাড়িতে থাকবে না?'

কবি মীরাকে বলেছিলেন, 'এত সুন্দর দেখতে, ওকে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে রাখবি।' তবে ছবি আঁকা আর হয়নি। পারুলকে তখন কলকাতায় ফিরে যেতে হল।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির অবস্থাও ক্রমশ বদলাচ্ছিল। পারুল তাঁর তিন ছেলেমেয়েকে মানুষ করাই প্রথম ও প্রধান কাজ হিসেবে বেছে নিলেন। একই সঙ্গে স্থির করলেন তাদের মানুষ করবেন চাকরি করে। তিনি চলে এলেন শান্তিনিকেতনে। ছেলে-মেয়েদের হস্টেলে রাখলে হয়তো সহজ হত সব কিছু। তা না করে তিনি নিজেই কাজ নিলেন শান্তিনিকেতনে। পাঠভবনের ছাত্রাবাসের দেখাশোনার ভার নিলেন। থাকতেন ছেলেমেয়েদের নিয়ে মীরার সঙ্গে মালঞ্চে। দুই মেয়ে প্রকৃতি ও সুকৃতি খুব ভাল গান করতেন। যদিও পারুল সব সময় লেখাপড়াকেই

গুরুত্ব দিতেন। কিন্তু হেমেন্দ্র পরিবারের মেয়েরা সকলেই গান জানতেন। সংগীত তাঁদের রক্তে। দুই মেয়েই গান শিখেছেন, বিশেষ করে সুকৃতি। একটা খুব মজার ব্যাপার ঘটল একদিন। সত্যজিৎ রায় এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে। তিনি তখন গল্পগুচ্ছের তিনটি গল্প নিয়ে ছবি তুলছেন। সুকৃতিকে দেখে তাঁর মনে হল, 'সমাপ্তি'র মৃন্ময়ীর ভূমিকায় তাঁকে চমৎকার মানাবে। তিনি পারুলকে বললেন সে কথা। অনুমতি চাইলেন সুকৃতির জন্যে। পারুল, যিনি ছায়াছবিতে অভিনয় করেছিলেন একেবারে প্রথম যুগে, তিনি অনেক ভেবে শেষ পর্যন্ত অনুমতি দিলেন না সুকৃতিকে। সত্যজিৎ রায় হয়তো অপ্রসন্ন হলেন কিন্তু সিদ্ধীন্দ্রনাথ তাঁর সিদ্ধান্তে খুশি হয়েছিলেন। কোনও সংস্কার নয়, পারুলের সেদিন মনে হয়েছিল, অভিনেত্রী হবার মতো দৃঢ়তা সে বয়সে তাঁর মেয়ে অর্জন করেননি। সুকৃতির অবশ্য আগ্রহ ছিল না, তবে তিনি ডি জি ও রমলাদেবীর নাতনি, হয়তো বড় অভিনেত্রী হতে পারতেন।

পারুল সব সময় লক্ষ রেখেছেন পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত সম্মানের যেন কোনও হানি না হয়। নিজের কর্তব্য করে গিয়েছেন। ছেলেমেয়েরা সুশিক্ষা পেয়েছেন, সবাই নিজের নিজের কর্মক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এ এক অন্য ধরনের পরিতৃপ্তি। মাঝে মাঝে নির্জনে বাস করেন, কখনও ভরা-ভর্তি সংসারে। জীবনকে বোঝার জন্যে, অনুভব করার জন্যে দুয়েরই প্রয়োজন আছে, সব মিলে পারুল জীবনের অনেকটা সময় পেরিয়ে এসেও আধুনিক।

ঋতেন্দ্র পরিবারে বধূ হয়ে স্মৃতি এসেছিলেন অনেক পরে। বাসবেন্দ্র ছিলেন শিল্পী, কিছুটা ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়িয়েছেন। তারপর যখন সংসারী হলেন তখন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি থেকে তাঁরা দূরে সরে এসেছেন। অবশ্য ঠাকুরবাড়ি থেকে নিজেদের অংশ বিক্রি করে ঋতেন্দ্র পরিবারই সবার আগে চলে এসেছিলেন। বাসবেন্দ্রের স্ত্রী স্মৃতি একসময়ে নিয়মিত লিখতেন। যুগান্তর পত্রিকায় 'আইন আছে অথচ' শিরোনামে একটি কলাম লিখতেন। এছাড়া কবিতা ও গল্প। স্মৃতি নিজেকে আড়ালে রাখতেই ভালবাসতেন। তাঁর নির্জনতাপ্রিয় মনটি অনেকের কাছেই তাঁকে দূরের মানুষ করে রেখেছিল। 'মাসিক বসুমতী'র পাতায় এখনও ছড়িয়ে আছে কয়েকটি গল্প। যেমন 'একটি ফুটকির জন্য'। হাসির গল্প। মেয়েদের লেখা হাসির গল্পের সংখ্যা বেশি নয়। সেজন্যই পড়তে ইচ্ছে করে। বিমল যখন কিছুই পাচ্ছিল না তখন হঠাৎ বিধবা পিসির সম্পত্তি পেল। ৫০৮৯৩ টাকা। পঞ্চাশ হাজার টাকার দাম '৬০-এর দশকে যথেষ্ট বেশি। বিমল চাকরি পেল, কারণ বড়বাবু ভাবছিলেন তার সঙ্গে শালীর বিয়ে দেবেন। অথচ বিমল ভালবাসে নন্দিতাকে, এবার আর তার অভিভাবকরা মেয়েকে বাধা দিলেন না। বিমলের মজা লাগে, শুধু একটা খবর কত কিছু বদলে দিতে পারে। কিছুদিন পরে তার হাতে এল পিসির সম্পত্তি। ৫০৮৯৩ নয়, মাত্র ৫০৮.৯৩ পয়সা, দশমিকের হিসেব তখন নতুন। একটা ফুটকিই বদলে দিল বিমলের জীবন। 'প্রতিজ্ঞা' গল্পটা আবার প্রেমের গল্প। আলাদা করে বলার মতো কিছু নয়।

প্রজ্ঞাসুন্দরী ও লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার চার মেয়ে। বড় মেয়ে সুরভির মৃত্যু হয় সাড়ে পাঁচ বছর বয়সে। বাকি তিনজন—অরুণা, রত্না ও দীপিকার কথাও খুব বেশি জানা না গেলেও, শিক্ষায় যোগ্যতায় তাঁরা ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য মেয়েদের মতো নানা গুণের অধিকারী হয়েছিলেন। লক্ষ্মীনাথ ও প্রজ্ঞাসুন্দরী কয়েক বছর ছিলেন সম্বলপুরে কিন্তু মেয়েরা কলকাতাতেই বড় মাসি প্রতিভার কাছে থাকতেন। ডায়োসেশনে পড়তেন, 'সঙ্গীত সংঘে' গান শিখতেন। শুধু তাই নয়, খুব ভাল গাইতেন। 'আনন্দ সংগীত পত্রিকা'য় অনেক সংগীতের স্বরলিপি প্রস্তুত করেছেন অরুণা। সংগীতে ভাল দখল না থাকলে স্বরলিপি করা যায় না।

সম্ভবত তিনি 'সঙ্গীত সংঘে' গানও শেখাতেন। ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ও সুর দেওয়া গান 'মরি সেই রূপ'-এর স্বরলিপি তৈরি করেন অরুণা। মাধবদেবের 'নাচে ভাল নাচে মদন গোপাল' ও 'জয় জয় জগজন তারণ কারণ' গানদুটিতে সুরারোপ করেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অরুণা এ গান দুটিরও স্বরলিপি তৈরি করেন। মনে হয় দুটি গানই অসমিয়া কবি মাধবদেবের লেখা।

লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার ঠাকুরবাড়ির নৃত্য-গীত-অভিনয়ের দিকে আগ্রহ ছিল। তাঁর লেখায় বারবার 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র কথা আছে। নিজেও তাতে অংশগ্রহণ করেছেন। ১৯১২ থেকে ১৯১৪-এর মধ্যে কয়েকবার 'বাল্মীকিপ্রতিভা'-র অভিনয়ের খবর পাওয়া যায়। আশুতোষ চৌধুরীর বাড়িতে লেডি হার্ডিঞ্জের সংবর্ধনা সভায় পরিবারের সদস্যরা যে অভিনয় করেছিলেন তাতে অরুণা সেজেছিলেন বনদেবী। সম্বলপুরে আরও দু-একবার 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র অভিনয় হয়েছিল। ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা যেখানে যেতেন সেখানেই একটি সুচারু পরিবেশ রচনা করতেন। সম্বলপুরে এই মনোরম পরিবেশ রচনা করেছিলেন লক্ষ্মীনাথ ও প্রজ্ঞাসুন্দরী দুজনে মিলে। লক্ষ্মীনাথের উৎসাহে সম্বলপুরের ভিক্টোরিয়া টাউন হলে দুবার 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র অভিনয় হয়। তাতে প্রথম দস্যু সাজতেন তিনি নিজে। গানে অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন প্রজ্ঞা ও তাঁর তিন মেয়ে। আর একবার ১৯১৪ সালে অভিনয় হলে অরুণা সেজেছিলেন সরস্বতী। রত্না ও দীপিকা হয়েছিলেন বনদেবী।

বিয়ের পরে অরুণা চলে যান বরোদায়। তাঁর স্বামী সত্যব্রত মুখোপাধ্যায় সেখানকার দেওয়ান হয়েছিলেন। অরুণা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ পাশ করেছিলেন। বরোদা ছিল দেশীয় রাজ্য। সনাতনপন্থী এবং রক্ষণশীল। তার ফলে সংগীত, অভিনয় কোনও কিছুতেই অরুণাকে পরে আর অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়নি। তাঁর মেয়ে ঋতা জানিয়েছেন, ছেলেবেলায় নাচ শেখার প্রবল ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তিনি বাবা-মার অনুমতি পাননি।

অরুণার লেখা একটি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়েছে। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার জন্মশতবর্ষে লিখেছিলেন। তার সামান্য অংশ:

'In 1914 or thereabouts when Rabindranath's operatte *Valmikipratibha* was on the stage in aid of our Day Fund, my father was selected, out of many, by Rabindranath himself to act the part of the First Dacoit. This was a great honour, because Rabindranath was a strict judge of histrionic abilities. After my fathers death, he wrote a very moving obituary. The famour artists, Gaganendranath and Abanindranath, who were cousins of my mother, were also very fond of my father. Particularly, Abanindranath who had a great sense of humour and wit, would laugh heartily, cracking jokes whenever he met my father at Jorasanko.'

কলকাতার এই রয়েল থিয়েটারের অভিনয় এবং প্রথম দস্যুর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্মীনাথকে নির্বাচনের কথা অন্যত্র পাইনি। আশুতোষ চৌধুরীর বাড়িতে যে 'বাল্মীকি প্রতিভা'-র অভিনয় হয়েছিল তাতে প্রথম দস্যু সেজেছিলেন জ্ঞানদাভিরাম বরুয়া।

অরুণার পরের বোন রত্না। তিনিও প্রথম জীবনে কলকাতায় থাকতেন। কোনও কোনও সংগীত ও অভিনয়ে অংশগ্রহণও করেছেন। 'সঙ্গীত সংঘে' এসরাজ বাজাতে শিখেছিলেন কানুত খাঁর কাছে। পিয়ানোও শিখেছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা, বাংলা, অসমিয়া ও ইংরেজি তিনটি ভাষাতেই দক্ষ ছিলেন রত্না। বিয়ে হয়েছিল অসমের অভিজাত পরিবারের রোহিণীমোহন বরুয়ার সঙ্গে। সম্ভবত অসমিয়া ভাষাতেই তিনি তাঁর আত্মজীবনী লিখেছিলেন। তাঁর শৈশবস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথের কথাও রয়েছে। ১৯২৩ সালের কথা। রত্নারা দুই বোন প্রতি

শনিবার জোড়াসাঁকোর মামার বাড়িতে ছুটি কাটিয়ে সোমবার ফিরে যেতেন। তাঁরা আসতেন ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংসারে। যদিও রত্নাদের মামারা জমিদার ছিলেন কিন্তু তাঁদের মোটর ছিল না বলে ঘোড়ার গাড়ি চেপেই যাতায়াত করতে হত। পরীক্ষার পরে যখন তাঁরা সম্বলপুরে ফেরার তোড়জোড় করছেন তখন খবর পেলেন লক্ষ্মীনাথকে কুকুরে কামড়েছে। দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল তাঁর বন্ধু নগেন চৌধুরীর বাড়িতে। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল শিলংয়ে। জোড়াসাঁকো থেকে রত্নাও গেলেন বাবার সঙ্গে, যদিও তাঁর নিজের শরীরও বিশেষ সুস্থ ছিল না। শিলংয়ে পাস্তুর ইনস্টিটিউটে লক্ষ্মীনাথের চিকিৎসা শুরু হল। তার আগের দিনই তাঁদের সাক্ষাৎ হয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। তিনি সে সময়ে শিলংয়ে মনীষার বাড়ি জিৎভূমিতে ছিলেন। অসুস্থ রত্নার জ্বর বাড়তে লাগল। লক্ষ্মীনাথ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু রত্নার কপাল ভাল ছিল, কেননা তাঁদের পিছনের ঘরটিতে সে সময় উঠেছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। লক্ষ্মীনাথ তাঁকে অনুরোধ জানাতে গিয়ে দেখলেন সেখানে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত রয়েছেন। নাতনির অসুখ শুনেই তিনি লক্ষ্মীনাথকে বললেন, 'লক্ষ্মীনাথ, আমিও কিছু চিকিৎসা জানি। পরে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে পারবে।' বলেই হোমিওপ্যাথি ওষুধের বাক্স নিয়ে রত্নাকে দেখতে এলেন। ওষুধও দিলেন। কিন্তু চিকিৎসক রবীন্দ্রনাথ ব্যর্থ হলেন। জ্বর কমল না। ডাঃ রায় এসে জিভ দেখেই বলে দিলেন, রোগটা টাইফয়েড। এক সপ্তাহের মধ্যে প্রজ্ঞাসুন্দরীকে নিয়ে ঠাকুরবাড়ির আরও কয়েকজন আত্মীয় শিলং পৌঁছে গেলেন।

সবটাই লিখেছেন রত্না তাঁর শৈশবস্মৃতিতে। এ ছাড়া ইংরেজিতে লিখেছেন একটি প্রবন্ধ, 'লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া অ্যান্ড প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী'।

অরুণা ও রত্নার ছোট বোনের নাম দীপিকা। লক্ষ্মীনাথ ও প্রজ্ঞার আদরের কনিষ্ঠ সন্তান। দিদিদের মতোই পড়তেন ডায়োসেশনে। সংগীতে তালিম নিতেন নিশ্চয়, যদিও তাঁকে গায়িকা হিসেবে আলাদাভাবে পাওয়া যায়নি, তবে সম্বলপুরের 'বাল্মীকিপ্রতিভা'য় তাঁকে দিদিদের সঙ্গে বনদেবী সাজতে দেখা গিয়েছিল। তাঁর কোমল মনটি ছিল ভালবাসায় ভরা। স্কুলের ভাল ছাত্রী হওয়ার জন্যে সন্ন্যাসিনীরা তাঁকে খুব ভালবাসতেন। তিনি থাকতেন কলকাতাতেই, বাবা-মার কাছ থেকে দূরে হলেও আত্মীয় পরিজনদের ঘনিষ্ঠ স্নেহচ্ছায়ায়। কিন্তু মানুষের মনের চেহারা বদলায় প্রতিদিন, যাকে মনে হয় খুব চেনা, সে হয়তো অজানাই থেকে যায়। কোনও কঠিন আঘাতে দীপিকার মন একেবারে গেল ভেঙে, মনে হল কেউ তাঁকে ভালবাসে না। ভাবলেন, সন্ন্যাসিনী হয়ে নবজীবনের সন্ধান করবেন। চার বছর আগে দীপিকা গিয়েছিলেন তাঁর রবিদাদার কাছে, শান্তিনিকেতনে। বড়দিনের ছুটি কাটাতে। তার কয়েকদিন আগে বড়লাট ও ভাইসরয় লর্ড আরউইন এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে। বোলপুরের মতো ছোট জায়গায় বড়লাটের আসা একটি অভাবনীয় ঘটনা। বহুদিন ধরে এর আয়োজন চলে। সেই উপলক্ষেই হয়তো দীপিকা এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে। পৌষমেলাতেও উপস্থিত ছিলেন। শুধু তাই নয়, ২৫শে ডিসেম্বর কবির একটি অটোগ্রাফও নিয়েছিলেন, সঙ্গে কয়েক ছত্র আশীর্বাণী:

> 'জ্বালো নবজীবনের নির্মল দীপিকা,
> মর্ত্যের চোখে ধরো স্বর্গের লিপিকা।
> আঁধার গহনে রচো আলোকের বীথিকা,
> কলকোলাহলে আনো অমৃতের গীতিকা।'

দীপিকার জীবনে এই আশীর্বাদ আশ্চর্যভাবে সফল হয়ে উঠেছিল। মনস্থির করতে দেরি

হয়নি, মর্ত্যে আলোকবর্তিকা হয়েই জীবনযাপন করবেন তিনি। স্কুলের সন্ন্যাসিনী শিক্ষয়িত্রীদের মতো তিনিও জীবন কাটাবেন ত্যাগ ও সেবার মধ্য দিয়ে, তাঁরাই দীপিকার আদর্শ এবং আপনজন। মেয়ের এই সিদ্ধান্তে সবচেয়ে বেশি দুঃখ পেলেন দীপিকার বাবা লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া। তাঁর সঙ্গে দীপিকার একাধিক পত্রালাপ চলে। একটি চিঠিতে লক্ষ্মীনাথ লিখেছেন, 'মা দীপিকা, তুমি তোমার দু'খানা চিঠিতে তোমার জ্যাঠার ধর্মান্তর গ্রহণের কথা লিখেছ, তার কোনও ইতিহাস জান না বলেই লিখেছ। আমরাও বলিনি, কারণ বিষয়টা বড় কষ্টকর। ...ডাক্তার বেজবরুয়া টাকাকড়ির অভাবে খ্রিস্টান হয়েছিলেন, ভালবাসার অভাবে নয়। তোমার খ্রিস্টান হবার ইচ্ছে হয়েছে টাকাকড়ির অভাবে নয়। ...বিভীষিকার কুয়াশাতে তোমার মন আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তোমার নিজের লোকের ভালবাসা-সমুদ্রের মধ্যে তুমি ডুবে আছ। কিন্তু সে সমুদ্রের জল জলই বলে মনে হচ্ছে না। তুমি মরীচিকার পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছ। মা দীপিকা, তোমার কি ভুল! কি ভুল!'

লক্ষ্মীনাথ এ চিঠি লিখেছিলেন ১৯৩২ সালের ১৪ জুলাই। দীপিকার সঙ্গে তাঁর আরও পত্র বিনিময় হয়ে থাকতে পারে কিংবা সাক্ষাৎ, তথ্যের অভাবে কিছুই জানা যায়নি। দীপিকা এর কিছুদিন পরে, নভেম্বর মাসে অ্যাঙ্গলিকান চার্চে যোগ দিয়ে ধর্মান্তরিত হন। ১৯৩৫ সালের জানুয়ারিতে তিনি সন্ন্যাসিনী-হয়ে বিলেতে যান। সেখানে তিনি সেন্ট জন দি ব্যাপটিস্ট কনভেন্টে কয়েক বছর থেকে ১৯৩৮-এর জানুয়ারিতে আবার কলকাতায় ফিরে আসেন।

চার্চ অফ ইংল্যান্ডের প্রিচিং অর্ডারে ছিলেন সিস্টার দীপিকা, কাজেই পড়াতেন। ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা পড়াতে ভালবাসেন, স্কুল তাঁদের নেশা, সুতরাং দীপিকারও স্কুলের কাজ ভাল লাগত। তাঁর সুমধুর ব্যবহার ও সেবাপরায়ণতার কথা এখনও অনেকের মনে আছে। হয়তো একভাবেই কেটে যেত তাঁর জীবন কিন্তু চার্চ অফ ইংল্যান্ডের শাখাটি এদেশে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অন্য সমস্যার উদ্ভব হল। কনভেন্ট থেকে সন্ন্যাসিনীদের নির্দেশ দেওয়া হল সংসারে ফিরে যেতে। কিন্তু সংসার যাঁরা স্বেচ্ছায় ছেড়ে এসেছেন তাঁরা ফিরে যাবার জন্যে আসেননি। সিস্টার দীপিকা বেছে নিলেন সেবার পথ। তিনি আয়ু দিতে পারেন না কিন্তু আর্তের কপালে তো বুলিয়ে দিতে পারেন কোমল হাতের স্পর্শ, অসুস্থ রোগীকে পৌঁছে দিতে পারেন হাসপাতালে। সরোজার নাতনি সুজাতা দেখেছেন সিস্টার দীপিকা খালি পায়ে ধুলোমাখা পথে হেঁটে চলেছেন কোনও অনাথ আতুরকে শুশ্রূষা করতে। এই ব্যাপারটা তাঁকে বড় কষ্ট দিত। অথচ দীপিকা ছিলেন অম্লান কুসুমের মতো, কেউ পরিশ্রমের কথা তুললে হেসে বলতেন, my soul is hungry. তাঁর একটি লেখার খোঁজ পাওয়া যায়, 'লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া, দি ম্যান অ্যান্ড ফাদার'। সন্ন্যাসিনীর পূর্বজীবন থাকতে নেই। সিস্টার দীপিকাও পূর্বজীবনের ময়না তদন্ত করেননি, তবে আত্মীয়দের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। সবার বাড়িতেই তিনি যেতেন। গল্প করতেন। আবার ফিরে যেতেন নিজের ছোট্ট বাসায়। কোনও অভিযোগ, কোনও অনুশোচনা ছিল না। শুধু মৃত্যুর আগে চেয়েছিলেন তাঁর শেষকৃত্য যেন দাহ করে হয়। মানুষ তো তার সংস্কারকে ধর্মের মতো ত্যাগ করতে পারে না। কিন্তু সব ধর্মেই সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের জন্যে বোধহয় কঠোর নিয়মের অনুশাসন থাকে। প্রোটেস্ট্যান্ট সিস্টার দীপিকারও শেষ ইচ্ছে রক্ষা করা গেল না। আত্মীয়দের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে তাঁকে সমাহিত করা হল।

সৌদামিনীর নাতি সুপ্রকাশের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল তনুজার, তিনি নতুন কেউ নন, পাঁচ নম্বর বাড়ির মেয়ে কুমুদিনীর পরিবার থেকে এসেছিলেন। সুপ্রকাশ ছিলেন বরোদা মিউজিয়ামের কিউরেটর। তনুজা খুব ভাল রাঁধতে পারতেন। তাঁর বাপের বাড়ির রান্না কিছুটা অন্য ধরনের। ভিন্ন স্বাদ প্রতিদিনকার রুচি বদলাতে পারে ভেবে তিনি সেগুলোকে খাতায় লিখে রাখতে শুরু

করেন। তাঁর উৎসাহের আরও কারণ ঘটল রবীন্দ্রনাথ যখন বরোদায় বক্তৃতা দিতে গেলেন। মহারাজার নিমন্ত্রণে বরোদা গেলেও কবি একদিন গিয়েছিলেন সুপ্রকাশের বাড়িতে। সেদিন তনুজার আন্তরিকতা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তনুজা নিজের হাতে নানারকম সন্দেশ তৈরি করে কবিকে খাইয়েছিলেন। কবি সন্তুষ্ট হয়ে একটি কবিতা লিখে তনুজাকে উপহার দেন:

'কল্যাণীয়া তনু,

অন্তরে তব স্নিগ্ধ মাধুরী পুঞ্জীভূত,
বাহিরে প্রকাশ সুন্দর হাতে সন্দেশে।
লুব্ধ কবির চিত্ত গভীর গুঞ্জিত,
মুগ্ধ মধুর মিষ্ট রসের গন্ধে সে।
রবি দাদারে যে ভুলালে তোমার নাতিত্বে
প্রবাসবাসের অবকাশ ভরি আতিথ্যে,
সেই কথাটুকু গাঁথি দিল এই ছন্দে সে ॥'

পরে এই কবিতাটিকে সামান্য বদলে এবং তিনটি স্তবক যোগ করে 'প্রহাসিনী' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তনুজার নাম সেখানে না থাকলেও কবিতাটির নাম রাখা হয় 'নাতবউ'। পরে তনুজা প্রকাশ করেন তাঁর রান্নার বই 'পাঁচমিশেলি'। সে বই অনেক পরিবারেই বধূদের স্বস্তির নিশ্বাস ফেলায় সাহায্য করেছে। মধুমিতা হালদার তাঁদেরই একজন। বললেন, 'এদের বাড়ির খাওয়া-দাওয়া একেবারে অন্যরকম। সব ব্যঞ্জনেই পড়ে রসুন আর ভিনিগার। রান্নাও নানারকম, এঁরা অড়হর ডালে রসুন ফোড়ন দেন। আবার মুগের ডালে শুধু আদা নুন ও মিষ্টি, তাতে সবজিও দেওয়া যায়। আরও আছে বাংলা মাংসের ঝোল, মাছের ঝোলে পড়ে টক দই—'পাঁচমিশেলি'তে এসব রান্না না থাকলে কী বিপদেই না পড়তে হত।' তনুজার বইয়ে আছে আরও নানারকম রান্না—ছানার ঘণ্ট, পুদিনার চাটনি, মাছের মৌলি, ভুট্টার কাটলেট। তনুজা গৃহিণীদের কথা অনেক ভেবেছেন, 'একই রান্না রোজ খেতে অরুচি। তাই রান্না কি করে একটু অদল বদল করা যায় এই দুর্ভাবনা লেগেই থাকে মেয়েদের। এক সপ্তাহের রান্নার এই ফর্দ সেই দুর্ভাবনা দূর করবে। এর যে সবই করতে হবে তা নয়, ইচ্ছেমতো বেছে নিলেই চলবে।' তনুজার এই সাপ্তাহিকী এখনকার দিনে একটু বড় হলেও হয়তো অনেকেরই কাজে লাগবে। শুধু রান্না নয়, ভাল সেলাই, বিশেষ করে উলের ওপর নানারকম নকশা তুলতে জানতেন বলে লিখেছিলেন আর একটি বই 'বুনুনি'। গৃহিণীদের সেলাই বোনা শেখাবার জন্যে।

অদিতির কথা এখন অনেকেরই মনে নেই অথচ যাঁরা তাঁকে চিনতেন তাঁদের স্মৃতিতে তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি বুঝিয়ে দেয় শরৎকুমারীর এই নাতনিটির মধুর ব্যক্তিত্ব ছিল। ঠাকুরবাড়ির যে শাখাগুলির খবর সবচেয়ে কম পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে পড়েন শরৎকুমারীর মেয়েরা। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ছোট থেকে বড় হয়ে ওঠার দুর্লভ সুযোগ পেয়েও যেন তাঁরা দূরে রয়ে গিয়েছেন। তবু সুশীলা ও সুপ্রভাকে আলোর বৃত্তে মাঝেসাঝে প্রবেশ করতে দেখা গেলেও স্বয়ম্প্রভা ও চিরপ্রভাকে একবারও দেখা যায় না। শুধু ছিন্নপত্রের গোটা দুয়েক চিঠিতে আছে স্বয়ম্প্রভার কথা। কবি লিখেছেন ইন্দিরাকে। কৌতূহল হয় যখন দেখি, প্রশান্তকুমার পাল মন্তব্য করেছেন, 'এই ভাগিনেয়ীটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কিছু বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাঁর চিঠিতে একাধিকবার এঁর উল্লেখ আছে.... স্বয়ম্প্রভা দেবীর বিবাহের পর রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত একটি চিঠিতে এ সম্পর্কে কিছু লিখেছিলেন, ইন্দিরা দেবী সে সম্পর্কে খোঁটা দিয়ে লেখেন বিয়ে

প্রভৃতি বিষয় পুরুষেরা 'কিছু বেশি থিওরেটিক্যালি' দেখে—রবীন্দ্রনাথ সেই অভিযোগ মেনে নিয়ে লিখলেন 'স্বয়ম্প্রভার বিয়ের সম্বন্ধে আমি যে সব ফিলজফাইজ করেছিলুম সেটা কোনও কাজেরই না।' রবীন্দ্রনাথ আগের চিঠিতে কী লিখেছিলেন তা পাওয়া যায়নি, পাওয়া যায়নি ইন্দিরার চিঠিটিও। পত্রের শেষে কবি খোঁটা দিতে ছাড়েননি মেয়েদের কিংবা 'যারা মন পদার্থের দ্বারা অতিমাত্রায় পীড়িত নয়' তাদের। এঁদের মধ্যে স্বয়ম্প্রভা যেমন পড়েন তেমনি পড়েন ইন্দিরাও। আপাতত যেটুকু পাওয়া গেল তা হচ্ছে, 'স্বয়ম্প্রভারা বেশ আনন্দেই আছে—অবশ্য এ উচ্ছ্বাস কিছুদিন বাদে কমে আসবে, তখন অভ্যাসবন্ধনে স্নেহবন্ধনে বদ্ধ হয়ে জীবনটি বিস্তৃত ব্যাপ্ত হয়ে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হতে থাকবে।' স্বয়ম্প্রভার কথা এর পরে আর কিছুই জানা যায় না। অদিতি এঁরই ছোট মেয়ে। খুব মিষ্টি শান্ত স্নিগ্ধ স্বভাব। করুণায় বুক ভরা। গানের গলাটিও মধুর। যে একবার শোনে সে আবার শুনতে চায়। শুধু গান নয় শিল্প, সাহিত্য, সংগীত প্রতিটি সুকুমার শিল্পই তাঁকে টানে। ডুবে থাকেন তাতে। খুব শীঘ্র বিয়ে ঠিক হয়ে গেল পরিচিত পরিবারে। মহর্ষির বড় মেয়ে সৌদামিনীর নাতনি ইন্দ্রাণীর বিয়ে হয়েছিল নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সেই পরিবারেই বউ হলেন অদিতি। তাঁর স্বামীর নাম নীলাঞ্জন, তাঁর মায়ের নাম ত্রাণকুমারী, তিনি পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ির মেয়ে এবং মোহিতকুমারীর ছোট বোন ছিলেন। ইন্দ্রাণী নীলাঞ্জনের বিমাতা। দুই বোনের দুই নাতনির নতুন সম্পর্ক হল শাশুড়ি আর বধূ, ঠাকুরবাড়িতে কিংবা পিরালীদের মধ্যে এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটত। মাত্র তিন চারটি পরিবারের মধ্যে চলত বারবার আসা যাওয়া। সম্পর্কের জটিলতা এড়াতে ঠাকুরবাড়ির সদস্যরা নিজেদের মধ্যে নিয়ম করে নিয়েছিলেন নতুন সম্পর্কটিকেই মেনে চলা হবে।

ইন্দ্রাণী পরম স্নেহে অদিতিকে গ্রহণ করলেন। কিন্তু সুখের কপাল নিয়ে যিনি আসেননি তাঁকে সুখী করবে কে? অল্প বয়সেই বিধবার শুভ্রবেশে অদিতি ফিরে এলেন তাঁর বাবা মার কাছে। চোখের পলকে তাঁর জীবন শুরু হবার আগেই শেষ হয়ে গেল। খুব ভাল গাইতেন অদিতি, অসাধারণ শিল্পী মন নিয়ে আঁকতেন ছবি কিন্তু অল্পবয়সি বিধবার জন্যে কেউ সংগীতশিক্ষক বা অঙ্কনশিক্ষক নিয়োগ করে কি? অদিতির নিজেরও এসব কিছুই আর তখন ভাল লাগত না। শূন্য মন সব সময় যেন খাঁ খাঁ করে। আমাদের সমাজ বিধবাদের কোনও সুবিধে দিতে চায় না। অদিতিকে সকলের মধ্যে ফিরিয়ে আনার জন্যেই হয়তো শ্বশুরবাড়িতে তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে তুলে দেওয়া হল তাঁর অসুস্থ ননদের সেবার ভার। আসলে অদিতি সকলকে যেমন ভালবাসতেন তেমনই ভালবাসতেন শুশ্রূষা করতে তাঁর করুণ হৃদয়টি সকলের জন্যে আতুর হত। তিনি মনে মনে ঠিক করলেন নার্সিং পড়ে সেবার মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দেবেন। কিন্তু মহৎ কাজেও বিস্তর বাধা আসে। বিশ শতকের গোড়ার দিকে বাঙালি সমাজে মহিলা চিকিৎসক কিংবা সেবিকাদের কোনও সম্মান ছিল না। ভদ্র পরিবারের ব্যক্তিরা সেবিকার হাতে জলও খেতেন না, পেশাটিকে দেখা হত ঘৃণার চোখে। নেহাত নিরুপায় না হলে কেউ এ কথা ভাবে? অদিতির বাবা অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুতেই অদিতিকে নার্সিং পড়ার অনুমতি দিলেন না। একটি বিধবার কতটুকুই বা অভাব? শ্বশুরবাড়িতে বা ভাইয়ের সংসারে অবলীলায় আর অবহেলায় কেটে যাবে তা। একথা সত্যি, অদিতি সকলেরই ভালবাসা আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। তাঁর কোমল মন, সবার প্রতি আন্তরিক ভালবাসা অতি বড় কঠোর হৃদয়েরও মন ছুঁতে পারত। কিন্তু নিজের করে কিছু পাওয়ার মধ্যে যেমন আনন্দ আছে তেমনি আনন্দ আছে কর্মের মধ্যে মুক্তি পাওয়ার। সেইটুকুই চেয়েছিলেন অদিতি, সেবার মধ্যে, মহৎ কাজের মধ্যে মুক্তি পেতে। ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের মতো মন অন্য দেশের নারীরও তো থাকতে পারে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।

শান্তিনিকেতনে অদিতি এসেছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি কোনও সময়ে, বোমার ভয়ে ঠাকুরবাড়ির সকলেই তখন কলকাতা ছেড়ে আশ্রয় নিচ্ছেন কলকাতার বাইরে। অদিতির

শ্বশুরবাড়ি সবাই অন্যত্র গেলেও অদিতি চলে এলেন শান্তিনিকেতনে। কবির সঙ্গে অদিতির আগে কোনও না কোনও সময়ে সাক্ষাৎ নিশ্চয় হয়েছিল তবে শান্তিনিকেতনে তিনি যখন পাকাপাকিভাবে থাকতে এলেন তখন আর কবির সঙ্গে অদিতির দেখা হওয়ার সুযোগ নেই। হয়তো তিনিই তাঁকে দিতে পারতেন পথের সন্ধান। অবশ্য শান্তিনিকেতনে এসে অদিতি কিছুটা শান্তি পেয়েছিলেন। অতি নির্জনে একটি মাটির বাড়িতে থাকতেন, চারপাশের গেরুয়া মাটির মধ্যে একমাত্র শ্বেতশুভ্র প্রতিমার মতো, যেন ভোরের মাটিতে কুড়িয়ে পাওয়া শিশিরসিক্ত একমুঠো শিউলি ফুল। শান্তিনিকেতনের প্রতিটি মানুষ তাঁকে চিনতেন, ভালবাসতেন। একাই বাস করতেন অদিতি, সঙ্গে তাঁর পোষা কুকুরটি, যার সমাধি এখনও শান্তিনিকেতনে রয়েছে। এখানেই অদিতি খুঁজে পেলেন আর একটি কাজ। সাঁওতালদের সারল্য ও দুঃখ দেখে তিনি ঠিক করলেন, তাদের জন্যে তিনি কিছু করবেন। বিশেষ করে শিশুদের পড়াবার জন্যে অদিতি প্রচুর চেষ্টা করেন। সাংগঠনিক শক্তি বা শিক্ষা দেবার অভিজ্ঞতা কোনওটাই তাঁর ছিল না, কাজেই তাঁর চেষ্টা সীমাবদ্ধ হয়ে রইল দান ও সাহায্যের মধ্যে। স্কুলে ভর্তি হলেও বই কেনার পয়সা সাঁওতাল শিশুদের ছিল না, অদিতি তাঁর যাবতীয় স্ত্রীধন ব্যয় করলেন তাদের জন্যে। নিজের বাড়ির উঠোনে কালো-কালো সাঁওতাল শিশুদের কাকলি তাঁকে যেন মনে পড়িয়ে দিতে লাগল বৃন্দাবনের কথা। ব্রজের রাখাল শিশুদের দেখার জন্যে অধীর হল তাঁর মন। সবটাই অবশ্য অনুমান, কেননা শান্তিনিকেতনের সব কিছু ছেড়ে, পারিবারিক যোগাযোগ সম্পূর্ণ ছিন্ন করে তিনি চলে গিয়েছিলেন বৃন্দাবনে। যতদূর জানা যায়, ওঙ্কারনাথ আশ্রমই হয়েছিল তাঁর নতুন আশ্রয়স্থল। তীব্র আধ্যাত্মিক আকর্ষণে মহিলাদের ঘর ছাড়া নতুন নয়, ঠাকুরবাড়ির দুই সন্ন্যাসিনী মেয়ে এবং বধূর নামও তো আমরা জানি। কিন্তু সবাই সফল হয় না, কেউ কেউ হয়। ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে যে মানসিক দৃঢ়তা সন্ন্যাসিনীর থাকা প্রয়োজন, অদিতির তাও ছিল না। অনাহারে, অর্ধাহারে, অসুস্থ শরীরে তিনি যখন মৃত্যুর জন্যে দিন গুনছেন তখন তাঁর ভাইপো তাঁকে খুঁজে পেলেন। সাংবাদিক অরণি একরকম জোর করেই তাঁকে ফিরিয়ে আনলেন বাড়িতে। পিসিকে খুব ভালবাসতেন তিনিও। সংসারের মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন তাঁকে। সুচিকিৎসায় সুস্থ হলেন অদিতি। অদিতিকে ফিরে পাওয়ার খবর পেয়ে তাঁকে শ্বশুরবাড়িতে ফিরিয়ে আনলেন নীলাঞ্জনপ্রকাশের ভাইপো নিরধিপ্রকাশ। বড় কিছু না করেও অদিতি যে মাধুর্য দিয়ে তাঁর উপস্থিতিকে সুন্দর করে তুলতে পারতেন, এটাও তার প্রমাণ বইকী!

স্বর্ণকুমারীর সংসারে বিদুষী মেয়ের সংখ্যা কম নয়। তাঁর তিনটি সন্তানই কৃতী। হিরণ্ময়ী ও সরলা সুপরিচিত, তাঁদের ভাই জ্যোৎস্নানাথ পরিবারের নিষেধ অগ্রাহ্য করে বিবাহ করেছিলেন কুচবিহারের রাজকন্যা সুকৃতিকে। ঠাকুরবাড়িতে অসবর্ণ বিবাহের নজির এটি। স্বর্ণকুমারীর অসামান্য রচনাশক্তি তাঁর মেয়েদের পরে হারিয়ে যায়নি। তাঁর নাতনি কল্যাণী দিদিমার দৃঢ়তা ও লেখনীশক্তিকে নিজের কাজের মধ্যে বাঁচিয়ে রেখে পুনরায় নজির সৃষ্টি করলেন। হিরণ্ময়ীর একমাত্র কন্যা কল্যাণী ঠাকুরবাড়ির প্রচলিত ধারায় মিশে যাননি। যদিও আশুতোষ চৌধুরীর বাড়িতে যেদিন 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র অভিনয় হয়েছিল তাতে ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে কল্যাণীকে বনদেবীর ভূমিকায় দেখা গিয়েছে কিন্তু তাঁর প্রকৃত টান ছিল আপাত কঠিন বিষয়ের দিকে। বিয়ের পরে ঘর-সংসারের কাজের ফাঁকে ফাঁকে একদিকে যেমন সেতার এবং বেহালা বাজাতে শিখেছেন, তেমনই লেখাপড়াও শিখেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নন কলেজিয়েট ছাত্রী হিসেবে এম এ পরীক্ষা দিলেন ১৯৩৬ সালে। বাংলা সাহিত্যে। উত্তীর্ণ হলেন প্রথম শ্রেণীতে, তৃতীয় স্থান পেয়ে। অথচ লোরেটো স্কুলে পড়াতেন সংস্কৃত। সেইসঙ্গে গবেষণা করার কথাও ভাবছিলেন। বাংলা সাহিত্যে তখনও খুব বেশি গবেষণা হয়নি। বহু সহজ বিষয়

তাঁর সামনে থাকা সত্ত্বেও তিনি বেছে নিলেন আপাত অপরিচিত নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন-প্রণালীর মতো জটিল বিষয়টিকে। ১৯০১ সালের লোকগণনায় ভারতে ৪৫,৪৬৩ নাথযোগীর সংখ্যা দেখা যায়। তার পরে এঁদের আর পৃথকভাবে গণনা করা হয়নি। কল্যাণী নেপাল থেকেও কিছু কিছু উপাদান সংগ্রহ করে আনলেন। প্রধানত শৈব যোগীদের সঙ্গে এঁদের যোগ থাকলেও বৌদ্ধধর্মের সঙ্গেও নাথধর্মের কিছু সাদৃশ্য বা যোগ আছে। যে চুরাশিজন সিদ্ধ যোগীর কথা বা রচনা চর্যাপদে মেলে তাঁদের অনেকের নাম আবার নাথযোগীদের মধ্যেও পাওয়া যায়। এঁরা সকলেই যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে যে গোরক্ষ বিজয়, গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস বা ময়নামতীর গান পাওয়া যায় তার সঙ্গে লোকসাহিত্যের যোগ বেশি। মনে হয় তন্ত্র, হঠযোগ, শৈবাচার, ধর্মপুজো, বজ্রযান, সহজিয়া—সব ধর্মের প্রভাব পড়েছিল নাথযোগীদের সাধনায়। সারা ভারতেই ছড়িয়ে রয়েছে নাথযোগীদের প্রভাব। কল্যাণী এই জটিল ও বিচিত্র বিষয় নিয়ে তাঁর গবেষণা আরম্ভ করেন। আজ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে সেই গবেষণার সমতুল্য কোনও কাজ নাথ সাহিত্য বা নাথযোগীদের নিয়ে হয়নি।

গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে কাজ করলেও কল্যাণীর ভাষা দুর্বোধ্য নয়। তাঁর দুটি বই-ই এখন দুষ্প্রাপ্য, সাধারণের নাগালের বাইরে। সেজন্য তাঁর 'নাথপন্থ' থেকে দু-একটি উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। কল্যাণী লিখছেন, '...এখন নাথযোগীদের সিদ্ধান্ত ও সাধনা সম্বন্ধে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করিব। মোক্ষলাভই সকল সাধনার মূলতত্ত্ব, মানব জন্মমরণরূপ চক্র হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ধর্মসাধনের পক্ষপাতী। কিন্তু নাথপন্থে মোক্ষলাভ আবশ্যকবোধ হইলেও উহা নাথগণের লক্ষ্য নহে, সিদ্ধি বা বিভূতি লাভ করিয়া এই মরণশীল দেহকেই সাধনদ্বারা মৃত্যুহীন করিয়া জীবন্মুক্তি লাভই আদর্শ। তাই এই দেহকে মুক্তি লাভের বাধা নহে, সহায়রূপেই তাঁহারা মনে করেন। দেহপাতে যে মুক্তি লাভ হয় তাহাকে নাথেরা যথার্থ মুক্তি বলেন না, কারণ সে মুক্তি দেহপাতরূপ প্রতিবন্ধক দ্বারা বাধিত। নাথগণ বলেন, যে দেহে পরমপদ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠপদের প্রাপ্তি হইয়াছে তাহাকেই অজর অমর করিয়া রাখা কর্তব্য। কারণ মৃত্যুর পর কি ঘটিবে তাহার নিশ্চয়তা কি? জীবন্মুক্ত যোগীর প্রাণ বহির্গত হয় না বলিয়া এবং দেহত্যাগ তাঁহার স্বেচ্ছাধীন বলিয়া তিনি কালজয়ী হইয়া যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারেন।'

অবশ্য অন্যান্য ধর্মের সাধনপদ্ধতির মতো অবিদ্যা দূর করে তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য নাথযোগীরাও বাসনাক্ষয়কে গুরুত্ব দিতেন। তাই তাঁদের 'উলটাসাধন' হল বহির্মুখী মনকে অন্তর্মুখী করা। বিভিন্ন ধর্মের সাধনার সঙ্গে এভাবেই নাথপন্থের যোগ খুঁজেছিলেন কল্যাণী এবং সফলও হয়েছিলেন। নাথ সম্প্রদায় তাঁকে মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত করে সম্মান দিয়েছেন। এতেই আরও স্পষ্ট হয়েছে কত নির্ভুল ছিল কল্যাণীর গবেষণা।

কল্যাণীর আপাত কঠিন মনের আড়ালে ছিল বন্ধুবৎসল, পরোপকারী একটি মন। স্বর্ণকুমারী যেমন লেখিকাদের সঙ্গে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন, কল্যাণীও তেমনি যোগ রেখেছিলেন কবি নিস্তারিণী প্রমুখ অনেকের সঙ্গে। ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের সঙ্গে তাঁর যেমন যোগ ছিল, সেইরকম যোগ ছিল হেমলতার 'বঙ্গলক্ষ্মী'র সঙ্গে। আশ্রমের বিধবাদের জন্যে হিরণ্ময়ীর ভাবনাচিন্তার শরিক ছিলেন তিনি। মায়ের কষ্ট গভীর দাগ কেটেছিল মনে। কাশীর নিস্তারিণীর সঙ্গে হয়তো সেজন্যেই গড়ে উঠেছিল সখ্য। বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষাতেই লিখেছেন। শুধু নাথযোগীদের কথা নয়, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাদেবীর কথাও লিখেছেন। মায়ের কথা, দিদিমার কথা, জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর কথা, রবীন্দ্র স্মৃতিবার্ষিকী, ভ্রাতৃস্মরণে, প্রমথনাথ চৌধুরী প্রভৃতি লেখা তাঁর গুরুগম্ভীর লেখাগুলির পাশে পাশেই রয়েছে। স্ত্রী শিক্ষা নিয়ে লিখেছেন কয়েকটি প্রবন্ধ, সমসাময়িক বিষয় নিয়ে কয়েকটি কবিতা, কাশ্মীর, সিকিম ও শতপন্থ ভ্রমণের কথাও লিখেছেন পত্র-পত্রিকায়। দীক্ষা নিয়েছিলেন কপিলমুনির মঠে হরিহরানন্দ স্বামীর কাছে। অনেক সম্মান পেয়েছেন, সে কথা বলতেন না কখনও কিন্তু কাশীর

মহিলা মণ্ডলের সদস্যারা এম এ বি টি পাশ করায় যে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন সেই কবিতাটি সযত্নে রেখে দিয়েছিলেন অপরিসীম ভালোবাসায়। সেই কবিতাটি লিখেছিলেন কবি নিস্তারিণী। তার কিছু অংশ:

'...প্রবাসের নিদর্শন,
বিশুদ্ধ প্রণয়ধন,
প্রদানিতে ভয় করে ওগো সুবদনি।
ক্ষুদ্র শক্তি ক্ষুদ্র আশা,
অকপট অভিলাষা,
অনাবিল স্বচ্ছতোয়া স্বর্গ মন্দাকিনী।
মধুমাখা ভালবাসা
জানে না মৌখিক ভাষা,
কাব্য অলঙ্কার নাহি জানে এ রমণী।
নিতান্ত সরলাবালা সতী প্রবাসিনী।...
এস মোর প্রিয় সখি
আবার আবার দেখি
তোমার ও স্নেহমাখা সরল বয়ান
শিক্ষার আদর্শ যদি
রক্ষা করো নিরবধি
ধন্য হবে আর্যনারী আবার ভারতে
ঘুচিবে আঁধার কারা
উজলিবে চন্দ্র তারা
আলোকে আলোকময় সুন্দর জগতে।'...

রবীন্দ্রনাথের একমাত্র দৌহিত্রী নন্দিতা মীরার মেয়ে। যদিও দাদামশায় হিসেবে কবির বিশাল ভূমিকা বারবারই চোখে পড়ে। একান্নবর্তী পরিবারের অনেক নাতি-নাতনি তাঁর, সম্পর্কের বাইরেও ছিলেন কয়েকজন। তবু নন্দিতা নিজগুণেই স্বতন্ত্র। তিনি শান্তিনিকেতনের সব উৎসবের সঙ্গেই জড়িয়ে থাকতেন। প্রতিমার নৃত্যশিক্ষার স্কুলের সবচেয়ে উজ্জ্বল রত্ন নিঃসন্দেহে নন্দিতা। যদিও নন্দিতা পড়েছিলেন কলকাতার গোখেল মেমোরিয়াল স্কুলে। তিনি তাঁর বাবাকে খুব ভালোবাসতেন কিন্তু নগেন্দ্রনাথ ও মীরার বিবাহিত জীবন সুখের হয়নি। এর প্রভাব পড়েছিল তাঁদের পুত্র-কন্যার জীবনে। নন্দিতা পরে কলাভবনে ও সংগীতভবনে যোগ দিয়ে শান্তিনিকেতনের আপনজন হয়ে ওঠেন। নৃত্য নিয়ে কবির নবনিরীক্ষায় তিনি প্রথম থেকেই যোগ দিয়েছিলেন সাগ্রহে। ১৯৩৬ সালে 'চিত্রাঙ্গদা'র প্রথম অভিনয় হয়। নন্দিতা মঞ্চে এলেন দ্বিতীয় চিত্রাঙ্গদা হিসেবে। এখন আমরা এই চরিত্রটির নতুন নাম দিয়ে থাকি সুরূপা, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোথাও চিত্রাঙ্গদাকে কুরূপা ও সুরূপা নামে ভাগ করে দেননি। যাই হোক, প্রথম অভিনয়ে প্রথমা চিত্রাঙ্গদা সেজেছিলেন নন্দলাল বসুর মেয়ে যমুনা। শান্তিদেব ঘোষের দেওয়া হিসেব থেকে জানা যায় ১৯৩৬ থেকে ১৯৪০-এর মধ্যে 'চিত্রাঙ্গদা' অভিনীত হয়েছিল চল্লিশবার। প্রথমবার কলকাতা থেকে পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন শহরে নাচের দল নিয়ে গিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তিনি সব সময় মঞ্চে উপস্থিত থাকতেন। পাটনা, দিল্লি, এলাহাবাদ, লখনউ, মীরাট, লাহোর—সর্বত্র 'চিত্রাঙ্গদা' সার্থকভাবে সফল হয়েছিল। সবাই সুন্দর নাচতেন, নন্দিতা সব সময় দ্বিতীয়া হলেও

একদিন দেখা গেল যমুনার স্বর। অর্জুন, প্রথমে কে সাজবেন? অমলা দিদিকে দিয়ে দুটো ভূমিকায় একা নন্দিতা অভিনয় করেছেন। আবার এর বিপরীতও ঘটেছে কোনও কোনও সময়ে।

'চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে সঙ্গে আরও ক'টি নৃত্যনাট্য তৈরি হল—'চণ্ডালিকা', 'শ্যামা' ও 'তাসের দেশ'। প্রতিটিতেই নন্দিতার প্রধান ভূমিকা, অসাধারণ অভিনয়। অপূর্ব দেহমুদ্রা ও ভাবভঙ্গিতে প্রতিটি চরিত্রই প্রাণ পেত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনে নৃত্য আর নিন্দার বস্তু হয়ে থাকেনি। নন্দিতার সঙ্গে আরও কয়েকজনের নাম করা যায়। 'নটীর পূজা'র গৌরী বসু অসাধারণ অভিনয় করেন। শ্রীমতী একক নৃত্যে অসামান্য খ্যাতি অর্জন করেন। 'তাসের দেশে' হরতনী সেজেছিলেন যুঁইদি বা অমলা রায়চৌধুরী। নন্দিতা 'চণ্ডালিকা' ও 'তাসের দেশে' ও অংশ নিয়েছেন। মাতনি মঞ্চে নামলে কবিও স্বস্তি পেতেন। তাই সময়-অসময়ে ডাক পড়ত নন্দিতার। কবি লিখছেন মীরাকে, ...'বিপদে পড়েছি। হঠাৎ খবর পেয়েছি, এক চীনে জাপানি আসবে আমাদের নাচের পরীক্ষার জন্য। ...বুড়িকে না পেলে এমন একটা লোক-হাসানো ব্যাপার হবে যা সমুদ্র পার হয়ে যাবে।' নন্দিতাও এসেছেন। যখনই ডাক পড়েছে, সাড়া দিয়েছেন। অপরিসীম প্রাণপ্রাচুর্যে পূর্ণ ছিলেন তিনি। শান্তিনিকেতনে সব অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। একবার ঠিক হল 'অরূপরতন' হবে। সুদর্শনা সাজলেন অমিতা। সুরঙ্গমা কে হবে? কবির ইচ্ছে ছিল তিনি নিজেই হবেন সুরঙ্গমা কিন্তু অন্যেরা তাতে রাজি না হওয়ায় বাধ্য হয়েই পার্টটা দিলেন মাতনিকে।

১৯৩৬-এই নন্দিতার বিয়ে হয়। নন্দিতা ভালবাসতেন কৃষ্ণ কৃপালনীকে। সুদর্শন, বিদ্বান ও সুরসিক কৃষ্ণকে সকলেই খুব ভালবাসতেন। রবীন্দ্রনাথ বলতেন, তিনি যে দুজন প্রকৃত ভদ্রলোককে চেনেন তাঁদের অন্যতম হলেন কৃষ্ণ কৃপালনী। নন্দিতা আড্ডা দিতে খুব ভালবাসতেন, শান্তিনিকেতনেই উভয়ের বন্ধুত্ব গাঢ় হয়ে উঠল। উভয়ের বন্ধুরা জানতেন সে কথা। রমা চক্রবর্তী লিখেছেন, 'দুপুরবেলায় মীরাদি ঘুমিয়ে পড়লে বুড়ি বাগানের ভিতর দিয়ে দিয়ে ছোট গেট টপকে চলে আসত রতনকুঠিতে।' রতনকুঠিতেই থাকতেন তরুণ অধ্যাপক কৃষ্ণ কৃপালনী। কৃষ্ণ কৃপালনী যখন কবির কাছে নন্দিতার পাণিপ্রার্থনা করলেন তখন কবির কী মনে হয়েছিল তা জানা যায়নি। তিনি অনুমতি দিতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করেননি বরং বিস্মিত হয়েছিলেন কৃষ্ণ স্বয়ং। তিনি বাঙালি বা ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্ম কিছুই নন তবু কবির সানন্দ সমর্থন তাঁকে অভিভূত করেছিল। ঘটনাটি বিস্মিত করেছিল প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কেও। তিনি লিখেছেন, 'এই বিবাহ অসবর্ণ বিবাহ, তজ্জন্য যথাযথভাবে সিউড়িতে ১৮৭২ সালের ৩ আইন বা সিভিল-বিবাহ আইন মতে বিবাহ রেজিস্টারি করা হয়। আবার পারিবারিক রীতি অনুসারে 'শুভদিন' দেখিয়াও বিবাহের দিন ধার্য করা হয় (১১ বৈশাখ ১৩৪৩)। আশ্চর্যের বিষয়, যে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং 'তিন আইন' অনুসারে বিবাহের বিরোধী ছিলেন এবং 'দিন-দেখা' প্রভৃতি পঞ্জিকা দেখা ধর্মকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করিয়া আসিয়াছেন, আজ তাঁহাকে অসহায়ভাবে এসব মানিয়া লইতে হইল।' নন্দিতার বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বর এলেন সুসজ্জিত হাতি চড়ে। অতি সুন্দর করে সাজিয়ে মালকারা কন্যা সম্প্রদান করলেন মীরা। বিয়ে দেন পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন। কবি তাঁদের উপহার দিলেন 'পত্রপুট', নবজীবনের মাধুর্য থাকবে যার পাতায় পাতায় ভরে।

কবির রোগশয্যায় নন্দিতার আর এক রূপ সকলের চোখে পড়ল। দারুণ অসুখের সময় নন্দিতা অন্যান্য শুশ্রূষাকারিণীদের সঙ্গে সযত্নে সেবা করেছেন কবির। প্রতিদিন সকাল থেকে বেলা বারোটা পর্যন্ত একনাগাড়ে সেবা করতেন নন্দিতা। সঙ্গে থাকতেন অমিতা। তাঁর মনে হত, 'সেবাশুশ্রূষা করবার ও পরিশ্রম করবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল নন্দিতার। কবি সেই সেবার মধ্যে পেয়েছেন সান্ত্বনা:

দিদিমণি—

অফুরান সান্ত্বনার খনি।
কোন ক্লান্তি কোন ক্লেশ
মুখে চিহ্ন দেয় নাই লেশ।
কোন ভয় কোন ঘৃণা কোন কাজে কিছুমাত্র গ্লানি
সেবার মাধুর্যে ছায়া নাহি দেয় আনি।'

এই জেলাও একদিন মুখরোল।

এর পরে নন্দিতা জড়িয়ে পড়লেন নানা কাজে। ১৯৪২ সালে সারা ভারত জুড়ে শুরু হয়েছিল ভারত ছাড়ো আন্দোলন। কৃষ্ণ ও নন্দিতা দুজনেই যোগ দিলেন তাতে। স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীসমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছিল সবচেয়ে বেশি। প্রতিটি পরিবারের শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে অসংখ্য নারী প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে এগিয়ে এসেছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে বাঙালি নারীসমাজের পূর্ণমুক্তি ঘটেছে এই বিপ্লবকে কেন্দ্র করেই। চিরলাঞ্ছিত, অপমানিত নারীদের মনে স্বাধীনতার বাণী এত সাড়া জাগিয়েছিল কেন কে জানে? নন্দিতাও কবির মৃত্যুর পরে মহাত্মাজির আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। রাজনীতির সঙ্গে যোগ ছিল নন্দিতার জ্যাঠতুতো বোন অরুণা গঙ্গোপাধ্যায়ের। পরে যিনি অরুণা আসফ আলি নামে পরিচিত হন। এ সময় সক্রিয় রাজনীতির উন্মাদনা কম। শান্তি-সুনীতি-বীণা-কল্পনা-প্রীতিলতার সাহসিক কার্যকলাপ হয়ে উঠেছে গল্প। অগাস্ট বিপ্লবে বহু নারী বিপ্লবে যোগ দিয়েছেন। অনেকের সঙ্গে আন্দোলনে যোগ দিয়ে নন্দিতাও কারাবরণ করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শ্রীমতী, রানী চন্দ ও আরও অনেকে। নন্দিতার কারাদণ্ড হল ছ'মাসের জন্যে। জেলখানা ফটকে তিনি সঙ্গিনী হিসেবে পেলেন আরও কয়েকজনকে। রানী চন্দ লিখেছেন, সেখানে নন্দিতা মাঝে মাঝে গাইতেন, 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে—' শোনাতেন অন্যান্য কয়েদিদের গান। মেয়েরা ঠিক করলেন, ২৬ জানুয়ারি পতাকা তুলতে হবে জেলের মধ্যে, নন্দিতারা ছিলেন রাজশাহী জেলে। কারও বিছানার চাদরের কোণ কেটে, কারও গামছা হলুদ জলে ছুপিয়ে, কারও শাড়ির আঁচলা ছিঁড়ে তিন টুকরো খদ্দর দিয়ে অতি সন্তর্পণে পতাকা সেলাই হল, ভোরবেলা নিমগাছের ডালে লাগানোও হল। নন্দিতা ও মায়া জেলখানার ভোরের আকাশ কাঁপিয়ে গান ধরেছিলেন, 'জয় হোক, জয় হোক, নব অরুণোদয়'। জেল থেকে তিনি যেসব চিঠি লিখতেন তাতে দেখা যায়, ভাষার ওপরেও নন্দিতার আশ্চর্য দখল রয়েছে।

মায়ের মতোই আত্মপ্রচারবিমুখ নন্দিতার অধিকাংশ গুণই ঢাকা পড়ে আছে। সব কিছুতেই তিনি নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছেন। নাহলে তাঁর সম্বন্ধে তথ্য এত কম পাওয়া যাবে কেন? কাজ তো তিনি কম করেননি। শান্তিনিকেতনে থাকার সময় তিনি শিখেছিলেন বাতিক, চামড়ার কাজ, কাপড়ের ওপর ব্লক প্রিন্টিং। ছবি আঁকা শিখেছিলেন নন্দলাল বসু, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, রামকিংকর প্রমুখ শিল্পীদের কাছে। এখনও চিনা ভবনের দেওয়ালে একটা ফ্রেসকো পেন্টিং তাঁর শিল্প-দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে। গানের ক্ষেত্রেও নন্দিতা আত্মপ্রকাশ করেননি। একটিমাত্র রেকর্ডের সমবেত সংগীতে ধরা আছে নন্দিতার কণ্ঠ। গান দুটি হল 'জনগণমন অধিনায়ক' ও 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে'। নন্দিতার বাকি তিনজন সহশিল্পী ছিলেন শান্তিদেব ঘোষ, সুধীন দত্ত ও অমলা দত্ত। ভারত যেদিন স্বাধীন হয় সেদিন মধ্যরাতে সুচেতা কৃপালনীর সঙ্গে নন্দিতাও গেয়েছিলেন ভারতের জাতীয় সংগীত। এতে বোঝা যায়, নন্দিতার আত্মপ্রচারবিমুখতা কুণ্ঠার গুণ্ঠনে ঢাকা নয়। এ তাঁর স্বাভাবিক নিস্পৃহতা। নয়তো যখন যেখানে ডাক পড়েছে দেশে কিংবা বিদেশে, নন্দিতা এগিয়ে এসেছেন হাসিমুখে। ১৯৫০ সালে মৃণালিনী সরাভাইয়ের নৃত্যদলের সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রা এবং ১৯৬০ সালে

সোভিয়েত সরকারের আমন্ত্রণে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে সেখানে গিয়ে Kuibyshev on the Volga ব্যালেতে 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্য শিখিয়ে আসা এমনি দুটি ঘটনা। অবশ্য ব্রাজিলের ভারতীয় দূতাবাসে সাংস্কৃতিক মন্ত্রকের অধিকর্তা হয়েছিলেন কৃষ্ণ কৃপালনী। নন্দিতা স্বামীকে নানাভাবে সাহায্য করেন; তা ছাড়া ব্রাজিলের সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গেও পরিচিত হন এবং সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর দক্ষিণ আমেরিকা সফরের বিষয়ে কিছু লেখেন। '...রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকের অনুবাদ করলেন Cecilia meireless এবং তাঁরই উৎসাহে নাটকটি অভিনীত হল আমরা থাকতে। ...লেখিকার কনিষ্ঠা কন্যা Maria সাজলেন অমল। অভিনয় দেখে আমার কেবল মনে হচ্ছিল রবীন্দ্রনাথ নিজে দেখলে কত খুশি হতেন।' নন্দিতার লেখার হাত ভাল হলেও তিনি বিশেষ লিখতেন না। কিন্তু চিঠিপত্র এবং সফর কাহিনীতে তাঁর কলমের শক্তির পরিচয় ছড়িয়ে আছে। নন্দিতার লেখা একটি গল্পে দেখা গিয়েছে তিনি যখন জেলে ছিলেন সেই সময়কার একটি ঘটনা নিয়ে লেখা হলেও সে যেন 'শাস্তি' গল্পের আর এক রূপ। নন্দিতার গল্পটির নাম 'নির্দোষ'। লালী কুড়ি বছরের মেয়াদ নিয়ে জেলে এসেছে। সঙ্গে ছ'বছরের মেয়ে জিয়া। বিচিত্র তার কাহিনী। নিষ্ঠুর স্বামী তার প্রেমিকাকে খুন করেছে ভেবে সে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে খুনের দায়। আসলে খুন করেছিল নিহত স্ত্রীলোকটির স্বামী। লালী বলেছে, '...তখন কে যেন চুপি চুপি আমার কানে কানে বলে দিলে, বল তুই খুন করেছিস। নইলে তোর স্বামীর ফাঁসি হবে।' উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'খুন করেছি আমি। আমার স্বামীকে ছেড়ে দাও।' ঘরভরা লোক অবাক হয়ে গেল। আমার হল কুড়ি বছরের সাজা। ...জিয়ার বাপ আমায় বললে, 'আমায় মাপ করিস। আমার জন্যে সাজা নিলি কিন্তু খুন আমি করিনি।' এখানেই গল্প শেষ হয়েছে।

মা ও বাবাকে সাহায্য করার জন্য নন্দিতা চাকরি নিয়েছিলেন দিল্লি ক্লথ মিলসে, তার সঙ্গে একটা স্কুলে নাচ শেখাতেন। নন্দিতার জীবনের এই দিকটা প্রায় অজানাই রয়ে গিয়েছে। বাবার মৃত্যুর পর তিনি ভেবেছিলেন চাকরি ছেড়ে দেবেন কিন্তু মায়ের কথা ভেবে পারেননি। রমা চক্রবর্তীকে লিখেছিলেন, '...তবে এটাও ঠিক যে, মেয়েদের স্বাবলম্বী হওয়া খুব প্রয়োজন। মা, বাপ, ভাই, বোন, স্বামী কারওর প্রতি ভরসা না করে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারলে অনেক সহজ হয় জীবনযাত্রা। আমার বাস্তবিকই কোনও Qualification নেই, তবু যে চাকরি পেয়েছি এ আমার বিশেষ ভাগ্য।'

বাস্তব জগতের সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের ভাবনাচিন্তাও যে কতটা বদলে যাচ্ছিল, এই চিঠিটাই তার প্রমাণ। যাঁরা মনে করেছেন, সময়ের সঙ্গে, নারীপ্রগতির সঙ্গে এ বাড়ির মেয়েরা পরে আর যোগ রাখতে পারেননি, তা ঠিক নয়। পরিস্থিতি, পারিবারিক নিয়ম, আভিজাত্যের চাপ, শিক্ষার পরিমণ্ডল অনেক সময়ই ঠাকুরবাড়িকে, তার সদস্যদের প্রচলিত ধারায় মিশে যেতে দেয়নি। কিন্তু ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা আধুনিকতম পরিস্থিতির কথা যে ভাবতে শুরু করেছিলেন, নন্দিতার চিঠিই তার সাক্ষী। বিশাল পরিবারের সদস্যরা ছড়িয়ে পড়েছেন বলে এই পরিবর্তনটিকে প্রত্যক্ষ করাও শক্ত। শান্তিনিকেতনের পরিবর্তন নন্দিতাকে আহত করেছিল, '...কত মহৎ আদর্শে গড়া আশ্রম, বছরের পর বছর আপ্রাণ পরিশ্রম করেছিলেন দাদামশায়, তাঁর সেই প্রাণ দিয়ে গড়া জিনিস আমাদেরই চোখের সামনে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এ কি কম দুঃখের কথা। আমার মনে হয় আমরা সবাই দোষী। আজকাল আদর্শবাদী বড় কম দেখতে পাই। যাঁরা ছিলেন এককালে, তাঁরাও সে পথ থেকে বেঁকে গেছেন। সারাটা দেশে উপযুক্ত লোকও যে মেলে তা মনে হয় না। কয়েকদিন আগে মনে হচ্ছিল, সব ছেড়েছুড়ে আশ্রমে আমার উপরের ঘরটিতে বসে যা প্রাণ চায় তাই করি। স্বাধীনতা মানবজীবনে নেই। এ আমি খুব বিশ্বাস করি। কেউই স্বাধীন নয়। ও সব অত্যন্ত বাজে কথা।'

দুরারোগ্য ব্যাধি নিতান্ত অকালে নন্দিতাকে কেড়ে নিয়েছিল। হয়তো সেজন্যই নন্দিতার সব

কিছুই অসমাপ্ত অসমাপ্তই রয়ে গিয়েছে। নাচ, গান, আবৃত্তি, অভিনয়, লেখা, ভাস্কর্য কোনও কিছুই পরিণতি লাভ করল না। অন্যান্য অসমাপ্ত জিনিসের সঙ্গে আরও একটা জিনিস অসমাপ্ত রয়ে গেছে। সেটি হল একটি পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র। সম্ভবত 'চণ্ডালিকা'। নন্দিতা আগে মায়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন কিন্তু অর্থাভাবে ছবিটি সম্পূর্ণ হয়নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই প্রতিমূর্তি নিয়ে অনেক কিছু লিখেছেন। কিন্তু নন্দিতাকে নিয়ে এখনও পর্যন্ত স্বতন্ত্র কোনও কাজ হয়নি। অনেকেই কবি-দৌহিত্রী হিসেবে নন্দিতাকে খুব মনে রেখেছেন কিন্তু নন্দিতাকে স্বতন্ত্রভাবে দেখবার চেষ্টা করা হয়েছে খুব কম। কিন্তু আত্মীয়রূপে নন্দিতা যে মহামানবকে পেয়েছিলেন, তাঁর বিচিত্র সাহিত্য নন্দিতার একক ব্যক্তিত্বকে যেমন খানিকটা ঢেকে রেখেছিল তেমনি কয়েকটি দুর্লভ গুণেরও অধিকারী করে তুলেছিল। অপরিসীম রোগযন্ত্রণা নীরবে সহ্য করে তিনি সেদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন প্রকৃতপক্ষে সেদিনই ঠাকুরবাড়ির অঙ্গন থেকে মুছে গেল শেষ রবিরেখা।

এখানে নন্দিনী বা পুপের কথাও বলে নেওয়া যেতে পারে। তিনি ঠাকুরবাড়ির মেয়ে নন কিন্তু তাঁকে বুকে টেনে নিয়েই প্রতিমা মিটিয়েছেন মাতৃত্বের সাধ। নন্দিনীর বাবা চতুর্ভুজ দামোদর ছিলেন গুজরাতি ব্যবসায়ী। রবীন্দ্রভক্ত, সেই সূত্রেই শান্তিনিকেতনবাস। চিররুগ্ন স্ত্রী ও নবজাত শিশুকে নিয়ে তিনি যখন অত্যন্ত বিব্রত, তখন প্রতিমা মেয়েটিকে অসহায় দেখে বুকে টেনে নেন, আমি তখন অত্যন্ত অসুস্থ। বাঁচবার কোনও আশা ছিল না। আমার মা প্রতিমাদেবী আমাকে কোলে করে ... আগে আমার দাদামশায় রবীন্দ্রনাথের কাছে এনে আমাকে গ্রহণ করবার অনুমতি চেয়েছিলেন।' পরম সমাদরে পুপেরানি অধিষ্ঠিত হলেন উত্তরায়ণের ঘরে। রবীন্দ্রনাথ নাম দিলেন নন্দিনী। তিন বছর বয়স থেকেই শুরু হল তাঁর গল্প শোনা। নন্দিনীর মনোরঞ্জনের জন্যে কবি কখনও ছড়া বানিয়েছেন, কখনও গল্প শুনিয়েছেন। সেদিক থেকে রবীন্দ্রসাহিত্যে নন্দিনীর অবদান কম নয়। 'সে'-র গল্প, 'খাপছাড়া'র কবিতা অনেক কিছুরই সূচনা পুপেদিদির গল্প শোনার তাগিদে।

নন্দিনীর লেখার হাতটিও ভাল ছিল। পরিণত বয়সে তিনি লিখেছেন, 'পিতা পুত্রী' পিতা রবীন্দ্রনাথের কথা ছাড়াও তাতে রয়েছে দাদামশাই রবীন্দ্রনাথের কথা। একবার তাঁর রাগ করার গল্প নন্দিনী লিখেছেন নিজের ভাষায়, '...অমন রাগতে দাদামশাইকে আর দেখিনি। ঘটনাটি ঘটেছিল দাদামশাইয়ের চিকিৎসার সময় দাড়ি কেটে নেওয়ার জন্য। কলকাতা থেকে ডাক্তাররা এলেন দাদামশাইকে দেখতে। সেই ডাক্তারদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ নীলরতন সরকার, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ। দিনের বেলায় তাঁরা দাদামশাইকে দেখে তাঁর মাথা থেকে ঘাড় পর্যন্ত যন্ত্রণার সঠিক কারণ কি বুঝতে পারলেন না। তাঁরা ঠিক করলেন ঘুমের ট্যাবলেট দিয়ে দাদামশাইকে ঘুম পাড়িয়ে তাঁর দাড়ির ভিতরটা দেখতে হবে। সেইমতো দাদামশাইয়ের রাতের খাবারের সঙ্গে গোপনে ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়। তিনি ঘুমিয়ে পড়লে ডাক্তাররা তাঁর কানের কাছের চুল ও গালের কিছু অংশের দাড়ি কেটে তাঁকে ভাল করে পরীক্ষা করলেন ও ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু দাদামশাইয়ের দাড়ির ওই দশা করার পর তাঁরা আর শান্তিনিকেতনে থাকতে ভরসা পেলেন না। সেই রাতেই তাঁরা কলকাতা পাড়ি দিলেন। এদিকে ভোরে ঘুম থেকে উঠেই দাড়িতে হাত দিতে গিয়েই দাদামশাই টের পেলেন তাঁর দাড়িতে কিছু হয়েছে। তিনি আয়নাতে মুখ দেখে রাগে অগ্নিশর্মা। বনমালীদাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর দাড়ির এ দশা হল কী করে? বনমালীদা প্রায় কেঁদে ফেলে বলল, সে ঘুমিয়েছিল। সে এসব কিছু জানে না। নিয়মমতো ভোরবেলায় কফি খেতেন। কিন্তু সেদিন কিছু খেলেন না। বনমালীদা একবার বলতে গিয়ে ধমক খেল। দাদামশাই তখন আমার বাবাকে ডাকতে বললেন। বনমালীদা

একটু পরে ঘুরে এসে বললে, তিনি একটা জরুরি কাজে কোথায় বেরিয়েছেন। মামামশাই আর কোনও কথা বললেন না। চুপ করে বসে রইলেন। অনেকক্ষণ চুপচাপই কাটল। কথা বলতে এল তারপরই ধমক খেল। কেউ আর তাকে মামামশাইয়ের সামনে যেতে পারল না। তিনিও কিছু খান না। শেষ পর্যন্ত মা গিয়ে দাঁড়ালেন মামামশাইয়ের সামনে। বললেন, তিনি না খেলে এখানে তো কেউ খেতে পারবে না। মামামশাই তবু কোনও কথা বলেন না। শেষে মা আবার খাবার অনুরোধ জানাতে তিনি বললেন, কারও কি একটুও ভদ্রতাবোধ নেই। আমার বাড়িতে হাত দেবার আগে একবার কি জিজ্ঞেস করার দরকার ছিল না? রাগত গলায় এই কথাকটি বলেছিলেন তিনি। তারপর আবার খেয়েছিলেন। কিন্তু মারা যাবার আগে মামামশাইয়ের মুখোমুখি হননি।' মনে হয় যেন ছবি দেখছি। নন্দিনীর লিখনের ধাঁচটি এমন মনে গেঁথেছিল যে তিনি পরিণত বয়সে মামামশাইয়ের কথা বলতে গিয়ে এই অসাধারণ ছবিটি উপহার দিয়েছেন। স্বামী পুত্র পরিবার নিয়ে জমজমাট সংসার থেকে সময় বাঁচিয়ে তিনি যদি এমন আরও কিছু দুর্লভ ছবি উপহার দিতেন তাহলে আরও ভাল লাগত। কিন্তু নন্দিনীর আত্মপ্রকাশে বিমুখ ছিলেন। লিখেছেনও কম।

আবার ফিরে যেতে হবে পাঁচ নম্বর বাড়িতে। শুধু তাই নয়, পিছিয়ে যেতে হবে সময়কে। সৌদামিনীর অনেক পৌত্রী। গগনেন্দ্রর তিন মেয়ে সুনন্দিনী, সুশিমা ও সুজাতা, সমরেন্দ্রর পাঁচ মেয়ে মালবিকা, মালবিকা, কমলা, সুপ্রিয়া ও অনিমা, অবনীন্দ্রর জীবিত তিন মেয়ে উমা, করুণা ও সুরূপা। সবাই সমান রূপবতী না হলেও সুগৃহিণী হবার সব শিক্ষা সৌদামিনী নাতনিদের দিয়েছিলেন। তা ছাড়া এই পরিবারে, আরও অন্যান্য ঠাকুরবাড়ির মতো মেয়েদের সুশিক্ষিত করে তোলা হলেও শান্তশ্রীদের আলোয় নিয়ে আসা হত না বললেই চলে। এঁদের মধ্যে সবার চেয়ে বড় মেয়ে হলেন অবন ঠাকুরের মেয়ে উমা। তাঁর চেয়ে কয়েক মাসের ছোট সুনন্দিনী। বাড়িতেই তাঁরা লেখাপড়া শিখতেন। সেলাই শেখাতে আসতেন এক ব্রাহ্ম মহিলা, ইন্দুবালাদেবী। তিনি পড়াতেনও। ছোটরা পড়তেন মাস্টারমশাইয়ের কাছে। উমা অবশ্য বেথুন স্কুলে পড়েছিলেন। ক্লাসে ওঠার পরীক্ষায় ভাল ফল হওয়ায় একটা পুরস্কার তাঁর পাওনা হয়েছিল কিন্তু দশ বছর বয়সে পাশের বাড়ির নির্মল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়ায় দিদিমার আদেশে আর স্কুলে পুরস্কার নিতে যাওয়া হয়নি। দশ বছরের বালিকার এই দুঃখ সেদিন কেউ বুঝতেও চায়নি। উমা এ দুঃখ মনে চেপে রেখেছিলেন আমৃত্যু পর্যন্ত। মানুষের মনে কখন যে কোন ঘটনা দাগ কাটে তা কেউ জানে না।

ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য মেয়েদের মতো উমারও অনেক গুণ ছিল। ঘরোয়া নাটকে মাঝে মাঝে অভিনয় করা ছাড়াও দুবার তিনি বেশ বড়মাপের অভিনয় করেছিলেন। একবার 'আলিবাবা' নাটকের মর্জিনা, আর একবার 'বিরহে'র গোলাপি। রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন সে নাটক। খুশি হয়ে বলেছিলেন তাঁর সঙ্গে জাভায় যেতে। শ্বশুরবাড়ি থেকে আপত্তি ওঠেনি, বাধা দিয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। বলেছিলেন, 'উমা। ও কি পারবে অত ধকল সইতে?' কাজেই যাওয়া হল না। অধিকাংশ মানুষই মনে করতেন, মেয়েরা বেশি কষ্ট সইতে পারে না। বাইরের কাজের ধকল বেশি বলেই তাঁরা মেয়েদের ঘরবন্দি করে রাখতেন। চেষ্টা করতেন তাদের সুখে রাখতে, আরামের উষ্ণতায় ভরে রাখতে। সব সময় তা মেয়েদের পক্ষে সুখের হয়নি, সম্মানেরও না। পরে খোঁটা খেতে হয়েছে দুর্বলতার জন্যে। আসলে সমাজটা যে এত শীঘ্র বদলে যাবে সে কথা সেদিন কেউ বুঝতে পারেনি। পাঁচ নম্বর বাড়িতে তখনও ছিল পুরনো দিনের রেশ।

সেলাইয়ে উমার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি কাঁপা কাঁপা হাতে তুলেছেন সুতোর নকশা। মাকড়সার জালের মতো সূক্ষ্ম আঁকিবুঁকিতে কাপড়ের ওপর ফুটি

উঠত লতা, পাতা, কলকা। এ সময় অনেক মেয়েই সেলাই জানত ও বিয়ের আগে নিয়ম করে সেলাই শিখত। বিয়ের পরেও ঘরে বসে নানারকম শিল্পচর্চা করে সিবন দক্ষতার পরিচয় দিত। আগের আমলে, সে ঠিক কত আগে জানি না, মনে হয় বিদেশিনী গভর্নেস বাঙালি বাড়িতে প্রবেশ করার আগে অভিজাত পরিবারের মেয়েরা সেলাই শিখতেন না। সাধারণ সমাজে নিশ্চয় সেলাইয়ের চল ছিল। গ্রামের মেয়েরা দক্ষ হাতে কাঁথা সেলাই করতেন। কাজেই বিবিমহলে সেলাই না করাই ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। আমাদের সমাজে গড়ে উঠেছিল নতুন নিষেধাজ্ঞা, সেলাই করা কাপড় পরে কোনও শুভকাজ হবে না। অনেক পরিবারে বধূদের শাড়ি ছিঁড়ে গেলে তাঁরা তা সেলাই করে পরতে পারতেন না। হয় দাসীদের দান করতে হত কিংবা কাঁথা সেলাই করিয়ে সেটি ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা হত। পূর্ববঙ্গের মেয়েরা নকশি কাঁথায় উজাড় করে দিতেন তাঁদের শিল্পসাধনা। এটি তাঁদের জীবিকা হয়ে উঠেছিল কিনা তা অবশ্য জানি না তবে কাঁথায় তাঁদের নাম লিখে রাখার ধরন দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না নকশি কাঁথা রচনা করে তাঁরা তৃপ্তি ও গর্ব অনুভব করতেন। ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা নানারকম সেলাই শিখলেও উমার আগে কেউ নকশি কাঁথা নিয়ে ভাবেননি। তার আরও একটা কারণ থাকতে পারে। কলকাতায় কাঁথার চল ছিল না, ছিল লেপ কিংবা বালাপোশ। উমারাও ছেলেবেলায় শীতের সন্ধ্যায় বালাপোশ মুড়ি দিয়ে বসে গল্প শুনতেন। কাঁথার সঙ্গে যে তাঁদের পরিচয় ছিল না তা নয়, যশোরের মেয়েরা বউ হয়ে আসতেন বলে তাঁদের অনেক আত্মীয়স্বজন পালে-পার্বণে এ বাড়িতে আসতেন। পূর্ববঙ্গের মেয়েরা নিয়ে আসতেন তাঁদের দক্ষ হাতের কাজ। নানারকম খাবার, পুতুল এবং আরও অনেক কিছু। অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন নকশি কাঁথার সমঝদার, যে কোনও শিল্পকর্মই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করত। আর উমা শিল্পী-পিতার শিল্পী মেয়ে। তাঁর সিবন দক্ষতা অবন ঠাকুরের মনে উৎসাহ জাগাত। তিনি উমাকে এঁকে দিতেন নানান ধরনের নকশা, সুতোর রঙের সঙ্গে রং মিলিয়ে। লোকশিল্পের পুনরুজ্জীবনের সময় সেটা। অবনীন্দ্রনাথ নানারকম কাঁথার নকশা, পাড় ও ফোঁড়নের নমুনা সংগ্রহ করে আনতেন। উমা কাঁথায় তুলতেন সেই সব বয়কা, বাঁশপাতা, তেরসি-র নকশা। এখনও সেসব কাঁথা তাঁর পরিবারের দু-একজনের কাছে রয়েছে। অনেক নতুন স্টিচেরও উদ্ভাবক তিনি। তবে এসব তো লিখে রাখেননি। তাই ছড়িয়ে পড়েনি সবার মধ্যে। কয়েকজন মহিলা কিন্তু সেলাইয়ের বই লিখেছিলেন। সুশীলাদেবীর 'আদর্শ সূচীশিল্প', কাননবালাদেবীর 'আদর্শ সূচীচিত্র', অপরাজিতাদেবীর 'সূচীচিত্র শিক্ষা', গায়ত্রী দেবীর 'সূচী লিখন', 'সুলেখা দেবীর 'সূচিরেখা' অনুজাদেবীর 'বুনুনি' ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলির কোনওটাই নকশি কাঁথার নকশা তোলার বই নয়।

লোকশিল্পের প্রতি ভালবাসার টানেই বোধহয় উমা তাঁর বাবার লেখা 'ক্ষীরের পুতুলে'র নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। 'ক্ষীরের পুতুল' আসলে একটি রূপকথা, অবনীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন কাকিমা মৃণালিনীর রূপকথা সংগ্রহ থেকে। সবাই তাঁর নাটকের প্রশংসা করলেও উমা পরে আর এ নিয়ে ভাবনাচিন্তা করেননি। বৃদ্ধ বয়সে, হাতে যখন অনেক সময়, ক্ষীণদৃষ্টিতে আর কাঁথা সেলাই করা যায় না, তখন উমা স্মৃতিকথা লেখা শুরু করেন। নিজের আত্মকথা নয়, বাবার কথা। অবন ঠাকুরের কথা। উমার বইয়ের নামও 'বাবার কথা'। অবনীন্দ্রনাথকে এত কাছে থেকে দেখার সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। সেইসঙ্গে গাঁথা হয়ে গিয়েছে নিজের কথা, পাঁচ নং বাড়ির কথা। ভেবেচিন্তে লেখা নয়, পুরনো কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে হয়েছিল লিখে রাখার কথা। 'আমার বাবা ছবি আঁকতেন, আমি লিখব পুরনো দেখা ছবির কথা।'

'...আমি তখন খুব ছোট্ট। ভোর হলেই দেখতুম বাবা দোতলায় নেমে আসতেন। জোড়াসাঁকোর বাড়ির কথা বলছি। বাবা, মা, আমরা ভাই-বোন সকলে তখন তেতলায় থাকতুম। বাবা মুখ ধুয়ে বাগানে বেড়াতেন। ...গোলাকার বাগানে খানিক পায়চারি করে লোহার বেঞ্চে বসতেন। আমিও খুব ভোরে উঠে গুপীদাসীর সঙ্গে যেতুম বাগানে। ...নানারকম গল্প হত

পিতাপুত্রীতে।

'তেতলার ঘরের জানলা খোলা হলে বাবা বলতেন, 'যাও দেখি তোমার মা উঠেছেন, দুর্গানাম লেখোগে।' মায়ের পুজোর কাছে বসে আলতা দিয়ে শরের কলমে করে দুর্গানাম লিখতে হত একপাতা রোজ।...

'দুর্গানাম লেখার পর আমাদের দুধ খাবার পালা। সে ভার থাকত দিদিমার। ...দোতলার বারান্দায় একটা তক্তায় তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসতেন দিদিমা। তাঁর পাশে ছোট পিসি। বল্লভ গোয়ালা দুধ আনত, সোনার মতো চকচকে পিতলের তিন চারটে কেঁড়েতে করে। রুপোর মতো ঝকঝকে একটা বড় কড়া, তাতে থাকত ওইরকম ঝকঝকে একটা ডাবু হাতা, তাতে করে দুধ মেপে নিয়ে জ্বাল দিয়ে আনত শ্রীনাথ চাকর। ঢালা-উপুড় করে ফেনা বাটিয়ে বাটিতে বাটিতে দুধ দিত আমাদের। অবিনাশ নিয়ে আসত বাবা ও জ্যাঠামশায়ের রুপোর বাটি আর পিরিচ। দিদিমা নিজের হাতে বাটিভরে দিতেন ফেনাসমেত দুধ বাহিরে পাঠিয়ে। বাবা ও জ্যাঠামশাইরা তখন এসে বসেছেন দক্ষিণ দিককার বারান্দায়। অবিনাশের পিছু পিছু আমিও হাজির হতুম সেখানে। বাবা খেতেন দুধের বাটিটা, দুই হাতে অঞ্জলি করে ধরে। এই অভ্যাস ছিল বাবার বরাবর। ঘটিতে জল খেতেন অঞ্জলি করে ধরে।...

'বেলা আটটার সময় নবীন বাবুর্চি রুটি টোস্ট, ডিমসেদ্ধ ট্রেতে করে এনে ধরে দিত তিন বাবুর সামনে। আগে তাঁরা কাকেদের খাওয়াতেন, তারপর নিজেরা খেতেন। বিশ্বম্ভর বেহারা তামাক দিয়ে যেত তিন বাবুকে।

'এরপর কাজের পালা। ...হয় লেখা, নয় আঁকা, এই দুয়ের একটা চলত প্রায় দুপুর পর্যন্ত।

'বেলা বারোটা নাগাদ স্নান সেরে তিন ভায়ে খেতে বসতেন দিদিমার সামনে। খাওয়া শেষ হলে বাহিরে চলে যেতেন। পাথরে বাঁধানো ছোট ঘরটায় তাঁরা শুতেন। গরমকালে বেহারা টানত টানা পাখা। পরে যখন সেটা ছেলেদের পড়বার ঘর হল তখন তাঁরা শুতেন লাইব্রেরি ঘরে। বেলা তিনটের সময় নীলু চাকর ডাব এনে খাইয়ে যেত তিন বাবুকে। চারটের সময় বাবা যেতেন তেতলায় দিদিমার হলঘরে। দিদিমার কাছ থেকে পান খেয়ে একটু গল্প করে আমার মায়ের ঘরে আসতেন। সেই সময় এসরাজ বাজিয়ে গান শেখাতেন আমাকে। পাঁচটার সময় নীচের বারান্দায় নেমে আসতেন। দিদিমাও তখন এসে বসতেন ছোট পিসির বারান্দায়। সাদা পাথরে করে নোনতা খাবার, ফল, মিষ্টি সাজিয়ে বড়মা পাঠিয়ে দিতেন অবিনাশ আর নীলুকে দিয়ে—ওঁদের বিকেলের জলখাবার। জলযোগের পর সকলে নেমে যেতেন বাগানে। সেখানে জড়ো হত সব ছেলেমেয়ে আর জুটতেন এবাড়ির-ওবাড়ির বাবুরা।...

'সন্ধ্যাবেলা গরমিকালে চাঁদনি রাতে ছাদে বসা হত দিদিমার কাছে। গল্প হত কত রকমের। কোনও কোনওদিন বা বড়বাড়ির তেতলার ছাদে বসত আসর। রবিদাদার গান আর বাবার এসরাজ। ...সন্ধ্যাবেলা দিদিমার মহলে সকলকেই একবার বসতে হত, তারপর যেতুম বাবার ঘরে। তাঁর কাছে গল্প শোনা ছিল আমাদের নিত্যকালের জরুরি কাজ।...

'শীতের সময় সন্ধ্যাবেলা ভাইবোনরা সবাই মিলে বালাপোশ মুড়ি দিয়ে জমিয়ে গল্প শুনতুম সিমলের দিদির কাছে। বাবাও দিব্যি বালাপোশ মুড়ি দিয়ে বসে যেতেন আমাদের সেই গল্প শোনার আসরে।

'রাত্রি নটার সময় ডাক আসত 'ডিনারের'। ডিনার খাওয়া সেরে বাইরের ঘরে বসে তামাক খেতেন তাঁরা। তখনকার দিনে অন্দরে আদৌ তামাক খাওয়ার রেওয়াজ ছিল না। তামাক খাওয়ার পর উপরে উঠে যেতেন যে যার শোবার ঘরে।

'এই ছিল বাবার প্রতিদিনের কাজের তালিকা।—বাঁধা রুটিন। তাঁর জীবনের বেশিরভাগ দিনগুলো কেটেছে এই নিয়মে।'

দীর্ঘ হলেও উদ্ধৃতি দেবার কারণ হল, হাতের নাগালে না থাকা এই বইটি থেকে ছবির মতো

পাঁচ নং বাড়িটিকে খুঁজে পাওয়া যায়। একেই বলা যায় ছবি লেখা। আরও কত ছবি সেখানে। কোনটা ছেড়ে কোনটা দেখি। শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের দুঃখের দু-একটা ছবি ধরা আছে নিপুণভাবে, '...বাবা তাঁর সাংসারিক জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছেন কিন্তু ছবি আঁকার জীবনেও তাঁর দুঃখের অন্ত ছিল না। তা আমি স্বচক্ষে দেখেছি। বাবা ছবি আঁকছেন, আমি পিছনে দাঁড়িয়ে। ছবিখানি জলে ডুবিয়ে চ্যাপ্টা তুলি দিয়ে মুছে রোদে দিলেন। রোদ থেকে যখন সেটি তুলে আনলেন, তখন তাঁর মুখ বিষণ্ণ। বললেন, 'যে রং মনে এসেছিল, হাতে তা বের করতে পারলুম না।' দুঃখ যে কতখানি পেয়েছেন তাঁর কথাতেই বুঝতে পারলুম।' আর একদিনের কথা। একদিন উমার স্বামীর একখানা ছবি আঁকতে বসলেন। প্রথম দিন স্কেচটা তৈরি করে তাঁকে বলে রাখলেন পরদিন সকালেও ঠিক ওইভাবে বসতে—রং দিয়ে ছবি শেষ করবেন।

'পরদিন সকালে মা আমাদের নিয়ে গেলেন নিউ মার্কেটে। ওঁকেও যেতে হয়েছিল। মা বললেন, মার্কেট থেকে ফিরে সিটিং দিলেই হবে।

'কেনাকাটা করে ফিরে এসে দেখি বাবা গুম হয়ে বসে আছেন, তাঁর আঁকবার আসনে। মাকে তো খুব বকলেন। বললেন, আমি সারারাত ধরে ভেবেছি কোনখানে কোন রং দেব। আজ সকালে দেখি সব উধাও।

'আমরা সকলে কত বললুম আঁকবার জন্যে। কিন্তু তিনি বললেন, আর হয় না। ক্ষণও চলে গেছে। মনও চলে গেছে।

'আর সে ছবি আঁকলেন না। এখন মনে হয় কেন সেদিন তাঁকে বাজারে নিয়ে গেলুম। তা না হলে তিনি চলে গেলেও বাবার হাতে আঁকা তাঁর ছবিখানি আজও থাকত।'

কোনও বিখ্যাত মানুষকে আমরা যখন আপনজনের দৃষ্টি দিয়ে দেখি, নতুন করে আবিষ্কার করি। রবীন্দ্রনাথের সংসারে সোনার বোতাম নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে মতান্তর, রান্নার পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বাসরঘরে গান শোনানো, কত খুঁটিনাটি ধরা পড়েছিল হেমলতার চোখে এবং তিনি তা লিখে রেখে মাঝে মাঝে কবির বিরক্তি কিংবা অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠলেও নির্দ্বিধায় বলা যায়, এসব ছোটখাটো ঘটনা ধরা পড়ত না কোনও পুরুষ লেখকের চোখে। উমার আঁকা অবন ঠাকুরের ছবিতেও পাওয়া যাবে সেই রম্য ব্যক্তিত্বর স্বাদ। কাকা সোনার বোতাম পরতে চাননি, গুপাল পাথর পরেছেন দায়ে পড়ে। ভাইপোও কম যান না। তিনি জল খেতেন কাঁসার ঘটিতে। সাবিত্রী ব্রত উদ্‌যাপন উপলক্ষে স্ত্রী সুহাসিনী তাঁকে একটি রুপোর ঘটি দিলেন। উমা লিখছেন, 'বাবা কিছুতেই সে ঘটিতে জল খাবেন না। আমি তাই শুনে বললুম, মা দুঃখ পাবেন। তুমি কিছুদিন জল খাও, তারপর আবার তুলে রেখে দিও।'

'মা মারা যাবার পর বাবা বললেন, 'ও ঘটি তোলো। চোর ডাকাতে লুটে নেবে। আমি সব সময় ও ঘটি সামলাতে পারব না।' তারপর আর কখনও সে ঘটিতে জল খাননি।'

এখানেই মেয়েদের লেখা স্মৃতিকথার সার্থকতা। এমন ঘরোয়া ছবি আঁকার ক্ষমতা মেয়েদেরই আছে। তারা পায় বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর স্বাদ, স্মৃতির মণিকোঠায় তা লুকিয়ে রাখে শুক্তির মধ্যে যেমন লুকিয়ে থাকে মুক্তো।

স্বামীর মৃত্যুর পর আকস্মিক শোকের ধাক্কায় বিহ্বল হয়ে উমা ফিরে গিয়েছিলেন স্নেহময় পিতার কাছে। অবনীন্দ্রনাথ তখন থাকেন গুপ্তনিবাসে। 'বাবার কাছে গেলুম। বাবা বললেন, 'এসেছ, বসো। এখানে থাকবে?' আমি বললুম, 'হ্যাঁ।'

'বাবা সেই স্নেহমাখা স্বরে ধীরে ধীরে বললেন, 'তা বেশ, থাকো দিনকতক। সংসার ছেড়ো না। এই দেখো, তোমার মা যখন মারা গেলেন, আমি শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলুম। থাকতে পারলুম কি? আবার ফিরে এলুম।' তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বললেন, সবই মিথ্যে কিন্তু মৃত্যু সত্যি। মানুষ মরলে তার আবার জন্ম হবে কিনা ঠিক নেই, কিন্তু জন্মালে যে মরতে হবে এটা সত্যি।'

'বাবার কথা' লেখার পর উমা ভেবেছিলেন নিজের কথা লিখবেন। যদি লিখতেন, সেও হয়তো হয়ে উঠত আর একখানি অসামান্য ছবির বই। জানা যেত কত অজানা কথা। একটি নারীজীবনের চাওয়া-পাওয়া, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার কথকতা চিরকালের মতো হারিয়ে গেল কালের প্রবাহে।

উমার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বোনেদের কথাও সেরে নেওয়া যেতে পারে। পাঁচ নম্বরে বয়সের দিক দিয়ে উমার পরেই নাম করা যায় সুনন্দিনীর। গগনেন্দ্রনাথের বড় মেয়ে। প্রভাতনাথের সঙ্গে তাঁর বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছিল বলতে গেলে জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই। ঠাকুরবাড়িতে, শুধু ঠাকুরবাড়ি কেন সেকালের অনেক পরিবারেই এভাবে ছেলেমেয়ের বিয়ে ঠিক করে রাখতেন অভিভাবকেরা। তা ছাড়া সুনন্দিনীর বিয়ে স্থির হয়েছিল আত্মীয়তার সূত্র ধরে। যখন তাঁর মাত্র সাত দিন বয়স তখনই বরের পিসি সুরথসুন্দরী সম্বন্ধ নিয়ে আসেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির পাশেই সুনন্দিনীর শ্বশুরবাড়ি। দ্বারকানাথ ঠাকুরের দিদি রাসবিলাসীর বিয়ে হয়েছিল এই চাটুজ্জে পরিবারে। পাঁচ ছয় পুরুষ কেটে গিয়েছে। আবার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির মেয়ে গেলেন সেই বাড়িতে। সুনন্দিনীর শাশুড়ি মোহিতকুমারীও ছিলেন ঠাকুরবাড়ির মেয়ে, পাথুরিয়াঘাটার অতীন্দ্রনন্দন ঠাকুরের বড় মেয়ে, অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল তাঁরও। শেষ বয়সে সন্ন্যাসিনী হয়ে সাধু মা নামে পরিচিত হন। সুনন্দিনী নিজে অবশ্য কিছু লেখেননি, তবে তাঁর শাশুড়ি একটি আত্মকথা লিখেছিলেন, তাতে অনেক খবর পাওয়া যায়। সুনন্দিনী ছিলেন চঞ্চল, দুষ্টু বুদ্ধিতে সেরা। দাদাদের পরামর্শে একবার ঘুমন্ত পণ্ডিতমশাইয়ের টিকি কেটে দিলে ঠাকুরমা সৌদামিনী বললেন, 'অনেক পড়াশুনো হয়েছে, এবার বিয়ে দিয়ে দাও।'

খুব ধুমধাম করে বিয়ে হল। উমার বয়স কয়েক মাস বেশি হলেও সুনন্দিনীরই আগে বিয়ে হল। দুই বোনেরই বিয়ে হল দ্বারকানাথ ঠাকুরের দুই ভাগনের বংশে, থাকতেনও পাশাপাশি দুই বাড়িতে, মাঝে কেবল সিঙ্গি বাগানের গলি। বাপের বাড়ি থেকেই তাঁরা দেখতে পেতেন শ্বশুরবাড়ি কিংবা বলা যায় তার উলটোটা। গগনেন্দ্রনাথ বড় মেয়েকে গৌরীদান করেছিলেন। বিয়ের আসরে বরের জ্যাঠামশায় অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এসে বললেন, 'সেলাই করা কাপড় পরে তো মেয়ে সম্প্রদান হয় না।' অথচ সময় অনেকটাই এগিয়ে এসেছে। চাটুজ্জে বাড়ি তখনও কিছুটা গোঁড়া, অবরোধের অনুশাসনও বেশি। মোহিতকুমারী এক অন্তঃপুর থেকে আরেক অন্তঃপুরে এসেছিলেন, দু জায়গাতেই পর্দার কড়াকড়ি। তবু তিনি দেখেছিলেন, তাঁর বাপের বাড়িতে ঘেরাটোপে ঢাকা পালকি চেপে গঙ্গাস্নান করতে যাওয়া চলত, শ্বশুরবাড়িতে এসে দেখলেন, '...কেউ গঙ্গাস্নান করতে পায় না, মেয়েদের ঘোড়ার গাড়ি চড়া কি রেলগাড়ি চড়া এসব ছিল না।'

গগনেন্দ্রনাথ এ কথা শুনে রাগ করেননি। তিনি বলেছিলেন, 'দেখুন মেয়ের গায়ে কোনও সেলাই করা কাপড় নেই।' সত্যিই ছিল না, বরং এমন ধাঁচে মেয়েকে সাজানো হয়েছিল যে মেয়ের গায়ে যে কোনও জামা নেই তা বোঝা যায়নি। সমবেত সকলেই গগনেন্দ্রের শিল্পরুচি ও শাড়ি পরানোর ধরনটির প্রশংসা করলেন। মেয়ে প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাবে। গগনেন্দ্র শিল্পীকে দিয়ে মেয়ের একটি ছবি আঁকিয়ে রাখলেন—সেই কেতায় শাড়ি পরা, হাতে কাজললতা—অতি সুন্দর সেই ছবিটি।

বিয়ে উপলক্ষে মেয়ে মহলে তখনও আসত ঘেমটাওয়ালীরা। ব্রাহ্ম বলে মহর্ষি পরিবারে না এলেও ঠাকুরবাড়ির অন্য সব বাড়িতেই তারা যেত, বায়না নিত ও গান শুনিয়ে বকশিশ আদায় করত। তাদের নাম ছিল নগেন আর কুসুম। পূর্ণিমা লিখেছেন, 'তিনতলার হলে... মেয়েরা সেজেগুজে পাঞ্জাবি আস্তিন বা রুমাল আস্তিনের জ্যাকেট পরে ছোট ছোট পালকের হাতপাখা

নেচে আসর জমাতেন নগণী কুলমীর ও নাচওয়ালীদের কথায় সেখানে পরীর হাট বসে যেত।'

এসব বর্ণনা পড়ে বোঝা যায়, বাইরের শিক্ষিত পরিবেশ তখনও ভিতরমহলে পুরোপুরি পৌঁছয়নি, নানা ফাঁক ফোকর দিয়ে তখনও বাইরের খোলা হাওয়া অন্দরে পৌঁছে দিচ্ছে মালিনী, নাপতিনী, খেমটা গায়িকা প্রভৃতি নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী সমাজ। ভদ্রসমাজে তাদের পুরোপুরি অপাঙ্‌ক্তেয় হতে আরও কিছুদিন সময় লেগেছিল।

এই ছায়াচ্ছন্ন মনের অধিকারিণীরাই মাঝে মাঝে অনর্থ ঘটিয়ে বসতেন। এই বিয়ের পরে একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। শুনিয়েছেন সুনন্দিনীর বোন পূর্ণিমা, তিনি আবার শুনেছিলেন সুনন্দিনীর শাশুড়ি মোহিতকুমারীর কাছে। গগনেন্দ্র বড়মেয়েকে দিয়েছেন একসেট হীরের গয়না। তাই নিয়ে হিংসা দেখে নিমন্ত্রিত মহিলারা তর্ক জুড়লেন। একদল বলেন, 'ও হিরে নয়, পোখরাজ।' আরেকদল বলেন, 'না, ও হিরেই।' তর্কের মীমাংসা হল বিচিত্রভাবে। ব্যাপারটা অনেকদূর গড়ায় আর বাজি রাখা হয় একশো টাকা। মেয়েরা দু-চারদিন বাদে পুরনো সরকার পাঠিয়ে সেই গয়না চেয়ে নিয়ে যান যাচাইয়ের জন্যে। বাক্সের ওপর কুক অ্যান্ড কেলভির নাম থাকায় সে দোকানেই পাঠানো হয়। তাঁরা আবার চোরাই মাল ভেবে গয়না আটক করলে বাড়ির কর্তার নাম জানানো হয়। সাহেব স্বয়ং তাঁদের বাড়িতে এসে কর্তার সঙ্গে দেখা করে বলেন, 'আমি গগন ঠাকুরের বাড়ির বিয়েতে এই গয়না তৈরি করে দিয়েছি, এ গয়না আপনি কোথায় পেলেন?' সাহেবকে দাঁড় করিয়ে কর্তা অন্তঃপুরে খোঁজ নিয়ে আসল খবর জেনে রসিদ লিখে সেই গয়না ছাড়িয়ে নিয়ে মোহিতকুমারীর কাছে পাঠিয়ে দেন ও মেয়েদের যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করেন। তারপর একশো টাকার খাবার তত্ত্ব পাঠানো হয়।

স্পষ্টভাবে না লিখলেও পূর্ণিমার লেখা পড়ে মনে হয়, তিনি ভেবেছিলেন, এই বিতর্কের সঙ্গে জড়িত ছিলেন ঠাকুরবাড়ি অর্থাৎ ছয় নম্বর বাড়ির মেয়েরা, 'যাঁরা আমাদের বাড়ির সঙ্গে যাওয়া-আসা রেখেছিলেন তাঁরা বলেন হিরে, আর যাঁরা যাতায়াত বন্ধ করেছিলেন তাঁরা বলেন পোখরাজ। পুরুষদের মধ্যে অবশ্য আসা-যাওয়া ছিল। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করায় আমাদের বাড়িতেও মেয়েরা আসতেন না।' আসলে ব্যাপারটা তা নয়। কোনও হিন্দু পরিবারেই বিয়ে, পইতে প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মদের নিমন্ত্রণ করা হত না, পঙ্‌ক্তি ভোজনে অসুবিধে হত বলে। সে কথা পূর্ণিমাই অন্যত্র জানিয়েছেন। এই অনুষ্ঠানেও মহর্ষি পরিবারের মেয়েরা অনুপস্থিত। কাজেই অন্য কোনও পরিবার থেকে হয়তো এ কথা উঠেছিল, পরের অধ্যায়ে পূর্ণিমা লিখেছেন। তখন দেবেন্দ্রনাথের পরিবার ব্রাহ্ম হয়ে যাওয়ায় আমাদের বাড়ির সঙ্গেও পাথুরিয়াঘাটার বাড়ির (দর্পনারায়ণ ঠাকুরের বংশ) যাওয়া-আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।' কাজেই বিশাল পরিবারের সবার কথা পূর্ণিমার পক্ষে না জানাই স্বাভাবিক। কিছু কিছু তথ্যগত প্রমাদ থাকলেও পূর্ণিমার লেখা 'ঠাকুরবাড়ির গগন ঠাকুর' পাঁচ নম্বর বাড়ির অন্দরমহলের সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ। তিনি সবার কথা, ভাবভঙ্গি এমনকী কণ্ঠস্বরটি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন ভাবীকালের পাঠকদের কাছে।

সুনন্দিনীর কথাও পূর্ণিমার লেখা থেকেই বেশি জানা যায়। সেইসঙ্গে বালিকা বধূর দুঃখটিও ফুটে উঠেছে, 'দিদি প্রথমটা অত বোঝেনি, ভেবেছিল বিয়েটা ছেলেখেলা হচ্ছে। ওর শ্বশুরবাড়ি আমাদের বাড়ির কাছেই ছিল। যখন দেখল আমরা বাগানে খেলা করে বেড়াচ্ছি সে আসতে পারছে না, তখন বনের পাখি খাঁচায় বন্ধ করলে যা হয়, ওর অবস্থা তাই হল। একবার বাড়িতে এলে আর কিছুতেই শ্বশুরবাড়ি যেতে চাইত না, খুব কাঁদত।' বালিকা বধূর বন্দিদশার দুঃখ বড়রা বিশেষ বুঝতেন না। সুনন্দিনী না গেলে মোহিতকুমারী বিরক্ত হতেন। অথচ তিনি নিজেও ন' বছর বয়সে বধূ হয়ে শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিলেন। নিজেই লিখেছেন, 'আজ হতে আমার এই বাল্যজীবনের খেলা, আহার, নিদ্রা, বস্ত্রভূষণ, কথা, চালচলন সকলি পরিবর্তন করতে হবে। ...আজ সকলি অন্য লোকের আজ্ঞার উপর নির্ভর। আর সেদিন গেল,—প্রাতঃকালে পাড়িতে

ভ্রমণ, যখন যা ইচ্ছা খাওয়া, যেখানে ইচ্ছে বসে গান গল্প করা।' স্মৃতিকথা লেখবার সময় তাঁর কোনও দীর্ঘশ্বাস পড়েনি, কেননা 'তখন আমার কোনও চিন্তা ছিল না, আমি চিন্তা করতেও শিখিনি।' হয়তো সেজন্যই তিনি ন' বছরের বালিকা পুত্রবধূকেও চালাতে চেয়েছিলেন এক হাতে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে পরিবর্তন আসছিল। সে কথা বুঝতে পারছিলেন পুরুষেরা। গগনেন্দ্র মেয়েকে মারধোর করে শ্বশুরবাড়ি পাঠানো একেবারেই পছন্দ করতেন না। তাঁর বৈবাহিক প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় বলতেন, 'বড় হলে বুঝবে, তখন নিজেই যাবে। তোমরা শুধু শুধু মারধোর করছ কেন?' প্রমোদকুমারী বা মোহিতকুমারী সনাতন নিয়মকেই সহজে মেনে নিয়েছিলেন। অথচ যখন পড়ি, ন' বছরের বালিকা মোহিতকুমারীর বিয়ে হতে যাচ্ছে এমন একটি পরিবারে যেখানে মেয়েরা গঙ্গাস্নানের জন্যেও পালকি চেপে বেরোয় না আর সে কথা মনে রেখে তাঁর অভিভাবকেরা মেয়েকে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছেন, তখন সেকালের অসংখ্য বালিকার নিরুপায় জীবন চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মোহিতকুমারী লিখেছেন, 'গায়ে হলুদের পূর্বদিনে, আমার বাবা সকালে ফোর্টের ভিতরে নিয়ে বেড়িয়ে আনেন, মনুমেন্ট চড়া হয়, পরে দুপুরবেলা জাদুঘর ও জুলজিকেল গার্ডেন দেখে আসি। বৈকালে গড়ের মাঠে রোজ যেমন বাজা শুনে বাড়ি ফিরি, সেইমতো হয়। কেবল সেদিন কর্তামণি আমার দিকে ভাল করে চাননি, আমার বেশ মনে আছে। আর যদি কোনও সময় চার চক্ষু এক হয়েছিল, তাহলে জলপূর্ণ দৃষ্টি।' মোহিতকুমারীর মা-ও এই উদার পরিবারে, যেখানে মেয়েকে বিয়ের আগের দিন শহর ঘুরিয়ে দেখানো হয়, সর্বদা ঘরের মধ্যে রুদ্ধ অবস্থায় থাকতেন। 'এখনকার বউ-ঝি-রা যেমন গান বাজনা করে, স্বচ্ছন্দে সুখে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু আমার মা ঘরের বারান্দায় বেরোতে পারেননি, মনের কষ্টেই দিন গত হয়েছে। যদি কোনওদিন ঠাকুরমা বেড়াতে যেতেন, তবে একবার উঠান দেখবার সাধ হত, বেরিয়ে দেখতেন ও মনে কত আনন্দ হত। তবু রাস্তা কি গাড়িঘোড়া দেখবার সম্পর্কও ছিল না। এ উঠানে কি আছে? আছে একটি বোজানো পাতকুয়া ও একটি জলযুক্ত কুয়া, বৃহৎ উঠান, তিনদিকে রোয়াক আর একদিকে চৌতালা সমান প্রাচীর। এই দৃশ্য দেখতে মার বাসনা হত। আমার এ গল্প শুনে বড় আক্ষেপ হয়।' এই তিনটি বালিকার জীবন থেকেই পরিবর্তনের স্পষ্ট রেখাটি চোখে পড়ে।

মেয়ের কান্নাকাটি দেখে গগনেন্দ্রনাথ স্থির করেন 'আর কখনও ন' বছরের মেয়ের বিয়ে দেব না।' যদিও সুনন্দিনীর ফুলশয্যার দিনই পূর্ণিমার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছিল। কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের ছোট মেয়ে প্রভাবতী সাত বছরের পূর্ণিমাকে দেখে প্রমোদকুমারীকে বললেন, 'তোমার ছোট মেয়েটিকে আমাদের দিতে হবে। মেজদিদির (সরোজিনী) ছোট ছেলে দিনানাথের জন্য।' এভাবেই বিশাল পরিবারের মধ্যেই ছেলে ও মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ হত। উপযুক্ত ঘরের মেয়ে না পেলে তবেই পরের মেয়েকে বউ করে আনা হত ঠাকুরবাড়িতে। বিয়ে ঠিক হয়ে গেল তবে এবার স্থির হল, বারো বছরের আগে বিয়ে দেওয়া হবে না। সরোজিনী খবর পাঠালেন, একদিন মেয়েকে নিয়ে যাবেন কালীকৃষ্ণ ঠাকুরকে দেখাতে। 'সেই কথা শুনেই আমি ত কাঁদতে আরম্ভ করলুম ...আমি ভাবলুম দিদি যেমন শ্বশুরবাড়ি গেছে, আমাকেও বোধহয় সেইরকম করে ধরে রাখবে।' অনেক বুঝিয়ে তাঁকে পাঠানো হল, ফিরে এলেন অনেক খেলনা নিয়ে। 'সেই থেকে মাঝে মাঝে নিয়ে যেতেন। অনেকটা সাহস হয়েছিল। বিয়ের এক বছর আগে থেকে আর যেতুম না। দিদিমা বললেন, এখন আর হবে না। একেবারে শুভদৃষ্টির দিন দেখাতে হয়। তার আগে দেখতে নেই। এখন মেয়ে বড় হয়েছে।' বারো বছর বয়সে আমার বিয়ে হয়, তারই বলতেন, কত বড় হয়েছে।' বালিকাকে শ্বশুরবাড়ির পরিবেশ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করে তোলার ভালো এও ছিল বাবুদিবাড়ির সাবেক নিয়ম।

ফিরে আসি সুনন্দিনীর কথায়। লেখার অভ্যাস না থাকলেও তাঁর হাতের কাজ খুব সুন্দর ছিল। তিনি কাপড় দিয়ে পুতুল তৈরি করতে পারতেন। একে বলা হয় গুড়িয়া পুতুল। শিল্পী

নিতে হয়েছিল সুজাতাকে। পানমশলা দিয়ে বাড়ি করা ছাড়াও তিনি তৈরি করেছেন সেতার-তবলা-হারমোনিয়াম। শর্মিলার বিয়েতে তৈরি করে দিয়েছিলেন একটা আস্ত ক্রিকেট টিম! এ ছাড়া সুজাতার ঝোঁক ছিল ফেলে-দেওয়া, কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস দিয়ে সুদৃশ্য পুতুল বা টুকিটাকি জিনিস তৈরি করা। নতুন জিনিস দিয়ে তো সবাই পারে। কিন্তু ফেলনা জিনিস দিয়ে? সুজাতা দেখেছিলেন তাঁর ছোটকাকা অবনঠাকুর নানারকম ফেলে দেওয়া জিনিসকেই কাজে লাগাচ্ছেন। তুচ্ছ কাঠের টুকরোকে কুটুম কাটামে রূপান্তরিত করাই শুধু নয়, তিনি লেখার পাণ্ডুলিপিতেও খবরের কাগজ, পাঁজি, শাড়ির লেবেল, বোতলের লেবেল, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ছবি, বিজ্ঞাপন, কার্টুন কেটেকুটে লাগসই করে জুড়ে জুড়ে ছবি বানাতেন। 'খুদুর রামায়ণে'র পাণ্ডুলিপিটি এভাবেই তৈরি হয়েছিল। রাবণের মুখে অবলীলায় জুড়ে দিয়েছিলেন হিটলারের মুখ। তিনি জানতেন 'তুচ্ছ কভু তুচ্ছ নয়' শিল্পীর কাছে। সুজাতাও তৈরি করেছেন আইসক্রিম কাঠির বাড়ি, শিশি বোতলের পিনকুশন-ফুলদান-পুতুল। আজকাল অব্যবহার্য জিনিসে তৈরি ঘর সাজাবার পুতুল সাজিয়ে অনেকেই বাহবা পাচ্ছেন। অসুন্দরকে সুন্দর করার জাদু জানতেন ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা। খুব সম্ভব জাপানি শিল্পীদের আনাগোনার ফলে তাঁরা চিনতে শিখেছিলেন 'প্রতিদিনের শত তুচ্ছের আড়ালে আড়ালে' হারিয়ে যাওয়া সুন্দরকে। নিজস্ব শিল্পীমন তো ছিলই। তাছাড়া পল্লীবাংলার মেয়েরা বাজে উপকরণ দিয়ে কাজের জিনিস রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। যেমন, পুরনো কাপড় আর পাড়ের সুতো দিয়ে তৈরি হত নকশি কাঁথা, আসন, বাক্স-পেটরার কভার। সুজাতা তাঁদের কাজ দেখেও কিছু শিখতে পারেন। কেননা তাঁর দিদিরা ভাল কাঁথা সেলাই করতেন।

দিদির মতো সুজাতা লেখেননি বড় একটা কিছু বাবার কথা যে অফুরান। তাই পূর্ণিমার পরে গগনেন্দ্র শতবার্ষিকী কমিটির উদ্যোক্তারা সুজাতাকে দিয়েও লিখিয়েছেন। সেই ছোট্ট লেখাটিতে আছে আপন করা ঘরোয়া কথা ও সুর। একটুখানি দেখা যাক:

'দার্জিলিং-এ দেখেছি বাবা কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন। শিল্পীর চোখে তিনি যা দেখেছিলেন আমাদেরও তাই দেখতে শেখালেন। মহাদেব শুয়ে আছেন—নাক মুখ চোখের রেখা তখন স্পষ্ট দেখতে পেলাম। তিনি আমাদের চোখ ফুটিয়ে দিলেন, তাই, না হলে আগে শুধু বরফের পাহাড় বলেই দেখেছিলাম।'

এভাবে দেখতে শেখানোই ছিল অবন-গগনের নিজস্ব আর্ট। সুজাতার শিল্পীজীবনে এসেছে পরিতৃপ্তির আনন্দ। ছোটখাটো অনেক কিছু করেছেন তিনি। কয়েকবার পুরস্কার পেয়েছেন হাতের কাজ—সেলাই আর আলপনার জন্যে। শিখেছিলেন 'বনসাই'-এর কৌশল। ছোটকাকা অবনীন্দ্রনাথের কাছে। যতদিন ছিলেন, সবাইকেই দেখাতেন পঞ্চাশ বছরের পুরনো বটগাছটা চারপাশে ঝুরি নামিয়ে কেমন বেঁচে আছে।

খুব ভাল কনে সাজাতেন তিনি। এ ব্যাপারে ঠাকুরবাড়ির অনেক মেয়েই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর সাজানোর গুণে সাধারণ কালো মেয়েকেও সুন্দর দেখাত। লতিকার মেয়ে ইরার বিয়ে হয়েছিল যখন, তখন তাঁর সাধ ছিল, জীবনের স্মরণীয় দুটি দিন দুজনের কাছে সাজবে। বিয়ের দিন সবিতার কাছে, আর বউভাতের দিন সুজাতার কাছে। ঘটনাচক্রে দুটি সাধই মেটেনি। সুজাতার অবশ্য বিরাম ছিল না, আত্মীয়েরা ছাড়াও বাইরের পরিচিত বন্ধুরাও তাঁকে ডেকে নিয়ে যেতেন। বৃদ্ধ বয়সে কাঁপা কাঁপা হাতেও কনে সাজিয়েছিলেন। অবাক হয়ে লক্ষ করেছেন যত আধুনিকাই হোক না কেন বিয়ের দিন সবাই চায় সাবেক সাজ। যেমন তাঁর নাতনি শিঞ্জিতা, বিয়ের দিন তিনিও চেয়েছিলেন শিল্পীকন্যার শিল্পমণ্ডিত হাত দুখানির চিরন্তন স্পর্শ।

কনে সাজানোর কথায় মনে পড়ছে [illegible]এর কথা। তিনিও খুব ভাল কনে সাজাতেন,

সরলা দেবী চৌধুরাণী

অপর্ণা ঠাকুর

পারুল ঠাকুর

চন্দ্রিমা চট্টোপাধ্যায়

কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়

মণিমালা চট্টোপাধ্যায়

বীণা চট্টোপাধ্যায়

সুরভি ভট্টাচার্য

সুজাতা ভট্টাচার্য

স্মিতা সিংহ

কৃষ্ণা রিবু

সুপূর্ণা চৌধুরী

ঈশিতা দাস

সুরশ্রী দাস

শ্যামশ্রী সিংহরায়

শুভ্রা ঠাকুর

মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়

সুষমা দেবী

হেমলতা ঠাকুর

সুশীলা ঠাকুর

অমিতা ঠাকুর

সংজ্ঞা ঠাকুর

অরুন্ধতী ঠাকুর

শ্যামশ্রী ঠাকুর

গীতা চট্টোপাধ্যায়

মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায়

মাধবী রায়

প্রণতি ঘোষ

জয়শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়

শিবানী ঘোষাল

মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায়

পদ্মা মজুমদার

মালবী ঠাকুর

সুনীতি ঠাকুর

বেলা (সুধা) গৌরী

শীলা চট্টোপাধ্যায়

ঋতা বন্দ্যোপাধ্যায়

এইকো ঠাকুর

মাধুরীলতা দেবী

মীরা দেবী

রেণুকা দেবী

ছায়াময়ী দেবী

তাঁর নাম মাধবিকা। সমরেন্দ্রনাথের মেয়ে। মাধবিকারা পাঁচ বোন। যমজ বোন মালবিকা ছাড়াও ছিলেন সুপ্রিয়া, কমলা ও অণিমা। মাধবিকার বিয়ে হয়েছিল কবিকন্যা রেণুকার ছোট দেবর শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে। ঠাকুরবাড়িতে মেয়ে সাজানোর ব্যাপারে নাম ছিল মাধবিকার। সেখানে মেয়ে সাজানোর একটি বিশেষ ধরন ছিল। নিশ্চিত করে বলতে না পারলেও মনে হয় তখনকার সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলির মধ্যে এক ধরনের মেয়ে সাজানোর বৈশিষ্ট্য ছিল। যাই হোক, ঠাকুরবাড়িতে এখনকার মতো লবঙ্গের টিপ দিয়ে চন্দনের নকশা কেটে মেয়ে সাজানো হত না। তার বদলে অনেকখানি চন্দন লেপে দেওয়া হত পুরো কপালে। ভুরু থেকে সিঁথি পর্যন্ত চন্দন লেপা হলে খুব সরু যত্নে চিরুনি দিয়ে চন্দনটা আঁচড়ে দেওয়া হত। ভুরু থেকে চুল পর্যন্ত সারা কপালে চন্দনের খড়কে ডুরে কাটার পর চন্দন শুকোলে তার ওপর সিঁদুর-কুমকুমের টিপ ও নকশা কাটা হত।

ইন্দিরা যখন স্ত্রী-আচারের একখানি সংকলন প্রকাশের কথা ভাবছিলেন, তখন তাঁর এ ব্যাপারে মাধবিকাকেই যোগ্যতমা বলে মনে হয়েছিল। একান্নবর্তী পরিবারের বহু বিয়ে তিনি দেখেছেন এবং এ বিষয়ে স্বাভাবিক ঔৎসুক্য থাকায় সবই মাধবিকার মনে ছিল। তাঁর দেওয়া বিবরণ থেকেই আমরা ঠাকুরবাড়ির বিয়ের স্ত্রী-আচার সম্বন্ধে সব কিছু জানতে পারি। মহর্ষি পরিবার ব্রাহ্ম হয়ে যাবার পরেও মহর্ষি বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে স্ত্রী-আচার বাদ দেননি। পাঁচ নম্বরে তো সাবেক নিয়মই ছিল। মাধবিকা সব জানতেন। সবই মনে রেখেছিলেন। কত নিয়ম! নিয়ম তো নয়, সে হল রীতি বা 'রীত'। গায়ে হলুদ থেকে শুরু, বিয়ের পর ন'দিনে শেষ। মাধবিকা লিখেছেন ঠাকুরবাড়ির কথা, তার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের স্ত্রী-আচারের তফাত নেই বললেই চলে। দু-একটার একটু নতুনত্ব আছে। যেমন:

'বরণের পরে মা ছেলের কাছ থেকে কনকাঞ্জলি নেবে। ছোট একটি থালাতে অল্প একটু আতপ চাল, একটি টাকা দিয়ে ছেলের হাতে দিতে হয়, দিয়ে মা সামনে আঁচল পেতে দাঁড়ায় ও ছেলেকে তিনবার জিজ্ঞাসা করে, 'বাবা কোথায় যাচ্ছ?' ছেলে বলে, 'মা তোমার বউ আনতে যাচ্ছি।' ... তিনবার সেই কথাটি বলে মায়ের আঁচলে ওই চাল ঢেলে দিয়ে নারায়ণ প্রণাম ও মাকে প্রণাম করে যাত্রা করে। সম্প্রদান হয়ে গেছে এই খবর মায়ের কানে দিতে হয়; দিলে সারাদিনের উপোসের পর ওই কনকাঞ্জলি চাল মা ফুটিয়ে মুখে দেন ও দুধ মিষ্টি খান।'

ঠাকুরবাড়িতে বিয়ের উৎসব তো ন'দিন ধরে চলত, তারও নিয়ম আছে। মাধবিকা লিখেছেন, 'তিনদিনের দিন বরকনে একবার কনের বাড়ি যায় ও ফিরে আসে। —তাকে বলে ধুলাপায়ে গমন। তারপর নয়দিনের দিন জোড় ভাঙা হয়। কনের বাড়ি বর ও কনে যায়, কনের মা বরণ করে ঘরে নেয়, তারপর হাতের সুতো খোলা, শাঁখা শিত্‌লোন হয়, কালোপাড় কাপড় পরে। সেইদিন গাঁটছড়া খোলে। বর নিজের বাড়ি ফিরে আসে, মেয়ে মায়ের কাছে থাকে। তাকেই বলে জোড়-ভাঙা। আটদিন দাড়িসিঁদুর রাখতে হয়, সেইদিন দাড়িসিঁদুর বাড়ন্ত করে অল্প করে ছোট করে সিঁদুর পরে।' ঠাকুরবাড়িতে শাঁখা ও গয়না খুলে রাখাকে বলা হত শিথলানো, সম্ভবত খুলে ফেলাটা অমঙ্গলসূচক বলে 'শিথিল করা' বলা হত, মুখে মুখে তা হয়েছিল শিথলানো, শিত্‌লোন ইত্যাদি। মোহিতকুমারীর লেখাতেও আছে 'গহনাগুলি শিথ্‌লে দিলেন।' তিনি আরও লিখেছেন, 'আমাদের বিয়ের আটদিন দু'বেলা মাছভাত খেতে হয়। ওই আটদিন কোনও বিধবাকে ছোঁবে না, আবার চুলে কালো ফিতে পরা চলবে না। ...মাথার চুলগুলি পাক দিয়ে বাঁধতে হবে, বিননি করা চলবে না।'

আরও কত নিয়ম ছিল, মাধবিকা সবই প্রায় লিখেছেন। খুঁটিয়ে দেখার চোখ ছিল তাঁর। তবে মুদ্রিত বইয়ে তাঁর নামটি সংক্ষিপ্ত, মাধবী ভট্টাচার্য।

মাধবিকার যমজ বোন মালবিকা ছোটবেলায় মুখে মুখে ছড়া বানিয়ে সবাইকে হাসাতে পারতেন। একবার এক আত্মীয়কে নিয়ে ছড়া বানাতে গিয়ে খুব ধমক খেয়েছিলেন। দিদিমা

সৌদামিনী ধমক দিলেও ছড়া শুনে না হেসে পারেননি। পরবর্তীকালে কিন্তু এই আমুদে মহিলার ছড়া লেখায় উৎসাহ ছিল কিনা জানা যায়নি। তবে আর-এক বোন কমলা কিছু কিছু কবিতা লিখতেন। তিনি দু-একটি 'নারী সমিতি'র সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। তাঁর লেখা কয়েকটা অপ্রকাশিত কবিতা এখনও আছে। মেয়ের মৃত্যুর পরে লেখা একটা কবিতায় দেখা যাচ্ছে তিনি বেছে নিয়েছেন গদ্য ছন্দের আঙ্গিক:

'আমার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে কেড়ে
নিয়েছে কে তাকে, সব শূন্য করে দিয়ে
তারপরে তার বন্ধু দুটি এসে
বসলো আমার কাছে, একবার
আমার দিকে চেয়ে মাথা রইল
নিচু করে, চোখের জল নিলে
সাম্‌লে আমার কাছে, মাসিমা
বলে ডাকলে আমার তারা;
এ জন্মের মতো সে গেল চলে, রেখে
গেল বুঝি, এদের আমার কাছে
ভোলাতে আমায়।'

উমার আরও দুটি বোন ছিল—করুণা আর সুরূপা। আর একজন শৈশবেই মারা যান। করুণাও দীর্ঘায়ু হননি। তাঁর বিয়ে হয়েছিল সাহিত্যিক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তিনটি ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে রেখে অকালে মারা যান তিনি। সবচেয়ে ছোট বোনের নাম সুরূপা। এঁর বিয়ে হয়েছিল কাদম্বিনীর পরিবারে অর্থাৎ হীরবালার পৌত্রের সঙ্গে। জটিলতা এড়াতে এখানেই তাঁর কথা বলা হল। ছেলেবেলায় 'ডাকঘরে'র সুধা মালিনী সেজে সুরূপা সকলের মন কেড়ে নিয়েছিলেন। একদিন রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথকে ডেকে বললেন, 'তোমাদের বাড়ির একটি ছোট মেয়ে জোগাড় করো।' তখনও শিশু অভিনেতাদের মঞ্চে দেখা যেত না। ছোটদের দিয়ে কাজ করাতে কেউ সাহস করে এগিয়ে আসেনি। তবে সব ছেলেমেয়েরাই কম-বেশি গান করত। রবীন্দ্রনাথ 'ডাকঘরে' দেখালেন, ছোটরা ভাল অভিনয় করতে পারে। নিজের নিজের দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালন করে। যাই হোক, বাবার সঙ্গে ভয়ে ভয়ে এলেন সুরূপা, কবির আদেশে পড়লেন 'ডাকঘরে'র কিছুটা অংশ। কবি খুশি হয়ে বললেন, 'অবন একে সুধার ভূমিকায় তৈরি করো, তবে তুমি আবার বেশি শিখিও না। ওকে নিজের মতো করতে দিও।' সুরূপা লিখেছেন, 'বাবা আমাকে সাজাতেন মাথায় উবু ঝুঁটি, গলায় পুঁতির মালা, পায়ে মল, পরনে লাল শাড়ি আঁট করে পরা, এক হাতে ফুলের সাজি, এক বগলে বেনে পুতুল।' 'সুধার স্মৃতি' পড়ে আরও জানা যায়, 'ডাকঘরে'র অভিনয়ের সময় আরও অনেক ঘটনা ঘটেছিল। ঠিক অভিনয়ের আগে সুরূপা দেখলেন, মঞ্চের সামনে চেয়ার টেবিল পেতে লাট কারমাইকেল ও অন্যান্যদের বসবার জায়গা হয়েছে। টেবিলের ফুলদানিতে বড় বড় লাল গোলাপ সাজিয়ে রাখছেন সমরেন্দ্রনাথ। সঙ্গে সঙ্গে সুরূপা বায়না ধরলেন, 'একটা লাল গোলাপ দাও সাজিতে রাখব।' সমরেন্দ্রনাথও দেবেন না। বলেন, 'তোর সাজি তো খালি থাকবে, তুই ফুল তুলতে যাচ্ছিস।' সুরূপাও নাছোড়বান্দা। রবীন্দ্রনাথ দেখে বললেন, 'আহা দাও দাও। মালিনীর বাড়িতেও তো বাগান আছে, সেখানকার ফুল ও তুলেছে।' 'ডাকঘরে'র সেই অভিনয়ে অমল সেজেছিলেন আশামুকুল দাস। অভিনয় হয়েছিল চমৎকার। সুরূপার মনে আছে পাঁচদিন

অভিনয় হয়েছিল। অভিনয়ের শেষে সবাই দুই শিশু অভিনেতাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতেন। সুরূপা লিখেছেন, 'আমাদের কেউ মেডেল দেয়নি কিন্তু সবাই এত আদর করেছিলেন, সে কি বলব। রবিদা তো খুশি হয়ে আমার বেনে পুতুলের জন্যে একটা চমৎকার সবুজ রঙের জরি-পাড় দেওয়া সিল্কের রুমালই আমাকে বকশিশ দিলেন।' পরে 'ডাকঘরের কথা উঠলেই কবি দুঃখ করে বলতেন, 'আমার অমল সুধা বড় হয়ে গেল, আর কে অভিনয় করবে।'

সুরূপাকে বড় ভালবাসতেন কবি, আদর করে তাঁকে ডাকতেন মালিনী বলে। 'দ্বারে কেন নাড়া দিলে ওগো মালিনী' বুঝি এই মালিনীর উদ্দেশ্যেই লেখা। যদিও খুব বেশি অভিনয় সুরূপা করেননি। বড় হয়ে একবার করেছিলেন, 'নটীর পূজা'র মালতী। সেও বেশ মজার ঘটনা। আগে থেকে কোনও ঠিক ছিল না। সুরূপা লিখেছেন, 'ও বাড়ির দালানে 'নটীর পূজা' হবে। শান্তিনিকেতন থেকে মেয়েরা এসেছে, তারা অভিনয় করবে। অভিনয়ের একদিন আগে হঠাৎ মালতী সাজবে যে মেয়েটি তার খুব জ্বর এসে গেল। মহা বিপদ। রবিদাদা তৎক্ষণাৎ দিনুদাদাকে ডেকে হুকুম দিলেন, 'আমার মালিনীকে নিয়ে এস' ব্যস, দিনুদাদা বিপুল বপু টেনে ঝড়ের গতিতে পালতোলা নৌকোর মতো এ বাড়িতে এসে আমাকে নিয়ে হাজির করল রবিদাদার সামনে। যত বলি পারব না এত তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিন আমাকে, অন্য কেউ করুক। কে কার কথা শোনে। করতেই হবে তোকে, নিজে শেখাব। শিখিয়েওছিলেন কবি যত্ন করে। অভিনয় ভালভাবেই উতরে গেল। অভিনয়ের পর কবি ওপরের বারান্দায় সুরূপাকে ডেকে আদর করে গলায় পরিয়ে দিলেন একটি ফুলের মালা। বললেন, 'এই তোর প্রাইজ।'

অভিনয় বিশেষ না করলেও সুরূপা প্রায়ই কিছু না কিছু লিখতেন। কবিতা কিংবা প্রবন্ধ। স্মৃতিমূলক প্রবন্ধ—অবনীন্দ্রনাথ, সোমেন্দ্রনাথ, সুধার স্মৃতি, ডাকঘর প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। ছোটখাটো কাজে বাবার মতোই উৎসাহ ছিল। পাঁচ নং বাড়ির মেয়েদের ঘরের কাজ শিখতেই হত। রান্না, কাঁথা সেলাই—এটি বিশেষ করে পাঁচ নং বাড়ির মেয়েরাই শিখতেন, কেননা অন্যান্য পরিবারে মেয়েদের সেলাই শেখানো হলেও নকশি কাঁথা সেলাই করতে শেখানোর নজির নেই। কিন্তু এই বাড়িতে হরিশচন্দ্র হালদার নামে এক দুস্থ ব্রাহ্মণ থাকতেন। তিনি মঞ্চসজ্জায় সাহায্য করতেন, অন্যান্য কাজও করতেন। তাঁর একটি কাজ ছিল, মেয়েদের কাঁথা সেলাইয়ের নকশা এঁকে দেওয়া ও কী করে সেসব নকশা কাঁথায় বিভিন্ন ফোঁড় দিয়ে তুলতে হয় তা শেখানো। এ কাজে উমা ও পূর্ণিমা অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। অন্যরা চলনসই। বাবার দেখাদেখি সুরূপা তৈরি করেছিলেন ঝিনুকের কুটুমকাটাম। অবনীন্দ্রনাথ ছোটদের লেখার উৎসাহ বাড়াবার জন্যে তাদের উপদেশ দিয়েছিলেন স্বপ্ন লিখতে। তার জন্যে শ্রীরামপুরি কাগজে তৈরি করা হল কোষ্ঠী লেখার মতো গুটিয়ে রাখা মোড়ক। সেই স্বপ্ন লেখার খাতায় ছোট-বড় অনেকের লেখা আছে। আছে সুরূপার দুটি লেখা, তার একটি:

'একদিন আমি আর শোভনলাল বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। ইস্কুল ঘরের দিক থেকে কালু নানারকম ভূতের আওয়াজ করছে। সেই শুনে আমাদের খুব ভয় হল। এমন সময় কালু চেঁচিয়ে বললে, 'শোভনলাল, একটা জিনিস দেখতে এসো।' আমরা ছুটে গেলুম। গিয়ে দেখি টুকুনি কতকগুলো দাঁড়ে করে কতকগুলো পায়রা এনেছে। আর সেখানে বাবা বসে আছেন। আর সর্দার মালি দাঁড়িয়ে আছে। আর সব ছেলেরা দাঁড়িয়ে আছে। সেই পায়রাগুলোর মধ্যে একটা ছোট পায়রা আছে, তার গায়ে সাদা রং। আমি বাবাকে বললুম, ওই সাদা পায়রাটা কেনো। বাবা বললেন, 'ওটা ভূতের পায়রা। সর্দার মালি বললে, 'না না, নিবেন না। আমাদের এখানে একটা কালো পায়রা ঘুরে বেড়াত, সেটা ধরে নিবেন।' সেই সময় একটা কালো পায়রা সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। আমরা সেটাকে ধরে নিয়ে ঘরে গেলুম।'

যদিও কোনও স্বপ্নের মাথামুণ্ডু থাকে না, তবু অবনীন্দ্রনাথ যে বলেছিলেন স্বপ্ন থেকে গল্পের প্লট পাওয়া যায়, সুরূপার স্বপ্ন পড়ে তাই মনে হয়। এ সময়ে তাঁর বয়স মাত্র বারো বছর।

নিয়মিত চর্চা করলে কয়েকটি স্মৃতিচিত্রও প্রবন্ধের মুষ্টিভিক্ষা ছাড়া আরও হয়তো অনেক কিছু দিতে পারতেন সুরূপা।

পাঁচ নং বাড়িতে কয়েকজন বধূও এসেছেন। গগনেন্দ্রনাথ তাঁর বড় ছেলে গেহেন্দ্রের বিয়ে দিয়েছিলেন খুব ঘটা করে। 'চন্দনকাঠের রোলারে ঠিকুজির মতো লম্বা হলুদ রং-করা সাটিনের উপরে লাল কালি দিয়ে লেখা রাশিচক্রের আকারে বার, তারিখ, নাম থাকবে। ...রেশমের ফিতে জরির টাসেল দিয়ে চিঠি বাঁধা হয়। সেই থেকে ঠিকুজির আকারে চিঠির (নিমন্ত্রণপত্র) ফ্যাশান হয়ে যায়।' লিখেছেন পূর্ণিমা। তিনি আরও জানিয়েছেন, গগনেন্দ্রের ইচ্ছে ছিল 'ঢালা নেমন্তন্ন' করা। প্রথম বিয়ে। 'কিন্তু সে সময় অনেক দলাদলি ছিল। তাই ঠিক হল সামাজিক ব্যাপার বাদ দিয়ে ঢালা নেমন্তন্ন হবে। ...থিয়েটারের দিন হাতে হাতে খাওয়া, সেই দিনই ঢালা নেমন্তন্নের ব্যবস্থা থাকবে।' গেহেন্দ্রের বিবাহ উৎসব খুব সুন্দর হলেও শেষ পর্যন্ত সুখের হয়নি। বছরখানেক পরেই গেহেন্দ্রের মৃত্যু হয়। বিধবা পুত্রবধূ মৃণালিনীর আবার বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন গগনেন্দ্রনাথ। তার আগে প্রতিমার বিয়ে হয়েছে। কিন্তু মৃণালিনী রাজি হননি। এর কিছুদিন পরে মৃণালিনীও মারা যান।

গগনেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র কনকেন্দ্রর সঙ্গে সুরমাসুন্দরীর বিয়ে ঠিক করেছিলেন বাড়ির লোকেরাই। সুনন্দিনীর ননদ সরযূবালার মেয়ে সুরমা, তিন বছরের ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটি যখন ঠাকুরবাড়ির বাগানে বাজি পোড়ানো দেখতে আসতেন তখনই তাঁর বিয়ে ঠিক হয়। সুরমাকে বড় করেছিলেন মোহিতকুমারী। তিনি লক্ষ করেছিলেন, 'মেয়েটি যখন যার কাছে থাকে, তখন তাকে কিরকম করে বশ করে ফেলে। কিরকম মায়াময়ী মুখ, চাউনিটা ফ্যালফেলে, কাজেই যে দেখত সেই ভালবাসত।' সুরমার গায়ের রং ছিল খুব ফরসা, গালদুটি পাকা ডালিম ফলের মতো। হাসলে আরও টুকটুকে হয়ে উঠত। ভাল অভিনয় করতে পারতেন, বিচিত্রায় হত নানা ধরনের অনুষ্ঠান। একবার হল শকুন্তলা ট্যাবলো। তাতে সুরমা দুষ্মন্ত আর সুধীন্দ্রনাথের মেয়ে এণা শকুন্তলা সেজেছিলেন। আর একবার 'মৃণালিনী'তে পশুপতি! পুরুষ সাজলে তাঁকে চমৎকার মানাত বলে সুরসিক গগনেন্দ্র এক মহিলাকে ঠাট্টা করবার জন্যে সুরমাকে দারোয়ান সাজিয়ে দিলেন। মাথায় পাগড়ি মস্ত পাকানো গোঁফ, ভোজপুরি দারোয়ানের মতো সুরমা উঠোনে এসে দাঁড়িয়ে লাঠি ঠুকলেন। এই মহিলা মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের বাড়িতেও যেতেন। দারোয়ান এসে লাঠি ঠুকে জানাল, সে তাঁকে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়িতে নিয়ে যেতে এসেছে। তিনিও 'চল যাই' বলে উঠে দাঁড়ালে হাসির ধুম পড়ে গেল। প্রমোদকুমারী এসে বললেন, 'ও বড়মা, কোথায় যাচ্ছ ও তো সুরমা। তোমাকে ঠকাবে বলে মেয়েরা দারোয়ান সাজিয়েছে।' তিনি রেগে উঠলে মেয়েরা হাসতে হাসতে তাঁর পায়ে ধরে মান ভাঙায়। গগনেন্দ্র নিজের গাম্ভীর্য নিয়ে ধরাছোঁয়ার বাইরেই রইলেন। এ ধরনের হাসিঠাট্টায় অন্দরমহলের পরিবেশটি মাঝে মাঝে সরস হয়ে উঠত।

গগনেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র নবেন্দ্রনাথের সঙ্গে অপর্ণার বিয়ে হয়েছিল। অপর্ণা নলিনী ও সুহৃৎ চৌধুরীর মেজো মেয়ে। তাঁর ছোট বোন পূর্ণিমার কথা ক্রমানুসারে আগেই বলা হয়েছে। অপর্ণার বিয়ের নিমন্ত্রণ রবীন্দ্রনাথ নেননি। অথচ তখনও দ্বিপেন্দ্রনাথ রয়েছেন। নাতনির বিয়ে সম্ভবত তিনিই স্থির করেছিলেন। কিন্তু মেয়ের বিয়ে হিন্দু মতে হবে শুনে নলিনী প্রবল আপত্তি জানালেন। যতদূর মনে হয়, রবীন্দ্রনাথও সেজন্যেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন না লিখেছিলেন। ইন্দিরা মনে করতেন, মেয়ের বাড়িতে মেয়ের বাপের বাড়ির ধর্মমত অনুযায়ী বিয়ে হওয়াই উচিত, শ্বশুরবাড়িতে মেয়ের মত থাকলে সেখানকার নিয়ম মেনেই চলা উচিত। কিন্তু 'আমাদের দেশে মেয়েরা এত সস্তা এবং নিরুপায় বলেই বরপক্ষ এত অন্যায় চাপ দিতে ও মতামত

খাটাতে পারে।' মজার কথা হল, এ বিয়ের বরপক্ষ হলেন তাঁদের অতি আপনজন গগনেন্দ্র পরিবার। ইন্দিরা অবশ্য ব্রাহ্ম বরপক্ষদেরও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি, '...হিন্দুমতে ব্রাহ্মদের একমাত্র আপত্তি হতে পারে যদি কোনওরকমে মূর্তিপূজা করতে হয়। কিন্তু আমি যতদূর জানি বাংলাদেশের হিন্দু বিবাহ অনুষ্ঠানে শালগ্রাম বা নারায়ণশিলা কেবল সাক্ষীমাত্র থাকেন। তাঁকে কোনওরকম পূজা বা প্রণাম পর্যন্ত করতে হয় না। তা যদি হয় তো ব্রাহ্ম বরের সেই শিলার সঙ্গে এক ঘরে বসে বিয়ে করতে কি আপত্তি হতে পারে? ঘরের আর পাঁচটা জড় পদার্থের মতো মনে করলেই হল।' আসল কথাটা অবশ্য তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন, মেয়ের নিরুপায় অবস্থা। 'পুরুষানুক্রমে যে অনুষ্ঠান পদ্ধতির সঙ্গে মানুষ আজীবন জড়িত, সেটা ত্যাগ করতে তার মজ্জাগত সংস্কারে বাধে, বংশমর্যাদাজ্ঞানে আঘাত লাগে—বিশেষ মেয়েমানুষের জন্য। ছাড়তে হয় তারা ছাড়ুকগে। অথচ এই আপাত তুচ্ছ মতভেদ দরুন কত ভাল ভাল সম্বন্ধ ভেঙে যাচ্ছে, জীবনের সুখ নষ্ট হচ্ছে।' ঠাকুরবাড়িতে ছেলেমেয়ের বিবাহ উপলক্ষে মাঝে মাঝেই বহু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটত, তার প্রধান কারণ ছিল হিন্দু ও ব্রাহ্ম অনুষ্ঠানের পার্থক্যে। নগেন্দ্র ও মীরা দুজনেই ব্রাহ্ম ছিলেন তবু তাঁদের বিবাহবাসরে কম গণ্ডগোল হয়নি।

ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের মধ্যে যে যে গুণ থাকত, কম-বেশি তা সবই ছিল অপর্ণার। তিনি খুব ভাল বেহালা বাজাতে পারতেন, গাইতে পারতেন। তাঁর কণ্ঠে দুটি রবীন্দ্রসংগীত 'দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার' ও 'যদি প্রেম দিলে না প্রাণে' যত ভাল শোনাত অমনটি আর কেউ গাইতে পারতেন না। 'ভৈরবের বলি' ও আরও দু-একটা নাটকে অভিনয় করেছিলেন অপর্ণা। ইলার ভূমিকায় সুন্দর অভিনয় করেছিলেন তিনি। পরে সংসারের দুঃখে সুখে জড়িয়ে পড়েন। ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের মধ্যে অপর্ণা নামটা একটু অন্য ধরনের। ইন্দিরা লিখেছেন, 'আমরাই তার অপর্ণা নাম একটু নতুন ভেবে দিয়েছিলুম—যদিও এখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ...আমি আবার তার নামের একটা ব্রোচ করিয়ে দিয়েছিলুম—একটা সোনার পাতা, তার আগে একটা অ এবং পরে একটা আকার।'

সমরেন্দ্রনাথের পরিবারেও এ সময়ে এসেছেন কয়েকজন বধূ, তাঁদের মধ্যে উমাশশী ও শিবরানির বিয়ে হয়েছিল চেনাজানা আত্মীয় পরিবার থেকে। বিয়ের সময় উমাশশীর হামজ্বর হওয়ায় সেদিন আর বিয়ে হয়নি। বিয়ে হচ্ছিল আত্মীয় পরিবার থেকেই। কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বড় মেয়ে নীরজিনীর নাতনির সঙ্গে, তাঁর মেজো বোন সরোজিনীর ছেলের সঙ্গে আগেই বিয়ে হয়েছিল গগনেন্দ্রর মেয়ে পূর্ণিমার। এমন সময় সুনয়নী তাঁর বেনেপুকুরের বাড়ি থেকে এসে মাকে বললেন, 'তোমরা তো দেখছি সব বিয়ে দেবার জন্য তৈরি। মেয়ের বাড়ি গিয়ে দেখলাম তারাও খুব তৈরি হচ্ছে ...সে মেয়েকে কিছুতেই কাল পিঁড়িতে বসিয়ে গায়ে হলুদ দেওয়া যেতে পারবে না।'

'কেন, কী হয়েছে?'

সুনয়নী বললেন, 'তার হামজ্বর হয়েছে। খুব জ্বর। মুখটুখ লাল হয়ে ফুলে উঠেছে, সে উঠে বসতে পারছে না। তার উপর ওরা ওষুধ খাইয়ে জ্বর চেপে দেবার চেষ্টা করছে। মেয়েটা মারা যাবে। হয় দিন পিছিয়ে দাও, নয় বিয়ে বন্ধ কর।'

সৌদামিনী রেগে গিয়ে বললেন, 'ডাক গগনকে, সমরকে। গাড়ি জুতে আনতে বল। আমি দেখে আসি। ও মেয়ে না হয় অন্য মেয়ে এনে এক লগ্নেই বিয়ে দেব।'

মেয়ে দেখে এসে তিনি বললেন, 'আগে একটু খবর পেলে দিন পিছিয়ে দিতে পারতুম। এখন বাধা পড়ল, অন্য মেয়ে ওই লগ্নেই বিয়ে দেব।' পুরনো নাপিত চন্দ্রকে ডেকে বললেন, 'তুই যা ছোট রাজার বাড়ি। আমার বোনঝির মেয়ে আছে। দেখতেও সুন্দর। তার সঙ্গে ঘটকালি কর।

ছোট রাজা হচ্ছেন সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। নাপিত যাবার জন্যে তৈরি হলেও বাধা দিয়েছিলেন গগনেন্দ্রনাথ। বলেছিলেন, 'মাথা ঠান্ডা হলে ভেবেচিন্তে মেয়ে দেখা যাবে।' তখন সৌদামিনী বললেন, 'যা, কয়লাহাটার কাকিমাকে নিয়ে আয়। তিনি কি পরামর্শ দেন, আগে শুনি।' রমানাথ ঠাকুরের পুত্রবধূ নগেন্দ্রবালা এলেন পালকি করে। কয়লাহাটা ঠাকুরবাড়িটিও এখন নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। দ্বারকানাথের বৈমাত্রেয় ভাই রমানাথের বাড়ি ছিল দ্বারকানাথের বাড়ির কাছেই, এখন যেখানে ভেঙ্কটেশ মন্দিরটি রয়েছে, ঠিক সেখানে। হুবহু মহর্ষি ভবনের অনুরূপ বাড়ি, প্রবেশপথ ছিল রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রিটে। এ বাড়ির অধিবাসীরা গত শতকের চল্লিশের দশক থেকেই ছড়িয়ে পড়েছেন কলকাতার নানা জায়গায়। কয়লাহাটার বাড়ির কর্তামাও বললেন, 'বিয়েতে যখন বাধা পড়েছে আর তোমাদের মনে খটকা লেগেছে, তখন না দেওয়াই ভাল।'

সৌদামিনীকে কিছুটা সময় নিয়ে গগনেন্দ্রনাথ বোঝালেন এর মন্দ দিকটি। 'মেয়ের বাপের পক্ষে ভাল ঘরে পাত্র পাওয়া কত কষ্টকর তা তো বুঝতে পারছেন? এখন বিয়ে ভেঙে গেলে সে কোথায় আবার পাত্র খুঁজে বেড়াবে? আর আমাদেরও এতদিন আগে থেকে কথা কয়ে রাখা উচিত হয়নি।'

এ কথার সারসত্য সৌদামিনীও বুঝলেন। সত্যিই তো, মেয়ের বাবা কী করবেন? মেয়ের বিয়েই বা কী করে দেবেন? নিতান্ত নিরুপায় হয়েই তো অসুস্থ মেয়েকে বিয়ের পিঁড়েতে বসাতে চাইছিলেন। কিন্তু নিজের সংস্কার ও জেদ বজায় রেখে বললেন, 'বেশ ওই মেয়ের সঙ্গেই বিয়ে দেব কিন্তু কুমুদের বাড়ি থেকে দেব না। যদি পাথুরিয়াঘাটায় এনে মেজোমেয়ের কাছে রাখে তবেই দেব।' পূর্ণিমা তাঁর শাশুড়িকে সে কথা জানাতেই তিনি সানন্দে রাজি হলেন, কেননা মেয়ে তাঁর স্বর্গতা দিদির নাতনি। মাঘ মাসের দিন বদলে আষাঢ় মাসে বধূ হয়ে উমাশশী এলেন ঠাকুরবাড়িতে, সব ছবিটাই উপহার দিয়েছেন পূর্ণিমা। কিন্তু লক্ষণীয় ব্যাপার হল, কত সামান্য কথায় সে সময়ে বিয়ে ভেঙে যাবার সম্ভাবনা দেখা যেত। আসলে বিয়েতে বাধা পড়লে নারীরা অমঙ্গলের আশঙ্কায় চঞ্চল হয়ে উঠতেন। সব প্রস্তুতি শেষ হলে থাকত প্রচুর ক্ষতির আশঙ্কা। সব মিলেই সৌদামিনী ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। আরও দেখা যায়, এইসব ব্যাপারে বাড়ির কর্ত্রীর মতামতই গ্রাহ্য করা হত। কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম-ই শেষ কথা ছিল না। যদিও গগনেন্দ্রনাথের সুপরামর্শই কার্যকর হয় কিন্তু তাতে অন্দরমহলের দাপট মোটেই ক্ষুণ্ণ হয়নি। দাপট কথাটা শুনতে খারাপ লাগতে পারে। বরং কর্তৃত্ব বলাই ভাল।

পারুল সৌদামিনীর নাতনি, ইরাবতীর ছোট মেয়ে। জোড়াসাঁকোর বাড়ির দুই সৌদামিনীর মধ্যে ভারি ভাব ছিল। দুজনেরই এক নাম তাই সই পাতিয়েছিলেন দুজনে। একজন ছয় নম্বরের মেয়ে, অপরজন পাঁচ নম্বরের বউ। প্রথমে তাঁরা স্থির করেছিলেন ইরাবতীর মেয়ে ইন্দ্রাণীর সঙ্গে বিয়ে দেবেন অবনীন্দ্রনাথের। কিন্তু নিকট সম্পর্কের হিসেবে এ বিয়ে শেষ পর্যন্ত হয়নি। অনেকদিন পরে ইরাবতী আবার যখন ফুলের মতো মেয়ের মা হলেন তখন তিনদিনের মেয়েকে দেখেই সৌদামিনী ঘোষণা করলেন এই মেয়ের সঙ্গেই নাতি অলোকেন্দ্রের বিয়ে দেবেন তিনি। অলোকেন্দ্র অবনীন্দ্রনাথের বড় ছেলে। তাঁর কথার নড়চড় হয়নি। অবনীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্রবধূ হয়ে এলেন পারুল। তখন সৌদামিনী পরলোকে।

রবীন্দ্রনাথের নাতনি পারুল। নাচ, গান, অভিনয়ে বড়ই সংকোচ। তবু কবি একবার জোর করে নামিয়েছিলেন 'বর্ষামঙ্গলে'। 'হে ক্ষণিকের অতিথি' গানের সঙ্গে তাঁর নীরব আবির্ভাব হল শরৎলক্ষ্মীর বেশে। কথা কইতে হবে না, গান গাইতে হবে না শুনে রাজি হলেন পারুল। তা বলে যে গান শেখেননি তা নয়। বিয়ের আগে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে গান ও সেতার

শিখতেন। বিয়ের পরে শ্যামসুন্দর মিশ্রের কাছে। ছবি আঁকা শেখাতেন নন্দলাল বসু। তবু এসবে বড় সংকোচ, কেননা তাঁদের পরিবারের মেয়েরা একটু আড়ালেই থাকতেন। তা সে যাই হোক, শেষপর্যন্ত মেঘের মতো একঢাল চুল এলিয়ে সাজলেন শরৎলক্ষ্মী। গানের সঙ্গে তাঁর নীরব আবির্ভাব, আবার পিছনে হেঁটে প্রস্থান, এই ছিল তাঁর ভূমিকা। একালের মতো সেকালে অডিয়েন্সের দিকে পিছন ফিরে প্রস্থানের রেওয়াজ ছিল না। পিছনে পায়ে পায়ে সরে গিয়ে প্রস্থান করতে হত।

মাঝে মাঝে পারুল গিয়ে বসতেন রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রার আসরে। শুনেছিলেন কবিকণ্ঠে 'শেষের কবিতা' পাঠ। সেখানে তিনি লক্ষ করেছিলেন, কবি যখন হাসির গল্প পড়তেন নিজে হাসতেন না, অন্যের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করতেন। অনেকে ভয় পেতেন মনোভাব প্রকাশ করতে। পারুল তাঁর নাতনি, তাই ভয়টা কম। হাসির কথায় হেসে গড়িয়ে পড়তেন। কবি পড়া থামিয়ে জিজ্ঞেস করতেন, 'তোরা হাসছিস কেন?' অন্যরা সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে যেতেন। পারুল বলতেন, 'তুমি হাসির কথা বলছ, হাসব না?' কবি যে এ উত্তরে খুশি হতেন তা বোঝা যেত, কেননা বিচিত্রায় পাঠের আসর বসলে ডাক পড়ত পারুলের।

পাঁচ নম্বর বাড়ির বউ হয়ে এলেন পারুল। সৌদামিনী তখন গত হয়েছেন। কিন্তু সাবেক রীতি বদলায়নি। বউদের যেতে হয় তরকারি বানানোর আসরে। সুহাসিনী বসতেন একটা ন্যাড়া কাঠের তক্তায়। বাজার এসে নামাত ঝাঁকামুটে। বামুন ঠাকুর বসন্ত এসে দাঁড়াত নির্দেশের অপেক্ষায়। সুহাসিনী বলে দিতেন সকালে কী কী পদ রান্না হবে—সেই শুক্তো, ভাজাভুজি থেকে অম্বল পর্যন্ত। বউয়েরা বসতেন বঁটি এবং পিতলের গামলাভর্তি জল নিয়ে। দাসীরা খোসা-টোসা ছাড়িয়ে এনে দিলে বউয়েরা শাশুড়ির নির্দেশে কুটতেন ঝালের তরকারি, ঝোলের ব্যঞ্জন, কালিয়ার আলু, ঘণ্টর আলু, ঝুরো আলুভাজার আলু। পারুল যখন বউ হয়ে এসেছেন তখন হেঁসেলের আকার ক্রমশ ছোট হচ্ছে। ছোট কিন্তু সংক্ষিপ্ত নয়। তাই সুমিতেন্দ্রের স্মৃতিতে শুধু মায়ের কথাই আছে, 'আমি ছবির মতো আজও দেখতে পাই মা ঘোমটা মাথায় শাশুড়ির সামনে বসে তরকারি কেটে কেটে সামনের জলভর্তি গামলায় ফেলছেন আর তা ধুয়ে দাসীরা বড় বড় থালায় ভাগা দিয়ে তুলে রাখছে। তরকারি কাটার নানা ধরন ছিল বলে বামুন ঠাকুর কাটা আলুর চেহারা দেখেই বুঝতে পারত কোনটা মাংসের, কোনটা ঝোলের, কোনটা কালিয়ার, কোনটা চচ্চড়ির আর কোনটা ভাজার।'

ঠাকুরবাড়ির রন্ধন-বৈচিত্র্যের কথা সকলেই জানত। খাদ্যরসিক ছিলেন তাঁরা, খেয়ে খাইয়ে তৃপ্তি পেতেন। রান্না তখন মেয়েদের কাছে একটা শিল্প, আত্মপ্রকাশের একমাত্র উপায়। প্রতিদিনের রান্নাঘরে তাঁদের ঢুকতে না হলেও রান্না সব মেয়েই শিখতেন। আনুষঙ্গিক কাজে কেটে যেত বহু সময়। যেমন, বড়ি দেওয়া। সুমিতেন্দ্র দেখেছেন, 'সারা বছর হরেক রকমের নানাবিধ ডালের বড়ি দেওয়ার আসর বসত মা-দিদিমণিদের সামনে ওই তরকারির ঘরে। ...মা ও দিদিমণির সামনে মাঝখানে জাল লাগানো ছোট ছোট বড়ি দেবার খাট দেওয়া হত। ...জালের এক একটা খাট বড়িতে ভরে উঠত আর তা চলে যেত ভিতরের উঠোনের পাশ দিয়ে ঠাকুরঘরের ন্যাড়া ছাদে বা ভিতরবাড়ির বারান্দায় গোল গরাদের গায়ে হেলে পড়া সূর্যের আলোয় অথবা আমাদের উত্তরের রান্নাঘরের পাশের ছাদে মায়েদের সামনে থেকে এক একটি বড়ির খাট শেষ হচ্ছে ও তা.চলে যাচ্ছে রোদে ও সঙ্গে-সঙ্গে আরেকটা খালি জালের খাট মায়েদের সামনে বসিয়ে দিয়ে যাচ্ছে দাসীরা। এইভাবে প্রায় পনেরো দিন ধরে বড়ি দেওয়া হত তরকারির ঘরে ওই শীতের সকালে। কত রকমের কত ধরনের ছোট-বড়-ফুলে বড়ি হত মা দিদিমণির হাতে।'

পারুল ভাল পান সাজতেন। সেকালে বাড়ির বউদের এও একটা বড় কাজ ছিল। প্রতিদিন কয়েক শো পান সাজতে হত মেয়েদের। পান তাঁরা নিজেরাও খেতেন, অন্যরাও খেতেন।

প্রাত্যহিক প্রধান আহারের পরে, যাঁদের পানের নেশা ছিল না, তাঁরাও পান খেতেন। বাড়িতে যাঁরা আসতেন তাঁদের সবাইকে পান দেওয়া হত। সাধারণত পারুল পান সাজতেন চুন, খয়ের, সুপুরি, দারচিনি ও মৌরী দিয়ে। নানাভাবে পান মোড়া হত। সুমিতেন্দ্র দেখেছিলেন, 'তার মধ্যে মা যেটা বেশি করতেন, সেটা হত একটা ত্রিভুজাকৃতি। মাঝখানটায় গাঁথা থাকত একটা লবঙ্গ, নাকের নাকছাবির মতো। মা সামনে সাজিয়ে রাখা নানাজনের পানের ডিবেয় গুনে গুনে পান সাজিয়ে বন্ধ করে যার যার ঘরে পাঠিয়ে দিতেন।'

অবনীন্দ্রনাথের মেজো মেয়ে করুণা অল্প বয়সে তিনটি শিশুকে রেখে মারা যান। পারুল তাঁদের মাতৃস্নেহে মানুষ করেছিলেন নিজের সন্তানের মতো। এ সংবাদও দিয়েছেন সুমিতেন্দ্র। তিনি করুণার মেয়ে রেবার মুখে শুনেছিলেন, 'বিয়ের আগে পর্যন্ত তিনি আমার মাকে মা বলেই ডাকতেন। বিয়ের কথা যখন পাকা হয়ে গেল তখন একদিন মা দিদিকে ডেকে বললেন যে, বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে মামিমাকে মা বলে ডাকলে সেখানকার লোকেরা হয়তো অন্য কিছু ভাবতে বা মনে করতে পারে। তাই তখন থেকে দিদির 'মা' সম্বোধন মামিমায় রূপান্তরিত হল। তবে ওই সম্বোধনেই। ভিতরের সম্পর্কটা মা মেয়েরই ছিল—মামি ভাগনির নয়।'

জোড়াসাঁকোর বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েও মাঝে মাঝে মৌন বেদনায় গুমরে উঠত পারুলের মন, 'কেন ভাঙা হল বাড়িটা?' দ্বারকানাথ ঠাকুরের বৈঠকখানা বাড়ি যে মহর্ষিভবন নামে পরিচিত ৬ নং বাড়ির চল্লিশ বছর পরে তৈরি হয়েছিল। মাটির সঙ্গে ধুলো হয়ে মিশে না গিয়ে সে বাড়িটাও যদি দাঁড়িয়ে থাকত মহর্ষিভবনের পাশে তাহলে কত সুন্দর হত। মাঝে মাঝে দেখে আসা যেত।

বিনয়িনীর মেয়ে প্রতিমার কথা ছয় নং বাড়ির প্রসঙ্গে আগেই এসে গিয়েছে। প্রসঙ্গত মনে রাখা যেতে পারে, ঠাকুরবাড়ির যত সদস্যসংখ্যা বেড়েছে ততই বেড়েছে সম্পর্কের জটিলতা। এক একজনের সঙ্গে চার পাঁচটি আত্মীয়তাসূত্র। প্রতিমার দু'বারই বিবাহ হয়েছে পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে। নীলানাথ ও প্রতিমা দুজনেই ছিলেন গিরীন্দ্র পরিবারভুক্ত। কুমুদিনীর পৌত্র ছিলেন নীলানাথ, তাঁর ভাই গুণেন্দ্রনাথের দৌহিত্রী প্রতিমা। এমনই সম্পর্কের সূত্র ধরে বিনয়িনীর পুত্রবধূ চন্দ্রিমা ছিলেন কাদম্বিনীর পৌত্র যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা। অপরূপ রূপসী চন্দ্রিমার অনেক গুণও ছিল যা পরবর্তীকালে পরিবারের বাইরে ছড়িয়ে পড়েনি। লোরেটোয় শিক্ষা আরম্ভ করলেও ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য মেয়ের মতো খুব ভাল রান্না করতেন। তবে তাঁর আগ্রহ ছিল ছবি আঁকায়। যামিনীপ্রকাশ ছবি আঁকতেন, মেয়েরও ছবি এঁকেছিলেন। বাবার কাছেই কিংবা বাবাকে দেখেই ছবি আঁকতে শেখেন চন্দ্রিমা। এই সময়ে একই সঙ্গে বহু মহিলাশিল্পীর দেখা পাওয়া যায়। একথা ঠিক, আধুনিক শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে বহু অভিজাত পরিবারেই মেয়েদের অঙ্কনশিক্ষক থাকতেন এবং রং তুলি কাগজ ক্যানভাসের সঙ্গে তাঁদের বেশ ভালই পরিচয় ছিল। ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের সম্পর্কে এ কথা আরও প্রযোজ্য। তাঁদের নানা ধরনের বিধিনিষেধের মধ্যে থাকতে হত অথচ ছবির জগতে তাঁরা পেয়েছিলেন পরিপূর্ণ স্বাধীনতার স্বাদ। পরে চারু ও কারুশিল্প নামে শিল্পকলাকে ভাগ করে মেয়েদের প্রধানত কারুশিল্পী মনে করা যে কত ভুল ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের ছবি আঁকা দেখলে বোঝা যায়। তাঁরা আলপনা আঁকেননি, সেলাইয়ের কথা ভেবেও আঁকতে শেখেননি, ছবি আঁকবেন বলেই তুলি ধরেছিলেন, যদিও প্রদর্শনী বা প্রতিযোগিতায় অংশ নেননি বলে অনেকেই অপরিচিত রয়ে গিয়েছেন। চন্দ্রিমা তাঁদেরই একজন। শাশুড়ি বিনয়িনীর মতোই তিনি ছবি আঁকতেন চোখের আড়ালে। সামান্য কিছু এখনও রয়েছে পুত্রের ব্যক্তিগত সংগ্রহে।

সুনয়নীর চার মেয়ে চার ছেলে নিয়ে পরিপূর্ণ সংসার। বিয়ের পরে অনেকদিন তিনি সপরিবারে জোড়াসাঁকোতেই থেকেছেন, তারপর উঠে গিয়েছেন বেনেপুকুরে, তাঁর নিজের বাড়িতে। সেই বিশাল বাড়িতেও নানারকম আত্মীয়স্বজন, কর্মচারী, সরকার, কাজের লোক সব মিলে সদস্যসংখ্যা পৌঁছেছিল একশোর কাছে। আর সেখানে সুনয়নীর কাজে সাহায্য করতে একে একে এসেছিলেন চার পুত্রবধূ। বড় মেয়ে বীণার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল দিনেন্দ্রনাথের কিন্তু কৈশোরের সীমা পেরোবার আগেই বীণা ডিপথিরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান। প্রভাতী ও অনুজা গিয়ে পড়েন দুটি বৃহৎ পরিবারে। বউবাজারের রায় পরিবারে বিয়ে হয়েছিল প্রভাতীর, তাঁর চকমিলানো বিশাল শ্বশুরবাড়ি অনেকেরই চোখ টানত। অনুজার বিয়ে হয়েছিল কয়লাহাটা ঠাকুরবাড়িতে। অবশ্য তাঁর দিদিশাশুড়ি নৃপবালা ছিলেন কাদম্বিনী অর্থাৎ সুনয়নীর বড় পিসির মেয়ে। সেই অর্থে অনুজা তাঁদের ঘরের মেয়েই ছিলেন। তাঁর ননদ কল্যাণীই সুনয়নীর জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ।

মাত্র দশ বছর বয়সে কল্যাণীর বিয়ে হয় রতনমোহনের সঙ্গে। আত্মীয় এবং পালটি ঘরে খুশির তরঙ্গ ও নিশ্চিন্ততার আশ্বাস নিয়ে এসেছিলেন কল্যাণী। ভালবাসতেন লিখতে, ছবি আঁকতে, গুছিয়ে সংসার করতে। তাঁর বাবা জগদীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ছবি আঁকতেন। স্নেহের দুলালী একমাত্র মেয়েকে উৎসাহ দিতেন ছবি আঁকতে, মায়ের আগ্রহ ছিল মেয়েকে কঠিন সংসারের সবরকম আঘাত থেকে দূরে সরিয়ে রাখার, যদিও মাত্র দশ বছরেই মেয়েকে পাঠাতে হয়েছিল শ্বশুরবাড়ি। শ্বশুরবাড়িতে এসে কল্যাণী পেলেন অনুকূল পরিবেশ। সুনয়নী নিজেও শিল্পী, তাঁর পরিবারের অন্যান্য বধূরাও ছবি আঁকতে শিখেছিলেন। কল্যাণীর আঁকা ছবি কলকাতার চিত্র প্রদর্শনীতে শুধু স্থান পেয়েছিল তা নয়। পুরস্কৃতও হয়েছিল। তবে কল্যাণীর প্রধান পরিচয় তিনি একজন লেখিকা। কলকাতা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গেও তাঁর যোগ দীর্ঘদিনের। তাঁর সুমধুর কণ্ঠ পাঠকদের মন ছুঁতে পারত। তাই বারেবারে ডাক পড়ত আকাশবাণীতে। সেখানেই তিনি পাঠ করতে শুরু করেন স্বরচিত গল্প, কথিকা, কবিতা ইত্যাদি। নিজের কথা কল্যাণী এসব রচনায় কোথাও বলেননি। কিন্তু সব রচনাই কি কোনও না কোনও ভাবে আত্মকথা নয়? যাঁরা নিজের কথা লিখেছেন তাঁরাই বা কতটুকু বলতে পেরেছেন? কল্যাণীর লেখা গল্পগুলি মন দিয়ে পড়লেই বোঝা যায়, নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি গল্পগুলি লিখেছিলেন। বিশেষ করে যখন চোখে পড়ে 'গৌরী-দান' গল্পের রাণুকে। 'দশ বছরের রাণুর বিয়ে—বড় ঘর থেকে সম্বন্ধ এসেছে, ভাল ঘর-বর পেলে বিয়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। মার দিক থেকে ইচ্ছাটা প্রবল না হলেও বাবার যুক্তি অকাট্য। তাঁর ইচ্ছাই পূরণ করেছেন।' এখানে শুধু রাণু নয়, তার মায়ের মধ্যে চোখে পড়বে মহাপ্রভার ছায়া। 'নতুন বউ হয়ে এসেছিলেন বিদেশ থেকে—চেনা পরিচয় ছিল না কারও সঙ্গে, ননদ-জাদের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক পাতিয়ে নিলেন—তারাই ছিল সুখ-দুখের সাথী। সংসারের নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে অনেক কিছুই সইতে হয়েছিল তাঁকে। অবকাশ পেলেই ফাঁকা মনটা গুমরে উঠত সেই অতি প্রিয় গৃহটির জন্য। সে সব দিন তো অবাধেই জলের স্রোতের মতো কেটে গেল। সেই বন্দি জীবনটাও বনেদি ভিতের অন্তরালে স্বপ্নের মতো গেল মিলিয়ে।' এ তো শুধু রাণু আর তার মার কথা নয়, এ কল্যাণীরও কথা। না হলে গোলাপ ফুলের মতো রঙিন বাক্স দেখে বিস্ময় ও ঘাগরা পরা ডলিটার জন্য দুঃখ জীবন্ত হয়ে উঠত না। বস্তুত, 'গৌরী-দান' এক কথায় কয়লাহাটা ঠাকুরবাড়ির মেয়ের বিয়ের অনুপুঙ্খ বিবরণ। ঠাকুরবাড়ির বধূসজ্জা কিংবা নিয়মে যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল রাণুর বিয়েতেও তা রয়েছে। যেমন, 'কপালে কনে চন্দন লেপে দিয়ে ছোট হাতির দাঁতের চিরুনি দিয়ে টেনে দিলেন তার ওপর ছোট্ট একটি টিপ।' মাধবী এ কথাই লিখেছিলেন ঠাকুরবাড়ির কনে সাজানোর বৈশিষ্ট্য হিসেবে। বোঝা যায়, চারদিকে ছড়িয়ে পড়লেও সব বাড়িতে একই নিয়ম বজায় রেখেছিলেন ঠাকুরবংশের সদস্যরা। দ্বিতীয় আর একটি বৈশিষ্ট্য হল, 'প্রথানুরূপ সোনাবাঁধানো লোহা পরিয়ে

শরিফের জানালেন। তার মধ্যে আবার আমাদের সঙ্গে কোথা দিয়ে কার দূর হয়ে আত্মীয়তা বার হয়ে গেল। অবশ্য আমি বিশেষ কিছু বুঝলাম না।' পড়লেই বোঝা যায় কল্যাণী যা লিখেছেন তা তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সংগ্রহ করেছেন।

এরই সঙ্গে তিনি তৎকালীন আধুনিকাদের কথাও লিখেছেন। সোসাইটির আকর্ষণীয় সুন্দরীরা সেদিনও হাল্কা প্রজাপতির মতো ঘুরে বেড়ায়, পার্টির আসর থেকে ডান্সের মজলিসে তার অবাধ বিচরণ। কিন্তু এই মেয়েদেরও বিয়ে হত চিরকালীন প্রথায়। এদের মনে রঙিন স্বপ্ন আসত শিক্ষক বা অধ্যাপকের হাত ধরে, কখনও বা পরিবারের পরিচিত পরিবেশে সমবয়সী যুবকের ভালবাসার মধ্যে। কল্যাণী কোনও গল্পেই এদের পছন্দ-পাত্রীর মিলন ঘটাননি। ঘটাতে না চাননি ঘটাননি। কেননা মেয়েরা তখনও ভাবত 'বাঙালদেশের মেয়েদের নিজস্ব কোনও মত থাকতে পারে না। আর থাকাও উচিত নয়।' কল্যাণী ঠিক এভাবে না ভেবে মেয়েদের মনকেও বুঝতে চেয়েছেন। 'অনেকেই হয়তো বিয়েতে এইরূপ নীরব সম্মতিতে বিস্মিত হবেন কিন্তু আশ্চর্য হবার কিছু নেই। শ্রী পুত্র সন্দীপের রূপ আর অর্থের আকর্ষণই মিলিকে কাছে টেনে আনলো।' পাত্র নির্বাচন করা হত বংশ আর বিত্ত দেখে এবং এই নির্বাচনে সমর্থন করত মেয়ে নিজেও, যদিও তার মনে জেগে থাকত স্বপ্ন সেখানে দরিদ্র মধুসূদনী। কোনও কোনও সময় শিক্ষিত পাত্রের প্রতি মেয়ের বাবা আকৃষ্ট হলেও মেয়ের মা বলতেন, 'আমাদের এই একটা মেয়ে। আমাদেরও তো ইচ্ছে করে উপযুক্ত জামাই করতে। কলকাতায় থাকতে গেলে সোসাইটি না হলে আমাদের সোসাইটিতে চলে না—সেগুলি কি ওদের আছে? শুধু ভাল ছেলে হলেই তো সব হয় না।' কল্যাণী গল্প লিখেছেন সেই সময়ের মেয়েদের নিয়ে, যাদের কল্পনা রামধনুর মতো আকাশ ছুঁয়েছে কিন্তু বাস্তবকে সত্য করে তোলার মতো সাহস হয়নি। তাই 'বিলেত ফেরত ইঞ্জিনিয়ার' যার 'হাতে একটা হিরের আংটি আলো লেগে ঝলমল করছে' যা দেখে মেয়েদের মায়ের মন খুশিতে ভরে ওঠে' তাকে অপছন্দ হলেও 'মায়ের ভয়ে কিছু বলতে পারে না' এবং কিন বাবাতেই একদিন তাকে বিয়ে করে। এই শ্রী পাত্রটির জীবনের 'লৌকিক নারী সমাধান ঘটেছিল। 'অথচ বরুণকেও দোষ দেওয়া যায় না, সে তো নিজের কথার কাছে অনুমতি নিজেই বিয়ের প্রস্তাব করেছিল তার অভিভাবকের কাছে। হয়তো সেজন্যই ভিতর থেকে, আমার স্বামী রোজই সন্ধ্যায় বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে আমোদ আহ্লাদ করেন। আর যদি কোন দিন না থাকে আমায় পুরস্কৃত করেছেন প্রচুর। সে সব পুরস্কার আমার শরীরে সর্বাঙ্গ অলংকৃত হয়ে গেছে। ...স্বেচ্ছায় যে ভুল করেছি আজীবন তার প্রায়শ্চিত্ত করে যাব।' এইরকম টুকরো টুকরো ছবি ছড়িয়ে আছে 'মৌনরেখা'র গল্পগুলিতে, যার সামাজিক মূল্য কম নয়। এক সময়ের শিক্ষিত রূপসী শ্রী তনয়াদের চিত্তে যে বিবাহহীন মধুরতা ভেতর জন্ম হয়, তার ঐতিহাসিক অনেক লেখকের লেখাতেই পাওয়া যাবে। কিন্তু নারীমনের আলোআঁধার প্রতিফলক মেয়েদের লেখা গল্পে খোঁজ করলে হয়তো একমাত্র সেই সময়টাকে ধরা যাবে, যখন মেয়েদের মনের ভিত নড়ে উঠেছে। কল্যাণীর গল্পগুলিকে সেভাবেই দেখতে হবে।

গল্প ছাড়াও কল্যাণী লিখেছেন নাটক, বিশেষ করে হাসির নাটক। 'এক সন্ধ্যা' নিয়ে অভিনয় করিয়েছেন বাড়ির মেয়েদের দিয়ে, সেইসঙ্গে তাঁর বন্ধুবান্ধবী ও আত্মীয়স্বজনেরা। সেখানে ছিলেন তাঁর স্বামী ও মেয়েরা। তার নাটক দেখেছেন ও লেখকেরা। তার নাটক লেখায় সাহায্য করেছেন এই ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা। গল্প শুনিয়েছেন ও দেখিয়েছেন। কল্যাণীর শ্রী সুন্দরী ঘটিয়েছে বাড়িতেও মাঝে মাঝে অভিনয়ের আয়োজন করতেন। ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের আসরে একটি রূপ ধরে রেখেছিলেন। ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের মতো কল্যাণী শিক্ষা ও সমাজসেবার কাজে সব সময়ই এগিয়ে থাকতেন।

সংস্পর্শে এসেছিলেন। তখন কৃষ্ণভাবিনী তাঁকে বলেছিলেন, 'শিক্ষিত স্বামীর প্রকৃত সহধর্মিণী হতে গেলে স্ত্রীদের শিক্ষিতা হবে হবে।' সে কথা কল্যাণীর মনে ছিল তবে তিনি মনে করতেন, 'বর্তমানে দেশের যা পরিস্থিতি তাতে প্রত্যেক মেয়েরই আত্মনির্ভরশীল হওয়া প্রয়োজন। এইজন্য চাই শিক্ষা ও জীবনপথে চলবার সহজ জ্ঞান। প্রয়োজনবোধে মেয়েরাও যেন উপার্জনক্ষম হতে পারে—নিজের পায়ে দাঁড়াবার শক্তি অর্জন করে। স্বামীর মৃত্যুর পর বা সংসারের নানাবিধ জটিলতায় অনেক মেয়েই সহায়-সম্বলহীনা, নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে। তখন যদি তার উপযুক্ত শিক্ষা, মানসিক দৃঢ়তা ও আত্মনির্ভরশীলতা থাকে তাহলে সেই বিপদে সংগ্রাম করে সে উত্তীর্ণ হতে পারে। ...পরমুখাপেক্ষী হয়ে অপরের করুণা ভিক্ষা করে বাঁচার চেয়ে স্বাবলম্বী হয়ে বেঁচে থাকা অনেক শ্রেয়, অনেক গৌরবের।' বেতার ভাষণ হলেও পঞ্চাশ বছর আগে কল্যাণীর এই চিন্তা অত্যন্ত আধুনিক। জনকল্যাণের কাজেও তাঁর নাম মনে রাখা উচিত, কেননা নিজের টাকায় তিনি স্থাপন করেছিলেন কল্যাণী এক্স-রে ফান্ড, যা বেঙ্গল টিউবারকুলোসিস অ্যাসোসিয়েশনের একটি বিরাট অংশ। দুস্থ রোগীদের কল্যাণে এই অর্থ ব্যয় করা হয়।

মণিমালা এসেছিলেন বাইরে থেকে। শ্রীরামপুরের বিখ্যাত গোঁসাইবাড়ির মেয়ে হলেও অপরূপ রূপসী বলে বালিগঞ্জের অভিজাত পরিবারে অনায়াসে প্রবেশ করেন মাত্র বারো বছর বয়সে। ঠাকুরবাড়িতে, হয়তো অন্যান্য উচ্চবিত্ত পরিবারেও তখন বধূদের পরিবারের উপযোগী শিক্ষা দেবার নিয়ম ছিল। বিশেষ করে সেই মেয়ে যদি ভিন্ন পরিবার থেকে আসতেন। মণিমালার শিক্ষাও শুরু হয়েছিল ইংরেজ শিক্ষিকার কাছে। তাঁর স্বামী তখন উচ্চশিক্ষা নেবার জন্য বিলেতে। বালিকা বধূকে সর্বান্তঃকরণে তাঁর উপযোগী করে তোলার কাজ শুরু হল। মণিমালা ভর্তি হলেন ডায়োসেশন স্কুলে। বাড়িতে ছবি আঁকা শিখতেন কালীপদ ঘোষালের কাছে। পিয়ানো শেখাতে আসতেন এক বিদেশিনী শিক্ষয়িত্রী। সুনয়নী সুচারুভাবে তাঁর সবরকম শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। সেইসঙ্গে শিখতেন ঘরের কাজ। নিয়মমাফিক। সুনয়নীর পুত্রবধূরা তাঁর মতো না হলেও ভাল ছবি আঁকতেন কিন্তু তিনি তাঁদের শেখাবার ভার নেননি যদিও প্রচুর উৎসাহ দিতেন। মণিমালা সিনিয়র কেম্‌ব্রিজ পাশ করেন তবে কলেজে পড়েননি। সব দিক থেকেই তিনি ঠাকুরবাড়ির উপযুক্ত হয়ে ওঠেন কিন্তু বনেদিয়ানার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে যে জমিদারবাড়ির আবহাওয়া ছিল সেটা তাঁর ভাল লাগত না। একটা বিরাট পরিবর্তনের ঢেউ যে আসছে তাও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। ছেলেদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে নিয়ের পায়ে দাঁড় করাবার জন্যে তিনি তাঁদের পাঠিয়েছিলেন দুন স্কুলে। বাড়ি ছেড়ে এত দূরে লেখাপড়া শেখবার জন্যে ছোটদের ইতিপূর্বে কখনওই পাঠানো হয়নি। মণিমালার আন্তরিক চেষ্টাতেই তা সম্ভব হয়। এরপর মেয়েদেরও তিনি পাঠিয়েছিলেন গোখলে মেমোরিয়াল ও ব্রেবোর্ন কলেজে। এ দুটিও প্রচলিত রীতির অনুগামী নয়। আধুনিক ভাবধারার সঙ্গে সমান তালে এগোবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি শিখে নিয়েছিলেন সাবেক রীতি রেওয়াজ, খুব ভাল রাঁধতে পারতেন। কনে সাজাতেন আরও ভাল। সেবা, মধুর আপ্যায়নে মুগ্ধ করে রাখতেন সকলকে। তাঁর আঁকা ছবির সংখ্যাও কম নয়, যদিও সেগুলি নিয়ে কোনও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়নি। সেরকম কোনও বাসনাও তাঁর ছিল না। ছবি আঁকতেন নিজের শখে, সারদা সংঘের ফাউন্ডার মেম্বার ছিলেন তিনি, পরে হন সেখানকার ভাইস প্রেসিডেন্ট, আগ্রহ ছিল সেবায়, সুনয়নীও শেষ বয়সে তাঁর কাছে থাকতেই ভালবাসতেন। তাঁর ছবিগুলি সাজিয়ে গুছিয়ে অত্যন্ত আনন্দ পেতেন মণিমালা। কিছু কিছু লিখেছেনও তা কিন্তু নিজের কথা নয় শুধুই শাশুড়ি মা সুনয়নীর কথা। ছবিও এঁকেছিলেন তাঁর। সেইসঙ্গে কিছু অন্যান্য ছবি, তার মধ্যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একাধিক প্রতিকৃতিও রয়েছে।

সুনয়নীর আর, এক পুত্রবধূ বীণাপাণিও ঠাকুরবাড়ির মেয়ে, পাথুরিয়াঘাটার বাড়ি থেকে এলেন বলে জোড়াসাঁকোর ৬ নং বাড়ি আর মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ির কেউ বিয়েতে এলেন না, পরেও তাঁরা সুনয়নীর নতুন আত্মীয়দের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে খেতে বসতেন না। বীণাকে অপছন্দ হয়নি তা বলে, এ হল দুই বাড়ির তৈরি করা অদৃশ্য নিয়ম। সম্ভবত হিন্দু ও ব্রাহ্ম বলেই বিবাদটা জিইয়ে রাখা হয়েছিল এতদিন।

বিয়ের পরে বীণার শিক্ষা শুরু হল। ভাল গান জানতেন বীণা। ঠাকুরবাড়ির বিরোধ বেঁচে থাকলেও রবীন্দ্রসংগীত ভালবাসতেন তাঁরা, সব বিরোধিতার উর্ধ্বে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর শান্তিনিকেতন। বীণা কবিতা লিখেছেন তাঁকে নিয়ে,

'বহুকাল আগে এক বৈশাখী দিনেতে
ভিড়েছিল গানের তরী জাহ্নবী কূলেতে
আজ যদি এল সেই পঁচিশে বৈশাখ
ওরে তোরা খোল দ্বার বাজা রে শাঁখ।'..

এ কবিতা অবশ্য অনেক পরে লেখা। তবে লেখার ঝোঁক তাঁর ছেলেবেলা থেকেই ছিল। বাপের বাড়িতেও ছিল উপযুক্ত পরিবেশ। দাদারা গান গাইতেন, লিখতেন, ছবি আঁকতেন। বিশেষ করে প্রবোধেন্দুনাথ। খুব অল্প বয়সেই তিনি লিখতে শুরু করেন। বীণার দিদি সুব্রতাও খুব ভাল ছবি আঁকতেন। তাঁদের মামা হিরণ্ময় রায়চৌধুরী ছিলেন শিল্পী, প্রবোধেন্দু আর সুব্রতা তাঁর কাছেই ছবি আঁকা শেখেন। বীণাকে শিক্ষকের কাছে বসতে হত শ্বশুরবাড়িতে এসে। ছবি আঁকার চেয়ে তিনি বেশি ভালবাসতেন ছবি সেলাই করতে। হাতের কাজ ছিল পরিষ্কার। এক সময়ে কার্পেটের ছবি জনপ্রিয়তার তুঙ্গে ওঠে। কার্পেটের ছবি, বিশেষ করে অন্নপূর্ণা বা বসতবাটি যাই হোক না কেন, প্রতিটি বাড়ির দেয়ালে বাঁধিয়ে টাঙানো ছিল বাঙালির গৃহসজ্জার অন্যতম অঙ্গ। বীণার ছবি বোনা সমর্থন পেয়েছিল সুনয়নীর, এও তো একরকম শিল্পের বহিঃপ্রকাশ, সব মাধ্যমই যে এক হবে তার তো কোনও মানে নেই। কালীপদ ঘোষালের কাছে বীণা শিখেছিলেন বাতিকের কাজ। যদিও লেখার আগ্রহই ছিল বেশি। তাও নিজের মনে। গল্প কবিতা যাই লিখুন না কেন, সেগুলি কোথাও ছাপার জন্যে তিনি পাঠাননি। যখনই কোথাও বেড়াতে গিয়েছেন লিখে রেখেছেন নিজের অভিজ্ঞতার কথা। তবে কবিতাই বেশি। একটির নাম 'বীজমন্ত্র':

'প্রথম যেদিন এলাম আমি
এই ধরণীর বুকে
মাতৃনামের বীজমন্ত্র
উচ্চারিনু মুখে।
সেদিন থেকে আজ অবধি
ডাকছি মা মা বলে
অন্য নামে দীক্ষা নেওয়া
আর কি আমায় সাজে ॥'

সরোজাসুন্দরীর দুটি নাতনিকে কোনওক্রমেই ভুলে গেলে চলবে না। তাঁরা উত্তরাধিকার সূত্রে দুটি বিখ্যাত পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হয়েও দুটি যৌথ পরিবারের ভাঙন প্রত্যক্ষ করেছেন।

অনেক কথাই হয়তো জানা হত না পূর্ণিমা যদি না শেষ জীবনে নিজের কথা, নিজের পরিবারের কথা, বিশেষ করে ঠাকুরবাড়ির কথা লিখে রাখতেন। তাঁর 'নানা রঙের দিনগুলি' আসলে বিচিত্র অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্যময় স্মৃতিচিত্র। সময়ের সঙ্গে নারীমনের মানসিক মানচিত্রের পরিবর্তন ঘটছিল। পিছন ফিরে তাকাতে বসে পূর্ণিমা প্রথমেই বলেছেন, 'আমার যখন দশ বছর বয়স তখন আমি ফ্রক পরে স্কুলে যাই। অথচ দশ বছর বয়সে আমার মার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল।' অনেকখানি কথা এক নিমেষে অশ্রু ভাসিয়ে বলে দেওয়াই পূর্ণিমার লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। হয়তো তাঁর সত্যকথনের ভঙ্গি ও নিষ্ঠা কোনও কোনও সময়ে কারও কারও অস্বস্তির কারণ ঘটিয়েছে। কিন্তু ম্যাকলাউড স্ট্রিটের প্রাসাদোপম বাড়িটি অনেকখানি প্রাণ পেয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। জোড়াসাঁকো, পাথুরিয়াঘাটা এবং কয়লাহাটা—তিন ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে পূর্ণিমার যোগ ছিল। তিনি ঠাকুরদের 'দল কাটাকাটি'র ব্যাপারে উৎসাহবোধ করেননি, বরং শৈশবে অনেক বাধা ছিল বলে দুঃখ বোধ করতেন।

অবশ্য সবাই যা জানে, সেটা একটা সহজ-সরল ঘটনা। নীলমণি ও দর্পনারায়ণ দুই ভাইয়ের সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ-বিতর্ক এবং তার জেরে নীলমণি ঠাকুরের সপরিবারে গৃহত্যাগ শুধু এই একটি ঘটনাই কি চিরকালের মতো বিরোধের প্রাচীর তুলে দিয়েছিল? এই বিরোধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ত সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলিও। চট্টোপাধ্যায় পরিবার, মুখুজ্জে পরিবার, গাঙ্গুলি পরিবার প্রভৃতি তো বিবাহসূত্রে ঠাকুরদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন, পরে তাঁরাও কেন ভাগ হয়ে গেলেন দুই পরিবারের সঙ্গে? পুরুষেরা সহজেই দেখাসাক্ষাৎ করতেন, আসা-যাওয়া, গল্প করা, আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণ—সবই বজায় ছিল। অথচ পূর্ণিমা লক্ষ করলেন, সুনয়নীর মেয়ে রচনার যখন বিয়ে হল প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের মেজো ছেলে প্রশান্তনাথের সঙ্গে, তখন 'জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি আর আমাদের বাড়ি থেকে মেয়েরা কেউ প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের বাড়ির নিমন্ত্রণে গেলেন না। বৈবাহিক যোগাযোগ হলেও সামাজিক যোগাযোগ হল না। দিদিমার বাড়িতেও আমরা কেউ ওঁদের বাড়ির নিমন্ত্রিত নূতন কুটুম্বদের সঙ্গে খেতে বসতুম না।' সুনয়নীর এ ব্যাপারে উদারতা ছিল। তিনি তাঁর দুই ছেলের বউ এনেছিলেন কয়লাহাটা ও দর্পনারায়ণ ঠাকুরের শাখা থেকে। মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের পরিবারের সঙ্গেও ঠাকুরবাড়ির যোগ ছিল না, তাঁর দৌহিত্র জলধি মুখোপাধ্যায়ের মেয়ে প্রকৃতিই পূর্ণিমার মা। তাঁর বিয়েতে একটা গণ্ডগোল হয়েছিল ঠিকই, মোহিনীমোহনের বিচক্ষণতায় তা মিটেও গিয়েছিল। কিন্তু পূর্ণিমা মাকে বাপের বাড়ি যেতে দেখতেন বছরে একটিমাত্র দিন। এর কারণও বোধহয় লুকিয়ে আছে পূর্ণিমার লেখায়, '...জলধি মুখুজ্জি কোনওদিন ভুলতে পারেননি যে, তিনি মহারাজার নাতি।' এবং '...আমার দিদিমাও ভুলতে পারেননি যে, তিনি কয়লাঘাটার ঠাকুরবাড়ির মেয়ে আর রাজবাড়ির বউ।' এই ভুলতে না পারা প্রকৃতির মধ্যেও ছিল, তিনি যে বাড়ির বউ সেই বাড়ির এবং তাঁর শাশুড়ি যে বাড়ির মেয়ে সেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির রীতি মেনেই বাপের বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় ছিন্ন করতে দ্বিধা করেননি। এই আভিজাত্যচেতনা ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের একদিকে যেমন পুরনো বিবাদের জের টানতে সাহায্য করেছে, অপরদিকে অসামান্য গুণের অধিকারী করে তুলেছে। আভিজাত্যের সঙ্গে আধুনিকতা, সূক্ষ্ম রুচি, অসাধারণ শিল্পবোধ, যে কোনও অবস্থায় পারিপার্শ্বিক জগৎকে সুন্দরের রঙ্গভূমিতে পরিণত করার ক্ষমতা যেন তাঁদের সহজাত।

পূর্ণিমা এবং তাঁর বোন সুজাতাও নানা গুণের অধিকারিণী ছিলেন। ডায়োসেশনে পড়তেন। স্বাধীনচেতা পূর্ণিমা একদিন তাঁর মাকে জানালেন, 'ছবি আঁকা শিখতে চাই—আর্ট স্কুলে ভর্তি হব।' ছবি আঁকার আগ্রহ পূর্ণিমার মনে অনেকদিন ধরেই ছিল। তাঁর মা ও দাদামশাই খুব ভাল ছবি আঁকতেন, ন' দিদিমা সুনয়নী ছবি আঁকতেন। এখন জানা যাচ্ছে, সে সময়ে আরও অনেক মেয়ে ছবি আঁকতেন। সুনয়নীর পুত্রবধূদের ছবি আঁকা শেখাবার শিক্ষক ছিল, জোড়াসাঁকোর বাড়িতেও অনেক ছবি আঁকতেন। কাজেই পূর্ণিমার ছবি আঁকা শেখার জন্যে আর্ট স্কুলে ভর্তি

হবার ইচ্ছে খুবই স্বাভাবিক। সরস্বতী পুজোর সময় তিনি পুজো দেখতে যেতেন সুকৃতীর বাড়িতে, কারণ তাঁদের বাড়িতে পুজো হত না। সেখানে দেবীকে প্রণাম করবার সময় হাতজোড় করে প্রার্থনা জানাতেন, 'তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো আমি যেন রং আর তুলি দিয়ে ছবি আঁকতে পারি। আমার এই একান্ত বাসনা যেন তোমার ইচ্ছেয় পূর্ণ হয়।'

সুরুচির মা প্রকৃতি অবশ্য মেয়েকে ছবি আঁকায় উৎসাহ দিতেন কিনা জানা যায়নি। শিল্পী প্রকৃতি সম্পর্কে সুরুচি খুব কমই বলেছেন, 'মা ছবি আঁকতেন খুব ভাল।' শুধু এইটুকু। অথচ তিনি তো অনেক কিছুই বলতে পারতেন। তাঁর অঙ্কনশিক্ষার প্রাথমিক শিক্ষা কি তিনি মায়ের কাছেই পাননি? সে কথা কিছুই জানা যায়নি। সুরুচিকে প্রকৃতি বলেছিলেন, 'আগে তুমি পড়াশোনা শেষ করো—তারপর বাড়িতে মাস্টার রাখা হবে, তুমি ছবি আঁকতে শিখো।' একথার মূল কারণ হল, 'মোহিনীবাবু কো-এডুকেশনে বিশ্বাস করতেন না। ...আমার আর্ট স্কুলে ভর্তি হবার সম্বন্ধেও তাঁর আপত্তি ছিল।' সুরুচি অবশ্য আর্ট স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন, কেননা 'তুলি আর রং ছিল আমার সত্যিকারের দিক। আমি কল্পনা করতুম যে, আমি ছবি এঁকে খুব নাম করব।' তবে সে অনেক পরের কথা। তখন প্রকৃতির মৃত্যু হয়েছে। তাঁ বাবুদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সুরুচি জেনেছেন সোনার খনির ব্যবসা করতে গিয়ে বহু টাকা লোকসান করেছেন তাঁর বাবা মহীমোহন। 'চল্লিশ বছরের মধ্যে ঠাকুরমার মায়ের যৌথ পরিবার খেয়েছুয়ে আলাদা হয়ে গেল। ...আমরা একই বাড়িতে রইলুম, কিন্তু খাবার ব্যবস্থা আলাদা হয়ে গেল। ...অত জমজমাটি বাড়ির গমগমে ভাব চোখের পলকে সব নিঃশেষ। ঐশ্বর্য গেল, জাঁকজমক গেল—মানুষগুলোও অনেকেই রইল না।'

আর্ট স্কুলে ভর্তি হবার আগে সুরুচি একটি স্কুলে কাজ নিলেন। সরলা তখন কলকাতায় ফিরে এসেছেন। ঝাউ লেনে একটি স্কুলও করেছেন। সেখানে তিনিই সুরুচিকে নিয়ে গেলেন। বললেন, 'তুই পড়িয়ে দেখ, হয়তো ভাল লাগবে।' কাজের মধ্যে সুরুচি কিছুটা সুস্থ হলেন। তাঁদের দুঃসময় যদিও কাটল না বরং মহীমোহনেরও মৃত্যু ঘটায় তাঁরা তিন ভাই বোন 'অনাথ' এবং 'অসহায়' হয়ে পড়লেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ছায়াও একটু একটু করে ঘনাচ্ছিল। এমনই কোনও সময়ে আর্ট স্কুলে মেয়েদের বিভাগ খোলা হলে মুকুল দে তাঁর স্ত্রী বীণা ও সুরুচিকে সেখানে ভর্তি হতে বললেন। মুকুল দে-র আর্ট স্কুলে সুরুচি তাঁর মায়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে আসতেন, বীণা দে-র সঙ্গে বন্ধুত্বও গড়ে উঠেছিল। এবার তাঁরা জয়নুল আবেদিনের কাছে ছবি আঁকা শুরু করলেন, 'মার মৃত্যুর পর এই তুলি আর রঙের খেলার মধ্যে আমি ফিরে পেলুম সামান্য আনন্দের স্বাদ।' তবে যুদ্ধ শুরু হওয়ায় তাঁর শিল্পশিক্ষা বেশিদূর এগোয়নি।

ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের কথায় ফিরে ফিরে আসে রবীন্দ্রনাথের কথা। বিশ্বকবিকে আত্মীয় পরিজনের লেখায় নতুন করে পাওয়া যায়। সুরুচি কবিকে কয়েকবার দেখলেও তাঁর মনে দুঃখ ছিল, কবিকে কেউ তাঁর পরিচয়টি দেয়নি। প্রকৃতির মৃত্যুর পরে এবং এবার স্বামী হারানো মায়ের আকস্মিক মৃত্যুর পরে কিছুটা শান্তি পাবার আশাতেই শান্তিনিকেতনে গেলেন সুরুচি, এবং ও তাঁর ছেলে রথেন। কবি পুনশ্চতে তাঁদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। '...আমরা সিঁড়ি বেয়ে প্রণাম করলুম। এপাশিপি আমাকে দেখিয়ে বললেন, সরোজাপিসির নাতনি। খুশি হল আমার বড়দিদের ইচ্ছে। বিকেলে আমরা কর্তাবাবার কাছে গিয়ে বসতুম। তিনি কথা বলতেন, আমরা শুনতুম। ঘরে ফিরে এসে মনে হত, কর্তাবাবার গৌরোজ্জ্বল যেন উপাসনা করে ফিরে এলাম।' একদিন কবি সুরুচিকে বললেন, 'আমি তোর একটা ছবি আঁকব।' আঁকলেনও। সময় বেশি লাগল না। তারপর বললেন, 'দেখ তোর ছবি।' সুরুচি কোনও কথা বলছেন না দেখে বললেন, 'চিনতে পারছিস না? আমি তো আগেই বলেছিলুম, আমি আমার চোখে যাকে দেখি তেমনি আঁকি।' কবি সুরুচির মুখে কী দেখেছিলেন তা সুরুচিকে বলেননি, বলেছিলেন কৃষ্ণ কৃপালনীকে, 'এ খুব আঘাত পেয়েছে। ও তা ঢাকতে পারছে না। মর্মান্তিক দুঃখের ছাপ রয়েছে ওর চোখেমুখে।'

ছবিতে আমি সেটা ফুটিয়ে তুলেছি।' পরে সুরভি এণাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তুমি কি তোমার রবি-দাদামশায়কে আমার সম্বন্ধে কিছু বলেছিলে?' এণা বলেছিলেন, 'না, সুযোগ পাইনি।' সুরভি বুঝতে পেরেছিলেন, 'যে নিজে আঘাত পায় সে-ই অন্যের আঘাতের রূপ চিনতে পারে। রবীন্দ্রনাথ জীবনে বহুবার মর্মান্তিক শোক পেয়েছেন, তাই আমার ভিতরকার শোকার্ত চেহারাটা তাঁর অন্তর্ভেদি দৃষ্টিতে সহজেই ধরা পড়েছিল।' সুরভি তাঁর ছবিখানি পাননি। তিনি কবিকে বলেছিলেন, 'ছবিটি আমায় দেবেন?' কবি বলেছিলেন, 'তোকে দেব কেন? ছবি তো আমি আঁকলুম। ছবি আমার।' ছবি না পাওয়ায় সুরভি দুঃখিত হননি কিন্তু কোন ছবিটির তিনি মডেল হয়েছিলেন পরে বোধহয় তা জানা যায়নি। সুরভির সঙ্গে তোলা কবির একটিমাত্র ছবিও সুরভির সঞ্চয়ে পরবর্তীকালে ছিল না।

সুরভি তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে সিমলায় চলে যান এবং সেখানে সংবাদপত্র অফিসে অনুবাদের কাজ নেন। 'তখন বার্লিন, রোম, টোকিও থেকে বাংলাভাষায় যুদ্ধের খবরাখবর আসত। সেইগুলি টেপ করা থাকত। আমি সকালে গিয়ে টেপ চালিয়ে বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে বড় সাহেবকে দিয়ে, দুপুরে বাড়ি চলে আসতুম।' এ সময়কার দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা সুরভি উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি হল সুভাষচন্দ্র বসুর কথা। তাঁর দুই পিসি গীতা ও দীপ্তির সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের পরিচয় ছিল, তাঁদের ম্যাকলাউড স্ট্রিটের বাড়িতে সুভাষচন্দ্র এসেছিলেন। 'যুদ্ধের সময় সুভাষ বোস শাসনকর্তাদের সশস্ত্র ও সজাগ পুলিশবাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে জার্মানি চলে যান। বিদেশে তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন। একদিন সকালে বড় সাহেব আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, আজ রাতে তোমাকে আবার আপিসে আসতে হবে। রাতে সুভাষ বোস কিছু বলবেন। কিছু লিখে রাখতে পারবে না, বা পরে কারও সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করতেও পারবে না। আমি কথা দিলে উনি বিশ্বাস করলেন।

'সুভাষচন্দ্র বসু জার্মান সাবমেরিনে করে জাপান আসেন। জাপানে পৌঁছে তিনি জার্মান অফিসারদের ধন্যবাদ দেন। তিনি বাংলা, হিন্দি আর ইংরেজি এই তিনটি ভাষায় ভাষণ দেন। প্রত্যেক ভাষণের পরে সতেজে বলে ওঠেন, জয় হিন্দ।'

অপর ঘটনাটি হল, পুনার আগা খান প্রাসাদে গৃহবন্দি মহাত্মা গান্ধীর অনশনের খবর। '...সেইদিন সকালে তাঁর অবস্থা খুব খারাপ। আমি কানে হেডফোন লাগিয়ে শুনছি—তবে কিছুই লিখছি না, মনে মনে ঠিক করেছি, মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু ঘটলে আমি এ আপিস ছেড়ে চলে যাব—আর ফিরব না।'

এ দুটি ঘটনা থেকে সুরভির চাকরি-জীবনের বৈচিত্র্যও ধরা পড়ে। ঠিক সেই ভূমিকায় ঠাকুরবাড়ির কোনও মেয়েকে ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। এর পরে তিনি বিয়ে করেন। যদিও বাঙালি মেয়েদের তুলনায় তাঁর বিয়ের বয়স কিছু বেশিই হয়েছিল, তবে মোহিনীমোহনের পরিবারে মেয়েদের অবিবাহিত থাকা কোনও নতুন ঘটনা নয়। তাঁর দুই পিসি অবিবাহিত ছিলেন। তবু যিনি সুরভিকে দু'বার বিয়ের প্রস্তাব দেন তিনি ছিলেন সুরভির বড় পিসি সুমনার 'সৎ ছেলে' সুদেব ভট্টাচার্য। সুরভি লিখেছেন, 'পিসির সৎ ছেলে হিসেবেই ওর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। তখন ওকে আমরা ভাইবোনেরা সবাই দাদা বলে ডাকতুম। প্রেম না থাকলেও বন্ধুত্ব ছিল।' রক্তের কোনও সম্পর্ক না থাকলেও এই অসামাজিক বিয়ে ঝড় তুলতে পারে ভেবে সুরভি প্রথমে সুদেবের প্রস্তাবে রাজি হননি। পরে মত বদলে কলকাতায় ফিরে আসেন ও সুদেবকে জানান, 'ম্যাকলাউড স্ট্রিটের বাড়ির সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক কেটে গেছে। আমাকে বিয়ে করতে হলে, তোমাকে হাইকোর্টের বিবাহ-রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে বিয়ে করতে হবে। আমি কারও কাছ থেকেই কোনও সাহায্য চাইব না।' সুদেব সম্মত হলেন এবং আত্মীয়স্বজনেরা জানার আগেই তাঁদের বিয়ে হয়ে গেল। অবশ্য সুদেবের মামাতো ভাইরা তাঁদের সাহায্য করেছিলেন। সুরভির আত্মকথা পড়তে বসে তাঁর মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় পেয়ে চমৎকৃত হতে

হয়। কত সহজে তিনি লিখেছেন, 'তার পর দিন স্টেটসম্যানে আমাদের বিয়ের খবর ছাপা হল। তাতে মোহিনীমোহনের নাতনি হিসাবে আমার পরিচয় ছিল। তখন কলকাতা জুড়ে যত আত্মীয়স্বজনের মধ্যে সে কি হইচই—চারদিকে হায়-হায় গেল গেল রব উঠল।' সবার আগে তাঁদের স্বীকৃতি দেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সৌদামিনীর নাতি সুপ্রকাশ ও তাঁর স্ত্রী তনুজা, তিনি আবার পাঁচ নং বাড়ির কুমুদিনীর পরিবারের একজন। রবীন্দ্রনাথের মেয়ে মীরাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন নব দম্পতিকে আশীর্বাদ করার জন্যে। তনুজার মুখে খবর পেয়ে ম্যাকলাউড স্ট্রিট থেকে এলেন নয়নমোহনের স্ত্রী মমতা। নিয়ে গেলেন বাড়িতে, ক্রমে সকলেই এলেন। 'আমার মনে যে একটা আতঙ্ক ছিল সেটা পুরোপুরি কেটে গেল। ...সব দিক থেকেই আমি সুখী হলুম।'

স্বামী সন্তান সংসার নিয়ে মগ্ন থাকলেও সুরভির কর্মময় জীবনের অনেকখানি কেটেছে কলকাতা থেকে দূরে, বম্বেতে। সেখানে ১৯৫৩ সালে সুরভি একটি হস্তশিল্প প্রদর্শনী করেন। হবিজ অ্যান্ড হ্যান্ডক্রাফট্‌স। সুরভি নিজে শিল্পী ছিলেন। দেখবার মতো চোখ ছিল তাঁর। তাই নানা আকারের মাটির পাত্রে ছবি এঁকে সবাইকে মুগ্ধ করেছিলেন। ধারাবির কুমোর পল্লী থেকে প্রদর্শনীর জন্যে ছোট-বড় ঘড়া, কলসি, মটকা, নল মটকা প্রভৃতি জলপাত্র কিনে নিয়ে এলেন, তাতে অলঙ্করণের ছোঁয়া লাগতেই সেগুলি আর সামান্য মাটির পাত্র রইল না, ঘর সাজানোর উপকরণ হয়ে উঠল। এই সময় লেখালেখিও শুরু করলেন সুরভি। স্ট্যানভ্যাক হাউস ম্যাগাজিন, ফেমিনা, ইলাসট্রেটেড উইকলি, টাইমস অব ইন্ডিয়া প্রভৃতিতে ছাপা হয় সুরভির লেখা। বেশিরভাগই শিল্প সংক্রান্ত। যেমন, বাঁকুড়ার ঘোড়া, বালুচরী ও ঢাকাই শাড়ি, চিরুনি প্রভৃতি। '১৯৫৩ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত আমি অনেক লিখেছি—যার সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া আজ আর সম্ভব নয়। তবে এ মনে আছে যে, তখন দিনগুলো কেটেছে বেশ আনন্দে—ভিন্ন ভিন্ন কাগজের জন্যে লিখে। 'সামান্য হলেও নিজস্ব উপার্জন করার আনন্দটা খুবই উপভোগ করতুম' লিখেছেন সুরভি। শুধু লেখা নয় বিজ্ঞাপন জগতের নামকরা এজেন্সিগুলির সঙ্গেও কাজ করেছিলেন তিনি। এরপর তিনি ডাক পেলেন মিউজিয়াম থেকে। তিনি প্রথমে মিউজিয়াম সোসাইটির চেয়ারম্যান ও পরে অন্যতম ট্রাস্টি নিযুক্ত হন। অবাক হয়েছিলেন সুরভি নিজেও, 'সব দেশেই তো মান্যগণ্য ব্যক্তিরাই মিউজিয়ামের ট্রাস্টি হন। আমি তো সাধারণ একজন গৃহিণী মাত্র।' কিন্তু সুরভিকে চিনতে নির্বাচকদের কোনও ভুল হয়নি। অসংখ্য কাজের মধ্যে তিনি আশাতীত সাফল্য অর্জন করেছিলেন। ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা যে তাঁর পারিপার্শ্বিক জগৎকে সুন্দর করে তোলেন, সুরভি নতুন করে আবার তা প্রমাণ করলেন। গতানুগতিকতার মধ্যে নিয়ে এলেন গতি। ভারতীয় শিল্প ও ভারতীয় নৃত্যকে নতুন করে সবার সামনে নিয়ে এলেন। পরিণত বয়সে তিনি যখন স্মৃতিকথা লিখতে বসেছেন তখন শোকতাপে জর্জরিত তাঁর মন, হারিয়েছেন অনেক প্রিয়জনকে। কিন্তু স্মৃতিকথাটি আশ্চর্যভাবে জীবন্ত, 'দুঃখের দিনের কালো মেঘ, সব মিলিয়ে গিয়ে মন রাঙিয়ে উঠেছে খুশির রামধনু রঙে।'

সুরভির বোন সুজাতা। নয়নমোহন ও মমতার একমাত্র সন্তান। সরোজাসুন্দরীর আর এক নাতনি। শৈশবেই বাবাকে হারান। আর পাঁচজন মেয়ের সঙ্গে প্রথম জীবনে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। অন্য বোনেদের মতো ডায়োসেশনে পড়তেন। গান শিখতেন। হাতের লেখা সুন্দর ছিল বলে বড়মা হেমলতা 'বঙ্গলক্ষ্মী'র জন্যে যা লিখতেন সবই কপি করে দিতে হত সুজাতাকে। তবু নিজে কিছু লেখার কথা ভাবতেন না। বিয়ে হয়ে গেল যথাসময়ে, সুজাতা কলকাতা ছেড়ে চলে গেলেন স্বামীর কর্মক্ষেত্র শ্রীরামপুরে। ক্রমে শ্রীরামপুর তাঁর নিজের কর্মক্ষেত্র হয়ে উঠল। ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের সমাজসেবার ঝোঁক ছিল, সুজাতার দুই পিসি গীতা ও দীপ্তি

সমাজসেবিকা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। বড়মা হেমলতা যুক্ত ছিলেন নানা কাজে। বাড়ির মেয়ে ও বউদেরও তিনি যুক্ত করেছিলেন 'বঙ্গলক্ষ্মী'র সঙ্গে। সুজাতা কলকাতায় না থাকলেও শ্রীরামপুরে নিজের বাড়িতেই খোলেন একটি বয়স্ক শিক্ষার স্কুল। অনেকদিন আগে দিনেন্দ্রনাথ একটি অটোগ্রাফের খাতা কিনে রবীন্দ্রনাথকে দিয়েছিলেন সুজাতার জন্যে কিছু লিখে দেবার জন্যে। কবি তাঁর নামের সঙ্গে মিলিয়ে একটি কবিতা লিখে দিয়েছিলেন স্বাক্ষর সমেত।

'সংসারের খরতাপে রিক্ত যার প্রাণ
সুজাতা, অমৃতপাত্রে কোরো তারে দান।' (৪.১০.১৯২৯)

সুজাতা সেই কাজই হাতে তুলে নিলেন। সংসারের তাপে ঝলসে যাওয়া নারীদের শিক্ষা ও স্বনির্ভর করে তোলার কাজে তিনি কাটিয়েছেন বহু বছর। তার সূচনা হয় শ্রীরামপুরেই। তাঁর মেয়ে ঋতা লিখেছেন, 'আমি একটু বড় হবার পর দেখতাম দুপুরবেলা পিছনের গাড়িবারান্দার সামনের ঘরটাতে বয়স্ক সাক্ষরতার ক্লাস বসাতেন মা। অন্যপাশে সমিতির মেয়েরা সেলাই ফোঁড়াই করত। ...ছাত্রীদের কারও নাম চঞ্চলা, কেউ কুরের মা, কেউ কিরণশশী, কেউ বা নয়নতারা।' একবার সরকারি অনুদানের প্রস্তাব এল। পরিদর্শক আসবেন বলে ছাত্রীদের বিশেষভাবে তৈরি করা হল। সে কি সহজ কাজ? বিশেষ করে চল্লিশের দশকে, তখন মেয়েরা আরও আত্মবিস্মৃত এবং অসচেতন। 'মা কেবলই বলতেন শুনতুম—চঞ্চলা, বল বয়ে আকার বা আর ঘ, বাঘ। আর চঞ্চলা দিব্যি ঘাড় নেড়ে—এই যে মা, ব আর ট বাঘ বলত পরম আত্মবিশ্বাসে। মা অধৈর্য হয়ে বলতেন, স্কুল পরিদর্শকের সামনে এরকম বানান করলে অনুদান তো পাওয়াই যাবে না, উপরন্তু এইরকম শেখাচ্ছি জানলে স্কুলই না উঠে যায়।' অবশ্য শেষ পর্যন্ত সরকারি অনুদান নামঞ্জুর হয়নি। সমিতির মেয়েদের হাতের কাজ বিক্রি করার জন্যে একবার একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করলেন সুজাতা। সামান্য ডালমুটের প্যাকেট, নকুলদানা, চিনির রসে চিনেবাদাম, রকমারি নকশার রুমাল, টেবিলক্লথ এবং আরও অনেক কিছুর পসরা সাজিয়ে বসলেন মেয়েরা। সুজাতা স্টলের সামনে সাঁচির তোরণের ঢংয়ে তৈরি করলেন একটি সুন্দর গেট কলাগাছের খোড় আর রাংতা দিয়ে। সবার চোখ টানল সেটা। জিনিসপত্রও সব বিক্রি হয়ে গেল। দুস্থ মেয়েরা হাতের কাজের মূল্য নতুন করে যেন বুঝলেন। নিজের পায়ে দাঁড়াবার সত্যিকারের উৎসাহ এল তারপর থেকে। অথচ শ্রমিক নারীরা সব সময়েই উপার্জন করতেন, তাঁরা তো কাজই করতেন। তবে দরিদ্রমাত্রেই যে বাড়ির বাইরে কাজ করতেন তা তো নয়, এভাবে তাঁরা সামান্য হলেও একটা পথের হদিস পেলেন।

সুজাতার কাজের গণ্ডি আরও ছড়িয়ে পড়ল। দুর্ভিক্ষের সময় ও তার পরে। ঋতা সব কিছু বুঝতেন না তবে দেখতেন, 'মা কোথা থেকে যেন গুঁড়ো দুধ, কম্বল আর চাল জোগাড় করে পিছনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে বিলি করতে লাগলেন।' এই দুর্ভিক্ষের রিলিফের কাজে জড়িয়ে পড়ে সুজাতা ঘুরে বেড়ালেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, পায়ে হেঁটে। অনভ্যাসে প্রচুর হেঁটে পায়ের পাতা ফুলে গেল। পরে অবশ্য অভ্যাস হয়ে গেল। দেশ স্বাধীন হবার পরে জড়িয়ে পড়েন অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবক সংস্থার সঙ্গে। এ আই ডব্লিউ সি থেকেও প্রতিনিধি হয়ে এলেন জোকা-বিষ্ণুপুর প্রজেক্টে। শ্রীরামপুরের অন্যান্য সহযোগীরা ছড়িয়ে পড়লেন অন্যদিকে। সর্বত্রই সুজাতা ছিলেন স্বেচ্ছাসেবকদের পুরোভাগে। জোকা-বিষ্ণুপুর ছাড়াও কাজ করেন কালিকাপুর-প্রতাপনগর প্রজেক্টে, দক্ষিণ গড়িয়ায়, দক্ষিণ ২৪ পরগনার অঙ্গনবাড়ি, আঁধারমানিক প্রভৃতি গ্রামে। মেয়েদের লেখাপড়া, হাতের কাজ শেখানো প্রভৃতির সঙ্গে তাঁরা চেষ্টা করেছেন ধাত্রীদের শিক্ষিত করতে। কেননা ওইসব অঞ্চলে শিশুমৃত্যুর হার খুব বেশি ছিল। সুজাতা এবং তাঁর সঙ্গিনীদের চেষ্টায় এই হার কমে আসে। পরে এই জাতীয় প্রকল্পগুলি বন্ধ হয়ে যায়।

সুজাতা পরে একবার গিয়ে দেখেও এসেছেন, তাঁরা কষ্ট করে যে বাড়িগুলি সমিতির কাজের জন্যে তৈরি করেছিলেন সেগুলি অবহেলায় পড়ে থেকে থেকে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বেসরকারি প্রকল্পগুলি সরকারি উদ্যোগে পরিণত হবার পরিবর্তে ক্রমেই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এক সময়ে কর্মকুটিরের প্রেসিডেন্ট হয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে মেয়েদের মনে সচেতনতা জাগানোর চেষ্টা করেছিলেন। শ্রীরামপুর কলেজে স্বাধীনতার পরেই ভারতমাতার শৃঙ্খলমোচন অভিনয় হয়েছিল। সুজাতা দেখেছিলেন, 'ভারতমাতা সাজলেন মা, মলিন বেশ, হাতে শিকল বাঁধা।' সত্যিকারের মায়েদের শৃঙ্খলমোচনে এবং মলিন বেশ ঘোচানোর কাজেই সুজাতা সময় দিয়েছিলেন সবচেয়ে বেশি।

ঠাকুরবাড়ির আর এক মেয়ে স্মিতা, অমিতা ও অজিন ঠাকুরের মেয়ে, শৈশব কেটেছে জোড়াসাঁকোর বাড়ির অন্তিম পর্বে অর্থাৎ বাড়িটা বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে যাবার আগে। প্রথম থেকে দেখেছিলেন বাড়ির আলো-হাওয়ায় শুধু গান আর গান। সেইসঙ্গে অভিনয় আর নৃত্য। স্মিতার সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ ছিল নাচের ওপর। 'বাবা মায়ের কাছে শুনতাম যে শিশুকালে কোনও গানের রেকর্ড বাজালেই আমি নাকি নাচতে শুরু করতাম।' একটু বড় হয়ে বাড়িতে ভাইবোনেরা মিলে নাটক করতেন আর তাতেও 'নিজে বানিয়ে রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে নাচতুম।' নাচ শেখার আরও সুযোগ হয়েছিল শান্তিনিকেতনে বাস করবার সময়। ঠাকুরবাড়িতে এবং তার বাইরেও তখন মেয়েরা নৃত্যশিক্ষা নিচ্ছেন। ১৯৪২ কিংবা '৪৩ সালে প্রতিমা শান্তিনিকেতনে 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' নাটকটি করালে স্মিতা তাতে নৃত্যাভিনয়ের সুযোগ পান।

সৌম্যেন্দ্রনাথের 'বৈতানিকে'ও নাচ শেখা ও দেখার সুযোগ ছিল, কেননা শ্রীমতীর পরিচালনায় নাচের অনুষ্ঠানগুলি হত। 'মোর ভাবনারে কি হাওয়ায় মাতালো' গানটির সঙ্গে স্মিতা নাচলেন নিউ এম্পায়ারে, '৫০-এর দশকে শ্রীমতীর পরিচালনায়। মনে হতে লাগল এত আনন্দ তিনি আর কোনও কিছুতে খুঁজে পান না। অংশ নিলেন 'শেষবর্ষণ', 'সামান্য ক্ষতি', 'ঋতুরঙ্গ', 'তপতী'তে। কলেজে 'চিত্রাঙ্গদা'য় সেজেছেন অর্জুন। বাঙালি মেয়েদের মধ্যে দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটিকে দেখে 'শেষের কবিতা'য় লাবণ্য সাজাতে চেয়েছিলেন মধু বসু। তাঁর জহুরির চোখ ঠিকই চিনেছিল স্মিতার অভিনেত্রীসত্তাকে। কিন্তু অজিন ঠাকুর এ প্রস্তাবে সম্মতি দেননি। সে সময়ে, যখন স্মিতার বয়স মাত্র আঠেরো, তিনিও জানতেন না মধু বসুর প্রস্তাবের কথা। শুনেছিলেন পরে। দুঃখ পেয়েছিলেন; তবে আরও দুঃখ পেয়েছিলেন মায়ের একটি সিদ্ধান্তের জন্যে। তখনও তিনি ছাত্রী, উদয়শঙ্কর এসেছিলেন নৃত্য বিভাগের পরীক্ষা নিতে। তিনি তখন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন হয়েছেন। ছেলেবেলার স্বপ্নটি নিয়ে আশায়-আশঙ্কায় কাঁপতে কাঁপতে স্মিতা পরীক্ষা দিলেন এবং নির্বাচিতও হলেন। ছেলেবেলা থেকেই তিনি স্বপ্ন দেখতেন নাচকে ঘিরে। ভেবেছিলেন, নিজের একটা দল তৈরি করবেন। পেশা হিসেবে বেছে নেবেন নৃত্যকে। সেই স্বপ্নের চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি। এই পরম লগ্নে বাদ সাধলেন অমিতা। তিনি মেয়েকে নাচ শেখায় সম্মতি দিলেন না। এর পরের জীবনটা কিছু অন্যরকম। স্মিতার বিয়ে হয়ে গেল। মিহির সিংহের মনে নৃত্য বা অভিনয় সম্বন্ধে কোনও সংস্কার ছিল না। স্ত্রীকে বাধা দিলেন না তিনি। স্মিতা যোগ দিলেন সবিতাব্রত দত্তের 'রূপকার' গোষ্ঠীতে। মধ্যে অনেক দিন কেটে যাওয়ায় নাচের জগতে আর প্রবেশ করা গেল না কিন্তু রঙ্গমঞ্চে 'বাঁশরী'র ভূমিকায় অভিনয় করে সকলেরই চোখে পড়ে গেলেন স্মিতা আর ফেরার প্রয়োজন হল না। মাত্র চারদিনের রিহার্সালে নামলেন রঙমহলের মতো পেশাদার রঙ্গমঞ্চে 'ব্যাপিকা বিদায়ে'র মিসেস লাহিড়ী হয়ে। তারপর মিসেস রায় হিসেবে। গ্রুপ থিয়েটারের সঙ্গে ঘুরে বেড়ালেন নানা জায়গায়। তাতে অভিজ্ঞতার পুঁজি বাড়ল বিস্তর। জোড়াসাঁকোর বাড়ির দালানে শেষ অভিনয়

হয় 'শেষরক্ষা'। স্মিতা সেখানে ইন্দুমতী।

থিয়েটার করবার সময়েই ছোটখাটো চলচ্চিত্রাভিনয়ের ডাক পড়ল। দু' জায়গায় দু'রকম অভিনয়। সেজন্যেই মনে হয়তো একটু দ্বিধা এসেছিল কিন্তু তরুণ মজুমদারের 'পলাতকে' তাঁর ভূমিকাটি ধনী গৃহিণীর, তাঁর চোখে দেখা বহু চরিত্রের মতো। কাজেই চিত্রজগতে সরাসরি পা রাখলেন স্মিতা। 'পলাতকে'র পর সত্যজিৎ রায়ের 'মহানগর'। ছোট্ট চরিত্রটির সাবলীল অভিনয় চোখে পড়ল সবার। পূর্ণেন্দু পত্রীর 'স্ত্রীর পত্রে' তিনি হলেন বিন্দুর দিদি, বড় বাড়ির বড় বউয়ের আর এক অনবদ্য চিত্রণ। তপন সিংহের 'অতিথি'র কথাও তো ভোলা যায় না। 'জতুগৃহ', 'আদালত ও একটি মেয়ে' ছাড়াও স্মিতা অভিনয় করেছেন তরুণ মজুমদারের 'সজনী ও সজনী', দিলীপ মুখার্জির 'ব্যবধান', অজয় করের 'বর্ণালী', প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের 'দেবতার দীপ', দীনেন গুপ্তর 'রজনী' ও 'শঠে শাঠ্যং', প্রভাত রায়ের 'সেদিন চৈত্রমাস' ছাড়াও 'ছোট বউ', 'বাহাদুর', 'শতরূপা' প্রভৃতি অনেক চিত্রে। ভূমিকাভিনেত্রী হিসেবে নজর কেড়েছেন সর্বত্র। পাশাপাশি দূরদর্শনের ধারাবাহিকেও ডাক পড়ল স্মিতার। কলকাতা দূরদর্শনের প্রথম বাংলা সিরিয়াল 'সোনার সংসার'-এ স্মিতা ছিলেন। পরেও তাঁকে দেখা গিয়েছে 'কলকাতা কলকাতা', 'চরিত্রহীন', 'গৃহদাহ', 'শ্রেয়সী', 'সিংহবাহিনী', 'রত্নদীপ', 'কিছু কণ্ঠে কত রূপ', লজ্জা', 'সাতকাহনে'—কোথাও কেউ বলতে পারবে না নিখুঁত অভিনয় হয়নি। বরং মাঝে মাঝে একঘেয়ে মনে হয় স্মিতারই। যদি উপযুক্ত সময়ে আসতে পারতেন চিত্রজগতে পেতে পারতেন নায়িকার ভূমিকা, শুধু তো গ্ল্যামার নয় তাতে থাকত অনেক বেশি অভিনয়ের সুযোগ। নাচ খুব ভালবাসতেন বলে '৮০-র দশকে অবনীন্দ্রনাথের জন্মদিনে তাঁর নাতনি মেনকার অনুরোধে রথীন্দ্র মঞ্চে শেষবারের মতো নৃত্য পরিবেশন করেন স্মিতা, সেই নাচ 'যে নাচটি প্রথমবার নেচেছিলুম 'নিউ এম্পায়ারে' শ্রীমতী ঠাকুরের পরিচালনায়।'

মায়ের মতো লেখার হাতটিও বেশ ভাল। অথচ স্মিতা কোনও আত্মকথা লেখেননি। যা লিখেছেন সবই স্মৃতি আশ্রিত প্রবন্ধ। যেমন 'নৃত্যের আঙিনায় মেয়েরা', 'তপতীর প্রথম অভিনয়' কিংবা 'জোড়াসাঁকোর লাল বাড়ি বা বিচিত্রা বাড়ি'। একটি বিশেষ লেখা যতটা অভিনিবেশ দাবি করা উচিত ছিল কিন্তু করেনি সেটি হল 'একটি অবহেলিত মানুষ: দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর'। স্মিতাই প্রথম এই অভিমানী মানুষটির কথা, তাঁর শান্তিনিকেতন থেকে চলে আসার নেপথ্য ইতিহাস ব্যক্ত করেন। পরে দিনেন্দ্রনাথকে নিয়ে আরও লেখা হলেও স্মিতাই প্রথম কলম ধরেন। আরও অনেক হয়তো দিতে পারতেন স্মিতা কিন্তু বাধা কাটিয়ে সামনে এসে দাঁড়াতে অনেকটা দেরি হয়ে গেল, দর্শক পেল না 'শেষের কবিতা'র লাবণ্যের ভূমিকায় ঠাকুরবাড়ির একটি মেয়েকে।

সুধীন্দ্র পরিবারের আর একটি রত্ন কৃষ্ণার জন্ম হয়েছিল কলকাতা থেকে দূরে ঢাকায়। এণা ও তাঁর স্বামী রাজেন তখন সেখানেই থাকতেন। পরে তাঁরা চলে আসেন কলকাতায়। লোয়ার সার্কুলার রোডের বাড়িতে। কৃষ্ণা পড়তেন লোরেটো কনভেন্টে। হাসি-খুশি-গল্পে-আড্ডায় তাঁদের বাড়িতে অনাবিল আনন্দের হাওয়া বইত। এই বাড়িটির আর একটি বৈশিষ্ট ছিল, সুরভি লিখেছেন, 'কোনও পরচর্চা-পরনিন্দা হত না।' কৃষ্ণার কৈশোরে বাড়ির এই আবহাওয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল স্বাধীনতা আন্দোলন। তাঁর মামা সৌম্যেন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন রাজনীতির সঙ্গে। তারই মধ্যে শুরু হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। আকস্মিক মৃত্যু হল রাজেন রায়ের। যুদ্ধ শেষ হবার ,অল্প পরে কৃষ্ণা মাদাম চিয়াংকাইশেক স্কলারশিপ পেয়ে চলে গেলেন আমেরিকায়। ভর্তি হলেন ম্যাসাচুসেট্‌সের ওয়েলেসলি কলেজে, পাঠ্য বিষয় ছিল রাশিয়ান ভাষা ও দর্শন। রাশিয়ান ভাষার অধ্যাপক হিসেবে পেলেন ভ্লাদিমির নভোকভকে। আর

পাশ্চাত্য দর্শনের রহস্য উন্মোচনের ভার নিলেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। তিনি আবার কৃষ্ণার মামা সৌম্যেন্দ্রনাথের বন্ধু। তিনি কৃষ্ণাকে সস্নেহে গ্রহণ করলেন, হেগেল ও কান্টের দর্শনকে সহজবোধ্য করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে বেহালা বাজিয়েও শোনালেন। আর এক পারিবারিক বন্ধু লুই কেলগ তাঁকে কন্যাস্নেহে গ্রহণ করে তাঁর সামনে বহু সম্ভাবনার দরজা খুলে দিলেন। কৃষ্ণাকে তিনি নিয়ে গেলেন স্বামী প্রভবানন্দের কাছে। আর এক বন্ধু হেনরি কার্টিয়ার-ব্রেসন কৃষ্ণার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন জাঁ রিবুর। লিয়ঁর অত্যন্ত প্রভাবশালী পরিবারের সন্তান তিনি, সে সময় কাজ করছিলেন নিউ ইয়র্কে। যুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতায় তিনি ক্লান্ত। এই পরিস্থিতিতে কৃষ্ণার বন্ধুত্ব এবং সাহচর্য তাঁর মানসিক ক্ষতে ওষুধের কাজ করল। অত্যন্ত ধনী পরিবারের সন্তান হলেও অভিজ্ঞতা তাঁকে সংস্কারপন্থী করে তুলেছিল। কৃষ্ণার সঙ্গে তাঁর মতের ও মনের মিল হতে দেরি হল না। ভালবাসলেন কৃষ্ণাও। জাঁ রিবুর মার আগ্রহে এক ক্যাথলিক যাজক তাঁদের বিয়ে দেন। যদিও মনস্থির করার আগে কৃষ্ণা গিয়েছিলেন স্বামী প্রভবানন্দের কাছে। তাঁর আশীর্বাদ ও উৎসাহে মনের দ্বিধা কেটে গিয়েছিল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দুটি অভিজাত পরিবারের মিলন ঘটল এ বিয়েতে। কৃষ্ণার প্রকৃত কাজ শুরু হল আরও কিছুদিন পরে তাঁরা যখন ফ্রান্সে ফিরে এলেন।

প্রথমে তাঁরা নিউ ইয়র্কেই থাকতেন, রিবুঁ দম্পতির অসাধারণ বন্ধুপ্রীতি ও শিল্প সাহিত্যের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার টানে তাঁদের ফ্ল্যাটে ভিড় করে আসতেন শিল্পী, চিত্রকর, ফোটোগ্রাফার, চলচ্চিত্র পরিচালক, ফ্রান্স ও ইতালির স্বনামধন্য ব্যক্তিরা। কিন্তু তাঁদের বাড়িতে বামপন্থী ব্যক্তিদের উপস্থিতিকে সন্দেহের চোখে দেখলেন কেউ কেউ। যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতার তিক্ত স্মৃতি ছিল বলে রিবুঁ পরিবার স্বদেশে ফিরে যাওয়াই শ্রেয় মনে করলেন। স্বদেশে ফিরে জাঁ তাঁর বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলির উন্নতিতেই মগ্ন রইলেন না। শিল্পী সাহিত্যিকদের স্বাধীন চিন্তা প্রকাশের জন্য একটি নিরাপদ ক্ষেত্র গড়ে তোলার কথাও ভাবতে শুরু করলেন। এ কাজে তিনি সবচেয়ে বেশি সাহায্য পেলেন কৃষ্ণার। তাঁর প্যারিসের ফ্ল্যাট, লিয়ঁর প্রাসাদ কিংবা অ্যারিজোনা ডেজার্টের বাড়ি হয়ে উঠল শিল্পের পীঠস্থান। প্যারিসের ফ্ল্যাটের পিছনে অনেকখানি জায়গা জুড়ে এক বিশাল বাগানকে কৃষ্ণা করে তুললেন ওরিয়েন্টাল প্যারাডাইস।

কৃষ্ণার মতো প্রভাবশালী এবং সূক্ষ্ম রুচিসম্পন্না নারী বিরল। তাঁর বন্ধুদের সংখ্যাও কম নয়। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট মিতেঁর, ইন্দিরা গান্ধী, সত্যজিৎ রায়, রবার্তো রোসোলিনি। নানা দেশের শিল্পী এবং লেখকেরা যেমন ছিলেন তেমনই ছিলেন কাছেরও দূরের সাধারণ মানুষেরা। দূর থেকে কতটুকুই বা তাঁকে জানা গিয়েছে? ভারতের সঙ্গে তাঁর যোগ কখনও বিচ্ছিন্ন হয়নি। প্রাচীন বস্ত্রশিল্প নিয়ে তিনি প্রথমেই যে ভাবতে শুরু করেছিলেন তা নয়। পঞ্চাশের দশকে কলকাতায় এসে তাঁর চোখে পড়ে কিছু শাড়ি, সম্ভবত বালুচরির নকশা, কেননা এ সময়েই সুভো ঠাকুর, অজিত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন প্রাচীন বস্ত্রশিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য চেষ্টা করেছিলেন। সুভো সম্পর্কে কৃষ্ণার মামা, তিনি তাঁকে উৎসাহ দিলেন আপাত অবহেলিত বস্ত্রশিল্প নিয়ে পড়াশোনা করতে। যে কোনও শিল্পই কৃষ্ণাকে আকৃষ্ট করে, তিনিও আগ্রহ বোধ করেন। শুধু গবেষণা নয়, তার সঙ্গে নমুনা সংগ্রহও করতে হবে। অন্যান্য বস্তুর মতো বস্ত্রের আয়ু বেশি নয়। সংগ্রহের সঙ্গে সংরক্ষণও প্রয়োজন। প্রচণ্ড উদ্দীপনা নিয়ে কৃষ্ণা কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। যাঁরাই কৃষ্ণার কথা বলেছেন, তাঁরা সকলেই কৃষ্ণার অফুরন্ত প্রাণশক্তির প্রশংসা করেছেন। বিভিন্ন সংগ্রহশালায় বারবার গিয়ে কৃষ্ণা প্রাচ্যের বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়ে উঠলেন। বস্ত্রশিল্পের প্রাচীন ইতিহাস লুকিয়ে আছে চিনে। বার দশেক সেখানে গেলেন কৃষ্ণা— তাঁর প্রথম গবেষণাপত্র প্রকাশিত হল ১৯৭০-এ। বিষয়: চিনের তুংহুয়াং-এর বস্ত্র। অবশ্য গবেষণাপত্র প্রকাশ হয়েছিল তাঁর চিন ভ্রমণের আগেই। পরে তিনি বুঝলেন চিনের বস্ত্র নিয়ে তাঁকে আরও গভীরভাবে ভাবতে হবে, কারণ বস্ত্রশিল্পের ভৌগোলিক ব্যাপ্তি কোনও দেশের

মধ্যে সীমিত নয়। চিনের বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভারতের নকশা, মধ্য এশিয়ার বয়নরীতি এবং আরও নাম না জানা নানা দিক।

১৯৭৯ সালে রিবুঁ দম্পতির বিশাল পোশাক সংগ্রহ নিয়ে স্থাপিত হল AEDTA (Association Pour l' Etude et la Documentation des Textilesd' Asic) প্যারিসে। এখানে এশিয়ার বস্ত্রশিল্প নিয়ে গবেষণা করার যাবতীয় সুযোগ সুবিধে রয়েছে। কুড়ি বছর ধরে কৃষ্ণা যা ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করেছিলেন সবই রইল এখানে, সঙ্গে বইপত্র, গ্রন্থাগারসহ আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় বস্তু। ক্রমে AEDTA গ্লোবাল ভিলেজ-এ পরিণত হয়েছে। এখানে এসে আমেরিকান, ভারতীয়, চাইনিজ, ব্রিটিশ, রাশিয়ান সকলেই কাজ করতে পারেন। যাঁদের অর্থাভাবে গবেষণা বন্ধ হতে বসেছে তাঁদের সাহায্য করার ব্যবস্থা যেমন আছে, তেমনই রয়েছে তাঁদের গবেষণাপত্র প্রকাশের সুব্যবস্থা। প্রাচ্য দেশের পোশাকের এত বড় সংগ্রহ আর কোথাও নেই। এই পোশাক সংগ্রহ এখন প্যারিসের অন্যতম সংগ্রহশালায় পরিণত হয়ে মুগ্ধ বিস্মিত দর্শকের অভিজ্ঞতা বাড়াচ্ছে। নিরন্তর গবেষণার ফলে আবিষ্কৃত হচ্ছে হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসের ছিন্ন সূত্র, আমাদের সাংস্কৃতিক পরিভ্রমণের মৌন চিত্র। কৃষ্ণার গবেষণাপত্র থেকেই একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। তিনি জানিয়েছেন, 'আমরা লাসার বিভিন্ন মন্যাস্ট্রি থেকে সংগৃহীত বারোটি বস্ত্রখণ্ড নিয়ে কাজ করে কতকগুলি চমকপ্রদ তথ্য পেয়েছি।' সেই তথ্যগুলিকে সংক্ষেপে সাজালে দেখা যায় বস্ত্রগুলির নকশা বোনা হয়েছে কোনও গুহ্য সাংকেতিক ভাষায়। যতদূর জানা গিয়েছে বস্ত্রগুলির উদ্ভব হয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে কিন্তু তার নকশাগুলি পুরোপুরি ইসলামিক অলংকরণে পূর্ণ। আর একটা রহস্য হল, যে তাঁতে এই বস্ত্রগুলি বোনা হয়েছে কস্মিনকালে ভারতে সেই তাঁতের চল ছিল না। 'কেউ জানে না লাসায় কি করে এই বস্ত্রগুলি এল এবং তাদের রহস্য হয়তো কোনও দিনই ভেদ হবে না, যতদিন না এই বস্ত্রবয়নের প্রযুক্তিকৌশল গবেষণার সাহায্যে পুরোপুরি না আয়ত্ত হয়', লিখেছেন কৃষ্ণা।

অজস্র সম্মান পেয়েছেন কৃষ্ণা। ফ্রান্সের লিজিয়ন অফ অনর, শোভ্যালিঁয়া অফ আর্টস অ্যান্ড লেটারস। বক্তৃতা দিয়েছেন বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে, বেজিং-এর আর্কিওলজিক্যাল ইনস্টিটিউটে। মাঞ্চুরিয়ার বিশেষ অধিবেশনে যে একমাত্র অচৈনিক ব্যক্তি নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন তিনি কৃষ্ণা। চিনা বস্ত্রের সেরা বিশেষজ্ঞের সম্মান দেওয়া হয়ে থাকে কৃষ্ণাকে, বিশেষ করে ৪র্থ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ১০ম খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের চিনে প্রাপ্ত বস্ত্র নিয়ে তাঁর মতো গবেষণা এখনও কেউ করেননি। মনে হতে পারে, ভারতীয় বস্ত্র কি ভারতকন্যাকে সেভাবে আকৃষ্ট করেনি? তা নয়, AEDTA-র সংগ্রহে ভারতীয় বস্ত্রসম্ভারও তুলনাহীন। অজস্র জামদানি শাড়ি, নকশি কাঁথা, আশিটি বালুচরি শাড়ি রয়েছে। বালুচরির নকশায় মুঘল ও পোর্তুগিজ প্রভাব স্পষ্ট। শাড়ির আঁচলের ভাঁজে ভাঁজে বাবুসমাজের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সাহেবদের জীবনচিত্র বোনা হয়েছে। লখনউ-এ পাওয়া হিরে-মুক্তো বসানো পাগড়ি অপেক্ষা করছে গবেষকের জন্যে। ইন্দোনেশিয়ার পোশাক সংগ্রহেও রয়েছে মেয়েদের চুল দিয়ে তৈরি করা আট ইঞ্চি চওড়া জাভার রাজকুমারের কোমরবন্ধ কিংবা সোনায় বাতিকের কাজ। আছে কলাপাতা দিয়ে তৈরি জাপানি কিমোনো। সংগ্রহশালার ৩,৫০০ বস্ত্রসংগ্রহের মধ্যে মাঞ্চুরীয় সম্রাটের একটি দুর্লভতম পোশাক, হলুদ সিল্কের ওপর সোনা-রুপোর জরি দিয়ে বোনা নৃত্যরত ড্রাগন; জাপানের সামুরাই যোদ্ধার জন্যে তৈরি করা সুতির পোশাকে সোনা লাগানো কোট। মসুলিপট্টমের সাদা গাউনে রঙিন ব্লকপ্রিন্ট কোনটা থেকেই চোখ ফেরানো যায় না। কাশ্মীরের দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য জামেয়ার সংগ্রহের কথা আর নাই বা বললাম।

নিরবচ্ছিন্ন সুখের জীবন কৃষ্ণা পাননি। স্বামীর মৃত্যুর কিছুদিন পরেই দুর্ঘটনা ছিনিয়ে নেয় তাঁর একমাত্র পুত্রকে। সাময়িকভাবে ভেঙে পড়লেও ফ্রান্সের সাংস্কৃতিক জগতের সম্রাজ্ঞীর কাজ থেমে থাকে না। বিশেষ করে কৃষ্ণাকে ঘিরে ছিলেন তাঁর বিখ্যাত বন্ধুরা। কাজের মধ্যেই একদিন

শেষ হল তাঁর জীবন। বস্ত্রশিল্পের প্রতি তাঁর ভালবাসা তিনি সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন তাঁর
উত্তরপুরুষদের মধ্যে। পুত্রের মৃত্যুর পর পৌত্র টমাস তুলে নিয়েছেন কৃষ্ণার অসমাপ্ত কাজের
ভার। এই কাজের মধ্যেই কৃষ্ণা বেঁচে থাকবেন।

সুপূর্ণা ছেলেবেলায় স্মিতার সঙ্গে নাচে-গানে-অভিনয়ে যোগ দিতেন শান্তিনিকেতনে কিন্তু
পরে তাঁর মন পুরোপুরি নিমজ্জিত হল রবীন্দ্রসংগীতে। সত্যেন্দ্রনাথের বড় নাতি সুবীর ও
পূর্ণিমার বড় মেয়ে সুপূর্ণা। হাসিখুশি সুপূর্ণাকে দেখে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'ওর নাম রাখিস
সলীলা।' যে কারণেই হোক, সে নাম রাখা হয়ে ওঠেনি। শেষ পর্যন্ত নাম রাখা হয় সুবীরের সু
এবং পূর্ণিমার পূ নিয়ে একেবারে নতুন ধরনের নাম সুপূর্ণা। নামকরণে ইন্দিরার হাত থাকতে
পারে, নতুন ধরনের নাম নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে ভালবাসতেন তিনি। কবিরও অনুমোদন
রইল নতুন নামকরণে। গান শেখা শুরু শৈশবেই। ঠাকুরবাড়ির ছেলেমেয়েদের জীবনে গানটা
জড়িয়ে থাকে জীবনযাত্রার অঙ্গ হিসেবে। সুপূর্ণার সবচেয়ে কাছের মানুষটি ছিলেন ইন্দিরা, তাঁর
কাছেই শুরু 'গান প্রথম শিখি ন'-দিদি ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর কাছে। আপনার জন, কাছের
মানুষ ন' দিদিকে গুরু ভাবিনি কোনওদিন।' এছাড়া ছিল স্কুলে পড়তে পড়তে গান শেখা।
স্কুলের দিনেন্দ্র পুরস্কার প্রতিযোগিতায় তিনবার প্রথম হয়েছিলেন। 'এই সময়েই মা একদিন
প্রফুল্লদাকে বললেন, 'একে এবার একটু ভাল করে শেখাবার ব্যবস্থা কর।' সুপূর্ণা তখন
পাঠভবনের ছাত্রী। তাঁকে আর চিত্রলেখা চৌধুরীকে নিয়ে শুরু হল প্রফুল্লকুমার দাসের
'স্পেশ্যাল ক্লাস'। 'সিংহসদনে একটা টেব্‌ল টেনিসের টেব্‌ল ছিল, তার ওপর উঠে বসতাম গান
শেখার জন্য। প্রফুল্লদার কাছে প্রথম শিখি 'তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে'। প্রফুল্লদা খুব সুন্দর
করে গান শেখাতেন... অনেক উপদ্রব করেছি ওঁর ওপর। কখনও বিরক্ত হননি। প্রফুল্লদা সব
সময় স্বরলিপি দেখে শেখাতেন।' সুপূর্ণা শিখেছেন আরও অনেকের কাছে। সংগীতভবনের
অধ্যাপক চিনু চোবেজীর কাছে ক্ল্যাসিক্যাল গানের তালিম নেওয়া হল। '...ওঁর বাড়ি যেতাম।
ক্লাস করতাম সংগীত ভবনে। খুব যত্ন করে শেখাতেন। ক্লাসে মাঝে মাঝে একা-একা ধরতেন।
প্রথম যে শুরু করবে সে যদি বেসুর লাগিয়ে দিত তো আমরা তারপর সবাই বেসুর গাইতে
থাকতাম। খুব রেগে যেতেন। বলতেন, সব কিচেনে: পচা আলু। এক সুর তো সব বেসুর।'
সংগীতভবনে কোর্স শেষ করলেন। 'এসরাজে পাশ না করলে রবীন্দ্রসংগীতে ডিপ্লোমা পাওয়া
যাবে না। এসরাজ তো সোজা করে ধরে রাখতেই পারি না, বাজাব কী? অশেষদার কাছে ক্লাস।
ভয়ে আধমরা হয়ে আছি। সে অনেক কান্ড করে ইমনের একটা গৎ বাজিয়েছিলাম। অশেষদা
৪০ দিয়েছিলেন। করুণা করেই। পাশ করার মতো অবস্থা ছিল না।' আত্মপ্রকাশে অনিচ্ছুক
সুপূর্ণাকে দিয়ে লিখিয়ে নিতে পারলে তাঁর সমসাময়িক শান্তিনিকেতন চোখের সামনে ফুটে
উঠবে। যদিও তিনি লেখেন খুবই কম। 'দিনগুলি মোর' বোধহয় একমাত্র স্মৃতিকথা। এখনও
পর্যন্ত।

আসলে সুপূর্ণা বিশেষভাবে সংগীতজগতের মানুষ। কোথাও বেড়াতে গেলেও সঙ্গে থাকত
'স্বরবিতান'। একবার বাড়ির সবার সঙ্গে গেলেন শিমুলতলায়। 'ওখানে গিয়ে একদিন ন দিদির
কাছে শিখলাম 'বড়ো বেদনার মতো'। ন' দিদি চেয়ারে বসে রিপু করছিলেন, আমি মাটিতে
বসে। গাইতে লাগলেন। শিখলাম। পরে 'বড়ো বেদনার মতো' অনেকবার অনেক জায়গায়
গেয়েছি। ন' দিদি যেখানেই যেতেন গানের কথা বলতে, সঙ্গে নিয়ে যেতেন ওঁরই শেখানো গান
করবার জন্য।' শুধু কি ইন্দিরার কাছে? গরমের ছুটি, পুজোর ছুটিতে শান্তিনিকেতন থেকে
কলকাতায় বেড়াতে আসা। সুবীর ঠাকুর উঠতেন তিনতলায়, রবীন্দ্রনাথ সামনের দোতলায়
থাকতেন। 'জোড়াসাঁকোর পিছনের দিকটায় একপাশে অমিয়া ঠাকুর থাকতেন, অন্যপাশটাতে

অমিয়াকাকি থাকতেন। ...রোজ বিকেলে আমি যেতাম অমিয়া জ্যাঠাইমার বাড়ি। বুড়ি (পিসি) আসত। কিন্তু সে তো ছিলই। অমিয়া জ্যাঠাইমার ঘরের সামনে একটা খোলা চাতাল ছিল, সেখানে অমিয়া জ্যাঠাইমা মোড়ায় বসতেন। আমরা মাটিতে। অমিয়া জ্যাঠাইমা গান গাইতেন নিজের ভঙ্গিতে। খালি গলায়। কোনও যন্ত্র নেই। আমাদের হাতে 'গীতবিতান'। গানটা বার বার করে নিয়ে তিনবার গাইতাম অমিয়া জ্যাঠাইমার সঙ্গে। দু-একবার গাইবার পর আর বই দেখতাম না। মনে গেঁথে যেত। বই বন্ধ। গানটা গানের মতোই গাইতেন অমিয়া জ্যাঠাইমা। একটা লাইন বা শব্দ কোনও অংশ বারবার গাইতেন তা নয়। তবে গানটা দু-একবার গাইতেন বা হয় তোমারই তো জানতাম। অমিয়া জ্যাঠাইমার কাছে অনেক গান শিখেছি। যেমন 'ওগো কাঙাল আমারে', 'স্বপন যদি ভাঙিলে', 'কত কথা তারে', 'আকুল কেশে' ইত্যাদি।'

সুপূর্ণা গান শিখেছিলেন শান্তিদেব ঘোষের কাছেও। বছরে একবার করে শান্তিনিকেতন থেকে দল যেত বাইরে 'চিত্রাঙ্গদা', 'নটীর পূজা', 'তাসের দেশ', 'শ্যামা' অভিনয় করবার জন্য। একবারও বাদ পড়েননি সুপূর্ণা। এই দলের সঙ্গে ঘুরেছেন বম্বে, দিল্লি, মাদ্রাজ। পাকিস্তানে যখন সর্বশেষ সাংস্কৃতিক দল 'শ্যামা' করতে গিয়েছিল, সে দলেও ছিলেন সুপূর্ণা। ঢাকা রেডিওতে 'শ্যামা'র গীতি আলেখ্যে অংশগ্রহণও করেছিলেন। শুধু তাই কেন, আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্রেও গায়িকা ছিলেন সুপূর্ণা। শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীদের গান মাঝে মাঝে আকাশবাণীতে সম্প্রচার করা হত, তাতেও অংশ নিতেন সুপূর্ণা। তারপরে কত গান যে হল গাওয়া, কে তার হিসেব রাখে। ১৯৫৬ সালে বিয়ে। স্বামী সুভাষ চৌধুরীও সংগীতজগতের সঙ্গে যুক্ত। গায়িকা হিসেবে সুপূর্ণার পক্ষে প্রতিষ্ঠিত হওয়া তাতে সহজ হয়েছে। গান শেখার সঙ্গে শেখানোর পালা শুরু হয়েছে এই পর্বে। সর্বপ্রথম [illegible] উইমেন্স কলেজে রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষা সংস্থায়।

দক্ষিণী আয়োজিত প্রথম রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন সুপূর্ণা। তাঁর গানের বৈশিষ্ট্য শ্রোতাদের আকৃষ্ট করে। 'পরিচয়' পত্রিকায় হিরণকুমার সান্যাল মন্তব্য করলেন, 'উদার কণ্ঠ স্পষ্ট উচ্চারণে গান গেয়ে রবীন্দ্রনাথের গানের সৌকুমার্য ও বলিষ্ঠতা কি করে একসঙ্গে ফুটিয়ে তোলা যায় তার একটি দৃষ্টান্ত হল সুপূর্ণা ঠাকুরের গান।' এমন কণ্ঠ সত্ত্বেও রেকর্ড হতে দেরি হয়েছিল। ১৯৫৫-তে প্রথম রেকর্ড 'পুব হাওয়াতে দেয় দোলা' এবং 'কার যেন এই মনের বেদন' শ্রোতাদের মন কেড়েছিল কিন্তু অজ্ঞাত কারণে বিমুখ সুপূর্ণা একটু আড়ালেই থেকে গিয়েছেন। তাঁর দ্বিতীয় রেকর্ড হল দশ বছর বাদে। গান দুটি হল 'দিন অবসান হল' ও 'কেন যে যাবে ভুল', পরে আরও কিছু কিছু। তবে যিনি অনেক দিতে পারতেন তার কাছে সে প্রাপ্তিটুকুই পাওয়া গেল। যদিও উজাড় করে দিতে চেয়েছেন ছাত্র-ছাত্রীদের। বলেছেন, 'আমার ক্ষুদ্র সামর্থ্য দিয়ে যদি একটি দুটি রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীগোষ্ঠী সৃষ্টি করতে পারি জীবনে তার চেয়ে বেশি সার্থকতা কি থাকতে পারে?'

ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা নৃত্যগীতের সঙ্গে অভিনয়ও করতেন। সুপূর্ণার অভিনয়ের কথাও মনে রাখা যেতে পারে। শান্তিনিকেতনে বহুবার 'বাল্মীকিপ্রতিভা'য় তিনি নিয়েছেন লক্ষ্মীর ভূমিকা। অবশ্য শুরু হয়েছিল প্রতিমার পরিকল্পনায় 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'য়। গীতবিতানে একবার 'নটীর পূজা'য় সাজলেন মালতী। আর শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের প্রযোজনায় ১৯৬১ সালে যখন নিউ এম্পায়ারে 'মায়ার খেলা' মঞ্চস্থ হল, তাতে সুপূর্ণা শান্তার ভূমিকা গ্রহণ করে গান ও অভিনয়ের জন্য সকলের প্রশংসা অর্জন করেন। কিন্তু সুপূর্ণা তো কোনওদিনই নিজের কথা বেশি ভাবেননি, ভেবেছেন তাঁর ছাত্রদের কথা। সংগীত সম্বন্ধে তাদের মনে, শুধু তাদের কেন, সকলের মনে আগ্রহ জাগানোর কথাই বেশি ভেবেছেন।

কলকাতায় গীতবিতানে সংগীতের শিক্ষকতা করবার সময় থেকে চৌধুরী দম্পতির মনে হয় ইন্দিরা সংগীত শিক্ষায়তনের কথা। শুধু রবীন্দ্রসংগীত নয়, ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য গীতিকারদের

দিয়ে গানও তাঁরা ধুলোর বিস্মৃতির ধুলো থেকে লোকসমক্ষে নিয়ে এলেন। সুপূর্ণা রেকর্ডও করেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গান 'ও হৃদয়নাথ এসো হে'। ইন্দিরা সংগীত শিক্ষায়তনে শুধু গান শেখানো হয় তা নয়, সংগীতসংক্রান্ত গ্রন্থ প্রকাশ, ক্যাসেট প্রকাশের কাজও হয়। সুপূর্ণার কাজ সেখানে সবাইকে দেখার মতো। রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে আজকাল যে হইচই হচ্ছে, সেই নতুনত্বের প্রতি বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই তাঁর, তিনি চান বিশুদ্ধ গায়কী, যা তিনি শুনেছেন এবং শিখেছেন ইন্দিরার কাছে, অমিতার কাছে কিংবা সেই শিক্ষকদের কাছে, যাঁরা রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসে রবীন্দ্রসংগীত শিখেছিলেন। তাঁর একমাত্র মেয়ে ঐন্দ্রিলাও রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী, নিশ্চয় তিনিও এই ধারা অনুসরণ করবেন।

সুপূর্ণার ছোট বোন ঈশিতা দিদির একেবারেই বিপরীত। শান্তিনিকেতনে শৈশব অতিবাহিত হলেও দিদির মতো গানের জগতে ডুব দেয়া কোনও ঘটনা ঈশিতার স্মৃতিতে নেই। তিনি লেখাপড়াই বেশি ভালবাসতেন। ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের সঙ্গে এখানে তাঁর কিছুটা অমিল, আবার মিলও আছে অনেক জায়গায়। পড়াতে ভালবাসেন। স্কুল খোলার মতো স্কুলের দায়িত্ব নেবার ক্ষমতাও কম নয়। শান্তিনিকেতনে যখন পড়তেন তখনই তাঁর মধ্যে পরিচালনা শক্তি লক্ষ করা গিয়েছে। সেখানে বড়দের ওপর ভার থাকত ছোটদের দেখাশোনা করার। ঈশিতা সেই বিভাগেরও কাজ করেছেন সুষ্ঠুভাবে। সেবা বিভাগেও কাজ করেছেন দক্ষতার সঙ্গে। এভাবেই কেটে গেল ছাত্রজীবন, দর্শনে স্নাতকোত্তর উপাধি পেলেন অতি সহজে। তারপর থেকে তো স্কুল এবং পড়ুয়ারাই তাঁর ধ্যানজ্ঞান, তাদের জন্যে তৈরি হতে হতে, বৃহত্তর জগতে তাদের পাঠাবার জন্যে তৈরি করতে করতে কখন যে কেটে গেল তিরিশটা বছর, কে জানে! নিজে শুরু করেছিলেন গবেষণার কাজ, সেও শেষ করতে পারেননি স্কুলের কাজের চাপে। অধ্যক্ষার কাজটাও তো জটিল, শুধু পড়া আর পড়ানো নয়, প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত থেকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা।

তারই সঙ্গে রয়েছে শিশুতীর্থের কাজ। এস ও এস ভিলেজের মতো একটি সংস্থা। শান্তিনিকেতনে শুক্লা নামে এক ছাত্রী আসত সেখান থেকে। তার কাছ থেকে খবর পেয়ে ঈশিতা এবং আরও কয়েকজন, তার মধ্যে বউদিদি শুভা ঠাকুরও রয়েছেন, শিশুতীর্থের কাজ শুরু করেন ১৯৮৯ সাল থেকে। খুবই ছোট আকারে। এঁরা দশটি অনাথ শিশুর ভার নিয়েছেন। তারা সেখানে মানুষ হচ্ছে, লেখাপড়া শিখছে, হয়তো ভবিষ্যতে দেশ তাদের জন্যে গর্ববোধ করবে। এখনও সংস্থাটি বড় ছোট, তবু এই কাজের মধ্যে আনন্দ পান ঈশিতা।

শুভা ঠাকুরবাড়িরই মেয়ে, আবার ঠাকুরবাড়ির বউ। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্রী অনুভার মেয়ে শুভা। সম্পর্কের খতিয়ানে প্রতিমা যেমন বিনয়িনীর আগেই এসেছেন কিংবা উমার আগে মেনকা, তেমনই অনুভার আগেই শুভার প্রসঙ্গ এসে যাচ্ছে। অনুভা কনকেন্দ্র ও সুরমার মেয়ে, বিয়ে হয়েছিল রমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সেই সূত্রে তিনি প্রবাসী। কিন্তু এই পরিবারের সাংস্কৃতিক প্রভাব পরিবারের সকলের জীবনে আরোপিত নয়, প্রাণের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো জীবনের অঙ্গ। তাই শুভা ঠাকুরবাড়ির পরিবেশ থেকে দূরে থেকেও দূরে রইলেন না। গান শেখার হাতেখড়ি মায়ের কাছে। অনুভা সুগায়িকা ছিলেন, গান শেখার দুর্লভ সুযোগ পেয়েছিলেন দিনেন্দ্রনাথের কাছে। কাজেই রবীন্দ্রসংগীত শেখার কোনও অসুবিধে ছিল না, যদিও শুভার ভালবাসা ছিল নৃত্যের প্রতি। নাচ শেখার আগ্রহ দেখেই তাঁকে কত্থক নাচ শেখানো হয়। উত্তরপ্রদেশে থাকতেন বলে কত্থক নাচ শেখার সুযোগও বেশি ছিল। শুভার আর

একটি শখ ছিল শান্তিনিকেতনে পড়ার। সব মিলে দূরে থাকতেন বলে যেন বেশি টান অনুভব করতেন বাংলার প্রতি কিংবা বলা যায় নিজের আত্মীয়স্বজনের প্রতি। সংস্কার আমাদের সব সময় শিকড়ের দিকে টানে। ঠাকুরবাড়ির পূর্বগৌরব কমতে থাকায় সেই টানের অনেকটাই টেনে নেয় শান্তিনিকেতন। কবির জীবৎকালে যা হয়নি, পরবর্তীকালে তাই হয়েছে। পরিবারের বহু সদস্যই ঘুরেফিরে আসেন এখানে। কেউ স্থায়ীভাবে, কেউ সাময়িকভাবে শান্তিনিকেতনে থাকতে ভালবাসেন।

শুভ্রার স্বপ্নও সফল হল একসময়ে, ১৯৫৬ সালে পড়তে এলেন তাঁর সেই স্বপ্নের শান্তিনিকেতনে। সংগীতভবনে ভর্তি হলেন নৃত্যশিক্ষার জন্যে। সংগীতভবন শেখানো হত মণিপুরি ও কথাকলি নৃত্য। শুভ্রা একই সঙ্গে বিনয়ভবনে টিচার্স ট্রেনিংও নিয়ে নিলেন। কর্মক্ষেত্রে বেশি কাজে লেগেছিল সেটাই। ১৯৫৮ সালে প্রথম যোগ দিলেন 'বসন্ত উৎসবে'। প্রাণের আনন্দ মূর্ত হয়ে উঠল দেহভঙ্গিতে। 'চিত্রাঙ্গদা'য় অর্জুন, 'শ্যামা'য় উত্তীয়, 'তাসের দেশ'-এ হরতনী। রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে শান্তিদেব ঘোষ তাঁকে দিলেন 'মালিনী'র ভূমিকা। পারিবারিক প্রতিবেশেই বিয়ে হল শুভ্রার, সুবীরের বড় ছেলে সুপ্রিয়ের সঙ্গে। ঘরের কাজের ফাঁকে ফাঁকে চলল নৃত্যচর্চা। পড়াতে শুরু করলেন। কোথায় না পড়িয়েছেন তিনি! কখনও দেরাদুনে, কখনও লন্ডনে, কখনও কলকাতায়, কখনও শান্তিনিকেতনে। সব সময় যে চাকরি করেছেন তাও নয় কিন্তু নাচের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটেনি কোনওদিন। নাচ শেখাতে ভাল লাগত তাঁর। দেরাদুনে হিন্দিতে 'নটীর পূজা' করে খুব ভাল লেগেছিল। নৃত্য নিয়ে আরও ভাবনাচিন্তা শুরু করলেন তখনই। রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের বিশুদ্ধতার কথাও ভাবতে শুরু করলেন। পুরো নৃত্যনাট্য পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা অর্জন করার জন্যে পাঠভবনে প্রতি বছর ক্লাস টেনের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে একটা করে নৃত্যনাট্য করেছেন। এম এড পাশ করে আনন্দ পাঠশালার দায়িত্ব নিয়েছিলেন আনন্দের সঙ্গে। আসলে তখন সব কাজের মধ্যেই চলেছে আনন্দের অনুসন্ধান। খুব ভাল রাঁধতে জানেন, ভালবাসেন নানা ধরনের হাতের কাজ, বিশেষ করে বাতিক শিল্প। শান্তিনিকেতনের পরিবেশেই মনের মুক্তি পেয়েছেন বেশি। তাই ক্লান্তি নেই কোনও কাজে। নাচ শেখানোর সঙ্গে সমানে ভাবছেন সাজপোশাকের কথা। নিজেও সাজতে ভালবাসেন, ভালবাসেন সাজাতে। অভিনয়ের সময় নটনটীদের সাজিয়ে দিতে-দিতেই মনে হয়েছে রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যকে বা তাঁর অন্য কোনও নাটক অভিনয়ের সময় কুশীলবদের সাজপোশাক নিখুঁত হওয়া চাই। নিখুঁত অর্থাৎ সেই সময়কে ধরে রাখা। 'চিরকুমার সভা'র নায়িকারা নিশ্চয় আধুনিকা কিন্তু তাঁদের সময়কে ছাড়িয়ে তাঁরা পরবর্তী সময়ের পোশাক নিশ্চয় পরতে পারেন না। আবার নৃত্যনাট্যে অভিনয়ের সময় মনে রাখতে হবে 'তাসের দেশে'র হরতনী কিংবা 'মায়ার খেলা'র প্রমদার সাজটা সেই প্রথম অভিনয়ের কাছাকাছি হওয়া চাই। প্রতিমা যে বিশুদ্ধতার কথা ভেবে নৃত্যলিপি এবং ছবি আঁকিয়ে রাখতে চাইতেন গুরুদেবের অনুমোদিত ভঙ্গিটিকে, শুভ্রাও সেকথা ভেবে পোশাক নির্বাচনের ওপর গুরুত্ব দিতে চান।

সুরেন্দ্রনাথের কন্যা মঞ্জুশ্রীর পুত্রবধূ মঞ্জু ইতিহাসের অধ্যাপিকা, যুক্ত আছেন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে। মঞ্জুশ্রীর কম্যুনিস্ট আন্দোলনে যোগ দেওয়াটা ছিল আকস্মিক ঘটনা, মঞ্জুর তা নয়, ছাত্রজীবন থেকেই তিনি বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। ভূমিকা যখন বদলাল, ছাত্র থেকে অধ্যাপক—তখনও তিনি জড়িয়ে রইলেন অধ্যাপকদের আন্দোলনের সঙ্গে। যুক্ত রয়েছেন NFIW-র সঙ্গে। ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস-এর কার্যনির্বাহী সম্পাদক ছিলেন টানা তিন বছর। একই মত ও পথের শরিক হওয়ায় সব সময়েই পেয়েছেন অধ্যাপক স্বামী গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের পরামর্শ এবং সমর্থন। কিন্তু মঞ্জুর সবচেয়ে বড় কাজ বোধহয় বিস্মৃতির ধূসর

আস্তরণ সরিয়ে শ্রমিকনেত্রীদের একালের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। তারও আগে তাঁর গবেষণাপত্রটিতেও ছিল একটা চমক। ১৮৫৭ থেকে ১৮৮৫-র সময়সীমায় বাংলার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে পাওয়া বিবরণের সাহায্যে তিনি দেখিয়েছেন কী করে বাঙালির মনে ইংরেজের প্রতি ভক্তি একটু একটু করে বদলে গিয়ে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়েছে। 'পিটিশন টু অ্যাজিটেশন' সেই পরিবর্তনের একটি নিখুঁত দলিল।

কম্যুনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'চলার পথে'র জন্যে কাজ করতে করতে মঞ্জু শ্রমিকনেত্রীদের কথা লিখতে শুরু করার কথা ভাবেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে কাজ করতে গিয়ে খুঁজে পান শ্রমিকনেত্রী সন্তোষকুমারী দেবীর লেখা কয়েকটি ধারালো প্রবন্ধ। কৌতূহলী হয়ে তিনি 'সংহতি' পত্রিকার সম্পাদক বিপিনচন্দ্র পালের পুত্র জ্ঞানাঞ্জন পালের সঙ্গে দেখা করেন, কারণ 'সংহতি'তেই সন্তোষকুমারীর প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। আরও কিছু খবর জোগাড় করে মঞ্জু 'চলার পথে'র জন্যে সন্তোষকুমারীকে নিয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন (১৯৭০)। বছর দশেক পরে চিন্মোহন সেহানবীশ মঞ্জুকে জানান, সন্তোষকুমারী দেবী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। তখনই মঞ্জু তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। তাঁর কাছে পান আরও নানা তথ্য, ইংরেজিতে লেখা সন্তোষকুমারীর অপ্রকাশিত জীবনস্মৃতি, লেখা হয় 'শ্রমিকনেত্রী সন্তোষকুমারী'। এ দেশের শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়ম আন্দোলনের প্রথম নেত্রী সন্তোষকুমারী দেবীর কথা গত শতকের বিশের দশকের মানুষ জানতেন। দরিদ্র চটকল শ্রমিকদের পাশে এসে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন একাই, মহিলা দূরে থাক কোনও পুরুষ কর্মীকেও তিনি পাশে পাননি। মঞ্জুর বই পড়ে আমরা জানতে পারি সন্তোষকুমারী মেয়েদের অধিকারের সপক্ষে কম যুদ্ধ করেননি, বিশেষ করে সমাজে নির্যাতিত মেয়েদের সমাজে ফিরিয়ে আনার প্রস্তাব তিনি করেছিলেন। একই সঙ্গে মঞ্জু ধন্যবাদের পাত্রী হবেন শ্রমিক আন্দোলনের আর এক দিক ধাঙড় ধর্মঘট ও শ্রমিকনেত্রী প্রভাবতী দাশগুপ্তের কথা লিখেছেন বলে। তিনি আরও আলোচনা করেছেন বন্দরশ্রমিক ধর্মঘটের সঙ্গে জড়িত কম্যুনিস্টনেত্রী সুধা রায়ের কথা। তাঁর দৃষ্টি এড়াননি একেবারে অন্য মেরুর বাসিন্দা বহু আন্দোলনের শ্রমিক নেত্রী দুখমৎ দিদি। বহু পত্র-পত্রিকায় মঞ্জু লিখেছেন নারীশিক্ষা ও নারীপ্রগতির কথা, বিশেষ করে শ্রমিক আন্দোলন ও তাতে অংশগ্রহণকারী নারীদের ভূমিকার কথা, যা গ্রন্থাকারে সংকলিত হলে আরও অনেকে সেই মহিলাদের কথা জানতে পারবেন। কিন্তু অতিরিক্ত ব্যস্ততা মঞ্জুকে সেজন্যে সময়ই দিতে চাইছে না।

সুরশ্রী ও শ্যামশ্রীর ছেলেবেলা কেটেছে কলকাতা থেকে অনেক দূরে, উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুরে, সুনৃতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কর্মস্থল ছিল সেখানেই। ঠাকুরবাড়ির পরিবেশ দূরে থাকুক, মা সতীরানীর বরং ভয় হত মেয়েরা বাংলা না ভুলে যায়। অবশ্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার ঠাকুরবাড়ির প্রতিটি সদস্যের রক্তে রয়েছে। সুনৃতেন্দ্র ও সতীরানীও মেয়েদের গান শিখিয়ে, বাংলা বই পড়িয়ে বড় করতে লাগলেন। মেয়েরা স্কুলে পড়তেন হিন্দি, বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতেন হিন্দিতে। যদিও প্রতি বছর তাঁরা গরমের ছুটিতে কলকাতায় আসতেন। সুরশ্রীর যখন মাত্র ছ' বছর বয়স তখনই তিনি 'চিত্রাঙ্গদা' মুখস্থ বলতে পারতেন। সুনৃতেন্দ্র খুশি হয়ে সেটি রেকর্ড করান। তখন ইচ্ছেমতো রেকর্ড করে রাখার ব্যবস্থা ছিল। সে রেকর্ড অবশ্য অন্যান্য রেকর্ডের মতো বিক্রি হত না, তবে নিজেদের সংগ্রহে রাখা যেত। বাজাতে হত বাঁশের পিন দিয়ে। সুনৃতেন্দ্র ভালবাসতেন বেড়াতে। নিজেই একলা হাতে ড্রাইভ করে সবাইকে নিয়ে ঘুরে এসেছিলেন সারা ভারত, এতদিন পরেও সেই স্মৃতি, সেই রোমাঞ্চ মেয়েদের মনে অম্লান। একবার সাহারানপুরের বাঙালিরা এসে তাঁকে বললেন, এখানে একটা পাকা দুর্গাবাড়ি করার জন্যে টাকা তোলার ব্যবস্থা করতে হবে। সুনৃতেন্দ্র দু'দিনের দুটি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করলেন।

একদিন হল 'ঋতুরঙ্গ', অন্যদিন হিন্দিতে 'ডাকঘর'—সেই 'ডাকঘরে' অমল সাজলেন সুরশ্রী। খুব সুন্দর হয়েছিল সে অভিনয়। টিকিট বিক্রির টাকায় উঠেছিল দুর্গাবাড়ির ভিত।

সুরশ্রী আর শ্যামশ্রী স্নাতক হন আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। সুরশ্রী খুব ভাল গান গাইতেন, লখনউ থেকে সংগীত বিশারদ উপাধি পান। বিয়ের পর চলে আসেন কলকাতায়। শিক্ষকতা করেন, বিভিন্ন স্কুলে হিন্দি পড়িয়েছেন। হিন্দিতেই এম এ পাশ করেছেন। রান্না নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতেও খুব ভালবাসেন। এটিও তাঁর উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। ঠাকুরবাড়ির সকলেই রান্না নিয়ে ভাবতে চান। সুনৃতেন্দ্রনাথের ছিল 'টেগোর স্পেশ্যাল' নামে রান্না। সুরশ্রী আবার ঠাকুরবাড়ির পছন্দের পদগুলোকে সাজান পরিবারের লোকজনের নামে। তাঁর রন্ধনপ্রণালী ছাপা হয়েছে 'সানন্দা'য়—তাতে রয়েছে দাদার ডাল, ধীরবালার পটল, ধীরবালার আমক্ষীর, বাবার লেমন রাইস, মার ইলিশরোস্ট ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রশ্ন উঠতেই পারে, ধীরবালা কে? কাদম্বিনী ও যজ্ঞেশপ্রকাশের মেয়ে ধীরবালা থাকতেন ইন্টালিতে, ঠাকুরবাড়ির অনেকেই তখন থাকতেন এ অঞ্চলে, সকলেই ছিলেন ঠাকুরবাড়ির মেয়ে-জামাই এবং দৌহিত্ররা। ঘরজামাইদের সকলেই ঠাকুরবাড়িতে বসবাস করতেন না। অধিকাংশ সময়ে তাঁদের একটি স্বতন্ত্র বাড়ি দেওয়া হত। মেয়ে সেখানেই স্বামী ও সন্তানের সঙ্গে বাস করতেন। জামাইরাও শ্বশুরের অন্ন ধ্বংস করে দিন কাটাতেন তা নয়, অধিকাংশই যুক্ত ছিলেন আইন ব্যবসার সঙ্গে। ঠাকুরবাড়ির সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণে এঁদের ভূমিকা সামান্য ছিল না। ধীরবালার রান্নার খুব নাম ছিল, অনেক ব্যঞ্জন আবিষ্কার করেছেন তিনি। পাঁচ পুরুষ ধরে পরিবারের সকলে মনেও রেখেছেন তার স্বাদগন্ধের কথা। সুরশ্রী তাঁদের পরিবারের সেই বিশেষ রান্নাগুলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন আধুনিক রন্ধনশিল্পীদের।

শ্যামশ্রী শান্তিনিকেতনের সংগীতভবনে ভর্তি হয়ে শিখেছেন মণিপুরি নৃত্য আর বিশেষ করে ভালবাসেন সেতার বাজাতে। দিদির মতো প্রচুর হিন্দি পড়িয়েছেন কচিকাঁচাদের। ওদের পড়াতে পড়াতেই মনে হয়েছে হিন্দিতে সুকুমার রায়ের মতো কোনও লেখক নেই, তার চেয়েও বড় কথা, সুকুমার রায়ের বইয়ের কোনও অনুবাদও হয়নি হিন্দিতে। অথচ নিজের শৈশবের কথা যখন মনে পড়ে, মনে পড়ে যায় 'পাগলা দাশু'র কথা। কী ভালই না লাগত! হিন্দিভাষী শিশুরা কি কোনওদিন পাবে না সেই আনন্দের স্বাদ? মনের কথা ছড়িয়ে পড়েছিল চেনাশোনাদের মধ্যে। বন্ধুরা সবাই উৎসাহ দিলেন শ্যামশ্রীকে। দু'-তিন বছরের চেষ্টায় শ্যামশ্রী সত্যিই সফল হলেন। প্রথমে ভেবেছিলেন 'আবোল তাবোলে'র কথা কিন্তু কবিতার অনুবাদে মূলের রস আনা শক্ত। কাজেই হাত দিলেন 'পাগলা দাশু' ও 'হ য ব র ল' অনুবাদে। একদিন সফল হলেন। নিজের চেষ্টায় বইটা ছাপলেন। সবারই চোখে পড়ল ব্যাপারটা। প্রচুর সমাদর পেয়েছেন তবে সবচেয়ে বেশি আনন্দ পেলেন যখন অবাঙালি বাচ্চারাও ভালবেসে 'পাগলা দাশু'কে আপন করতে উৎসাহ পেল।

হেমেন্দ্র পরিবারে সুহিতা যখন বধূ হয়ে এলেন তখন ঠাকুরবাড়ির সদস্যেরা ছড়িয়ে পড়ছেন কলকাতার নানা জায়গায়। সুহিতা পড়তেন শান্তিনিকেতনে। যদিও তিনি শৈশবের সোনালি দিনগুলো কাটিয়েছিলেন জার্মানিতে। বাবা কানাইলাল গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন বৈজ্ঞানিক কিন্তু সাহিত্যের প্রতি ছিল প্রগাঢ় ভালবাসা। 'ফাউস্টে'র অনুবাদ করেছিলেন গ্যেটের স্টাইল পুরোপুরি বজায় রেখে। ভারতে ফিরে এসে তিনি তাঁর মেয়েদের পাঠিয়ে দিলেন শান্তিনিকেতনে, ভয় ছিল মেয়েরা যদি শেষে বাংলা ভুলে যায়। যদিও নিজে ছিলেন লখনউ-প্রবাসী বাঙালি। ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে যোগ ছিল নিবিড়। সুহিতার অবশ্য স্থান পরিবর্তন এবং শিক্ষার পরিবর্তন সহজে মেনে নিতে কষ্ট হয়েছিল। চার বোনের মধ্যে তিনিই ছিলেন

সবচেয়ে লাজুক এবং সংবেদনশীল। দিদি গীতা ঘটক ও ছোট বোন স্বপ্না গঙ্গোপাধ্যায় গানের জগতে সুপরিচিত, এক বোন নমিতা বিজ্ঞানের অধ্যাপিকা।

পরে আবার যখন শান্তিনিকেতনের কলাভবনে এলেন, সুহিতার মনে হল, তিনি এতদিনে তাঁর মনের মতো জায়গাটি খুঁজে পেলেন। লখনউ-এ অসিতকুমার হালদারের কাছে শুরু করেছিলেন ছবি আঁকা। তাঁর আগ্রহেই ভর্তি হলেন কলাভবনে। শিক্ষক হিসেবে পেলেন নন্দলাল বসু, সুরেন কর, রামকিঙ্কর বেজের মতো বিখ্যাত শিল্পীদের। শিখলেন সবরকম হাতের কাজ—টেম্পেরা, জল রং, ফ্রেস্কোর কাজের সঙ্গে সঙ্গে উডকাট, এচিং, মাটির কাজ। সেইসঙ্গে শান্তিনিকেতনের কারুশিল্প—বাতিক, বাঁধনি, চামড়ার কাজ। সবেতেই সুহিতা দক্ষতার পরিচয় দিতেন। তবে বিশেষভাবে ভাল লাগত কিঙ্করদার কাছে ভাস্কর্যের শিল্পপাঠ নিতে। তাঁর প্রিয় ছাত্রী ছিলেন সুহিতা। আবার একই সঙ্গে নাচ গান। শান্তিদেব ঘোষ তাঁকে নিলেন গানের দলে। ওঁর সঙ্গে ডুয়েট গেয়েছেন সুহিতা, 'চলে যায়, মরি হায়, বসন্তের দিন'। আর একক সংগীতের তো লেখাজোখা নেই। সময়টাকে তখন মনে হত শুধু রূপের জগৎ, রসের জগৎ—ছবি আর গান, গান আর ছবি। রূপবতী, গুণবতী মেয়েটিকে দেখে তাঁকে পুত্রবধূ করে নিয়ে এলেন ঠাকুরবাড়ির অপর গুণবতী বধূ অমিয়া। হেমেন্দ্র পরিবারে এলেন আর এক সম্ভাবনাময়ী নক্ষত্র। কিন্তু এই পরিবারের ধারা অনুযায়ী সুহিতাকেও মেনে নিতে হল কয়েকটি অদৃশ্য নিয়মের গণ্ডিকে। কলাভবনে পাশ করার পর বিশ্বভারতী থেকে ডাক পেলেন কাজ করার জন্যে, নেওয়া হল না। ঘরের কাজ করতে করতে নিজের সংগীত আরাধনাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন অমিয়া, সুহিতা পারলেন না। মাটি মেখে মূর্তি গড়ার ছাঁচে অরূপকে রূপ দেবার আগেই সাংসারিক কোনও কাজে হয়তো উঠে পড়তে হত আর পাঁচজন বধূর মতো, তারপর হাতের কাজ সেরে দেখতেন উধাও হয়েছে কল্পনা, পড়ে আছে শুধু মাটি। এভাবে কি কাজ করা যায়? ভাবতে ভাবতেই কেটে গেল অনেকটা সময়। ছোট ছোট কাজ ছাড়া বড় কাজে আর হাত দেওয়া হল না। এখন নতুন করে ভাবছেন, আবার শুরু করবেন। সংসারের কাজ থেকে এখন অনেকটাই ছুটি, কাছের মানুষেরা কেউ কাছে নেই। স্বামী ও শাশুড়ি পরলোকে, অন্যরা নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত, দ্রুতগতিতে বদলাচ্ছে সময়। সুহিতাই বা বসে থেকে করবেন কী? শিল্পসাধনার শুভক্ষণ হয়তো সত্যিই নেই, সময়ের সঙ্গে বদলেছে চিত্রভাষা। কিন্তু শিল্পশিক্ষা দেবার সময় তো পেরিয়ে যায়নি। সুহিতা যা শিখেছেন, সবই তো মনে আছে। তাঁর খুব ভাল লাগে আজকাল নিয়মিত শিশুদের আঁকার স্কুলে পাঠানো হয়, মেয়েরা শেখে নানারকম হাতের কাজ। সবই যে প্রয়োজনের জন্যে তা তো নয়, পারিপার্শ্বিক সুন্দর করে তোলার জন্যও যে প্রয়োজন আছে শিল্পশিক্ষার। শিশুকে ছোট থেকেই জানতে হবে ধ্বংস নয়, সৃষ্টিতেই তার উত্তরাধিকার। এখন তাদেরই শেখাচ্ছেন সুহিতা।

ঋতেন্দ্র পরিবারে সুভো ঠাকুরের মেয়ে চিত্রলেখা পারিবারিক ছবি আঁকার ধারাটি অনুসরন
করেছেন আর্ট কলেজে ভর্তি হয়ে। হেমেন্দ্র পরিবারে অনেকেই ছবি আঁকতেন। তাঁদের মধ্যে
মেয়েরাও রয়েছেন। সুভো নিজে শুধু ছবি আঁকতেন না, শিল্পের প্রকৃত বোদ্ধা ছিলেন। 'সুন্দরমে'
শিল্পবিষয়ক লেখা প্রকাশ করতেন। চিত্রলেখা প্রথম থেকেই পেয়েছিলেন একটি শৈল্পিক
পরিমন্ডল। যদিও শুভোর উদাসীন স্বভাবের জন্যে তাঁর শৈশবে ছিল তীব্র অনিশ্চয়তা, আরতির
জীবনসংগ্রামও ছিল তার পাশাপাশি। শিল্পী পিতার শিল্পী স্বভাব ও মায়ের কর্মকুশলতা দুই-ই
পেয়েছেন তিনি। ছবি আঁকার শিক্ষা শেষ করে তিনি চলে গিয়েছিলেন কানাডায়। স্বামী ও
সন্তানদের নিয়ে সুখে সংসার করলেও ছবি আঁকার চর্চা থেকে গিয়েছিল। সেখানেই ছবি
আঁকতেন। মাধ্যম হিসেবে জল রং তাঁর পছন্দ। অ্যাক্রলিকেও করেছেন কিছু কাজ। ঝোঁক

রয়েছে অ্যাবস্ট্রাক্ট আঙ্গিকের প্রতি। ১৯৯২-এ প্রথম গ্রুপ শো করলেন কলকাতার পুরনো বাড়িগুলির ছবি এঁকে। এক একটি ঐতিহাসিক বাড়ি আমাদের সংস্কৃতি ও শিল্পরীতির ধারক, অথচ সেগুলি দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের জীবন থেকে। চিত্রলেখা তাদেরই রং, তুলি ও ক্যানভাসে ধরে রাখতে চেয়েছেন। শিল্পরসিকরা মনে করেন তাঁর কাজে হেমেন্দ্র পরিবারের আধ্যাত্মিকতা লক্ষ করা যায়। কলকাতার পরে ভ্যাঙ্কুভারে চিত্র প্রদর্শনী করতে চান চিত্রলেখা। ইচ্ছে আছে বাবার সংগৃহীত শিল্পসম্ভার দিয়ে একটি আর্ট গ্যালারি তৈরি করা এবং মায়ের রচনাগুলিকে একত্র করে প্রকাশ করা। কবে সম্ভব হবে কে জানে?

শুভশ্রী বধূ হয়ে এসেছেন ঋতেন্দ্র পরিবারে। তাঁর বাবা নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসুর ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে। ব্যারিস্টার হয়েও পেয়েছেন প্রভূত সম্মান। শুভশ্রীও নানা গুণের অধিকারী। বৈতানিকে নৃত্যগীত দুই-ই শিখতেন, সেইসঙ্গে লেখাপড়া। ইংরেজি সাহিত্যে এম এ পাশ করে শুরু করেছেন অধ্যাপনা। সেও তো চব্বিশ পঁচিশ বছর হয়ে গেল। পারুল নিজে সন্তানদের বড় করে তোলার তাগিদে শান্তিনিকেতনে চাকরি করেছেন, কাজেই শুভশ্রীকে ঘরের কাজের ফাঁদে আটকে রাখেননি। ঠাকুরবাড়ির মেয়েরাও ঘর-সংসারকে অবহেলা করেননি, প্রয়োজনে কিংবা প্রাণের তাগিদে বাইরের জগতে পা রাখলেও না। অথচ সময়ের সঙ্গে সব মেয়েই বদলাচ্ছিলেন। লেখাপড়া, নাচগান, খেলাধূলাকে অতিরিক্ত সময় দিতে দিতে হারাচ্ছিলেন ঘরের কাজের প্রতি টান। শুভশ্রীর ক্ষেত্রে তা হয়নি। ঠিক ঠাকুরবাড়ির সংস্কৃতির ছাঁচেই নিজেকে তৈরি করে নিয়েছেন তিনি। পারুলের কাছে সেটা একটা প্রাপ্তি। প্রাপ্তি শুভশ্রীরও। একই সঙ্গে তাঁর পরিবার আধুনিক হয়েও আন্তরিক। যে মূল্যবোধকে পদে পদে ভুলে যাওয়াই নতুনদের স্বভাব, শুভশ্রীর সন্তানেরা সেই মূল্যবোধকে যথেষ্ট মর্যাদা দেন।

শুভশ্রী নিজেও পরিবারের সবাইকে খুব ভালবাসেন। এই বিশাল পরিবারকে। ঠাকুরবাড়ির সকলের কথাই ভাবেন বলে স্মৃতির সঙ্গেও গড়ে উঠেছিল তাঁর ভালবাসার নিবিড় বন্ধন, অথচ নিজের মনে একলা থাকা স্মৃতি আর কোনও মানুষকেই শেষ জীবনে আপন ভাবতেন না। কিন্তু শুভশ্রীর আন্তরিকতা সেখানেও জয়ী হয়েছিল।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে শুভশ্রী এম ফিল করেছেন। ভাল অধ্যাপনার জন্যে পেয়েছেন ছাত্রদের শ্রদ্ধা। লেখালেখির অভ্যাস আছে, যদিও অনুবাদই করেছেন বেশি। এই তো কিছুদিন আগে 'অনুষ্টুপ' থেকে প্রকাশিত লেখিকাদের গল্প সংকলনে প্রতিভা বসুর 'দুকুলহারা' গল্পের অনুবাদ করলেন শুভশ্রী।

প্রতিভার মেয়ে অশোকার তিন ছেলে। ছোট ছেলে অনিরুদ্ধর সঙ্গে বিয়ে হল স্মিতার। শৈশব কেটেছে লাহোরে এবং রাওয়ালপিন্ডিতে। দেশভাগের এক বছর আগে চলে আসেন দিল্লিতে। বাবা ছিলেন রেলওয়ে সার্ভিসে, তাই কখনও লামডিং কখনও গোরখপুর—এই রকম ঘুরে ঘুরেই কেটেছে জীবনের প্রথমদিকটা। লেখাপড়া শুরু করেন লখনউ-এ। অরগ্যানিক কেমিস্ট্রি নিয়ে এম এসসি পড়লেন, উত্তীর্ণ হলেন প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে। তারপরই বিয়ে। অনিরুদ্ধও ছিলেন রেলওয়েতে। জিওলজিস্ট শ্বশুরমশাই উপেন্দ্রনাথের বউমাকে বেশি পছন্দ হল স্মিতা জার্মান ভাষা শিখেছেন বলে। উপেন্দ্রনাথও জার্মান ভাষা জানতেন শুধু তাই নয়, তিনি গথিক স্ক্রিপ্ট লিখতেও পারতেন।

বিয়ের পরও স্মিতার পড়া বন্ধ হল না। অশোকার সংসারে কাজের ফাঁকে ফাঁকে চলল

গবেষণার প্রস্তুতি। স্মিতা শিখে নিলেন চৌধুরীবাড়ির রীতিনীতি, যার সূচনা হয়েছিল প্রতিভার হাতে। পুত্রবধূকে নিয়ে শিলচরে গেলেন অশোকা, নববধূকে তাঁর শ্বশুরবাড়ির দেশ দেখাতে। স্মিতা গবেষণা শুরু করেন এলাহাবাদে এসে, অধ্যাপক নীলরতন ধরের কাছে। থিসিস শেষ করে কমনওয়েল্‌থ স্কলারশিপ পেয়ে দু'বছর বিদেশে ইম্পিরিয়াল কলেজ অফ সায়েন্সে। কলকাতায় এসে ১৯৭২ সালে যোগ দিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু কলেজে। অনিরুদ্ধের আকস্মিক মৃত্যু হল ১৯৭৬-এ। একটানা কঠোর এবং একক সংগ্রাম শুরু হল স্মিতার। কাছের দূরের আত্মীয়স্বজন সকলেই ছিলেন, বাড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন সাহায্যের হাত, তবু স্মিতা নিজেই তুলে নিলেন মেয়ের সব ভার। মায়ের মতো মেয়ে অনুরাধাও মেধাবী ছাত্রী ছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পাশ করেছেন, ইতিহাসে অনার্স নিয়ে। রোটারির হয়ে সমাজের বিভিন্ন সেবামূলক কাজের সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে ভালবাসেন অনুরাধা। কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়ে স্মিতা জড়িয়ে পড়েছেন বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে। নবনীড়ের জন্যে কাজ করতে ভালবাসেন মেয়ের সঙ্গে। ঠাকুরবাড়ির সদস্যদের যা চিরকালের অভ্যাস। স্মিতা অবশ্য আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে মন দিয়েছেন। সেটি হল তাঁর পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের বংশতালিকা তৈরি করা। সেইসঙ্গে চৌধুরী পরিবারের বংশলতা উদ্ধারেও রয়েছে প্রচুর আগ্রহ। তাঁর মতো উৎসাহী কন্যা ও বধূর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে বহু পরিবারের বংশপঞ্জি উদ্ধার করা সম্ভব হত। এ কাজ তো একজনের নয়, অনেকের।

ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ হলেও একটি কথা বারংবার শোনা যায়, তাঁরা সকলেই প্রতিভা বিকাশের একটি সুন্দর ক্ষেত্র পেয়েছিলেন। নিজের সাধনাকে সফল করে তোলার জন্যে পেয়েছিলেন সমমনস্ক ও সহানুভূতিসম্পন্ন পারিবারিক প্রতিবেশ, যা তাঁদের আত্মবিকাশে প্রভূত সহায়তা করেছিল। কিন্তু প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও যে এই পরিবারের মেয়েরা এগিয়ে যাবার জন্যে কঠোর সাধনা করতে পারতেন, তার উদাহরণ ঋতা, হেমেন্দ্র পরিবারের আর একটি উজ্জ্বল রত্ন। নৃত্যের জন্যে তাঁর একনিষ্ঠ সাধনা চিরকাল শিল্পপ্রেমিক মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে। ঋতা প্রজ্ঞাসুন্দরী ও লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার দৌহিত্রী, অরুণা ও সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা। সত্যব্রত ছিলেন বরোদা রাজ্যের কর্মচারী। তিনি যখন অক্সফোর্ডে পড়তে গিয়েছিলেন সেই সময় মহারাজা সয়াজিরাও গাইকোয়াড়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। মহারাজার আগ্রহেই তিনি বরোদা রাজ্যের দেওয়ানের পদ গ্রহণ করেছিলেন। ঋতার মা অরুণাও ছিলেন অত্যন্ত শিক্ষিত এবং সংগীতজ্ঞ। অবশ্য তৎকালীন বরোদা ছিল সনাতনপন্থী এবং অতিমাত্রায় রক্ষণশীল। সেই পরিবেশে অরুণা একরকম হারিয়েই গেলেন। কেননা, বরোদায় তাঁকে গৃহবধূ ছাড়া অন্য কোনও ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা গিয়েছিল বলে মনে হয় না। ঋতার জন্ম হয়েছিল বরোদায়। প্রজ্ঞাসুন্দরীর পরিবারের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি জড়িয়ে ছিলেন তাঁর ছোটদাদা ঋতেন্দ্রনাথ। অরুণা বিশেষভাবে তাঁর কথা মনে রেখেই মেয়ের নাম রাখেন ঋতা। জন্ম থেকেই ঋতা পেয়েছিলেন একটি আলোকপ্রাপ্ত পরিবারে বড় হবার সুযোগ। শৈশবেই তাঁর মন ঝুঁকল একটি নতুন শিল্পমাধ্যমের দিকে। বরোদা রাজ্যের এক অনুষ্ঠানে নটরাজ নৃত্য পরিবেশন করছিলেন উদয়শঙ্কর আর সেদিকে চেয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন ঋতা। তখনও তিনি নটরাজ সম্পর্কে কিছু জানেন না, কোনও মন্দিরেও যাননি, গোঁড়া ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়ের মনে নটরাজ সম্পর্কে কোনও পূর্বধারণা গড়ে ওঠেনি। বাড়ি ফিরে ঋতা বায়না ধরলেন তিনি নাচ শিখবেন। বলা বাহুল্য, কেউ তাতে কর্ণপাত করলেন না। বছর কয়েকের মধ্যে ঋতা বহু চেষ্টার পরে একটি নটরাজের মূর্তি ও জগন্নাথের পট সংগ্রহ করলেন। মেয়ের ব্যাকুলতা একদিন বাবা-মার মনে করুণার উদ্রেক করল এবং তাঁরা মেয়ের

জন্য একটি গ্রামোফোন কিনে দেন। সঙ্গে কিছু পুরনো রেকর্ড। 'This magic instrument came into my life with its promise of strange, wonderful vistas, where I could give free rein to my dreams. Behind close doors, I let my fancy run wild.'

যদিও ঋতার বাবা-মা তাঁর নাচ শেখার আগ্রহকে একটুও মূল্য দিলেন না এবং সাফ দিলেন, লেখাপড়া শেষ না করলে তাঁকে নাচ শেখানো হবে না। সে কথা শুনে ঋতা মন দিলেন লেখাপড়ায় এবং শুধুমাত্র নৃত্যশিক্ষার আগ্রহে মাত্র সতেরো বছর বয়সেই স্কুল ও কলেজের পাঠ চুকিয়ে গ্র্যাজুয়েট হলেন। পড়তে তাঁর ভালই লাগত, বিশেষ করে ইংরেজি আর সংস্কৃত। কিন্তু ঋতার বাবা-মা তাঁদের কথা রাখতে রাজি হলেন না। 'মেয়ে বড় হচ্ছে', 'বিয়ে দিতে হবে', 'লোকে শুনলে কী বলবে', 'আমাদের ঘরের মেয়ে হবে নাচিয়ে', 'তাও কি হয়'? বলতে লাগলেন তাঁরা।

এরই মধ্যে ঋতার বাবা অবসর নিয়ে বরোদা থেকে চলে এলেন শিলংয়ে, পাকাপাকিভাবে থাকবেন বলে। এখানেই ঋতা নৃত্যশিক্ষার প্রথম সুযোগ পেলেন এক মণিপুরি নৃত্যশিক্ষকের কাছে। সঙ্গিনী হিসেবে ছিলেন কয়েকজন আর্মি অফিসারের স্ত্রী। কয়েকদিনের মধ্যেই ঋতার বাবা এ কথা জানলেন এবং মেয়েকে তীব্র ভর্ৎসনা করে বললেন, ঋতা নাচ শিখে তাঁর অর্থ অপচয় করছেন। ঋতা তাঁর অর্থসাহায্য না নিয়ে নিজেই শিশুদের নৃত্য শেখাতে শুরু করলেন। সেই 'আফটারনুন ক্লাস' শিখিয়ে ঋতা যা পেতেন গুরুদক্ষিণা হিসেবে, তা দিয়ে শিখতেন মণিপুরি নৃত্য। পরবর্তীকালেও তিনি নৃত্যশিক্ষার জন্য কারও অর্থসাহায্য নেননি।

এরই মধ্যে একদিন ঋতার বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের আগে ভেবেছিলেন, নৃত্যশিক্ষার বাধা পাবেন না, ভেবেছিলেন তাঁর স্বামীও নৃত্য ভালবাসেন। কিন্তু শ্রীলঙ্কায় মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে গিয়ে সামান্য ক্যান্ডি নাচ শেখার ব্যাপারে প্রস্তাবকে স্বামী বিরক্তির সঙ্গে নিলেন দেখে ঋতা ভয় বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। পারিবারিক শান্তির জন্য নাচ ছেড়ে দেওয়া ছাড়া তাঁর আর কোনও পথ রইল না। যদিও ঋতার ভাগ্যলিপিতে নিশ্চয় নৃত্যশিল্পী হবার কথাই লেখা হয়েছিল। না হলে কলকাতা শহরে একটি পার্টি থেকে ফিরে ঋতা কেন দেখবেন তাঁর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন সেই বৃদ্ধ মণিপুরি নৃত্যশিক্ষক। তিনি ঋতাকে জানালেন, সুদূর ইম্ফল থেকে কলকাতায় ঠিকানা খুঁজে খুঁজে তিনি এসেছেন এখানে একটি নৃত্যশিক্ষার স্কুল খুলবেন বলে। ঋতা তাঁকে ফেরাতে পারলেন না। দেখলেন বৃদ্ধ তাঁর ভরসাতেই এতদূরে এসেছেন। নৃত্য আবার ফিরে এল তাঁর জীবনে। 'Thus dance came back into my life. Friction at home had to be endured stoically as the price for the joy I felt in dance.'

কিছুদিন পরে ঋতার স্বামী বদলি হয়ে গেলেন মাদ্রাজ বা এখনকার চেন্নাইয়ে। নৃত্যশিক্ষার সুবর্ণসুযোগ এল তাঁর সামনে। শুরু হল ভরতনাট্যম শিক্ষা। ঋতা প্রমাণ করলেন, তাঁর পূর্ববর্তী নৃত্যশিক্ষার সঙ্গে এর মিল নেই। কঠোর পরিশ্রম করে কয়েক মাসের মধ্যে আয়ত্ত হল কিছুটা। মণিপুরি নৃত্যশিক্ষকের মতো ভরতনাট্যম নৃত্যশিক্ষকেরও প্রিয় শিষ্যা হয়ে উঠলেন ঋতা। কিন্তু হায়! সুখের দিন বড় শীঘ্র শেষ হয়ে যায়। ঋতার স্বামী এবার চেষ্টা করে বদলি হলেন গোয়াতে। একটুও সময় না দিয়ে ঋতা স্থির করলেন, নতুন জায়গায় গিয়ে আরেক ঘরানার নাচ শিখবেন তিনি। ভাবতে অবাক লাগে, সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় যাবতীয় প্রতিকূলতাকে ভেঙে ফেলে ঋতা নিজের সফলতার দিকে কীভাবে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর মতো আর কোনও মেয়েকে, ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনও পরিবারে এমনভাবে একক প্রচেষ্টায় এগোতে হয়নি। যদিও প্রতিটি সাফল্যের সোপান মানুষকে একাই অতিক্রম করতে হয়, তবু অনেকে পান এগিয়ে যাবার একটি পথ কিংবা এগিয়ে যাবার পথে উৎসাহ ও প্রেরণা। ঋতার প্রেরণা তাঁর নৃত্য। আর সাহায্য পেয়েছিলেন তাঁর গুরুর কাছ থেকে। নৃত্যের প্রতি ঋতার অকৃত্রিম টান, নাচ শেখার ঐকান্তিক আগ্রহ তাঁদের স্নেহ আকর্ষণ করেছিল।

বোম্বেতে এসে তিনি ভরতনাট্যমের বিভিন্ন পরম্পরার সম্বন্ধে জ্ঞান সুগভীরভাবে চর্চা করবেন বলে স্থির করলেন। ইচ্ছার সঙ্গে সুযোগ আসে। সে সময় কবি ভাল্লাথোলের নৃত্যশিক্ষক আনন্দ শিবরামন পানিক্করকে বোম্বেতে পাঠিয়েছিলেন কথাকলি নৃত্য শেখাবার জন্যে। ঋতা কথাকলি শিখতে শুরু করলেন। এই শিক্ষায় তাঁর প্রভূত উপকার হল, কেননা নৃত্যের সঙ্গে মুখের অভিব্যক্তি প্রকাশের শিক্ষা তিনি মণিপুরি নৃত্যে পাননি, ভরতনাট্যমে কিছুটা অভিনয় শিক্ষা হলেও তা পূর্ণ হল কথাকলি শিক্ষার পর। মধ্যে কিছুটা সময় তিনি শিখলেন কথক নৃত্য। নৃত্য এমন এক শিল্প, যার প্রকাশ ঘরে বসে সম্ভব নয়। ঋতারও আত্মপ্রকাশের সময় এসে গেল। কেরালায় তাঁর গুরুর সাহায্যে প্রস্তুত করলেন 'পুতনা-মোক্ষম'। অন্যান্য ভাবের তুলনায় বাৎসল্যের ভাব ফুটিয়ে তোলা কঠিন। তা ছাড়া এই নৃত্য তখন কঠোরভাবে 'শুধু পুরুষদের জন্য' নির্দিষ্ট। শুনলেন না ঋতা। কথাকলি নৃত্যের সঙ্গে ঋতা এই ভাবপ্রকাশের কৌশলও শিখলেন। একে একে তাঁর নৃত্যে ফুটে উঠেছিল পুতনা, মঙ্কুড়ি কিংবা বিভিন্ন রূপ। এর মধ্যে 'পুতনা-মোক্ষম' সবার এত ভাল লাগল যে, ঋতার পরবর্তী নৃত্যানুষ্ঠানগুলির সর্বশেষ অনুষ্ঠানটি এই নাচটি দিয়ে শেষ হত। বোম্বেতেই ঋতা পেলেন তাঁর নিজের মনমতো দর্শকদের, একমাত্র পুত্রের জন্মও হল এখানেই। পারিবারিক জীবনের অশান্তি কিছু রয়েই গেল। কলকাতা বা ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে তেমন যোগাযোগ কোনও সময়েই হয়নি। শান্তিনিকেতনে অবশ্য এসেছিলেন প্রতিমার আমন্ত্রণে। শুনেছিলেন ইন্দিরা অনেকের কাছে তাঁর কথা বলেছে উল্লেখ করতেন 'আমাদের ঋতা' বলে। মন ব্যাকুল হয়ে উঠত আপনজনেদের একটু স্নেহস্পর্শের জন্যে।

প্রথম বিদেশযাত্রার সুযোগ পেলেন ১৯৫৮ সালে, পণ্ডিত রবিশঙ্করের চেষ্টায়। ইউরোপ থেকে আমন্ত্রণ পেলেন। ভারতে তখন তিনি প্রতিষ্ঠিত নর্তকী, ইন্দ্রাণী রহমান প্রমুখ নৃত্যশিল্পীর মতো। ঋতা নৃত্য প্রদর্শন করলেন ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ডেনমার্ক ও জার্মানিতে, তাঁর একক নৃত্যে তাঁর সঙ্গী ছিল শুধুমাত্র একটি টেপ রেকর্ডার। এই দিয়েই তিনি জয় করলেন বিদেশের চিত্ত। ফিরে এসে মন দিলেন মোহিনীঅট্টম শিক্ষায়। ঋতার মধ্যে সবরকম নাচ শেখার যে তীব্র আগ্রহ ছিল তা খুবই বিস্ময় জাগায়। সাধারণত, এক একজন শিল্পী এক একটি নৃত্যশৈলী বেছে নেন এবং তাতেই মনোনিবেশ করেন। কিন্তু ঋতা একে একে শিখেছিলেন মণিপুরি, ভরতনাট্যম, কথাকলি, কথক, মোহিনীঅট্টম, কুচিপুড়ি এবং অবশেষে তিনি খুঁজে পেলেন তাঁর আকাঙ্ক্ষিত নৃত্যশৈলী ওড়িশি নৃত্যের মধ্যে। অবশ্য তার আগে তিনি আমেরিকার বিদেশ ঘুরে এসেছেন। এ সময়েই তিনি দেখলেন যামিনী কৃষ্ণমূর্তির ওড়িশি নৃত্য। খোঁজ নিয়ে জানলেন যামিনী নৃত্যশিক্ষা করেছেন গুরু পঙ্কজচরণ দাসের কাছে। ঋতা তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন বোম্বেতে, পঙ্কজচরণ দাসকে আধুনিক মাহারি নৃত্যের জনক বলা হয়। ওড়িশি নৃত্যের অতুলনীয় সৌন্দর্য মুগ্ধ করল ঋতাকে। তিনি পঙ্কজচরণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। 'Since that time I have been devoted to Odissi, almost obsessed with it, gradually giving up all the other styles that I had acquired with so much effort and joy. I made up my mind to dedicate myself to the resuscitation and worldwide projection of this dance tradi- to dedicate myself to the resuscitation and worldwide projection of this dance tradi-

এখানে মাহারি নৃত্য সম্বন্ধে মোটামুটি দু' একটা কথা ঋতার লেখা থেকেই বলে নেওয়া যেতে পারে। এখন আমরা যাকে ওড়িশি নৃত্য বলে থাকি, পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরে তাকেই বলা হত মাহারিদের নাচ। মাহারি বলা হত দেবদাসীদের। এক সময় ভারতের সব প্রান্তের মন্দিরেই দেবদাসী ছিল এবং ছিল তাঁদের স্বতন্ত্র নৃত্যশৈলী। সমাজে তাঁরা সম্মান পেতেন না, বিশেষ করে যখন দেবদাসীপ্রথা উচ্ছেদের জন্যে অনেকেই সরব হয়ে উঠেছেন। দেবদাসীদের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যও ভদ্রঘরের মেয়েদের কাছে অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে উঠল। একই সঙ্গে নৃত্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলেন শত শতকের কয়েকজন শিল্পী। একদিকে উদয়শঙ্করের আবির্ভাব হল, অপরদিকে

শান্তিনিকেতনে শুরু হল নৃত্যচর্চা। ওড়িশায় গুরু পঙ্কজচরণ দাস অবহেলিত মাহারি নৃত্যশিক্ষা দিতে শুরু করলেন। তিনি স্বয়ং একজন মাহারির সন্তান এবং পুরুষেরা মাহারি নৃত্য শিখতেন না। অল্পবয়সি ছেলেরা শিখত গুটিপোয়া নাচ। যাই হোক, সমাজে বিকৃত দেবদাসী নৃত্যকে শিল্পরসিক সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন পঙ্কজচরণ এবং তাঁর ছাত্রেরা। এদের মধ্যে রয়েছেন কেলুচরণ মহাপাত্র, যামিনী কৃষ্ণমূর্তি, সংযুক্তা পাণিগ্রাহী, প্রিয়ম্বদা মোহান্তি ও তাঁর কন্যা অহল্যা ও আরও অনেকে। অবশ্য পুরোপুরি তাঁর নৃত্যধারাকে অনুসরণ করেছেন মাত্র তিনজন, তাঁর নিজের মেয়ে বিজয়লক্ষ্মী, অহল্যা এবং ঋতা। মাহারি নৃত্যের কিছু বৈচিত্র্য তাকে অন্য সব কিছুর থেকে আলাদা করেছে। ঋতা শিখেছেন তাঁর গুরুর কাছে এবং পঙ্কজচরণ শিখেছিলেন তাঁর মাসি রত্নপ্রভাদেবীর কাছে; এই বৈশিষ্ট্যটি হল মাহারিদের কাছে নৃত্য কোনও কলা বা শিল্প নয়, তা হল পূজা। সেইজন্য কোনও রীতিগত বিশুদ্ধতার প্রতি দায়বদ্ধতারও প্রয়োজন তাঁরা অনুভব করতেন না। গুরু পঙ্কজচরণ একই নৃত্য ভিন্ন তাল, লয়, ভঙ্গিতে প্রকাশ করতেন। ঋতাই প্রথম দেবদাসী নৃত্যকে যথাযথভাবে জগৎসভায় পরিবেশন করলেন।

১৯৬৫-তে আসামে বা অসমে নৃত্যানুষ্ঠান করতে গিয়ে ঋতা খোঁজ পেলেন সত্রিয় নৃত্যের। অসমের সত্র বা দেবস্থানে সাধুরা এই নাচ শিখে থাকেন। এটিও শুধু পুরুষেরাই শিখতেন। তবু যে দুজন ঋতাকে সত্রিয় নাচ শেখাতে রাজি হলেন তার প্রধান কারণ ঋতা অসমিয়া বংশোদ্ভূত এবং তাঁর মাতামহ কলমবারি সত্রের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নৃত্যশিক্ষার পর ঋতা এই নৃত্য পরিবেশন করেন অসমের বাইরে এবং ভারতের বাইরে। এই অঞ্চলের দেওনটী ও দেওধনী নাচও তিনি শিখেছিলেন, নাম শুনে এ দুটিকেও দেবদাসী নৃত্যের স্বজাতি বলে মনে হয়। ঋতার নৃত্য পরিক্রমা থেকে আরও একটা ধারণা ক্রমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, প্রাচীন ভারতে সব নৃত্যই গড়ে উঠেছিল মন্দিরকে আশ্রয় করে। প্রতিটি নাচ শিখে ঋতা সেই মন্দিরকলা সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করে মন দিলেন মাহারি নৃত্য পুনরুদ্ধারে। ওড়িশার জগন্নাথ মন্দিরের অন্তরাল থেকে তাকে নিয়ে এলেন আধুনিক স্টেজে।

এখানেই যদি থামতেন ঋতা, তাহলেও তাঁকে সুদক্ষ শিল্পী বলে অভিহিত করা যেত অনায়াসে। কিন্তু তিনি নতুন নতুন নৃত্যরীতির উদ্ভাবকও। নৃত্যের মধ্য দিয়ে নাট্যাভিনয় আমরা আগেই পেয়েছি রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা', 'শ্যামা', 'চণ্ডালিকা' প্রভৃতির মধ্যে। প্রত্যক্ষভাবে ঋতার সঙ্গে এই নতুন ধারাটির যোগ না থাকলেও বিশাল বাড়িটির শিল্পসাধনা ও প্রতিভার সঙ্গে তাঁর অলক্ষিত যোগ থেকে গিয়েছিল। অবশ্য এ যোগ কিছুটা আকস্মিক, কেননা প্রাচীন ভারতীয় শিল্পধারার পুনরুজ্জীবনই ছিল ঋতার প্রধান লক্ষ্য। এ কাজে তিনি সবচেয়ে বেশি সাহায্য পেয়েছিলেন তাঁর গুরু পঙ্কজচরণ দাসের। ঋতার প্রথম নৃত্যনাট্য সম্ভবত 'পঞ্চকন্যা'— কুন্তী, দ্রৌপদী, তারা, অহল্যা ও মন্দোদরী—রামায়ণ ও মহাভারতের পাঁচটি অবিস্মরণীয় চরিত্রকে তিনি একাই ওড়িসি নৃত্যের সাহায্যে রূপায়িত করলেন দীর্ঘ সাড়ে তিন ঘণ্টায়। উচ্চ প্রশংসিত সেই অনুষ্ঠানের প্রস্তুতির জন্যে ঋতার লেগেছিল ছ'টি বছর। পেলেন প্রার্থিত সম্মান, সংগীত নাটক আকাদেমি থেকে মাহারি নৃত্য সম্বন্ধে অধিকতর কাজ করার জন্যে বিশেষ পুরস্কার। আকাদেমির পক্ষ থেকে সংরক্ষণের জন্যে তোলা হল ভিডিও ফিল্ম। সর্বোপরি পেলেন গুরুর আশীর্বাদ। সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছোতে হলে মানুষকে কিছু হারাতেও হয়, নৃত্যের জন্যে ঋতা হারিয়েছেন অনেক কিছু। এ সময় তাঁর দাম্পত্য জীবনে ছিল প্রবল অশান্তি। কোনওক্রমেই আর ভাঙন ঠেকানো গেল না এবং বিবাহ বিচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে ঋতার জীবনের ধারাবাহিকতা বদলে গেল অনেকখানি। এ সময়ে তিনি চতুর্থবার আমেরিকা সফর সেরে ফেলেছেন, সেখানেও 'পঞ্চ কন্যা' অজস্র বিস্ময় বিমুগ্ধ অভিনন্দন কুড়িয়েছে, নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাঁকে নৃত্যশিক্ষক হিসেবে যোগ দেবার জন্যে অনুরোধ জানানো হল। অনিশ্চয়তার পরিবর্তে তখন তাঁর প্রয়োজন ছিল নিশ্চিত আয়ের, কারণ তাঁর ছেলেকে

তিনি নিজের কাছে রাখতে পেরেছিলেন। কিন্তু আমেরিকায় চলে যাওয়ার ফলে ভারতে নৃত্যশিল্পী হিসেবে তিনি খ্যাতির যে চূড়া স্পর্শ করেছিলেন তা আর ধরে রাখা সম্ভব হল না। আবার যখন তিনি চুক্তিবদ্ধ সময়ের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে নৃত্যজগতে ফিরে এলেন তখন দশ বছরের বিপুল ব্যবধান ভারতীয় নৃত্যজগৎ থেকে তাঁকে দূরে সরিয়েই রাখল।

একটুও দমে না গিয়ে ঋতা আবার মন দিলেন নৃত্যনাট্যে। কালিদাসের 'কুমারসম্ভবম্', 'মেঘদূতম', 'ঋতুসংহারম'-এর পরে শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিকম' করলেন। ওড়িয়া 'কল্পলতা' ও বাংলা কাহিনী অবলম্বনে 'খনা', চণ্ডীপুরাণ থেকে 'মহাদুর্গা' প্রচুর সমাদর লাভ করল। পরীক্ষামূলকভাবে বাইবেল ও গ্রিক পুরাণ থেকে কিছু অংশ বেছে নিয়ে তাকে ভারতীয় নৃত্য ও বিদেশের আবহসংগীতের মাধ্যমে নতুন রূপ দেবার চেষ্টা করলেন ঋতা, নাম দিলেন 'প্রাক-প্রতীচি'—ভারতীয় নৃত্যশিল্পীদের মধ্যে তিনিই এ কাজে প্রথম হাত দিলেন। তাঁর এই প্রচেষ্টার জন্যে নিউ ইয়র্কের ক্রিয়েটিভ আর্টিস্টস্ পাবলিক সার্ভিস প্রোগ্রাম থেকে (১৯৭৯) কোরিওগ্রাফি ফেলোশিপ দেওয়া হয়, ১৯৮২ ও ১৯৮৪ সালে কোরিওগ্রাফি ফেলোশিপ পান ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল এনডাউমেন্ট ফর দি আর্টস-এর পক্ষ থেকে। একে একে প্রস্তুত হয় 'মেরি ম্যাগডালেন', 'দি সঙ অফ সলোমন', 'ডেলাইলা', 'দি গার্ডেন অফ ইডেন', 'বাসবদত্তা' ও 'লিলিয়াথ'—প্রতিটির ভিডিও টেপ ওই দুটি সংস্থার রক্ষণাগারে সংরক্ষিত হয়েছে। প্রশংসাও পেয়েছে কিন্তু মন ভরেনি ঋতার। 'গতি-বিলাস-পল্লবী'তে তিনি স্বচ্ছন্দ, নিজস্ব সংস্কৃতির মধ্যেই তিনি পেয়েছেন বাঁচার স্বাদ। ১৯৯৪-এ যখন সংগীত নাটক আকাদেমি আবার মাহারি নৃত্যের নিখুঁত রূপায়ণের ভিডিও টেপ তুলে রাখে, তখন আনন্দিত হন ঋতা, মাহারি নৃত্যকে যথাযথ রূপ দিতে পেরেছেন বলে। আজও নৃত্য তাঁর কাছে শুধু শিল্প নয়, নৃত্যই তাঁর জীবন, 'My dance is my total life. The prospect of a time when I will not be able to dance is unthinkable.'

ঋতা প্রতি বছর শীতকালে একবার করে ওড়িশায় আসেন। নিয়ে যান নতুন কিছু নৃত্যশৈলী। নাচ নিয়ে মাঝে মাঝে লিখেওছেন। সম্প্রতি শেষ করেছেন নিজের আত্মজীবনী 'দি ইটারনাল ফ্রেম'—তাতে আছে নিজের কথা এবং অবশ্যই নাচের কথা। ভারতের প্রতিটি নৃত্যশৈলীর অনুপুঙ্খ আলোচনার সঙ্গে গাঁথা হয়েছে তাঁর জীবনকথা। শিষ্যদেরও শেখান, নাচের কোনও বয়স নেই, সব বয়সেই নাচ শেখা যায়। এমন কথা বলতে পারেন শুধু ঋতাই, যাঁর দিনের প্রতিটি ঘণ্টাই অধিকার করে আছে নৃত্য। তিনি বলেন, অন্য কোন কাজে খরচ করার মতো সময় তাঁর নেই, 'I think dance, I live dance, I dream dance.'

রত্নার মেয়েদের মধ্যে ইরা অনেকদিন পড়িয়েছেন বিভিন্ন জায়গায়। ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা পড়াতে ভালবাসতেন, কাজেই শিক্ষকতা ইরার প্রিয় বিষয়। পরে যোগ দিয়েছেন একাধিক সেবামূলক কাজের সঙ্গে। দিদিমার বিশেষ গুণ অর্থাৎ রান্নায় সিদ্ধহস্ত তিনিও। প্রজ্ঞাসুন্দরীর রান্নার বইগুলি সম্পাদনা করে প্রকাশ করার দায়িত্ব নেবার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজিতে লেখা একটি রান্নার বইও শীঘ্রই প্রকাশ করবেন ইরা।

মহর্ষির বড় মেয়ে সৌদামিনী কখনও শ্বশুরবাড়িতে না গেলেও তাঁর মেয়েরা ঠাকুরবাড়ি, বিশেষ করে জোড়াসাঁকোর বাড়ি থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছিলেন। বড় মেয়ে ইন্দুমতীর পরিবারের সঙ্গে পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ির ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল। তাঁর তিন মেয়ের মধ্যে দুজনের বিয়ে হয়েছিল ঠাকুরবাড়িতেই। সম্পর্কসূত্রে পারুলের কথা আগেই বলা হয়েছে। এখানে তাঁর আর এক মেয়ে ইন্দ্রাণীর মেয়ে ও ছেলের বউয়ের কথা বলা যেতে পারে। তাঁর মেয়ে শেফালিকার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের মেজো ছেলে প্রমোদেন্দুনাথের সঙ্গে

আর ছেলের বউ হয়ে এসেছিলেন প্রবোধেন্দুনাথের বোন সুব্রতা। শেফালিকা ও সুব্রতা পরম বন্ধু ছিলেন।

প্রফুল্লনাথ ঠাকুর বিবিধ গুণের অধিকারী ছিলেন। সুকুমার শিল্পের প্রতি ছিল প্রকৃত টান। গান শুনতে যেমন ভালবাসতেন তেমনই ভালবাসতেন চিত্র ও ভাস্কর্য সংগ্রহ করতে। তাঁর স্ত্রী অমিয়া ছিলেন কবিপত্নী মৃণালিনীর মাসতুতো বোন। প্রখ্যাত ভাস্কর হিরণ্ময় রায়চৌধুরী প্রফুল্লনাথের শ্যালক ছিলেন। তাঁর কাছেই প্রবোধেন্দু এবং সুব্রতার অঙ্কনশিক্ষা শুরু হয়। অল্প কয়েকদিন পরেই দেখা গেল তাঁর আঁকার হাত খুব ভাল। আজও তাঁর ছবিগুলি তাঁদের বাড়িতে রয়েছে। অবশ্য বিশাল ক্যানভাসে ধরে রাখা সব ছবি কালের নিষ্ঠুর স্পর্শ থেকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি, অজন্তার অনুকরণে একটি বিশাল ছবি জলে ভিজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অন্য যেগুলি ভাল অবস্থায় আছে সেগুলি প্রমাণ করে নিয়মিত চর্চা রাখলে আর একজন উৎকৃষ্ট চিত্রশিল্পীকে পাওয়া যেত। কিন্তু সুব্রতা বিয়ের পরে বিশেষ ছবি আঁকতেন না। অন্তত তাঁর পুত্র নিরধিপ্রকাশ তাঁকে ছবি আঁকতে দেখেননি জানিয়েছেন। অধিকাংশ পরিবারেই বাড়ির পুরুষেরা, বিশেষত সেকালে, খোঁজ রাখতেন না অন্তঃপুরিকারা কীভাবে তাঁদের সময় কাটান। সুনয়নীর মতো নিয়মিত চিত্রচর্চার সময়ও সুব্রতার ছিল না। তবে পরেও তিনি কিছু ছবি এঁকেছিলেন। প্রকৃতি তাঁকে টানত। পাহাড় খুব ভালবাসতেন বলে দেরাদুন, মুসৌরি, দার্জিলিং-এর কিছু ছবি এঁকেছিলেন যা প্রথম জীবনে আঁকা অজন্তার গুহাচিত্রের প্রতিলিপির সঙ্গে মেলে না কিন্তু দুটি ধারাই সুন্দর। তিনি গান শিখেছিলেন রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর কাছে। ভাল সেতার বাজাতেন। রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর তাঁর মেয়ের ছবি বড় আকারে আঁকিয়ে ফ্রেমে বাঁধিয়ে রেখেছিলেন। আজও সেগুলি গাঙ্গুলিবাড়ির বসবার ঘরে সাজানো আছে। ছবিটি বিদেশ থেকে বাঁধিয়ে এবং অলংকৃত করে আনা হয়েছিল। ঠাকুরবাড়ির অনেক পরিবারেই এমন ছবি চোখে পড়বে। শুনেছি এক সময়ে বাড়ির মেয়েদের ছবি বসবার ঘরে রাখা হত না। অনেক পরিবারেই মেয়েদের ফোটো থাকত না। কিন্তু সমস্ত ঠাকুরবাড়িতে কিংবা বলা যায় মূল বাড়িগুলিতে মেয়েদের বড় এবং বাঁধানো ফোটো পাওয়া যায়। সেগুলি নিশ্চয় মেয়ের বিয়ের সময় উপহার দেওয়া হত, কেননা তাঁদের বাড়িতেই এখনও ছবিগুলি রয়েছে। এমনও হতে পারে, মেয়ের নতুন সংসার সাজিয়ে দেবার অঙ্গ ছিল বিশালাকার একখানি ছবি দিয়ে। বিশেষ করে যে মেয়ের বাবা ছিলেন চিত্রকর কিংবা চিত্রবোদ্ধা। লক্ষণীয় যা, তা হল মেয়েদের শ্বশুরবাড়ির সকলেই সে ছবি সমাদরের সঙ্গে বসবার ঘরে সাজিয়ে রাখতেন।

•

ইন্দ্রাণীর মেয়ে শেফালিকার বিয়ে হল সুব্রতার দাদা প্রবোধেন্দুনাথের সঙ্গে। অপরূপ রূপসী শেফালিকার একটি সুন্দর বর্ণনা আছে তাঁর পুত্র সন্দীপ ঠাকুরের লেখায়। তিনি লিখছেন, 'দিদিমা সাদা-ফর্সা, পিঙ্গল চোখ ও চুল, আমার মায়ের কালো চোখ, চুল—মুখ নাক টিকোলো। ছোটবেলা থেকেই আজানুলম্বিত তাঁর কেশ। খোলা চুলে তিনি যখন বসে থাকতেন, তাঁর চারপাশ ঘিরে তাঁর অন্ধকার আকাশে চাঁদের মতো মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। বাড়ির অন্যান্য মেয়েদের মতো তিনিও বাড়িতে লেখাপড়া শিখেছেন ইংরেজি ও বাংলার ওপর দখল তো ছিলই, পরে শিক্ষিত স্বামীর সংস্পর্শে এসে তাঁর লেখার কাজেও সাহায্য করেছেন।' তাঁর বড় মেয়ে পদ্মার মনে আছে মায়ের গানের কথা। তিনি লিখেছেন, 'ছোটবেলা থেকে আমাদের বাড়িতে গানের একটা পরিবেশের ভিতর আমরা মানুষ হয়েছি। আমার মা খুব ভাল গান করতেন। রাধিকা গোস্বামীর কাছে গান শিখেছিলেন। দিনেন্দ্রনাথের কাছে রবীন্দ্রনাথের গান শিখেছিলেন। আমার মা দেখতে যেমন সুন্দরী ছিলেন তাঁর গানের গলাও তেমনি অপরূপ ছিল। তখন বাইরে কোথাও মেয়েদের গাইবার রেওয়াজ ছিল না, বিশেষ করে আমাদের ঠাকুর

পরিবারে। বিশেষ পরিচিত পরিবার বা নিজেদের পরিবারের গণ্ডির মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ ছিল।' পদ্মার এই লেখাটুকু থেকেই পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ির পরিবেশটি খুঁজে পাওয়া যায়। আরও স্পষ্ট হয় সন্দীপ যখন লেখেন, 'মা ছিলেন রোগা পাতলা মানুষ। লোকদেখানো ব্যাপারে তাঁর বিতৃষ্ণা ছিল। তিনি সব সময় তাঁতের শাড়ি ও নামমাত্র গয়না পরতেন। শাড়িতে পায়ের পাতা ঢাকা মাকেই সব সময় দেখেছি। সেই মাকেই মুসৌরিতে দেখেছি। বাবার সঙ্গে ঘোড়ায় চড়তে, অশ্বারোহীর যোধপুর-ব্রীচেস পরনে, গায়ে রঙিন জামা, হাঁটু পর্যন্ত বুট, হাতে চাবুক, ঘোড়া হাঁকাচ্ছেন, আমরা হাঁ করে দেখছি।' বোঝা যায়, এ বাড়ির মেয়েরাও আধুনিকতার খোলা হাওয়ায় স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করতে পারতেন, সে যোগ্যতাও তাঁদের ছিল কিন্তু সনাতনি প্রচলিত নিয়মকে অগ্রাহ্য করার সময় এ বাড়ির মেয়েদের মধ্যে এল আরও পরে। শেফালিকা তাঁর মামা দিনেন্দ্রনাথের কাছে এস্রাজ বাজাতেও শিখেছিলেন, আবার সুর করে রামায়ণ-মহাভারতও পড়তেন। ছেলেমেয়েদের শৈশবে লেখাপড়া ও গান শেখাবার ভার তিনি নিজেই নিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে ছিল সংসারের তদারকির ভার। এ নিয়মটা সব ঠাকুরবাড়ির সব গৃহিণীকেই পালন করতে হত। শাশুড়ি অমিয়া ভাঁড়ারের চাবি তুলে দিয়েছিলেন শেফালিকার হাতে।

প্রবোধেন্দুনাথ ঋগ্বেদ অনুবাদ করছিলেন কয়েক বছর ধরে। বাতে তখন তিনি এতই কাতর হয়ে পড়তেন যে, লিখতে পারতেন না। সেই সময় শেফালিকা তাঁকে সাহায্য করতেন লিখে দিয়ে। প্রতিদিন সকালে দু' ঘণ্টা আর বিকেলে দু' ঘণ্টা প্রবোধেন্দুনাথ বলে যেতেন আর শেফালিকা লিখে যেতেন। তাঁর শরীরও ভাল ছিল না। হাঁপানির জন্যে কষ্ট পেতেন, তবু বছরের পর বছর বাগানের দক্ষিণ দিকের কুঞ্জ বিতানে বসে বসে তাঁরা দুজনে সাহিত্যসাধনা করেছেন।

সৌদামিনীর ছোট মেয়ে ইন্দুমতীর সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির যোগ কিছু কমে গিয়েছিল, তাঁরা থাকতেন দক্ষিণ ভারতে। তাঁর এক মেয়ে নীলার বিয়ে হয়েছিল চৌধুরী পরিবারে, আশুতোষ, প্রমথদের ছোট ভাই মন্মথর সঙ্গে আর ছোট মেয়ে স্টেলার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল স্বর্ণকুমারীর নাতি অজিতকুমার ঘোষালের। মধ্যে আরও কয়েকজন মেয়ে ছিলেন। ইন্দুমতীর পরিবারে উজ্জ্বলতম নক্ষত্র হচ্ছেন মন্মথ ও নীলার মেয়ে দেবিকারানি। যাঁকে সরোজিনী নাইডু বলতেন, 'ভারতীয় ছবির নাইটিঙ্গেল।' অল্প বয়সেই দেবিকারানিকে লন্ডনে পাঠানো হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে শোনা গিয়েছে, তিনি যখন বাবা ও মায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাছে এসেছিলেন তখন কবি দেখেছিলেন নৃত্য-গীত-অভিনয়ে বালিকার অসাধারণ অধিকার। প্রতিভা চিনতে পারে প্রতিভাকে। মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ দেবিকার বাবা-মাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, মেয়েকে বিদেশে পাঠাতে, সেখানেই এ মেয়ে পেতে পারে যোগ্য শিক্ষা, অর্জন করবে যোগ্য ব্যক্তিত্ব। দেবিকার মধ্যে যে প্রতিভা কুঁড়ির মতো সুপ্ত রয়েছে, তার পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব লন্ডনে। কবির উপদেশ শিরোধার্য করে মন্মথ ও নীলা দেবিকারানিকে পাঠালেন বিলেতে। বাবার ইচ্ছে ছিল মেয়ে স্থাপত্যবিদ্যায় পারদর্শী হবেন। অন্যদের ইচ্ছে ছিল মেয়ে শিখবে আধুনিকতম টেক্সটাইল ডিজাইনিং। দেবিকারানির নিজের ইচ্ছে ছিল অভিনেত্রী হবার। সাউথ হ্যাম্পস্টেড স্কুলে পড়বার সময়েই তিনি ক্লাসরুমে ক্লিওপেট্রার ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করে পুরস্কার পান ও লন্ডনের রয়্যাল অ্যাকাডেমি অফ ড্রামাটিক আর্টস স্কুলে শিক্ষার জন্য স্কলারশিপ পেয়ে মনস্থির করতে দেরি হয় না। যদিও তিনি ভর্তি হলেন টেক্সটাইল ডিজাইনিং, ডেকর ও আর্কিটেকচার হাতে-কলমে শেখবার জন্য অ্যাপ্লায়েড আর্টস-এর ক্লাসে। এবং এই শিক্ষা তাঁকে আরও এগিয়ে দেয় চিত্রজগতের দিকে। মাত্র আঠেরো বছর বয়সে এক নামকরা স্টুডিওয় টেক্সটাইল ডিজাইনারের কাজ পেলেন দেবিকারানি। তাঁর অনুপম সৌন্দর্য এবং লাবণ্যময় ব্যক্তিত্ব ক্রমেই প্রকাশিত হল। এ সময়েই তাঁর সঙ্গে দেখা হল এক প্রতিভাবান বাঙালি যুবকের, তাঁর নাম

হিমাংশু রায়। শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য আশ্রমে তাঁর শিক্ষা শুরু হয়েছিল, বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তিনি লন্ডনে পড়তে আসেন এবং পরে ব্যারিস্টার হবার জন্যে আইন পড়তে শুরু করেন। কিন্তু অভিনয় এবং শিল্পজগতের প্রতি প্রবল টান থাকায় আইন পড়া ছেড়ে হিমাংশু প্রতিভা বিকাশের মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রকে বেছে নিয়েছিলেন। সারা বিশ্বেই তখন চলচ্চিত্র তুলনায় সবচেয়ে নতুন শিল্পমাধ্যম। ভারতীয়দের মনেও চলচ্চিত্র বিশেষ আগ্রহ সঞ্চার করেছিল। ডি জি বা ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায় একই সময়ে এদেশে চলচ্চিত্র নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছিলেন। হিমাংশু রায় বিদেশে। তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন বিপিন পালের পুত্র নিরঞ্জন পাল, প্রমথনাথ বসুর পুত্র মধু বসু, শিল্পী চারু রায় ও আরও অনেকে। হিমাংশু রায়ের 'দি লাইট অফ এশিয়া' নামে বুদ্ধের জীবনকথা দর্শকদের আলোড়িত করল। তারপর ১৯২৮-এ তিনি কাজে হাত দিলেন মহাভারত অবলম্বনে তাঁর বিখ্যাত ছবি 'এ থ্রো অফ ডাইস'। পরিচয় হল দেবিকারানির সঙ্গে, হিমাংশু তাঁকে অনুরোধ জানালেন তাঁর প্রোডাকশন ইউনিটে যোগ দিতে। দেবিকারানি সানন্দে সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। হয়তো তিনি সেদিন ভেবেছিলেন এর ফলে তাঁর পক্ষে অভিনেত্রী হওয়া সম্ভব কিংবা অন্য কিছু। আসলে দেবিকারানি কোথাও তাঁর নিজের মনের কথা বিশেষ বলেননি। আমরা আজও জানতে পারি না মেয়ের অভিনেত্রী হবার আগ্রহ দেবিকারানির বাবা-মাকে কতটা ভাবিয়েছিল। তাঁরা কি মেয়েকে উৎসাহ দিয়েছিলেন? কিংবা আপত্তি জানিয়েছিলেন?

এক বছর পরে ১৯২৮ সালে হিমাংশু ও দেবিকারানির বিয়ে হয়। রায় পরিবার কিংবা চৌধুরী পরিবার কীভাবে নিলেন ঘটনাটিকে, তা জানা যায়নি। লন্ডন থেকে তাঁরা চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্যে এলেন জার্মানিতে। সেখানে তাঁরা দুজনেই এরিখ পমারের কাছে ফিল্ম প্রোডাকশন বা চলচ্চিত্র নির্মাণের তালিমও নিলেন। অভিনয় শিক্ষার জন্যে দেবিকা গেলেন ম্যাক্স রাইনহার্টের কাছে। তাঁর শর্ত ছিল আগে জার্মান ভাষা শিখতে হবে। দেবিকা রাজি হলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই নির্ভুল উচ্চারণে নিয়ন্ত্রিত শীলিত কণ্ঠে সংলাপ শুনিয়ে ম্যাক্সকে মুগ্ধ করেন। টোয়েন্টিএথ সেঞ্চুরি ফক্স থেকে দেবিকারানিকে আমন্ত্রণ জানানো হয় অভিনয়ের জন্যে। সেখানে তখন তোলা হচ্ছিল 'দি স্নেক চার্মার্স ডটার'—তাঁরা বেদের মেয়ের ভূমিকায় দেবিকারানিকে চেয়েছিলেন। এত বড় সুযোগ সহজে পাওয়া যায় না। কিন্তু এই প্রস্তাবে সম্মত হননি হিমাংশু। তাঁর ইচ্ছে দেবিকারানির দুর্লভ প্রতিভা নিজের দেশের ছবির কাজেই লাগানো উচিত। দেবিকা হিমাংশুর ইচ্ছেকেই মর্যাদা দিয়েছিলেন। যদিও পরে অনেকেই মনে করেছেন, এ ছবিতে দেবিকার অভিনয় করা উচিত ছিল।

দেবিকারানি অভিনেত্রী হয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন আরও দু বছর পরে ১৯৩৩-এ। হিমাংশু নিজেই এ ছবিটি নির্মাণ করেন, নায়কও তিনি। ভারতীয় অভিনেতা-অভিনেত্রী নিয়ে ইংরেজি ভাষায় তোলা প্রথম ভারতীয় চিত্র 'কর্ম' অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছিল। অপরূপ রূপসী দেবিকারানির পরিশীলিত অভিনয় প্রচুর প্রশংসা লাভ করে। তাঁকে বলা হয় দি ফার্স্ট লেডি অফ দি ইন্ডিয়ান সিনেমা। ভারতে এই ছবির একটি হিন্দিরূপও দেখানো হয়েছিল। আসলে ছবিটি দুই ভাষাতেই তোলা হয়। এদেশে কিন্তু 'কর্ম' প্রচন্ড সমালোচনার সামনে পড়েছিল, কেননা এই ছবিতে ছিল একটি দীর্ঘ চুম্বন দৃশ্য। দেবিকারানি ছাড়া এতে অপর নারীচরিত্রে অভিনয় করেছিলেন বর্ধমানের রাজকুমারী সুধারানি। বি বি সি তাদের প্রথম টেলিভিশন প্রোগ্রামে দেবিকারানিকে বক্তা ও অভিনেত্রীরূপে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল।

ভারতে এসে হিমাংশু ও দেবিকা তৈরি করেন বোম্বে টকিজ, হিন্দি চলচ্চিত্র জগতে বোম্বে টকিজের দান কম নয়। এখানে একদিকে শুরু হল চিত্র নির্মাণ, অন্যদিকে এদেশের নবীন শিল্পীদের তালিম দেওয়া শুরু হল। নবীনদের মধ্যে ছিলেন অশোককুমার, কিশোর শাহ, দিলীপকুমার, মধুবালা, খাজা আহমেদ আব্বাস প্রমুখ পরবর্তীকালের বিখ্যাত শিল্পীরা। একই

সঙ্গে দেবিকারানি অভিনয়ও শুরু করলেন। এদেশে দেবিকার প্রথম ছবি 'গগন কী রাগিনী', তারপর 'জওয়ানি কা হাওয়া'। তার পরের ছবি 'জীবন নাইয়া'—নায়ক অশোককুমার। তিনি টেকনিশিয়ানের কাজ শিখতে এসেছিলেন আইন পড়া অসমাপ্ত রেখে। চলচ্চিত্র সম্বন্ধে সকলেরই তখন প্রবল কৌতূহল, যুবকদের কাছে অনেকটা নিষিদ্ধ জগতে প্রবেশ করার উন্মাদনা। সমাজে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা অপাঙ্‌ক্তেয়। হিমাংশু যখন অশোককুমারকে নায়ক হবার প্রস্তাব দিলেন, অশোক রাজি হতে পারলেন না। অথচ তিনি সেইখানেই কাজ করেন। বললেন, 'দেখুন, যারা অভিনয় করে তারা সব সমাজের নীচতলার মানুষ। আমি কিন্তু অ্যাক্টিং করতে চাই না।'

অশোককুমার লিখছেন, 'হিমাংশু রায়ের মুখ গম্ভীর। বললেন, আমার বউ দেবিকা সম্পর্কে রবি ঠাকুরের নাতনি। তুমি বলতে চাও সে ছোটলোক? আমি চিৎকার করে বলতে গেলুম, না, না, তা বলছি না—। আমাকে থামিয়ে তিনি চালিয়ে গেলেন, বর্ধমান মহারাজার মেয়ে সুধারানি আমাদের সঙ্গে কাজ করছে। সে ছোটলোক? জ্ঞান মুখার্জি এসেছে ইউনিভার্সিটির পরীক্ষায় রেকর্ড নম্বর পেয়ে। সে ছোটলোক?'

অশোককুমার আর প্রতিবাদ করতে পারলেন না। প্রসঙ্গত, মনে রাখতে হবে অভিনয়ের ক্ষেত্র থেকে দুর্নাম দূর করার জন্যে এক সময়ে বহু অভিজাত ব্যক্তি চেষ্টা শুরু করেছিলেন। ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়, মধু বসু, হিংমাশু রায়ের আগ্রহে তাঁদের স্ত্রীরা অভিনয়ের জগতে এসেছিলেন। ভদ্রসমাজের সামনে এই উদাহরণের প্রয়োজন ছিল। কেননা অধিকাংশ অভিনেত্রীই আসতেন নিষিদ্ধ পল্লি থেকে। দেবিকার কথা অবশ্য আলাদা। তাঁর নিজেরও আগ্রহ ছিল। বোম্বেতে দেবিকা সবচেয়ে বেশি ছবিতে অভিনয় করেন অশোককুমারের সঙ্গে। 'কিন্তু দেবিকারানি যে-সে মহিলা নাকি? অপূর্ব সুন্দরী। গায়ের রং, হাবভাব, কথাবার্তা—সব একেবারে মেম সায়েবদের মতো। লন্ডনে বড় হয়েছেন, হিন্দির চেয়ে সহজে ইংরেজি বলেন। তার ওপর বসের বউ। রিহার্সাল দেব কি, লজ্জাতেই মরে যাচ্ছি।' লিখেছেন অশোককুমার। কিন্তু তাঁদের জুটি দর্শকদের ভাল লেগেছিল। একে একে নির্মিত হল 'অচ্ছুত কন্যা', 'জন্মভূমি', 'ইজ্জত', 'সাবিত্রী', 'নির্মলা', 'বচন'—সর্বত্র দেবিকারানি আশ্চর্যভাবে আধুনিক। মঞ্চাভিনয় ও চলচ্চিত্রে অভিনয় যে এক নয়, প্রথম থেকেই তা তিনি জানতেন। সবাক যুগের প্রথমে অভিনয় করতে এসেও তিনি এত স্বাভাবিক অভিনয় করতেন কী করে কে জানে? 'অচ্ছুত কন্যা' সুপারহিট ছবি। তিনি যে ভাল গানও গাইতেন, এই ছবির 'ম্যায় বন কি চিড়িয়া' তার প্রমাণ। গানটিও অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। দেবিকার ব্যক্তিত্বের ঋজুতার সঙ্গে মিশে ছিল কণ্ঠের লাবণ্য। সেই বয়সেই এক ভাগ্যতাড়িত বৃদ্ধার ভূমিকায় অভিনয় করেন 'নির্মলা'তে। এর পরে করলেন 'দুর্গা'।

হিমাংশুর মৃত্যু হয় ১৯৪০ সালে। স্বামীর মৃত্যুর পরে দেবিকা অভিনয়ের জগৎ থেকে সরে আসেন। প্রযোজনা করেন বেশ কয়েকটি সফল চলচ্চিত্র—'কঙ্কন', 'বন্ধন', 'পুনর্মিলন', 'কিসমত' প্রভৃতি। নিজেও অভিনয় করেছিলেন 'আনজান' ও 'হামারি বাত'-এ কিন্তু সে ছবি তেমন চলেনি। হিমাংশু নিজে বড় অভিনেতা না হলেও মস্ত বড় অর্গানাইজার ছিলেন। দূরদৃষ্টির সঙ্গে ছিল স্বপ্ন দেখার, স্বপ্নকে সত্যি করে তোলার আশ্চর্য ক্ষমতা। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে, হিমাংশুর মৃত্যুর তেতাল্লিশ বছর পরেও দেবিকারানি এক সাক্ষাৎকারে বলছিলেন, 'It was he who made me what I am. It was he who trained me, directed me, taught me.'

১৯৪৫ সালে দেবিকা ছায়াছবির জগৎ থেকে চিরকালের মতো সরে যান। তাঁর পক্ষে বোম্বে টকিজের কাজ চালানো বেশ কঠিন ছিল। ইতিমধ্যে তাঁর জীবনে এসে গিয়েছেন রুশ শিল্পী স্বেতস্লাভ রোয়েরিখ। দেবিকাকে তিনি প্রাথমিকভাবে দেখেছিলেন মডেল হিসেবে। সম্পর্কের গভীরতা দেবিকাকে পুনর্বিবাহে উদ্বুদ্ধ করে। অনুভব করেন তাঁর জন্যে একটি ভিন্নতর জগতের

আহ্বান এসেছে। ইচ্ছে ছিল সিসিল বি ডে মিলের মতো বিরাট ও বর্ণাঢ্য করে মহাভারতকে চলচ্চিত্রে রূপ দেবার, হয়তো এ স্বপ্ন ছিল হিমাংশুরও কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না। বাকি জীবনটা তাঁর কাটে শিল্প-সাহিত্য-সংগীত-নাটক প্রভৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে। তাঁকে পদ্মশ্রী উপাধি দেওয়া হয় ১৯৫৮ সালে। দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারেরও প্রথম প্রাপক দেবিকারানি। যদিও চলচ্চিত্র জগৎ থেকে তখন তিনি বহু দূরে সরে গিয়ে বাঙ্গালোরে তাঁদের নিজস্ব পাঁচশো একর জমিতে পরীক্ষামূলক চাষবাস নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন কিংবা মানালিতে ছবির মতো সুন্দর বাড়িটিতে। রানির মতোই জীবন কাটিয়েছেন তিনি। প্রশ্ন করলে বলতেন, 'I have no time to look back.'

শরৎকুমারীর মেয়ে সুপ্রভার ছেলে অসিতকুমার হালদার কলাভবনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অতসীর জন্ম হয় সেখানেই। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁর নাম রাখলেন। জ্ঞান হওয়া অবধি পেয়েছিলেন একটি মনোরম পরিবেশ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব ভাল করে বোঝার আগেই অতসী তাঁর বাবার সঙ্গে চলে গেলেন লখনউ, অসিতকুমার সেখানকার মহারাজা আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল হয়েছিলেন, পরে সেখানেই গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল হন। অতসী ছেলেবেলা থেকেই ছবি আঁকতে ভালবাসতেন। মাকেও হারালেন শৈশবে। নিঃসঙ্গতা দূর করার সঙ্গী হল শুধু রং আর তুলি। ছবি আঁকা হলে বাবাকে দেখাবার জন্যে ছুটে যেতেন। 'বাবা শেখাতেন না কিছু যা দেখাতেন বলতেন ভাল হয়েছে', বলেছেন অতসী, আর তাতেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে আত্মবিশ্বাস। লখনউ-এর মার্টিনি স্কুলে লেখাপড়া শিখলেও শিল্পশিক্ষার কোনও ব্যবস্থাই হল না। কৈশোর পেরোবার আগেই বিয়ে হয়ে গেল অরবিন্দ বড়ুয়ার সঙ্গে, পেলেন রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী:

'পূর্ণতা আসুক অয়ি তোমাদের তরুণ জীবনে
আনন্দে কল্যাণে প্রেমে শুভ লগ্নে শুভ সম্মিলনে ॥'

কলকাতাবাসী বড়ুয়া পরিবার ছিলেন বৌদ্ধ। অতসীরও বড় প্রিয় ছিল বৌদ্ধিক পরিবেশ। অতসীর ছবির বিষয়বস্তুও ধর্মীয় অনুপ্রেরণা আর অজন্তাশৈলী হিসেবে তাঁর নিজের পছন্দ ছিল রেখা। কিন্তু বিরাট স্বামীর সংসার দেখা ও চারটি ছেলেমেয়েকে মানুষ করে তোলার ফাঁকে ফাঁকে কেটে গেল অনেকটা সময়। একেবারে নিশ্চিহ্নভাবে সংসার তাঁকে গ্রাস করতে পারল না। অতসীর ছবি আঁকা ধীরগতিতে এগিয়ে চলল। নিজের মনেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার পালা চুকিয়ে তিনি ছবি পাঠালেন প্রদর্শনীতে। পুরস্কৃত হল সেই ছবি অকাদেমি অফ ফাইন আর্টস থেকে। নিজের সম্বন্ধে কুণ্ঠা ঘুচে গেল অতসীর। তাঁর স্বামী শুধু বিদ্বান ছিলেন না, বাংলার বৌদ্ধদের নেতাও ছিলেন। সমাজসেবার কাজে তিনি সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন। দুটি সন্তানের অসুস্থতাও অতসীকে শিল্পের জগতে নিমজ্জিত হতে দেয়নি। ছবি আঁকার ক্ষেত্রে মেয়েদের যা প্রবল অসুবিধে, অতসীর তা পুরোমাত্রায় ছিল। তবু বুদ্ধের চরণে মনপ্রাণ সমর্পণ করে অতসী মগ্ন হলেন ছবির জগতে। তাঁর বিখ্যাত চিত্রগুলির অধিকাংশই বুদ্ধের জীবন ও অজন্তার গুহাচিত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ১৯৫০-এ তিনি সিংহলে, এখনকার শ্রীলঙ্কায় যাবার সুযোগ পেলেন বিশ্ব বৌদ্ধ সম্মেলনে যোগ দেবার জন্যে। সেখানে তিনি দুর্লভ সুযোগ পেলেন পূর্ব ও পশ্চিমের সমস্ত বিশিষ্ট প্রতিনিধির পেন্সিল স্কেচ করার। শ্রীলঙ্কার অনুপম বৌদ্ধ তীর্থে গিয়ে আঁকলেন আরও অনেক ছবি।

কলকাতার মহাবোধি সোসাইটি থেকে অতসীর আঁকা বত্রিশটি চিত্র নিয়ে প্রকাশিত হল

শিকাগোর পোস্টকার্ড 'দি লাইফ অব বুদ্ধ'। এ সময়ে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল। অতসীর বুদ্ধের জীবনচিত্র আঁকা পোস্টকার্ড চোখে পড়ল জৈন দিগম্বর ট্রাস্টির কয়েকজনের চোখে। তাঁরা মুগ্ধ হলেন অতসীর ছবি দেখে এবং তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে জানালেন, বেলগাছিয়ার পার্শ্বনাথ মন্দিরের মার্বেলের রিলিফে তাঁরা ফুটিয়ে তুলতে চান পার্শ্বনাথের জীবনচিত্র। শিল্পের সুষমা জয় করল ধর্মীয় গোঁড়ামির লক্ষ্মণরেখাকে। অবশ্য বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের পাশাপাশি অবস্থান দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসছে। সুতরাং বুদ্ধের জীবনচিত্র দেখে পার্শ্বনাথের জীবনচিত্র অঙ্কনের আগ্রহ খুবই স্বাভাবিক এবং উদারতার পরিচায়ক। অতসী এর পরে আঁকলেন পার্শ্বনাথের জীবনচিত্র আর তার রূপ, বেলগাছিয়ার মন্দিরের দেয়ালে ফুটিয়ে তুললেন জয়পুরের প্রস্তরশিল্পীরা। অনুপম এই মন্দিরটি আজও কলকাতার অন্যতম পর্যটক আকর্ষণের কেন্দ্র। মন্দিরে মার্বেল রিলিফের কাজ শেষ হতে সময় লেগেছিল প্রায় দেড় বছর।

১৯৫৬ সালে অতসী বিশ্ব বৌদ্ধ সম্মেলনে যোগ দেবার জন্যে নেপালে গেলেন, আরও সমৃদ্ধ হল তাঁর স্কেচের খাতা। ফিরে এসে মন দিলেন ছবি আঁকায়, যা দেখেছেন তা যেন ফুটে উঠল তুলির ডগায়, তেমনই ধরা পড়ল রঙে ও রেখায় তথাগতের বিশেষ রূপ। একশো চোদ্দোটি ছবি নিয়ে একটি প্রদর্শনী হল ১৯৫৮তে। আমন্ত্রণ এল বিভিন্ন দিক থেকে। আকাশবাণী থেকে জানতে চাওয়া হল তাঁর বাবার কথা, শিল্পী পিতার শিল্পী কন্যা তিনি। শৈশবেই তার নিজস্ব ধারাটিকে মেয়েকে চিনে নিতে সাহায্য করেছিলেন তিনি। নির্দেশ দিয়ে খাটো করেননি তার কল্পনা কিংবা চেষ্টাকে। শুধু উৎসাহ দিয়ে গিয়েছেন। শিল্পীকন্যার এগিয়ে যাবার পথে সেটাই ছিল পাথেয় আর বাকিটুকু পেয়েছিলেন তথাগতের জীবনাদর্শ থেকে।

আবার ফিরে আসা যেতে পারে পাঁচ নং বাড়ির মূল কাঠামোয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পুরনো বাড়িগুলির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বাড়ির সদস্যেরা ছড়িয়ে পড়েছেন নানা জায়গায়। গগনেন্দ্র পরিবারে একে একে অনেক নতুন অতিথি এলেন। কনকেন্দ্র ও সুষমার ছয় মেয়ে—অনুভা, গৌরী, বকুলা, করবী, শুক্লা ও সীমা। প্রত্যেকেই গুণী শিল্পী। গানবাজনা-সেলাই-বাটিক প্রভৃতি কাজে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়ে নাম করেছেন। এঁদের মধ্যে অনুভার নাম আর একটি কারণেও উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি গ্রামোফোন রেকর্ডের প্রথম যুগে দু'খানি রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ড করেছিলেন। গান দুটি হল 'দেখো দেখো শুকতারা' ও 'নাই এলে যদি সময় নাই'। এখন রেকর্ডটি দুষ্প্রাপ্য। অত্যন্ত সুগায়িকা হওয়া সত্ত্বেও কলকাতার বাইরে চলে যাওয়ায় গানের চর্চা রাখতে পারেননি। গান শিখেছিলেন দিনেন্দ্রনাথের কাছে। 'বর্ষামঙ্গল'-এ অংশগ্রহণও করেছিলেন। অভিনয়েও অংশ নিয়েছেন কয়েকবার। 'বিসর্জনে' সেজেছিলেন হাসি, একটু বড় হবার পর 'ভৈরবের বলি' নাটকে ইলার সখী। স্বামীর কর্মক্ষেত্র করাচিতে অনুভার অন্য রূপ। সেখানে সমাজসেবার কাজে যোগ দিয়ে একটা চাইল্ড সেন্টার গড়ে তোলেন। বোম্বাইতেও তিনি খুলেছিলেন বাটিক শিল্পশিক্ষার স্কুল এবং নিউ ওয়ার্ক সেন্টার। এই অনুভারই মেয়ে শুভ্রা। নৃত্যের প্রতি মেয়ের আগ্রহ দেখে তাঁকে শিখিয়েছিলেন কথক নৃত্য।

কনকেন্দ্রর বড় ছেলের নাম গীতীন্দ্রনাথ। ঠাকুরবাড়ির নিয়ম অনুযায়ী বড় ছেলের নাম রাখা হত বাবার নামের আদ্যাক্ষরের সঙ্গে মিলিয়ে। গিরীন্দ্রনাথের পুত্র গণেন্দ্র ও গুণেন্দ্র। আবার গুণেন্দ্রর পুত্র গগনেন্দ্র। তাঁর পুত্র গেহেন্দ্র। কিন্তু অপুত্রক অবস্থায় গেহেন্দ্রর মৃত্যু হল বলে মেজো ছেলে কনকেন্দ্রর প্রথম পুত্রের নাম রাখা হয়েছিল গগনেন্দ্রর সঙ্গে মিলিয়ে। গীতীন্দ্রর কনকেন্দ্রর অপর পুত্র করীন্দ্রের নাম রাখা হয়েছিল কনকেন্দ্রকে অনুসরণ করে।

সঙ্গে বিবাহ হল অরুণেন্দ্রনাথের দৌহিত্রী ইরা বরুয়ার। ৬ নং বাড়ির মেয়ে এলেন ৫ নং বাড়ির বউ হয়ে। অবশ্য ইরা জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বড় হননি। তাঁর মা ললিতা বা লতিকার বিয়ে হয়েছিল অসমের জ্ঞানদাভিরাম বরুয়ার সঙ্গে, প্রজ্ঞাসুন্দরী ও লক্ষ্মীনাথের বিয়ের পরে এটি ঠাকুরবাড়ির দ্বিতীয় আন্তঃপ্রাদেশিক বিবাহ। বিভিন্ন সূত্রে শোনা গিয়েছে, রায়বাহাদুর গুণাভিরাম বরুয়ার জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বর্ণলতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিবাহ-সম্বন্ধের কথা। এ নিয়ে স্বর্ণলতার ছোট ভাই এবং ঠাকুরবাড়ির জামাতা জ্ঞানদাভিরামেরও ক্ষোভ ছিল কিন্তু স্পষ্টভাবে কিছুই এতদিন জানা ছিল না। ইরা সেই অস্পষ্টতা অনেকটাই দূর করে দিলেন। সম্পর্কে তিনি কবির নাতনির মেয়ে লতিকা ও জ্ঞানদাভিরামের কন্যা। প্রসঙ্গত মনে রাখা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথ রহস্য করে বলতেন, আমার বিয়ের কোনও গল্প নেই। মেয়ে দেখার বড় মাপের আয়োজন দাদা বউদিদি সবাই মিলে করেছিলেন ঠিকই এবং তা থেকে উঠে আসে একটিমাত্র গল্প, এক মদ্রদেশীয় ধনী পরিবারের মেয়ে দেখার গল্প। এই গল্প কবি শুনিয়েছিলেন মৈত্রেয়ী সেন এবং সীতা দেবীকে। সাত লক্ষ টাকার উত্তরাধিকারিণী হলেও 'মদ্রজা'কে যে ঠাকুরবাড়ির কেউ পছন্দ করেননি, দ্বিজেন্দ্রনাথের বহুপঠিত কবিতাটি তার বড় প্রমাণ:

....'অনিন্দিতা স্বর্ণ-মৃণালিনী হোক
সুবর্ণ তুলির তব পুরস্কার। মদ্রজার কারে
যে পড়ে সে পড়ুক খাইয়া চোক।'

এ কবিতা লেখা হয় যে বছর অগ্রহায়ণ মাসে রবীন্দ্রনাথের বিয়ে হয়েছিল, সেই বছরেরই জ্যৈষ্ঠ মাসে। কৃষ্ণ কৃপালনী রবীন্দ্রজীবনী লেখার সময় মাদ্রাজের মেয়ের পরিবর্তে ওড়িশার মেয়ের উল্লেখ করেছেন। ওড়িশায় ঠাকুরবংশের জমিদারি ছিল, কাজেই সেখানকার আর এক জমিদার সুদর্শন কবিকে জামাতা করতে চাইলে অবাক হবার কিছু নেই। তিনি আরও লিখেছেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ দুই ভাই সেই রাজবাড়িতে মেয়ে দেখতেও গিয়েছিলেন। অপরদিকে আমরা জ্ঞানদাভিরামের আত্মজীবনী 'মোর কথা' থেকে পাচ্ছি একটি খেদোক্তি। যার বাংলা করলে দাঁড়ায়, 'ভগবানের কি ইচ্ছা! কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বড়দিদির বিয়ে হল না, কিন্তু বড়দিদির ছোট ভাই আমার সঙ্গে, রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞ দার্শনিক বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেজো ছেলে অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা লতিকা দেবীর বিয়ে ১৯০৬ সালের ১ জুলাই অনুষ্ঠিত হল। মানুষের মতের কত পরিবর্তন হয়। এই বিয়ে বড়দিদি স্বর্ণলতা দেবীই দিয়েছিলেন। তার পরে সেই ঠাকুরবাড়িতে কত বিধবা বিবাহ হচ্ছে!' উষারঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও অসম' গ্রন্থে জ্ঞানদাভিরামের এই উক্তি অবলম্বন করেই জানিয়েছেন, 'জ্ঞানদাভিরামের রচনা' 'মোর কথা' থেকে জানা যায় তাঁর দিদি স্বর্ণলতা দেবীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিবাহ-সম্বন্ধ হয়েছিল। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ যখন জানলেন এই সুন্দরী ও সুশীলা পাত্রীটি বিধবা তখন আর এগোতে রাজি হলেন না। কবির সঙ্গে জ্ঞানদাভিরামের হৃদয়ের সম্পর্ক গ.ড় উঠেছিল, ফলে কবি তাঁর সঙ্গে এ নিয়ে বহুবার কৌতুক করেছেন, এ কথা জ্ঞানদাভিরা.' নিজেই লিখেছেন। শুধু তাই নয়, 'ছবি তোলার প্রস্তাব হতেই কবি কৌতুকের সুরে ইরাকে বললেন, তোর পিসিকে তো পাইনি, তুই কাছে থাকলে ছবি তোলায় আপত্তি নেই।' লিখেছেন শ্রীভট্টাচার্য।

এবার প্রশ্ন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে স্বর্ণলতার বিবাহ-সম্বন্ধ কবে উঠেছিল? শ্রীভট্টাচার্যের মতে, দেবেন্দ্রনাথের প্রাথমিক অনুমোদন থাকলেও পাত্রী বিধবা বলে দেবেন্দ্রনাথ আপত্তি জানান। কিন্তু লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া তাঁর জীবনস্মৃতিতে জানিয়েছেন, স্বর্ণলতা বিধবা হন ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের ৩১ মার্চ আর তাঁর পুনর্বিবাহ হয় ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারি। লক্ষ্মীনাথ ছিলেন

বিয়ের অন্যতম সাক্ষী। তা ছাড়া এই সময়সীমার মধ্যে কবিপত্নী জীবিত ছিলেন, রবীন্দ্রজীবনে তিনি এসেছিলেন ১৮৮৩ সালের ৯ ডিসেম্বর, বিদায় নিয়েছিলেন ১৯০২ সালের ২৩ নভেম্বর। তাহলে?

ইরা জানিয়েছেন, এর প্রতিটি ঘটনাই সত্যি। তবে স্বর্ণলতার সঙ্গে কবির বিয়ের কথা হয়েছিল ১৮৮৩ সালের কোনও এক সময়ে, তখন স্বর্ণলতার একবারও বিয়ে হয়নি। রায়বাহাদুর গুণাভিরাম বরুয়া ছিলেন উদারহৃদয় ব্যক্তি, 'আসামবন্ধু'র প্রতিষ্ঠাতা- সম্পাদক। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অত্যন্ত স্নেহভাজন ব্যক্তি। সুকিয়া স্ট্রিটে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠানেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। ১৮৬৯ সালে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। স্ত্রী ব্রজসুন্দরীর অকালপ্রয়াণের পরে তিনি দুই সন্তানের জননী বিধবা বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করেন। স্বর্ণলতা এঁদেরই কন্যা। অত্যন্ত রূপসী স্বর্ণলতা বেথুন স্কুলে পড়তেন ও পরবর্তীকালে লেখিকা হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁকেই প্রথম মহিলা সাংবাদিকের মর্যাদা দেওয়া হয়। ষোলো বছর ধরে তিনি অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসে সংবাদ সরবরাহ করেন। ঠাকুরবাড়ির উৎসবে তিনি পিতা গুণাভিরাম বরুয়ার সঙ্গে এসেছিলেন এবং তখনই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বিবাহ-সম্বন্ধ হয়। এই প্রস্তাবে কবির অনুমোদন ছিল, হয়তো সেই সম্ভাবনাতেই দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ খুশি হয়ে কবিতায় লিখেছিলেন 'অনিন্দিতা স্বর্ণ-মৃণালিনী হোক সুবর্ণ তুলির তব পুরস্কার'। কিন্তু অনুসন্ধানের পরে মহর্ষি যখন শুনলেন, স্বর্ণলতা বিধবার সন্তান তখনই সম্বন্ধ ভেঙে যায়। কবির বউদিদিরা দল বেঁধে যশোরে মেয়ে দেখতে যান, কবি সঙ্গে থাকলেও মেয়ে দেখেছিলেন এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বরং প্রশান্তকুমার পালের মন্তব্যই যথার্থ মনে হয়, ...'রবীন্দ্রনাথ স্বেচ্ছায় একটি দশ বছরেরও কম প্রায় অশিক্ষিতা মেয়েকে ভাবী জীবনসঙ্গী মনোনীত করবেন একথা বিশ্বাস করা কঠিন।' এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই মহর্ষির কিছু চাপ ছিল এবং সেজন্যেই তিনি সেপ্টেম্বর মাসে কবিকে মুসৌরিতে ডেকে পাঠান। রবীন্দ্রনাথ মুসৌরিতে যাবার কিছুদিন পরেই তাঁর বিয়ের তোড়জোড় শুরু হয় এবং সেরেস্তার কর্মচারী অভয়চরণ ঘোষকে যশোরে পাঠানোর সংবাদ পাওয়া যায়। দ্বিজেন্দ্রনাথের কবিতা অনুসরণ করেই ভবতারিণীর নতুন নাম রাখা হয় মৃণালিনী।

স্বর্ণলতার সঙ্গে কবির বিবাহ-প্রস্তাবটির কথা কেউ কখনও বলেননি, সম্ভবত কবি নিজেই তা সঙ্গোপনে রেখেছিলেন বলে। পরে শুধু জ্ঞানদাভিরাম ও তাঁর মেয়ে ইরার সঙ্গে এ নিয়ে কবিকে কৌতুকের সুরে কথা বলতে শোনা গিয়েছে। যে সময়ে তিনি ইরাকে তার পিসির কথা তুলে ঠাট্টা করছেন, মনে রাখতে হবে, তখন স্বর্ণলতাও আর ইহলোকে নেই। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৩২ সালে। জ্ঞানদাভিরাম তাঁর দিদিকে খুব ভালবাসতেন, তাই সেই ঠাকুরবাড়ির মেয়ের সঙ্গে যখন তাঁর বিয়ে হল তখন দিদির বিয়ে না হওয়ার কথাটি বেশি করে মনে পড়েছিল। ঠাকুরবাড়ির মত পরিবর্তনও তাঁর চোখে নতুন লেগেছিল। আসলে ঠাকুরবাড়িতে মহর্ষি বিধবা বিবাহের বিপক্ষে ছিলেন। জ্ঞানদাভিরামের সঙ্গে লতিকার বিয়ে হয় মহর্ষির মৃত্যুর পরে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং রথীন্দ্রনাথের বিয়ে দেন বিধবা প্রতিমার সঙ্গে। স্বর্ণলতার আগ্রহেই লতিকা বরুয়া পরিবারে বধূ হয়ে আসেন।

লতিকা দীর্ঘজীবন পাননি। অকালে মাতৃহারা শিশুরা মানুষ হলেন মাসিমা কণিকার কাছে, কলকাতা থেকে দূরে, কাশীতে। মেসোমশাই রক্ষণশীল ব্যক্তি ছিলেন বলে নৃত্যগীতের চর্চা করা হয়নি। কলকাতায় একবার এলেন ১৯৩৩ সালে। কবি শান্তিনিকেতন থেকে এসেছিলেন 'শাপমোচন' নাটকের দল নিয়ে। ইরা ধরলেন অমিতাকে। বিশ্বকবি তখন ঘরের মানুষের কাছে দূরের মানুষ। নাতি-নাতনিদের অনেককেই চেনেন না, চোখেই দেখেননি, চিনবেন কী করে? অমিতা রাজি হলেন। কবির কাছে তো যখন-তখন যাওয়া যায় না কিন্তু যেতে বললেন যখন, নাতবউ অমিতার সেখানে অবাধ গতি। দুটি বিনুনি গুছিয়ে বেঁধে পরিপাটি করে শাড়ি পরে

সঙ্গে বিবাহ হল অরুণেন্দ্রনাথের দৌহিত্রী ইরা বরুয়ার। ৬ নং বাড়ির মেয়ে এলেন ৫ নং বাড়ির বউ হয়ে। অবশ্য ইরা জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বড় হননি। তাঁর মা ললিতা বা লতিকার বিয়ে হয়েছিল অসমের জ্ঞানদাভিরাম বরুয়ার সঙ্গে, প্রজ্ঞাসুন্দরী ও লক্ষ্মীনাথের বিয়ের পরে এটি ঠাকুরবাড়ির দ্বিতীয় আন্তঃপ্রাদেশিক বিবাহ। বিভিন্ন সূত্রে শোনা গিয়েছে, রায়বাহাদুর গুণাভিরাম বরুয়ার জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বর্ণলতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিবাহ-সম্বন্ধের কথা। এ নিয়ে স্বর্ণলতার ছোট ভাই এবং ঠাকুরবাড়ির জামাতা জ্ঞানদাভিরামেরও ক্ষোভ ছিল কিন্তু স্পষ্টভাবে কিছুই এতদিন জানা ছিল না। ইরা সেই অস্পষ্টতা অনেকটাই দূর করে দিলেন। সম্পর্কে তিনি কবির নাতনির মেয়ে লতিকা ও জ্ঞানদাভিরামের কন্যা। প্রসঙ্গত মনে রাখা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথ রহস্য করে বলতেন, আমার বিয়ের কোনও গল্প নেই। মেয়ে দেখার বড় মাপের আয়োজন দাদা বউদিদি সবাই মিলে করেছিলেন ঠিকই এবং তা থেকে উঠে আসে একটিমাত্র গল্প, এক মদ্রদেশীয় ধনী পরিবারের মেয়ে দেখার গল্প। এই গল্প কবি শুনিয়েছিলেন মৈত্রেয়ী সেন এবং সীতা দেবীকে। সাত লক্ষ টাকার উত্তরাধিকারিণী হলেও 'মদ্রজা'কে যে ঠাকুরবাড়ির কেউ পছন্দ করেননি, দ্বিজেন্দ্রনাথের বহুপঠিত কবিতাটি তার বড় প্রমাণ:

....'অনিন্দিতা স্বর্ণ-মৃণালিনী হোক
সুবর্ণ তুলির তব পুরস্কার। মদ্রজার কারে
যে পড়ে সে পড়ুক খাইয়া চোক।'

এ কবিতা লেখা হয় যে বছর অগ্রহায়ণ মাসে রবীন্দ্রনাথের বিয়ে হয়েছিল, সেই বছরেরই জ্যৈষ্ঠ মাসে। কৃষ্ণ কৃপালনী রবীন্দ্রজীবনী লেখার সময় মাদ্রাজের মেয়ের পরিবর্তে ওড়িশার মেয়ের উল্লেখ করেছেন। ওড়িশায় ঠাকুরবংশের জমিদারি ছিল, কাজেই সেখানকার আর এক জমিদার সুদর্শন কবিকে জামাতা করতে চাইলে অবাক হবার কিছু নেই। তিনি আরও লিখেছেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ দুই ভাই সেই রাজবাড়িতে মেয়ে দেখতেও গিয়েছিলেন। অপরদিকে আমরা জ্ঞানদাভিরামের আত্মজীবনী 'মোর কথা' থেকে পাচ্ছি একটি খেদোক্তি। যার বাংলা করলে দাঁড়ায়, 'ভগবানের কি ইচ্ছা! কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বড়দিদির বিয়ে হল না, কিন্তু বড়দিদির ছোট ভাই আমার সঙ্গে, রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞ দার্শনিক বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেজো ছেলে অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা লতিকা দেবীর বিয়ে ১৯০৬ সালের ১ জুলাই অনুষ্ঠিত হল। মানুষের মতের কত পরিবর্তন হয়। এই বিয়ে বড়দিদি স্বর্ণলতা দেবীই দিয়েছিলেন। তার পরে সেই ঠাকুরবাড়িতে কত বিধবা বিবাহ হচ্ছে!' উষারঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও অসম' গ্রন্থে জ্ঞানদাভিরামের এই উক্তি অবলম্বন করেই জানিয়েছেন, 'জ্ঞানদাভিরামের রচনা' 'মোর কথা' থেকে জানা যায় তাঁর দিদি স্বর্ণলতা দেবীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিবাহ-সম্বন্ধ হয়েছিল। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ যখন জানলেন এই সুন্দরী ও সুশীলা পাত্রীটি বিধবা তখন আর এগোতে রাজি হলেন না। কবির সঙ্গে জ্ঞানদাভিরামের হৃদয়ের সম্পর্ক গ.ড় উঠেছিল, ফলে কবি তাঁর সঙ্গে এ নিয়ে বহুবার কৌতুক করেছেন, এ কথা জ্ঞানদাভিরা.' নিজেই লিখেছেন। শুধু তাই নয়, 'ছবি তোলার প্রস্তাব হতেই কবি কৌতুকের সুরে ইরাকে বললেন, তোর পিসিকে তো পাইনি, তুই কাছে থাকলে ছবি তোলায় আপত্তি নেই।' লিখেছেন শ্রীভট্টাচার্য।

এবার প্রশ্ন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে স্বর্ণলতার বিবাহ-সম্বন্ধ কবে উঠেছিল? শ্রীভট্টাচার্যের মতে, দেবেন্দ্রনাথের প্রাথমিক অনুমোদন থাকলেও পাত্রী বিধবা বলে দেবেন্দ্রনাথ আপত্তি জানান। কিন্তু লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া তাঁর জীবনস্মৃতিতে জানিয়েছেন, স্বর্ণলতা বিধবা হন ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের ৩১ মার্চ আর তাঁর পুনর্বিবাহ হয় ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারি। লক্ষ্মীনাথ ছিলেন

বিয়ের অন্যতম সাক্ষী। তা ছাড়া এই সময়সীমার মধ্যে কবিপত্নী জীবিত ছিলেন, রবীন্দ্রজীবনে তিনি এসেছিলেন ১৮৮৩ সালের ৯ ডিসেম্বর, বিদায় নিয়েছিলেন ১৯০২ সালের ২৩ নভেম্বর। তাহলে?

ইরা জানিয়েছেন, এর প্রতিটি ঘটনাই সত্যি। তবে স্বর্ণলতার সঙ্গে কবির বিয়ের কথা হয়েছিল ১৮৮৩ সালের কোনও এক সময়ে, তখন স্বর্ণলতার একবারও বিয়ে হয়নি। রায়বাহাদুর গুণাভিরাম বরুয়া ছিলেন উদারহৃদয় ব্যক্তি, 'আসামবন্ধু'র প্রতিষ্ঠাতা- সম্পাদক। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অত্যন্ত স্নেহভাজন ব্যক্তি। সুকিয়া স্ট্রিটে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠানেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। ১৮৬৯ সালে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। স্ত্রী ব্রজসুন্দরীর অকালপ্রয়াণের পরে তিনি দুই সন্তানের জননী বিধবা বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করেন। স্বর্ণলতা এঁদেরই কন্যা। অত্যন্ত রূপসী স্বর্ণলতা বেথুন স্কুলে পড়তেন ও পরবর্তীকালে লেখিকা হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁকেই প্রথম মহিলা সাংবাদিকের মর্যাদা দেওয়া হয়। ষোলো বছর ধরে তিনি অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসে সংবাদ সরবরাহ করেন। ঠাকুরবাড়ির উৎসবে তিনি পিতা গুণাভিরাম বরুয়ার সঙ্গে এসেছিলেন এবং তখনই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বিবাহ-সম্বন্ধ হয়। এই প্রস্তাবে কবির অনুমোদন ছিল, হয়তো সেই সম্ভাবনাতেই দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ খুশি হয়ে কবিতায় লিখেছিলেন 'অনিন্দিতা স্বর্ণ-মৃণালিনী হোক সুবর্ণ তুলির তব পুরস্কার'। কিন্তু অনুসন্ধানের পরে মহর্ষি যখন শুনলেন, স্বর্ণলতা বিধবার সন্তান তখনই সম্বন্ধ ভেঙে যায়। কবির বউদিদিরা দল বেঁধে যশোরে মেয়ে দেখতে যান, কবি সঙ্গে থাকলেও মেয়ে দেখেছিলেন এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বরং প্রশান্তকুমার পালের মন্তব্যই যথার্থ মনে হয়, ...'রবীন্দ্রনাথ স্বেচ্ছায় একটি দশ বছরেরও কম প্রায় অশিক্ষিতা মেয়েকে ভাবী জীবনসঙ্গী মনোনীত করবেন একথা বিশ্বাস করা কঠিন।' এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই মহর্ষির কিছু চাপ ছিল এবং সেজন্যেই তিনি সেপ্টেম্বর মাসে কবিকে মুসৌরিতে ডেকে পাঠান। রবীন্দ্রনাথ মুসৌরিতে যাবার কিছুদিন পরেই তাঁর বিয়ের তোড়জোড় শুরু হয় এবং সেরেস্তার কর্মচারী অভয়চরণ ঘোষকে যশোরে পাঠানোর সংবাদ পাওয়া যায়। দ্বিজেন্দ্রনাথের কবিতা অনুসরণ করেই ভবতারিণীর নতুন নাম রাখা হয় মৃণালিনী।

স্বর্ণলতার সঙ্গে কবির বিবাহ-প্রস্তাবটির কথা কেউ কখনও বলেননি, সম্ভবত কবি নিজেই তা সঙ্গোপনে রেখেছিলেন বলে। পরে শুধু জ্ঞানদাভিরাম ও তাঁর মেয়ে ইরার সঙ্গে এ নিয়ে কবিকে কৌতুকের সুরে কথা বলতে শোনা গিয়েছে। যে সময়ে তিনি ইরাকে তার পিসির কথা তুলে ঠাট্টা করছেন, মনে রাখতে হবে, তখন স্বর্ণলতাও আর ইহলোকে নেই। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৩২ সালে। জ্ঞানদাভিরাম তাঁর দিদিকে খুব ভালবাসতেন, তাই সেই ঠাকুরবাড়ির মেয়ের সঙ্গে যখন তাঁর বিয়ে হল তখন দিদির বিয়ে না হওয়ার কথাটি বেশি করে মনে পড়েছিল। ঠাকুরবাড়ির মত পরিবর্তনও তাঁর চোখে নতুন লেগেছিল। আসলে ঠাকুরবাড়িতে মহর্ষি বিধবা বিবাহের বিপক্ষে ছিলেন। জ্ঞানদাভিরামের সঙ্গে লতিকার বিয়ে হয় মহর্ষির মৃত্যুর পরে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং রথীন্দ্রনাথের বিয়ে দেন বিধবা প্রতিমার সঙ্গে। স্বর্ণলতার আগ্রহেই লতিকা বরুয়া পরিবারে বধূ হয়ে আসেন।

লতিকা দীর্ঘজীবন পাননি। অকালে মাতৃহারা শিশুরা মানুষ হলেন মাসিমা কণিকার কাছে, কলকাতা থেকে দূরে, কাশীতে। মেসোমশাই রক্ষণশীল ব্যক্তি ছিলেন বলে নৃত্যগীতের চর্চা করা হয়নি। কলকাতায় একবার এলেন ১৯৩৩ সালে। কবি শান্তিনিকেতন থেকে এসেছিলেন 'শাপমোচন' নাটকের দল নিয়ে। ইরা ধরলেন অমিতাকে। বিশ্বকবি তখন ঘরের মানুষের কাছে দূরের মানুষ। নাতি-নাতনিদের অনেককেই চেনেন না, চোখেই দেখেননি, চিনবেন কী করে? অমিতা রাজি হলেন। কবির কাছে তো যখন-তখন যাওয়া যায় না কিন্তু খেতে বসলে যখন, নাতবউ অমিতার সেখানে অবাধ গতি। দু'টি বিনুনি গুছিয়ে বেঁধে পরিপাটি করে শাড়ি পরে

অটোগ্রাফ খাতাখানা নিয়ে তৈরি হলেন ইরা। স্বাক্ষর-সংগ্রহে তাঁর খুব আগ্রহ ছিল। অমিতা পরিচয় করিয়ে দিলেন কবির সঙ্গে। কবি তখন খেতে বসেছেন। বললেন, অটোগ্রাফ খাতাটা রেখে যেতে, পরে লিখে দেবেন। অমিতাকে বললেন, 'আমার 'শাপমোচনে' একটা কিছুতে ওকে ঢুকিয়ে দাও।' ইরার দিকে চেয়ে বললেন, 'চল তোকে অভিনয় করতে হবে।' সুখের সঙ্গে বুক কেঁপে উঠল শঙ্কায়। কিছুই তো জানেন না, অভিনয় করবেন কী করে? পার্ট মুখস্থ হবে কী করে? কবিও কী জানেন না সে কথা, তাই তাঁকে দিলেন দেবসভায় ইন্দ্রের চামরধারিণীর পার্ট, মুখে কথা নেই, অভিনয় করারও কিছু নেই, তবু স্টেজে ওঠা, লোকের সামনে দাঁড়ানো। বিকেলবেলা ফেরত পেলেন অটোগ্রাফ নেবার খাতাখানা। স্বাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গে আস্ত একখানা কবিতা:

'শুন শ্রীমতী ইরা
কী বিশেষণে মিলে তোমার নাম
সকালবেলা অনেক ভাবিলাম
জানি না তুমি অধীরা কি না
অথবা তুমি ধীরা।

শুন শ্রীমতী ইরা
নামের মিল কোন রতন সাথে
ভাবিনু তাই কলম নিয়ে হাতে
নও তো নীলা নও তো চুনি
তুমি কমল হীরা।

স্বাক্ষরের সঙ্গে স্থান ও সাল, জোড়াসাঁকো ১৯৩৩।

একরাশ খুশির স্মৃতি নিয়ে ইরা ফিরে গেলেন কাশীতে। কলেজে গিয়ে পেলেন কিছুটা স্বাধীনতার স্বাদ। সেখানে খুব ভাল অভিনয় করতেন ইরা। ১৯৩৫-এ আবার দেখা হল কবির সঙ্গে। এলাহাবাদে এসেছেন শুনে ইরা দেখা করতে গিয়েছিলেন কবির সঙ্গে থিয়সফিক্যাল সোসাইটির কৃষ্ণাশ্রমে। দু'বছরে ইরার পরিবর্তন দেখে কবি লিখলেন আর একটি কবিতা। আগে ইরার মাথায় ছিল দুটি বেণী, কবি তাঁর নাম দিয়েছিলেন দ্বিবেণী কিন্তু এবার ইরা বেঁধেছেন খোঁপা। তাতে তাঁকে একেবারে অন্যরকম দেখাচ্ছে। কবি লিখলেন:

'প্রয়াগে যেখানে গঙ্গা যমুনা
মিলায়েছে দুই ধারা
সেখানে তোমার দেখেছিনু
কী চেহারা।
দ্বিবেণী তোমার নাম দিয়েছিনু
দুই বেণী সোজাসুজি
নেমেছিল অচল ঝরনা বুঝি।
কিন্তু এ কী দেখি
খোঁপায় তোমার বাঁধিয়া তুলেছ বেণী
চাঁদেরে মাগিয়া জমেছে মেঘের শ্রেণী
এবার তোমার নামের বদল
না করে উপায় নাই
খোঁপা গরবিনী খোবানি ডাকিব তাই।'

এ কবিতাটি ছাপা হয়েছিল 'প্রবাসী'তে। সেটি পড়ে এক ভদ্রমহিলা এসেছিলেন ইরাদের বাড়িতে, ইরার চুল দেখতে।

রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত স্নেহ করতেন ইরাকে। ঠাট্টা করতেন ইরার পিসির কথা বলে। ইরাকে কবি বলতেন, 'তুই আমার কাছে শান্তিনিকেতনে এসে থাক। এখানে গান শিখবি, অভিনয় শিখবি। তোকে একেবারে তৈরি করে দেব।' লোভ হত ইরার। তখন তিনি কলেজে ভর্তি হয়েছেন, বাংলায় পাঠ্যবই হিসেবে পড়তে শুরু করেছেন 'গোরা'। কবি স্বাক্ষর করে দিলেন একটি বইয়ে। মাঝে মাঝে পড়া বুঝতে এলে ভাল করে বুঝিয়ে দিতেন আবার মজা করে বলতেন, 'কলেজে গিয়ে তো খুব চাল মারবি যে রবীন্দ্রনাথের কাছে 'গোরা' পড়ে এসেছি।' আবার কখনও জিজ্ঞেস করতেন, 'কোন ক্যারেক্টারটা তোর ভাল লাগে?' এক একসময় ইরা বলতেন, 'আপনি ব্রাহ্মদেরও নিন্দে করেছেন?' শুনে কবি একটু হাসতেন, কিছু বলতেন না। আবার এক একদিন প্রশ্ন করতেন, 'তুই তোর মার মতো রাঁধতে পারিস?'

দ্বিজেন্দ্র পরিবারের সদস্যদের নিয়ে কবি যে ফোটো তোলেন তাতেও রয়েছেন ইরা। অজীন্দ্রনাথ ছবি তোলার প্রস্তাব করতেই কবি কৌতুক করে ইরাকে বলেছিলেন, তোর পিসিকে তো পাইনি, তবু তুই কাছে থাকলে ছবি তোলায় আপত্তি নেই।' লক্ষণীয়, এই ছবি তোলার সময় জ্ঞানদাভিরামও শান্তিনিকেতনে ছিলেন। ইরা ১৯৪৩ সালে ইংরেজি সাহিত্যে এম এ পাশ করেন। গীতীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় ও পরিণয় এমনই একটা সময়ে। অবনীন্দ্রনাথও খুব ভালবাসতেন ইরাকে। তখন তিনি যাত্রাপালা লিখছেন। বলেছিলেন, 'আমার যাত্রায় তোকে মৌমাছি করব।' ইরার সঙ্গে যোগ ছিল আরও বহু ব্যক্তিত্বের। লখনউ-এ বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ও তাঁর দাদা জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে পরিচয় হয়। সই নিয়েছিলেন জওহরলালের। তারপরে একদিন সুযোগ পেলেন গান্ধীজির কাছে যাবার। তিনি সবাইকে সই দিতেন না, বলতেন খদ্দর পরে আসতে। তা ছাড়া তাঁর সই নিতে হলে পাঁচ টাকা দিতে হত আশ্রমের জন্যে। ইরা খদ্দর পরেই গেলেন। টাকা জমা দিয়ে অটোগ্রাফ খাতাটি রেখে আসতে হল সেখানে, পরে পাবেন। যথাসময়ে পেলেনও আর অবাক হয়ে দেখলেন কেউ তাঁর খাতার পাতা থেকে ছিঁড়ে নিয়েছে জওহরলালের শুভেচ্ছাসহ স্বাক্ষরের পাতাটি। পরে এ কথাটি নেহরুজিকে তিনি লিখে জানালে জওহরলাল আবার তাঁকে একটি সই পাঠান।

সময়ের সঙ্গে সবই বদলায়। স্বামীর সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছেন। সর্বত্রই জড়িয়ে পড়েছেন হাই সোসাইটির সঙ্গে। আলাদাভাবে কিছু করা সম্ভব হয়নি। খুব ভালবাসতেন এককালে অভিনয় করতে, অথচ কলেজের বাইরে এমনকী শান্তিনিকেতনেও পূর্ণভাবে ফুটে ওঠার সুযোগ পায়নি তাঁর প্রতিভা। কিন্তু তাঁর তিন মেয়েই পেয়েছিলেন সেই ধারা। সেজন্যে শৈশবেই মেজো মেয়ে টিঙ্কু ঠাকুর তপন সিংহের আবিষ্কার, কৈশোর পেরোবার আগেই শর্মিলা সত্যজিৎ রায়ের আবিষ্কার হিসেবে সবার পরিচিত। ছোট মেয়ে রোমিলাও হতে পারতেন অপর্ণা সেনের আবিষ্কার, কেননা তাঁর ইচ্ছে ছিল '৩৬, চৌরঙ্গী লেন'-এ জেনিফারের ছাত্রীর ভূমিকায় রোমিলাকে নেবার কিন্তু মডেলিং-এর জগতে পা রাখলেও অভিনয় রোমিলাকে টানেনি।

এখানেই রেখার কথা বলে নেওয়া যেতে পারে। যোগাযোগের অভাবে তাঁর কথা খুব কমই জানা যায়। সমরেন্দ্রনাথের মেয়ে মালবিকার বিয়ে হয়েছিল কাদম্বিনীর বংশলতা অনুসরণ করে জলধিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্র প্রদোষচন্দ্রের। তাঁরই ছোট মেয়ে রেখা তাঁর স্বামী ড. নারায়ণ মেনন সংগীত নাটক অকাদেমির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, যুক্ত ছিলেন আকাশবাণীর সঙ্গে, ডিরেক্টর হিসেবে। রেখাও সংগীত ও নৃত্যজগতে অপরিচিত ছিলেন না। তবে তাঁকে বিশেষভাবে মনে

বলা উচিত, রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর সময় বিদেশ থেকে রবীন্দ্রবিষয়ক তথ্যাদি সংগ্রহের কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন রেখা। কৃষ্ণ কৃপালনী, ক্ষিতীশ রায় প্রমুখ ব্যক্তির সঙ্গে ইউরোপে গিয়েছিলেন রেখা। রবীন্দ্রভবনের অডিও-ভিস্যুয়াল সেকশনে সংগৃহীত হয় দুর্লভ কিছু রেকর্ড ও ফিল্ম। দুইজনের বিকেলবেলায় কবি বাংলায় আবৃত্তি করেছিলেন 'আমি পরানের সাথে খেলিব আজিকে' (ঝুলন)। টেপ রেকর্ডে ধরা ছিল অবিকৃতভাবে। সম্প্রতি তার রেকর্ড সাধন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ সময় অর্থাৎ এই অভিযানে জার্মানি থেকে সংগৃহীত হয় কিছু কিছু ফিল্ম, ইউ-এস ও স্টুডিও থেকে সংগৃহীত এই চলচ্চিত্রের দু-একটা অংশ সত্যজিৎ ব্যবহার করেছিলেন সত্যজিৎ রায়, তথ্যচিত্র নির্মাণের সময়। ইউরোপের বিভিন্ন জায়গা থেকে রবীন্দ্রবিষয়ক বিভিন্ন তথ্য, চিঠি, বক্তৃতা সংগ্রহে রেখা ও তাঁর স্বামী নারায়ণ মেননের সাহায্য রবীন্দ্রভবনের এই বিভাগটিকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছিল।

অবনীন্দ্রনাথের মেজো মেয়ে করুণার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র-কন্যারা অবনীন্দ্র পরিবারেই ছিলেন। তাঁর মেয়ে রেখা মামিমা পারুলকে মা বলে ডাকতেন। নিজের মনে কিছু কিছু লিখতেনও সেগুলি প্রকাশ করার চেষ্টা করেননি কখনও। অবনীন্দ্রনাথ নাতিদের উৎসাহ দিতেন লেখার জন্য। ঠাকুরবাড়িতে সব সময়েই ছোটদের লেখার ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া হত। নিজে নিজে কিছু লিখতে থাকলে যে শুধু কল্পনার প্রসার হয় তা না, সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায় ভাষাশিক্ষা, লেখার অভ্যাস, আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা, চিন্তার স্বচ্ছতা, মনের ভাব গুছিয়ে প্রকাশ করতে জানা এবং প্রতিভা থাকলে সাহিত্যজগতে স্থান করে নেওয়াও সম্ভব। সাহিত্যিক হয়তো সবাই হতে পারে না কিন্তু লেখার অভ্যাস জীবনকে গড়তে বেশ সাহায্য করে, পরীক্ষা বৈতরণী পার করতেও কাজে লাগে। কিন্তু বাড়ির খুদে লেখকরা সবাই এসে দাদামশাইকে ধরতেন গল্পের জন্য। অবনীন্দ্রনাথ পরামর্শ দিলেন, 'কেন, বই দেখিস না? কথাগুলো লিখে দেখ, দেখবি গল্প আপনি এসে যাবে।' রেখারও দু-একটা গল্প লিখতে দেখা গিয়েছে। যেমন, 'একদিন আমি জ্যেঠামামা, বড়দাদা, ছোটদাদা, দুদিদিমণি, কেষ্ট, বাচ্চি, মিনু আর বাবা সবাইকে নিয়ে ফিটিন গাড়িতে করে বেড়াতে যাচ্ছিলুম। কিছু দূর গিয়ে বাবা আর জ্যেঠামামা নেমে গেলেন। আমরা দেখতে দেখতে আমাদের বড় বাগানে হাজির হলুম। দেখলুম সেখানে জ্যেঠামামা ফুল তুলছে। তারপর বড়দাদা নেমে গিয়ে জ্যেঠামামাকে বললে, বাবা কোথায়? জ্যেঠামামা বললে, 'বাবা উপরে।' তারপর আমরা উপরে চলে গেলুম। তারপর ফিটিন গাড়ি চলে গেল।' এই গল্প লেখার সময় রেখার বয়স ছয় বছর।

করুণার বড় ছেলে মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, তাঁর লেখা 'দক্ষিণের বারান্দা' পড়ে আমরা জেনেছি, পাঁচ নং বাড়ির কথা। অবনীন্দ্রনাথের বাগানবাড়ি ক্রমশ পরিণতি লাভ করল, পুরোপুরি হারিয়ে গেল চোখের সামনে থেকে। তার সেই হারিয়ে যাওয়ার আগের সময়টিকে ধরে রেখেছিলেন মোহনলাল, শিল্পসমালোচক হিসেবেও তিনি সুপরিচিত। এঁরই সঙ্গে বিবাহসূত্রে বধূ হয়ে এলেন চেকোস্লোভাকিয়ার মেয়ে মিলাডা। ঠাকুরবাড়ি পেল আর একটি গুণবতী বধূ। মিলাডার সঙ্গে মোহনলালের দেখা হয় ১৯৫৪ সালে। এক শীতার্ত সন্ধ্যায় গান শুনতে এসে পরিচয় হল দুজনের। একমাত্র ভারতীয় ছাত্র সেখানে মোহনলাল, সেজন্যে পরিচয় পর্বে মিলাডা জানালেন, তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুটি বইয়ের চেক অনুবাদ পড়েছেন, 'দি গার্ডেনার' আর 'গীতাঞ্জলি', দুটিই তাঁর প্রিয় বই। ভারতীয় যুবকটি হেসে জানালেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার কথা। পরিচয় গভীর বন্ধুত্বে দাঁড়াল। ১৯৫৫-এ মিলাডা স্থির করলেন, তিনি মোহনলালকে ভালবাসেন, তাঁকেই বিয়ে করবেন। প্রথমদিকে তাঁর পরিচিতরা শুনে আঁতকে উঠলেন, 'তুমি কি পাগল হয়েছ যে এক ভারতীয়কে বিয়ে করতে যাচ্ছ?' ভারতীয় জীবনের সঙ্গে

তুমি খাপ খাওয়াতে পারবে নাকি?' কিন্তু দুটি তরুণ হৃদয় এমন অসার উপদেশ কানে তুলতেন না, তাঁরা গোপনে বিয়ে করলেন।

ইউরোপে তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘনিয়ে আসছে। ১৯৩৮-এ জার্মানি চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণ করতে পারে অনুমান করে মোহনলাল মিলাডাকে লন্ডনে নিয়ে আসতে বললেন। সেখানে তাঁরা স্থির করলেন, যত শীঘ্র লন্ডনে পড়া শেষ করে ভারতে ফিরবেন। মিলাডাকে একসঙ্গে ফেরা হল না। বিয়ের পরে মিলাডা ব্রিটিশ ভারতের নাগরিক হয়েছেন, কাজেই তাঁকে বিশেষ পারমিট নিয়ে বাবা-মার সঙ্গে দেখা করে আসতে হবে। মোহনলাল তাঁকে নিয়ে গেলেন লন্ডনে স্থিত নাৎসিদের অফিসে। অনেক বলানুরোধের পরে মিলাডা অনুমতি পেলেন এক মাসের জন্যে স্বদেশে যাবার। সেই কথাবার্তার এক টুকরো ছবি মিলাডার বর্ণনায় ধরা আছে:

I said, 'My mother is very ill, and if she cannot see me before I go to far-off India, she is going to die. She will not be able to bear it.'

Then the Officer-in-charge told me, 'Are you sure she is going to die if you don't see her?'

I said, 'Yes, I believe she would die if I do not see her before going to India.'

মিলাডা দেশ ছেড়ে ভারতে চলে আসার দু দিন পরেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ১৯৪৭-এর আগে তিনি আর স্বদেশে মা-বাপের কোনও খোঁজ পাননি। বুক ভেঙে দিয়েছিল তাঁর আত্মকাহিনি, 'I never saw my mother after 1939. At the height of the war, my mother tried to get news of India—about me really—on the radio. Someone heard her listening, which was illegal, and reported her. She was arrested by the Nazis and taken to a concentration camp. She never returned.'

ভারতে মিলাডাকে একাই আসতে হয়েছিল, তাঁর নিজের শহর থেকে জিনোয়া, সেখান থেকে মার্সেই, সেখান থেকে সর্বশেষ জাহাজে, সেটি ইউরোপ থেকে ভারতে আসছিল। ব্রিটিশ জাহাজ হলেও তার জানলাগুলি পর্দায় ঢাকা ছিল, আসন্ন যুদ্ধের আতঙ্কে কাঁপছিল সারা ইউরোপ। বোম্বেতে মিলাডার জন্যে একটা উপহার অপেক্ষা করছিল। প্যাকেট খুলে তিনি পেলেন তাঁর স্বামীর উপহার, শাড়ি, পেটিকোট, ব্লাউজ এবং সুন্দর একজোড়া চটিজুতো। জাহাজে পরিচিত এক ভারতীয় মহিলার সাহায্যে ভারতীয় পোশাক পরেই ভারতের মাটিতে পা দিলেন মিলাডা। খুশিতে বিহ্বল হলেন মোহনলাল, শ্বশুর শোভনলাল বউমাকে হাতে তুলে দিলেন গোলাপের স্তবকের বদলে পদ্মকুঁড়ির গুচ্ছ। জোড়াসাঁকোর পাঁচ নং বাড়ি তখন পূর্বগৌরব হারিয়েছে, তবু মেয়েরা এসে তাঁকে শাঁখ বাজিয়ে নববধূর মতো নিয়ে গেল। অবনীন্দ্রনাথ তখন ছবি আঁকছিলেন। তাঁকে দেখে বললেন, 'I am sorry for the parents who have lost you forever.' যুদ্ধের সময় ঠাকুরবাড়ির প্রায় সকলেই গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে। মিলাডা সেখানে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পেলেন, তবে তখন তাঁর শরীর ভাল ছিল না। তিন মাস সেখানে হাতের কাজ শিখলেন মিলাডা। এখানেই তাঁর মনে আদিবাসীদের নিয়ে কাজ করার আগ্রহ জন্মায়, বসন্ত উৎসবের সময় অনেককে সাঁওতালদের দেখতে পান। কিন্তু নিজের প্রকৃত কর্মক্ষেত্রটি তিনি খুঁজে পেলেন আরও অনেক বছর পরে।

মণিপুরের মহারাজকুমারী বিনোদিনী দেবীর সঙ্গে মিলাডার পরিচয় হয়েছিল শান্তিনিকেতনে। সেই সূত্র ধরে তিনি মণিপুর বেড়াতে গিয়েছিলেন ইম্ফলে। তার পাশেই নাগারাজ্য। মিলাডা জানালেন, তিনি সেখানে যাবেন। ইনার লাইন পারমিট নিতে হল, মণিপুরি রাজকন্যার ব্যবস্থায়, 'I entered Nagaland in a mail bus escorted by a convoy of 120 military trucks.'

নাগা পাহাড়ের নীলিমা মুগ্ধ করল মিলাডাকে, সেইসঙ্গে কৌতূহল তাঁর হল নাগাদের জীবনযাপন পদ্ধতি সম্পর্কে। দ্বিতীয় যাত্রায় মিলাডা সৌভাগ্যবশত পরিচিত হলেন এক অঙ্গামি নাগা যুবক নিবিসা চাসির (Nivisa Chasie) সঙ্গে। তিনি কোহিমা হাই স্কুলের শিক্ষক। তাঁর সাহায্যে মিলাডা নাগা সমাজের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সক্ষম হন। ১৯৬৩ থেকে ১৯৮৮ পঁচিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে মিলাডা নাগাদের নিয়ে ভেবেছেন, পর্যবেক্ষণ করেছেন, নাগারাজ্যে প্রবেশের জন্যে আঠেরোবার পারমিট নিয়েছেন, বিভিন্ন নাগা সম্প্রদায়ের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের জীবনযাপন পদ্ধতি জানতে চেয়েছেন। অপর্যাপ্ত ভালবাসা পেয়েছেন তাঁদের কাছ থেকে, দেখেছেন তাঁদের শিল্পবোধ ও প্রতিভার সুচারু সমন্বয়। চেক ভাষায় মিলাডা প্রথমে নাগাদের নিয়ে একটি বই লেখেন। এর পরে ইংরেজি ভাষায়, 'এ পিলগ্রিমেজ টু দি নাগাজ' (১৯৮৪) ও 'নাগা আর্ট' (১৯৯৩)। নৃতত্ত্ব ও ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে নাগা সমাজকে ইতিপূর্বে কখনও দেখা হয়নি। খুব ভাল ফোটো তুলতেন বলে মিলাডার বইদুটি দুর্লভ চিত্রসংগ্রহে পূর্ণ।

কর্মক্ষেত্র হিসেবে মিলাডা বেছে নিয়েছিলেন শিক্ষাক্ষেত্রকে। সাউথ পয়েন্ট স্কুলের সূচনাপর্ব থেকেই তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, বিশেষ করে নার্সারি বিভাগটির সঙ্গে। বাকি সময়টুকু তিনি কাটাতেন লেখাপড়ার কাজ নিয়ে। চেক ভাষায় যেমন লিখেছেন 'ইন দি ল্যান্ড অফ জুয়েল', 'পিকচারস ফ্রম বেঙ্গল', বাংলায় তেমনই রূপকথা সংগ্রহ প্রকাশ করেছেন 'বারো মাসের বারো রাজা'। মোহনলালের সঙ্গে যুগ্মভাবে অনুবাদ করেছেন চেক ছোটগল্প 'নীল চন্দ্রমল্লিকা'।

অবনীন্দ্র পরিবারে এসেছেন আরও কয়েকজন বধূ। অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী অরুন্ধতীর শিক্ষাজীবন শুরু হয়েছিল বাড়িতেই কেননা বাবা প্রফুল্লচন্দ্র চক্রবর্তী বি এন আরের প্রথম ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। বদলির চাকরি, কাজেই বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হত বলে গৃহশিক্ষকদের কাছেই পড়তে হত তাঁকে। পরে পড়তে গিয়েছেন লন্ডনে। বিয়ের পর এলেন শান্তিনিকেতনে। শান্তিনিকেতনে সবাই কোনও না কোনও বিভাগে ছাত্র বা ছাত্রী হয়ে কিছু না কিছু শিখতেন। অরুন্ধতী কলাভবনে কারুশিল্প শিক্ষা নিতে গেলেন, সেলাইয়ের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল বলে। বিশেষ করে ভালবাসতেন উল বুনতে। পরবর্তীকালে ইন্টারন্যাশনাল নিটিং কম্পিটিশনে পুরস্কার পেয়েছেন। অমিতেন্দ্রনাথ লিখেছেন, কলাভবনে পুরনো কারুসংঘ নামে একটি সংস্থা ছিল, সেটিরই পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছিলেন অরুন্ধতী প্রমুখ কয়েকজন। 'একবার মেলায় আমার ভাই একটা কফি স্টল দিয়েছিল। আমার স্ত্রী বললেন, 'আমরা যারা কলাভবন থেকে পাশ করে বেরিয়েছি, তারা একটা হাতের কাজের দোকান দেব কফিস্টলের মধ্যেই।' সেই প্রথম কারুসংঘ হল।'

অমিতেন্দ্রর সঙ্গে অরুন্ধতী আমেরিকায় চলে যান। সেজন্যে শান্তিনিকেতন পরে আর তাঁর কর্মক্ষেত্র হয়ে ওঠেনি। পঁচিশ বছর ছিলেন আমেরিকায়। অ্যাপ্লায়েড ডেভেলাপমেন্টাল সাইকোলজিতে এম এ পড়েন ওকল্যান্ড ইউনিভার্সিটির (রচেস্টা মিশিগান) গ্রন্থাগারে কাজ করতে করতে। তারপর গবেষণা করেন। গবেষণার বিষয়বস্তু অভিনব, 'কনসার্ন উইথ ফিয়ার অফ ডেথ অ্যামঙ থ্রি রেলিজিয়াস এথনিক গ্রুপস' (১৯৭৭)। এই তিন ধর্ম হল হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টধর্ম। মনস্তাত্ত্বিকের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে এর উপযোগিতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। মৃত্যুপথযাত্রীর চিন্তা নিয়ে কিংবা তাঁর অনুভূতিকে নিয়ে সাহায্য করার চেষ্টা এখানে মূল কথা। এই সাহায্য অভিজ্ঞতালব্ধ না হলে তার সততা ও আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ থেকে যায়। কাউন্সেলিং এবং গাইডেন্স দুটিরই সাহায্যে দুরারোগ্য ব্যাধির সঙ্গে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যুদ্ধ করা চলে। একই সাহায্য প্রয়োজন সেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় পরিবারেরও, যাঁদের চোখের

সামনে মৃত্যুর আগে দিন গুনছেন কোনও প্রিয়জন। আমাদের দেশে এখনও এই বিষয় নিয়ে কাজ হয়নি। অরুন্ধতী কুবলার রসের ওয়ার্কশপে নিয়মিত উপস্থিত থেকে লক্ষ করেছেন এ জাতীয় কিছু ঘটনা। নিজের অভিজ্ঞতা মিশিয়ে এ জাতীয় একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কথা অরুন্ধতী একসময়ে ভেবেছিলেন কিন্তু এদেশের মানুষ এখনও নিজেদের দুঃখকে একান্তভাবে নিজের সমস্যা বলেই ভাবে, সামাজিকভাবে এগিয়ে আসে না। সেজন্য এখানে এ জাতীয় কোনও প্রয়াস এখনও চোখে পড়ে না। তবে ব্যক্তিগতভাবে কেউ পরামর্শ চাইলে বা যোগাযোগ করলে তিনি সব সময় সাহায্য করেন।

অরুন্ধতী অনুবাদের কাজেও দক্ষ। অলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর' বইটির ইংরেজি অনুবাদ করেছেন।

সুমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী শ্যামশ্রী ঠাকুরবাড়ির সংজ্ঞা অনুযায়ী ঘরের মেয়ে অর্থাৎ এসেছেন কোনও জ্ঞাতি পরিবার থেকে। বাস্তবিকই তিনি দ্বারকানাথের বোন রাসবিলাসীর দৌহিত্র বংশের মেয়ে। তাঁর বাবা মোহন ঘোষাল বাংলা চলচ্চিত্র জগতে সুপরিচিত ব্যক্তি। শ্যামশ্রী পড়তেন ক্যালকাটা গার্লস-এ। অসম্ভব উৎসাহ ছিল খেলায়। টেবল টেনিস, ব্যাডমিন্টন, বাস্কেটবল সবেতেই দক্ষ, সবেতেই ক্যাপ্টেন। অসংখ্য কাপ আর মেডেল পেয়েছিলেন। ঠাকুরবাড়ির আর কোনও মেয়েকে ইতিপূর্বে খেলার জগতে দেখা যায়নি। এমনও হতে পারে, পারিবারিক গণ্ডি ঠাকুরবাড়ি না হলে শ্যামশ্রী হয়তো সত্যিই খেলার জগতে নিজের একটি জায়গা করে নিতে পারতেন। এখানে খেলেছেন নিজেদের মধ্যেই বেশি। বিয়ের পর খেলার জগৎ থেকে সরে এলেন শ্যামশ্রী। গান শিখতেন অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। খনিত গায়িকা হবার আগ্রহ তাঁর ছিল না। বরং ভাল লাগত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দেখতে। তখনই তাঁর মনে হয়েছিল বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রযোজনার কথা। অনায়াসেই তাঁকে বলা যায় ভারতের প্রথম মহিলা ইমপ্রেসারিও। সাধারণত, এই ভূমিকায় আমরা আজও পুরুষদের দেখতে অভ্যস্ত। শ্যামশ্রী একটুও দমেননি। তাঁদের পরিবারে চিত্র প্রযোজনার ব্যাপারটি তো প্রথম থেকেই ছিল। স্কুল কলেজে নিজেও ছিলেন খেলার দলের ক্যাপ্টেন। পরিচালনাশক্তি, সাহস, শিল্পজগৎ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকলে অনুষ্ঠান প্রযোজনার কাজে এগিয়ে আসা যায়। শ্যামশ্রীর সব গুণই পুরোমাত্রায় রয়েছে। সেজন্যে তাঁর আয়োজিত অনুষ্ঠানগুলিও সফল হয়েছিল। তবে তাতেও থাকত রুচির একটা ব্যাপার। তিনি অনুষ্ঠান করিয়েছিলেন আলি আকবর, যামিনী কৃষ্ণমূর্তি, বিলায়েৎ খাঁ, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখকে দিয়ে। শেষোক্ত সেতারশিল্পীর মেয়ে মিতা পরে শ্যামশ্রীর পুত্রবধূ হয়েছেন।

চিত্র প্রযোজনার দিকেও এসেছিলেন শ্যামশ্রী। সাধারণত, প্রযোজককে চিত্র পরিচালনা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না জানলেও চলে। আর শ্যামশ্রী তো চলচ্চিত্র জগতের কথা জানতেনই, বিখ্যাত রাধা ফিল্মস ছিল মোহন ঘোষালের নিজস্ব সংস্থা, এক সময় বহু বাংলো চলচ্চিত্র এঁরা প্রস্তুত করেছিলেন। কিন্তু শ্যামশ্রী নিজে প্রযোজনার জগতে আসার আগে প্রখ্যাত পোলিশ চিত্র পরিচালক ক্রিস্তফ জানুসির কাছে চলচ্চিত্র নির্মাণ সংক্রান্ত শিক্ষা নিয়েছিলেন। তারপর এলেন পরিচালনার কাজে। প্রখ্যাত ভাস্কর চিন্তামণি করের জীবন অবলম্বনে তৈরি হল তথ্যচিত্র 'গ্র্যাভেন ইমেজ'। মুগ্ধ করল দর্শককে, পেল রাষ্ট্রপতির সেরা পুরস্কার স্বর্ণকমল। আরও দুটি তথ্যচিত্রের প্রযোজনা করলেন শ্যামশ্রী; একটি চিন্তামণি করের ভাস্কর্য নিয়ে 'কাইনেটিক স্পিরুস' এবং বাংলার টেরাকোটা মন্দির নিয়ে 'স্প্লেনডার অফ বেঙ্গল'। তথ্যচিত্রগুলির বিষয়বস্তু নির্বাচন থেকে শ্যামশ্রীর রুচি ও শিল্পবোধ সম্বন্ধে একটা ধারণা গড়ে ওঠে। প্রতিটি ভূমিকায় সফল হয়েও একই বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকেন না দীর্ঘদিন, শুধু শিশুদের স্কুলটা নিয়ে, যা ঠাকুরবাড়ির

সন্ধ্যের টিফিনের অভ্যাস, 'অবন নার্সারি নুক'-এর ছাত্রদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয় শ্যামশ্রীকে। বি টি পাশ করাটাও এভাবে কাজে লেগে গেল। নিজে না শিখে বা না বুঝে কোনও কিছুই করতে চান না শ্যামশ্রী।

ঝিনঝিনীর নাতনিরা সবাই নানা গুণের অধিকারী। কালিদাস ও চন্দ্রিমা তাঁদের ছেলে মেয়ে সকলকেই উচ্চশিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, সেইসঙ্গে কারও কোনওদিকে বিশেষ ঝোঁক লক্ষ করলে তাকে তা শেখবার সুযোগও দিতেন। তার সুফল পাওয়া গিয়েছিল যথাসময়ে। অনুকূল পরিস্থিতি নারীর প্রতিভা বিকাশে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে। চন্দ্রিমার চার মেয়েই শান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে অনেক সময় থাকবার সুযোগও পেয়েছিলেন। বড় মেয়ে মানসী তাঁর মায়ের মতোই ছবি আঁকতে ভালবাসতেন, ইংরেজি সাহিত্যে এম এ পাশ করেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয়েছিল তাঁর। মেজো মেয়ে সুনন্দা খুব ভাল সেতার বাজাতেন। তিনি এম এ পাশ করেন ভূগোলে। মাধবী ও প্রণতির আগ্রহ ছিল নৃত্যের প্রতি। দুজনেই নৃত্যগীতের জগতে চর্চা রাখলে শান্তিনিকেতনে প্রতিমা-প্রবর্তিত নৃত্যশিক্ষার ধারা গৌরী-নন্দিতাদের পরেও অব্যাহত থাকত। মাধবী অবশ্য নৃত্যশিক্ষা দেবার ভার নিয়েছিলেন দক্ষিণীতে। ১৯৫০-এ নিউ এম্পায়ারে যে নৃত্যানুষ্ঠান হয়, তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং 'ভানুসিংহের পদাবলী'তে কৃষ্ণের ভূমিকায় তাঁর অনবদ্য নৃত্যাভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল। তপন সিংহের 'কাবুলিওয়ালা'য় মিনির ভূমিকায় টিঙ্কু ঠাকুরের অভিনয় সকলের মন কেড়েছিল, সেই ছোট্ট মেয়েটিকে নাচতেও দেখা গিয়েছে। মাধবীই তাকে রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে নৃত্যের তালিম দিয়েছিলেন।

চন্দ্রিমার মেয়েরা যেমন নাচ-গান-ছবি আঁকা নিয়ে থাকতে ভালবাসতেন, পুত্রবধূ মঞ্জরীও চেয়েছিলেন চিত্রশিল্পী হতে। দার্জিলিং থেকে এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে। কলাভবনে ভর্তি হয়েছিলেন অঙ্কনশিক্ষার জন্যে। সেখানে শিখলেন ছবি আঁকা। শুধু রঙে-রেখায় দাগ কাটা নয়, দেখতে শেখাও। প্রকৃতি কত সুন্দর করে নিজেকে সাজিয়েছে, আশ্চর্য তার সুষমা আর পরিমিতিবোধ, ছবি কখনও তার অনুকরণ, কখনও তার গভীরে প্রবেশ করে সত্যকে খুঁজে পাওয়া। সুচিত্রাদের পরের ব্যাচে ছিলেন মঞ্জরী, সেই সময় শান্তিনিকেতনেও রয়েছেন বিখ্যাত শিল্পীরা। তাঁদের কাছে শিক্ষাও এক অভিজ্ঞতা। পরে নানা কারণে চিত্রশিল্পী হিসেবে আলাদা করে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার সময় মঞ্জরী পাননি কিন্তু সংসারের কাজের ফাঁকে ফাঁকে অনেককে ছবি আঁকা শিখিয়েছিলেন। বেলতলা গার্লস স্কুলে কিংবা চিত্রাংশুতে কচিকাঁচাদের ছবি আঁকা শেখাতে গিয়ে মনে পড়ে যেত নিজের ছাত্রজীবনের কথা। কাজের মধ্যেই সেই সোনালি দিনগুলোর স্পর্শ পান মঞ্জরী, এখন শেখান রূপমে, নিজেরই বাড়িতে।

ঝিনঝিনীর ছোট মেয়ে অপর্ণার বিয়ে হয়েছিল মজুমদার পরিবারে। তাঁর মেয়ে বেলা, বিয়ের পর যিনি সুধা নামেই পরিচিত হন, ফরাসি সাহিত্যে এম এ পাশ করেন প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে। পড়াতেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে। শিল্প, সাহিত্য, সংগীত প্রতিটি দিকেই তাঁর ভালবাসা ছিল। খুব ভাল সেতার বাজাতেন, শিখেছিলেন বিলায়েত খাঁর কাছে। ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটির সেক্রেটারি হয়েছিলেন। শেষ জীবনে পুনের চিন্ময় আশ্রমের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। নানারকম সেবামূলক কাজের সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে ভালবাসতেন সুধা।

গঙ্গা মজুমদার বাড়িতে এসেছিলেন বউ হয়ে। যদিও এ পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল গঙ্গার। আসলে তিনি পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ির মেয়ে, তাঁর মা আবার ছয় নং বাড়ির

সৌদামিনীর নাতনির নাতনি। শেফালিকা ও প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুরের মেয়ে পদ্মা। সম্পর্কের সূত্র ধরে তাঁর কথা আগেই বলা হয়ে গেল। পদ্মা খুব ভাল গান করতেন। বাড়ির পরিবেশেই ছিল সংগীত। মা খুবই ভাল গাইতেন। পদ্মা এবং তাঁর ভাইবোনেরা সকলেই ছোট থেকে গান শুনেছেন ও শিখেছেন। 'পদ্মা পরে ওস্তাদ ধ্রুপদ-গাইয়ে হয়ে উঠেছিল, আমাদের সংগীতগুরু, আন্দুলের যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাখোয়াজ সঙ্গতের সঙ্গে ওর গান আমি মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। চণ্ডীদালানের মিনা করা থামের মাঝে বসে ওর উদাত্ত গলা যখন গমগম করত তখন আমি ভাবতাম এ গান যেন শেষ না হয়।' লিখেছেন পদ্মার প্রবাসী দাদা সন্দীপ ঠাকুর।

পদ্মার সংগীতশিক্ষা শুরু হয় বচ্চন মিশ্রের কাছে। ধ্রুপদে হাতেখড়ি হল আচার্য যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। তিনি এই পরিবারের ছোটদের সবাইকেই গান শেখাতেন। বাড়ির মেয়েরাও নিয়মিত গান শিখতেন। সময়ের দিক থেকে অনেকটা এগিয়ে থাকলেও বাইরের জগতে তখন তাঁরা আত্মপ্রকাশ করতেন না। পদ্মা অবশ্য সংগীত- শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাইরের জগতে পা রাখতে পেরেছিলেন। শুধু সংগীতজগতে কেন, তিনি কলেজের বহু নাটকে অংশগ্রহণ করতেন। কখনও 'চিরকুমার সভা'য়, কখনও 'বিসর্জনে'। প্রবোধেন্দুনাথের বন্ধু কবি ও সাঁতারু শান্তি পাল সাঁতার শেখাতেন হেদোয়, পদ্মারা চার বোনে প্রতিদিন সকালে বাবার সঙ্গে সেখানে যেতেন সাঁতার শিখতে। যুদ্ধের সময় তাঁরা সকলে যখন ভাগলপুরে গিয়েছিলেন, তখনও তাঁদের গান শেখা বন্ধ হয়নি। সেখানে পদ্মা গান শিখতেন বিভূতিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে। পরে শিখেছেন কৃষ্ণদাস ঘোষ ও দামোদর মিশ্রের কাছে। যোগ দিয়েছেন অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সে, গেয়েছেন বৈতানিকের সঙ্গে।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানে ছিল একটা আলাদা সুর। 'পারানি'তে হত সেই গান, যা পদ্মার খুব ভাল লাগত, তার 'রাজনৈতিক' বা বলা চলে বিশেষ একটি সুরের টান, যা ছিল শুধু সৌম্যেন্দ্রনাথের গানে। সৌম্যেন্দ্র নিজেও শুনতে ভালবাসতেন পদ্মার গান এবং চাইতেন তাঁর গানগুলি পদ্মার কণ্ঠে শুনতে। ধ্রুপদ গানের অসামান্য শিল্পী হলেও স্বতন্ত্রভাবে বেতার বা দূরদর্শনে পদ্মা ধ্রুপদ শোনাননি কিন্তু বৈতানিকের সঙ্গে দুটিতেই মাঝে মাঝে সংগীত পরিবেশন করেছেন। বিয়ের পরেও পদ্মা পেয়েছিলেন আত্মপ্রকাশের সহজ পরিবেশ, যদিও কিছু কিছু বাধা ছিল আত্মীয়দের মনে, কেননা অপর্ণার দিদি প্রতিমার বিধবা বিবাহ হয়েছিল বলে। পদ্মাকে বরণ করে ঘরে তোলেন প্রতিমাই। এই পরিবারের সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল। কলকাতায় এলে এখানেই, অর্থাৎ মজুমদার বাড়িতেই উঠতেন শেষজীবনে। পদ্মা শিবানী ঘোষালের অনুরোধে একবার শান্তিনিকেতনে গিয়ে প্রতিমার সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। সেটি পড়ে জানা যায়, প্রতিমা বিয়ের পরে পাঁচ নং বাড়ি থেকে ছ' নং বাড়িতে গিয়েছিলেন ফুল দিয়ে সাজানো ঘোড়ায় টানা ব্রুহাম গাড়ি চেপে। বধূবরণ করেছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী এবং 'আমার শাশুড়ির হাতের লোহা পরিয়ে দিয়ে বরণ করে ঘরে তুললেন।' এক সময় সধবা নারীর মৃত্যু হলে তাঁর হাতের লোহা বা নোয়াটি সযত্নে রেখে দেওয়া হত তাঁর পরিবারের নবাগতা বধূর জন্যে। ঠাকুরবাড়িতেও যে এই নিয়ম ছিল তা জানা গেল পদ্মার নেওয়া সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। এই সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় ১৯৬৮ সালের ১০ সেপ্টেম্বর। মাসিমার কথা লিখেছেন অমিত মজুমদার নিজেও।

লেখার প্রতি পদ্মার আগ্রহ আছে। তাঁদের পরিবারে সবাই যেমন সংগীত ভালবাসতেন, তেমনই সাহিত্যচর্চাও হত। পদ্মা নিজেও লিখেছেন কবিতা, স্মৃতিকথা, কথিকা। পদ্মার লেখা একটি প্রবন্ধে দেখা যায় তিনি লিখছেন, ...'ভারতীয় সভ্যসমাজে শিল্পকলা ক্ষেত্রে মহিলাদের কোনও সম্মানজনক স্থান ছিল না। যে সব নারী সংগীতজ্ঞা তখনকার দিনে ছিলেন তাঁরা সমাজের বাইরে অসম্মানের মধ্যে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাঁদের বাইজি বলা হত। পুরুষ গায়কদের সমকক্ষ সংগীতজ্ঞ হলেও সেই সম্মানের অধিকারী এঁরা কখনই ছিলেন না। ... আজ

সংগীতের ক্ষেত্রে নারীদের যে সম্মান তার মূলে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির ঠাকুরদের অবদান সর্বজনস্বীকৃত। রবীন্দ্রনাথের নাটক এবং গানে বাড়ির মহিলারা অংশগ্রহণ করতেন সামাজিক প্রথাকে অস্বীকার করে।'

শম্পা নিজের পরিবারের সংগীতের পরিবেশকে ধরে রেখেছেন। তাঁর মেয়ে অশ্রুকীর্তি ভাল গান জানেন, শিখেছেন কৃষ্ণপদ ঘোষের কাছে। ভালবাসেন গান গাইতে। তাঁর নিজস্ব সংগ্রহে রয়েছে ভজন ও রূপদের প্রচুর সম্ভার। মা আটিনির ইংরেজি বিভাগের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন দীর্ঘদিন।

আর একটা ব্যাপারে শম্পার নাম করতেই হবে। কলকাতায় যখন একটিও ভাল কফি-শপ ছিল না, তখন তিনি শুরু করেন তাঁর ক্যাফেটি—নিজেরই বাড়িতে। ১৯৯৭-এ আমেরিকা থেকে ফিরে তাঁর ছেলে যখন সে দেশের সেরা কফি-শপগুলোর কথা বলেন তখনই শম্পা ও অমিত স্থির করেন ভাল কফির স্বাদ প্রতিবেশীদেরও দিতে হবে। কেন তার জন্যে ছুটতে হবে বিদেশে কিংবা পাঁচতারা হোটেলে। স্বাদ আর সাধকে মিলিয়ে দেওয়ার পরীক্ষা করেই না হয় দেখা যাক। রান্নার শখ শম্পা পেয়েছেন পৈতৃক উত্তরাধিকার সূত্রে। অবোধেন্দুনাথের শখ ছিল রান্না করা। শেফালিকা বিশেষ রান্নাঘরে সময় কাটাতে পারেননি স্বাস্থ্যের কারণে। শম্পা নিজে না করলেও তাঁর রেসিপি অনুযায়ী তৈরি করা ব্রাউনি-র আকর্ষণও কফিপ্রেমিকদের কাছে কম নয়। এখন অবশ্য কলকাতায় উঁচুমানের আরও কয়েকটি কফি-শপ হয়েছে কিন্তু স্বাদে গন্ধে অতুলনীয় নানান ধরনের কফির কাপে চুমুক দেবার শখ কারও থাকলে তাকে বারকয়েক রয় স্ট্রিটের ছোট্ট কফি-শপটিতে আসতেই হবে।

এবার একটু সুনয়নীর পরিবারের কথায় আসি। বংশপরম্পরায় এই পরিবারের বধূরা ছবি এঁকে চলেছেন। এমন পরম্পরার ঘটনা চোখে না পড়ে পারে না। সুনয়নীর পরে তাঁর পুত্রবধূ কল্যাণী, তারপরে তাঁর দুই পুত্রবধূ শীলা ও গীতা—সকলেই ছবি এঁকেছেন। অবশ্য শীলার খ্যাতি লেখক হিসেবে অনেক বেশি। রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামলী'র অনুবাদ করেছেন তিনি। প্রকাশিত হয় বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ থেকে, প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে। শীলার শৈশব কেটেছে বিদেশে। বাবা সত্যেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে সুভাষচন্দ্রের সহপাঠী। দর্শনে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছিলেন, দ্বিতীয় হয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র। সত্যেন্দ্রমোহন পরে আই সি এস অফিসার হন। মা গান করতেন, আবার শিকারেও বেরোতেন। শীলা দু' বছর বয়স থেকেই ইংরেজ গভর্নেসের তত্ত্বাবধানে বড় হয়েছেন। সুতরাং ইংরেজি তাঁর কাছে মাতৃভাষার মতোই আপন হয়ে উঠেছিল। ছোটবেলায় বিলেতেই থাকতেন, পড়তেন উডস্টকে পরে এদেশে ফিরে ভর্তি হন গোখলে মেমোরিয়াল স্কুলে। বিদেশেই কার্ল শারার কাছে ছবি আঁকা শিখতে শুরু করেন। অনবরত আঁকতেন। সতেরো বছর বয়সে বউ হয়ে এলেন চাটুজ্জে পরিবারে, সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে। ঠাকুরবাড়িতে নবাগতা বধূকে যেমন আধুনিক আদবকায়দা শেখানো হত স্কুলে পাঠিয়ে, গান শিখিয়ে, কোনও একটা বাদ্যযন্ত্র—পিয়ানো কিংবা সেতার শিখিয়ে। ছবি আঁকতে এবং ইংরেজিতে কথা বলবার জন্যেও নির্দিষ্ট সময় দেওয়া হত। সাহিত্যপাঠ এবং জ্ঞানচর্চাও বাদ পড়ত না। একই সঙ্গে বধূদের নিতে হত গৃহিণীপনার তালিম। নিজে কাজ করা নয়, অন্যদের দিয়ে কাজ করানো, ব্যাপারটা খুব সহজ নয়। নিজে সুষ্ঠুভাবে কাজ না জানলে অন্যের ফাঁকি ধরা যায় না, ত্রুটিও ধরা যায় না। ঠাকুরবাড়ির পাকা গিন্নিদের কাছে ঠাকুর এবং বামুনির জব্দ থাকত। জীবনের এই দিকটায় শীলা তাঁর পূর্ববর্তী সতেরো বছরে কোনওদিন উঁকি মেরে দেখেননি। এসে পড়লেন জমিদারি চালে অভ্যস্ত এক ধনী পরিবারে। অ্যাটর্নি রজনীমোহন প্রচুর উপার্জন করতেন, সুনয়নীর শ্রীধনও ছিল প্রচুর। বেনেপুকুরে তাঁর নতুন সংসার

জোড়াসাঁকো থেকে অনেকটা দূরে হলেও সেখানকার নিয়মকানুনই চলত এ বাড়িতে। তাকেই বলতে গেলে জমিদারি চাল। শীলার সাংসারিক কাজের সূচনা হল এখানে। সুনয়নী প্রতিদিন এসে বসতেন তাঁর নির্দিষ্ট খাটে। ঘরে বসে তাঁর মা সৌদামিনী যেমন করে কাজকর্ম দেখতেন, খোঁজখবর নিতেন, ঠিক সেইভাবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছবিও আঁকতেন। লোকও কম ছিল না, শীলা দেখেছিলেন তাঁর শ্বশুরবাড়িতে নানারকম লোকজনের বাস কিংবা আনাগোনা, যাঁরা প্রত্যেকেই এ বাড়িতে খেতেন, প্রায় একশোজন মানুষের রান্না হত। কাজেই সব দিকে নজর রাখতে হলে দক্ষ গৃহিণীর ভূমিকা কিছু কম ছিল না। শীলাকে প্রতিদিন সকালে নিয়মমাফিক সুনয়নীর সঙ্গে থাকতে হত, তাঁর কাজ ছিল ভাঁড়ার দেখা। সে কাজে পূর্ব অভিজ্ঞতা যেমন ছিল না, তেমনি আগ্রহও ছিল না। বরং সেই সময়ে তিনি বসে বসে সুনয়নীর কাছে ছবি আঁকা শিখতেন, গল্প করতেন। প্রচুর গয়না ছিল সুনয়নীর, দ্বারকানাথের আমলের বালা, 'নিরেট সোনার তোলের মতো' বালা দুটি শেষ সময় পর্যন্ত শীলার হাতে ছিল, সাত লহর মুক্তোর মালা, বড় বড় মুক্তো, নাতবউয়েরা মিলেজুলে ভাগ পেয়েছিলেন তার। আর ছিল একুশ লহর হার, গলা থেকে পা পর্যন্ত থাকে থাকে নেমেছিল এক একটি লহর, সেটি সুনয়নী দিয়েছিলেন শ্রীমোহনের স্ত্রী আরতিকে। সোনাদানার কিছু গহনাও সৌদামিনী তাঁর জেঠি মেয়েকে দিয়েছিলেন। এরই ফাঁকে ফাঁকে চলত আর একটা কাজ, লেখা।

শীলা গল্প লিখতেন ইংরেজিতে। বাংলায় তাঁর কোনও লেখা নেই। একই সঙ্গে তিনি প্রচুর অনুবাদ করেছিলেন। শুরু রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামলী'র কবিতা দিয়ে। এ কাজে তাঁকে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ দিতেন তাঁর বাবা। শীলার খুব ভাল লেগেছিল 'শ্যামলী'র কবিতাগুলো। অনুবাদ শুরু করেছিলেন নিজে থেকেই। মনের ভিতর থেকে সাড়া না পেলে তিনি কোনও কাজ করতে পারতেন না। করেনওনি কোনওদিন। 'শ্যামলী'র সর্বশ্রেষ্ঠ অনুবাদ হিসেবে 'তিন বিঘাটি' বিদেশে প্রচুর সম্মান পেয়েছে। এখনও বইটি পাওয়া যায়, তবে 'শ্যামলী' নামেই, প্রকাশক বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৯৫৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। কবিতার আক্ষরিক অনুবাদ কঠিন, কিন্তু শীলা সহজেই লিখেছেন, 'শেষ পহরে' থেকে দেখা যাক একটু:

'ভালোবাসার বদলে দয়া
যৎসামান্য সেই দান,
সেটা হেলাফেলারই ছাপ-তোলানো।
পথের পথিকও পারে তা বিলিয়ে দিতে
পথের ভিখারিকে,
শেষে ভুলে যায় বাঁক পেরোতেই।
তার বেশি আশা করিনি সেদিন।'...

'Pity, in place of love,
That pettiest of gifts,
Is but a sugar-coating over neglect.
Any passerby can make a gift of it
To a street beggar,
Only to forget the moment the first corner is turned.
I had not hoped for anything more that day.'...

কবিতার নাম 'At the Last watch'

আর 'শ্যামলী'র শেষ স্তবকটি:

'যাব আমি।
তোমার ব্যথাবিহীন বিদায়-দিনে
আমার ভাঙা ভিটের 'পরে গাইবে দোয়েল লেজ দুলিয়ে।
এক সাহানাই বাজে তোমার বাঁশিতে, ওগো শ্যামলী,
যেদিন আসি আবার যেদিন যাই চলে।'

'I will go.
The day you part from me with no pain
The Doyel will sing swinging its tail on my forsaken homestead.
There is but one tune of Sahana that plays on your flute,
Oh green beauty,
On the day I come and the day I go away.'

একই সঙ্গে চলল শিক্ষা এবং লেখা। শীলা ইংরেজিতে এম এ পাশ করেছিলেন। পঞ্চাশের দশকে নিয়মিত গল্প লিখতেন অমৃতবাজার পত্রিকায়। প্রতি রবিবার বা দু-এক সপ্তাহ বাদ দিয়ে নিয়মিত তাঁর গল্প প্রকাশিত হত। পুজো, বার্ষিক ও রবীন্দ্র সংখ্যায় ছাপা হত রবীন্দ্রনাথের গল্পের অনুবাদ। সর্বপ্রথম ছাপা হয় 'গুপ্তধনে'র অনুবাদ 'দি বেরিড ট্রেজার' ১৯৫২ সালে, তারপর প্রায় প্রতি বছর। যেমন, 'দালিয়া' (১৯৫৪), 'মাল্যদান' বা 'দি গ্যারল্যান্ডিং' (১৯৫৫), 'প্রতিহিংসা' বা 'রিভেঞ্জ' (১৯৫৬), 'শাস্তি' বা 'পানিশমেন্ট' (১৯৫৮), 'তপস্বিনী' বা 'দি গার্ল অ্যাসেটিক' (১৯৫৯), 'দেনাপাওনা'-র অনুবাদ 'ডেট অ্যান্ড ডিউজ' (১৯৬০), ১৯৬১তে দুটি গল্প 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি' ('তারাপ্রসন্ন'স মাস্টারপিস') এবং 'দান প্রতিদান' বা 'গিফ্‌ট অ্যান্ড রিটার্ন', ১৯৬২ সালে 'সম্পাদক' 'দি এডিটর' নামে অনুবাদ করেন। ১৯৬৩তে পাচ্ছি 'চিত্রকর' ('দি আর্টিস্ট') এবং 'ফেল' ('ফেলিওর')। এর পরে শীলা আর কোনও গল্পের অনুবাদ প্রকাশ করেননি। একই সময়ে তিনি অনুবাদ করেছিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প এবং আরও কোনও কোনও আধুনিক সাহিত্যিকের গল্প। 'ইলাসট্রেটেড উইক্‌লি'তেও লেখা শুরু করেন '৬০-এর দশকে। কিন্তু সত্যেন্দ্রমোহনের মৃত্যু হয় ১৯৬১ সালের ২৪ ডিসেম্বর। বাবার মৃত্যুতে শীলা অত্যন্ত মানসিক আঘাত পেয়ে লেখার জগৎ থেকে সরে আসেন।

জোর করে লেখার চেষ্টা না করে তিনি মন দিয়েছিলেন ছবি আঁকায়। প্রত্নতত্ত্ব তাঁকে টানত। সেই টানেই ঘুরে বেড়িয়েছেন দেশ-বিদেশে, ছবির মধ্যে কিছু কিছু ধরা পড়েছে চোখে দেখা ও মনের দেখা মিলেমিশে। 'মাসিক বসুমতী'তে তাঁর আঁকা ছবি প্রকাশিত হত। কিন্তু যেমন লেখাগুলি তেমনি ছবিগুলিও সাময়িকপত্রের পাতা থেকে বই বা অ্যালবামে পরিণত হয়নি। লেখার কপিগুলো অবশ্য সযত্নে রেখে দিয়েছিলেন শীলা, টাইপ করা কপি। প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, 'বাবা সব টাইপ করিয়ে গুছিয়ে দিয়েছিলেন, তেমনই আছে। বই করার কথা ভাবিনি কোনওদিন, ভাবলে হয়তো হত।' ঠাকুরবাড়ি এবং তাঁদের আত্মীয় পরিবারগুলির মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য—শিক্ষা, রুচিবোধ, ব্যক্তিত্ব, প্রথমেই চোখে পড়ে, যা তাঁদের বিশেষ করে চিনিয়ে দেয়, তার সবকটি গুণের অধিকারী হয়েও শীলা যেন সকলের মধ্যে একা, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের দ্যুতি তাঁর সর্বাঙ্গে।

•

গীতা উত্তরপাড়ার মেয়ে। বিয়ে হয়ে সুনয়নীর পরিবারে আসেন মাত্র তেরো বছর বয়সে। অসাধারণ প্রাণপ্রাচুর্যে পূর্ণ রূপসী গীতার নতুন করে শিক্ষা শুরু হয় লোরেটো স্কুলে। বাড়িতে ছবি আঁকা শেখাতেন কালীপদ ঘোষাল। গীতাও জলরঙে ছবি আঁকতেন। শাশুড়ি যে নাটক লিখতেন তাতে অভিনয় করেছেন উৎসাহের সঙ্গে। শুধু অভিনয় নয়, লিখতেও ভালবাসেন গীতা। কবিতা, ছড়া, সেইসঙ্গে স্মৃতিকথা। কোনওটাই বড় নয় কিন্তু খন্ড খন্ড হলেও সেখানে খুঁজে পাওয়া যায় কোনও ব্যক্তিকে কিংবা একটি বিশেষ সময়কে। যে গীতা ছড়ায় লেখেন,

...'তুমি আমার ছুটির দিনের
গল্প বলা পিসি,
ঘুমের সময় হও যে তুমি
ঘুম পাড়ানি মাসি।
তুমি আমার অচিন দেশের
পক্ষীরাজের ঘোড়া
তোমা বিনা হয় না আমার
পরির দেশে ওড়া।'

সেই গীতাই স্মৃতিকথা লেখবার সময় পাঠককে নিয়ে যেতে পারেন পরির দেশে। বিশেষ করে যখন তিনি তাঁর শৈশবের কিংবা তারও আগের কথা, মায়ের মুখে শোনা গল্প শোনান। উত্তরপাড়ায় গীতার ঠাকুরদাদা ছিলেন সেকেলে ধরনের গোঁড়া ব্যক্তি। স্ত্রীস্বাধীনতার বিপক্ষে। ভাবতেন, '...বেশি নাটক নভেল ও শরৎবাবু ও বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ করে আনন্দমঠ জাতীয় সাহিত্য পড়লে মেয়ে বউরা খুব স্বাধীনচেতা হয়ে যাবে।' কিন্তু যুগের হাওয়া সব ঘরেরই দরজা খুলে দেয়। গীতার মা পড়েছিলেন ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে। শাশুড়ির সঙ্গে দারুণ ভাব ছিল বলে সাহিত্যচর্চা কিংবা সংগীতচর্চা কোনওটাই বাধা পায়নি। 'মা যত ভাল ভাল বই আর রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা', মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' ইত্যাদি এনে ঘরের দেয়াল আলমারিতে রাখতেন। আর দুপুরে ভাত খাবার পর থেকে যতক্ষণ না বিকেল চারটে বাজত ততক্ষণ আমার মা, নীচের জ্যাঠাইমা, পাড়ার কমলা পিসিমা, আমার ঠাকুমা সবাই মিলে এইসব সাহিত্যচর্চায় লেগে থাকতেন। যেই দাদু ভেতরবাড়িতে বিকেলে পা রাখতেন, মা ও জ্যাঠাইমারা তাড়াতাড়ি দেয়াল আলমারিতে বই তুলে রেখে, আলমারির সামনের ছোট ছোট পরদাগুলি টেনে দিয়ে হাতে সব সেলাই, বোনা ইত্যাদি নিয়ে বসতেন।'

গীতার আর একটি লেখা থেকে জানা যাবে আরও অনেক খবর। উত্তরপাড়ার এই সাহসী নারীরা আরও নানাভাবে স্বাধীনতা উপভোগ করতেন। কোনও এক সময় মেয়েরা ঘেরাটোপের আড়ালে বন্দিজীবন হয়তো কাটাতেন কিন্তু সময়ের সঙ্গে যদি সেই কড়াকড়ি শিথিল না হয় তাহলে অন্য উপায় অবলম্বন করতেই হয়। যে সময়ের কথা বলছি তখন শিবরাত্রির সময় সারারাত কলকাতায় থিয়েটার হত, কেননা শিবভক্তদের রাত জাগতে হয়। অনেকে শিবরাত্রির দিন কালীঘাটের নকুলেশ্বরতলায় প্রদীপ জ্বেলে তবে জল খেতেন। সেবার গীতার মা, ঠাকুমা, জ্যাঠাইমারা ধরলেন, তাঁরাও নকুলেশ্বরতলায় প্রদীপ দিতে যাবেন। বাড়ির কর্তাকে জানানো হল, অনেকেই যেতে চান কালীঘাটে। কর্তা হুকুম দিলেন, 'দ্যাখ দুলে কালকে মেয়েরা সবাই কালীঘাটে যাবে। যাবার সময় তুই সঙ্গে যাবি, ঠিকমতো সকাল সকাল যেন আবার আনা হয়।' এরপর ভিতর থেকে ডাক পড়ল কাকা দুলদুলের। মেয়েরাই ঠিক করলেন, 'দুপুরবেলায় দেড়টা দুটোর মধ্যে বেরোতে হবে। সোজা রংমহল থিয়েটারে 'সতী' নাটক দেখে সন্ধ্যা ছ'টার মধ্যে

নকুলেশ্বরতলায় প্রদীপ জ্বালিয়ে গাড়িতে বসে বসেই একটু মিষ্টি, নোনতা আর চা খেয়ে আবার রাত ন'টার শোতে অহীন্দ্র চৌধুরীর 'শাজাহান' পালা দেখে রাত বারোটায় উত্তরপাড়ায় রওনা দিলেই চলবে।' ঠাকুমা শুধু বললেন, 'অত রাত্রে ফিরে কত্তাকে কী বলা হবে?' মা বললেন, 'কেন? বলা হবে হাওড়ার ব্রিজ অনেকক্ষণ ধরে খোলা ছিল তাই দেরি হল।' এরকম নিশ্ছিদ্র পরিকল্পনা থাকায় গীতার ঠাকুরদাদা কোনওবারই মেয়েদের থিয়েটার দেখার খবর পেতেন না। আর একবার খিদিরপুরে এক বিয়েবাড়িতে রাত্রের নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়ে 'সন্ধ্যার মধ্যে অল্প একটু মাছভাজা ও দই মিষ্টি খেয়ে সন্ধ্যা ছ'টার শোয়ে সোজা স্টার থিয়েটারে গিয়ে উঠলেন শিশির ভাদুড়ির 'আলমগীর' দেখবেন বলে। সবাইকার গায়ে হিরেমুক্তোর গয়না, বেনারসি শাড়ি, তার ওপরে অবশ্য গায়ে চাদর ঢাকা ছিল তাই রক্ষে, না হলে এমনিতেই সবাই অবাক হয়ে এই সাজপোশাকে থিয়েটার দেখতে আসা দলটিকে লক্ষ করছিলেন। দলে শিশু গীতা ও তাঁর দাসী রাধাও ছিলেন। তিন বছরের মেয়ের জন্যে সঙ্গে ছিল বিছানা বালিশ, দুধের বোতল, হাতপাখা সব কিছু। 'দুলদুলকাকা বলে কয়ে কোনওরকমে একটা খালি জায়গায় আমার শোবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। শুধু একটা শর্তে যে, থিয়েটারের মধ্যে বাচ্চা যেন না কাঁদে।' রাত্রে তাঁরা ফিরে দেখেন, 'দাদু বাইরের ঘরে পায়চারি করছেন। তাঁর সামনে দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে কাকাবাবু তো ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাস্ট-এর আদ্যশ্রাদ্ধ করল—কেমনভাবে যে কাগজে পোল খোলার কথা ছাপায় তার কোনও মাথা মুন্ডু নেই। কতক্ষণ ধরে যে দাঁড়াতে হল—একটার পর একটা তিনখানা জাহাজ গেল, তবে ব্রিজ জোড়া হল—এই একটু আগে। দাদু শুধু বললেন, 'যাই হোক, সোনামণিটার কোনও অসুবিধে হয়নি তো?' সোনামণি হলেন তাঁর আদরের নাতনি গীতা। এরকম আরও অনেক গল্পই আছে গীতার স্মৃতিতে, লিখলে পাওয়া যাবে আর একটি সুখপাঠ্য স্মৃতিকথা। প্রতিদিনের শত তুচ্ছের আড়ালে হারিয়ে যেতে যেতে রক্ষা পেতে পারে সাধারণ নারীজীবনের কিছু টুকরো ছবি। শাশুড়ি-বউয়ের সৌহার্দ ও সমবেত চেষ্টার গল্প।

গীতার বিয়ে হয়েছিল যে পরিবারে, সেখানে ছিলেন একাধিক বিখ্যাত নারী। সুনয়নীকে তিনি পেয়েছিলেন ঘরোয়া পরিবেশে। তাঁর স্মৃতিকথা পড়লে সুনয়নীকেও পাওয়া যায়। তখন সুনয়নী অশীতিপর বৃদ্ধা, হাঁটতেও পারেন না ভাল করে, ক্ষীণ দুর্বল দৃষ্টি। এক সময় তিনি প্রতিদিন বিকেলে গড়ের মাঠ ও গঙ্গার ধারে বেড়াতে যেতেন নাতিনাতনিদের নিয়ে। সে কথা মনে রেখেই একদিন লোকমোহন বললেন, 'চল না দিদিমা একটু বেড়িয়ে আসি। নিচু গাড়ি আছে, তোমার উঠতে কষ্ট হবে না।'

'বললেন, 'নাঃ এই তো বেশ আছি, আবার কোথায় যাব।' অথচ মনে যেন যাবার ইচ্ছেও রয়েছে। আমিও বললুম, 'চলুন না ঠাকুমা, একটু বেড়িয়ে এলে ভালই লাগবে আপনার।' তিনি বললেন,, 'আবার কেন আমায় নিয়ে তোদের ঝঞ্ঝাট বাড়ানো।' ...এটি তাঁর স্বভাবের বৈশিষ্ট্য, নিজের জন্যে কাউকে কিছু ফরমাশ করবেন না, বা তাঁর জন্যে কেউ স্বতন্ত্রভাবে কিছু একটা করে, সেটা বাঞ্ছিত নয়। আমরা তবু তাঁকে কোনওরকমে বুঝিয়ে নিয়ে গেলাম।

'গাড়িতে বসে খুশি হয়ে বললেন, 'বহুদিন পরে আবার গাড়ি চড়লুম।' উনি বললেন, 'কোথায় যাবে বল।' ঠাকুমা বললেন, 'তবে একটু গঙ্গার ধারে চল।' ...গাড়ি সার্কুলার রোডে গিয়ে পড়তেই উনি রাস্তাটা ঠিক চিনতে পারলেন, 'এটা যেন কী রাস্তা? বহুদিন আগে তোর দাদামশায়ের সঙ্গে বেড়াতে আসতুম বেনেপুকুরের বাড়ি থেকে। তখন এই রাস্তাটা পড়ত। সে আজ কতদিনের কথা..

'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পাশ দিয়ে যেতে যেতে লক্ষ করলাম তাঁর চোখদুটিতে বিগত দিনের কত ছবি যেন ভেসে উঠল। এধার থেকে ওধার পর্যন্ত যতদূর দেখা যায় ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে বললেন, এই ভিক্টোরিয়াতে প্রত্যেক পূর্ণিমা রাত্তিরে আমরা বেড়াতে আসতুম।

সেই গাছগুলো এখনও আছে দেখছি।' মহারানির স্মৃতিস্তম্ভের আশেপাশে আরও কত লোকের স্মৃতিই না জড়িয়ে আছে এখনও।...

'আমাদের গাড়ি টানা গঙ্গার ধার হয়ে ইডেন গার্ডেন-এর সামনে মোড় নিল। ঠাকুমা বললেন, 'এই ইডেন গার্ডেনে তখন রোজ ব্যান্ড বাজত, আর বারোমাসই ফুল ফুটে আলো হয়ে থাকত।' একটু হেসে বললেন, 'এখন একেবারে ন্যাড়া হয়ে গেছে।' তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল এবার কোন রাস্তায় বাড়ি ফেরা হবে? তিনি বললেন, 'চল, আর একবার না হয় গঙ্গার ধার দিয়েই ফিরে যাই।'

স্মৃতির ঝুলি ঝেড়ে গীতা হয়তো একদিন সত্যিই উপহার দেবেন সত্যিকার পরিদের গল্প।

সুনয়নীর পরিবারের আরও দু-একজনের কথা বলা যেতে পারে। মণিমালার পরিবারেও এসেছিলেন দুটি নতুন পরিবারের মেয়ে। কমলা সাহিত্যিক লীলা মজুমদারের মেয়ে। মায়ের সঙ্গে যুগ্মভাবে একটি রান্নার বই প্রকাশ করেছিলেন। অপরজন হলেন মৈত্রেয়ী, সম্পর্কসূত্রে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের নাতনি। নারী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, প্রকৃতপক্ষে মানবাধিকার কর্মী হিসেবে সুপরিচিত। ফ্রিল্যান্স জার্নালিস্ট হিসেবেও। নারীর বিভিন্ন সমস্যার কথা তিনি যেমন ভেবেছেন, তেমনই চেষ্টা করেছেন নারীজীবনের নিষ্ঠুর অপচয়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার জনমত গড়ে তুলতে। নারী নির্যাতন প্রতিরোধ মঞ্চের জন্মলগ্ন থেকেই মৈত্রেয়ী তার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। নারীবাদ নিয়ে তাঁর সঠিক চিন্তা কী, সে কথা স্পষ্ট করে এক জায়গায় লিখেছেন, 'আভিধানিক অর্থে নারীবাদ হল সেই মতাদর্শ যা সব নারীর জন্য সমানাধিকারের দাবি করে। যারা এই দাবির শরিক তাঁদেরই নারীবাদী বলা হয়। অবশ্য নারীবাদের এই অর্থ খুবই সংকীর্ণ। শুধু সমানাধিকারের দাবি বললে এই মতাদর্শ সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় না। এটি একটি বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলন যার সৃষ্টি কোনও একটি সীমাবদ্ধ অবস্থা থেকে নয়। ইতিহাসের এক দ্বিধাবিভক্ত সময়েই এই আন্দোলনের জন্ম হয়। যার মুখ্য উদ্দেশ্য শুধুই মেয়েদের জন্যে কিছু সুযোগ সুবিধে আদায় করা নয়, যার আসল লক্ষ্য হল, সাম্যের ভিত্তিতে সমাজ বদল। ৮ মার্চের (১৮৫৭) সে আন্দোলনে নারী শ্রমিকদের দাবি ছিল আরও বেশি মজুরি, কাজের জন্যে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং কাজের সময় ১৬ ঘণ্টা থেকে ১০ ঘণ্টায় নিয়ে আসা, সেই আন্দোলনকে পাথেয় করেই ষাটের দশকে আন্দোলন আরম্ভ হয়, যার কয়েকটি মুখ্য দাবি ছিল জন্ম নিয়ন্ত্রণ এবং গর্ভপাতের অধিকার, চাকরির সুযোগ বৃদ্ধি, সমান কাজে সমান মজুরি এবং অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নারীর ভোগ্যপণ্য ও যৌনতার প্রতীক হওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং সবরকম বৈষম্যের অবসান।'

মৈত্রেয়ীর ভাবনার সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির দীর্ঘদিনের ধারণার হয়তো মিল নেই, এক সময়ে নারীমুক্তির চেষ্টায় তাঁরা যতই ব্যস্ত হয়ে উঠুন এবং বাড়ির মহিলারা তাঁদের সাহায্য করুন না কেন, তাঁদের চিন্তার সঙ্গে মৈত্রেয়ীর দৃষ্টিভঙ্গির প্রবল পার্থক্য রয়েছে। আবার বলা চলে, চিন্তার দিক থেকে মৈত্রেয়ীকে এগিয়ে যাবার পথেও সাহায্য করেছেন তাঁরাই। দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকলেও মণিমালা পুত্রবধূ হিসেবে পছন্দ করতেন মৈত্রেয়ীকে। বলতেন, তাঁর ছেলে কিশোরও তো অন্যরকম, সে শিল্পী। তার স্ত্রী যদি প্রচলিত ছাঁচে নিজের জীবনকে ঢালতে না চায়, তাতে কী হয়েছে? হয়তো নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই এক টুকরো ছবি উপহার দিয়েছেন মৈত্রেয়ী, 'ঘরের এক কোণে টেবিলে ফুলদানিতে সুন্দর করে ফুলগুলি সাজানো ছিল। ফুলদানির গড়ন ও রঙের সঙ্গে মিলিয়ে ফুলগুলি রাখা হয়েছিল। গৃহকর্ত্রীর বন্ধু ও তার স্ত্রী মুগ্ধ ও উচ্ছ্বসিত। আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল তাদের জন্যে। খাবার টেবিলে সাজানো ছিল তাদের দুজনেরই প্রিয় নানা ধরনের নিরামিষ পদ। খুবই পরিতৃপ্তির সঙ্গে তারা খাওয়া-দাওয়া সারল। যাবার

আগে বলল, 'তোমার এত গুণ। তুমি কী পরিপাটি বাঁধতে পার। কিছুতেই বুঝি না কী করে তুমি ফেমিনিস্ট হলে।' মৈত্রেয়ী এর পরে লক্ষ করলেন ফেমিনিস্ট সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা এঁরা 'কুচ্ছিত, মোটেও সুগৃহিণী নয়, দেহে কিংবা মনে নেই কোনও নারীসুলভ কমনীয়তা।' মৈত্রেয়ী দেখেছেন, 'সমাজে উচ্চবিত্ত ও উচ্চবর্ণের নারীর সমস্যা ও মূল্যবোধ তার নিপীড়িত ও নিম্নবর্গের ভগিনীর মতো নয়।' এই সমস্যা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা চেষ্টা করছেন নারীমনে চেতনা সঞ্চার করতে। একটি মেয়ে যখন অপর একটি মেয়ের সমস্যা, সে সত্যিকারের 'ভগিনী' না হলেও বুঝবে হয়তো তখনই সত্যিকারের পরিবর্তন আসবে। আপাতদৃষ্টিতে এখনও সেই শিক্ষা বা সমদৃষ্টি নিয়ে দেখার সময় এখনও আসেনি, তবে একটা বোধের সঞ্চার যে হয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। যদিও তা মৈত্রেয়ীর মতো মানবাধিকার কর্মীকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি, পারা উচিতও নয়, তিনি যে নারীবাদী আন্দোলনের কর্মীদের একজন হয়ে 'বন্ধ্যা মাটিতে ধান ফলানোর দুঃসাহসিক চেষ্টা থেকে বিরত' হননি সেজন্যেও অবশ্যই মেয়েরা তাঁকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে, কেননা আপন ভাগ্য জয় করার অধিকার বিধাতার কাছে ভিক্ষা না চেয়ে নিজেরাই অর্জন করার কথা ইতিমধ্যেই অনেকের চিন্তায় এবং চরিত্রের বনিয়াদ হয়ে উঠেছে। অবশ্য তাঁদের মানসিক মানচিত্রে তাঁদের 'ভগিনী'রা সমান গুরুত্ব পেয়েছেন কিনা তা এখনও জানা যায়নি। সেজন্যে মৈত্রেয়ী এবং আরও অনেককে ব্যাপক অর্থে সব মেয়েকেই সেই চেষ্টার শরিক হতে হবে।

কমলা ও মৈত্রেয়ীর ননদ জয়ন্তী, এ বাড়িতে তিনিও কিছুটা ব্যতিক্রম। অবশ্য রামকৃষ্ণ মিশনের জেনেটিক্স বিভাগের রিডারকে আমি প্রশ্ন করতেই ভুলে গিয়েছি, ছেলেবেলায় তিনি ছবি আঁকতেন কিনা কিংবা গান শিখতেন কিনা। গোখলে স্কুল থেকে পাশ করে নৃতত্ত্বে অনার্স নিয়ে জয়ন্তী সায়েন্স কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। তাঁর বিষয়টিকে আরও বিশদ করে বললে দাঁড়ায় ফিজিক্যাল অ্যানথ্রোপলজি। গবেষণার বিষয় ছিল 'গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ নিউ বর্ন বেবিজ' বা নবজাতকের বৃদ্ধি ও পুষ্টি। ক্লাসরুম, ফেলোশিপ প্রভৃতির প্রসঙ্গে না গিয়ে সরাসরি কাজের কথায় চলে আসাই তাঁর মতো কর্মব্যস্ত মহিলার সঙ্গে কথা বলবার সময় স্বাভাবিক বলে মনে হয়। সেবা প্রতিষ্ঠানের ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত থেকে বারো বছর গ্রামে গ্রামে ঘুরে কাজ করেছেন। শিশুকন্যার অবস্থা কিংবা বলা যায় দুরবস্থার একটা চিত্র পাওয়া যায় তাঁর লেখা থেকে। জানা যায় কিছু নতুন তথ্য। যেমন, 'গর্ভাবস্থায় সাধারণত ছেলে-ভ্রূণের সংখ্যা মেয়ে-ভ্রূণের সংখ্যার থেকে অনেক বেশি হয়। এর কোনও বৈজ্ঞানিক কারণ জানা যায়নি, কাজেই এটিকে একটি সাধারণ নিয়ম হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ছেলে-ভ্রূণের মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে অনেক বেশি। তাই জন্মকালীন sex-ratio পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এই সময় ছেলে-ভ্রূণের সংখ্যা মেয়ে-ভ্রূণের থেকে সামান্য বেশি হয়। কিন্তু উন্নত এবং অনেক উন্নতিশীল দেশেও দু' বৎসরের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা বেড়ে যায়। আমাদের দেশে কিন্তু এই নিয়মের ব্যতিক্রম চোখে পড়ে। অন্যান্য দেশের মতো জন্মকালীন Sex-ratioতে ছেলে-শিশুর সংখ্যা মেয়েদের থেকে সামান্য বেশি হয়। কিন্তু দু'মাস বয়সের পর থেকে মেয়েদের তুলনায় ছেলে-শিশুর সংখ্যা বেড়ে যায়। দু'মাস থেকে বারোমাস এই সময় একটি শিশু অত্যন্ত দ্রুতহারে বৃদ্ধি পায়, তাই এই সময় তার যত্নের দরকার হয় সবচেয়ে বেশি। আমাদের মানসিকতা যেহেতু পুত্রমুখী, তাই কন্যাসন্তানদের আমরা ইচ্ছাকৃত অবহেলা করি। এর ফলে দু'মাস থেকে এক বছর, এই সময়ের মধ্যে মেয়ে-শিশু-মৃত্যুহার ছেলে-শিশু-মৃত্যুহারের থেকে ২১ শতাংশ বেশি হয়।' শুধু কি এই? জয়ন্তী বিশিষ্ট পুষ্টিতত্ত্ববিদ ডা. সি. গোপালনের পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছেন, 'যদিও অপুষ্ট মেয়ে-শিশুর সংখ্যা অপুষ্ট ছেলে-শিশুর

চেয়ে পাঁচগুণ বেশি কিন্তু হাসপাতালগুলিতে দেখা যায় যে অপুষ্ট ছেলে-শিশু ও মেয়ে-শিশুর অনুপাত ৫০ : ১। এর কারণ ছেলেদের অপুষ্টিজনিত বা অন্য যে কোনওরকম রোগ হলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় কিন্তু মেয়েদের বেলায় হয় না।'

সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার দশটি অনুন্নত গ্রাম নিয়ে কাজ করতে গিয়ে জয়শ্রী বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার শরিক হয়েছেন। লেখেছেন, 'এই পাকগ্রামেরই মেয়ে দুর্গা, অশিক্ষিত, দারিদ্র্যপীড়িত, সাংসারিক কর্মভারে অবনত এক অতি সাধারণ মেয়ে। দুর্গার স্বামী পঞ্চানন একজন ভাগচাষী, অন্যের জমিতে দিনমজুরি করে সংসার চালায়। চাষের ঋতু অনুযায়ী বছরে ছ'মাস কাজ থাকে। বাকি ছ'মাস...কোনওরকমে সংসার চালায়।' তার রোজগারের বেশিরভাগটাই চলে যায় দেশি মদ কিনে। দুর্গার দুই মেয়ে ও দুই ছেলে। দু'হাতের কাজ দশ হাতে করেও সংসারের দারিদ্র্য দূর করতে পারে না। কিন্তু চিকিৎসার জন্যে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দ্বারস্থ হয়ে সাক্ষাৎ পায় স্বাস্থ্যকর্মীদের। তাঁরা তাকে পরিবার নিয়ন্ত্রণের কথা বলেন। আগেই বলেছিলেন, শেষ পর্যন্ত মনে সাহস এনে সে অপারেশন করায় কুটুমবাড়ি যাবার নাম করে হাসপাতালে গিয়ে। বাড়ি ফিরে আসার পরে তার ওপর শুরু হয় অমানুষিক অত্যাচার, সাতদিন তার স্বামী তাকে খেতে দেয়নি। 'দুর্গার অবস্থা দেখে আমার চোখে জল এসে যায়, বলি—'আমাদের জন্যই আজ তোকে এত কষ্ট পেতে হচ্ছে।' সে হেসে বলে—'না গো দিদিমণি—যখন বুঝবে যে আমি যা করেছি ওর আর ওর কচিদের ভালর জন্যেই করেছি তখন সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি কিছু ভেবো না। আমায় যতই মারুক আমি ভিটে ছেড়ে নড়বনি, দেখবে শেষে আমিই জিতব।' সত্যিই দুর্গার জয় হয়েছে। দুর্গার ঘরে শান্তি ফিরেছে। দারিদ্র্য দূর হয়নি। পঞ্চানন মদ খেলে হয়তো মারধরও করে কিন্তু অন্য সময় সে তার সংসার, পরিবার সকলকেই দেখে। মেয়ে লক্ষ্মীর হাত ভেঙে গেলে 'সে মেয়েকে নিয়ে সমানে ৩০ মাইল দূরের হাসপাতালে যাতায়াত করে মেয়ের হাত ঠিক করাল। এরা নিজেরা খেতে পায় না কিন্তু গাছের পেঁপে এনে দিদিদের খাওয়ায়।' শুধুমাত্র কয়েকটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, চিকিৎসাব্যবস্থা, সহৃদয় ব্যবহার, সহানুভূতি বদলে দিতে পারে অনেক কিছু। 'চালচুলোহীন, অতি দরিদ্র রমণী অর্ধেকদিন যার পেটে ভাত জোটে না, সে তার অন্তর্নিহিত পূর্ণতার বিকাশ ঘটিয়ে সত্যিকারের শিক্ষিতা হয়ে উঠল।' যেহেতু 'গ্রামবাংলার গল্প' বলতে বসেছেন জয়শ্রী, তাই দুর্গার রূপকে শুনিয়েছেন কোনও অনামিকার গল্প। এই সংগ্রামী নারীকে দুর্গা ছাড়া আর কীই-বা নাম দেওয়া যেত? এই দুর্গাদের নিয়েই তো বাঙালি কবিরা আগমনী গান লিখেছেন, গিরিজায়া মেনকা ভেঙে পড়েছেন অজানা আশঙ্কায়।

গ্রামে কাজ করার জন্যে জয়শ্রীর অভিজ্ঞতার ঝুলি ভরে গিয়েছে বহু খবরে। কোনটা ছেড়ে কোনটাকে নেব সেটাই সমস্যা। 'একবার গ্রামের একটি মেয়ে আমাদের দেখতে আসে। অবাঙালিদের মতো শাড়ি পরা, বুলিও বাংলা-হিন্দি মেশানো। সে বলে তার বাপের বাড়ি এই গ্রামে কিন্তু বিয়ে হয়েছে অযোধ্যায়।' কী করে? মেয়েটি গল্প শোনায়: একদিন সে গড়িয়ায় তার দিদিমার বাড়ি যাচ্ছিল। গড়িয়াতে গিয়ে তার বন্ধু তাকে একটি মিষ্টির দোকান থেকে সন্দেশ কিনে খাওয়ায়। এরপর কিছু মনে নেই। জ্ঞান হতে সে দেখে, সে একটি পুলিশ থানায় বসে আছে, জায়গাটার নাম অযোধ্যা। থানাতে এক ভদ্রলোক এসে পুলিশের কাছ থেকে তাকে কিনে নিয়ে যায়। তারপর নিজের ছোট ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে দেয়। স্বামীর সে দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী। স্বামী তাকে খুব যত্নে রেখেছে। কোনও অভাব নেই অর্থাৎ খেত-খামার, গোরু-মহিষ সবই আছে। শ্বশুর, শাশুড়ি, জা সকলেই ভাল, এখন সে চার ছেলের মা ও বাড়ির গিন্নি। ওদের সঙ্গে বেশ ভালভাবে মিশে গিয়েছে। একদিন তার দেওর এসে বলল, সে কলকাতায় যাচ্ছে, ভাবী যদি বাপের বাড়ি যায় তো ঘুরে আসতে পারে। তাই সে আবার এই গ্রামে এসেছে। কিছুদিন পরে আবার ফিরে যাবে। 'সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, সে পরে জানতে পেরেছে তাদের গ্রামের ও

আশেপাশের গ্রামের অনেক মেয়েই অযোধ্যায় বধূরূপে ঘর-সংসার করছে।'

পশ্চিমবঙ্গের ৩৮,০২৪টি গ্রামের মধ্যে একটি গ্রামের গল্প লিখতে বসেছিলেন জয়শ্রী. বিশেষভাবে চোখে পড়েছিল 'গ্রামে এখন মেয়েরাও ধীরে ধীরে লেখাপড়া শিখছে এবং নিজেরাই খুব ছোট বয়সে বিয়ে করতে চাইছে না। ...স্বামী পরিত্যক্তা গৃহবধূরা এইসব গ্রামে নিজেরা সংসার চালায়। ...কেউ কেউ ক্ষুদ্রশিল্প যেমন তাঁতবোনা, ধূপ তৈরির কাজ করে। কিন্তু চাহিদার তুলনায় এগুলি প্রায় কিছুই নয়।' দীর্ঘ দশ বারো বছরের অভিজ্ঞতায় জয়শ্রী দেখেছেন, 'পঞ্চগ্রামের মেয়েরা পুরুষশাসিত সমাজে নীরবে নিঃশব্দে লড়াই করে চলেছে। এরা হয়তো বিপ্লবী নয় কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাগুলির সঙ্গে এরা যেভাবে যুদ্ধ করছে তাতে অন্তত এদের অনায়াসে সৈনিক আখ্যা দেওয়া যায়। এদের এই নিত্যকার সংগ্রাম সমাজের চোখে পড়ে না।'

সেবা প্রতিষ্ঠানের ভ্রাম্যমাণ সেবাকেন্দ্রের সঙ্গে বারবার পঞ্চগ্রামে গিয়ে আর একটি পরিবর্তনও তিনি দেখেছিলেন, যা তাঁর মনে অফুরন্ত আশা জাগিয়েছে। 'পঞ্চগ্রামের ছেলেমেয়েরা প্রথম প্রথম গল্প পর্যন্ত শুনতে চাইত না, কেবল খাবার ঘণ্টার শব্দ শোনবার জন্য ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় বসে থাকত। সেই ছেলেরাই বর্তমানে লেখাপড়া, খেলাধুলার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কন প্রতিযোগিতায়ও যোগ দিচ্ছে। ১৯৯০ সালে গ্রামের ষষ্ঠী মন্ডল World Art Competition—যা চিনদেশ sponsor করেছিল, সেই প্রতিযোগিতায় পালাগানের ছবি এঁকে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।'

জয়শ্রীর এখনকার কাজ জেনেটিক্স নিয়ে। রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিবেকানন্দ মেডিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সঙ্গেও যুক্ত রয়েছেন তিনি। তাঁর বিভাগে ক্রোমোজোমের ম্যাপিং-এর কাজ হয়। এর সাহায্যে জিনঘটিত ব্যাধির নিরাময় সম্ভব। এভাবে থ্যালাসেমিয়া রোগীদের সাহায্য করা সম্ভব হয়েছে। আজকাল জিন-সংক্রান্ত চিকিৎসাপদ্ধতি ক্রমেই গুরুত্ব পাচ্ছে এবং অনেকক্ষেত্রেই ব্যাধির প্রবণতার ওপরে বংশগত প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। জয়শ্রীর কাজ ততই বাড়ছে। কাজের সঙ্গে সঙ্গে সমাজকল্যাণের চেষ্টা। সেজন্যে সংসারকে উপেক্ষা করেননি, চার সদস্যের সমস্ত পরিবারটিই শিক্ষিত এবং কর্মব্যস্ত।

কাদম্বিনী ও কুমুদিনীর বংশলতা ধরে আরও কয়েকজনের কথা এখানে বলে নেওয়া উচিত। এত বিস্তৃত বংশলতার অনেককেই খুঁজে পেতে অসুবিধে, কেউ কেউ হয়তো যথাযথভাবে উপস্থাপিত হননি। যেমন, জ্ঞানপ্রকাশের মেয়ে তিলোত্তমা ভাল ছবি আঁকতেন, তাঁর হাতের কাজও ছিল নিখুঁত। কিন্তু এর অতিরিক্ত আর কিছুই বলা গেল না। কাদম্বিনীর মেয়ে নৃপবালার বিয়ে হয়েছিল হরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে, তাঁর পৌত্র অরবিন্দনাথের সঙ্গে সুনয়নীর মেয়ে অনুজার। সুনয়নীর মেয়েরা কেউ ছবি আঁকতেন কিনা জানা যায়নি। তবে অনুজার মেয়ে শিবানী এই পরিবারের এক উজ্জ্বল চরিত্র। সমাজসেবার কাজে তিনি অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। বিয়ে হয়েছিল অসিত ঘোষালের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল শিবানীর, সে কথা ভুলতে পারেননি কোনওদিন। পরিণত বয়সে এক সাক্ষাৎকার দেবার সময় বলেছিলেন, একবার বাঁকুড়ায় সুনয়নীর সঙ্গে শিবানীরাও গিয়েছিলেন বেড়াতে। রবীন্দ্রনাথও সে সময়ে বাঁকুড়ায় এসেছিলেন স্থানীয় কোনও বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করতে। সুনয়নী তাঁর রবিকাকাকে নাতনি ও নাতজামাইকে দেখাতে নিয়ে গেলেন। '...আমরা এসে পৌঁছলাম ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মিস্টার হালদারের বাংলোয়। গেট ও বারান্দা পেরিয়ে কবির ঘরের সামনে এসে থমকে দাঁড়ালাম। দিদিমা খুব আস্তে আস্তে ঘরের ভেজানো দরজাটা খুললেন। দেখলাম একটা আরাম কেদারায় শুয়ে কবি চক্ষু মুদে বিশ্রাম নিচ্ছেন। সারা ঘরটা নীলচে সার্সির কাচ

দিয়ে বন্ধ। ঘরময় চাঁপাফুলের গন্ধ। সে এক আশ্চর্য অনুভূতি। আমার সারা শরীর আনন্দ আবেশে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। তাঁর গান, তাঁর কবিতার সঙ্গে পরিচয় ছিল অক্ষর পরিচয়ের পর থেকেই। তবে এই রকম একটা পরিবেশে কবির দেখা পাব তা কোনওদিন স্বপ্নেও ভাবিনি।'

সেদিন সন্ধ্যায় ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোয় বসল গানের আসর। শিবানীর স্বামী অসিত সুগায়ক ছিলেন, তাঁর কণ্ঠে দুটি রবীন্দ্রসংগীত 'দুঃখের বরষায়' ও 'হার মানালে গো' শুনে কবি মুগ্ধ হলেন। পরে গানদুটি তিনি রেকর্ডেও গেয়েছিলেন। শিবানীকে বললেন, 'তুমি গাইবে না?' দিদিমার প্রবল উৎসাহ ও কবির আগ্রহে প্রমাদ গনলেন শিবানী, স্থির করলেন, 'চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে' গানটি গাইবেন, কারণ তার সুরটা সোজা, গোলমাল শুধু একটা শব্দ নিয়ে, গানের এক জায়গায় রয়েছে 'শশী' শব্দটি। এদিকে মেয়েরা তখন শ্বশুর-ভাশুরের নাম উচ্চারণ করত না, শশী শিবানীর দাদাশ্বশুরের নাম। কাজেই শিবানী নিজের বুদ্ধিমতো গানের সেই অংশে 'শশী'র বদলে লাগিয়েছেন 'বুকে' শব্দটি। কবিকে তিনি গান গাওয়ার আগেই ব্যাপারটি বুঝিয়ে বললেন। '...উনি তো প্রথমটায় ভুরু কুঁচকে উঠলেন। তারপর বললেন, ঠিক আছে গাও তো শুনি। আমি বেশ সাহসভরে গলায় সবটুকু মাদকতা এনে গাইলাম। কবি চক্ষু মুদে খুব মন দিয়ে গানটা শুনলেন। তারপর বললেন, 'তা মন্দ লাগাওনি তো নাতনি।' তারপর প্রতিদিনই কবির পায়ের কাছে গিয়ে বসতেন। দূর দুরান্ত থেকে লোকে তাঁকে প্রণাম করে যেত। প্রদৌহিত্রী হিসেবে শিবানীর সাহস একটু বেশি, কৌতূহলও। একদিন পায়ের কাছে বসে বলেই ফেললেন, 'আচ্ছা দাদাভাই, আপনি কখনও প্রেমে পড়েছেন?' কবি হেসে বললেন, 'হ্যাঁ গো নাতনি, তবে তা শুধু পড়াই হয়েছিল, ওঠা আর হয়ে ওঠেনি।'

শিবানীর প্রকৃত পরিচয় বা কর্মভূমিকা জানা গেল অনেক পরে। দেশভাগ হবার সময় ঘোষালদের বিশাল বাড়ির একতলা অধিগ্রহণ করে উদ্বাস্তুদের সাময়িক বাসস্থান নির্ধারণ করা হয়। ধনী পরিবারের মেয়ে ও বউ শিবানী ছিন্নমূল মানুষগুলির অবস্থা দেখে অস্থির হয়ে ওঠেন। বিশেষ করে সহায় সম্বলহীনা মেয়েরা। কী করবে তারা? কাজ করার সুযোগ থাকলেও অনেকেরই কোনও শিক্ষাগত যোগ্যতা বা অভিজ্ঞতা নেই। হঠাৎ এক উদ্বাস্তু মহিলার কাছে দেখতে পান একটি অপূর্ব সুন্দর নকশি কাঁথা। ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা নকশি কাঁথার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তবে দেশভাগের সময়ে এই কাঁথা বাংলার অন্যান্য শিল্পের মতো আমাদের স্মৃতি থেকে প্রায় হারিয়ে গিয়েছিল। পূর্ববঙ্গে অবশ্য এর চল ছিল। শিবানী সেই মহিলাকে প্রশ্ন করলেন, 'এই কাঁথা সেলাই করতে কতদিন লাগে?' মহিলা উত্তর দিলেন, 'গরমকালে দিন যখন বড়, তখন আমি একটা কাঁথা কুড়ি দিনে শেষ করতে পারি। অন্য সময়ে এক বছর লাগে।' কিছু ভাবনাচিন্তা করে শিবানী এই ছিন্নমূল নারীদের হস্তশিল্প দিয়ে কোনও আর্থিক সংস্থান করা যায় কিনা তা নিয়ে আরও কয়েকজনের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন। রাজ্য সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ড ও কয়েকজন শিল্পপ্রেমিক ব্যক্তি শিবানীকে উৎসাহ দেন। কলকাতার উপকণ্ঠে গঙ্গানগর গ্রামে ১৯৫৩ সালে শুরু হল গঙ্গানগর মহিলা শিল্পশিক্ষা মন্দির। শিশুশিক্ষা, সূচিশিল্প, কাঁথাস্টিচ, বাতিকশিল্প, তাঁত বোনা—একে একে সবই মেয়েদের শেখানো হত। তাঁদের হাতের কাজ বিক্রি করার ব্যবস্থাও হল।

শিবানীর এই চেষ্টা বিস্মৃতির অতল থেকে নকশি কাঁথাকে জনসাধারণের মধ্যে বিপুলভাবে ফিরিয়ে এনেছে। যদিও এ ব্যাপারে অবনীন্দ্রনাথের উদ্যোগকে ভুলে গেলে চলবে না। কিন্তু এর আগে নকশি কাঁথাকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা হয়েছিল শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ থেকে, শিবানী তাকে নিয়ে এলেন বাণিজ্যিকভাবে। পূর্ববঙ্গে যা ছিল প্রধানত কাঁথা, গঙ্গানগরে কাঁথার সেই সূচিশিল্পকে তুলে আনা হল কুশন কভার, বেড কভার, শাল, টিকোজি, টেবলক্লথ থেকে ধীরে ধীরে শাড়িতে। পরিধেয় বস্ত্র শাড়ির ওপরে ফোঁড় তোলা হলে তার নামই হয়ে গেল কাঁথা শাড়ি। এখন সে কাজ চাদরে, পাঞ্জাবিতেও দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশেও কাঁথাস্টিচের পরীক্ষা চলছে

শাড়ির ওপর। আগেকার দিনে যা হয়নি। বিদেশেও কাঁথা দিয়ে গৃহসজ্জার পথ দেখিয়েছেন গঙ্গানগরের শিল্পীরা। পশ্চিমবঙ্গের নারীদের বিপুল সমাদরে একদিকে যেমন প্রাচীন লোকশিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটল, অপরদিকে বহু নারী এই ব্যবসার সঙ্গে নানাভাবে জড়িয়ে পড়লেন। শিবানী অবশ্য সবটাই করেছিলেন স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে। তিনিই ছিলেন সংস্থার সেক্রেটারি।

কুমুদিনীর পরিবারের অনেকের কথা হয়তো ভিন্ন সূত্রে আগেই এসেছে। তবে জোড়াসাঁকোর দুই ঠাকুরবাড়ির সঙ্গেই এই পরিবারের দীর্ঘ স্থায়ী বিচ্ছেদ ঘটেছিল রথীন্দ্র ও প্রতিমার বিয়ের সময়, কেননা প্রতিমা এই পরিবারের বিধবা পুত্রবধূ। তাঁদের এই মনোভাব প্রশ্রয় পায়নি অন্যান্য শাখার প্রতিনিধিদের কাছে। সময় বদলাচ্ছিল এবং একটি বালিকার পুনর্বিবাহকে তাঁরা দোষের মনে করেননি। তবে এর জের ছিল বেশ কিছুদিন। কুমুদিনীর পৌত্র নরনাথ, তাঁর বড় মেয়ে তনুজার বিয়ে হয়েছিল সৌদামিনীর নাতি সুপ্রকাশের সঙ্গে। অনেক আগেই তাঁর কথা বলা হয়েছে। তনুজার আরও তিনটি বোন মনুজা, শিবানী ও মালবী। মালবী পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়িতে বউ হয়ে এসেছেন, রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের বড় ছেলে পূর্ণেন্দুনাথের বিয়েতে প্রচুর জাঁকজমক হয়েছিল। এঁরা অত্যন্ত ধনী এবং ভূস্বামী। পূর্ববঙ্গের বাখরগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে হাজারখানেক গ্রামের জমিদার ছিলেন এই পরিবার। প্রচুর সম্পদ ছিল এই পরিবারে, বিশেষ করে পারিবারিক অলঙ্কার ছিল প্রচুর। এই গয়নাগুলি মেয়েদের স্ত্রীধন ছিল না, তবে যার যখন ইচ্ছে বা প্রয়োজন হত তিনি সেগুলি ব্যবহার করতে পারতেন। এ বোধহয় রাজপরিবার এবং জমিদারবাড়ির সাবেক নিয়ম। বিয়ের সময় মেয়েরা যা বাপের বাড়ি থেকে আনতেন বা যৌতুক পেতেন, সেগুলি তাঁদের নিজস্ব স্ত্রীধন হিসেবে গণ্য হত।

মালবীর বিয়ে হয়ে গিয়েছিল মাত্র বারো বছর বয়সে। তার আগে তিনি জীবন শুরু করেছিলেন ইংরেজ গভর্নেসের কাছে। ডায়োশেসনে পড়তেন। শিখেছিলেন নাচ, গান, সেলাই, ছবি আঁকা—সব কিছু। সে সময়ে মেয়েকে সব কিছু শেখানো বা বলা যায় শেখাবার চেষ্টা করা হত। যদিও ঘর থেকে বাইরে একলা এবং ইচ্ছেমতো বেরোবার স্বাধীনতা এ বাড়ির মেয়েরা তখনও পাননি। তাঁদের নিজেদের এবং অভিভাবকদেরও প্রধান লক্ষ্য ছিল ভাল ঘরে সুগৃহিণীর ভূমিকায় মেয়েকে প্রতিষ্ঠা করা। এর অতিরিক্ত মালবী যা শিখেছিলেন তা হল গান। খেয়াল-ঠুংরি শিখতেন গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। খুব ভাল গাইতেন। সম্ভবত বিয়ের পরেও চর্চা রেখেছিলেন। ছবি আঁকা শিখেছিলেন গভর্নেসের কাছেই। অনেক কার্ড এঁকেছেন, মেলায় আবার তা বিক্রিও হত। পরে তাঁর ছবি আঁকার খবর পাওয়া যায় না, যদিও পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবারে ছবির আদর ছিল, অনেকেই ছবি আঁকতেন। ছবি না আঁকলেও মালবী সুভো ঠাকুরের 'সুন্দরম' পত্রিকায় সুনয়নীর ছবি নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। লেখার আগ্রহও মালবীর কম ছিল না। যদিও তাঁর অধিকাংশ লেখাই অপ্রকাশিত রয়ে গিয়েছে এবং সেই লেখার পাণ্ডুলিপিও খুঁজে পাওয়া যায়নি। বহু নারীর রচনা এভাবেই হারিয়ে যায়।

কুমুদিনীর নাতনি নীরজা এসেছিলেন কয়লাঘাটা ঠাকুরবাড়ির শরদিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারে। তাঁর ছোট দুই ছেলে যমজ, সুজনেন্দ্র ও সজনেন্দ্র। আবার তাঁদের বিয়েও হয়েছিল সুচিত্রা ও ইরা নাম্নী দুই বোনের সঙ্গে। বয়সের দিক থেকে ইরা সুচিত্রার দিদি, ক্ষণের হিসেবে সুজনেন্দ্র বড়। মহারাজা শৌরীন্দ্রমোহনের দৌহিত্রী ছিলেন এঁদের মা। একই পরিবার থেকে এসে একই পরিবারের দুই বধূ হওয়ায় প্রবণতা অনুযায়ী দুই বোনের একজন ছিলেন সুগৃহিণী,

অপরজনের ছিল তীক্ষ্ণ শিল্পরুচি। ইরা সংসার দেখতেন আর সুচিত্রা ভালবাসতেন লিখতে কিংবা ছবি আঁকতে। কারও কাছে না শিখেও তিনি যে ছবিগুলি এঁকেছিলেন তার তুলনা হয় না। তাঁদের বাড়িতে দুর্গাপুজো হত। সুচিত্রা একাধিক দুর্গার ও জগদ্ধাত্রীর ছবি এঁকেছেন, এঁকেছেন বিশ্বকবির অনবদ্য প্রতিকৃতি, অভিনিবেশ সহকারে দেখলে তবেই বোঝা যায় ছবিটা ছাপা নয়, আঁকা। ছবি আঁকার দুর্লভ ক্ষমতা সুচিত্রা পেয়েছিলেন কিন্তু অঙ্কনশিক্ষার সামান্যতম সুযোগ তিনি পাননি। বিধবা হয়েছিলেন অল্প বয়সে, তিনটি ছেলেমেয়েকে বড় করে তুলতে হয়েছিল। কাজেই সামান্য কিছু রেখা টেনেও কেউ তাঁকে মানুষের অবয়ব আঁকা নিয়ে কোনও উপদেশ দেননি। তিনি ছবি আঁকতেন, ভাল লাগত বলে। মনের মধ্যে কোনও ছবি ফুটে উঠত কিনা জানা যায়নি, তবে চোখে দেখা ক্যালেন্ডারের ছবি, সাময়িকপত্রের পাতায় ছাপা বিভিন্ন শিল্পীর আঁকা ছবি তাঁকে উদ্বুদ্ধ করত তুলি ধরতে। কোথাও থাকত আড়ষ্টতা, কোথাও অপূর্ণতা। সে নিয়ে বিশেষ ভাবতেন না, কেননা ছবি আঁকতেন নিজের জন্যে এবং প্রাণের তাগিদে। অবনীন্দ্রনাথের শাজাহানকে তুলে আনতে পেরেছিলেন নিখুঁতভাবে। গোপালের মূর্তি সাজাতেন সেই একাগ্রতায়। বিয়ের কনে সাজানোর সময় বারেবারে ডাক পড়ত তাঁর। নিজের নাতনিকে বলেছিলেন, 'বিয়ের বেনারসী হবে লাল। কিন্তু বউভাতের শাড়িটি হবে ফিরোজা রঙের, তাতে রুপোর জরির ফুল, মনে হবে যেন সন্ধ্যার আকাশে তারা ফুটে উঠছে।' এই সামান্য কয়েকটি কথা থেকেই সুচিত্রার সৌন্দর্যবোধের পরিচয় মেলে।

আঁকার সঙ্গে সঙ্গে ছিল লেখা। খুব বেড়াতে ভালবাসতেন সুচিত্রা। চার দেয়ালের বাইরে প্রকৃতির বৃহত্তর লীলাক্ষেত্রে বারবার ছুটে যেতে চাইত তাঁর মন। যদিও খুব সহজ ছিল না সেটা। তবে সন্তানেরা যে যার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হবার পর সুচিত্রা প্রচুর ঘুরেছেন। খাতার বুকে ধরে রেখেছেন সেইসব যাত্রাপথের দুরন্ত স্মৃতি। যোশিমঠের শঙ্করাচার্যের কাছে দীক্ষা নিয়ে তৃপ্তি পেলেন। শান্তি পেতেন গোপালের সিংহাসন সাজিয়েও। তাঁর বেড়ানোর অভিজ্ঞতা কিছু কিছু হয়তো প্রকাশিত হয়েছে সাময়িকপত্রে। তার চেয়ে অনেক বেশি জমে রয়েছে পাণ্ডুলিপি। সেখান থেকেই নেওয়া হল কন্যাকুমারী সংলগ্ন বিবেকানন্দ রক ভ্রমণের এক টুকরো স্মৃতি, তখনও আজকের মন্দির হয়নি। সুচিত্রা লিখেছেন, '...কিছুক্ষণের মধ্যেই বিবেকানন্দ রকের গায়ে স্টিম লঞ্চ এসে লাগল। একে একে সবাই নেমে এলুম সেই তীর্থে। সেখানে মহাপুরুষের পদচিহ্ন আঁকা আছে পাষাণের বুকে। প্রশস্ত প্রাঙ্গণ পেরিয়ে মর্মরের শুভ্র সোপানশ্রেণী উপরে উঠে গেছে। অপরদিকে একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে আছে স্বামীজির পদচিহ্ন খোদিত পাষাণ ফলক। একটি নিম্নগর্ভ বেদিতে কাচের আধারে পুষ্পশোভিত সেই পাষাণ ফলকটি বিজলির পীতাভ রশ্মিতে আলোকিত হয়ে আছে।...'

নীরজার বোন সুরজার বিয়ে হয়েছিল মহারাজা প্রদ্যোৎকুমারের সঙ্গে। এঁরা সকলেই পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ির প্রতিনিধি কিন্তু জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির মেয়ে কুমুদিনী সুরজার মাতামহী। প্রদ্যোৎকুমার দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন প্রবীরেন্দ্রমোহনকে। প্রসঙ্গত মনে রাখা যেতে পারে, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন নিঃসন্তান ছিলেন এবং তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র প্রদ্যোৎকুমারকে দত্তক নিয়েছিলেন। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। প্রবীরেন্দ্র প্রদ্যোৎকুমারের বৈমাত্রেয় ভাই শিবকুমার ও স্নেহলতার কনিষ্ঠ পুত্র, আবার স্নেহলতা সুরজারই ছোট বোন। প্রবীরেন্দ্রর স্ত্রী সুরীতি উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত পাকড়াশি পরিবারের মেয়ে, তাঁর বাবা উত্তরবঙ্গের নাট্যজগতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, মা দেবী চৌধুরানির বংশধারার সঙ্গে যুক্ত। অপরূপ রূপলাবণ্যের খাতির আড়ালে সুরীতির যাবতীয় গুণের কথা হারিয়েই গিয়েছে। তিনি খুব ভাল ফরাসি ভাষা জানতেন। পিয়ানো বাজাতে শেখা এক সময়ে ধনী পরিবারের মেয়েদের শিক্ষার অঙ্গ ছিল,

সুরীতি পিয়ানোর সঙ্গে সঙ্গে গিটারও শিখেছিলেন। যন্ত্রসংগীতের অধিকাংশ তালিম নিয়েছিলেন দক্ষিণামোহন ঠাকুরের কাছে। আগ্রহ ছিল ছবি আঁকায়। অনিল ভট্টাচার্যের কাছে অঙ্কনশিক্ষার হাতেখড়ি।

এবার সুরীতির রূপের একটি গল্প শোনা যেতে পারে। তাঁকে সবাই বলতেন দুর্গা, বাস্তবিকই দুর্গাপ্রতিমার মতো তাঁর রূপ ছিল। সরোজার নাতনি সুরভি চেষ্টা করেছিলেন পাথুরিয়াঘাটার বাড়ির সঙ্গে তাঁদের বাড়ির অকারণ দূরত্ব কমিয়ে আনতে। তাঁর মা এই রাজবাড়িতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যদিও তিনি বিয়ের পর এঁদের সঙ্গে বিশেষ যোগ রাখেননি। সুরভির লেখা পড়ে মনে হয়, তাঁর চেষ্টা সফল হয়েছিল। যাই হোক একদিন লেডি রাণু মুখোপাধ্যায় সুরভিকে বললেন, 'উনি শুনেছেন, পাথুরিয়াঘাটার মহারানি পরমাসুন্দরী, তাই ওঁকে একবার দেখতে ইচ্ছে করে।' এক রূপসী দেখতে চান অপরকে। সুরভির চেষ্টায় একদিন সুরভির বাড়িতেই দুজনের দেখা হল।

'...দুর্গাদি আমার বাড়ি এলেন। প্রথমেই চোখে পড়ে তাঁর রঙের ছটা—সম্পূর্ণ স্বাভাবিক গোলাপি রং, যেন আভা ফুটে বেরুচ্ছে। চুলের রং কটা, সাধারণ ধরনে খোঁপা বাঁধা। টানা টানা চোখে ভাসা-ভাসা দৃষ্টি, কোনও চঞ্চলতা নেই। হাসিটি ভারি মিষ্টি—হাসলে মুক্তোর মতো দাঁতের সারি ঝিলিক দিয়ে ওঠে। দুর্গাদি দীর্ঘাঙ্গী নন। সাজ খুবই সাধারণ হলেও শাড়িটি দামি, জরিপাড় শান্তিপুরে—কানে মুক্তোর টপ, গলায় সোনার হার। সুগোল হাতে সোনা-বাঁধানো শাঁখা-লোহা, মকরমুখো বালা। কপালে লাল টিপটি ছাড়া কোনও রঙের প্রলেপ নেই। পায়ে সাধারণ চটি। ওঁর চলাফেরা, কথাবার্তা সবেতেই ফুটে উঠছে ধীর স্থির ভাব।' দুই রূপসীকে একসঙ্গে দেখার আগ্রহে সুরভি যখন অধীর তখন সুরীতি তাঁকে বললেন, 'তোমার রাণুদির আমাকে দেখবার এত আগ্রহ কেন?' সুরভি বললেন, 'আচ্ছা, তোমার কি একটুও কৌতূহল হচ্ছে না রাণুদিকে দেখবার জন্যে?' বলা বাহুল্য, নারীর, বিশেষ করে রূপসীর চিরন্তন কৌতূহল নিশ্চয় ছিল সুরীতির মনেও, তা না হলে তিনিই বা আসবেন কেন? রাণুও এলেন ঠিক সময়ে, 'রাণুদি দীর্ঘাঙ্গী, ছিপছিপে মেদহীন শরীর বেতের মতো টান-টান—গয়নার মধ্যে কানে একজোড়া ঝোলানো দুল, পরনে হালকা রঙের পাতলা বেনারসি, যা ওঁর পছন্দ। পাকা হাতের মেক-আপ, বোঝার উপায় নেই। পায়ে হিলতলা জুতো। দুজনেই রূপসী—কিন্তু দুজনের রূপের দীপ্তি একেবারে ভিন্ন ধরনের।' প্রথম দেখার পরে দুজনেরই পরিচয় ক্রমে গাঢ় হয়।

ফিরে আসি দ্বিজেন্দ্র পরিবারে, সুজাতার মেয়ে ঋতার প্রসঙ্গে। এ নামটা ঠাকুরবাড়িতে ঘুরেফিরে বারবার এসেছে। উৎসাহ এবং কাজ করবার প্রবল ইচ্ছে থাকলেও বাধাবিপত্তি এসেছে মৃত্যু, ব্যাধি, দুর্ঘটনার রূপ ধরে। শৈশবে মাকে দেখেছেন সমাজসেবার কাজে ব্যস্ত থাকতে, তিনি নিজেও জড়িয়ে পড়েছেন নানা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে। যেমন, এখন রয়েছেন কেয়াতলার 'বিবেক চেতনা'র সঙ্গে। কিন্তু ঋতার আসল পরিচয় হল, তিনি শিশুদের জন্যে লিখতে ভালবাসেন। তাঁর লেখা খুবই ভাল, কিন্তু বড়দের জন্যে কিছু লিখতে ইচ্ছে করে না। শুধু শিশুদের জন্যে লেখেন এমন সাহিত্যিক এখন বিরল, ঋতা তাঁদেরই একজন। তাদের জন্যেই লিখেছেন নিজের শৈশবের সোনালি দিনগুলোর গল্প।

'...আমাদের নাটকের শখ ছিল। একবার সুকুমার রায়ের 'ঝালাপালা' থেকে 'অবাক জলপান' হল। কর্ক পুড়িয়ে দাড়িগোঁফ-টৌফ আঁকা হল, দাদারাই করেছিল। আমি ধুতি-পাঞ্জাবি পরে চুল বিনুনি করে পাঞ্জাবির ভিতরে ঢুকিয়ে চোখে কাচ ছাড়া সেলোফেন কাগজ আঁটা রিমলেস চশমা পরে, একটা ছড়ি নিয়ে মোড়ার উপর বসে রবীন্দ্রনাথের 'কানাই মাস্টার' আবৃত্তি করলাম। যেই না বলেছি 'পোড়ো মোর বেড়ালছানাটি' অমনি বাধল মহা গোল। গলায় সবুজ

ফিতে দিয়ে ঘন্টা বেঁধে সাজগোজ করা বুচু বেড়াল 'ম্যাও' বলে আমার হাতের শক্ত বাঁধন ছাড়িয়ে কোল থেকে লাফিয়ে স্টেজের পাশ দিয়ে এক লাফে অদৃশ্য হয়ে গেল। মন খুব খারাপ হয়ে গেলেও সামলে নিয়ে বেড়াল ছাড়াই আবৃত্তি শেষ করলুম। অথচ যত দিন বুচুকে নিয়ে রিহার্সাল দিয়েছি, দিব্যি লক্ষ্মী হয়ে বসে থাকত।'

ঋতার শৈশব কেটেছে শ্রীরামপুরে, ঠাকুরবাড়ি কিংবা ম্যাকলাউড স্ট্রিট থেকে দূরে, যদিও বাড়ির পরিবেশে ছিল তার প্রভাব। তাই কখনও তাঁরা করতেন 'ডাকঘর', কখনও মায়ের বয়স্ক শিক্ষার ক্লাসে সাহায্য। এভাবেই কেটেছে ঋতার শৈশব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বোমার ভয়ে কিছুদিন শান্তিনিকেতনে কাটিয়ে ফিরে এলেও শ্রীরামপুরে মেয়েদের জন্য ভাল স্কুল ছিল না বলে তাঁকে ফিরে আসতে হল কলকাতায়। পরবর্তী জীবনের স্মৃতিকথা ঋতা এখনও লেখেননি। উগান্ডায় ছিলেন কিছুদিন, ইচ্ছে ছিল আফ্রিকার লোকসংস্কৃতি নিয়ে কাজ করার। সেখানকার কালো মানুষগুলিও ভালবাসত তাঁকে, বলত 'মাম্মা, তুমি আমাদের ডাকছ, কিন্তু কেউ তো আমাদের সঙ্গে ডেকে কথা বলে না।' ফিরে আসার সময়ে চেয়েছিল তাঁর ছবি। 'তোমাদের একটা ছবি দাও, না যদি দিতে পারো সোনালি অক্ষরে আমাদের বুকে লেখা থাকবে তোমাদের স্মৃতি।' ত্রিশ-বত্রিশ বছর আগের কথা, তবু কালো মানুষগুলোর সোনার হাসি ঋতার স্মৃতিতে অমলিন।

সৌদামিনীর বংশলতায় রয়েছেন আরও দুজন। একজন শেফালিকার জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ ও অপরজন ছোট মেয়ে শ্রীলেখা। এই পরিবারের সবাই গান ও ছবি আঁকার ব্যাপারটিকে নিজেদের জীবনের অঙ্গীভূত করেছেন। শেফালিকার বড় ছেলে সন্দীপ প্রখ্যাত শিল্পী। বিদেশে রবীন্দ্রসংগীতকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। প্রায় অর্ধ শতাব্দী তিনি জাপানে বাস করছেন। সেই সূত্রে এসেছেন এইকো, জাপানের এই বুদ্ধিদীপ্ত মেয়েটি ঠাকুরবাড়িতে বধূরূপে এসেছেন ১৯৫৮ সালে। সন্দীপ লিখেছেন, 'এক ছুটিতে তোকিও বেড়াতে গিয়ে তার সাথে আমার পরিচয়। সপ্তাহখানেক আলাপের পরই আমি বুঝলাম আমার জীবনসঙ্গিনীকে আমি খুঁজে পেয়েছি।' অভিজাত পরিবারের শিক্ষিত মেয়ে এইকো প্রথমেই বিয়ের প্রস্তাবে রাজি হননি, তখনও তাঁর পড়াশোনা বাকি ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষা ও আমেরিকান সাহিত্যের ছাত্রী ছিলেন তিনি। বিয়ে হল আরও এক বছর পরে। সন্দীপের লেখা থেকেই জানতে পারি, 'জাপানি সমাজ যেন এক সুবিশাল অজগর, নারীজাতিকে পিষে নিংড়ে নিচ্ছে, স্বার্থসাধনের জন্যে। ...অনেক জাপানি মহিলা অ-জাপানিকে বিয়ে করছেন,—প্রেম ভালবাসার জন্যে নয়, জাপানি পুরুষদের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে।' এইকো অবশ্য সেজন্যে সন্দীপকে নির্বাচন করেননি। তবে নির্বাচনের পটভূমিতে জাপানের সমাজের কথা নিশ্চয় তাঁর মনে ছিল, কেননা তিনি ভালবেসেই ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার এবং তাকে আপন করার চেষ্টা করেছেন।

অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে এইকো ভারত-জাপান সংস্কৃতি বিষয়ক পাঁচটি বই লিখেছেন, বলা বাহুল্য জাপানি ভাষায়। এর মধ্যে ভারতীয় গল্প সংকলন, লোককাহিনী, রূপকথার অনুবাদ সবই রয়েছে। নামগুলি অনুবাদ করে দিয়েছেন সন্দীপ—'গাধাকে মানুষ করা গেল না', 'দোল দোল দোলানি' ও 'ভারতের পাখি হিরামন'। এছাড়া এইকো লিখেছেন তাঁর ভারতভ্রমণের অভিজ্ঞতা এবং 'টু ইন্ডিয়া অ্যাজ এ জাপানিজ ব্রাইড'। ভারতীয় সংস্কৃতি নিয়েও তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন। এইকো ভারতে বেশিদিন থাকেননি, কাজেই ভারত তাঁর কতটা আপন হয়ে উঠেছে বোঝা কঠিন। তবে নিজের মেয়েদের মনে ভারত সম্বন্ধে শ্রদ্ধা জাগাতে সন্দীপের সঙ্গে যৌথভাবে চেষ্টা যে করেছিলেন তার প্রমাণ মেলে সন্দীপকে লেখা তাঁর বড় মেয়ে মায়ার চিঠি থেকে, 'তুমি

ও মা ভারতবর্ষকে আমার জীবনের অঙ্গ হিসাবে রাখতে প্রথম থেকেই সচেষ্ট ছিলে এবং তোমার মাতৃভূমির ঐতিহ্য আমার জীবনে অবশ্যই প্রভাব ফেলেছে। আমার এই ভারত-চিহ্নিত ব্যক্তিত্ব নিয়ে আমি গর্বিত। আমার পুত্রকন্যাদেরও আমি আমার এই চিহ্নে চিহ্নিত করে যেতে পারব, এটাই আশা।'

সন্দীপ ও পদ্মার ছোট বোন শ্রীলেখা। প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী। এঁর দিদি পদ্মার কথা অন্যত্র বলা হয়েছে। এঁদের আরও দুটি বোন আছেন চন্দ্র ও শ্রীরূপা এবং ছোট ভাই সুদীপ। গান ও ছবি এঁদের সকলকেই কোনও না কোনওভাবে প্রভাবিত করেছে। সকলেই গান শিখেছেন। চন্দ্রার হাতের কাজ খুব ভাল, যা ছবির জগতে সীবন-শিল্পের নতুন মাত্রা যোগ করতে পারত। তাঁর কন্যা কৌশিকীও সুগায়িকা। শ্রীলেখার সংগীতসাধনায় ব্যাপ্তি অনেক বেশি। গানে তাঁর হাতেখড়ি দু' বছর বয়স থেকেই। যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ির সব শিশুকেই গান শেখাতেন। দু বছরের মেয়েটিও কচি কচি পা ফেলে তাঁর গান শেখাবার ঘরে উপস্থিত হত এবং এভাবেই একদিন ধ্রুপদ শিক্ষার সূচনা হয়। শ্রীলেখার দিদি পদ্মা অসাধারণ ধ্রুপদশিল্পী হতে পারতেন তার জন্যে আরও সময় দিলে। কিন্তু শ্রীলেখার ব্যাপারটা আলাদা। তাঁর আগ্রহ ছিল রবীন্দ্রসংগীতে, পরে অতুলপ্রসাদের গানে দক্ষতার পরিচয় দিয়ে সংগীত জগতে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।

শ্রীলেখা রবীন্দ্রভারতীতে পড়তেন এবং সেইসঙ্গে গানও শিখেছেন। সংগীতই ছিল প্রধান বিষয়, রবীন্দ্রভারতীতে গান শেখাতেন সংগীতজগতের বহু ব্যক্তিত্ব। শ্রীলেখা রবীন্দ্রসংগীতে অনার্স নিয়েছিলেন এবং প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। তারপরে এম এ। বি এ-তে এর সঙ্গে পড়তে হত দর্শন আর সংস্কৃত। এখানেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় অধ্যাপক ড. সমীরণচন্দ্র চক্রবর্তীর। অসাধারণ মেধা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী তিনি, সংস্কৃত সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য তাঁকে সর্বজনশ্রদ্ধেয় করেছে। শ্রীলেখা তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে মুগ্ধ হলেন এবং স্থির করলেন জীবনসঙ্গিনী হয়ে এই জ্ঞানতপস্বীকে বরণ করে নেবেন। শ্রীলেখা যে সংকল্প করেছিলেন তাতে কোনও হঠকারিতা ছিল না। সব মানুষের জীবন একরকম হয় না। পছন্দ-অপছন্দের রংও আলাদা। বিত্তশালী পরিবারের মেয়ে হয়েও শ্রীলেখা চেয়েছিলেন খুব ধনী পরিবারে নয়, মধ্যবিত্ত সমাজের কোনও ব্যক্তিকে তিনি বিয়ে করবেন। বিদ্যার সঙ্গে আছে বিনয়, ধনের সঙ্গে অহংকার। নির্দ্বিধায় তিনি বিদ্বান ব্যক্তিকে বরণ করে নিয়ে মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় দিলেন।

প্রথমে খুবই কষ্ট হয়েছিল। অনভ্যাসের কষ্ট। বিয়ের আগে নিজের হাতে এক গ্লাস জল পর্যন্ত গড়িয়ে খাননি, বিয়ের পরে সংসারের কাজকর্ম আক্ষরিক অর্থেই নিজের হাতে তুলে নিতে হল। শ্রীলেখার মনে ছিল অসম্ভব শক্তি। নিজেকে বোঝালেন, 'সুখ তো আমি দেখেছি, এবার না হয় দুঃখটাও দেখি। সেও তো নতুন অভিজ্ঞতা।' শিখে গেলেন সব কিছু। সংসারের কাজের সঙ্গে চলল সংগীতের সাধনা। বেতারে অতুলপ্রসাদের গান গেয়েছেন একটানা পঁচিশ বছর, ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটির আমন্ত্রণে জাপানে গিয়েছিলেন গান শোনাতে, সেখানে তাঁর দাদা সন্দীপ ছিলেন। অধ্যাপক চক্রবর্তী জার্মানি ও অন্যান্য দেশে বক্তৃতা দিতে গিয়েছেন কয়েকবার কিন্তু শ্রীলেখার সেসব দেশে যাওয়া হয়নি। সে নিয়ে কোনও অনুযোগও নেই। নিজের সংসার এবং সন্তানদের নিয়ে তিনি সুখী। খুব শখ ছিল চাকরি করার। দু জায়গায় ইন্টারভিউ দিয়ে মনোনীত হলেও অধ্যাপক চক্রবর্তীর অমতে কোনও কাজই শেষ পর্যন্ত নেওয়া হয়নি। যদিও সংসারে কাজের অভাব নেই তবু...। গত শতকের '৬০-এর দশকে পশ্চিমবঙ্গের মেয়েরা চাকরি করার ব্যাপারে ক্রমশ আগ্রহী হয়ে উঠছিলেন। দেশ-বিদেশের ছাত্রেরা আজকাল আসে তাদের প্রিয় অধ্যাপকের কাছে। অধ্যাপক চক্রবর্তীর চেষ্টাতেই বৈদিক সাহিত্যচর্চার কেন্দ্র স্থাপিত

হয়েছে কলকাতায়, স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্ন ছিল বেদ-বিদ্যালয় স্থাপন করার। ভারতের প্রাচীন সাহিত্য কিংবা প্রাচীন ভারত আজও সবচেয়ে বেশি টানে জার্মান ছাত্রদের। ভারতীয় ছাত্রদের মনেও প্রাচীন সাহিত্যচর্চার আগ্রহ নেই তা নয়, শিকড়হীন হয়ে মানুষ আর কতদিন নিজের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখবে? শিকড়ের টানে নিজের সাহিত্য ও সংস্কৃতির কাছে আবার তাকে ফিরে আসতেই হবে। সেই নিয়েই শ্রীচক্রবর্তীর একাগ্র সাধনা, অর্ধাঙ্গিনীর গর্ব সেখানেই। শ্রীলেখার মেয়ে যশোধরাও সুগায়িকা।

শরৎকুমারীর বংশলতায় অতসীর মেয়ে কল্পিতা। শিল্পী মায়ের শিল্পী কন্যা বলা যাবে কিনা জানি না, তাঁর আগ্রহ কারুশিল্পকে ঘিরে। যদিও ছবি আঁকতে পারেন, বলতে গেলে তিনপুরুষ ধরে তাঁরা ছবি আঁকছেন। অসিতকুমার হালদারের পর তাঁর মেয়ে অতসী, আবার তাঁর মেয়ে কল্পিতা। কারও কাছে না শিখেই শিখেছেন বাতিকের কাজ। খুব আগ্রহ ছিল চামড়ার ব্যাগে বাতিকের কাজ করার। করেওছেন। সবার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেয়ে আরও কিছু করার কথা মনে হল। তাই ভূগোলে এম এ পাশ করে শিক্ষকতা করতে করতেও ভেবেছেন একটা বুটিকের কথা। শেষ পর্যন্ত সেই স্বপ্ন সাকারও হয়েছে। বুটিকের নাম দিলেন 'কাল্পনিক'। বাতিক আর বাঁধনির শাড়ি করেন নিজের কল্পনা মিশিয়ে। ছবি আঁকা, গান গাওয়া, রান্না করার মতোই ভাল হয় কল্পিতার হাতের কাজ। বোঝাই যায় না তিনি কারও কাছে এসব কাজ কোনওদিন শেখেননি। মেয়ে স্বর্ণিলা মডেলিং করেন। অভিনয়েও আগ্রহ আছে। দূরদর্শনের পর্দায় ছোট ছোট ভূমিকায় মাঝে মাঝে সুযোগও পাচ্ছেন। কল্পিতা হেসে বললেন, 'সাহায্য করি না, আপত্তিও নেই।'

জোড়াসাঁকোর পাঁচ নং বাড়িতে অনেক গুণবতী মেয়েকে দেখা গিয়েছে। সবাইকে ছাপিয়ে উদ্ভাসিত যে মুখটি, তিনি একেবারেই অপরিচিত নন, শর্মিলা ঠাকুর। 'অপুর সংসার' থেকে 'মিসিসিপি মশলা'—মধ্যে, অসংখ্য অবিস্মরণীয় উপস্থিতি 'দেবী', 'আরাধনা', 'অমর প্রেম', 'নায়ক', 'সফর', 'মৌসম', 'শেষ অঙ্কে'র মতো সফল চিত্রের সবই আমাদের স্মৃতিতে অমলিন। শর্মিলা ইরার মেয়ে। চোদ্দো বছর বয়স থেকে ছায়াছবির নায়িকা। কলেজে ইরা ভাল অভিনয় করতে পারতেন। মায়ের প্রতিভার উত্তরাধিকার ছিল মেয়েদের। শর্মিলার ছোট বোন ঐন্দ্রিলা পাঁচ বছর বয়সেই তপন সিংহের 'কাবুলিওয়ালা' ছায়াচিত্রে টিঙ্কু ঠাকুর নামে আত্মপ্রকাশ করে আপামর জনসাধারণের মন জয় করেছিলেন। কয়েক বছর পরে কাগজে যখন বেরোল সত্যজিৎ রায় 'অপুর সংসারে'র জন্যে নতুন মুখ খুঁজছেন, বাড়ির সবাই শর্মিলাকে খ্যাপালেন, 'অ্যাপ্লাই করবি নাকি?' তার আগে সত্যজিৎ রায় নিজেই ফোন করলেন গীতীন্দ্রনাথকে।

চতুর্দশী মেয়ের বাবা এবার প্রশ্ন করলেন, 'আপনি আমার মেয়েকে দেখলেন কোথায়?' সত্যজিৎ রায় হেসে বলেছিলেন, 'আমরা প্রত্যেকটি স্কুলের সামনে চর ফিট করে রেখেছিলাম। তাদেরই একজন আপনার মেয়েকে স্কুল থেকে ফেরার পথে ফলো করে বাড়িটি চিনে আসে।'

কিছু ইতস্তত করে গীতীন্দ্রনাথ সম্মত হলেন, কিন্তু 'আমার মত কেউ নিল না', বলেছেন শর্মিলা। 'অপুর সংসার' মুক্তিলাভ করলে চলচ্চিত্র জগৎ পেল এক নতুন নায়িকাকে। গীতীন্দ্রনাথ অবশ্য চাননি মেয়ে পাকাপোক্তভাবে অভিনেত্রী জীবন বেছে নিন। শর্মিলাও লেখাপড়া করতে চেয়েছিলেন। লোরেটো কলেজে ইতিহাসে অনার্স নিয়ে ভর্তিও হয়েছিলেন। ইচ্ছে ছিল নৃত্যশিল্পী বা চিত্রশিল্পী হবেন। শিল্পী পরিবারে তাঁর জন্ম, গগনেন্দ্রনাথের প্রপৌত্রী, ছবি আঁকার স্বপ্ন দেখার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। ছোট থেকেই নাচ শিখেছেন, সি এল

টি-র উৎসবে তাঁকে নাচতে দেখেছেন অনেকেই, সত্যজিৎ রায় সেখানে থেকেও শর্মিলাকে মনোনীত করে থাকতে পারেন, শুধু গীতীন্দ্রনাথকে তিনি যা বলেছিলেন, সে কথাই শুনিয়েছেন শর্মিলা।

অভিনেত্রী হওয়ার সবরকম ক্ষমতা শর্মিলার পুরোমাত্রায় ছিল। মনের ভাব ফুটিয়ে তোলার দুর্লভ ক্ষমতা, কথা বলা দুটি চোখ, সরল নিষ্পাপ চাহনি, গালের দুটি টোল—সবই তাঁকে নায়িকার ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। সর্বোপরি তিনি যে কোনও পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন। 'অপুর সংসার' ও 'দেবী'র পাশে 'কাশ্মীর কি কলি' কিংবা 'অ্যান ইভনিং ইন প্যারিস' অভিনয়ের ব্যাপ্তিতে যেমন, বাণিজ্যিক সাফল্যের দিক থেকেও তেমনি তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। 'আরাধনা'র মা, 'নায়কে'র সাংবাদিক, 'মৌসমে'র নায়িকার সঙ্গে 'অমর প্রেমে'র নায়িকা—যারা প্রায় একই ধরনের দুর্ভাগ্যের শিকার কিন্তু দুজনের জীবনের দুটি দিক, 'সফরে'র ডাক্তার, সবাইকে শর্মিলা অভিনেত্রী হিসেবে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন। 'ছায়াসূর্য', 'অরণ্যের দিনরাত্রি', 'নির্জন সৈকতে', 'শেষ অঙ্ক'—সর্বত্রই উল্লেখযোগ্য তাঁর উপস্থিতি।

শর্মিলা বিয়ে করেন পতৌদির নবাবকে। অভিজাত মুসলিম পরিবারের ঘরণী হয়েও তিনি অভিনয়ের জগৎ থেকে চলে যাননি। আবার সংসারকেও উপেক্ষা করেননি। সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'এখনকার ছেলেমেয়েরা শিখেছে ব্যক্তিগত স্বার্থ, আমরা শিখেছিলাম পারিবারিক স্বার্থ দেখতে।' হয়তো সেজন্যেই ঘরে-বাইরে, গৃহজীবনে, কর্মক্ষেত্রে তিনি সফল হতে পেরেছেন। তাঁর পুত্রবধূ অমৃতাও অভিনেত্রী। দুই মেয়ে নিজের নিজের কাজের জগতে অত্যন্ত ব্যস্ত। বড় মেয়ে সাবা অলঙ্কার ডিজাইনিং নিয়ে শিল্পজগতে অন্যভাবে প্রভাব বিস্তার করেছেন। এঁরা সবাই একুশ শতকের মানুষ।

ঐন্দ্রিলা বা টিঙ্কু ঠাকুর কাবুলিওয়ালা'র পর আর অভিনয় করেননি। অসাধারণ অভিনয় করে শিশুশিল্পী হিসেবে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। রবীন্দ্রনাথের গল্পের মিনিকে তিনি বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছিলেন। পরে খেলার জগতে তাঁকে মাঝে মাঝে পাওয়া গিয়েছে। বিশেষ করে ব্রিজ খেলায় তাঁর সমতুল্য কেউ ছিল না বললেই হয়। দাবাও খেলেছেন। তাস খেলার ওপর লিখেওছেন বেশ কয়েকবার। অকালে না চলে গেলে তিনি হয়তো এই দুটি বিষয় নিয়ে আরও কিছু লিখতে পারতেন।

অবনীন্দ্রনাথের মেয়ে উমার পুত্রবধূ শান্তি সুগায়িকা, এক সময়ে বেতারে রাগসংগীত পরিবেশন করেছেন। এখন তাঁর গানের স্কুল 'গৌড় মল্লার' অন্যতম রাগসংগীত শিক্ষাকেন্দ্র। মানীন্দ্রনাথের কন্যা স্থিরার আগ্রহ ছিল সংগীতের প্রতি। গান শিখেছিলেন, মেনকারও খুব আগ্রহ ছিল স্থিরার সংগীতশিক্ষা নিয়ে। যদিও পরে গায়িকা হিসেবে তিনি আত্মপ্রকাশ করবার চেষ্টা করেননি।

আবার ফিরে আসা যেতে পারে কুমুদিনীর বংশলতায়। মালবীর মেয়ে রত্না ও চম্পার নাম করতে হলে আবার পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবারের প্রসঙ্গ ওঠে। এঁরা দুজনেই পদ্মা-শ্রীলেখা-শ্যামশ্রীর কাছাকাছি সময়ের এবং সম্পর্কে বোন। পদ্মারা রত্নাদের আপন কাকার মেয়ে। চম্পা বলেন, 'আমাদের সবাই মিলে আমরা ছিলাম একুশ ভাইবোন, প্রায় সমবয়সি এবং বন্ধু। কাজেই ছেলেবেলায় মনেই হত না বাইরের সকলের সঙ্গে মেলামেশার অদৃশ্য গণ্ডি আছে না নেই।' এর ওপর বাড়িতে রবিবার দেখে মাঝে মাঝে হত গানের জলসা, মা-কাকিমারাও যোগ দিতেন তাতে। ভাইবোনেরা নিজেরাই হতেন কুশীলব। এই পরিবারে নতুন করে স্থাপিত হয়েছিল 'ভাই বোন-সংঘ', নতুন করে বলা হচ্ছে, কারণ আর একটির উল্লেখ পাওয়া যাবে

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। তার নাম ছিল 'ভাই-বোন-সমিতি', ১৮৮৩ সালে। সমিতির উদ্যোগীরা ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়,

'হিতু নীতু ক্ষিতু কৃতু, সুরেন বিবি, বলু সুধী
জ্যোৎস্না সরলা—কি আর বলব—সর্বগুণে গুণাম্বুধি।'

পাথুরিয়াঘাটার 'ভাই-বোন সংঘে'র বয়স অনেক কম, এর অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন চম্পার স্বামী নীলেন্দু হালদার। লতায়পাতায় আত্মীয়তা দূরের হলে এখানে যে জ্ঞাতিদের মধ্যে বিয়ে হত, সে কথা নিশ্চয় নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই।

প্রধানত জমিদার হলেও পূর্ণেন্দুনাথ নিজে ব্যারিস্টার হয়েছিলেন এবং সন্তানদের সকলকেই উচ্চশিক্ষা, বিশেষ করে 'কেরিয়ার' তৈরি করতে উৎসাহ দিয়েছিলেন, যা তাঁর দূরদর্শী চিন্তার পরিচায়ক। অবশ্য আগ্রহ ছিল রত্না ও চম্পার মনেও। পঞ্চাশের এবং ষাটের দশকে অনেক মেয়েই স্বোপার্জনের চিন্তা শুরু করেছেন। নিজের আয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর আগ্রহ তখন আর খামখেয়াল নয়, একটা অর্জন। পঞ্চাশ বছর পরে আজকের দিনে তাঁদের এবং তাঁদের পরিবেশকে বুঝতে কষ্ট হবে। দুটো উদাহরণ দিলেই স্পষ্ট হবে সব কিছু। এই পরিবারের মেয়েরা স্কুল কলেজে যেতেন, গান শিখতেন, খেলায় অংশ নিতেন, চম্পা তো টেবল টেনিস, বিলিয়ার্ড, ব্যাডমিন্টন, স্কুটার সব খেলাতেই অংশ নিতেন শ্যামশ্রীর মতো। তাঁদের খেলায় সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে তাঁদের 'ভাই-বোন সংঘ'। যাই হোক, নিজেদের ইচ্ছে অনুযায়ী একলা বেরোবার স্বাধীনতা কিন্তু রত্না-চম্পাদের ছিল না। প্রতিদিন তাঁদের কলেজে পৌঁছে দিয়ে ও নিয়ে আসা হত। বাড়ির গাড়ি চেপেই যে তাঁরা সবসময় যেতেন তা নয়, বাসে চাপলেও দারোয়ান সঙ্গে থাকত। কাজ করার ইচ্ছে রত্নার মনে ছিল, সেজন্যে তিনি সেক্রেটারিশিপ করেন ওয়াই ডব্লিউ সি এ-র সঙ্গে যুক্ত থেকে। ১৯৫৮তে ছাত্রীদের সবাইকে ট্রেনিংয়ে পাঠানো হল উটিতে, পূর্ণেন্দুনাথ মত দিলেন তবে সঙ্গে একজন দারোয়ানকেও পাঠানো হল। রত্না কলকাতায় কিছু বললেন না কিন্তু মাদ্রাজে পৌঁছে লোকটিকে বোকা বানিয়ে স্টেশনে ফেলে রেখে চলে গেলেন উটি। পরে তিনি ওই সংস্থার প্রোগ্রাম সেক্রেটারির কাজ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে দীর্ঘদিন করেছেন। চোখের অসুবিধের জন্যে চাকরি ছাড়েন ১৯৮৬তে। বিয়ের আগেই চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত মেয়েদের বাড়ির বাইরে কাজ করার অনুমতি বিয়ের পরে দেওয়া হত না। বিয়ের আগে রত্নার শাশুড়ি তাঁকে বলেছিলেন, 'শ্বশুরবাড়িতে থাকলে চাকরি করবে কী করে?' রত্না বলেছিলেন, 'তাহলে বিয়েই করব না।' আসলে তাঁর শ্বশুরবাড়ির পরিবেশে ছিল স্বাধীনতা। তাই কোনও অসুবিধেই হয়নি রত্নার। চাকরি ছাড়ার পর নিজের বাড়িতেই খুলেছেন ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার। কাজের মধ্যে থাকতেই ভালবাসেন তিনি।

দিদির মতোই চম্পা পড়েছেন লোরেটো স্কুলে, তারপর ব্রেবোর্ন কলেজে। তারপর গোখলে-তে টিচার্স ট্রেনিং নিতে গেলেন। কাজ করার আগ্রহ দিদির মতোই ছিল। তবে তিনি চাকরি খোঁজার আগেই গোখলে স্কুল থেকে প্রস্তাব এল সেখানে যোগ দেবার জন্যে। কারণ স্কুল কর্তৃপক্ষ তখন কোনও শিক্ষয়িত্রী নিয়োগের আগে তিনি কোন পরিবেশ থেকে আসছেন তার দিকে নজর রাখতেন। চম্পাকে তাঁদের খুব ভাল লেগেছিল। শিশুরা তাঁর কাছে পড়ে আনন্দ পাবে, কেননা যিনি পড়াবেন তিনি গানে, অভিনয়ে, খেলাধূলাতেও দক্ষ। চম্পা ভয়ে ভাবনায় অধীর হয়ে বাবার কাছে অনুমতি চাইলেন, পূর্ণেন্দুনাথ আপত্তি করলেন না। তবে স্কুল

আসা-যাওয়ার পথে দারোয়ান সঙ্গে থাকত। বছরখানেক পরে চম্পাকে স্কুল কর্তৃপক্ষ বললেন, 'শুনলাম তোমার বিয়ে হয়ে যাবে। তারপরে তুমি পড়াবে কিনা তা জানতে না পারলে তোমাকে আমরা পার্মানেন্ট করব না। এজন্যে তোমার শ্বশুরমশাইয়ের অনুমতি চাই।' শ্বশুরবাড়ির সবাই তো চম্পার পরিচিত, কারণ তিনি 'ঘরের মেয়ে'। কাজেই গিয়ে জানালেন নীরজচন্দ্রকে। স্কুলের সঙ্গে আগেই পরিচয় ছিল তাঁর, কাজেই অনুমতি দিতে কোনও আপত্তি রইল না। চম্পা পড়িয়েছেন দীর্ঘ সাঁইত্রিশ বছর। অবসর নিয়েছেন ১৯৯৭ সালে। আগে শিশুদের ইংরেজি শেখাতেন, পরে জুনিয়র সেকশনের প্রধান হন। পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের মধ্যে রত্না ও চম্পাই প্রথম চাকরি নিয়ে আধুনিক কর্মজগতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

কুমুদিনীর বংশলতায় কয়লাহাটা ঠাকুরবাড়ির আর একজন উজ্জ্বল মেয়ে বাণী। স্বজনেন্দ্র ও সুচিত্রার ছোট মেয়ে বাণী প্রখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী। বাবার আগ্রহ ছিল সংগীতে, সুচিত্রা ছবি আঁকতেন, লিখতেন, গাইতেন—সুকুমার শিল্পের প্রতিটি শাখার সঙ্গে ছিল তাঁর অন্তরের যোগ। বাণীর আগ্রহ ছিল রবীন্দ্রসংগীতের দিকে, বাড়িতে, সেই সংগীত-চেতনার উন্মেষের সময় থেকেই তিনি রেকর্ডে শুনতেন সুচিত্রা মিত্রের রবীন্দ্র সংগীত, যাঁর ব্যক্তিত্বের স্পর্শ পাওয়া যেত গানের মধ্যে। কিন্তু বাণীর গান শেখা শুরু হল রীতিমতো কড়া শিক্ষক রামকৃষ্ণ মিশ্রের কাছে। বাবাকে হারান শৈশবের সীমা পেরোবার আগেই। কয়লাহাটার বাড়ি থেকেও ঠাকুর পরিবারে চলে আসেন দক্ষিণ কলকাতায়। আপাতভাবে পাথুরিয়াঘাট-জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি থেকে দূরে। বাণীর রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি আন্তরিক টান দেখে তাঁর এক দাদা অদ্রিজানাথ মুখোপাধ্যায় তাঁকে ভর্তি করে দিয়েছিলেন দক্ষিণীতে। সেই শুরু। নতুন জীবনের পথে। শুধু গলা সাধা নয়, সুরের সাধনা। তিন বছর গান শিখলেন 'দক্ষিণী'তে, ডিপ্লোমা পাবার পরেও শুভ গুহঠাকুরতা তাঁকে রাগাশ্রয়ী রবীন্দ্রসংগীতে তালিম দিলেন। ১৯৬২তে বাণী সুযোগ পেলেন, তাঁর সংগীতচর্চার সূচনাপর্বে যাঁকে আদর্শ মনে হয়েছিল, সেই সুচিত্রা মিত্রের কাছে বসে গান শেখার। সন্ধ্যা সেনকে সাক্ষাৎকার দেবার সময় বাণী তাঁকে বলেছিলেন, 'গানের ভিতর ডুবে যাবার দীক্ষা সুচিত্রাদির কাছেই। ভয়েস মড্যুলেশন এবং এক্সপ্রেশন এসব সম্বন্ধেও উনি যেন একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে দিলেন। ভল্যুমের একটু এদিক-ওদিকে গানের মানে কেমন করে বদলে যায়, সে আশ্চর্য উপলব্ধি কোনদিনও ঘটত না যদি সুচিত্রাদির সংস্পর্শে আসার সুযোগ না ঘটত।'

শিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশও এই সময়ে। অবশ্য রেকর্ডের আগে নানা জায়গায় গাইতে শুরু করেছেন। রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে ভারতের নানা শহর—দিল্লি, পাটনা, লখনউয়ে; কংগ্রেসের প্রথম রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব শুরু হয় বাণীর গান দিয়ে, ১৯৬২তে বেঙ্গল লিটারারি অ্যান্ড কালচারাল কনফারেন্সে যোগ দিতে গিয়েছেন বর্মা বা এখনকার মায়ানমারে। ১৯৬৪তে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি হয়ে নেপালে, বেতারশিল্পী হয়ে ঘুরেছেন সব রাজ্যে, ঢাকায় টেলিভিশন প্রোগ্রামও করেছেন। গ্রামোফোন কোম্পানির পি কে সেনের সঙ্গে বাণীর পরিচয় করিয়ে দিলেন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে। প্রথম রেকর্ড 'হে মাধবী দ্বিধা কেন' ও 'দীপ নিভে গেছে মম'। ১৯৭২-এ ম্যাক্সমুলার ভবনে একক রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠান। ফুলের সুরভির মতো ছড়িয়ে পড়ছিল তাঁর নাম। পরিচিতি বাড়ছিল।

এভাবেই একদিন পরিচয় হল কল্যাণ রায়ের সঙ্গে। সুগায়ক, সুবক্তা এবং ভাষ্যকার। প্রচার বিভাগের বড় কর্মচারী। ঠাকুরবাড়ির অনেকেরই আপত্তি ছিল, আবার বাণীর পক্ষেও ছিলেন কেউ কেউ। তাই বিয়ে হল। দীর্ঘপক্ষ্ম দুটি ডাগর চোখে অনেক স্বপ্ন নিয়ে হাসিখুশিতে ভরা

শিশুকে মেয়েটি শুরু করলেন নতুন জীবন। গান গাওয়া আর গান শেখার যেন কোনও বিরাম নেই। একের পর এক রেকর্ড প্রকাশিত হল, 'সখি প্রতিদিন হায়', 'আজি ঝড়ের রাতে', 'আমার না বলা বাণী', 'মম অন্তর উদাসী' ও আরও অনেক গান। গান যে শুধু সুচিত্রা মিত্রের কাছে শিখতে চেয়েছেন তা নয়, যে রাগসংগীত ছেলেবেলায় শিখতে ভাল লাগেনি, তাও শিখেছেন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ ও প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। কিন্তু বাণীর জীবনে সুখের দিন স্থায়ী হয়নি। তাঁর স্বামীর আকস্মিক মৃত্যু ধারাবাহিকতায় ছেদ এনে দেয়।

অবশ্য গানই বাণীর সান্ত্বনা, সাফল্য সব কিছু। এরপরে বিভিন্ন সংগীত সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গান শেখানো ও অনুষ্ঠান প্রযোজনার কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। দেখা গেল সাংগঠনিক কাজে তাঁর দক্ষতা রয়েছে, সংগীতশিক্ষা দেবার যোগ্যতা তো ছিলই। অন্যান্য শিল্পীরাও তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন। এক সময় যোগ ছিল বহু গ্রুপের সঙ্গে—'সুর সঙ্গম', 'গান্ধর্বী', 'রাগিণী', 'সুরতীর্থ' প্রভৃতির। এখন তাঁর নিজের গ্রুপ 'কিংশুক'কেই দেখেন, ওদের সঙ্গে রয়েছেন '৬৯ সাল থেকে। গানের মতো ওই প্রতিষ্ঠানও তাঁর জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

সুচিত্রার পুত্রবধূ গৌরীর কথা বলার আগে মনে করিয়ে দেওয়া উচিত কয়লাহাটার ঠাকুরবাড়ি তখনও পুরনো দিনের ছাপ পুরোপুরি মুছে ফেলেনি। অল্প বয়সে বাবাকে হারিয়েছিলেন বলেই শোভেন্দ্র বিশেষ করে ঝুঁকেছিলেন শিক্ষার দিকে। অন্যদের মনে সে আগ্রহ ছিল না। কিন্তু গৌরী এলেন এক আলোকপ্রাপ্ত ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে। বাবা নরেন্দ্রনাথ রায় সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন, দাদা শচীন রায় এবং বউদি দুজনেই নৃতত্ত্ব নিয়ে পড়েছেন, যুক্ত ছিলেন ভারতীয় সংগ্রহশালার সঙ্গে। কলকাতার অ্যানথ্রোপোলজিকাল গ্যালারি তাঁর হাতেই সাজানো বললে অত্যুক্তি হবে না। গৌরী নিজেও ভাল ছাত্রী ছিলেন। ইতিহাস নিয়ে এম এ পর্যন্ত পড়েছিলেন। বিয়ের পরও নিয়মিত ক্লাস করেছেন তবে শেষ পর্যন্ত পরীক্ষাটা দেওয়া হয়নি। সন্তানসম্ভবা বধূকে পরীক্ষা দেবার অনুমতি দিতে পারেননি অভিভাবকেরা। গৌরীও পিছিয়ে গিয়েছিলেন সন্তানের কথা ভেবে। সেজন্যেই চাকরিও করা হয়নি। কিন্তু মেয়েদের বড় করে তোলার সময় তিনি তাঁদের সবসময় মনে করিয়ে দিয়েছেন জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ লেখাপড়া শেখা এবং স্বনির্ভর হতে শেখা। গৌরীর দৃষ্টিভঙ্গিতে ছিল আধুনিকতা। তাঁর সংস্পর্শে যে নিরক্ষর ব্যক্তি কর্মসূত্রে এসেছে, তাকেই তিনি লেখাপড়া শিখিয়ে ব্যাঙ্কে টাকা জমাতে শিখিয়েছেন। অর্থাৎ শিক্ষা-স্বোপার্জন-সঞ্চয় না থাকলে চলে না। মনুষ্যত্ব পদে পদে খর্ব হয়। তিনি উৎসাহ দিতেন শাশুড়ি সুচিত্রাকে, ছবি আঁকতে জোগাতেন রং তুলি। তাঁর নিজের দুই মেয়ে শিক্ষিত, স্বনির্ভর, সংসারীও। সংযুক্তা যুক্ত আছেন নব নালন্দার সঙ্গে। ছোট মেয়ে শাশ্বতী ভাল নাচতেন, এখন নৃত্যশিক্ষিকা।

এই পরিবারের আরেক বধূ জয়শ্রী, স্বপনেন্দ্রনাথের স্ত্রী, ইরার পুত্রবধূ। স্বপনেন্দ্র ভাল ছবি আঁকতেন। জয়শ্রী প্রহ্লাদ দাসের কাছে নৃত্যশিক্ষা নিয়েছিলেন, যদিও স্কুল-কলেজের বাইরে কোনও অনুষ্ঠানে যোগ দেননি। শিক্ষকতার পেশাটিকেই বেছে নিয়েছিলেন তাঁর সময়ের অধিকাংশ মেয়ের মতো। কাজের জগতে এসে মেয়েরা সবার আগে খুঁজতেন, খুঁজতেনই বা বলছি কেন, এখনও খোঁজেন শিক্ষকতার কাজ। গৌরী পড়াতেন সাউথ পয়েন্ট স্কুলে। মেয়ে শ্রীনয়নার ঝোঁক ছিল গানের দিকে। বাণীর কাছেই তিনি গান শিখেছেন।

শিবানীর মেয়েদের মধ্যে গোপা ডাক্তার হয়েছেন। ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের মধ্যে চিকিৎসক হবার প্রবণতা কম। গোপার নিজেরও যে খুব আগ্রহ ছিল তা নয়, কিন্তু তাঁর বাবার ইচ্ছে ছিল

মেধাবী কন্যাকে মেডিক্যাল পড়ানোর। কাজেই গোপা প্রচলিত পথে না হেঁটে ভর্তি হলেন মেডিক্যাল কলেজে। যথাসময়ে স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠলেন। যদিও প্রথম দিকে বেশ খারাপই লাগত। ক্রমে দেখলেন, তাঁর সামনে যন্ত্রণাদীর্ণ মুখের মিছিল, তাদের চোখে-মুখে স্বস্তির ছাপ ফুটে উঠছে তাঁকে দেখে। সেবা হিসেবে দায়িত্বের বোঝা তুলে নিতে কখন যে ভাল লাগতে শুরু করল তা নিজেও জানেন না। উত্তর কলকাতায় আজ তাঁর নার্সিংহোমে সর্বদাই উদ্বিগ্ন মানুষের ভিড়। নতুন মানুষকে পৃথিবীর আলো দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে তার মাকেও আনন্দের জগতে ফিরিয়ে আনেন গোপা। তবু চিকিৎসকের জীবনে থাকে কিছু ভুল বোঝাবুঝি, সংঘাত। কিন্তু গোপা মনে করেন, নিজের কর্তব্যে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা থাকলে এক সময় সব ভ্রান্তিরই অবসান ঘটে।

সৌম্যা সুরীতির পুত্রবধূ হয়ে আসেন অল্প বয়সে। বিয়ের পরে কলেজে পড়েছেন। এম এ পাশ করেছেন ইংরেজিতে। নাচ শিখেছেন ছেলেবেলায় রামগোপাল মিশ্রের কাছে, পরে ভরতনাট্যম, যুক্ত আছেন 'কৃতমবালম' (নৃত্যমন্দির)-এর সঙ্গে। এখন তিনি নাচ শেখান। মেয়ে সৌরজাও ভরতনাট্যম শিখছেন, 'কৃতমবালমে' উদীয়মান শিল্পী, ন্যাশনাল স্কলারশিপ পেয়েছেন। ভবিষ্যতে নৃত্যশিল্পী হবার স্বপ্ন তাঁর চোখে। সৌম্যাও চান মেয়ের স্বপ্নকে সাকার করতে। নিজে তিনি সরে এসেছেন মঞ্চ থেকে, ছেলের শিক্ষা আর মেয়ের নৃত্যশিক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখতে হয়েছে বলে। লেখাপড়ার সঙ্গে নাচ—দুটোই সৌরজাকে ব্যস্ত রাখে বলে সদা ব্যস্ত থাকেন সৌম্যা নিজেও।

অন্দরমহলের গল্প এখানেই থামাতে হয়, কেননা একুশ শতকে পৌঁছে সদর-অন্দর এক হয়ে গিয়েছে। পুরনো 'রাম বাড়ি'র কথা এখন খুব কম লোকেই জানে। অথচ জোড়াসাঁকোর ৬ নং বাড়ির অন্দরমহল অংশটির একসময়ে নাম ছিল 'রাম-বাড়ি।' রামলোচন-রামমণি-রামবল্লভের নামেই অন্দরমহল পরিচিত হত। এখনও ঠাকুরবাড়ির প্রবীন সদস্যেরা মহর্ষিভবনের পরের অংশটিকে সেই নামে অভিহিত করেন। সে বাড়ির সবাই এখন অন্যত্র। অনেকের কথাই বলা হল, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রইলেন আরও কতজন, যথাযথভাবে তাঁদের খুঁজে পাওয়া যায়নি বলে। এখন প্রত্যেকেই কিছু না কিছু করছেন। যেমন, এইমাত্র জানা গেল, সুষমার প্রপৌত্রী সুমনা অর্থনীতিকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম এ পাশ করেছেন। বিপুল কর্মক্ষেত্র তাঁর সামনে। অত্যন্ত ধনী পরিবারেও অলস মেয়ে নেই বললেই চলে। কাজের ধরনও বদলেছে। বদলেছে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, সামাজিক অবস্থান। দীর্ঘ পথ পেরিয়ে জয়রামের সেই বিশাল পরিবার বড় হয়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। নীলমণি ও দর্পনারায়ণের বিবাদ এখন তাঁদের উত্তরপুরুষদের কাছেই গল্পকথা। অতীতের দিকে তাকিয়ে এখন তো মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ শুরু হয়েছিল, গোবিন্দরাম ঠাকুরের স্ত্রী রামপ্রিয়ার সঙ্গে নীলমণি ও দর্পনারায়ণের, রামপ্রিয়ার পক্ষে ছিলেন নীলমণি ঠাকুরের ত্যাজ্যপুত্র আনন্দীরামের পুত্র রামতনু। মোকদ্দমায় জয়রামের সম্পত্তির ভাগ নিয়ে রামপ্রিয়া পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ি থেকে চলে যান শিবতলার স্বতন্ত্র বাড়িতে। হয়তো এই মামলার সূত্রেই নীলমণি ও দর্পনারায়ণ নিজেদের সম্পত্তি ভাগ করে নিয়ে নীলমণি চলে আসেন জোড়াসাঁকোয়। এঁদের মধ্যে কোনও মামলা-মোকর্দমা হয়নি। তবে বিবাদের কথাটা বহুদিন ধরেই শোনা গিয়েছে। এমনও হতে পারে, জোড়াসাঁকোয় দেবেন্দ্রনাথের পরিবার ব্রাহ্ম হয়ে গিয়েছিলেন বলেই ঠাকুরবাড়ির দুটি প্রধান ধারা ক্রমেই দূরে সরে গিয়েছিল। আজ সেই সমাজ নেই, ধনের গরিমা নেই, ধর্মের

চুলচেরা বিতর্ক নেই, ইতিহাসকে অনুসরণ করার আগ্রহ নেই। আছে শুধু ঐতিহ্যিক উত্তরাধিকারের উজ্জ্বল স্মৃতি। কেননা ঠাকুর পরিবারের কেন্দ্রে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, তিনি আজ শুধু ঠাকুরবাড়ির নন, শুধু শান্তিনিকেতনের নন, শুধু বাঙালির নন, সারা ভারতের। ১৯৯৭-এ নাফিসা জোশেফ ভারতসুন্দরী প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েই বলেন, তিনি ঠাকুরবাড়ির মেয়ে, কোনও না কোনও সম্পর্কসূত্রে তাঁর যোগ আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে। নাফিসার এই উক্তি থেকেই বোঝা যায়, বহুধারায় বিস্তৃত ঠাকুরবাড়ির স্মৃতিচারণার প্রয়োজন একুশ শতকেও ফুরিয়ে যায়নি। নাফিসা দর্পনারায়ণ ঠাকুরের বংশধারার সঙ্গে যুক্ত, জোড়াসাঁকোর বাড়ির সঙ্গে নয়। কিন্তু তাতে কী হয়েছে, আসলে তো তিনিও ঠাকুরবাড়িরই মেয়ে। কোনও না কোনওভাবে একবার যে এই পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, সে-ই পেয়েছে এই পরিবারের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার। গড়ে উঠেছে গল্পের পর গল্প। ইতিহাসের সঙ্গে ভবিষ্যতের টানাপোড়েনের নকশায় বোনা থাকবে বাংলার নারীপ্রগতির দীর্ঘ ও বন্ধুর পথে আমরা কী পেয়েছি আর কী পাইনি, তার কথা। অবন ঠাকুর বলতেন, মানুষ হিসেব চায় না, চায় গল্প। স্মৃতির মেদুর পথ আমাদের গল্পের দিকে বারবার টেনে নিয়ে যেতে চাইলেও প্রকৃতপক্ষে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ও মানসিক মানচিত্র পরিবর্তনের খণ্ডচিত্রই এখানে ধরে রাখার চেষ্টা করা হল।

বংশলতিকা

ঠাকুর পরিবার

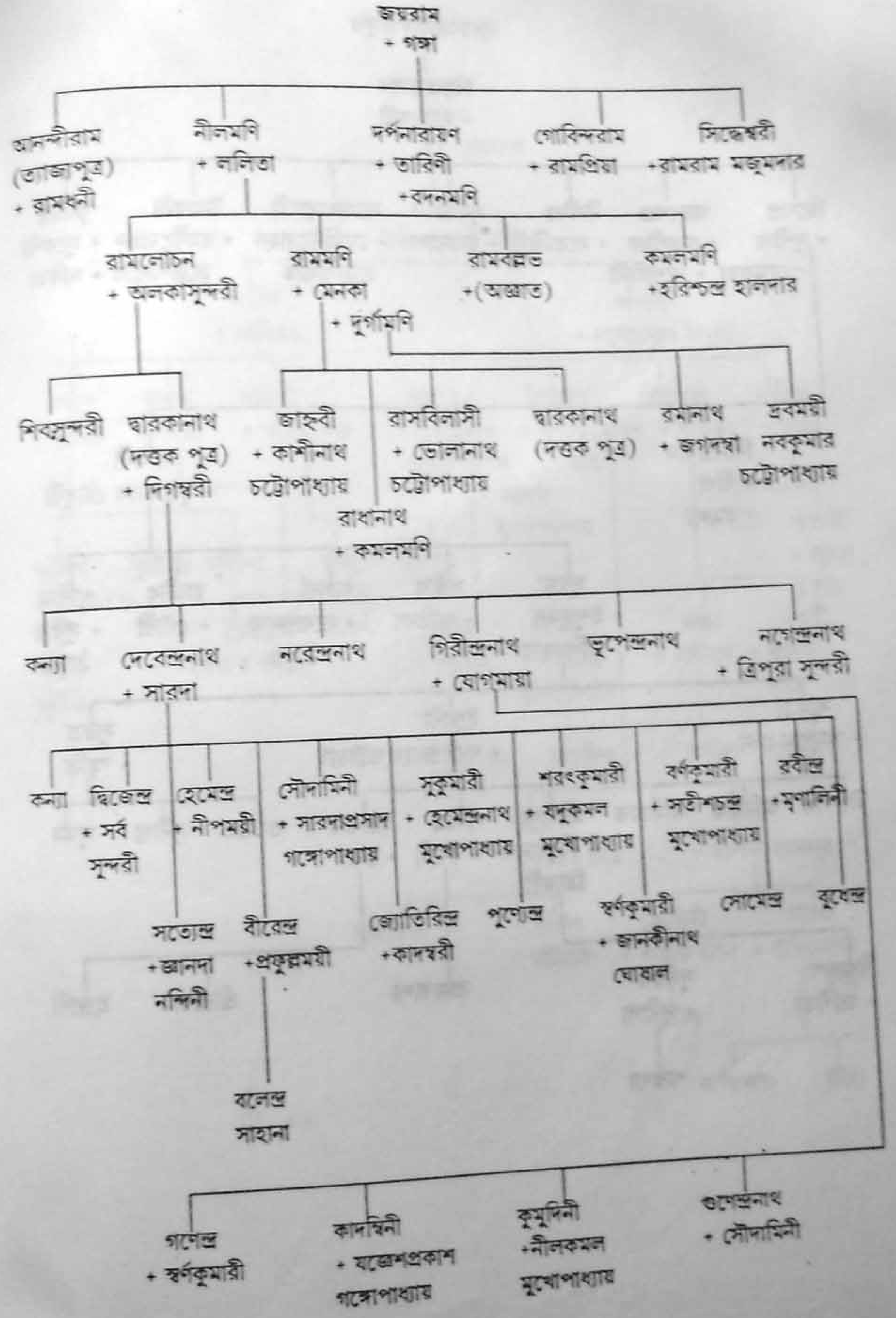
জয়রাম
+ গঙ্গা
আনন্দীরাম
(ত্যাজ্যপুত্র)
+ রামধনী
নীলমণি
+ ললিতা
দর্পনারায়ণ
+ তারিণী
+ বদনমণি
গোবিন্দরাম
+ রামপ্রিয়া
সিদ্ধেশ্বরী
+ রামরাম মজুমদার
রামলোচন
+ অলকাসুন্দরী
রামমণি
+ মেনকা
+ দুর্গামণি
রামবল্লভ
+ (অজ্ঞাত)
কমলমণি
+ হরিশ্চন্দ্র হালদার
শিবসুন্দরী
দ্বারকানাথ
(দত্তক পুত্র)
+ দিগম্বরী
জাহ্নবী
+ কাশীনাথ
চট্টোপাধ্যায়
রাসবিলাসী
+ ভোলানাথ
চট্টোপাধ্যায়
দ্বারকানাথ
(দত্তক পুত্র)
রমানাথ
+ জগদম্বা
ব্রজময়ী
নবকুমার
চট্টোপাধ্যায়
রাধানাথ
+ কমলমণি
কন্যা
দেবেন্দ্রনাথ
+ সারদা
নরেন্দ্রনাথ
গিরীন্দ্রনাথ
+ যোগমায়া
ভূপেন্দ্রনাথ
নগেন্দ্রনাথ
+ ত্রিপুরা সুন্দরী
কন্যা
দ্বিজেন্দ্র
+ সর্ব
সুন্দরী
হেমেন্দ্র
+ নীপময়ী
সৌদামিনী
+ সারদাপ্রসাদ
গঙ্গোপাধ্যায়
সুকুমারী
+ হেমেন্দ্রনাথ
মুখোপাধ্যায়
শরৎকুমারী
+ যদুকমল
মুখোপাধ্যায়
বর্ণকুমারী
+ সতীশচন্দ্র
মুখোপাধ্যায়
রবীন্দ্র
+ মৃণালিনী
সত্যেন্দ্র
+ জ্ঞানদা
নন্দিনী
বীরেন্দ্র
+ প্রফুল্লময়ী
জ্যোতিরিন্দ্র
+ কাদম্বরী
পুণ্যেন্দ্র
স্বর্ণকুমারী
+ জানকীনাথ
ঘোষাল
সোমেন্দ্র
বুধেন্দ্র
বলেন্দ্র
সাহানা
গণেন্দ্র
+ স্বর্ণকুমারী
কাদম্বিনী
+ যজ্ঞেশপ্রকাশ
গঙ্গোপাধ্যায়
কুমুদিনী
+ নীলকমল
মুখোপাধ্যায়
গুণেন্দ্রনাথ
+ সৌদামিনী

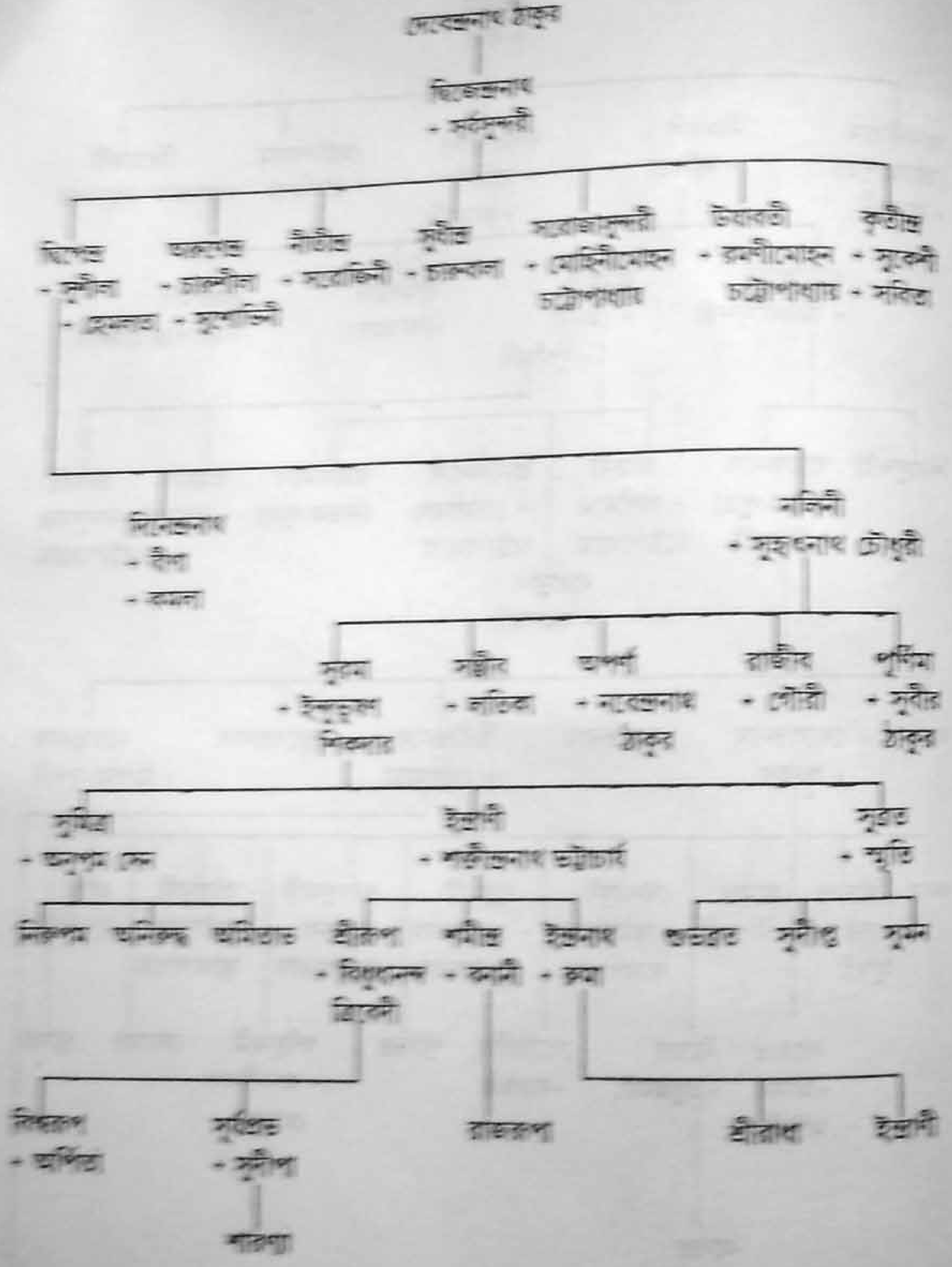
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
দ্বিজেন্দ্রনাথ
+ সর্বসুন্দরী
দ্বিপেন্দ্র
+ সুশীলা
+ হেমলতা
অরুণেন্দ্র
+ চারুশীলা
+ সুখশান্তিনী
নীতীন্দ্র
+ সরোজিনী
সুধীন্দ্র
+ চারুবালা
সরোজাসুন্দরী
+ মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়
ঊষাবতী
+ রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়
কৃতীন্দ্র
+ সুকেশী
+ নলিতা
দিনেন্দ্রনাথ
+ বীণা
+ কমলা
নলিনী
+ সুহৃৎনাথ চৌধুরী
সুরমা
+ ইন্দুভূষণ সিকদার
সঞ্জীব
+ লতিকা
অপর্ণা
+ নবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
রাজীব
+ গৌরী
পূর্ণিমা
+ সুবীর ঠাকুর
সুমিত্রা
+ অনুপম সেন
ইন্দ্রাণী
+ শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
সুব্রত
+ স্মৃতি
নিরুপম
অনিরুদ্ধ
অমিতাভ
শ্রীরূপা
+ বিশ্বানন্দ ত্রিবেদী
শমীন্দ্র
+ রমণী
ইন্দ্রনাথ
+ রুমা
শুভব্রত
সুদীপ্ত
সুমন
বিশ্বরূপ
+ অর্পিতা
সুপ্রিয়
+ সুদীপা
শারণ্যা
রাজরূপা
শ্রীরাধা
ইন্দ্রাণী

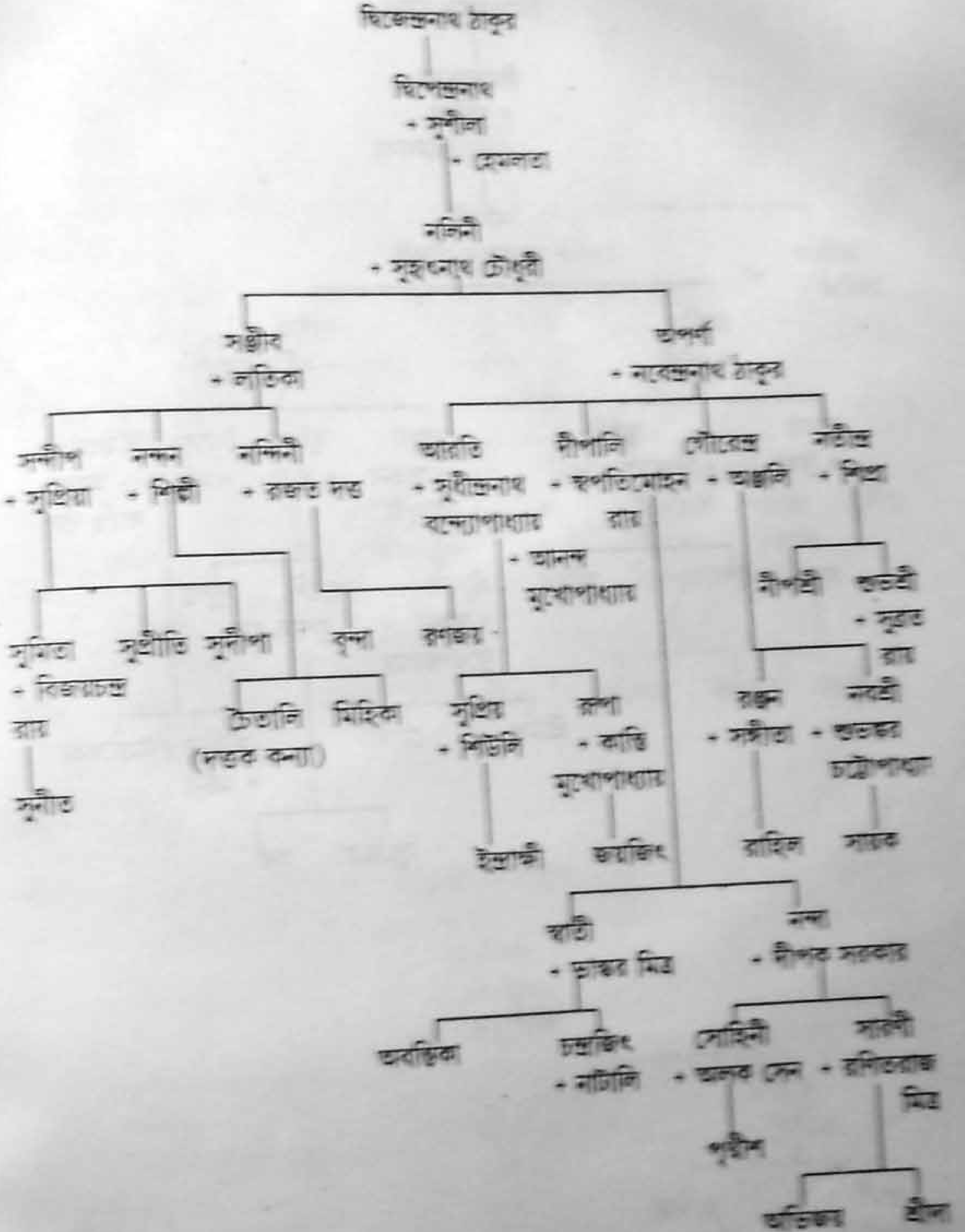
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
দ্বিপেন্দ্রনাথ
+ সুশীলা
+ হেমলতা
নলিনী
+ সুহৃৎনাথ চৌধুরী
সঞ্জীব
+ লতিকা
অপর্ণা
+ নবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সন্দীপ
+ সুপ্রিয়া
নন্দন
+ শিপ্রা
নন্দিনী
+ রজত দত্ত
আরতি
+ সুধীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
+ আনন্দ মুখোপাধ্যায়
দীপালি
+ হরপতিমোহন রায়
গৌরেন্দ্র
+ অঞ্জলি
নরেন্দ্র
+ শিপ্রা
সুমিতা
+ বিজয়চন্দ্র রায়
সুনীত
সুপ্রীতি
সুদীপা
চৈতালি
(দত্তক কন্যা)
মিহিকা
বৃন্দা
রণজয়
সুপ্রিয়
+ শিউলি
ইন্দ্রাক্ষী
রূপা
+ বাপ্পি মুখোপাধ্যায়
জয়জিৎ
দীপশ্রী
শতশ্রী
+ সুব্রত রায়
রঞ্জন
+ সঙ্গীতা
রাহিল
নবশ্রী
+ শুভঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
সায়ক
স্বাতী
+ ভাস্কর মিত্র
নন্দা
+ দীপক সরকার
অবন্তিকা
চন্দ্রজিৎ
+ নাটালি
সোহিনী
+ অলক সেন
পৃথ্বীশ
সাবরী
+ রণিতরাজ মিত্র
অভিজয়
শ্রীলা

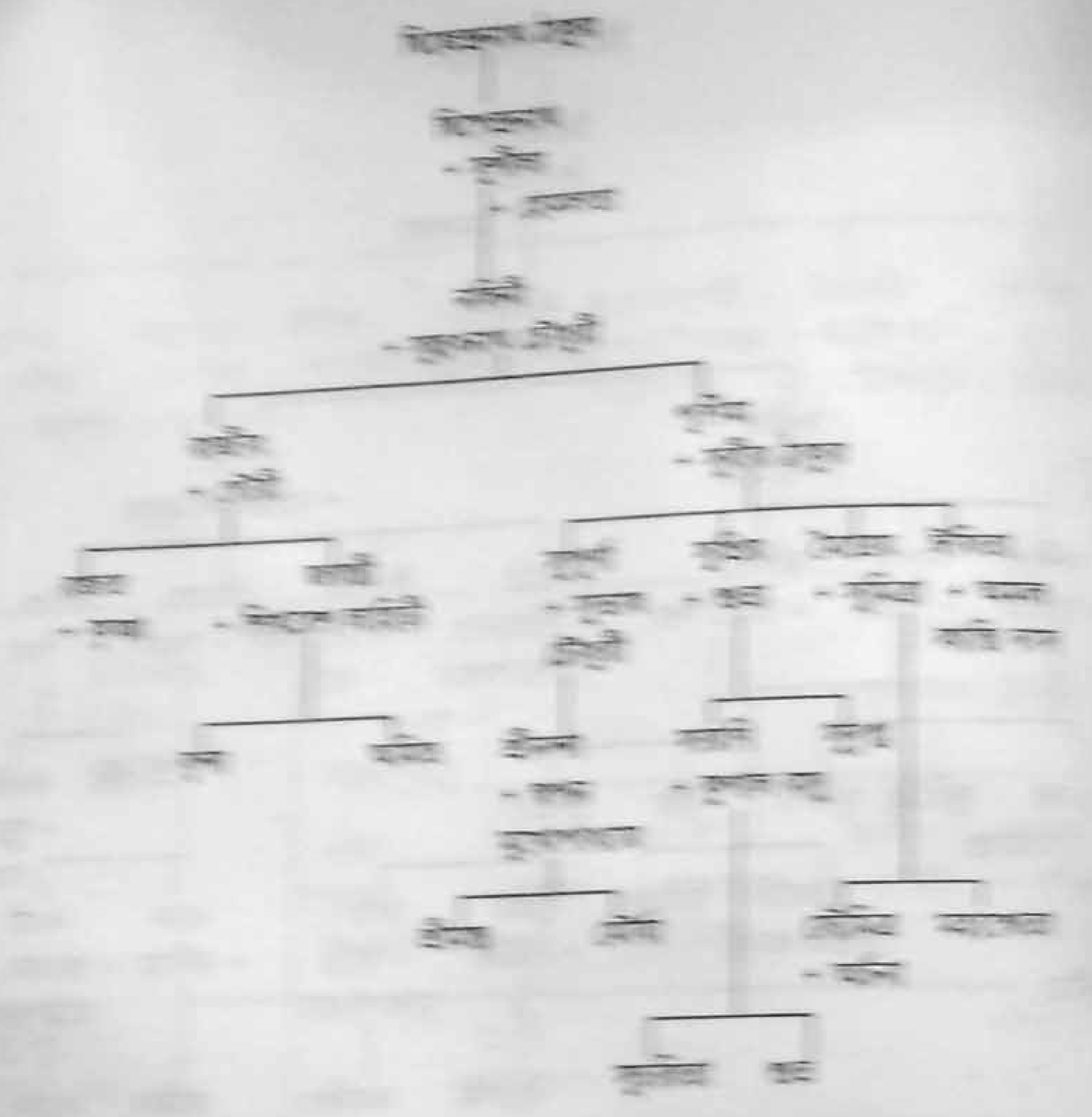

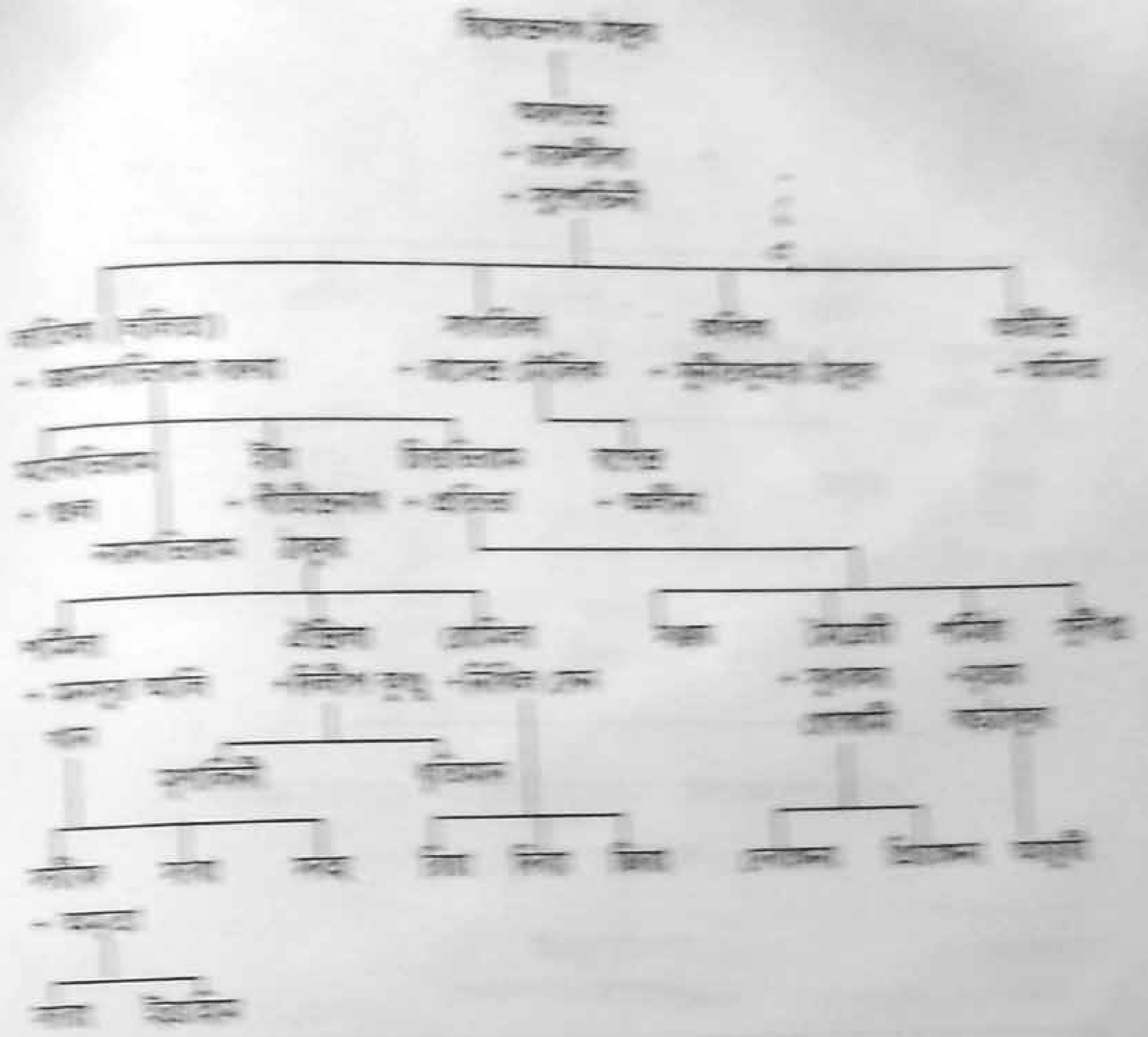

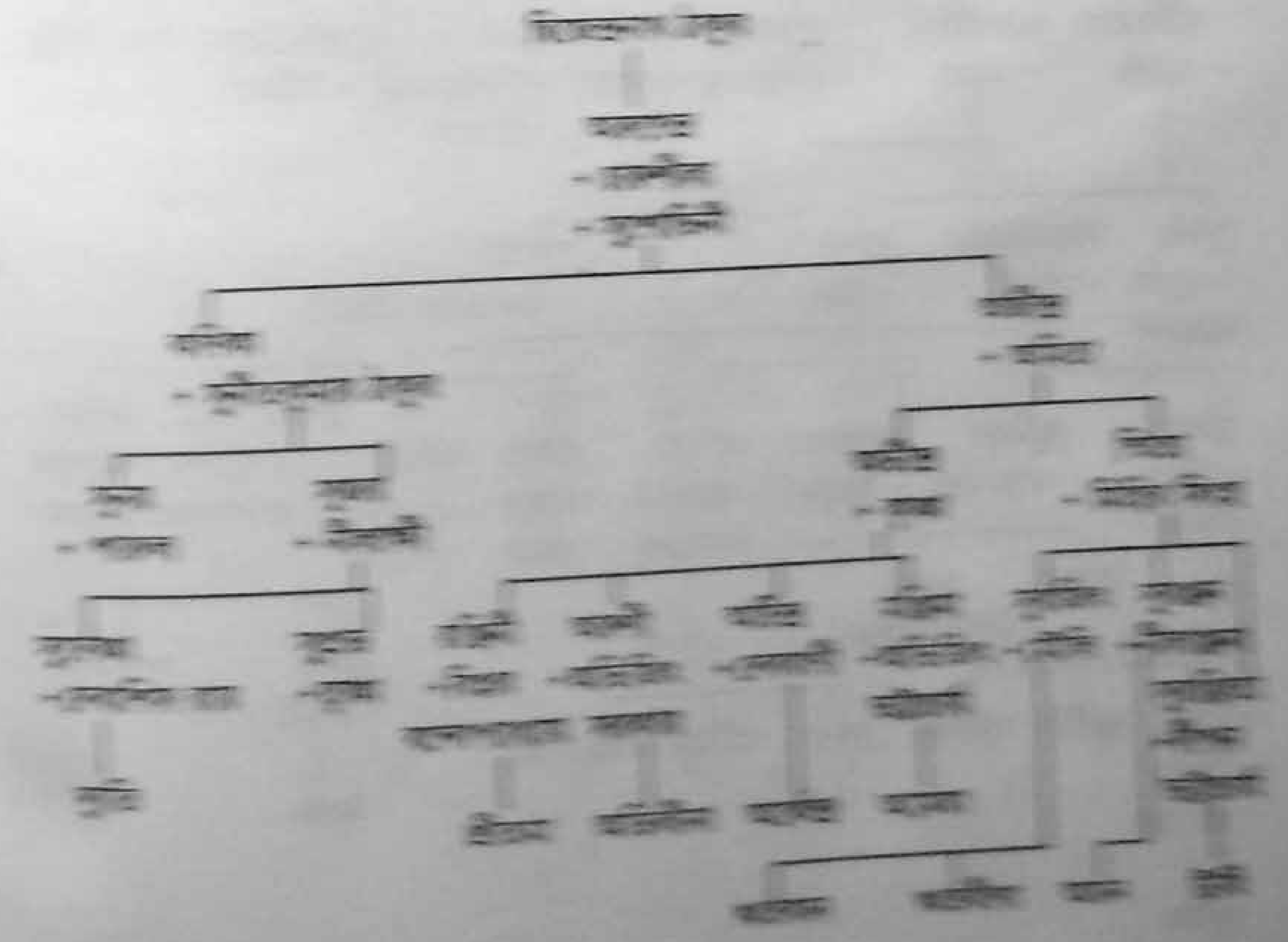

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

- সুধীন্দ্র + চারুবালা
  - রমা + গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
    - প্রসূন
  - এণা + রাজেন্দ্রচন্দ্র রায়
    - রণেন্দ্র
    - কৃষ্ণা + জাঁ রিবুঁ
      - ক্রিস্টফ + সোফী
        - পেনিলোপ (কাবেরী)
        - টমাস (অমিতাভ)
        - রাসেলা (মঞ্জরী)
  - সৌমেন্দ্র + শ্রীমতী
  - স্বরীন্দ্র
  - চিত্রা

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

- সরোজাসুন্দরী + মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়
  - মহীমোহন + প্রকৃতি
    - সুরভি + সুদেব ভট্টাচার্য
      - সুপ্রিয়া + সন্দীপ চৌধুরী
        - সুমিতা + বিজয় চন্দ্র রায়
          - সুনীত
        - সুপ্রীতি
        - সুদীপা
      - সুমিত্রা + তরুণ গুপ্ত
        - সুরঞ্জনা
        - সুপর্ণা + নিখিল আদবানি
    - মনুজমোহন + বন্দনা
      - মনোজিৎ + আঞ্জুম
        - কেয়া
        - মহীনূর
        - প্রিয়ানাজ
      - প্রদীপ্তা + সমর সেনগুপ্ত
        - সুমিতা
    - সুদর্শন + রত্না
      - প্রমিতা + গুরু প্রসাদ
      - ঈষিতা + বিক্রম দাশগুপ্ত
  - নয়নমোহন + মমতা
    - সুজাতা + ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য
      - কুণাল
      - ঋতা + সুধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
        - সুগত + কস্তুরী
          - ঈশান
        - সুদেষ্ণা
      - সুসীমা + অশোক সেন
  - শকুন্তলা + দেবব্রত মুখোপাধ্যায়
    - জ্যোতিব্রত
  - সুমনা + নলিনীমোহন ভট্টাচার্য
  - তপনমোহন + উর্মিলা
  - গীতা
  - দীপ্তি

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

- সরোজাসুন্দরী + মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়
  - সুমনা + নলিনীমোহন ভট্টাচার্য
    - অনসূয়া + অজিত লাহিড়ী
    - অনিমা + রাজসিংহ চট্টোপাধ্যায়
      - অনিতা
      - রাজেন
      - অলকা
    - অনিরুদ্ধ
  - তপনমোহন + উর্মিলা
    - ইনা + শৈলেন লাহিড়ী
      - রত্না + অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়
        - অনির্বাণ
    - বাণী + অনিল লাহিড়ী
      - নীলা + বিমল ভট্টাচার্য

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

- উষাবতী + রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়
  - মুরলা + প্রেমাংশু চক্রবর্তী
    - মাধুরী + সুধীর চট্টোপাধ্যায়
      - নীলিমা
      - অনিমা + দিলীপ সরকার
        - অনুপ + প্রতিমা
          - অরুণিমা + অর্জুন
          - দীপ
        - অঞ্জনা + শঙ্কর দাস
          - সুজয়
          - সঞ্জয়
        - অরূপ + শর্মিলা
          - প্রিয়াঙ্কা
      - সুকুমার + আরতি
        - অনুরাধা + সুরঞ্জন দাস
          - অদিতি
          - সুরঞ্জনা
        - সুপ্রকাশ + ইন্দিরা
          - সুমন্ত্র
      - সুবিমল + আলোকণা
        - করুণা + সুব্রত দাশগুপ্ত
          - সুপ্রতীম
        - অনসূয়া + ত্রিলোক গুপ্ত
          - সায়ন্তনী
    - মাধবী + নীতি পাকড়াশী
  - রজতমোহন + উমা + জ্যোৎস্না
  - করুণা + দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়
  - জগৎমোহন + পদ্মিনী

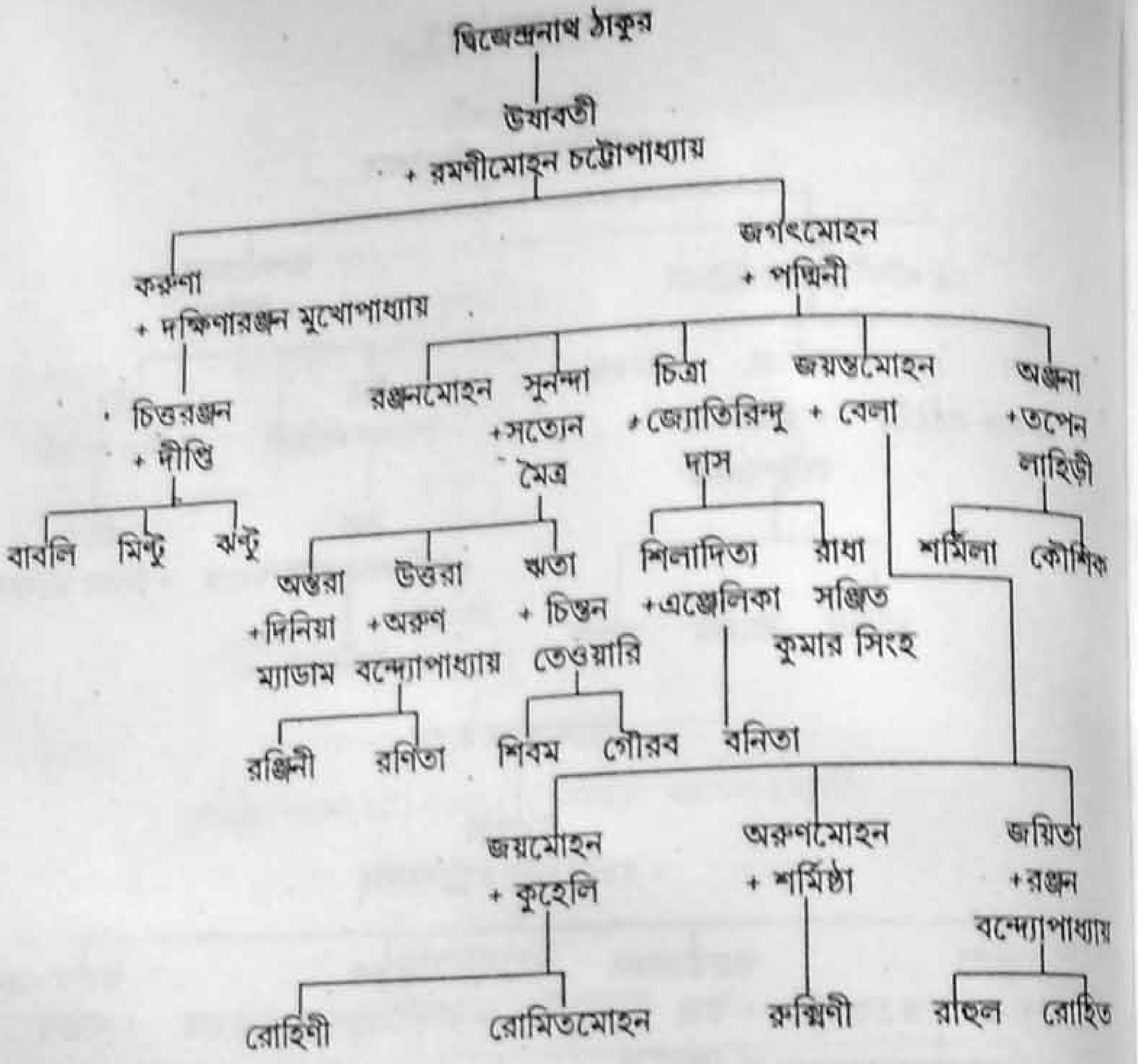

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
উষাবতী
+ রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়
করুণা
+ দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়
জগৎমোহন
+ পদ্মিনী
চিত্তরঞ্জন
+ দীপ্তি
বাবলি
মিন্টু
ঝন্টু
রঞ্জনমোহন
সুনন্দা
+ সত্যেন
মৈত্র
চিত্রা
+ জ্যোতিরিন্দু
দাস
জয়ন্তমোহন
+ বেলা
অঞ্জনা
+ তপেন
লাহিড়ী
অন্তরা
+ দিনিয়া
ম্যাডাম
উত্তরা
+ অরুণ
বন্দ্যোপাধ্যায়
ঋতা
+ চিন্তন
তেওয়ারি
শিলাদিত্য
+ এঞ্জেলিকা
রাধা
সঞ্জিত
কুমার সিংহ
শর্মিলা
কৌশিক
রঞ্জিনী
রনিতা
শিবম
গৌরব
বনিতা
জয়মোহন
+ কুহেলি
অরুণমোহন
+ শর্মিষ্ঠা
জয়িতা
+ রঞ্জন
বন্দ্যোপাধ্যায়
রোহিণী
রোমিতমোহন
রুক্মিণী
রাহুল
রোহিত

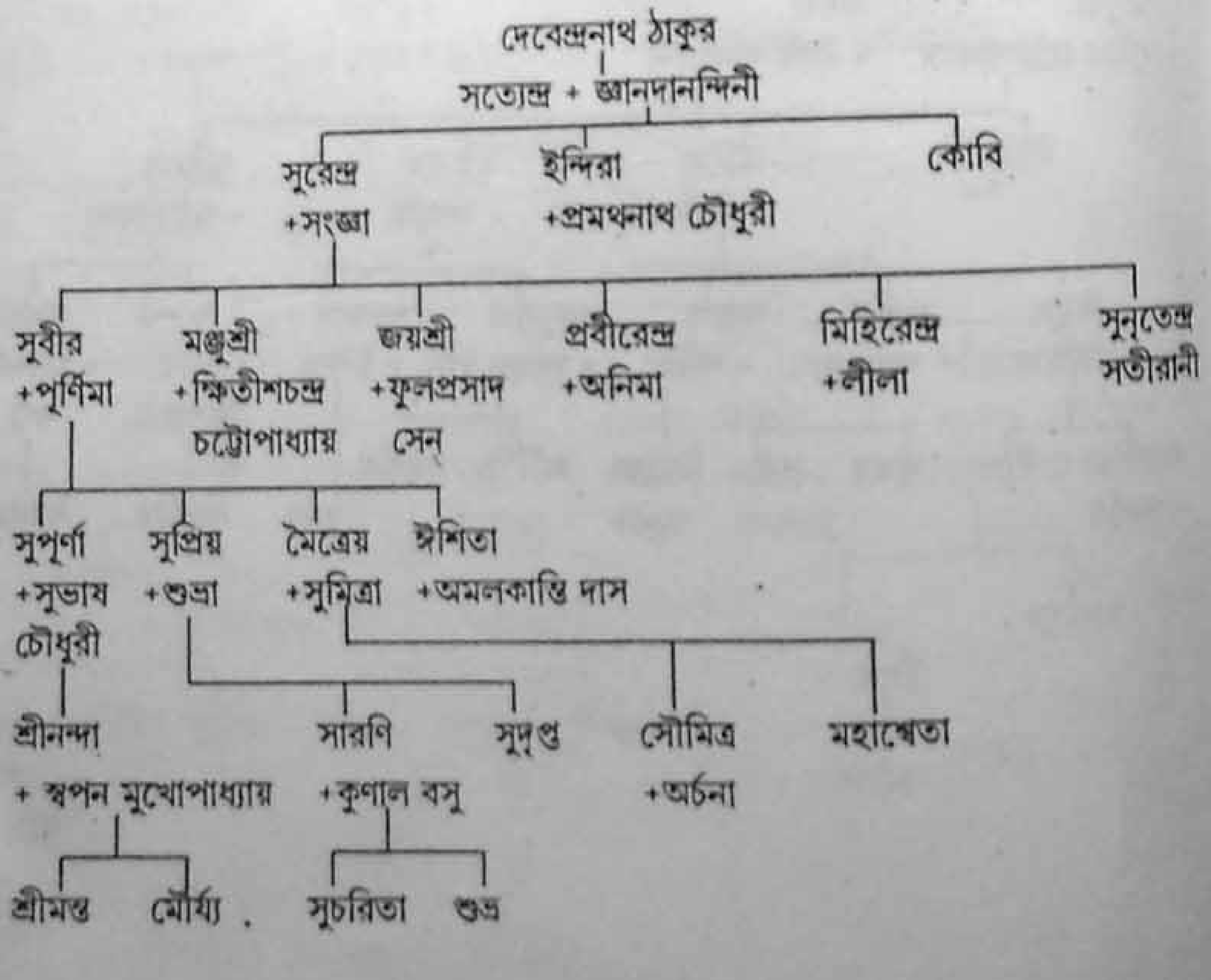

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সত্যেন্দ্র + জ্ঞানদানন্দিনী
সুরেন্দ্র
+ সংজ্ঞা
ইন্দিরা
+ প্রমথনাথ চৌধুরী
কোবি
সুবীর
+ পূর্ণিমা
মঞ্জুশ্রী
+ ক্ষিতীশচন্দ্র
চট্টোপাধ্যায়
জয়শ্রী
+ ফুলপ্রসাদ
সেন
প্রবীরেন্দ্র
+ অনিমা
মিহিরেন্দ্র
+ লীলা
সুনৃতেন্দ্র
সতীরানী
সুপূর্ণা
+ সুভাষ
চৌধুরী
সুপ্রিয়
+ শুভ্রা
মৈত্রেয়
+ সুমিত্রা
ঈশিতা
+ অমলকান্তি দাস
শ্রীনন্দা
+ স্বপন মুখোপাধ্যায়
সারণি
+ কুণাল বসু
সুদৃপ্ত
সৌমিত্র
+ অর্চনা
মহাশ্বেতা
শ্রীমন্ত
মৌর্য্য
সুচরিতা
শুভ্র

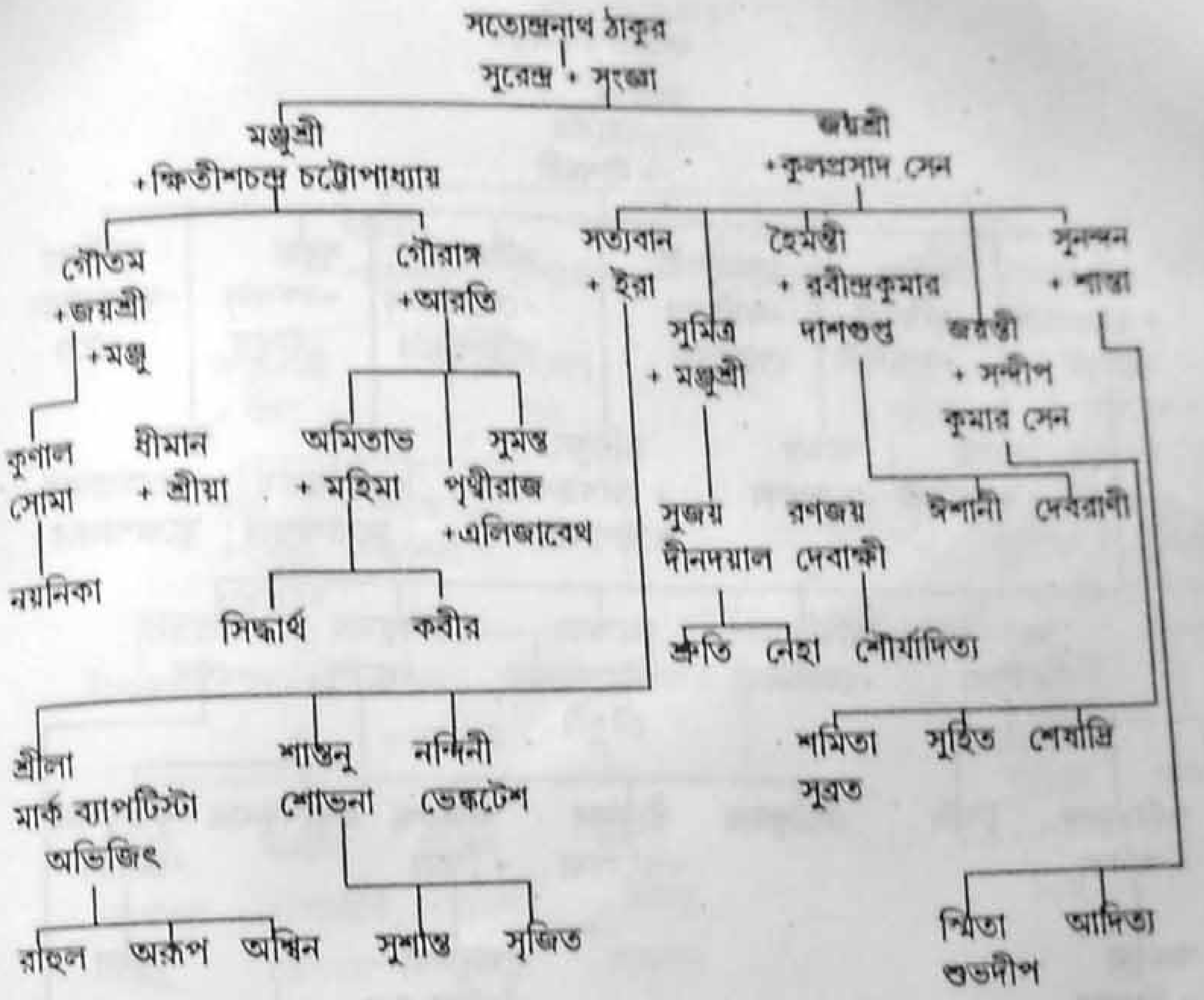

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সুরেন্দ্র + সংজ্ঞা
মঞ্জুশ্রী
+ ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
জয়শ্রী
+ কুলপ্রসাদ সেন
গৌতম
+ জয়শ্রী
+ মঞ্জু
গৌরাঙ্গ
+ আরতি
সত্যবান
+ ইরা
হৈমন্তী
+ রবীন্দ্রকুমার
দাশগুপ্ত
সুনন্দন
+ শান্তা
সুমিত্র
+ মঞ্জুশ্রী
জয়ন্তী
+ সন্দীপ
কুমার সেন
কুণাল
সোমা
ধীমান
+ শ্রীয়া
অমিতাভ
+ মহিমা
সুমন্ত
পৃথ্বীরাজ
+ এলিজাবেথ
নয়নিকা
সিদ্ধার্থ
কবীর
সুজয়
দীনদয়াল
রণজয়
দেবাঙ্কী
ঈশানী
দেবরাণী
শ্রুতি
নেহা
শৌর্যাদিত্য
শ্রীলা
মার্ক ব্যাপটিস্টা
অভিজিৎ
শান্তনু
শোভনা
নন্দিনী
ভেঙ্কটেশ
শমিতা
সুব্রত
সুহিত
শেষাদ্রি
রাহুল
অরূপ
অশ্বিন
সুশান্ত
সৃজিত
স্মিতা
শুভদীপ
আদিতা

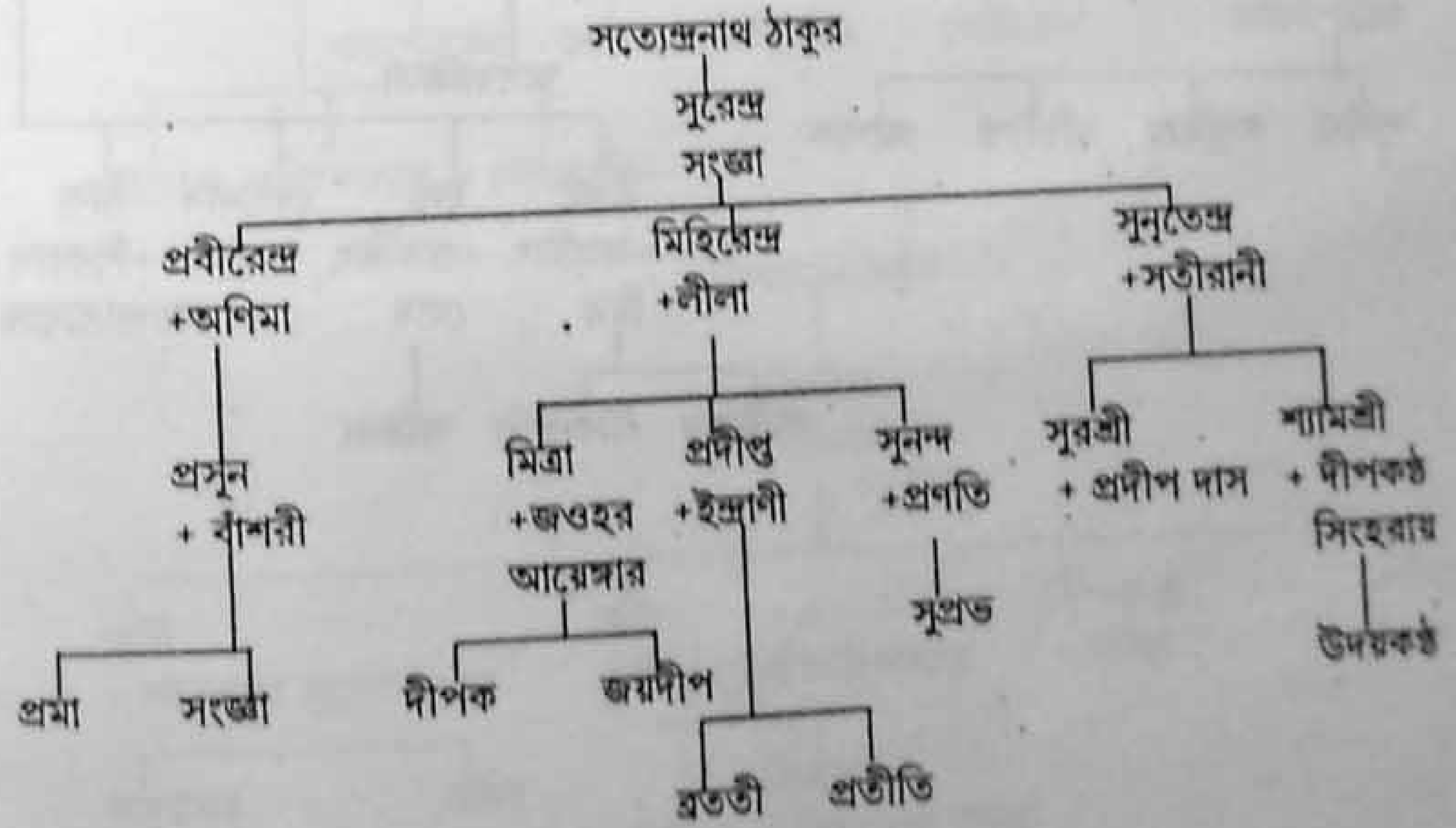

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সুরেন্দ্র
সংজ্ঞা
প্রবীরেন্দ্র
+ অনিমা
মিহিরেন্দ্র
+ লীলা
সুনৃতেন্দ্র
+ সতীরানী
প্রসূন
+ বাঁশরী
মিত্রা
+ জওহর
আয়েঙ্গার
প্রদীপ্ত
+ ইন্দ্রাণী
সুনন্দ
+ প্রণতি
সুরশ্রী
+ প্রদীপ দাস
শ্যামশ্রী
+ দীপকণ্ঠ
সিংহরায়
প্রমা
সংজ্ঞা
দীপক
জয়দীপ
সুপ্রভ
উদয়কণ্ঠ
ব্রততী
প্রতীতি

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

- হেমেন্দ্র + নীপময়ী
  - প্রতিভা + আশুতোষ চৌধুরী
    - আর্যকুমার + লীলা
      - অমিতানন্দ + অনিতা
        - অনসূয়া + কিশোর চট্টোপাধ্যায়
          - পূর্ণিমা
          - মধুমিতা
          - মণিদীপা
          - অশোক
      - টুবলি
    - অশ্বিনীকুমার + ফেলিসিতা
    - অশোকা + উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী
      - সৌরকুমার
      - শ্রীকুমার + আলোমা
      - অনিরুদ্ধ + স্মিতা
        - অনুরাধা + ঋত্বিক গুপ্ত
          - অপরাজিতা
    - শিবকুমার + সুরেণু
      - প্রতাপকুমার
      - কৃষ্ণকুমার + জেরিন
        - কন্যা
    - দেবকুমার + জেন
      - শ্রীলা + অভ্রজিৎ মিত্র
        - অভিজয়
        - প্রীতাঞ্জলি
      - ইলা + শুভজিৎ ঘোষ
        - অদ্রিজা
      - দেবীদাস
      - রীণা + শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
  - ক্ষিতীন্দ্র + ধৃতিমতী + সুহাসিনী
  - হিতেন্দ্র + সরোজিনী
  - প্রজ্ঞাসুন্দরী + লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া
  - ঋতেন্দ্র + অলকা
  - অভিজ্ঞা + দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
  - মনীষা + দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
  - সুনৃতা + নন্দলাল ঘোষাল
  - শোভনা + নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
  - সুষমা + যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
  - সুদক্ষিণা + জ্বালাপ্রসাদ পাণ্ডে

হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর

- হিতেন্দ্র + সরোজিনী
  - গায়ত্রী + প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়
    - প্রবুদ্ধনাথ + বীণা
      - দৃপ্তা + পুষ্কর জোহারি
        - দীপকুমার
        - রাধিকা
      - জয়ন্ত + হ্বলিনা
        - হৃজয় + আয়েষা
        - অন্তর্লীনা
        - রণজয়
    - দ্বারকানাথ + গীতা + ওডেথ
      - অদিতি + তৃণাঞ্জন মিত্র
      - অঞ্জলি + প্যাট্রিক ডেসক্যাম্প
        - মাইকেল
        - নিকোলাস
        - কোয়েরটেন
      - মণিকা + অ্যালেন রিচার্ড
        - অ্যান্টোয়েন
        - ডালিয়া
      - গায়ত্রী + পিটার স্যামসন
        - উইলিয়াম
        - গেব্রিয়েল
  - মেধা + রাজনাথ
  - হৃদিন্দ্র + অমিয়া
    - হৈমেন্দ্র + সুহিতা
      - হিমেন্দ্র + নীতা
        - হিমাদ্রি
    - স্নিগ্ধা + কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
      - সুরোত্তম + শুভশ্রী
        - সীমন্তিনী
      - মীণাক্ষী + অরুণ কাপুর
        - সংযুক্তা + পুলকিত ভিস
        - সুনয়না

হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর

- ক্ষিতীন্দ্র + ধৃতিমতী + সুহাসিনী
  - গার্গী + আনন্দময় মুখোপাধ্যায়
    - অমৃতময় + মন্দিরা
      - রঞ্জিনী + সায়ন দাশগুপ্ত
        - সায়ন্তনী
        - শ্রাবন্তী
      - পদ্মিনী + বিনোদ স্বামী
        - প্রেরণা
    - অর্চনা + দেবদত্ত লাহিড়ী
  - বাণী + শচীন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়
    - গীতাঞ্জলি + শিবপ্রসাদ মল্লিক
      - সুনৃতা + রাকেশ জগতিয়ানি
        - কেশব
        - স্থিতি
      - সুনৃত + জ্যোতি
        - সুনয়ন
        - সৃষ্টি
      - সুবিদ
  - ক্ষেমেন্দ্র + মেনকা
  - ব্রতীন্দ্র

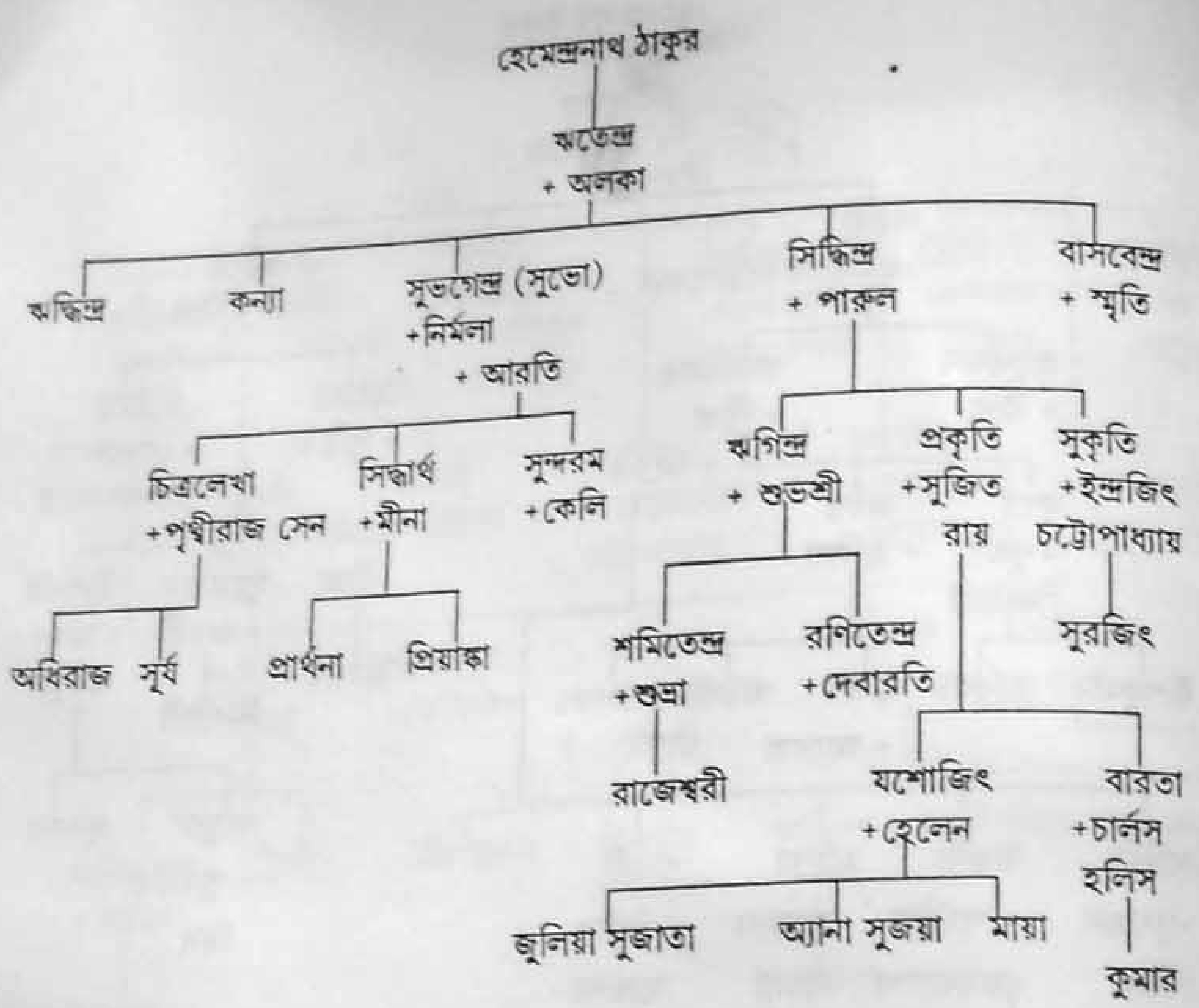
হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর
ঋতেন্দ্র
+ অলকা
ঋদ্ধিন্দ্র
কন্যা
সুভগেন্দ্র (সুভো)
+নির্মলা
+ আরতি
সিদ্ধীন্দ্র
+ পারুল
বাসবেন্দ্র
+ স্মৃতি
চিত্রলেখা
+পৃথ্বীরাজ সেন
সিদ্ধার্থ
+মীনা
সুন্দরম
+কেলি
ঋগিন্দ্র
+ শুভশ্রী
প্রকৃতি
+সুজিত রায়
সুকৃতি
+ইন্দ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায়
অধিরাজ
সূর্য
প্রার্থনা
প্রিয়াঙ্কা
শমিতেন্দ্র
+শুভ্রা
রণিতেন্দ্র
+দেবারতি
সুরজিৎ
রাজেশ্বরী
যশোজিৎ
+হেলেন
বারতা
+চার্লস হলিস
জুলিয়া সুজাতা
অ্যানা সুজয়া
মায়া
কুমার

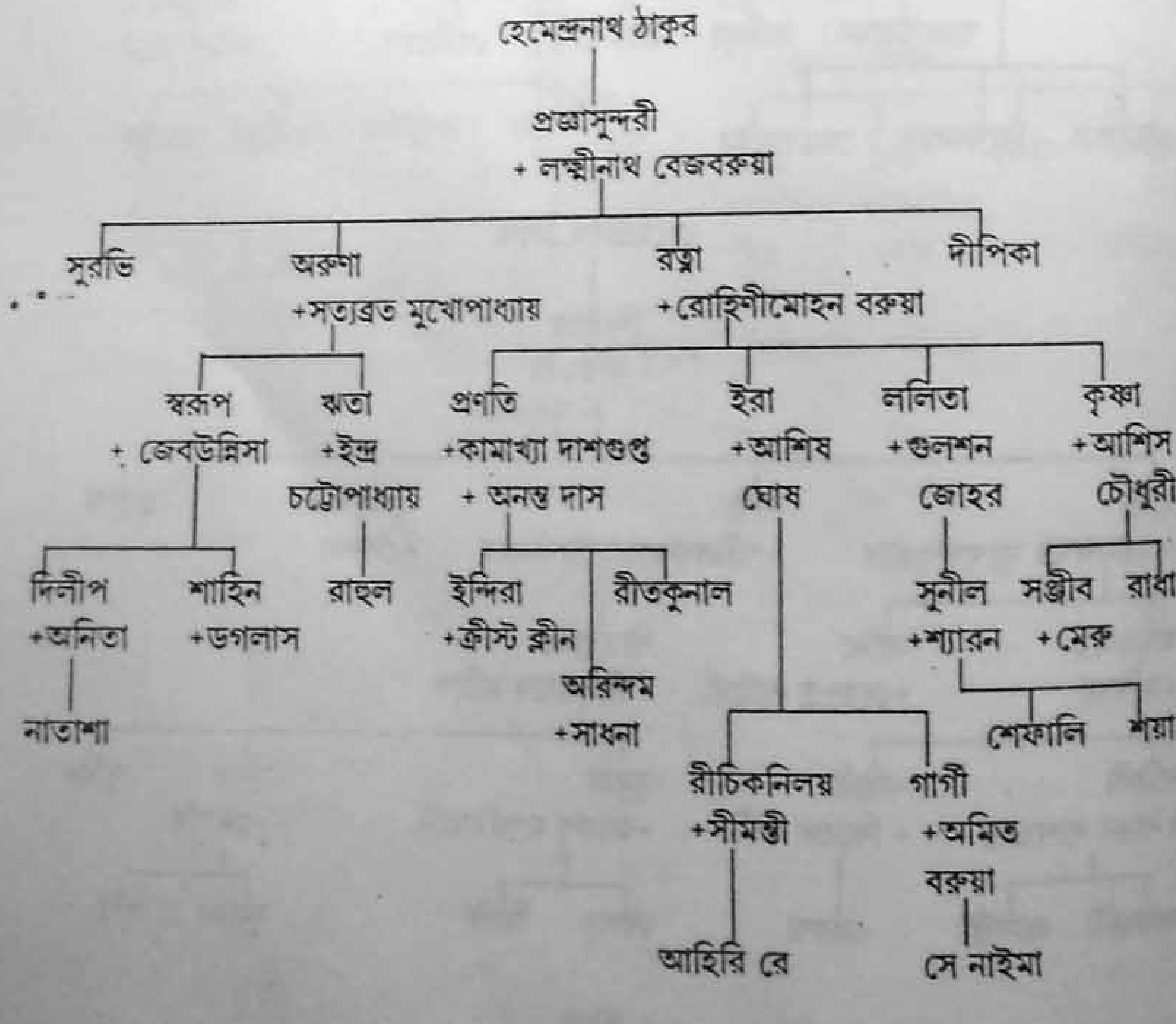
হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রজ্ঞাসুন্দরী
+ লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া
সুরভি
অরুণা
+সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়
রত্না
+রোহিণীমোহন বরুয়া
দীপিকা
স্বরূপ
+ জেবউন্নিসা
ঋতা
+ইন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
প্রণতি
+কামাখ্যা দাশগুপ্ত
+ অনন্ত দাস
ইরা
+আশিষ ঘোষ
ললিতা
+গুলশন জোহর
কৃষ্ণা
+আশিস চৌধুরী
দিলীপ
+অনিতা
শাহিন
+ডগলাস
রাহুল
ইন্দিরা
+ক্রীস্ট ক্লীন
রীতকুনাল
অরিন্দম
+সাধনা
সুনীল
+শ্যারন
সঞ্জীব
+মেরু
রাধা
নাতাশা
শেফালি
শয়া
রীচিকনিলয়
+সীমন্তী
গার্গী
+অমিত বরুয়া
আহিরি রে
সে নাইমা

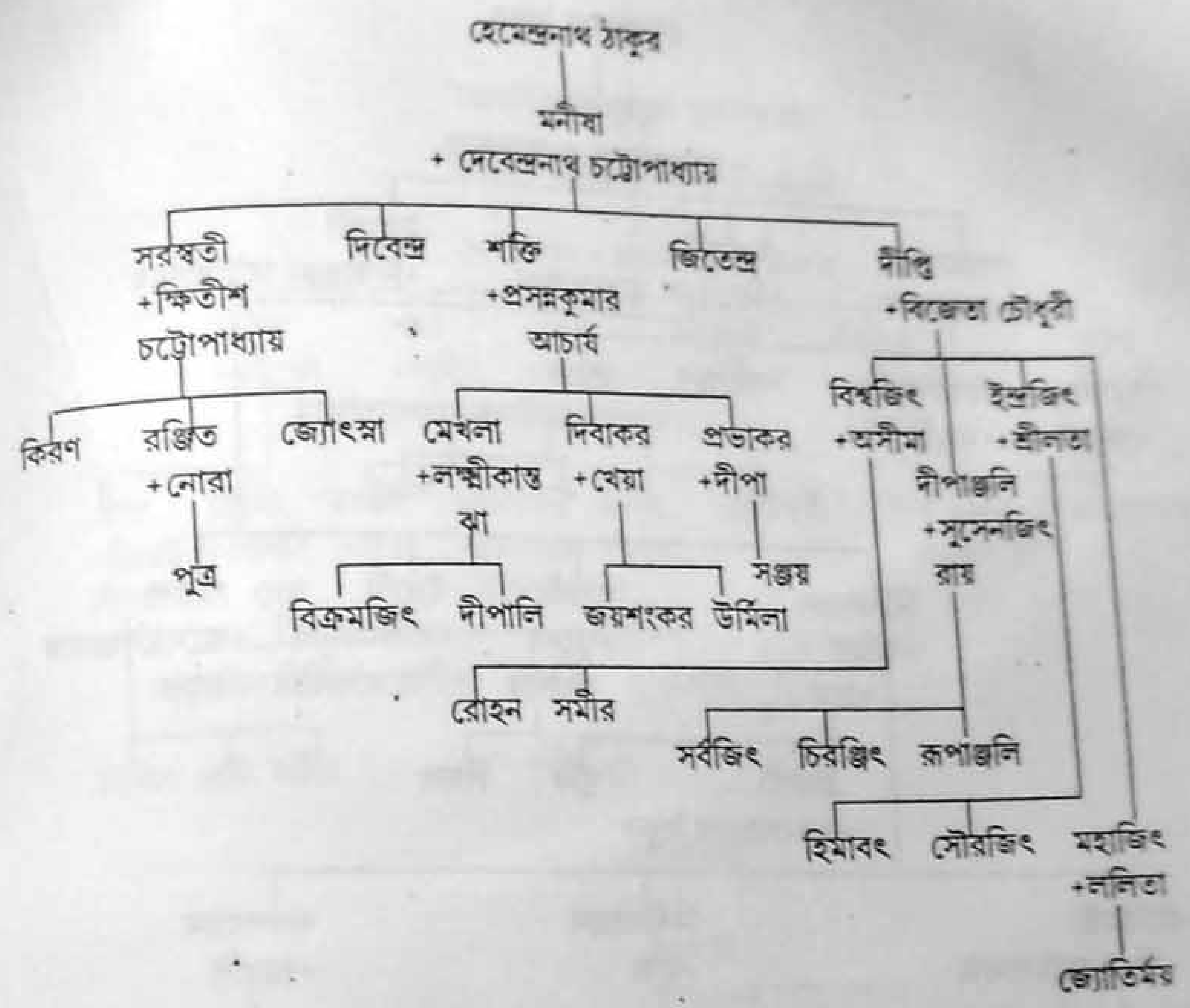
হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর
মনীষা
+ দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সরস্বতী
+ক্ষিতীশ চট্টোপাধ্যায়
দিবেন্দ্র
শক্তি
+প্রসন্নকুমার আচার্য
জিতেন্দ্র
দীপ্তি
+বিজেতা চৌধুরী
কিরণ
রঞ্জিত
+নোরা
জ্যোৎস্না
মেখলা
+লক্ষ্মীকান্ত ঝা
দিবাকর
+খেয়া
প্রভাকর
+দীপা
বিশ্বজিৎ
+অসীমা
ইন্দ্রজিৎ
+শ্রীলতা
দীপাঞ্জলি
+সুসেনজিৎ রায়
পুত্র
বিক্রমজিৎ
দীপালি
জয়শংকর
উর্মিলা
সঞ্জয়
রোহন
সমীর
সর্বজিৎ
চিরজিৎ
রূপাঞ্জলি
হিমাবৎ
সৌরজিৎ
মহাজিৎ
+ললিতা
জ্যোতির্ময়

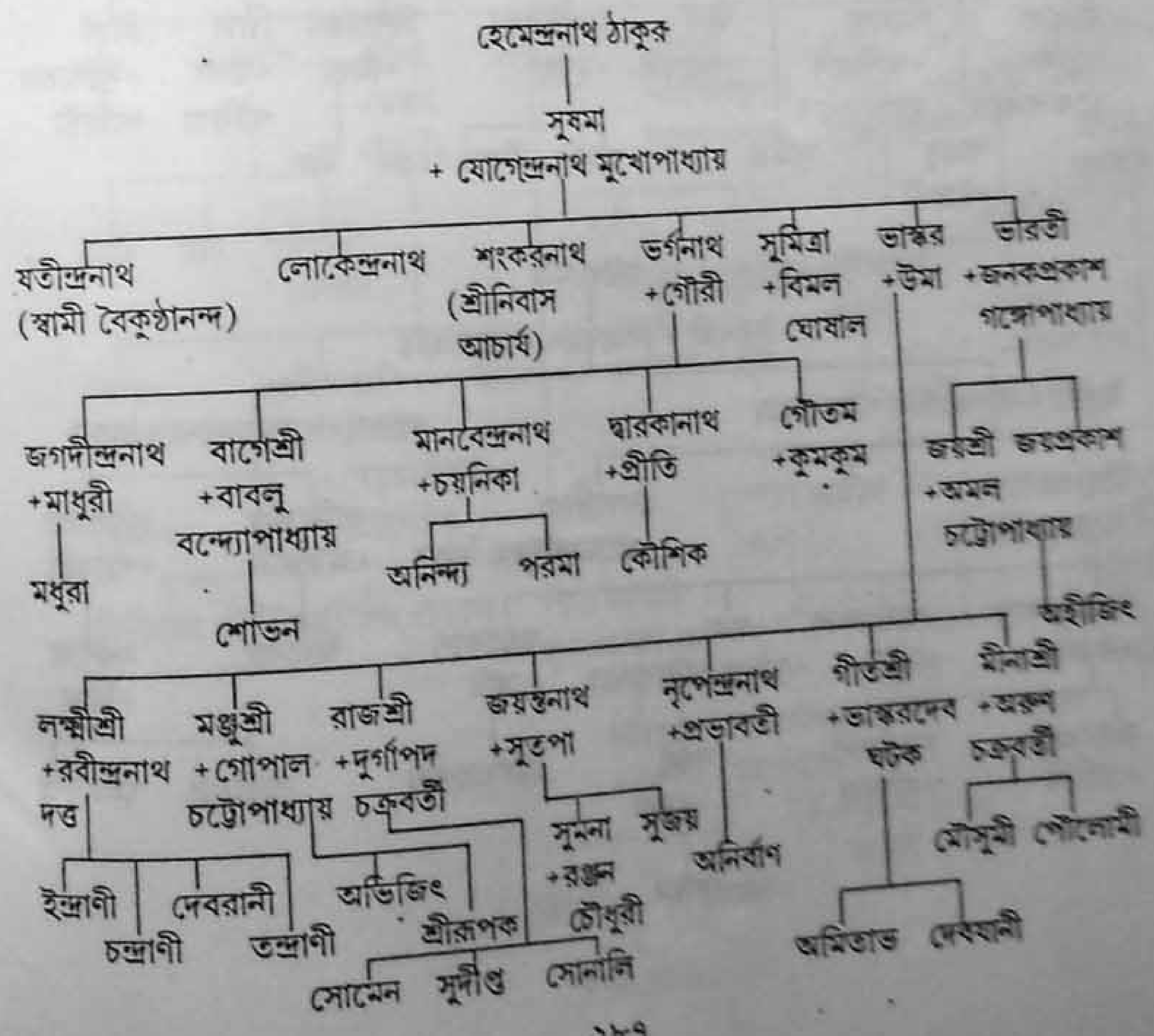
হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সুষমা
+ যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
যতীন্দ্রনাথ
(স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দ)
লোকেন্দ্রনাথ
শংকরনাথ
(শ্রীনিবাস আচার্য)
ভর্গনাথ
+গৌরী
সুমিত্রা
+বিমল ঘোষাল
ভাস্কর
+উমা
ভারতী
+জনকপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
জগদীন্দ্রনাথ
+মাধুরী
বাগেশ্রী
+বাবলু বন্দ্যোপাধ্যায়
মানবেন্দ্রনাথ
+চয়নিকা
দ্বারকানাথ
+প্রীতি
গৌতম
+কুমকুম
জয়শ্রী
+অমল চট্টোপাধ্যায়
জয়প্রকাশ
মধুরা
শোভন
অনিন্দ্য
পরমা
কৌশিক
অভীজিৎ
লক্ষ্মীশ্রী
+রবীন্দ্রনাথ দত্ত
মঞ্জুশ্রী
+গোপাল চট্টোপাধ্যায়
রাজশ্রী
+দুর্গাপদ চক্রবর্তী
জয়ন্তনাথ
+সুতপা
নৃপেন্দ্রনাথ
+প্রভাবতী
গীতশ্রী
+ভাস্করদেব ঘটক
মীনাশ্রী
+অরুণ চক্রবর্তী
ইন্দ্রাণী
চন্দ্রাণী
দেবরানী
তন্দ্রাণী
অভিজিৎ
শ্রীরূপক
সুমনা
+রঞ্জন চৌধুরী
সুজয়
অনির্বাণ
মৌসুমী
পৌলোমী
অমিতাভ
দেবযানী
সোমেন
সুদীপ্ত
সোনালি

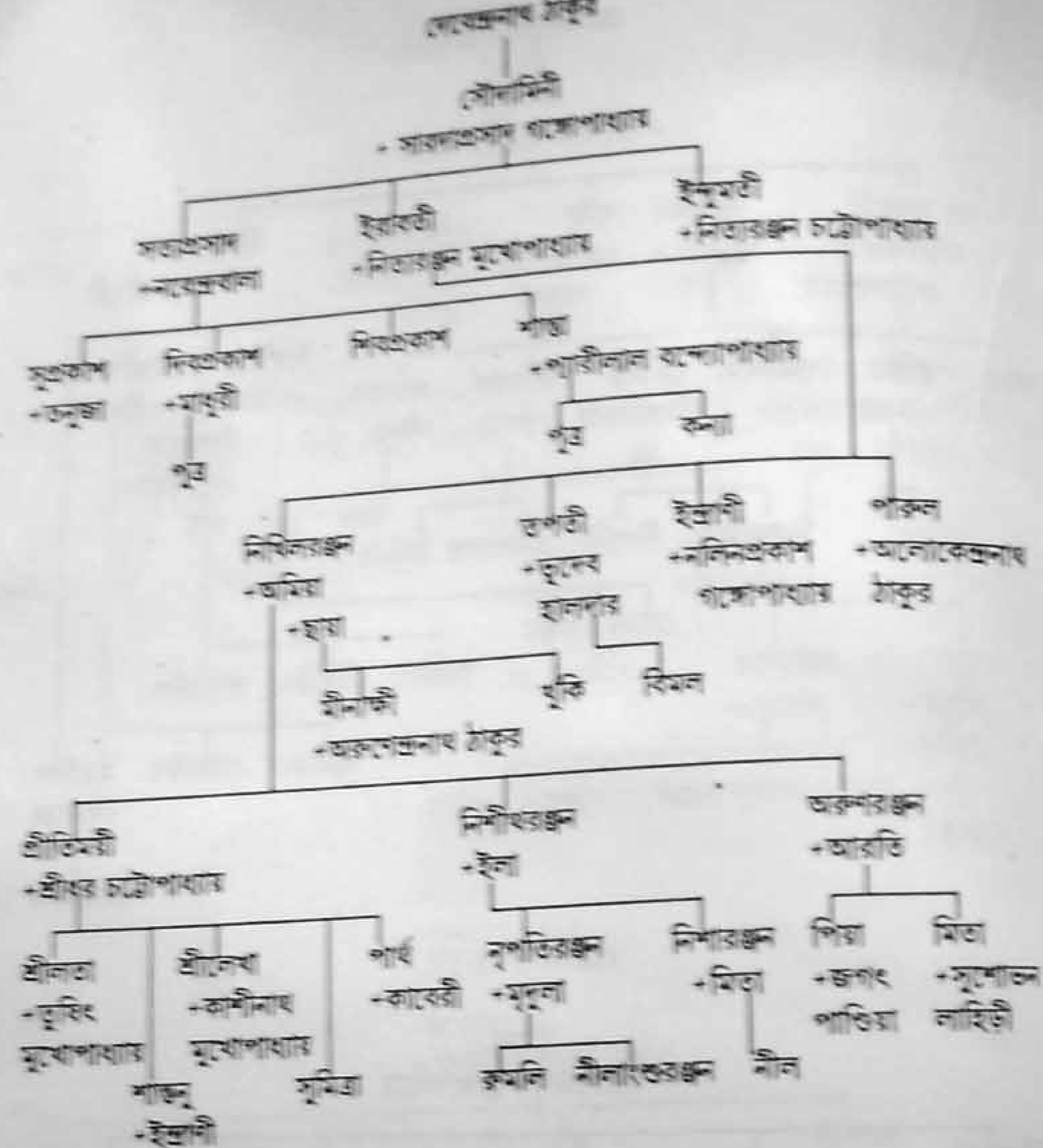
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সৌদামিনী
+ সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
সত্যপ্রসাদ
+নবেন্দ্রবালা
ইরাবতী
+নিত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ইন্দুমতী
+নিত্যরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
সুপ্রকাশ
+তনুজা
দিব্যপ্রকাশ
+মাধুরী
পুত্র
শিবপ্রকাশ
শান্তা
+প্যারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
পুত্র
কন্যা
নিখিলরঞ্জন
+অমিয়া
+ছায়া
তপতী
+ভূপেন
হালদার
ইন্দ্রাণী
+নলিনপ্রকাশ
গঙ্গোপাধ্যায়
পারুল
+অলোকেন্দ্রনাথ
ঠাকুর
মীনাক্ষী
+অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর
খুকি
বিমল
প্রীতিময়ী
+শ্রীধর চট্টোপাধ্যায়
নিশীথরঞ্জন
+ইলা
অরুণরঞ্জন
+আরতি
শ্রীলতা
+তুহিন
মুখোপাধ্যায়
শান্তনু
+ইন্দ্রাণী
শ্রীলেখা
+কাশীনাথ
মুখোপাধ্যায়
সুমিত্রা
পার্থ
+কাবেরী
নৃপতিরঞ্জন
+মৃদুলা
কমলি
নীলাংশুরঞ্জন
নিশারঞ্জন
+মিতা
নীল
পিয়া
+জগৎ
পাতিয়া
মিতা
+সুশোভন
লাহিড়ী

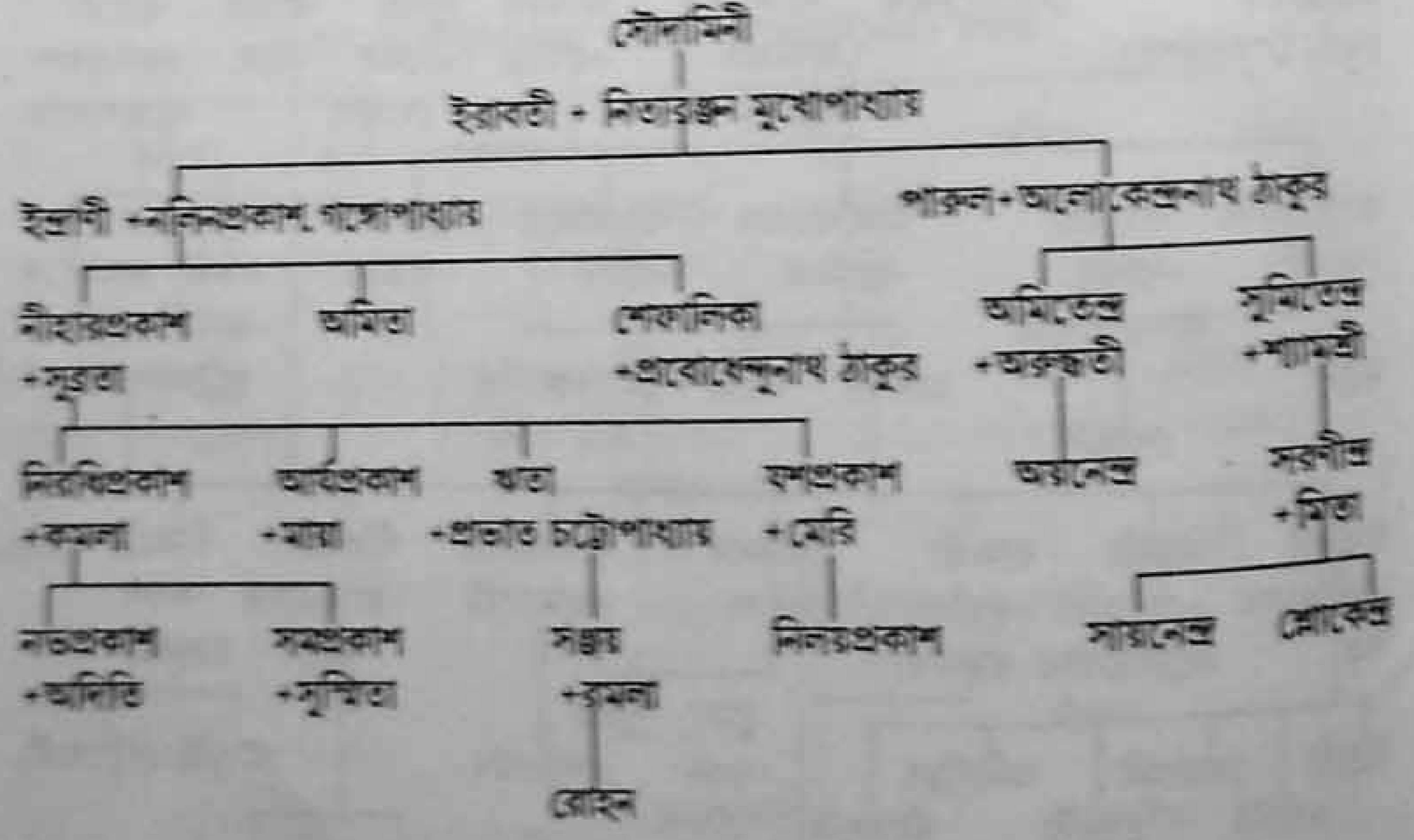
সৌদামিনী
ইরাবতী + নিত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ইন্দ্রাণী +নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
পারুল+ অলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুর
নীহারপ্রকাশ
+সুব্রতা
অমিতা
শেফালিকা
+প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর
অমিতেন্দ্র
+অরুন্ধতী
অয়নেন্দ্র
সুমিতেন্দ্র
+শ্যামশ্রী
সবনীন্দ্র
+মিতা
সায়নেন্দ্র
শ্রোকেন্দ্র
নিরঞ্জিপ্রকাশ
+কমলা
নভপ্রকাশ
+অদিতি
সমপ্রকাশ
+সুস্মিতা
আর্যপ্রকাশ
+মায়া
ঋতা
+প্রভাত চট্টোপাধ্যায়
সঞ্জয়
+রমলা
রোহন
যশপ্রকাশ
+মেরি
নিলয়প্রকাশ

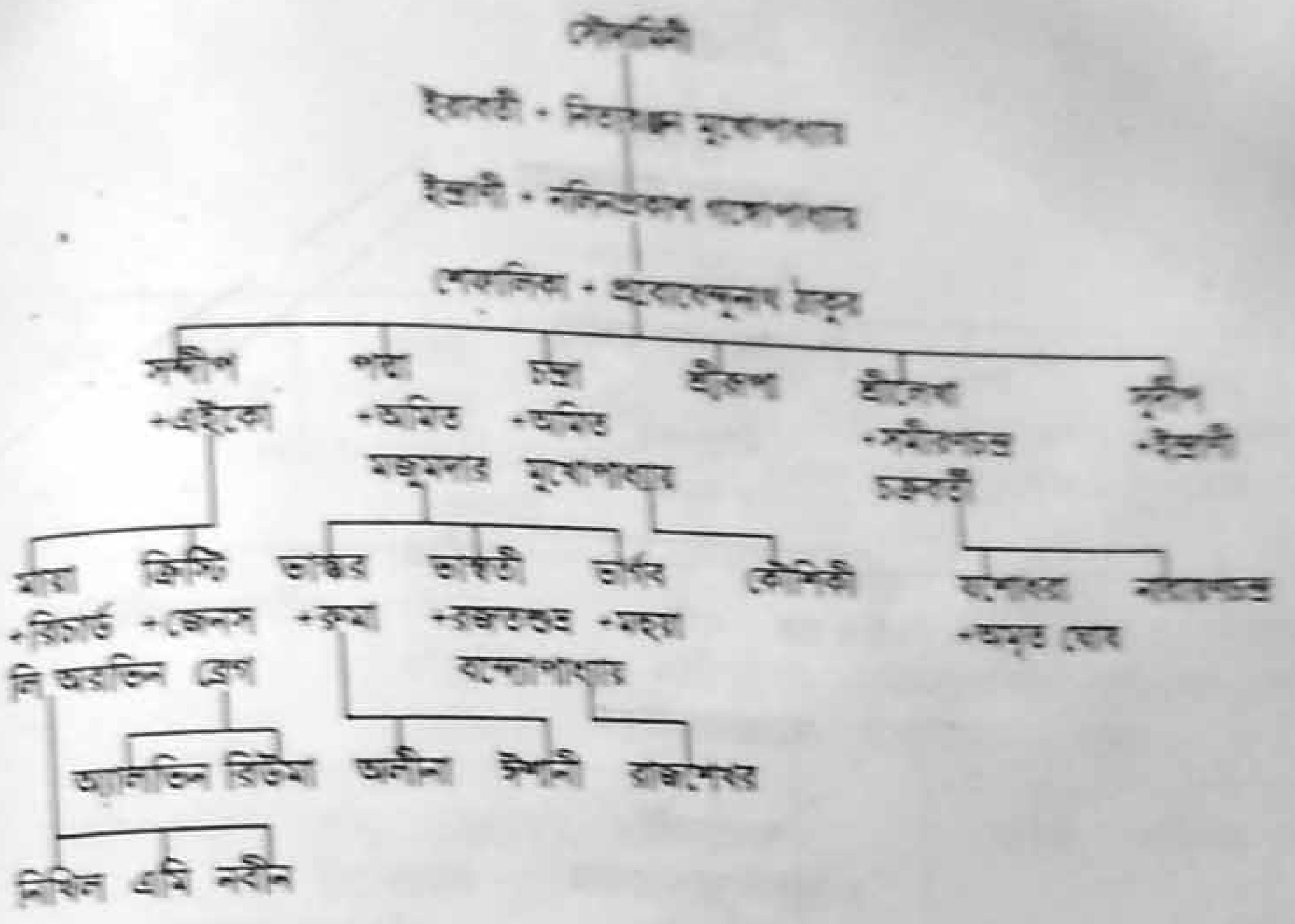
সৌদামিনী
ইরাবতী + নিত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ইন্দ্রাণী + নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
শেফালিকা + প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর
সন্দীপ
+এইকো
পদ্মা
+অমিত
মজুমদার
চন্দ্রা
+অমিত
মুখোপাধ্যায়
শ্রীরূপা
শ্রীলেখা
+সমীরণচন্দ্র
চক্রবর্তী
সুদীপ
+ইন্দ্রাণী
মায়া
+রিচার্ড
লি অরতিন
ক্রিস্টি
+জেনস
ব্রেগ
অ্যানতিন
রিতিমা
ভাস্কর
+রুমা
অলীনা
ঈশানী
ভাস্বতী
+রজতশুভ্র
বন্দ্যোপাধ্যায়
রাজশেখর
ভার্গব
+মহুয়া
কৌশিকী
যশোধরা
+অমৃত ঘোষ
নারায়ণচন্দ্র
নিখিল
এমি
নবীন

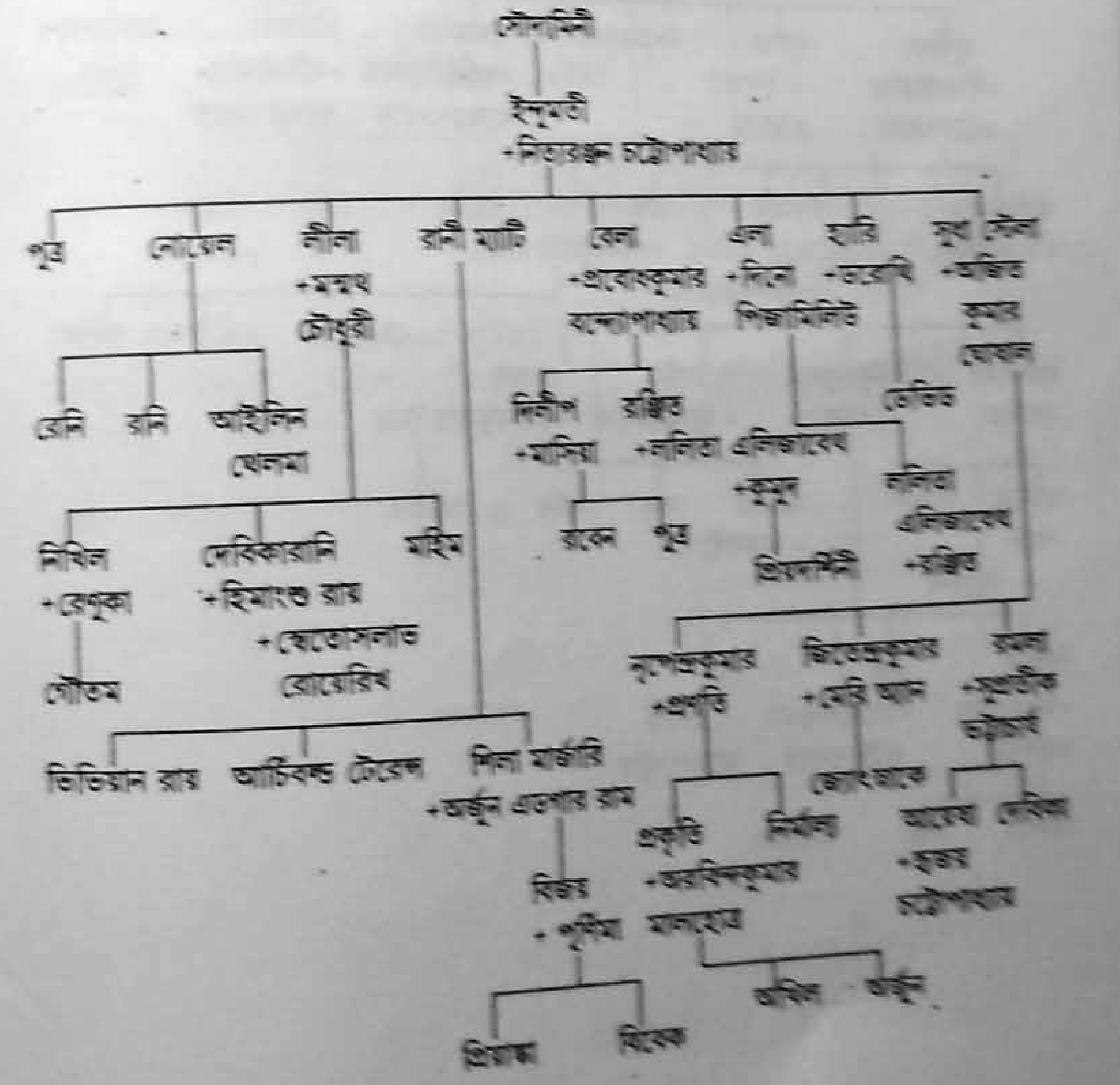
সৌদামিনী
ইন্দুমতী
+নিত্যরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
পুত্র
নোয়েল
রেনি
রানি
আইলিন
থেলমা
নীলা
+মন্মথ
চৌধুরী
নিখিল
+রেণুকা
গৌতম
দেবিকারানি
+হিমাংশু রায়
+যেতোসলাভ
রোয়েরিখ
মহিম
রানী মাটি
ভিভিয়ান রায়
আর্চিবল্ড টেডেল
শিলা মার্জারি
+অর্জুন এডগার রাম
বিজয়
+ পূর্ণিমা
প্রিয়াঙ্কা
বিবেক
বেলা
+প্রবোধকুমার
বন্দ্যোপাধ্যায়
দিলীপ
+মালিয়া
রাকেশ
পুত্র
রঞ্জিত
+ললিতা
এলা
+দিনো
পিজামিলিটি
এলিজাবেথ
+কুমুদ
প্রিয়দর্শিনী
হাসি
+ডরোথি
ডেভিড
ললিতা
এলিজাবেথ
+রঞ্জিত
সুধা সৈলা
+অজিত
কুমার
ঘোষাল
নৃপেন্দ্রকুমার
+প্রগতি
প্রকৃতি
+অরবিন্দকুমার
মালহোত্র
নির্মলা
অখিল
অর্জুন
জিতেন্দ্রকুমার
+মেরি অ্যান
জোনাথন
রমলা
+সুপ্রতীক
ভট্টাচার্য
আরেষ
দেবিকা
+শুভ্র
চট্টোপাধ্যায়

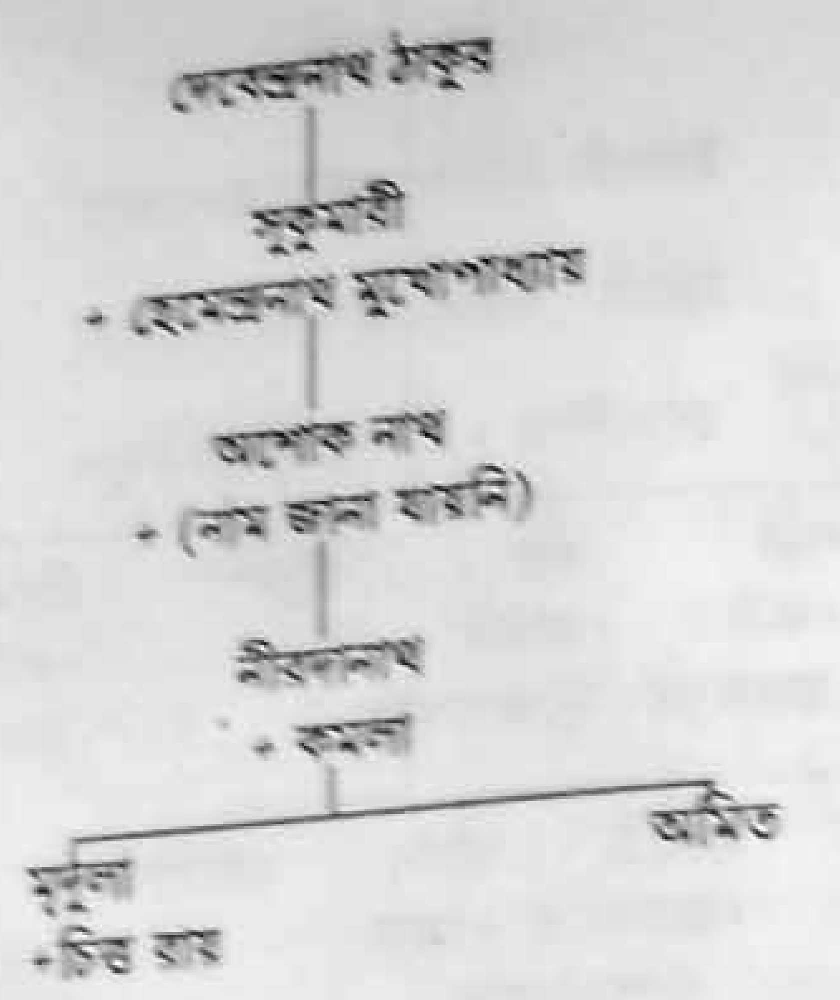
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সুকুমারী
+ হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
অশোক নাথ
+ (নাম জানা যায়নি)
নীরদনাথ
+ কমলা
মৃদুলা
+চিত্ত রায়
অমিত

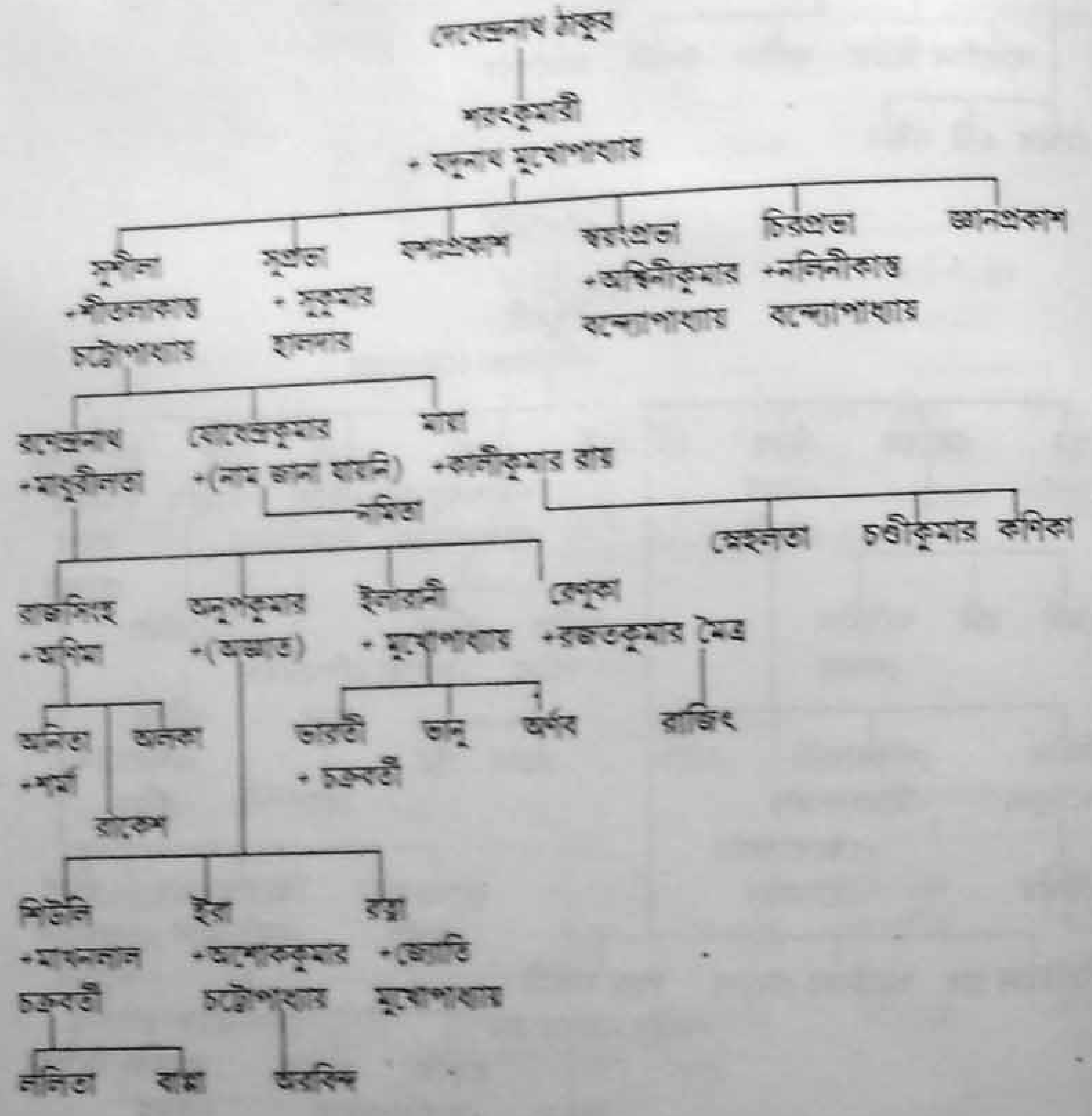
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শরৎকুমারী
+ যদুনাথ মুখোপাধ্যায়
সুশীলা
+শীতলাকান্ত
চট্টোপাধ্যায়
সুপ্রভা
+ সুকুমার
হালদার
যশঃপ্রকাশ
স্বর্ণপ্রভা
+অশ্বিনীকুমার
বন্দ্যোপাধ্যায়
চিরপ্রভা
+নলিনীকান্ত
বন্দ্যোপাধ্যায়
জ্ঞানপ্রকাশ
রমেন্দ্রনাথ
+মাধুরীলতা
যোগেন্দ্রকুমার
+(নাম জানা যায়নি)
নমিতা
মায়া
+কালীকুমার রায়
স্নেহলতা
চণ্ডীকুমার
কণিকা
রাজসিংহ
+অণিমা
অনুপকুমার
+(অজ্ঞাত)
ইলারানী
+ মুখোপাধ্যায়
রেণুকা
+রজতকুমার মৈত্র
অনিতা
+শর্মা
অলকা
রাকেশ
ভারতী
+ চক্রবর্তী
ভানু
অর্ণব
রাজিৎ
শিউলি
+মাখনলাল
চক্রবর্তী
ইরা
+অশোককুমার
চট্টোপাধ্যায়
রত্না
+জ্যোতি
মুখোপাধ্যায়
ললিতা
বাপ্পা
অরবিন্দ

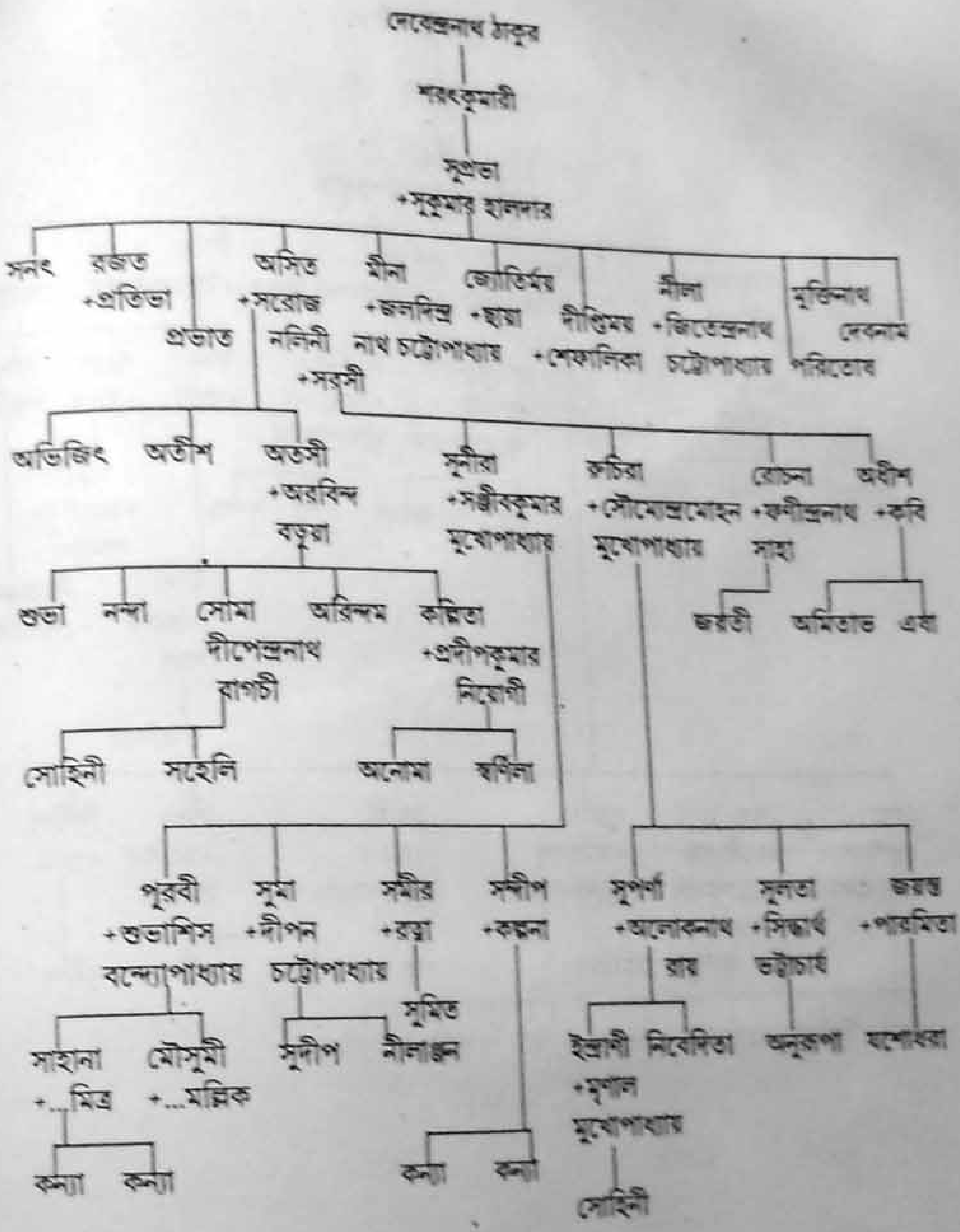
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শরৎকুমারী
সুপ্রভা
+সুকুমার হালদার
সনৎ
রজত
+প্রতিভা
প্রভাত
অসিত
+সরোজ
নলিনী
+সরসী
মীনা
+জলদিন্দ্র
নাথ চট্টোপাধ্যায়
জ্যোতির্ময়
+ছায়া
দীপ্তিময়
+শেফালিকা
নীলা
+জিতেন্দ্রনাথ
চট্টোপাধ্যায়
মুক্তিনাথ
পরিতোষ
দেবনাম
অভিজিৎ
অতীশ
অতসী
+অরবিন্দ
বড়ুয়া
সুনীরা
+সঞ্জীবকুমার
মুখোপাধ্যায়
রুচিরা
+সৌমেন্দ্রমোহন
মুখোপাধ্যায়
রোচনা
+ফণীন্দ্রনাথ
সাহা
অধীশ
+কবি
জয়তী
অমিতাভ
এষা
শুভা
নন্দা
সোমা
দীপেন্দ্রনাথ
বাগচী
অরিন্দম
কল্পিতা
+প্রদীপকুমার
নিয়োগী
সোহিনী
সহেলি
অনোমা
স্বপ্নিলা
পূরবী
+শুভাশিস
বন্দ্যোপাধ্যায়
সুমা
+দীপন
চট্টোপাধ্যায়
সমীর
+রত্না
সুমিত
সন্দীপ
+কল্পনা
সুপর্ণা
+অলোকনাথ
রায়
সুলতা
+সিদ্ধার্থ
ভট্টাচার্য
জয়ন্ত
+পারমিতা
সাহানা
+...মিত্র
মৌসুমী
+...মল্লিক
সুদীপ
নীলাঞ্জন
কন্যা
কন্যা
কন্যা
কন্যা
ইন্দ্রাণী
+মৃণাল
মুখোপাধ্যায়
সোহিনী
নিবেদিতা
অনুরূপা
যশোধরা

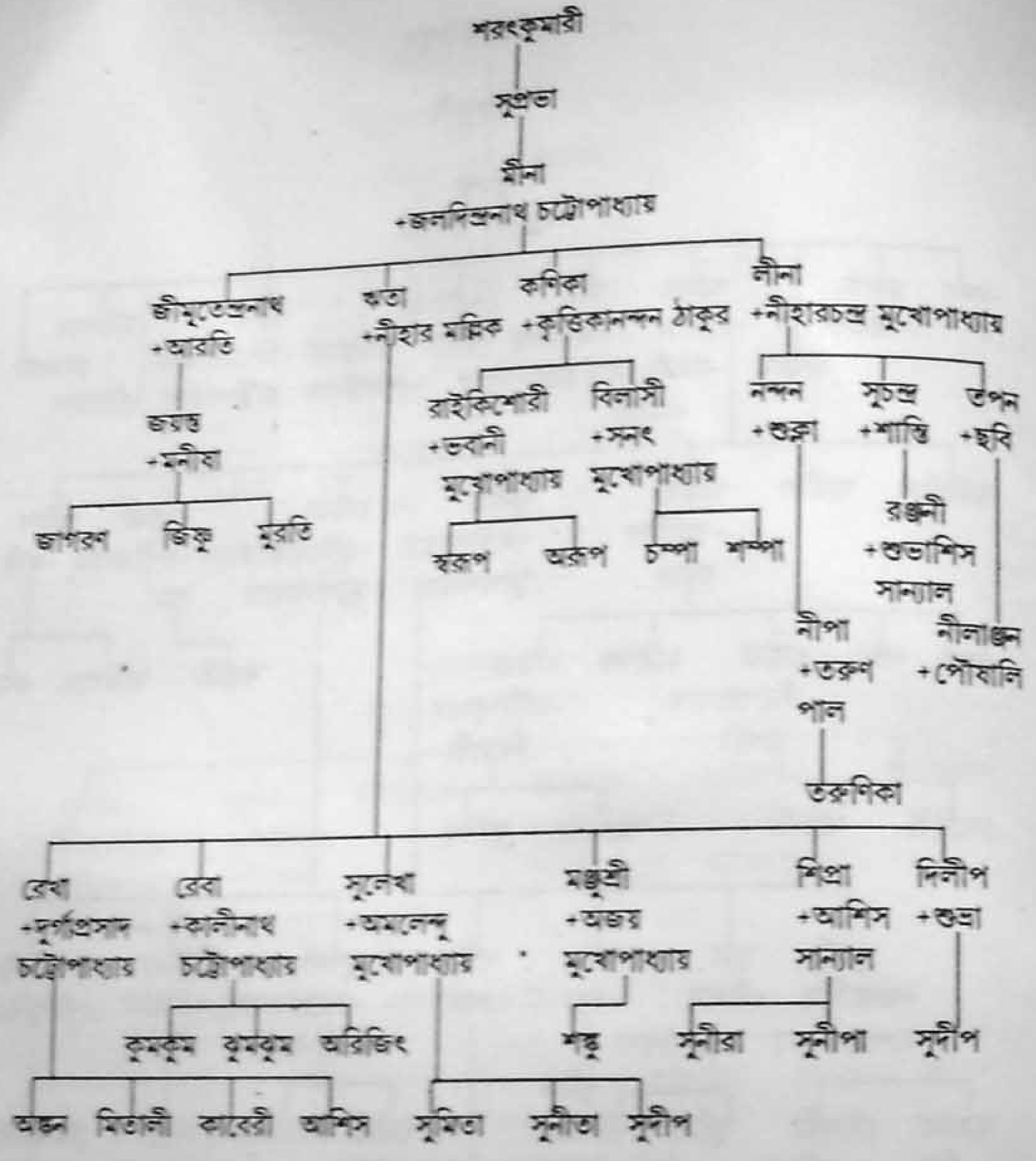
শরৎকুমারী
সুপ্রভা
মীনা
+জলদিন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
জীমূতেন্দ্রনাথ
+আরতি
ঋতা
+নীহার মল্লিক
কণিকা
+কৃত্তিকানন্দন ঠাকুর
লীনা
+নীহারচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
জয়ন্ত
+মনীষা
জাগরণ
জিষ্ণু
মুরতি
রাইকিশোরী
+ভবানী
মুখোপাধ্যায়
বিলাসী
+সনৎ
মুখোপাধ্যায়
স্বরূপ
অরূপ
চম্পা
শম্পা
নন্দন
+শুক্লা
সুচন্দ্র
+শান্তি
তপন
+ছবি
রঞ্জনী
+শুভাশিস
সান্যাল
নীপা
+তরুণ
পাল
নীলাঞ্জন
+পৌষালি
তরুণিকা
রেখা
+দুর্গাপ্রসাদ
চট্টোপাধ্যায়
রেবা
+কালীনাথ
চট্টোপাধ্যায়
সুলেখা
+অমলেন্দু
মুখোপাধ্যায়
মঞ্জুশ্রী
+অজয়
মুখোপাধ্যায়
শিপ্রা
+আশিস
সান্যাল
দিলীপ
+শুভা
কুমকুম
ঝুমঝুম
অরিজিৎ
শঙ্খ
সুনীরা
সুনীপা
সুদীপ
অঞ্জন
মিতালী
কাবেরী
অশিস
সুমিতা
সুনীতা
সুদীপ

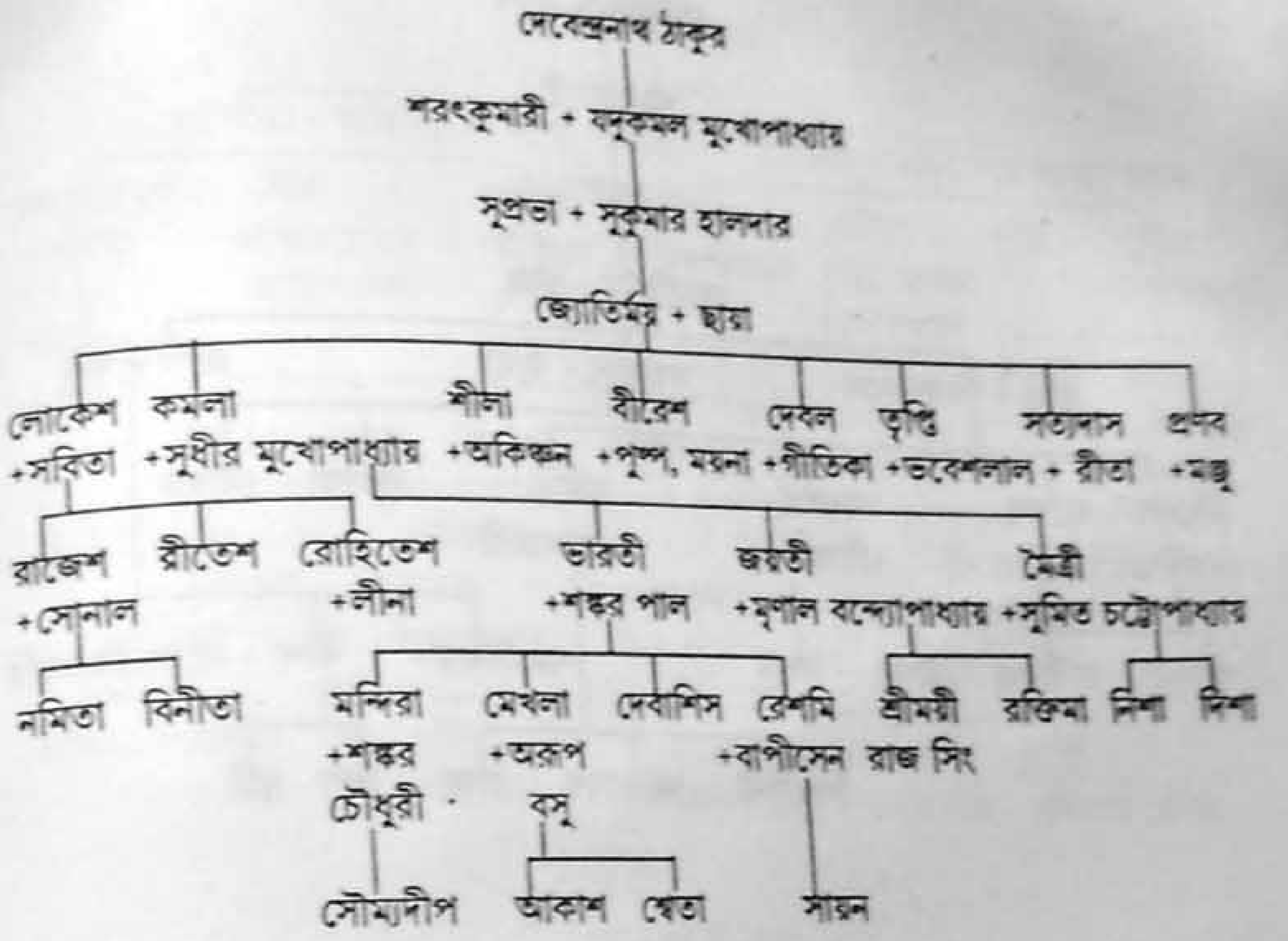
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শরৎকুমারী + যদুকমল মুখোপাধ্যায়
সুপ্রভা + সুকুমার হালদার
জ্যোতির্ময় + ছায়া
লোকেশ
+সবিতা
কমলা
+সুধীর মুখোপাধ্যায়
শীলা
+অকিঞ্চন
বীরেশ
+পুষ্প, ময়না
দেবল
+গীতিকা
তৃপ্তি
+ভবেশলাল
সত্যদাস
+রীতা
প্রণব
+মঞ্জু
রাজেশ
+সোনাল
রীতেশ
রোহিতেশ
+লীনা
ভারতী
+শঙ্কর পাল
জয়তী
+মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়
মৈত্রী
+সুমিত চট্টোপাধ্যায়
নমিতা
বিনীতা
মন্দিরা
+শঙ্কর
চৌধুরী
মেখলা
+অরূপ
বসু
দেবাশিস
রেশমি
+বাপীসেন রাজ সিং
শ্রীময়ী
রক্তিমা
নিশা
দিশা
সৌম্যদীপ
আকাশ
শ্বেতা
সায়ন

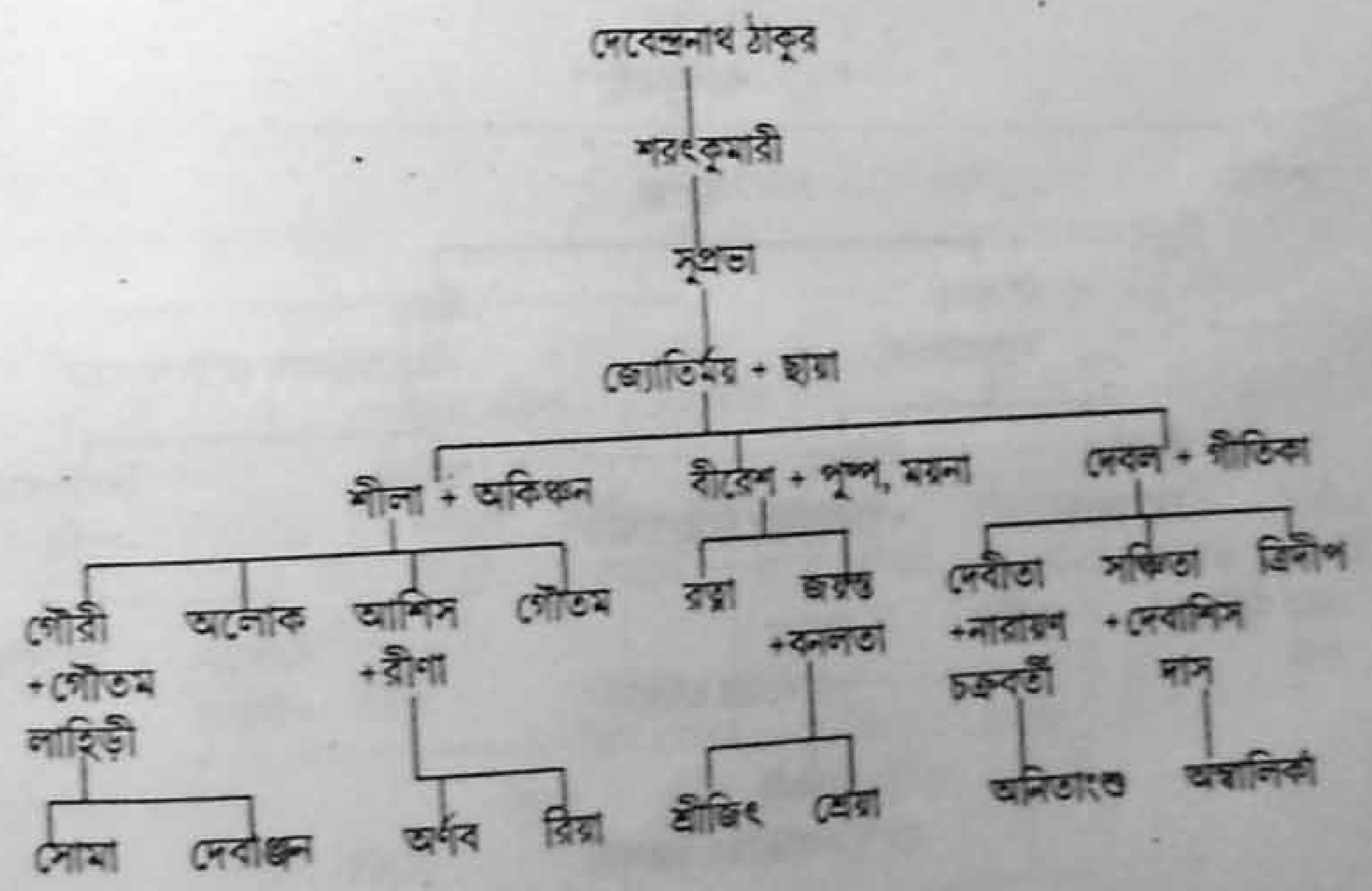
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শরৎকুমারী
সুপ্রভা
জ্যোতির্ময় + ছায়া
শীলা + অকিঞ্চন
বীরেশ + পুষ্প, ময়না
দেবল + গীতিকা
গৌরী
+গৌতম
লাহিড়ী
অলোক
আশিস
+রীণা
গৌতম
রত্না
জয়ন্ত
+কনলতা
দেবীতা
+নারায়ণ
চক্রবর্তী
সঞ্চিতা
+দেবাশিস
দাস
ত্রিদীপ
সোমা
দেবাঞ্জন
অর্ণব
রিয়া
শ্রীজিৎ
শ্রেয়া
অনিতাংশু
অঞ্জলিকা

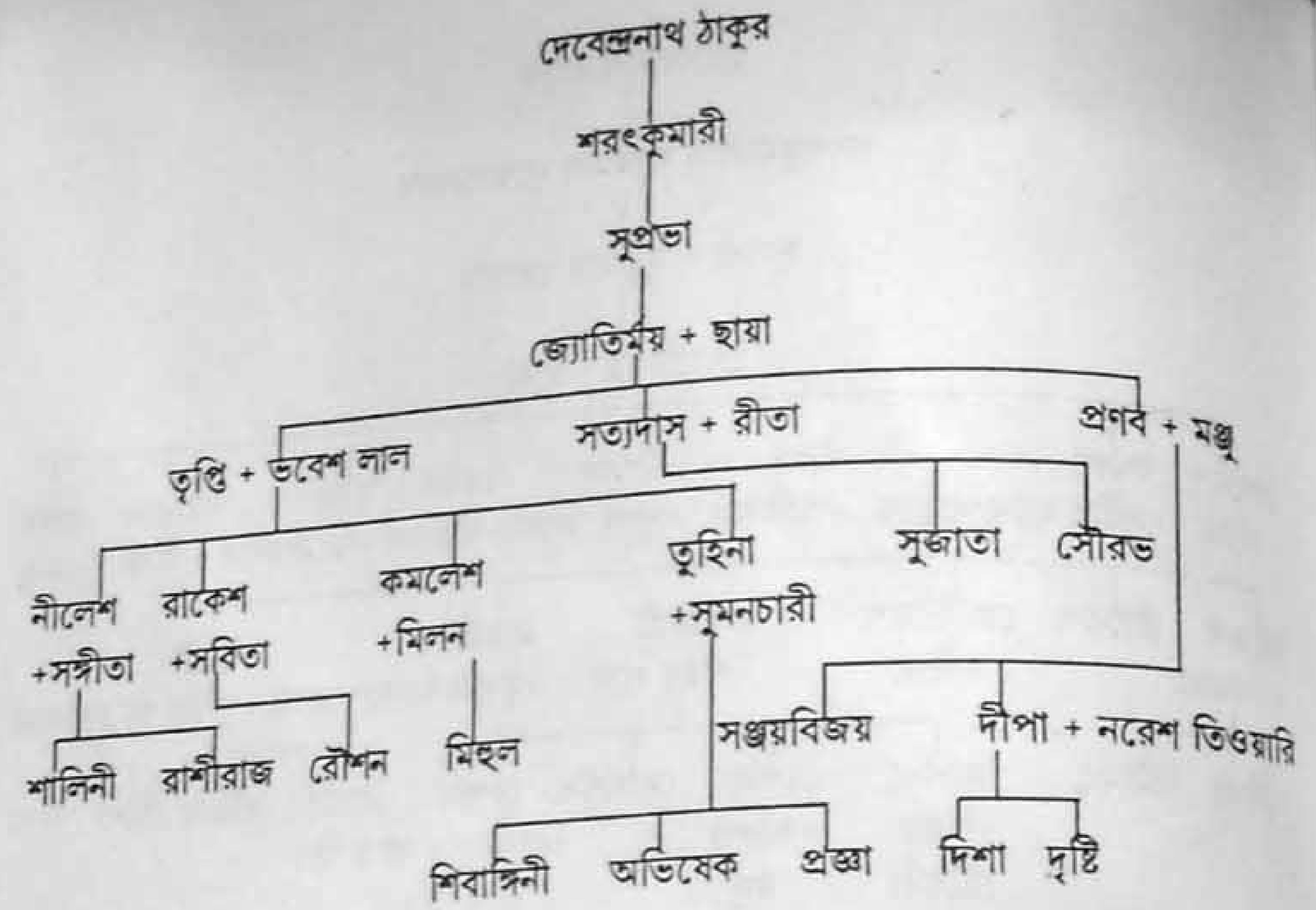
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শরৎকুমারী
সুপ্রভা
জ্যোতির্ময় + ছায়া
তৃপ্তি + ভবেশ লাল
সত্যদাস + রীতা
প্রণব + মঞ্জু
নীলেশ +সঙ্গীতা
রাকেশ +সবিতা
কমলেশ +মিলন
তুহিনা +সুমনচারী
সুজাতা
সৌরভ
শালিনী
রাশীরাজ
রৌশন
মিহুল
সঞ্জয়বিজয়
দীপা + নরেশ তিওয়ারি
শিবাঙ্গিনী
অভিষেক
প্রজ্ঞা
দিশা
দৃষ্টি

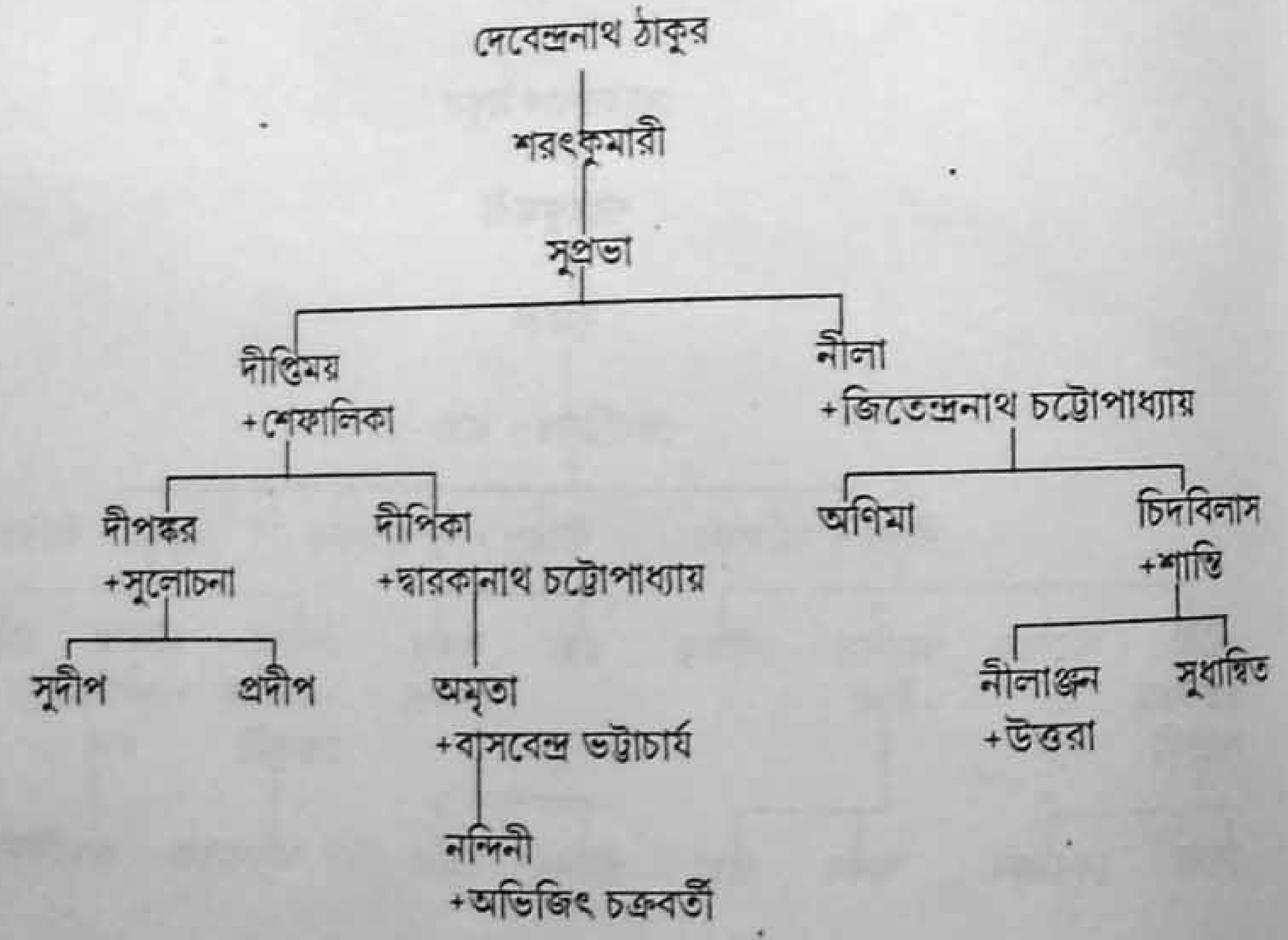
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শরৎকুমারী
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শরৎকুমারী
সুপ্রভা
দীপ্তিময় +শেফালিকা
নীলা +জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
দীপঙ্কর +সুলোচনা
দীপিকা +দ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায়
অণিমা
চিদবিলাস +শান্তি
সুদীপ
প্রদীপ
অমৃতা +বাসবেন্দ্র ভট্টাচার্য
নীলাঞ্জন +উত্তরা
সুধাম্বিত
নন্দিনী +অভিজিৎ চক্রবর্তী

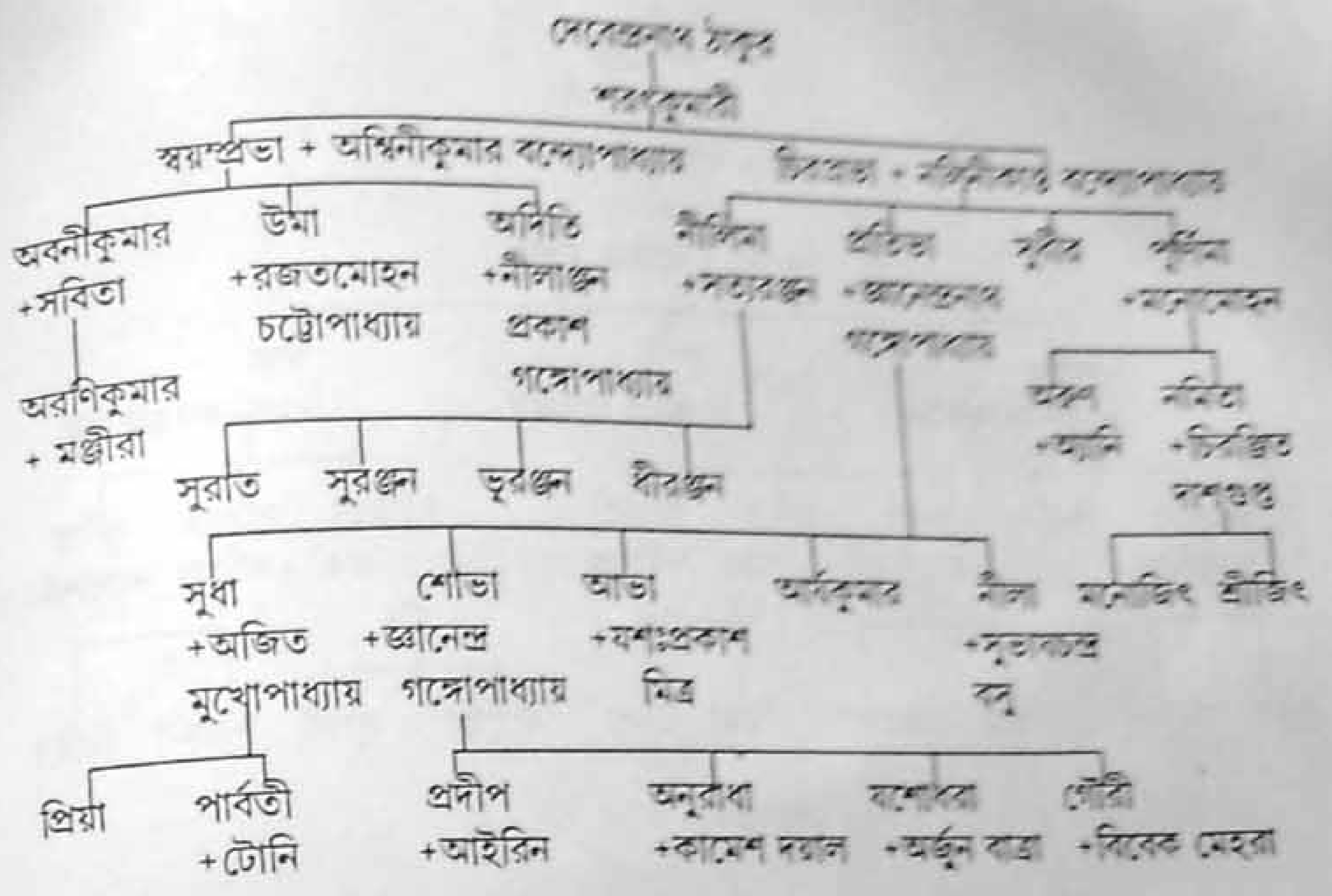
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শরৎকুমারী
স্বয়ম্প্রভা + অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
অবনীকুমার +সবিতা
উমা +রজতমোহন চট্টোপাধ্যায়
অদিতি +নীলাঞ্জন প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
অরণিকুমার + মঞ্জীরা
সুরতি
সুরঞ্জন
ভূরঞ্জন
ধীরঞ্জন
সুধা +অজিত মুখোপাধ্যায়
শোভা +জ্ঞানেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
আভা +যশঃপ্রকাশ মিত্র
নীলা
প্রিয়া
পার্বতী +টোনি
প্রদীপ +আইরিন
অনুরাধা
গৌরী +বিবেক মেহরা

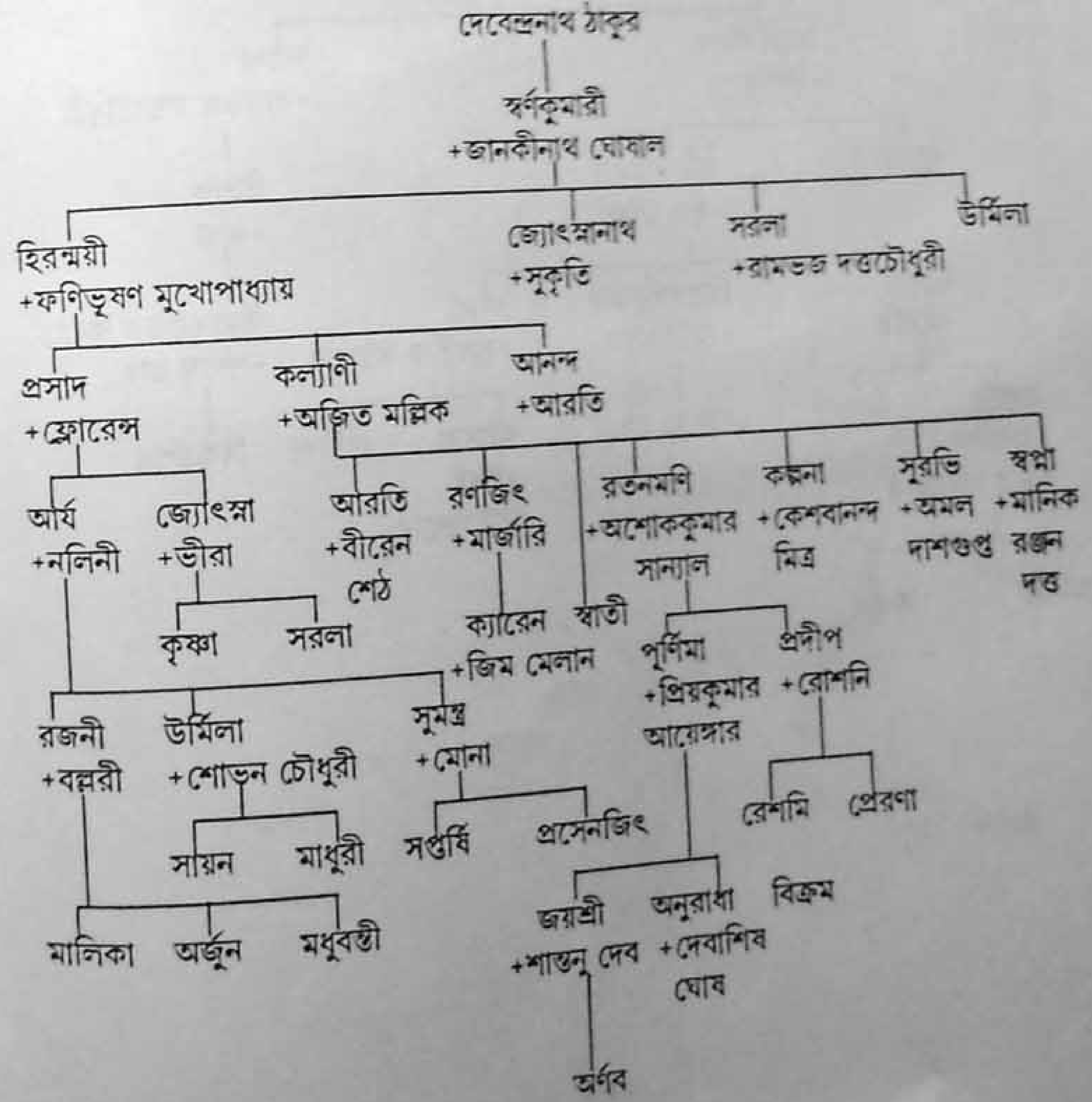
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
স্বর্ণকুমারী +জানকীনাথ ঘোষাল
হিরন্ময়ী +ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়
জ্যোৎস্নানাথ +সুকৃতি
সরলা +রামভজ দত্তচৌধুরী
ঊর্মিলা
প্রসাদ +ফ্লোরেন্স
কল্যাণী +অজিত মল্লিক
আনন্দ +আরতি
আর্য +নলিনী
জ্যোৎস্না +ভীরা
আরতি +বীরেন শেঠ
রণজিৎ +মার্জারি
রতনমণি +অশোককুমার সান্যাল
কল্পনা +কেশবানন্দ মিত্র
সুরভি +অমল দাশগুপ্ত
স্বপ্না +মানিক রঞ্জন দত্ত
কৃষ্ণা
সরলা
ক্যারেন +জিম মেলান
স্বাতী
পূর্ণিমা +প্রিয়কুমার আয়েঙ্গার
প্রদীপ +রোশনি
রজনী +বল্লরী
ঊর্মিলা +শোভন চৌধুরী
সুমন্ত্র +মোনা
রেশমি
প্রেরণা
সায়ন
মাধুরী
সপ্তর্ষি
প্রসেনজিৎ
জয়শ্রী +শান্তনু দেব
অনুরাধা +দেবাশিষ ঘোষ
বিক্রম
মালিকা
অর্জুন
মধুবন্তী
অর্ণব

- দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
  - স্বর্ণকুমারী
    - হিরন্ময়ী + ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়
      - কল্যাণী + অজিত মল্লিক
        - কল্পনা +কেশবানন্দ মিত্র
          - অশোক +সুস্মিতা
            - সুকৃৎ
            - অনুজিৎ
          - অর্জুন
        - সুরভি +অমল দাশগুপ্ত
          - অনুপ +হ্যাজেল
            - প্রিয়া
            - আয়েষা
          - সুমিত +সুনন্দা
            - স্নিগ্ধা
            - শৈলা
          - অঞ্জনা +দীপক সেন
        - স্বপ্না +মানিকরঞ্জন দত্ত
          - সুস্মিতা +সত্যজিৎ রায়
            - সংযুক্তা
            - সুপর্ণা
          - সুজিত +সবিতা
            - শিবানী
            - মিহির
          - সুনীত +রোশনি

- দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
  - স্বর্ণকুমারী
    - জ্যোৎস্নানাথ +সুকৃতি
      - রোমা
      - অজিতকুমার +সুধা সেলা
        - নৃপেন্দ্রকুমার +প্রণতি
          - প্রকৃতি +অরবিন্দ কুমার মালহোত্র
            - অখিল
            - অর্জুন
          - নির্মলা
        - জিতেন্দ্রকুমার +মেরি অ্যান
          - জ্যোৎস্না কে
        - রমলা +সুপ্রতীক ভট্টাচার্য
          - আয়েষা +হৃদয় চট্টোপাধ্যায়
          - দেবিকা
    - সরলা +রামভজ দত্তচৌধুরী
      - দীপক +রাধা
        - উমা (দত্তক কন্যা) +শশাঙ্ক রায়
          - দিব্যাশিস

- দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
  - স্বর্ণকুমারী +সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
    - সরোজচন্দ্র +তরুবালা
    - প্রমোদচন্দ্র +সুধীরাবালা +ঊষা
      - সবিতা
      - প্রসেনকুমার +অনিলা
        - প্রতীতি +সুভদ্র কুমার সেন
          - উদিত
          - রঞ্জিত
        - প্রকৃতি +বিশ্বরূপ ধর
          - বসুন্ধরা
        - প্রমীতি +সুজিত বসু
          - সুপ্রীত
      - নমিতা +সুবিনয় চট্টোপাধ্যায়
        - শমীক +সীমা
          - সুজয়
      - গীতা +সুনীল লাহিড়ী
        - জয়ন্ত +কৃষ্ণা
          - সুরজিৎ
          - নীলাঞ্জনা
        - সুদীপ্ত +শিবানী
          - দেবজিৎ
        - সুপ্রিয়া +অজিত চট্টোপাধ্যায়
          - অভিজিৎ
      - প্রশান্ত +প্রতিমা
        - পুলক
        - পাপিয়া
        - কাকলি

- দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
  - রবীন্দ্রনাথ +মৃণালিনী
    - মাধুরীলতা +শরৎকুমার চক্রবর্তী
    - রথীন্দ্র +প্রতিমা
      - নন্দিনী (পালিতা কন্যা)
    - রেণুকা +সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
    - মীরা +নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
      - নীতীন্দ্র
      - নন্দিতা +কৃষ্ণ কৃপালনী
    - শমীন্দ্র

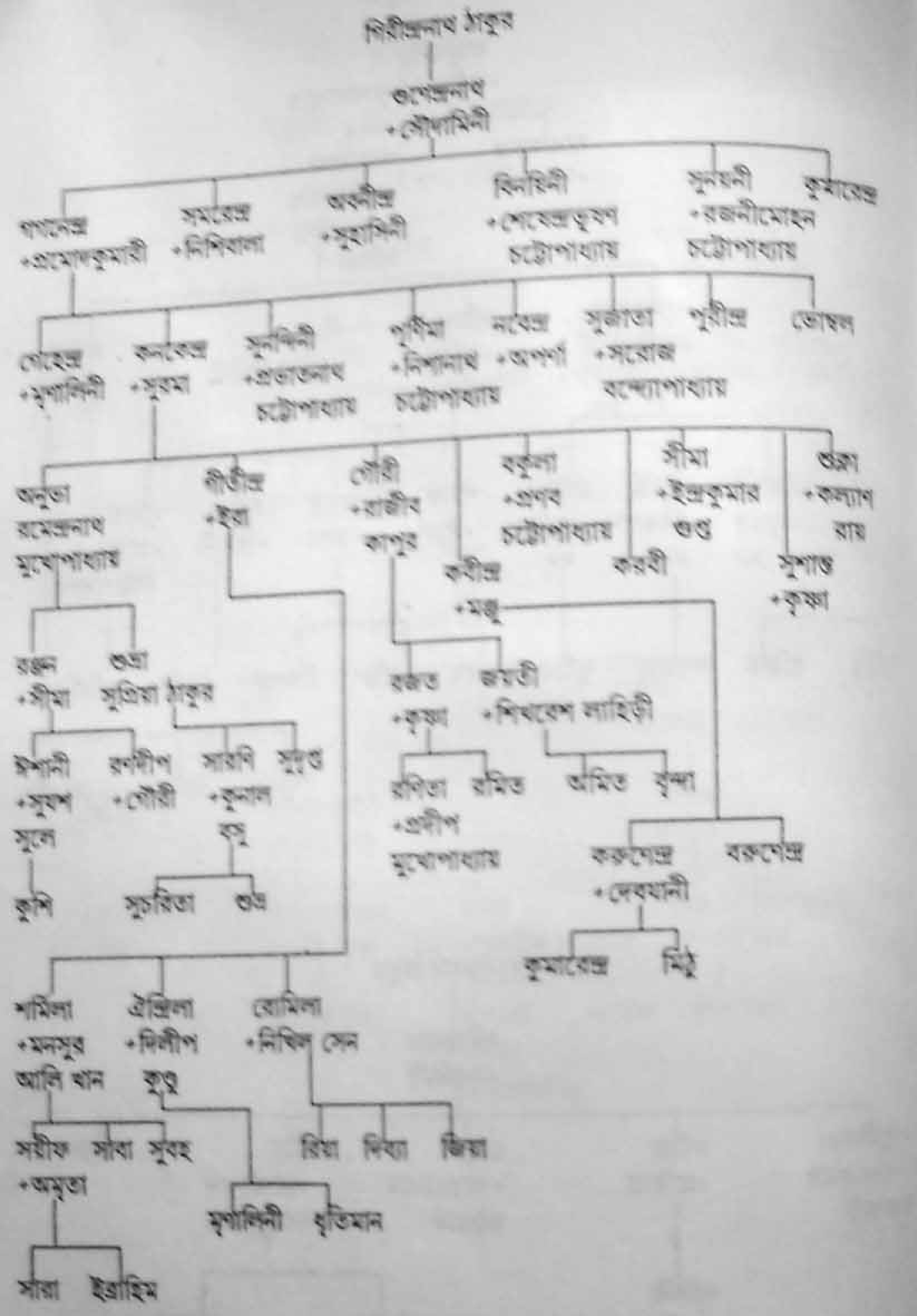
গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গুণেন্দ্রনাথ
+সৌদামিনী
গগনেন্দ্র
+প্রমোদকুমারী
সমরেন্দ্র
+নিশিবালা
অবনীন্দ্র
+সুহাসিনী
বিনয়িনী
+শেষেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়
সুনয়নী
+রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়
কুমারেন্দ্র
গেহেন্দ্র
+মৃণালিনী
কনকেন্দ্র
+সুরমা
সুনন্দিনী
+প্রভাতনাথ চট্টোপাধ্যায়
পূর্ণিমা
+নিশানাথ চট্টোপাধ্যায়
নবেন্দ্র
+অপর্ণা
সুজাতা
+সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়
পুণ্যেন্দ্র
তোষল
অনুভা
রমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
নীতীন্দ্র
+ইরা
গৌরী
+রাজীব কাপুর
বকুলা
+প্রণব চট্টোপাধ্যায়
সীমা
+ইন্দ্রকুমার গুপ্ত
শুক্লা
+কল্যাণ রায়
কবীন্দ্র
+মঞ্জু
করবী
সুশান্ত
+কৃষ্ণা
রঞ্জন
+সীমা
শুভ্রা
সুপ্রিয়া ঠাকুর
রজত
+কৃষ্ণা
জয়তী
+শিখরেশ লাহিড়ী
ঈশানী
+সুযশ সুলে
রণদীপ
+গৌরী
সারণি
+কুনাল বসু
সুব্রত
রঙ্গিতা
+প্রদীপ মুখোপাধ্যায়
রমিত
অমিত
বৃন্দা
করুণেন্দ্র
+দেবযানী
বরুণেন্দ্র
কুশি
সুচরিতা
শুভ
কুমারেন্দ্র
মিঠু
শর্মিলা
+মনসুর আলি খান
ঐন্দ্রিলা
+দিলীপ রায়
রোমিলা
+নিখিল সেন
সইফ
সাবা
সুবহ
রিয়া
দিয়া
জিয়া
+অমৃতা
মৃণালিনী
দ্যুতিমান
সারা
ইব্রাহিম

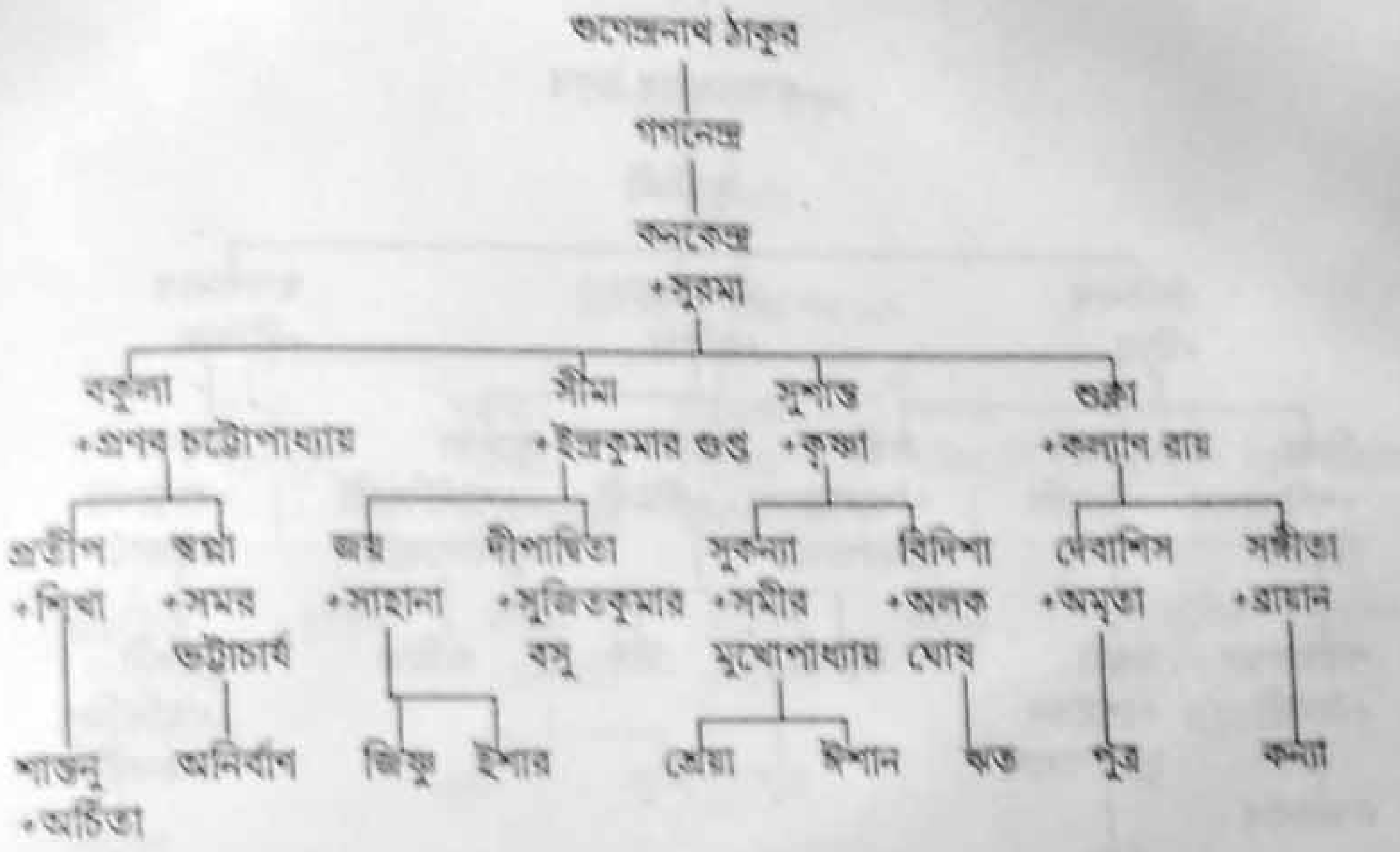
গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর
গগনেন্দ্র
কনকেন্দ্র
+সুরমা
বকুলা
+প্রণব চট্টোপাধ্যায়
সীমা
+ইন্দ্রকুমার গুপ্ত
সুশান্ত
+কৃষ্ণা
শুক্লা
+কল্যাণ রায়
প্রদীপ
+শিখা
স্বাতী
+সমর ভট্টাচার্য
জয়
+সাহানা
দীপান্বিতা
+সুজিতকুমার বসু
সুকন্যা
+সমীর মুখোপাধ্যায়
বিদিশা
+অলক ঘোষ
দেবাশিস
+অমৃতা
সঙ্গীতা
+রায়ান
শান্তনু
+অর্চিতা
অনির্বাণ
জিষ্ণু
ঈশান
শ্রেয়া
ঈশান
অত
পুত্র
কন্যা

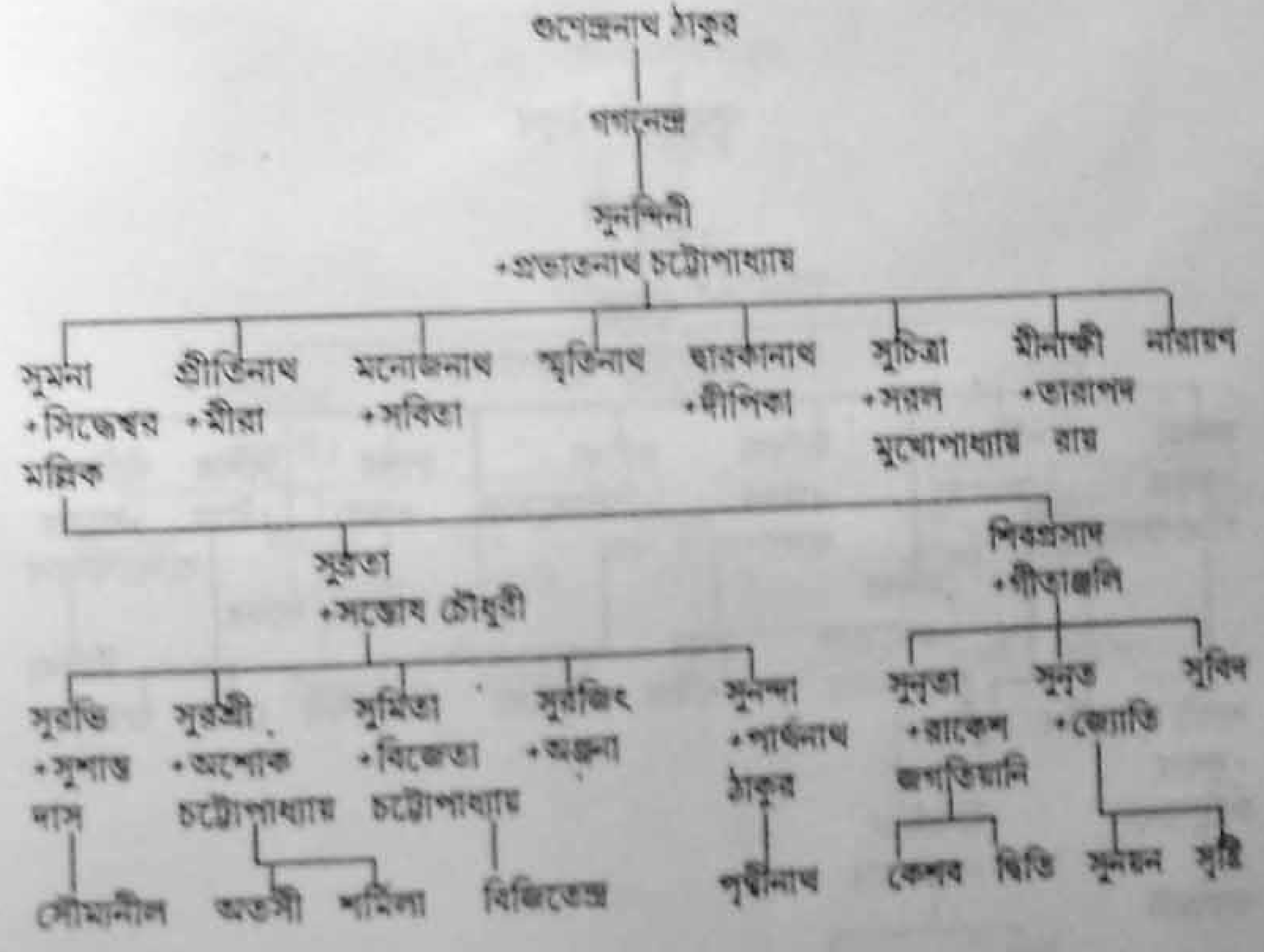
গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর
গগনেন্দ্র
সুনন্দিনী
+প্রভাতনাথ চট্টোপাধ্যায়
সুমনা
+সিদ্ধেশ্বর মল্লিক
প্রীতিনাথ
+মীরা
মনোজনাথ
+সবিতা
স্মৃতিনাথ
দ্বারকানাথ
+দীপিকা
সুচিত্রা
+সরল মুখোপাধ্যায়
মীনাক্ষী
+তারাপদ রায়
নারায়ণ
সুব্রতা
+সন্তোষ চৌধুরী
শিবপ্রসাদ
+গীতাঞ্জলি
সুরভি
+সুশান্ত দাস
সুরশ্রী
+অশোক চট্টোপাধ্যায়
সুমিতা
+বিজেতা চট্টোপাধ্যায়
সুরজিৎ
+অঞ্জনা
সুনন্দা
+পার্থনাথ ঠাকুর
সুনৃতা
+রাকেশ জগতিয়ানি
সুদৃপ্ত
+জ্যোতি
সুবিদ
সৌম্যনীল
অতসী
শর্মিলা
বিজিতেন্দ্র
পৃথ্বীনাথ
কেশব
ঋতি
সুনয়ন
সুষ্টি

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

- সুনন্দিনী
  - প্রীতিনাথ +মীরা
    - শিপ্রা +শক্তিপ্রসাদ ত্রিবেদী
      - শঙ্করপ্রসাদ +হৈমন্তী
        - ওঙ্কারনাথ
    - প্রবুদ্ধনাথ +দীপালি
      - মঞ্জরী + শোভেন মুখোপাধ্যায়
        - রিয়া
    - লক্ষ্মী + শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
  - মনোজনাথ +সবিতা
    - মানস +শ্রীমন্তী
      - মধুমন্তী
      - মৌর্য
    - সুদেষ্ণা +পার্থবিহারী মুখোপাধ্যায়
      - প্রজিত
  - দ্বারকানাথ +দীপিকা
    - অমৃতা +বাসবেন্দ্র ভট্টাচার্য
      - নন্দিনী +অভিজিৎ চক্রবর্তী

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

- সুনন্দিনী
  - সুপ্রিয়া +সরল মুখোপাধ্যায়
    - অলকা +প্রফুল্ল গঙ্গোপাধ্যায়
      - শ্রাবণী +সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়
        - অরুন্ধতী
    - সমীর +জ্যোৎস্না
      - সুদীপ
      - সুদীপ্তা
    - মণিকা +ব্রজমোহন চট্টোপাধ্যায়
      - দীপান্বিতা +ব্যারি রায়
        - কিট্টু
        - কুচুম
    - দীপিকা +অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়
      - রঞ্জন +শর্মিষ্ঠা
    - কণিকা +শিশিরকুমার রায়
      - প্রিয়াঙ্কা
      - প্রিয়দর্শিনী
    - সমর
    - শেখর +ঋতা
      - সাহানা
    - শংকর
    - শিশির +দীপা
      - স্নেহা
      - শুভম
    - গীতিকা +শংকর বন্দ্যোপাধ্যায়
      - বিদিশা

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

- সুনন্দিনী
  - মীনাক্ষী + তারাপদ রায়
    - তপন +শিবানী
      - অরুণিমা +শিবাসিস মুখোপাধ্যায়
        - অনুষ্কা
      - চন্দ্রিমা
    - সুনন্দা +জয়ন্ত গঙ্গোপাধ্যায়
      - প্রবীর +আত্রেয়ী
        - ধ্রুব
        - জুপি
    - শ্রীলেখা +সুমিত রায়চৌধুরী
      - শ্রীজিৎ +শর্মিলা
        - পুত্র
    - কমল +মিতালি
      - নবীনা
      - টিনা
    - শ্রীরূপা +অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়
      - ললিতা +অঞ্জন ভট্টাচার্য
      - সর্বজিৎ

গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর

- গগনেন্দ্র
  - পূর্ণিমা +নিশানাথ চট্টোপাধ্যায়
    - নীতিনাথ +অপর্ণা
      - নীরনাথ
      - নীলাদ্রি +লোপামুদ্রা
        - নীলাব্জ
      - পার্থ +নন্দিনী
        - মহাশ্বেতা
      - সুনীতা +বিশ্বজিৎ
        - প্রমিতা
        - দেবজিৎ
    - দিতিনাথ
    - সুব্রত +জ্যোতির্ময়ী
      - সুকৃৎ যূথিকা
        - সুপর্ণ
      - সুবিদ +রীণা
        - শ্রীজিৎ
      - শ্রীদীপ

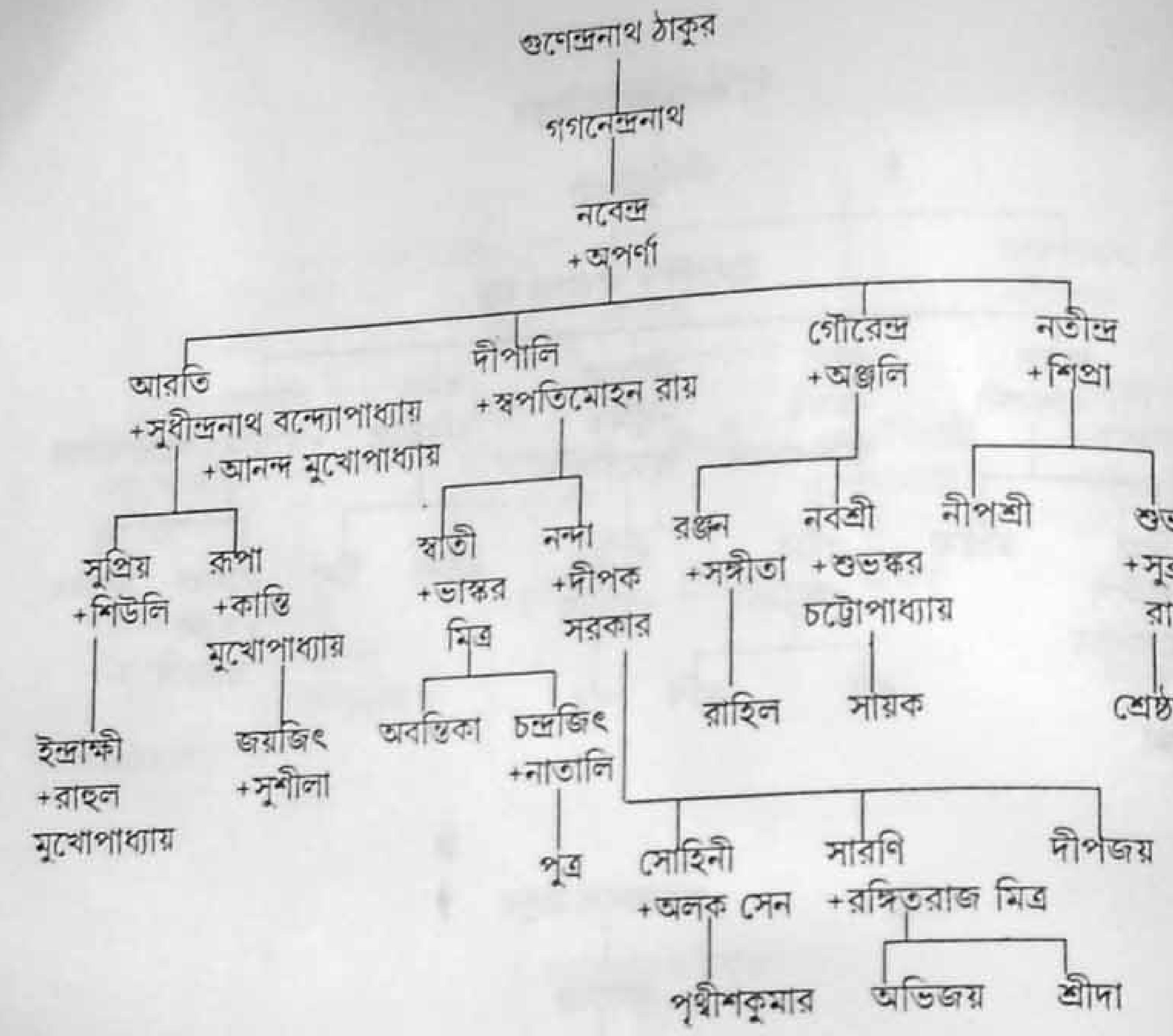

গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর
গগনেন্দ্রনাথ
নবেন্দ্র
+অপর্ণা
আরতি
+সুধীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
+আনন্দ মুখোপাধ্যায়
দীপালি
+স্বপতিমোহন রায়
গৌরেন্দ্র
+অঞ্জলি
নতীন্দ্র
+শিপ্রা
সুপ্রিয়
+শিউলি
রূপা
+কান্তি
মুখোপাধ্যায়
স্বাতী
+ভাস্কর
মিত্র
নন্দা
+দীপক
সরকার
রঞ্জন
+সঙ্গীতা
নবশ্রী
+শুভঙ্কর
চট্টোপাধ্যায়
নীপশ্রী
শুভশ্রী
+সুব্রত
রায়
ইন্দ্রাক্ষী
+রাহুল
মুখোপাধ্যায়
জয়জিৎ
+সুশীলা
অবন্তিকা
চন্দ্রজিৎ
+নাতালি
রাহিল
সায়ক
শ্রেষ্ঠা
পুত্র
সোহিনী
+অলক সেন
সারণি
+রঙ্গিতরাজ মিত্র
দীপজয়
পৃথ্বীশকুমার
অভিজয়
শ্রীদা

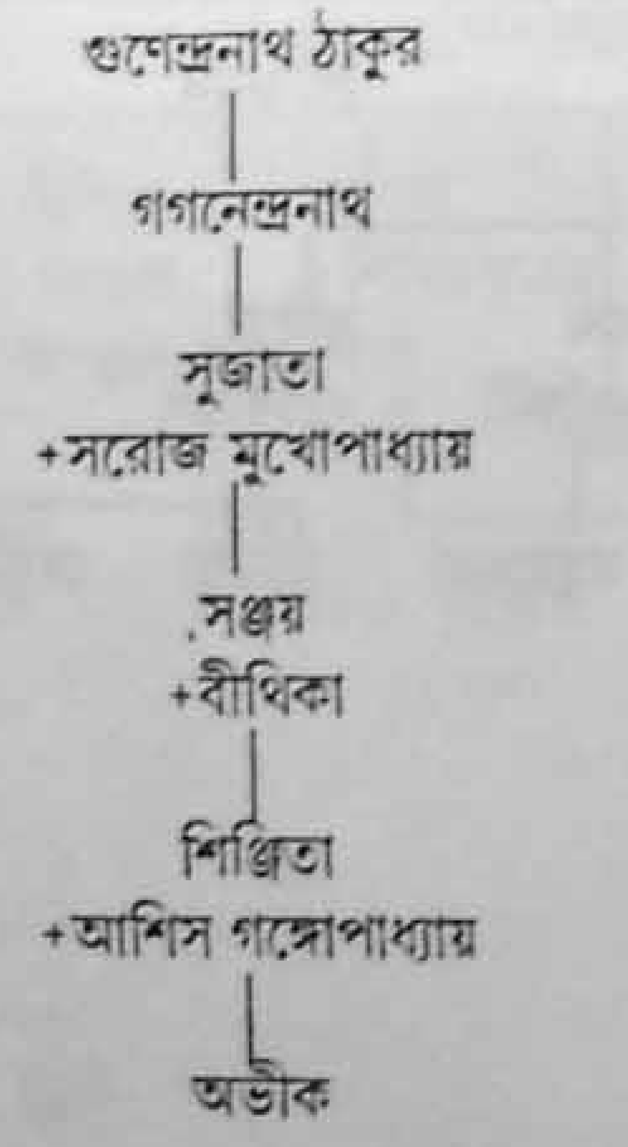

গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর
গগনেন্দ্রনাথ
সুজাতা
+সরোজ মুখোপাধ্যায়
সঞ্জয়
+বীথিকা
শিঞ্জিতা
+আশিস গঙ্গোপাধ্যায়
অভীক

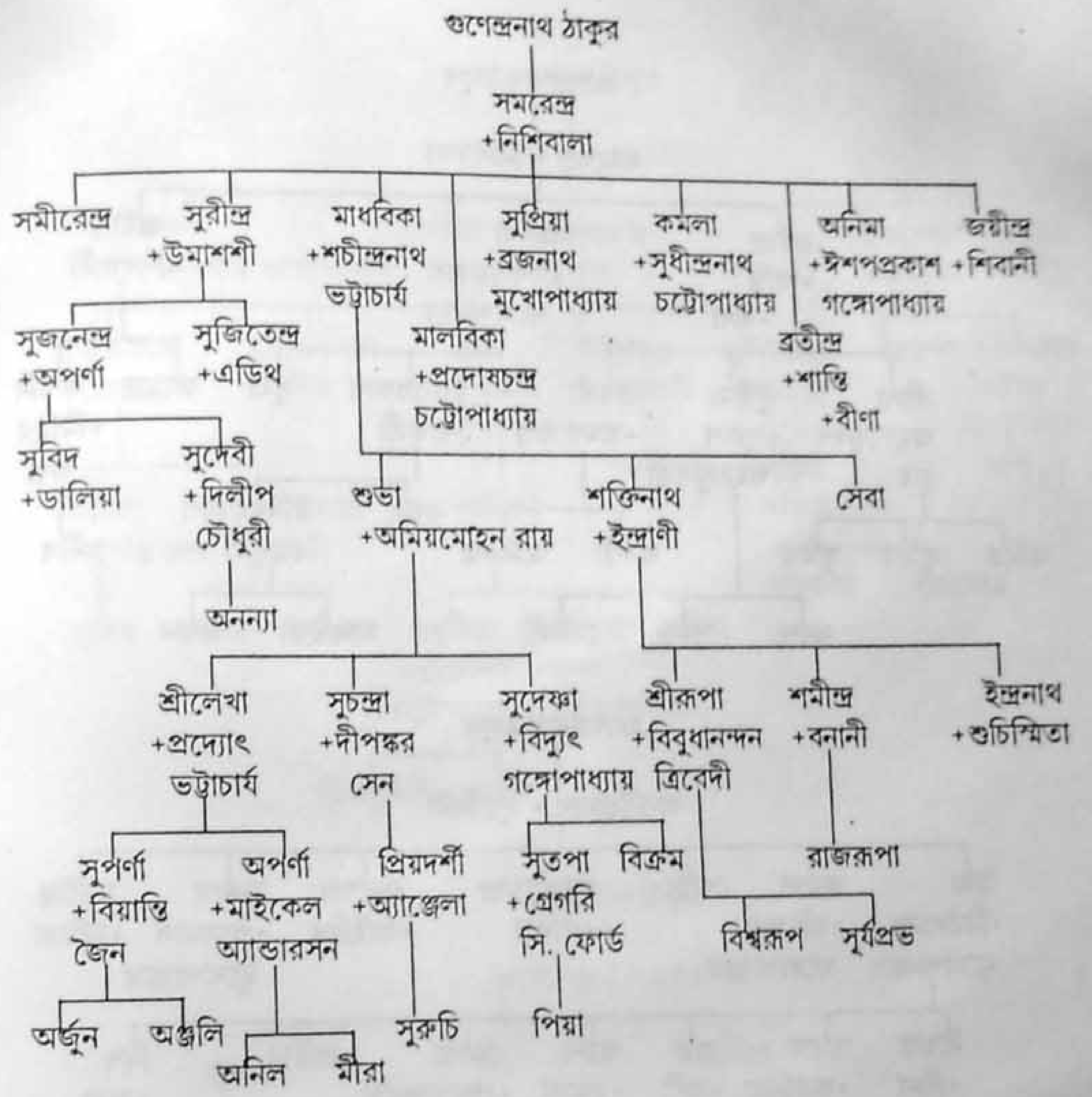

গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সমরেন্দ্র
+নিশিবালা
সমীরেন্দ্র
সুরীন্দ্র
+উমাশশী
মাধবিকা
+শচীন্দ্রনাথ
ভট্টাচার্য
সুপ্রিয়া
+ব্রজনাথ
মুখোপাধ্যায়
কমলা
+সুধীন্দ্রনাথ
চট্টোপাধ্যায়
অনিমা
+ঈশপ্রকাশ
গঙ্গোপাধ্যায়
জয়ীন্দ্র
+শিবানী
মালবিকা
+প্রদোষচন্দ্র
চট্টোপাধ্যায়
ব্রতীন্দ্র
+শান্তি
+বীণা
সুজনেন্দ্র
+অপর্ণা
সুজিতেন্দ্র
+এডিথ
সুবিদ
+ডালিয়া
সুদেবী
+দিলীপ
চৌধুরী
অনন্যা
শুভা
+অমিয়মোহন রায়
শক্তিনাথ
+ইন্দ্রাণী
সেবা
শ্রীলেখা
+প্রদ্যোৎ
ভট্টাচার্য
সুচন্দ্রা
+দীপঙ্কর
সেন
সুদেষ্ণা
+বিদ্যুৎ
গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীরূপা
+বিবুধানন্দন
ত্রিবেদী
শমীন্দ্র
+বনানী
ইন্দ্রনাথ
+শুচিস্মিতা
সুপর্ণা
+বিয়াত্তি
জৈন
অপর্ণা
+মাইকেল
অ্যান্ডারসন
প্রিয়দর্শী
+অ্যাঞ্জেলা
সুতপা
+গ্রেগরি
সি. ফোর্ড
বিক্রম
রাজরূপা
বিশ্বরূপ
সূর্যপ্রভ
অর্জুন
অঞ্জলি
অনিল
মীরা
সুরুচি
পিয়া

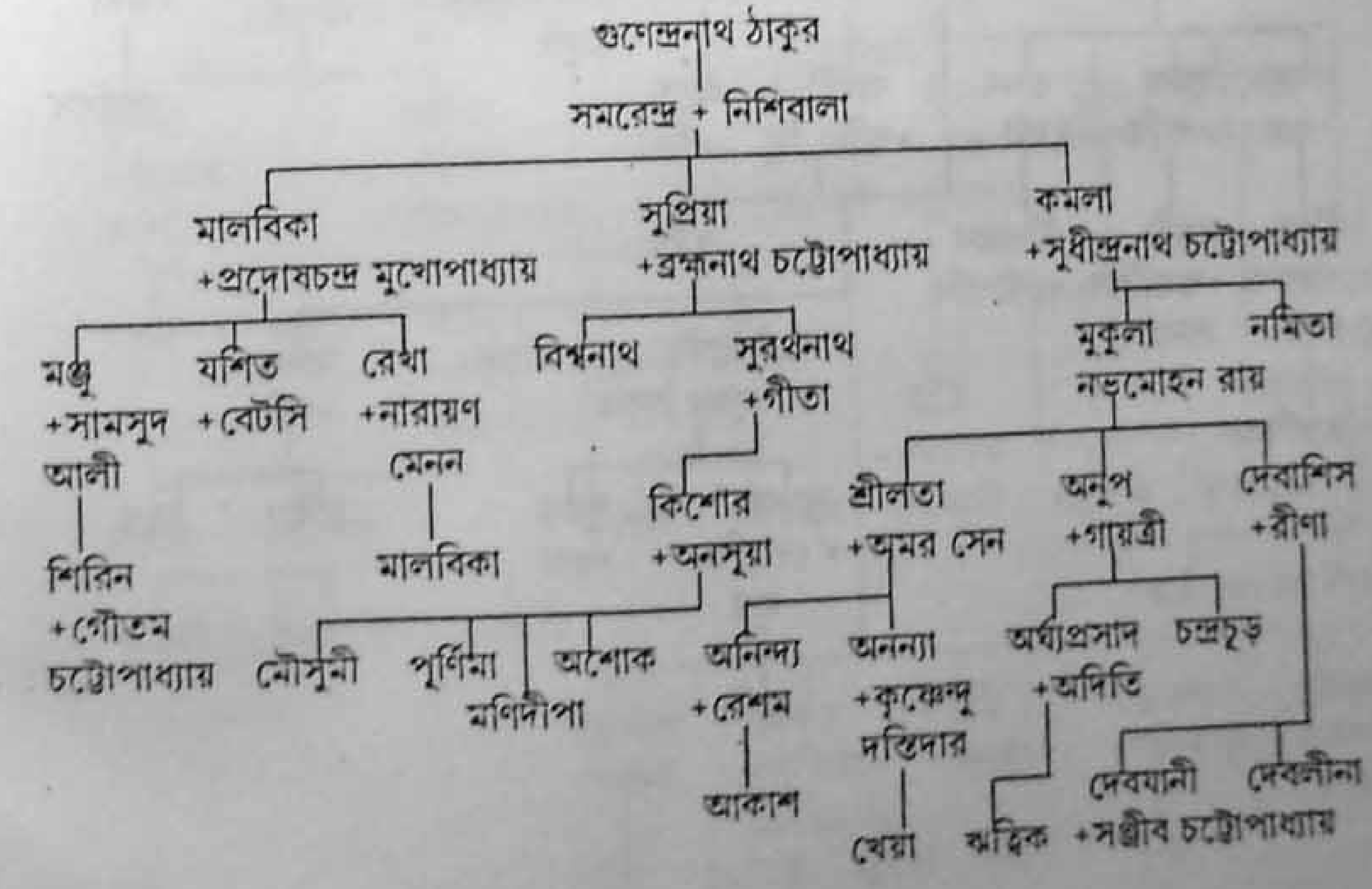

গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সমরেন্দ্র + নিশিবালা
মালবিকা
+প্রদোষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
সুপ্রিয়া
+ব্রজনাথ চট্টোপাধ্যায়
কমলা
+সুধীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
মঞ্জু
+সামসুদ
আলী
যশিত
+বেটসি
রেখা
+নারায়ণ
মেনন
বিশ্বনাথ
সুরথনাথ
+গীতা
মুকুলা
নভমোহন রায়
নমিতা
শিরিন
+গৌতম
চট্টোপাধ্যায়
মালবিকা
কিশোর
+অনসূয়া
শ্রীলতা
+অমর সেন
অনুপ
+গায়ত্রী
দেবাশিস
+রীণা
মৌসুমী
পূর্ণিমা
মণিদীপা
অশোক
অনিন্দ্য
+রেশম
অনন্যা
+কৃষ্ণেন্দু
দস্তিদার
অর্ঘ্যপ্রসাদ
+অদিতি
চন্দ্রচূড়
আকাশ
খেয়া
ঋত্বিক
দেবযানী
দেবলীনা
+সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

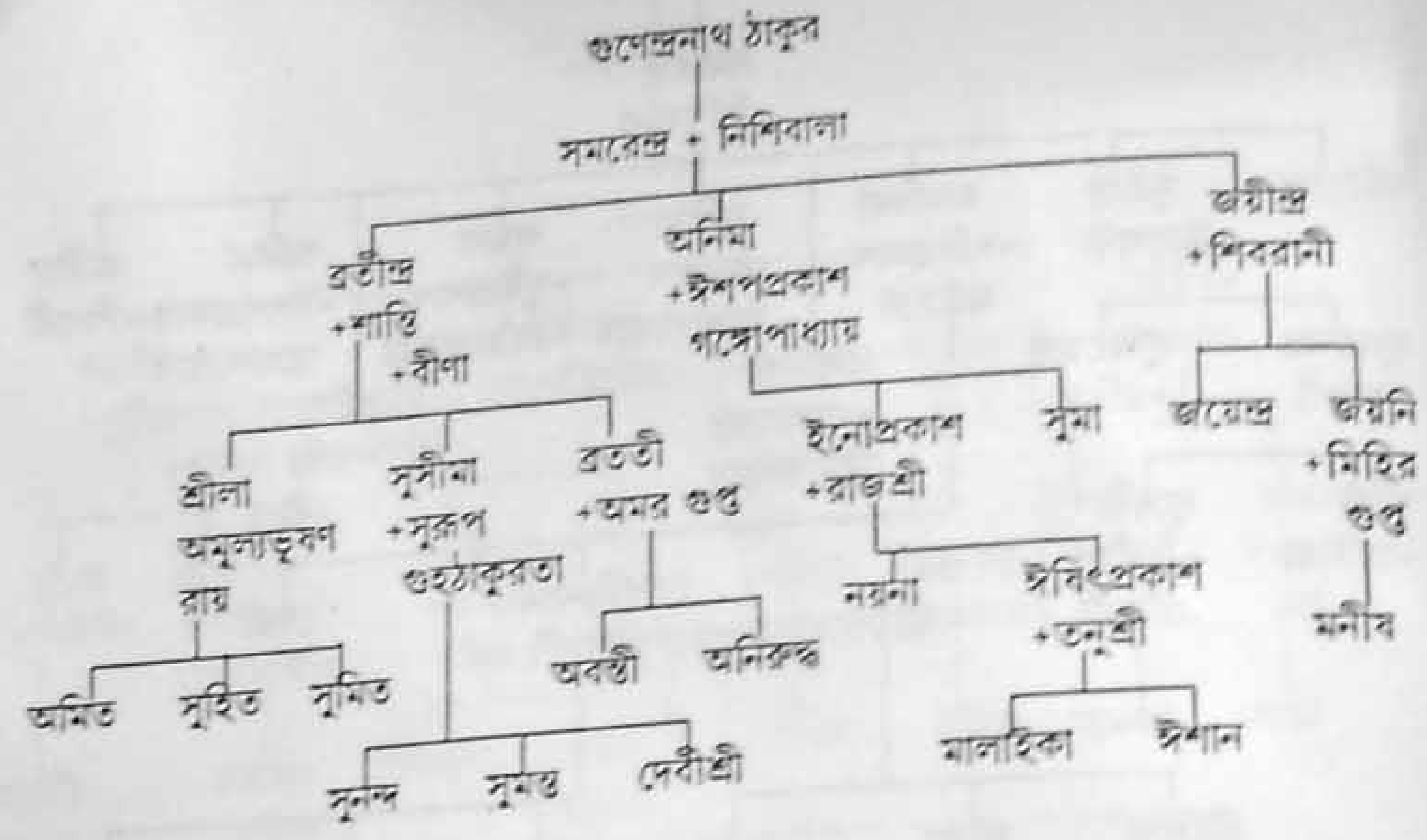
গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সমরেন্দ্র + নিশিবালা
প্রতীন্দ্র
+শান্তি
+বীণা
অনিমা
+ঈশপ্রকাশ
গঙ্গোপাধ্যায়
জয়ীন্দ্র
+শিবরানী
শ্রীলা
অমূল্যভূষণ
রায়
সুশীনা
+সুরূপ
গুহঠাকুরতা
ব্রততী
+অমর গুপ্ত
ইন্দ্রপ্রকাশ
+রাজশ্রী
সুমা
জয়েন্দ্র
জয়নি
+মিহির
গুপ্ত
অমিত
সুহিত
সুমিত
অবন্তী
অনিরুদ্ধ
নয়না
ঈবিৎপ্রকাশ
+তনুশ্রী
মনীষ
সুনন্দ
সুমন্ত্র
দেবীশ্রী
মালবিকা
ঈশান

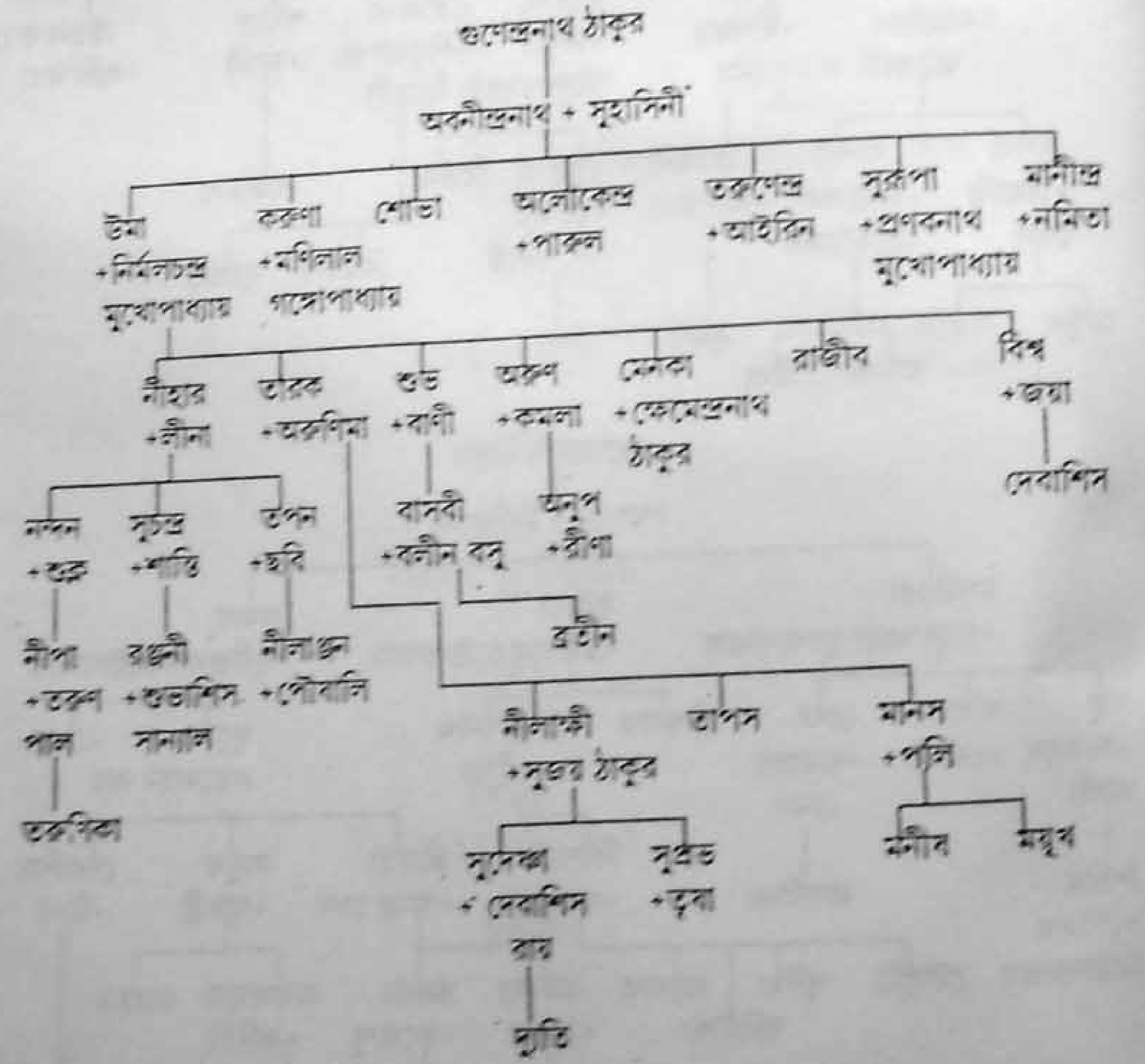
গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর
অবনীন্দ্রনাথ + সুহাসিনী
উমা
+নির্মলচন্দ্র
মুখোপাধ্যায়
করুণা
+মণিলাল
গঙ্গোপাধ্যায়
শোভা
অলোকেন্দ্র
+পারুল
তরুণেন্দ্র
+আইরিন
সুরূপা
+প্রণবনাথ
মুখোপাধ্যায়
মানীন্দ্র
+নমিতা
নীহার
+লীনা
তারক
+অরুণিমা
শুভ
+বাণী
অরুণ
+কমলা
মেনকা
+ক্ষেমেন্দ্রনাথ
ঠাকুর
রাজীব
বিশ্ব
+জয়া
দেবাশিস
নন্দন
+শুক্লা
সুচন্দ্র
+শান্তি
তপন
+ছবি
বাসবী
+বলীন বসু
অনুপ
+বীণা
নীপা
+তরুণ
পাল
রঞ্জনী
+শুভাশিস
সান্যাল
নীলাঞ্জন
+পৌষালি
ব্রতীন
তরুণিকা
নীলাক্ষী
+সুজয় ঠাকুর
তাপস
মানস
+পলি
সুলেখা
+দেবাশিস
রায়
সুপ্রভ
+তৃষা
মনীষ
ময়ূখ
দ্যুতি

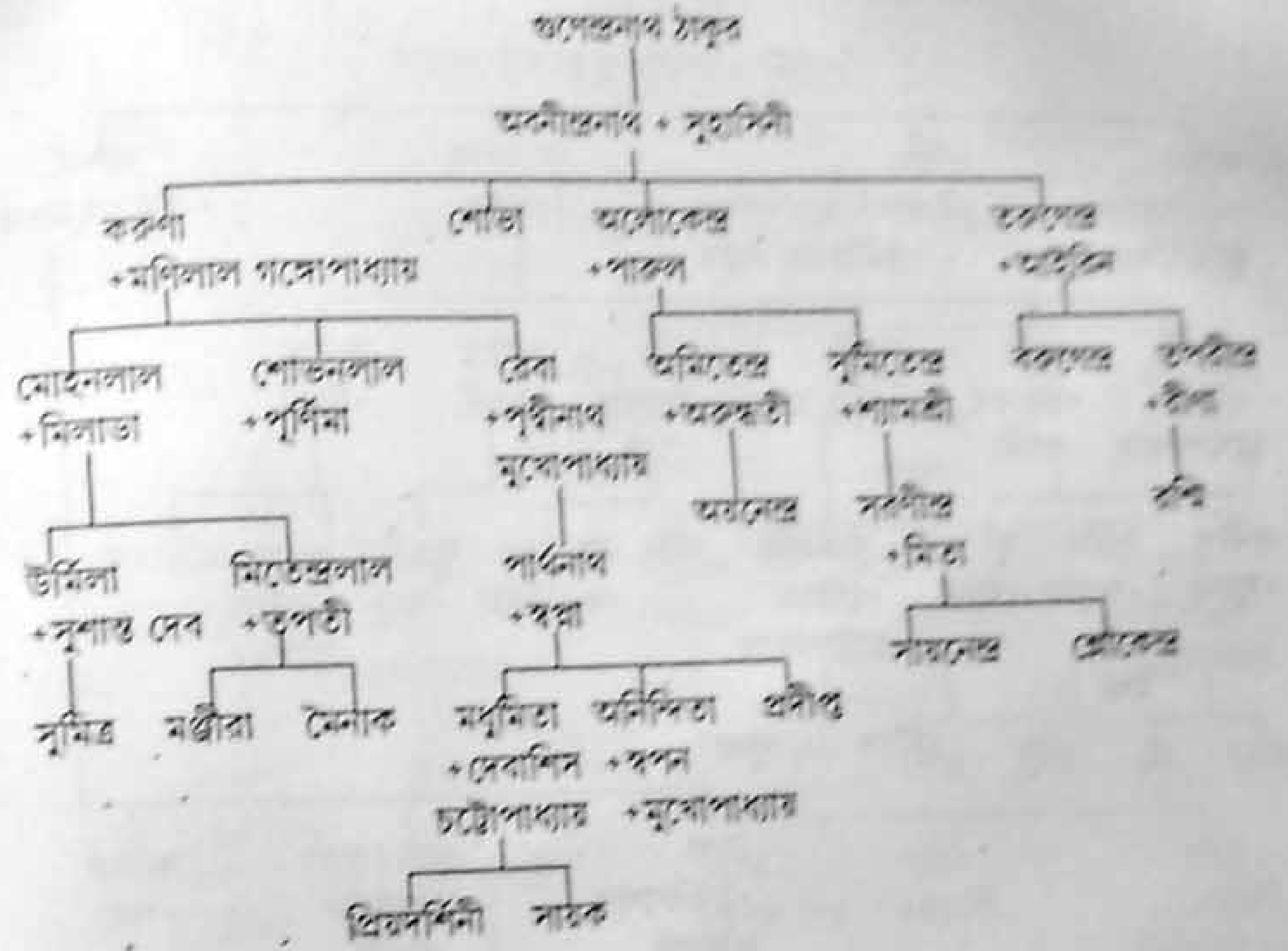
গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর
অবনীন্দ্রনাথ + সুহাসিনী
করুণা
+মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
শোভা
অলোকেন্দ্র
+পারুল
তরুণেন্দ্র
+আইরিন
মোহনলাল
+মিলাডা
শোভনলাল
+পূর্ণিমা
রেবা
+পৃথ্বীনাথ
মুখোপাধ্যায়
অমিতেন্দ্র
+অরুন্ধতী
সুমিতেন্দ্র
+শ্যামশ্রী
অরুণেন্দ্র
রণ্বীর
+বীণা
অমলেন্দ্র
সমরীন্দ্র
+মিতা
রশ্মি
ঊর্মিলা
+সুশান্ত দেব
মিতেন্দ্রলাল
+তপতী
পার্থনাথ
+স্বপ্না
সায়নেন্দ্র
শ্রেয়েন্দ্র
সুমিত্র
মঞ্জীরা
মৈনাক
মধুমিতা
+দেবাশিস
চট্টোপাধ্যায়
অনিন্দিতা
+স্বপন
+মুখোপাধ্যায়
প্রদীপ্ত
প্রিয়দর্শিনী
সাত্যক

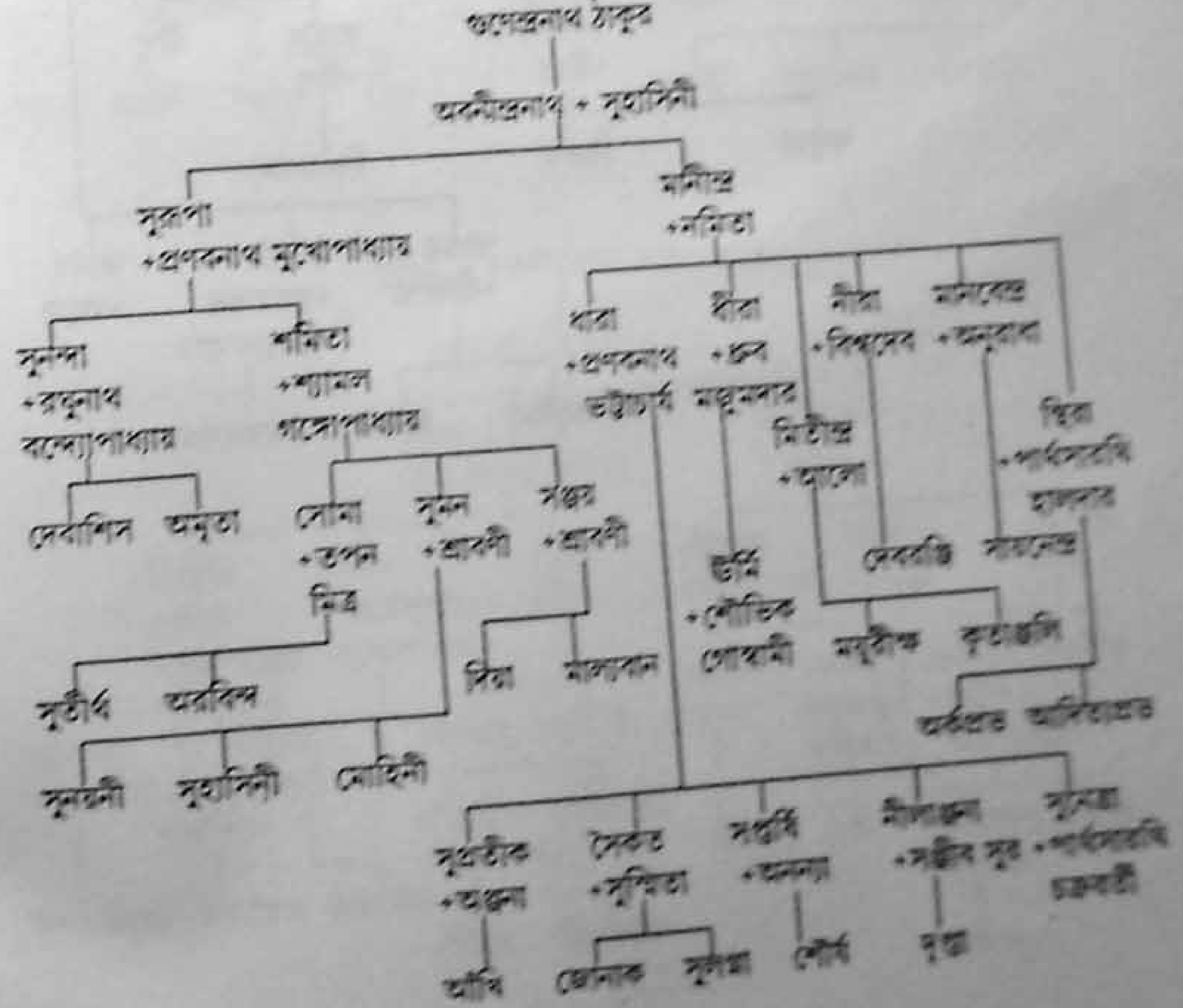
গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর
অবনীন্দ্রনাথ + সুহাসিনী
সুরূপা
+প্রণবনাথ মুখোপাধ্যায়
মনীন্দ্র
+নমিতা
সুনন্দা
+রঘুনাথ
বন্দ্যোপাধ্যায়
শমিতা
+শ্যামল
গঙ্গোপাধ্যায়
ধারা
+প্রণবনাথ
ভট্টাচার্য
ধীরা
+ধ্রুব
মজুমদার
নীরা
+বিশ্বদেব
মানবেন্দ্র
+অনুরাধা
মিতীন্দ্র
+আলো
স্থিরা
+পার্থসারথি
হালদার
দেবাশিস
অমৃতা
সোমা
+তপন
মিত্র
সুমন
+শ্রাবণী
সঞ্জয়
+শ্রাবণী
দেবব্রত
সায়নেন্দ্র
ঊর্মি
+কৌশিক
গোস্বামী
মধুদীপ্ত
কৃষ্ণাঞ্জলি
প্রিয়া
মালবিকা
সুতীর্থ
অরবিন্দ
অর্কপ্রভ
অনিরুদ্ধ
সুনন্দী
সুহাসিনী
মোহিনী
সুপ্রতীক
+অঞ্জনা
সৈকত
+সুস্মিতা
সপ্তর্ষি
+অনন্যা
নীলাঞ্জনা
+সঞ্জীব সুর
সুস্মিতা
+পার্থসারথি
চক্রবর্তী
অর্ণব
জোনাক
সুলগ্না
শৌর্য
দৃপ্তা

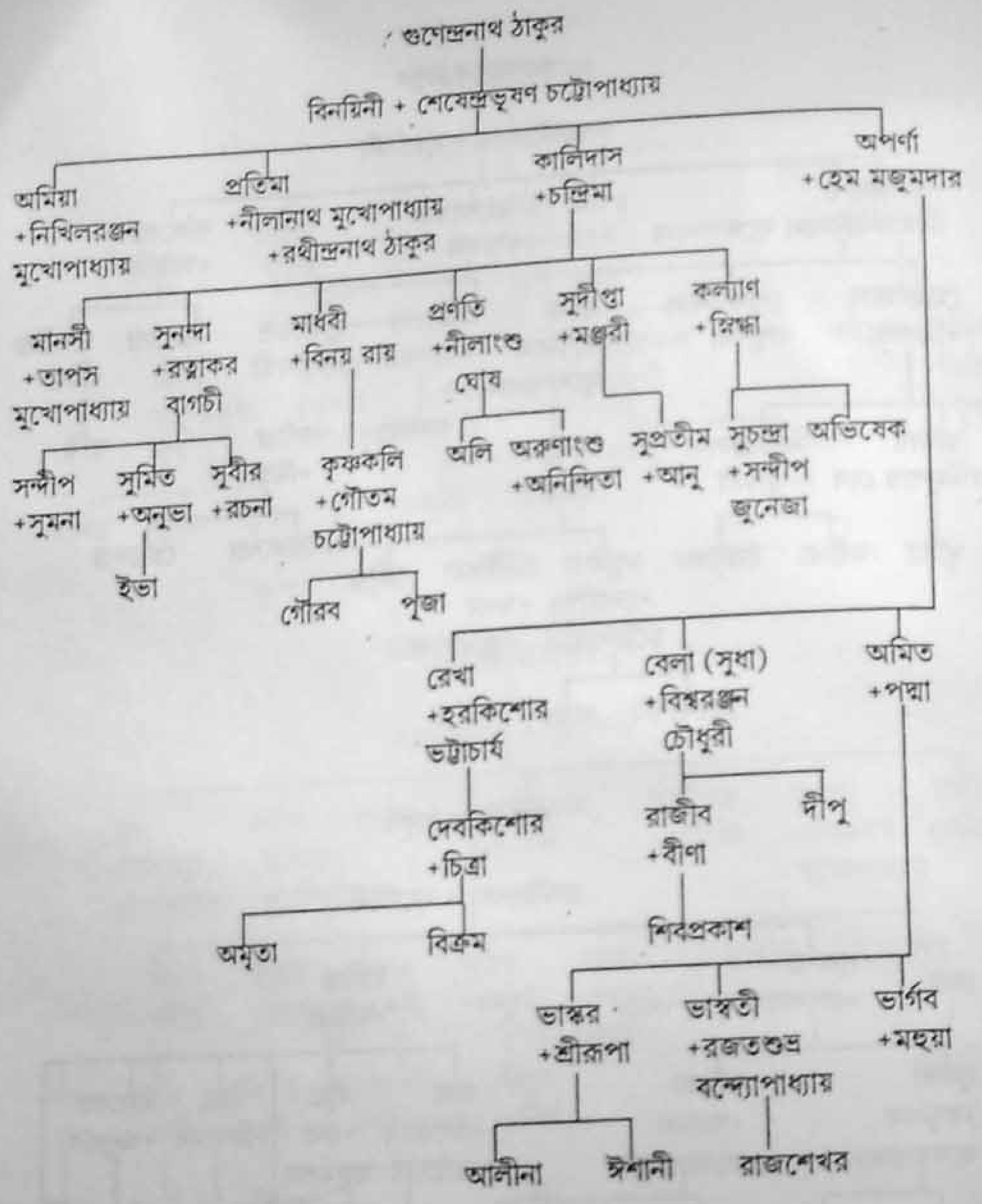
গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর
বিনয়িনী + শেষেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়
অমিয়া
+নিখিলরঞ্জন
মুখোপাধ্যায়
প্রতিমা
+নীলানাথ মুখোপাধ্যায়
+রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
কালিদাস
+চন্দ্রিমা
অপর্ণা
+হেম মজুমদার
মানসী
+তাপস
মুখোপাধ্যায়
সুনন্দা
+রত্নাকর
বাগচী
মাধবী
+বিনয় রায়
প্রণতি
+নীলাংশু
ঘোষ
সুদীপ্ত
+মঞ্জরী
কল্যাণ
+স্নিগ্ধা
সন্দীপ
+সুমনা
সুমিত
+অনুভা
সুধীর
+রচনা
ইভা
কৃষ্ণকলি
+গৌতম
চট্টোপাধ্যায়
গৌরব
পূজা
অলি
অরুণাংশু
+অনিন্দিতা
সুপ্রতীম
+আনু
সুচন্দ্রা
+সন্দীপ
জুনেজা
অভিষেক
রেখা
+হরকিশোর
ভট্টাচার্য
বেলা (সুধা)
+বিশ্বরঞ্জন
চৌধুরী
অমিত
+পদ্মা
দেবকিশোর
+চিত্রা
অমৃতা
বিক্রম
রাজীব
+বীণা
দীপু
শিবপ্রকাশ
ভাস্কর
+শ্রীরূপা
ভাস্বতী
+রজতশুভ্র
বন্দ্যোপাধ্যায়
ভার্গব
+মহুয়া
আলীনা
ঈশানী
রাজশেখর

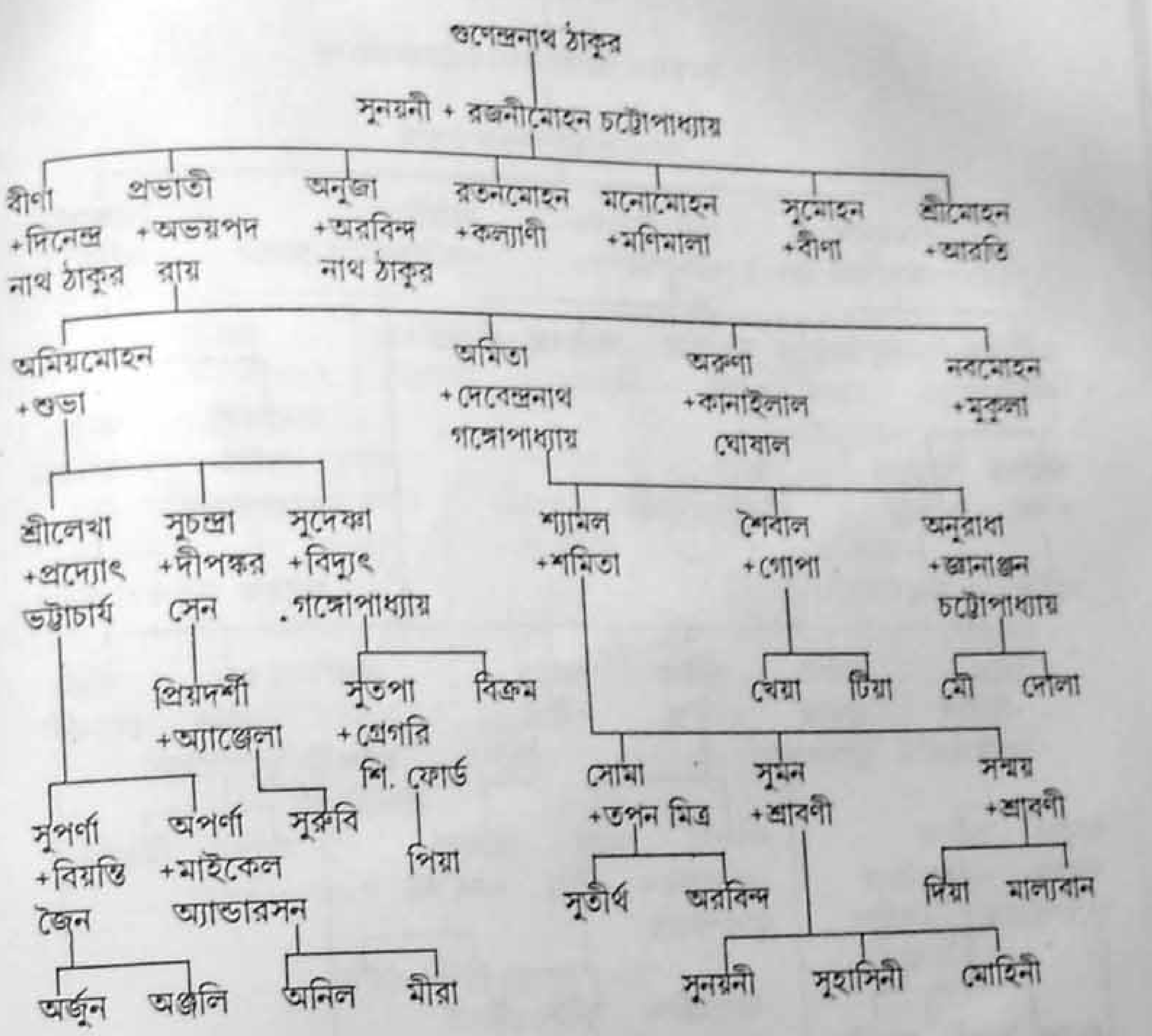
গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সুনয়নী + রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়
বীণা
+দিনেন্দ্র
নাথ ঠাকুর
প্রভাতী
+অভয়পদ
রায়
অনুজা
+অরবিন্দ
নাথ ঠাকুর
রতনমোহন
+কল্যাণী
মনোমোহন
+মণিমালা
সুমোহন
+বীণা
শ্রীমোহন
+আরতি
অমিয়মোহন
+শুভা
অমিতা
+দেবেন্দ্রনাথ
গঙ্গোপাধ্যায়
অরুণা
+কানাইলাল
ঘোষাল
নবমোহন
+মুকুলা
শ্রীলেখা
+প্রদ্যোৎ
ভট্টাচার্য
সুচন্দ্রা
+দীপঙ্কর
সেন
সুদেষ্ণা
+বিদ্যুৎ
গঙ্গোপাধ্যায়
শ্যামল
+শমিতা
শৈবাল
+গোপা
অনুরাধা
+জ্ঞানাঞ্জন
চট্টোপাধ্যায়
প্রিয়দর্শী
+অ্যাঞ্জেলা
সুতপা
+গ্রেগরি
শি. ফোর্ড
বিক্রম
খেয়া
টিয়া
মৌ
দোলা
সুপর্ণা
+বিয়স্তি
জৈন
অপর্ণা
+মাইকেল
অ্যান্ডারসন
সুরুচি
পিয়া
সোমা
+তপন মিত্র
সুমন
+শ্রাবণী
সময়
+শ্রাবণী
সুতীর্থ
অরবিন্দ
দিয়া
মাল্যবান
অর্জুন
অঞ্জলি
অনিল
মীরা
সুনয়নী
সুহাসিনী
মোহিনী

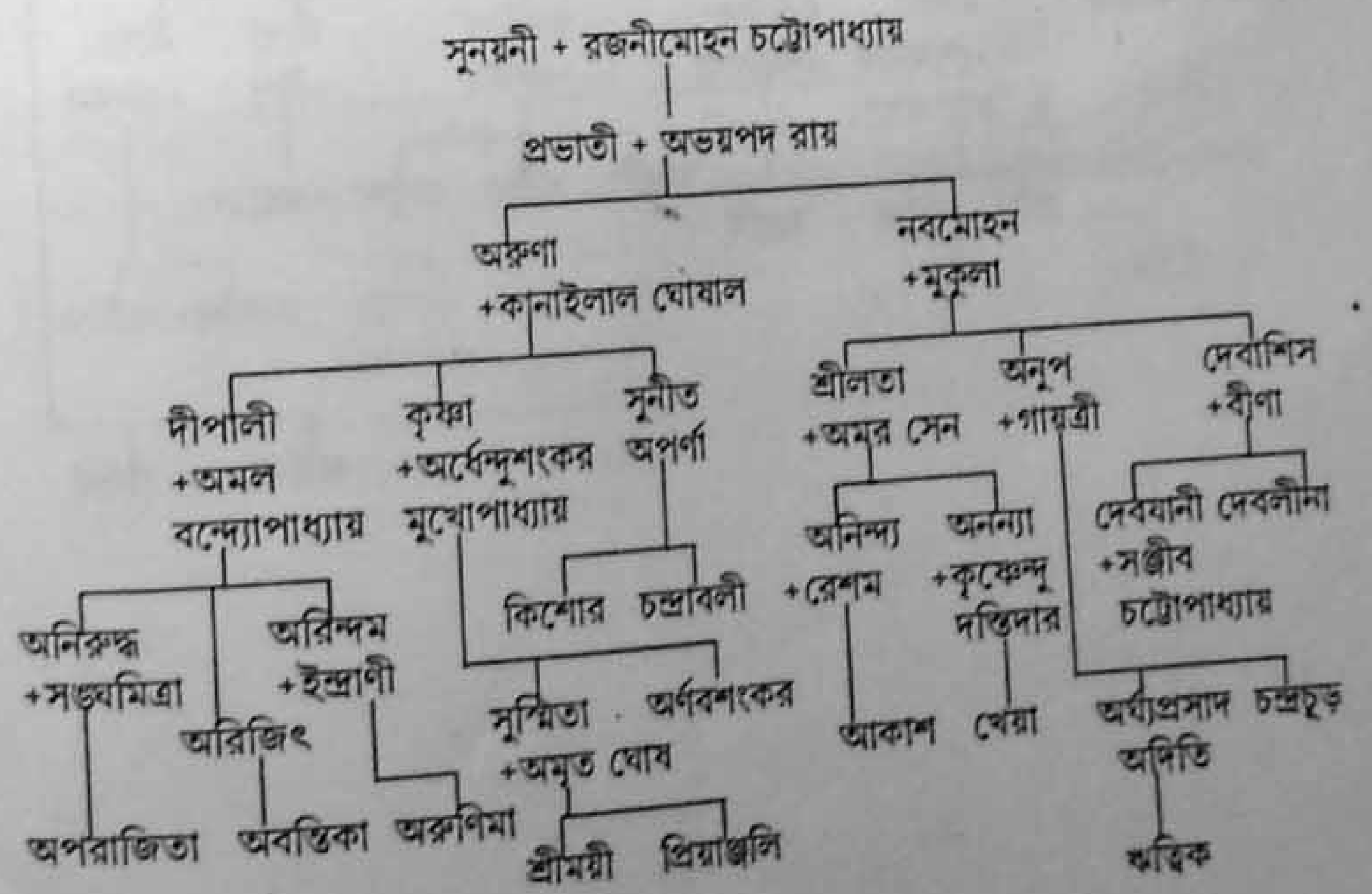
সুনয়নী + রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়
প্রভাতী + অভয়পদ রায়
অরুণা
+কানাইলাল ঘোষাল
নবমোহন
+মুকুলা
দীপালী
+অমল
বন্দ্যোপাধ্যায়
কৃষ্ণা
+অর্ধেন্দুশংকর
মুখোপাধ্যায়
সুনীত
অপর্ণা
শ্রীলতা
+অমর সেন
অনুপ
+গায়ত্রী
দেবাশিস
+বীণা
কিশোর
চন্দ্রাবলী
অনিন্দ্য
+রেশম
অনন্যা
+কৃষ্ণেন্দু
দস্তিদার
দেবযানী
দেবলীনা
+সঞ্জীব
চট্টোপাধ্যায়
অনিরুদ্ধ
+সঙ্ঘমিত্রা
অরিজিৎ
অরিন্দম
+ইন্দ্রাণী
সুস্মিতা
+অমৃত ঘোষ
অর্ণবশংকর
আকাশ
খেয়া
অর্ঘ্যপ্রসাদ
অদিতি
চন্দ্রচূড়
অপরাজিতা
অবন্তিকা
অরুণিমা
শ্রীময়ী
প্রিয়াঞ্জলি
ঋত্বিক

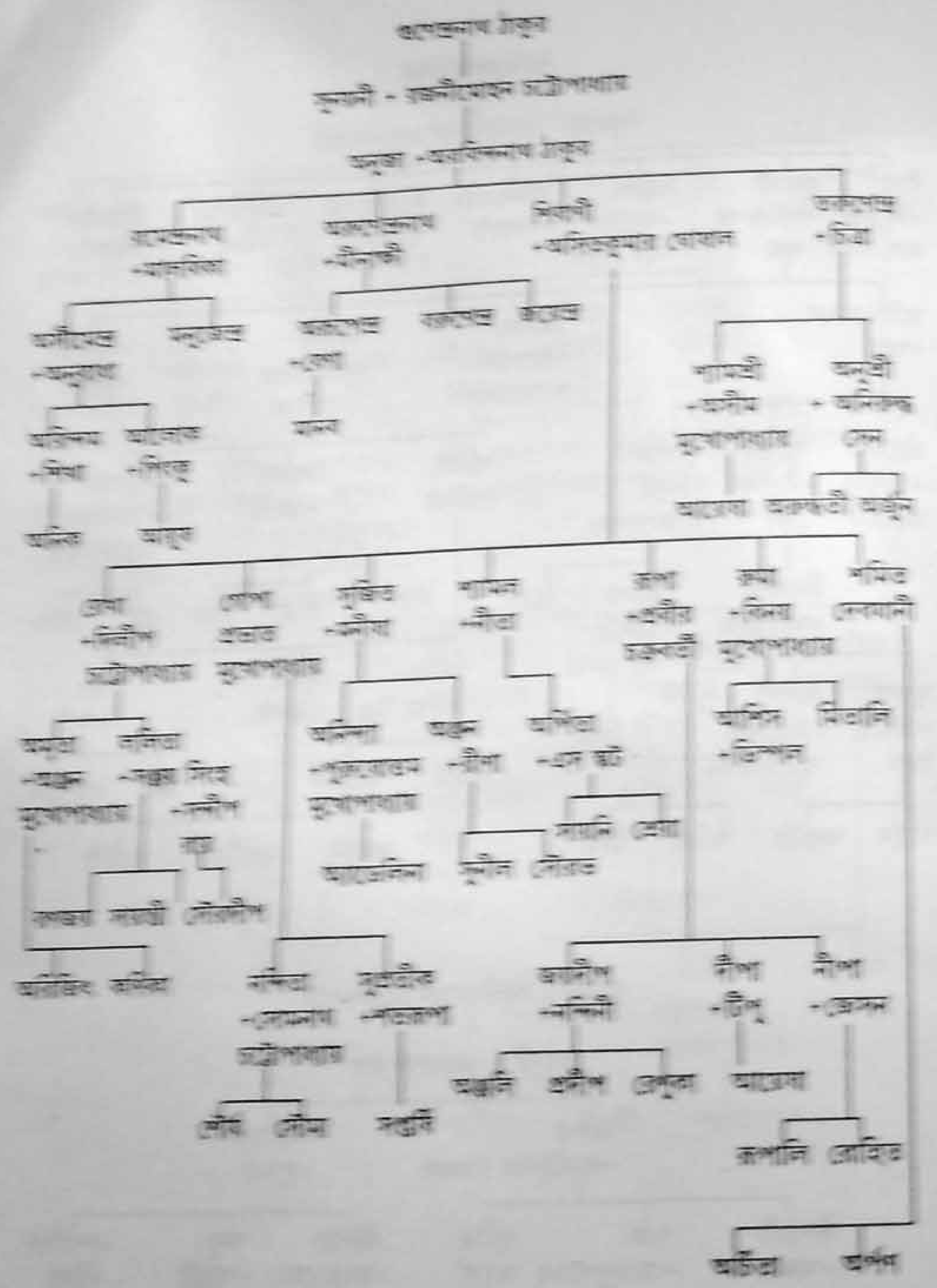
গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সুনয়নী - রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়
অনুজা - অরবিন্দনাথ ঠাকুর

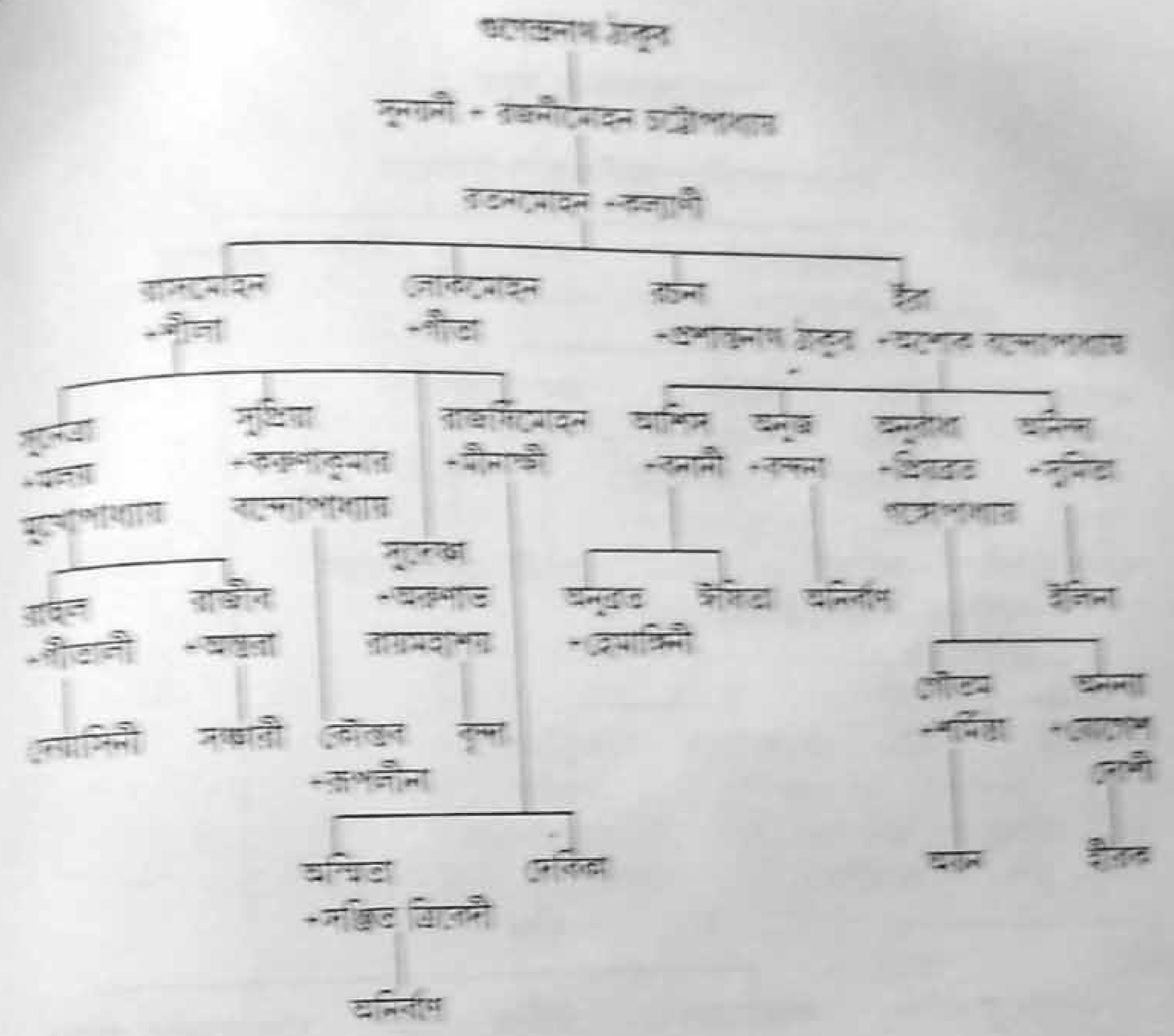
গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সুনয়নী - রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়
রতনমোহন - কল্যাণী

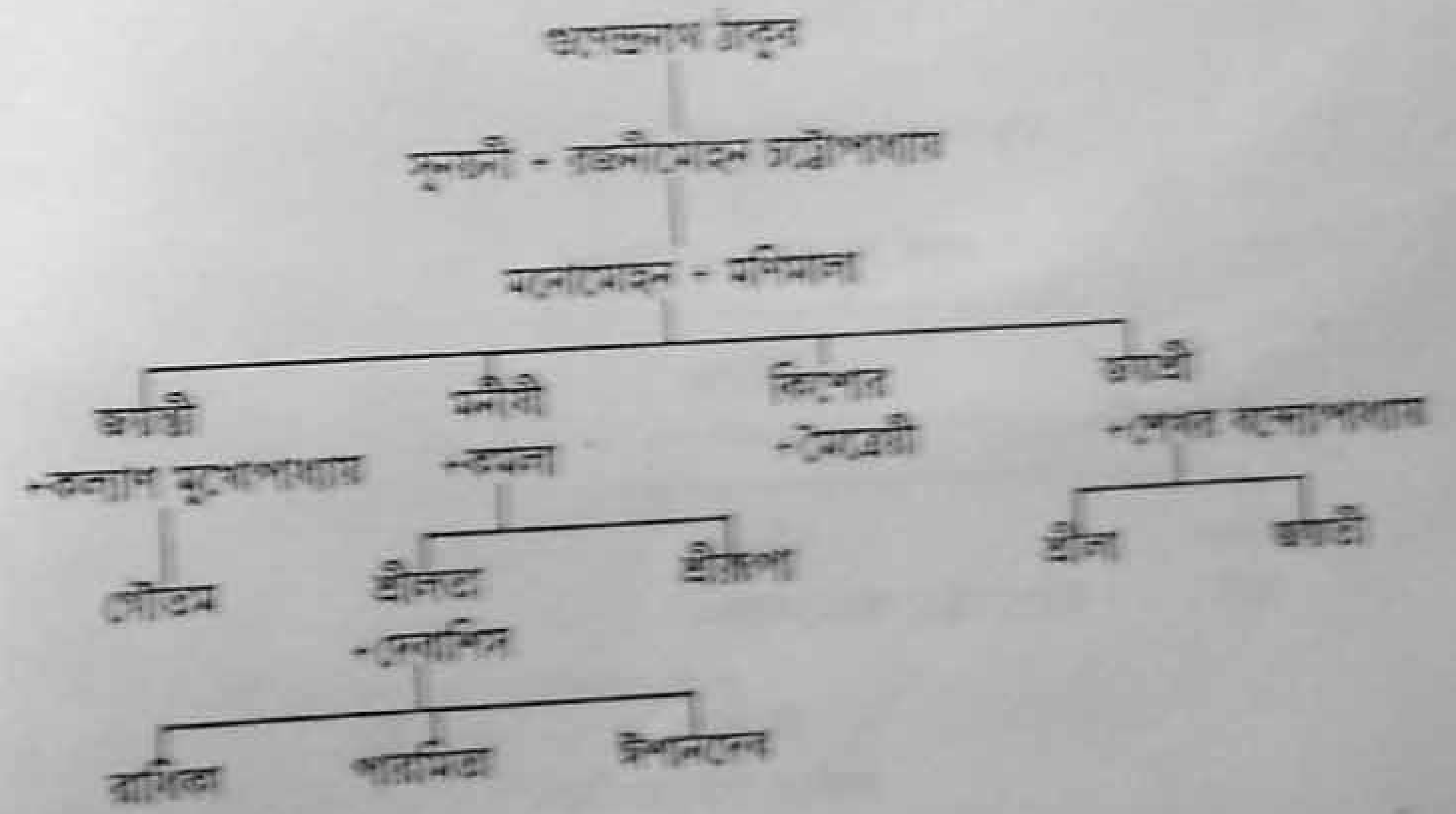
গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সুনয়নী - রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়
মনোমোহন - মণিমালা

গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুনয়নী + রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

- সুমোহন +বীণা
  - সম্মোহন +বন্দনা
    - পায়েল
  - সুমিতা +শক্তিনাথ মুখোপাধ্যায়
    - সঙ্গীতা +সৌমিত্র মুখোপাধ্যায়
      - শুভ্রজ্যোতি
      - ঈশানী
    - সংযুক্তা +অনিন্দ্য গোস্বামী
  - অনিন্দিতা +সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
    - সত্যরাজ
    - মধুমিতা +শুচিত মুখোপাধ্যায়
      - সুকৃৎ
  - মানসমোহন +তপতী +মিতা
    - রূপশ্রী
    - সৌরভমোহন
- শ্রীমোহন +আরতি
  - স্বপনমোহন
  - চন্দ্রিকা
  - শুক্লা
  - সুজিতমোহন
  - সান্ত্বনা

গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাদম্বিনী + যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

- জ্যোতিপ্রকাশ
  - যামিনীপ্রকাশ +সুনীলা
    - জনকপ্রকাশ +ভারতী
      - অহীজিৎ
    - চন্দ্রিমা +কালিদাস চট্টোপাধ্যায়
      - মানসী +তাপস
      - সুনন্দা +রত্নাকর
        - সন্দীপ +সুমনা
        - সুমিত +অনুভা
          - ইভা
        - সুবীর +রচনা
      - মাধবী +বিনয়
        - কৃষ্ণকলি +গৌতম চট্টোপাধ্যায়
          - গৌরব
          - পূজা
      - প্রণতি +নীলাংশু ঘোষ
        - অলি
        - অরুণাংশু +অনিন্দিতা
      - সুদীপ্ত +মঞ্জরী
        - সুপ্রতীম +আনু
      - কল্যাণ +স্নিগ্ধা
        - সুচন্দ্রা +সন্দীপ জুনেজা
        - অভিষেক
  - জীনপ্রকাশ +লতিকা
    - তিলোত্তমা +অমিয়কুমার বসু
      - অনুপ
      - গৌরী
      - কাঞ্চন
- নৃপবালা +হরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
- ধীরবালা +অমিয়নাথ মুখোপাধ্যায়
- ইন্দুপ্রকাশ

কাদম্বিনী + যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

নৃপবালা + হরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

- জগদীন্দ্রনাথ +মহাপ্রভা
  - অরবিন্দনাথ +অনুজা
    - রমেন্দ্রনাথ +মালবিকা +মীনাক্ষী
      - অসীমেন্দ্র অনুরাধা
        - অরিন্দম +শিখা
          - অনিক
        - আলোক +পিংকু
          - আয়ুষ
      - মনুজেন্দ্র
    - অরুণেন্দ্র
    - শিবানী +অসিতকুমার ঘোষাল
      - অরুণেন্দ্র +বেণা
        - মানব
      - বরুণেন্দ্র
      - জয়েন্দ্র
  - রথীন্দ্রনাথ +অনিমা
  - কল্যাণী +রতনমোহন চট্টোপাধ্যায়
  - তরুণেন্দ্র +চিত্রা
- নৃত্যেন্দ্রনাথ +তড়িৎপ্রভা
- প্রণয়িনী +জলধিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
- মায়াবিনী +কিরণমালী মুখোপাধ্যায়

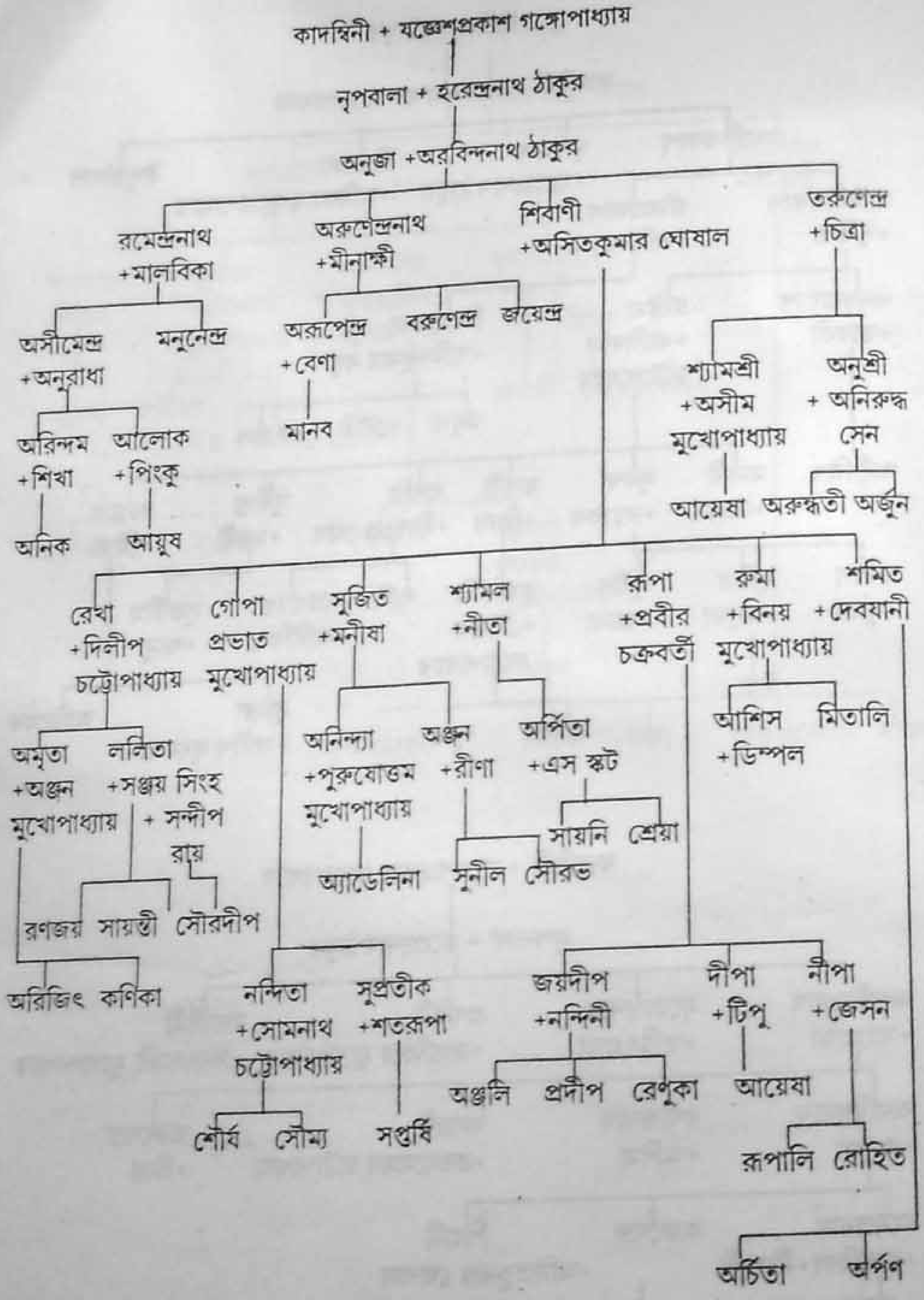
কাদম্বিনী + যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
নৃপবালা + হরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
অনুজা + অরবিন্দনাথ ঠাকুর
রমেন্দ্রনাথ +মালবিকা
অরুণেন্দ্রনাথ +মীনাক্ষী
শিবাণী +অসিতকুমার ঘোষাল
তরুণেন্দ্র +চিত্রা
অসীমেন্দ্র +অনুরাধা
মনুনেন্দ্র
অরূপেন্দ্র +বেণা
বরুণেন্দ্র
জয়েন্দ্র
মানব
শ্যামশ্রী +অসীম মুখোপাধ্যায়
অনুশ্রী + অনিরুদ্ধ সেন
আয়েষা
অরুন্ধতী
অর্জুন
অরিন্দম +শিখা
আলোক +পিংকু
অনিক
আয়ুষ
রেখা +দিলীপ চট্টোপাধ্যায়
গোপা প্রভাত মুখোপাধ্যায়
সুজিত +মনীষা
শ্যামল +নীতা
রূপা +প্রবীর চক্রবর্তী
রুমা +বিনয় মুখোপাধ্যায়
শমিত +দেবযানী
অমৃতা +অঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ললিতা +সঞ্জয় সিংহ + সন্দীপ রায়
অনিন্দ্য +পুরুষোত্তম মুখোপাধ্যায়
অঞ্জন +রীণা
অর্পিতা +এস স্কট
আশিস +ডিম্পল
মিতালি
সায়নি
শ্রেয়া
রণজয়
সায়ন্তী
সৌরদীপ
অ্যাডেলিনা
সুনীল
সৌরভ
অরিজিৎ
কণিকা
নন্দিতা +সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়
সুপ্রতীক +শতরূপা
জয়দীপ +নন্দিনী
দীপা +টিপু
নীপা +জেসন
অঞ্জলি
প্রদীপ
রেণুকা
আয়েষা
শৌর্য
সৌম্য
সপ্তর্ষি
রূপালি
রোহিত
অর্চিতা
অর্পণ

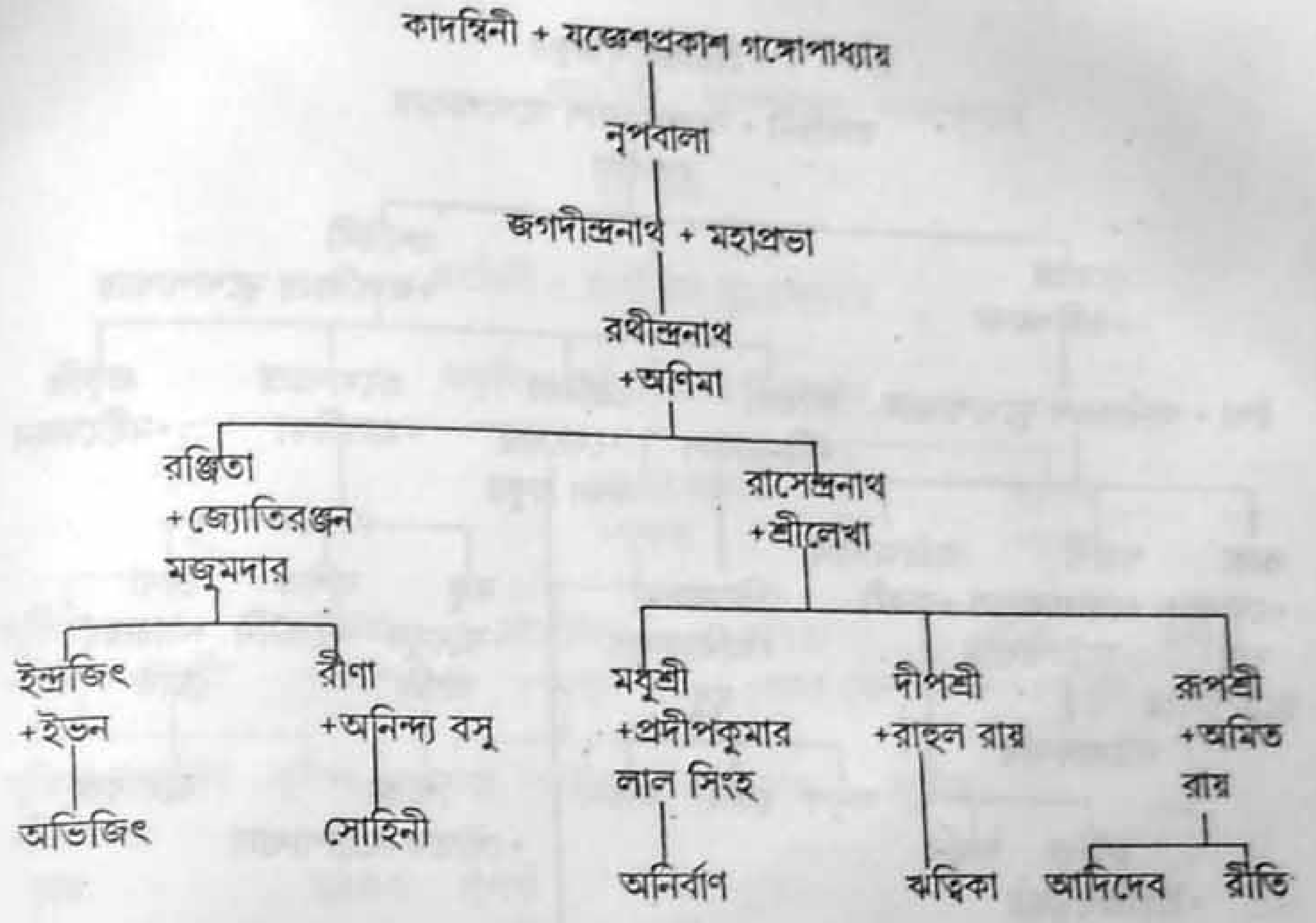
কাদম্বিনী + যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
নৃপবালা
জগদীন্দ্রনাথ + মহাপ্রভা
রথীন্দ্রনাথ +অণিমা
রঞ্জিতা +জ্যোতিরঞ্জন মজুমদার
রাসেন্দ্রনাথ +শ্রীলেখা
ইন্দ্রজিৎ +ইভন
রীণা +অনিন্দ্য বসু
মধুশ্রী +প্রদীপকুমার লাল সিংহ
দীপশ্রী +রাহুল রায়
রূপশ্রী +অমিত রায়
অভিজিৎ
সোহিনী
অনির্বাণ
ঋত্বিকা
আদিদেব
রীতি

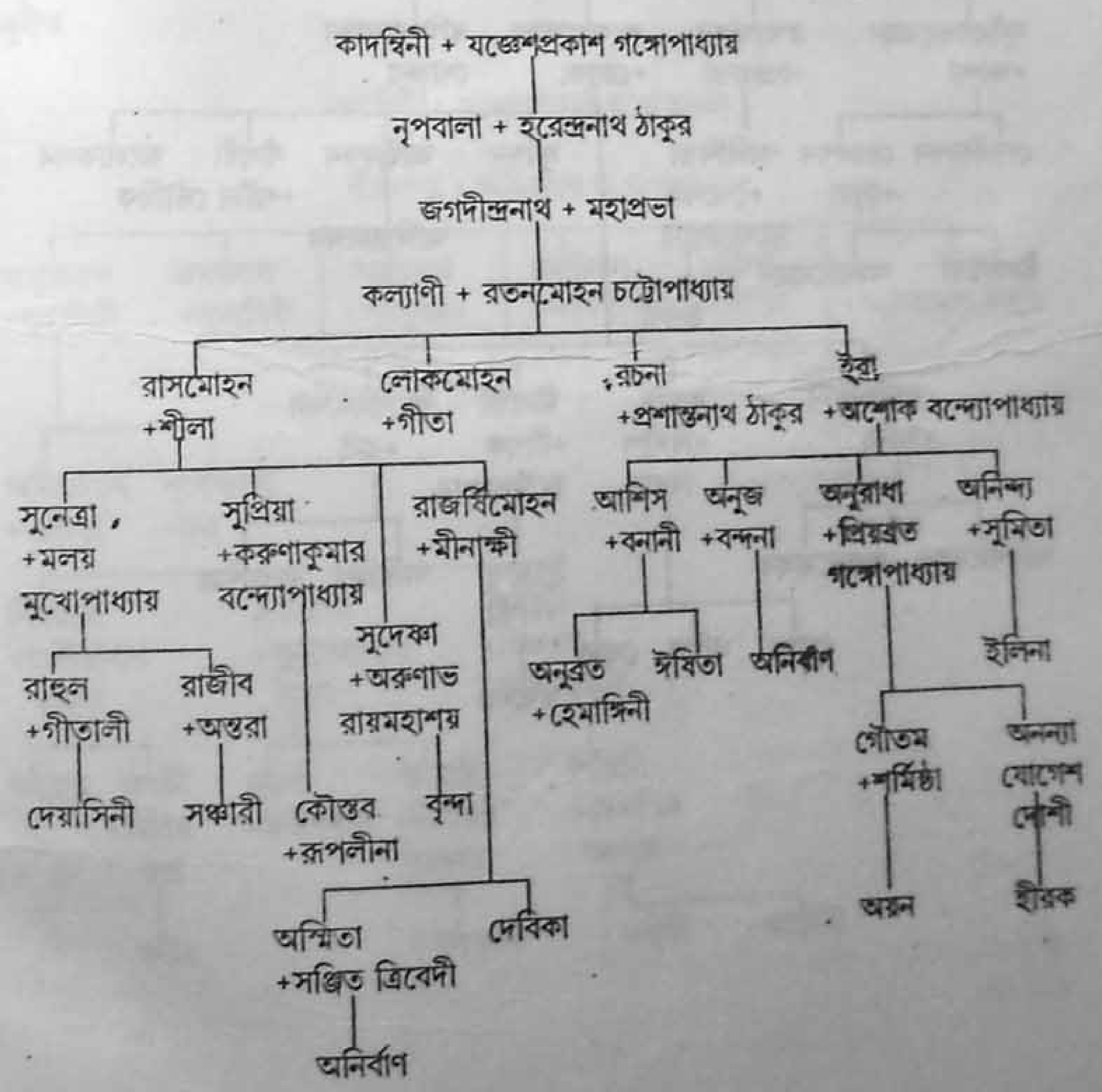
কাদম্বিনী + যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
নৃপবালা + হরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
জগদীন্দ্রনাথ + মহাপ্রভা
কল্যাণী + রতনমোহন চট্টোপাধ্যায়
রাসমোহন +শীলা
লোকমোহন +গীতা
রচনা +প্রশান্তনাথ ঠাকুর
ইরা +অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়
সুনেত্রা +মলয় মুখোপাধ্যায়
সুপ্রিয়া +করুণাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
রাজর্ষিমোহন +মীনাক্ষী
আশিস +বনানী
অনুজ +বন্দনা
অনুরাধা +প্রিয়ব্রত গঙ্গোপাধ্যায়
অনিন্দ্য +সুমিতা
সুদেষ্ণা +অরুণাভ রায়মহাশয়
রাহুল +গীতালী
রাজীব +অন্তরা
অনুব্রত +হেমাঙ্গিনী
ঈপ্সিতা
অনির্বাণ
ইলিনা
গৌতম +শর্মিষ্ঠা
অনন্যা যোগেশ যোশী
দেয়াসিনী
সঞ্চারী
কৌস্তুভ +রূপলীনা
বৃন্দা
অস্মিতা +সঞ্জিত ত্রিবেদী
দেবিকা
অনির্বাণ
অয়ন
হীরক

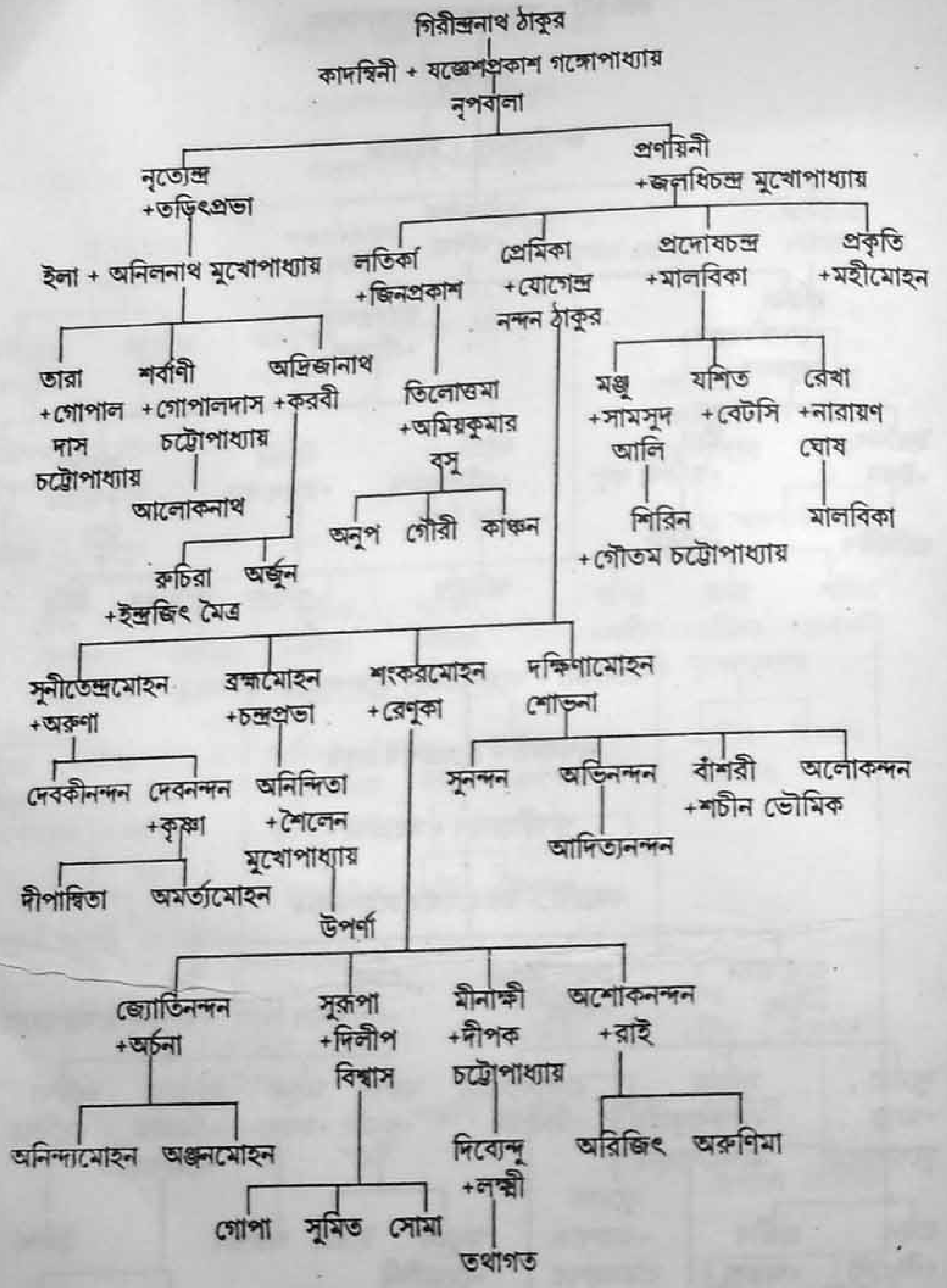
গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর
কাদম্বিনী + যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
নৃপবালা
নৃত্যেন্দ্র +তড়িৎপ্রভা
প্রণয়িনী +জলধিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
ইলা + অনিলনাথ মুখোপাধ্যায়
লতিকা +জিনপ্রকাশ
প্রেমিকা +যোগেন্দ্র নন্দন ঠাকুর
প্রদোষচন্দ্র +মালবিকা
প্রকৃতি +মহীমোহন
তারা +গোপাল দাস চট্টোপাধ্যায়
শর্বাণী +গোপালদাস চট্টোপাধ্যায়
অদ্রিজানাথ +করবী
তিলোত্তমা +অমিয়কুমার বসু
মঞ্জু +সামসুদ আলি
যশিত +বেটসি
রেখা +নারায়ণ ঘোষ
আলোকনাথ
অনুপ গৌরী কাঞ্চন
শিরিন +গৌতম চট্টোপাধ্যায়
মালবিকা
রুচিরা +ইন্দ্রজিৎ মৈত্র
অর্জুন
সুনীতেন্দ্রমোহন +অরুণা
ব্রহ্মমোহন +চন্দ্রপ্রভা
শংকরমোহন +রেণুকা
দক্ষিণামোহন শোভনা
দেবকীনন্দন
দেবনন্দন +কৃষ্ণা
অনিন্দিতা +শৈলেন মুখোপাধ্যায়
সুনন্দন অভিনন্দন বাঁশরী +শচীন ভৌমিক অলোকনন্দন
আদিত্যনন্দন
দীপান্বিতা অমর্ত্যমোহন
উপর্ণা
জ্যোতিনন্দন +অর্চনা
সুরূপা +দিলীপ বিশ্বাস
মীনাক্ষী +দীপক চট্টোপাধ্যায়
অশোকনন্দন +রাই
অনিন্দ্যমোহন অঞ্জনমোহন
দিব্যেন্দু +লক্ষ্মী
অরিজিৎ অরুণিমা
গোপা সুমিত সোমা
তথাগত

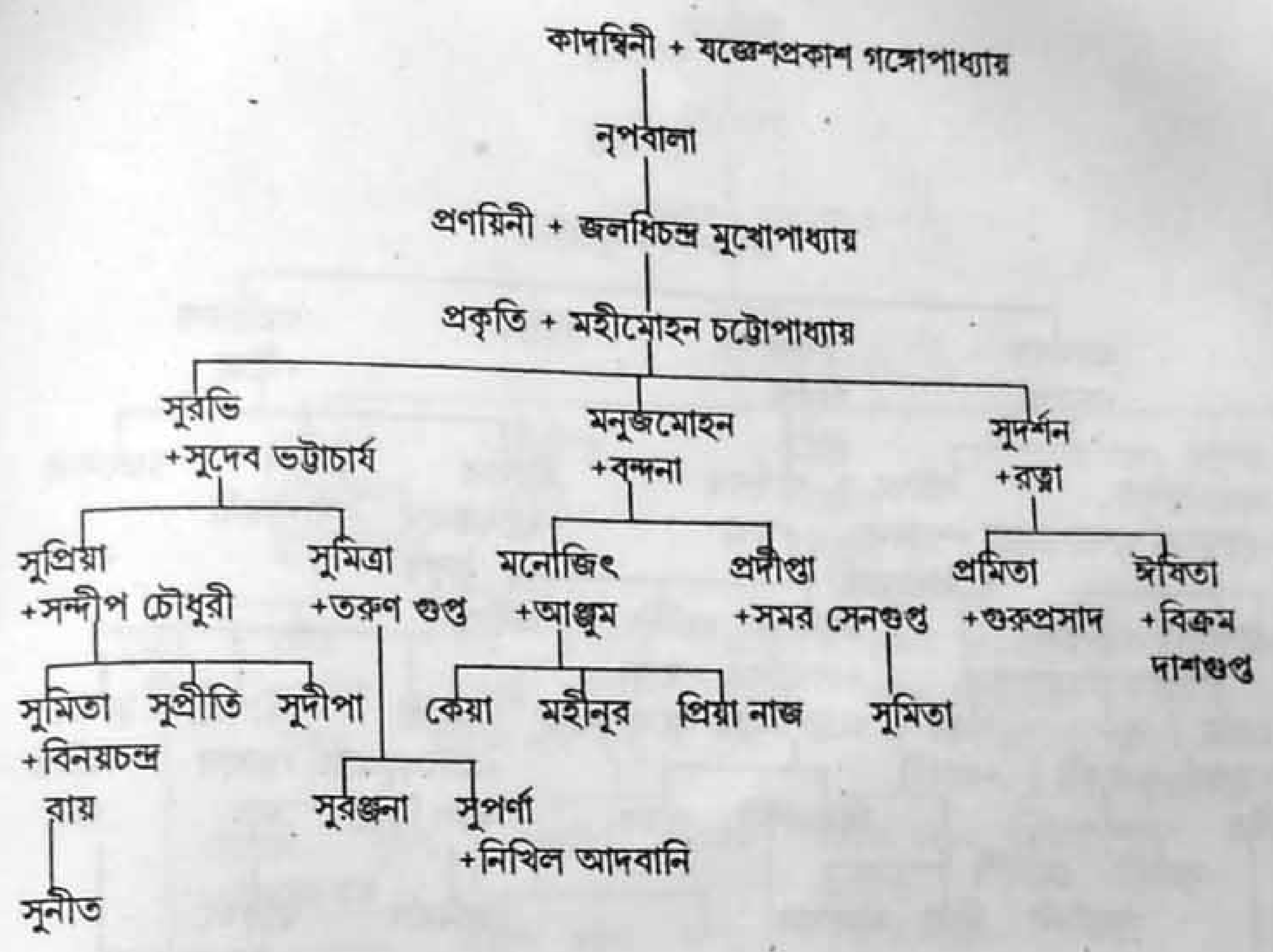
কাদম্বিনী + যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
নৃপবালা
প্রণয়িনী + জলধিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
প্রকৃতি + মহীমোহন চট্টোপাধ্যায়
সুরভি +সুদেব ভট্টাচার্য
মনুজমোহন +বন্দনা
সুদর্শন +রত্না
সুপ্রিয়া +সন্দীপ চৌধুরী
সুমিত্রা +তরুণ গুপ্ত
মনোজিৎ +আঞ্জুম
প্রদীপ্তা +সমর সেনগুপ্ত
প্রমিতা +গুরুপ্রসাদ
ঈপ্সিতা +বিক্রম দাশগুপ্ত
সুমিতা +বিনয়চন্দ্র রায়
সুপ্রীতি সুদীপা
কেয়া মহীনূর প্রিয়া নাজ
সুমিতা
সুরঞ্জনা সুপর্ণা +নিখিল আদবানি
সুনীত

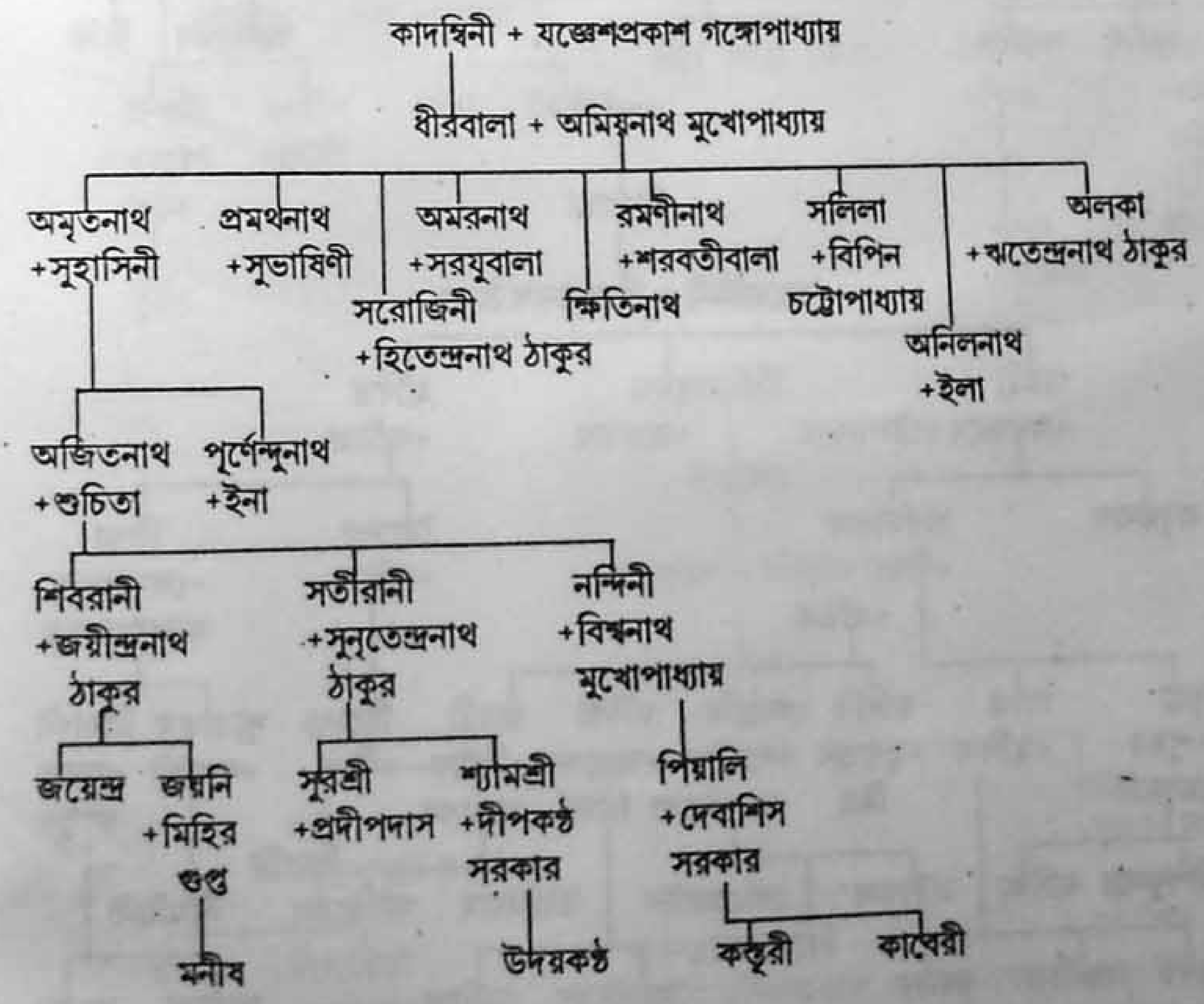
কাদম্বিনী + যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
ধীরবালা + অমিয়নাথ মুখোপাধ্যায়
অমৃতনাথ +সুহাসিনী
প্রমথনাথ +সুভাষিণী
অমরনাথ +সরযূবালা
সরোজিনী +হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর
রমণীনাথ +শরবতীবালা
ক্ষিতিনাথ
সলিলা +বিপিন চট্টোপাধ্যায়
অলকা +ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর
অনিলনাথ +ইলা
অজিতনাথ +শুচিতা
পূর্ণেন্দুনাথ +ইনা
শিবরানী +জয়ীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সতীরানী +সুনৃতেন্দ্রনাথ ঠাকুর
নন্দিনী +বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়
জয়েন্দ্র
জয়নি +মিহির গুপ্ত
মনীষ
সুরশ্রী +প্রদীপদাস
শ্যামশ্রী +দীপকণ্ঠ সরকার
উদয়কণ্ঠ
পিয়ালি +দেবাশিস সরকার
কস্তুরী কাবেরী

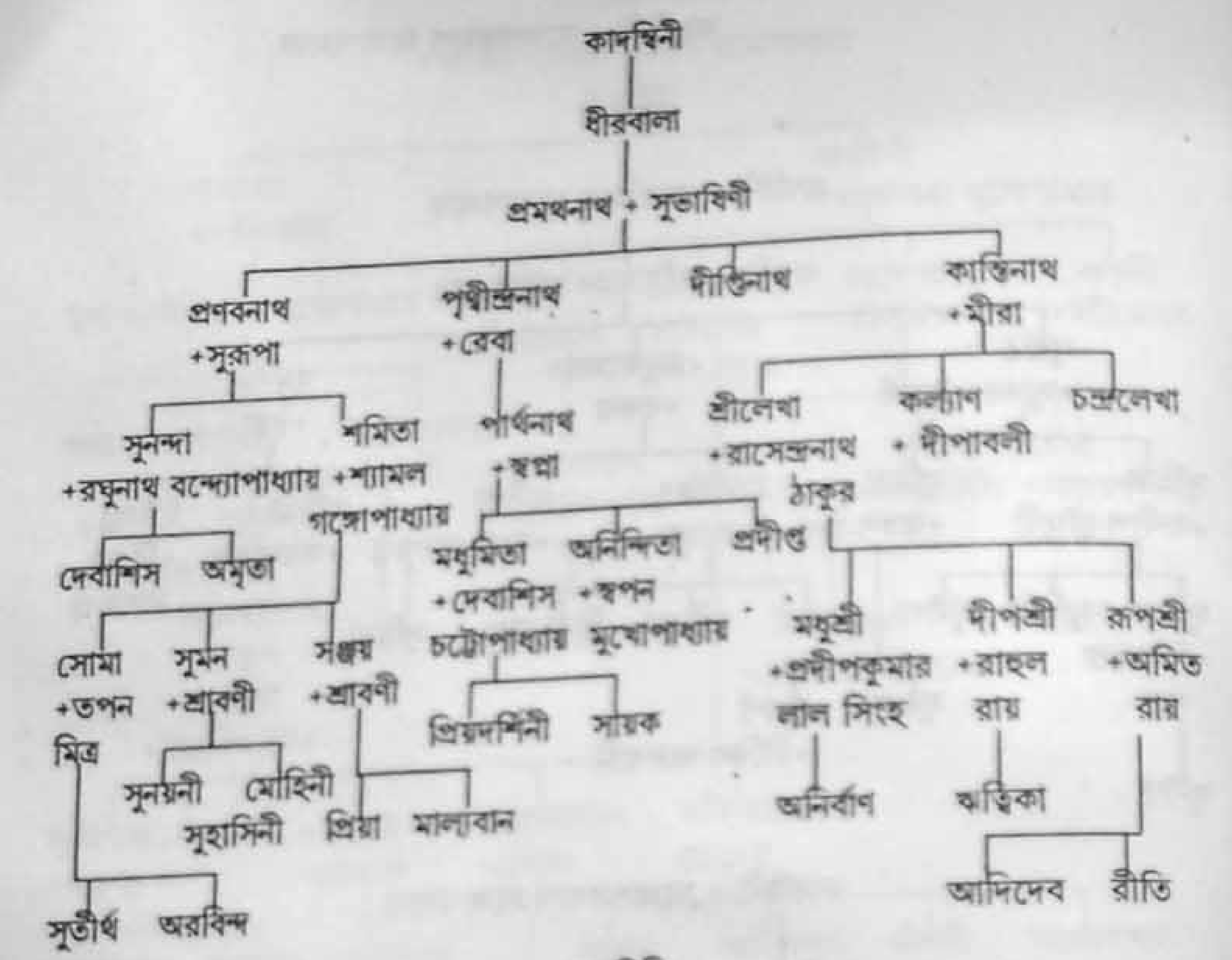
কাদম্বিনী
ধীরবালা
প্রমথনাথ + সুভাষিণী
প্রণবনাথ
+সুরূপা
পৃথ্বীন্দ্রনাথ
+রেবা
দীপ্তিনাথ
কান্তিনাথ
+মীরা
সুনন্দা
+রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শমিতা
+শ্যামল
গঙ্গোপাধ্যায়
পার্থনাথ
+স্বপ্না
শ্রীলেখা
+রাসেন্দ্রনাথ
ঠাকুর
কল্যাণ
+দীপাবলী
চন্দ্রলেখা
দেবাশিস অমৃতা
মধুমিতা
+দেবাশিস
চট্টোপাধ্যায়
অনিন্দিতা
+স্বপন
মুখোপাধ্যায়
প্রদীপ্ত
মধুশ্রী
+প্রদীপকুমার
লাল সিংহ
দীপশ্রী
+রাহুল
রায়
রূপশ্রী
+অমিত
রায়
সোমা
+তপন
মিত্র
সুমন
+শ্রাবণী
সঞ্জয়
+শ্রাবণী
প্রিয়দর্শিনী সায়ক
অনির্বাণ
ঋত্বিকা
সুনয়নী মোহিনী
সুহাসিনী
প্রিয়া মাল্যবান
আদিদেব রীতি
সুতীর্থ অরবিন্দ

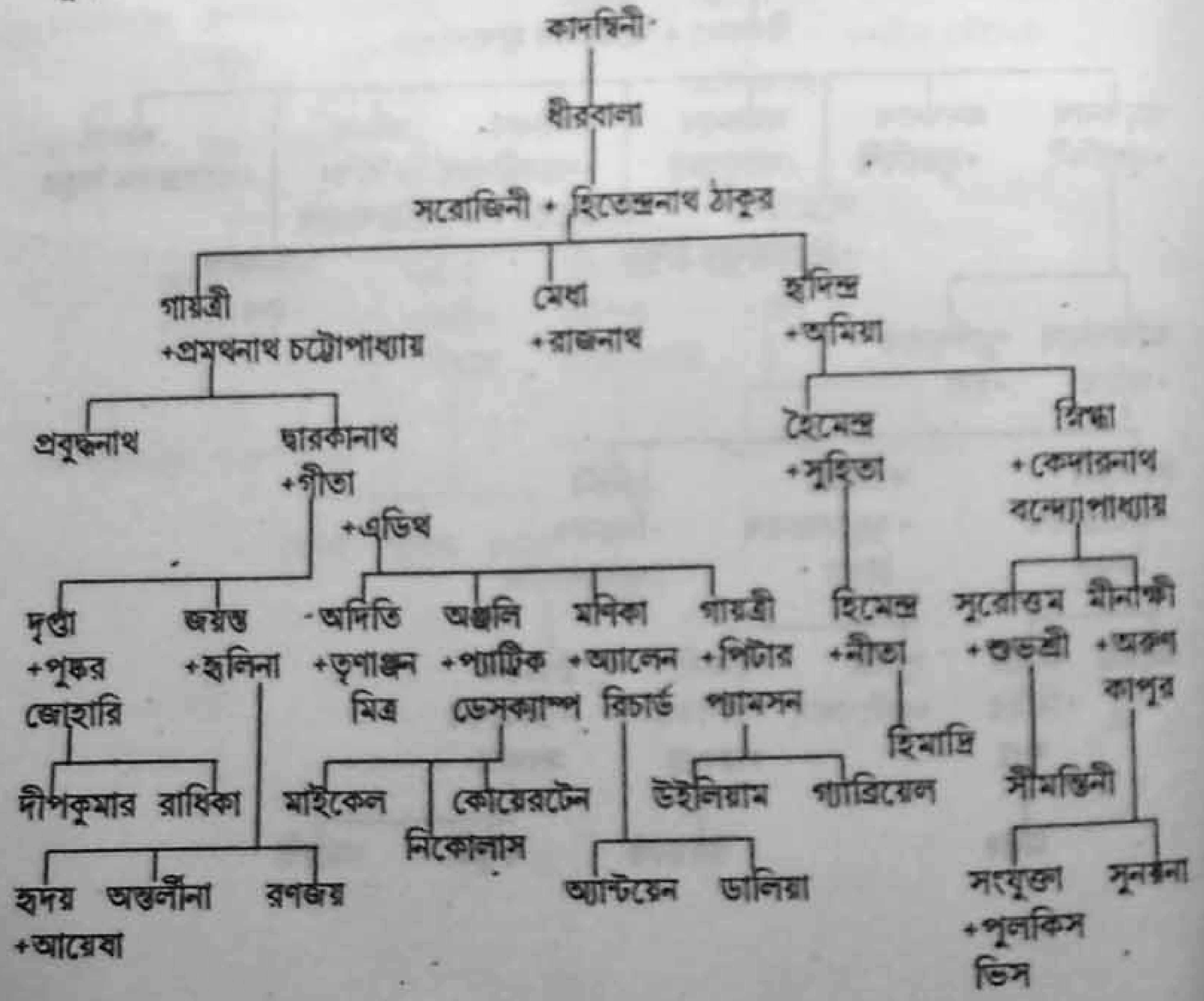
কাদম্বিনী
ধীরবালা
সরোজিনী + হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর
গায়ত্রী
+প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়
মেধা
+রাজনাথ
হৃদিন্দ্র
+অমিয়া
প্রবুদ্ধনাথ
দ্বারকানাথ
+গীতা
+এডিথ
হেমেন্দ্র
+সুহিতা
ঐন্দ্রিলা
+কেদারনাথ
বন্দ্যোপাধ্যায়
দৃপ্তা
+পুষ্কর
জোহারি
জয়ন্ত
+হুলিনা
অদিতি
+তৃণাঙ্কুর
মিত্র
অঞ্জলি
+প্যাট্রিক
ডেসক্যাম্প
মনিকা
+অ্যালেন
রিচার্ড
গায়ত্রী
+পিটার
প্যামসন
হিমেন্দ্র
+নীতা
সুরোত্তম
+শুভশ্রী
মীনাক্ষী
+অরুণ
কাপুর
হিমাদ্রি
দীপকুমার রাধিকা
মাইকেল
কোয়েরটেন
নিকোলাস
উইলিয়াম গ্যাব্রিয়েল
সীমন্তিনী
হৃদয়
+আয়েষা
অন্তর্লীনা
রণজয়
অ্যান্টয়েন ডালিয়া
সংযুক্তা
+পুলকিস
ভিস
সুনন্দা

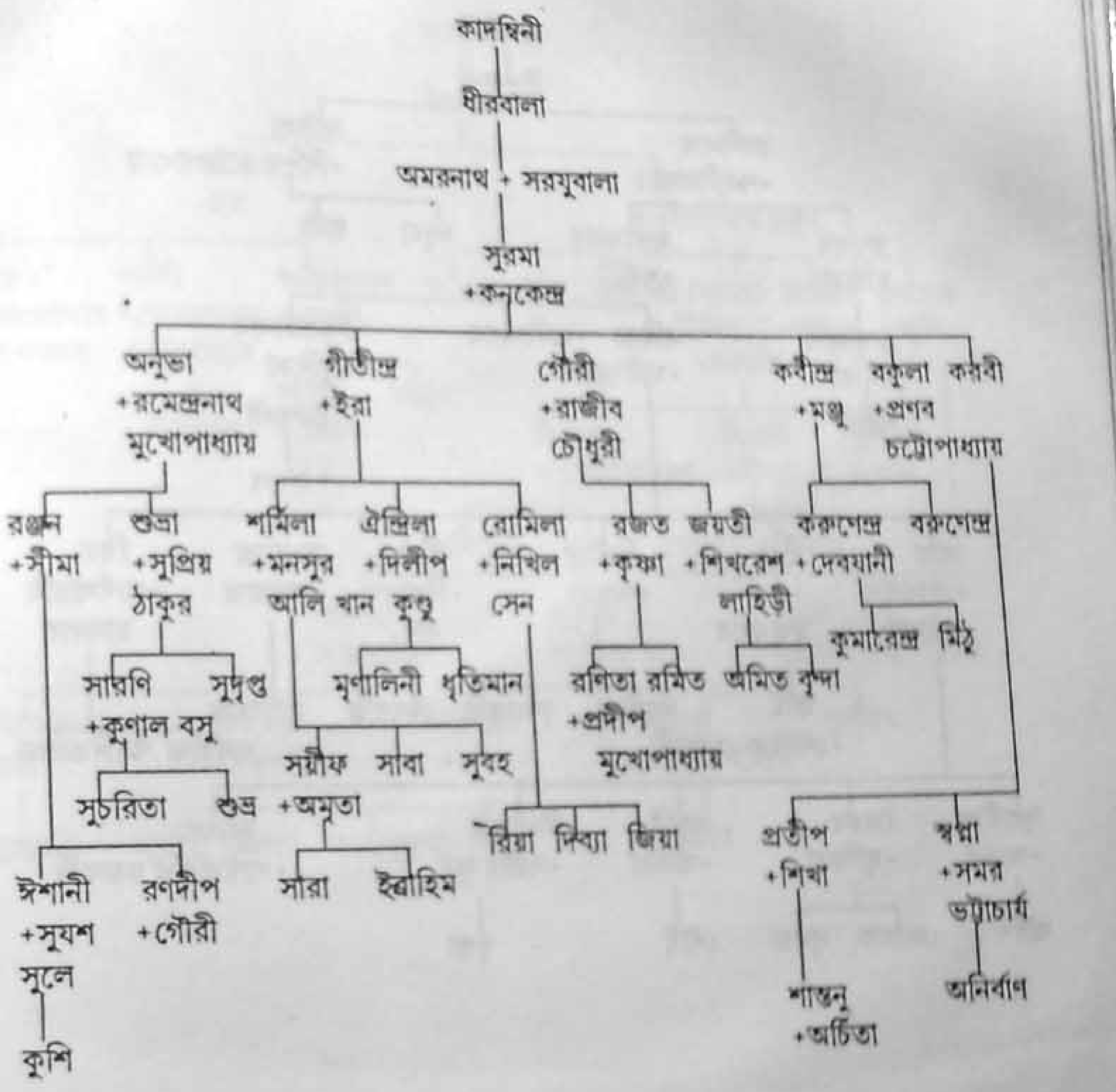
কাদম্বিনী
ধীরবালা
অমরনাথ + সরযুবালা
সুরমা
+কনকেন্দ্র
অনুভা
+রমেন্দ্রনাথ
মুখোপাধ্যায়
গীতীন্দ্র
+ইরা
গৌরী
+রাজীব
চৌধুরী
কবীন্দ্র
+মঞ্জু
বকুলা
+প্রণব
চট্টোপাধ্যায়
করবী
রঞ্জন
+সীমা
শুভ্রা
+সুপ্রিয়
ঠাকুর
শর্মিলা
+মনসুর
আলি খান
ঐন্দ্রিলা
+দিলীপ
কুণ্ডু
রোমিলা
+নিখিল
সেন
রজত
+কৃষ্ণা
জয়তী
+শিখরেশ
লাহিড়ী
করুণেন্দ্র
+দেবযানী
বরুণেন্দ্র
সারণি
+কুণাল বসু
সুদৃপ্ত
মৃণালিনী ধৃতিমান
রণিতা
+প্রদীপ
মুখোপাধ্যায়
রমিত
অমিত বৃন্দা
কুমারেন্দ্র মিঠু
সয়ীফ সাবা সুবহ
+অমৃতা
সুচরিতা শুভ্র
রিয়া দিয়া জিয়া
প্রতীপ
+শিখা
স্বপ্না
+সমর
ভট্টাচার্য
ঈশানী
+সুযশ
সুলে
রণদীপ
+গৌরী
সারা ইব্রাহিম
শান্তনু
+অর্চিতা
অনির্বাণ
কুশি

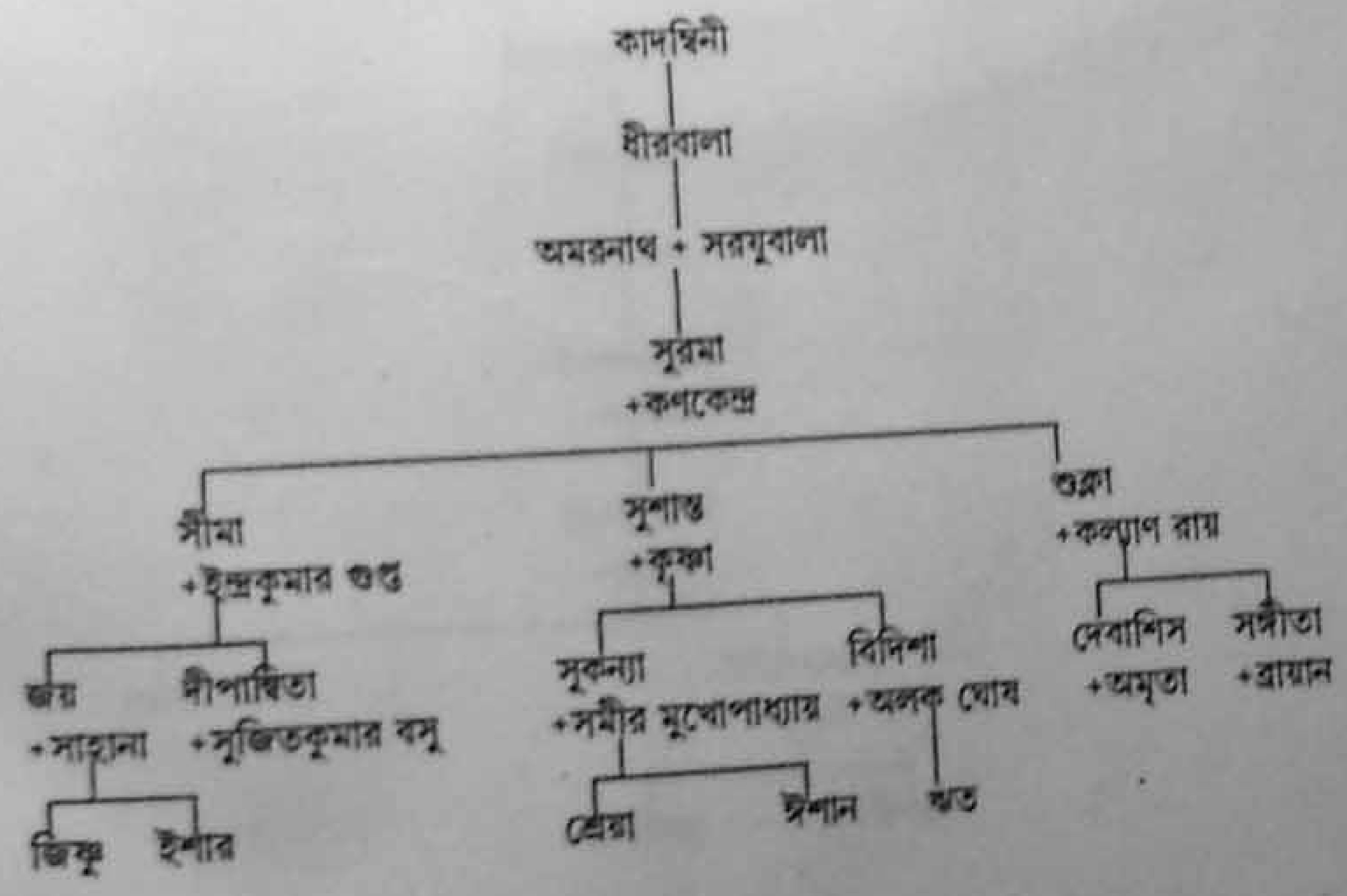
কাদম্বিনী
ধীরবালা
অমরনাথ + সরযুবালা
সুরমা
+কণকেন্দ্র
সীমা
+ইন্দ্রকুমার গুপ্ত
সুশান্ত
+কৃষ্ণা
শুক্লা
+কল্যাণ রায়
জয়
+সাহানা
দীপান্বিতা
+সুজিতকুমার বসু
সুকন্যা
+সমীর মুখোপাধ্যায়
বিদিশা
+অলক ঘোষ
দেবাশিস
+অমৃতা
সঙ্গীতা
+ব্রায়ান
জিষ্ণু ঈশার
শ্রেয়া ঈশান ঋত

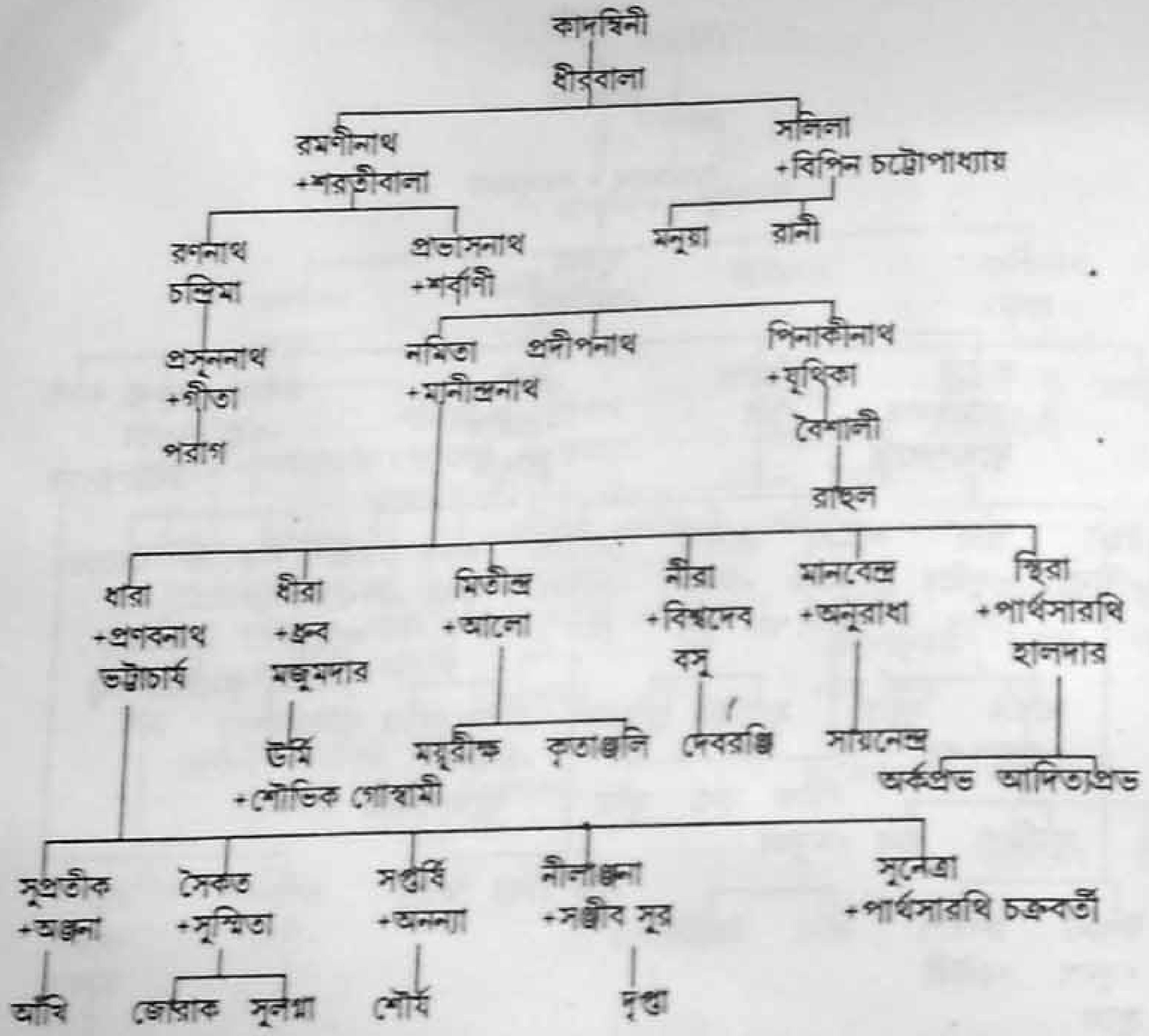
কাদম্বিনী
ধীরবালা
রমণীনাথ
+শরতীবালা
সলিলা
+বিপিন চট্টোপাধ্যায়
রণনাথ
চন্দ্রিমা
প্রভাসনাথ
+শর্বাণী
মনুয়া
রানী
প্রশুনাথ
+গীতা
পরাগ
নমিতা
+মানীন্দ্রনাথ
প্রদীপনাথ
পিনাকীনাথ
+যূথিকা
বৈশালী
রাহুল
ধারা
+প্রণবনাথ
ভট্টাচার্য
ধীরা
+ধ্রুব
মজুমদার
মিতীন্দ্র
+আলো
নীরা
+বিশ্বদেব
বসু
মানবেন্দ্র
+অনুরাধা
স্থিরা
+পার্থসারথি
হালদার
ঊর্মি
+শৌভিক গোস্বামী
ময়ূরাক্ষ
কৃতাঞ্জলি
দেবরঞ্জি
সায়নেন্দ্র
অর্কপ্রভ
আদিত্যপ্রভ
সুপ্রতীক
+অঞ্জনা
সৈকত
+সুস্মিতা
সপ্তর্ষি
+অনন্যা
নীলাঞ্জনা
+সঞ্জীব সুর
সুনেত্রা
+পার্থসারথি চক্রবর্তী
আঁখি
জোনাক
সুলগ্না
শৌর্য
দৃপ্তা

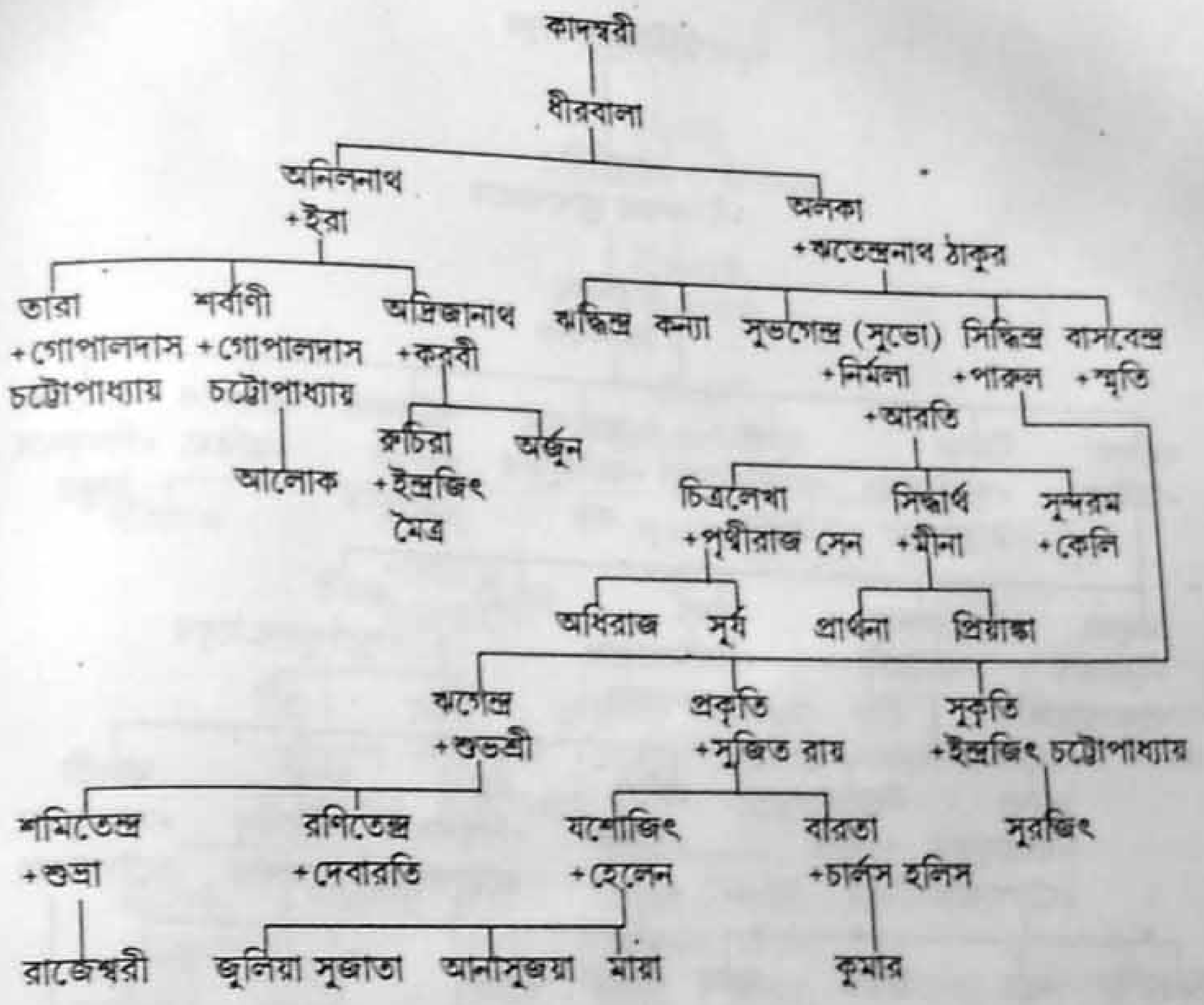
কাদম্বরী
ধীরবালা
অনিলনাথ
+ইরা
অলকা
+ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর
তারা
+গোপালদাস
চট্টোপাধ্যায়
শর্বাণী
+গোপালদাস
চট্টোপাধ্যায়
অভিজ্ঞানাথ
+করবী
ঋদ্ধিন্দ্র
কন্যা
সুভগেন্দ্র (সুভো)
+নির্মলা
+আরতি
সিদ্ধিন্দ্র
+পারুল
বাসবেন্দ্র
+স্মৃতি
আলোক
রুচিরা
+ইন্দ্রজিৎ
মৈত্র
অর্জুন
চিত্রলেখা
+পৃথ্বীরাজ সেন
সিদ্ধার্থ
+মীনা
সুন্দরম
+কেলি
অধিরাজ
সূর্য
প্রার্থনা
প্রিয়াঙ্কা
ঋতেন্দ্র
+শুভশ্রী
প্রকৃতি
+সুজিত রায়
সুকৃতি
+ইন্দ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায়
শমিতেন্দ্র
+শুভ্রা
রণিতেন্দ্র
+দেবারতি
যশোজিৎ
+হেলেন
বারতা
+চার্লস হলিস
সুরজিৎ
রাজেশ্বরী
জুলিয়া সুজাতা
আনাসুজয়া
মায়া
কুমার

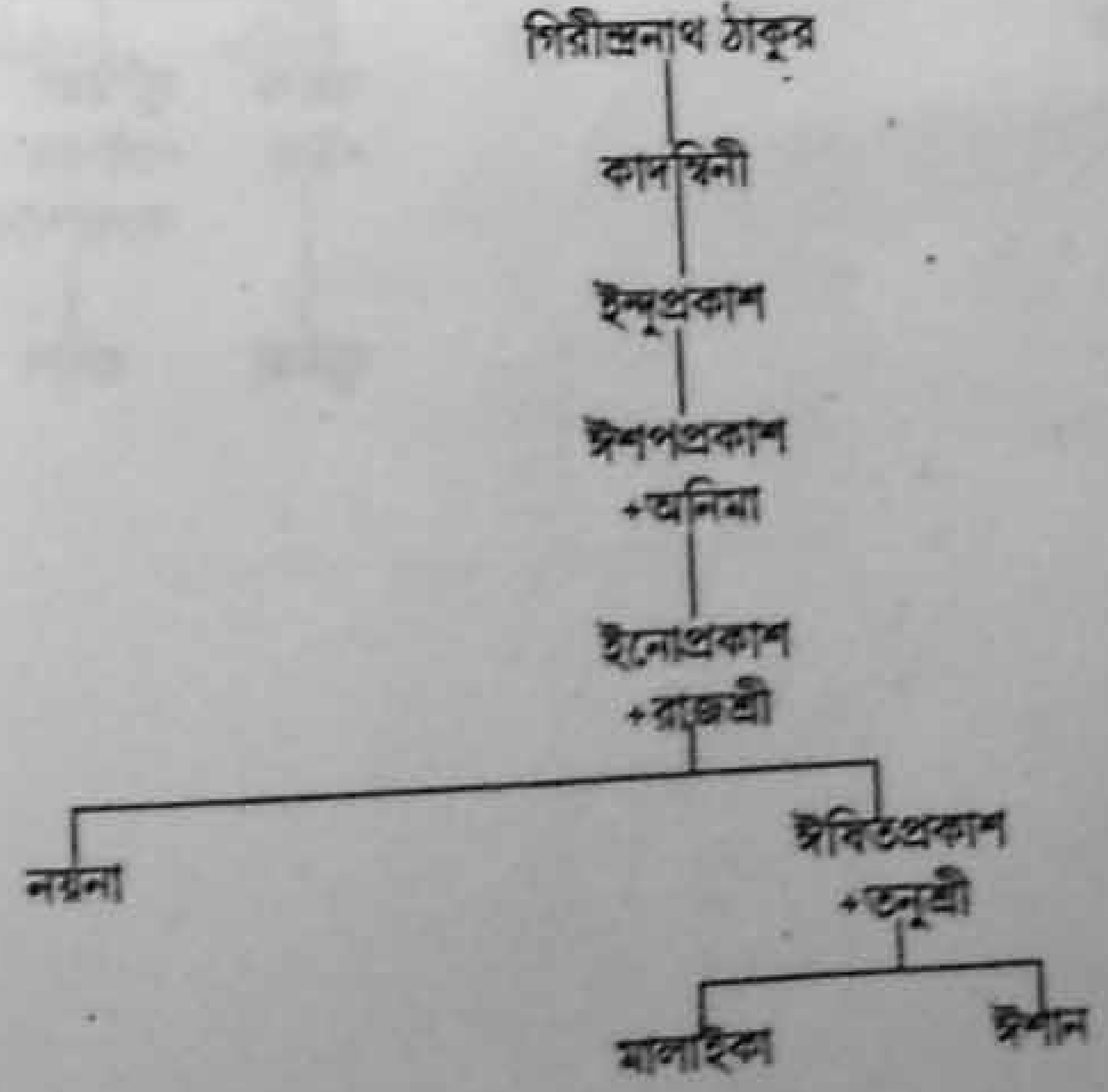
গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর
কাদম্বিনী
ইন্দুপ্রকাশ
ঈশপ্রকাশ
+অনিমা
ইনোপ্রকাশ
+রাজশ্রী
নয়না
ঈপ্সিতপ্রকাশ
+তনুশ্রী
মালাইকা
ঈশান

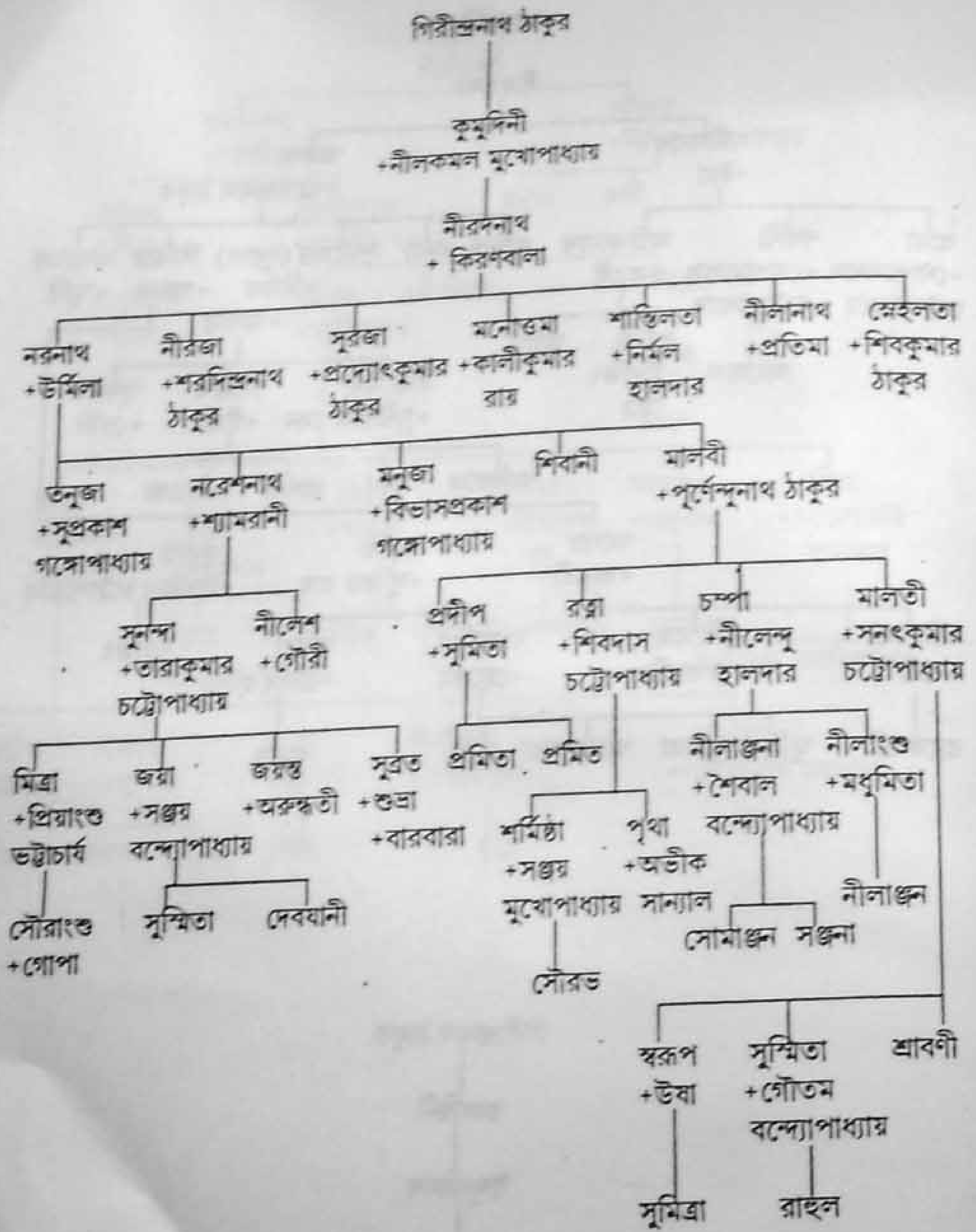
গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর
কুমুদিনী
+নীলকমল মুখোপাধ্যায়
নীরদনাথ
+ কিরণবালা
নরনাথ +উর্মিলা
নীরজা +শরদিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সুরজা +প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর
মনোত্তমা +কালীকুমার রায়
শান্তিলতা +নির্মল হালদার
নীলানাথ +প্রতিমা
স্নেহলতা +শিবকুমার ঠাকুর
তনুজা +সুপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
নরেশনাথ +শ্যামরানী
মনুজা +বিভাসপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
শিবানী
মালবী +পূর্ণেন্দুনাথ ঠাকুর
সুনন্দা +তারাকুমার চট্টোপাধ্যায়
নীলেশ +গৌরী
প্রদীপ +সুমিতা
রত্না +শিবদাস চট্টোপাধ্যায়
চম্পা +নীলেন্দু হালদার
মালতী +সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়
মিত্রা +প্রিয়াংশু ভট্টাচার্য
জয়া +সঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়
জয়ন্ত +অরুন্ধতী
সুব্রত +শুভ্রা +বারবারা
প্রমিতা
প্রমিত
শর্মিষ্ঠা +সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়
পৃথা +অভীক সান্যাল
নীলাঞ্জনা +শৈবাল বন্দ্যোপাধ্যায়
নীলাংশু +মধুমিতা
সৌরাংশু +গোপা
সুস্মিতা
দেবযানী
সৌরভ
সোমাঞ্জন
সঞ্জনা
নীলাঞ্জন
স্বরূপ +উষা
সুস্মিতা +গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রাবণী
সুমিত্রা
রাহুল

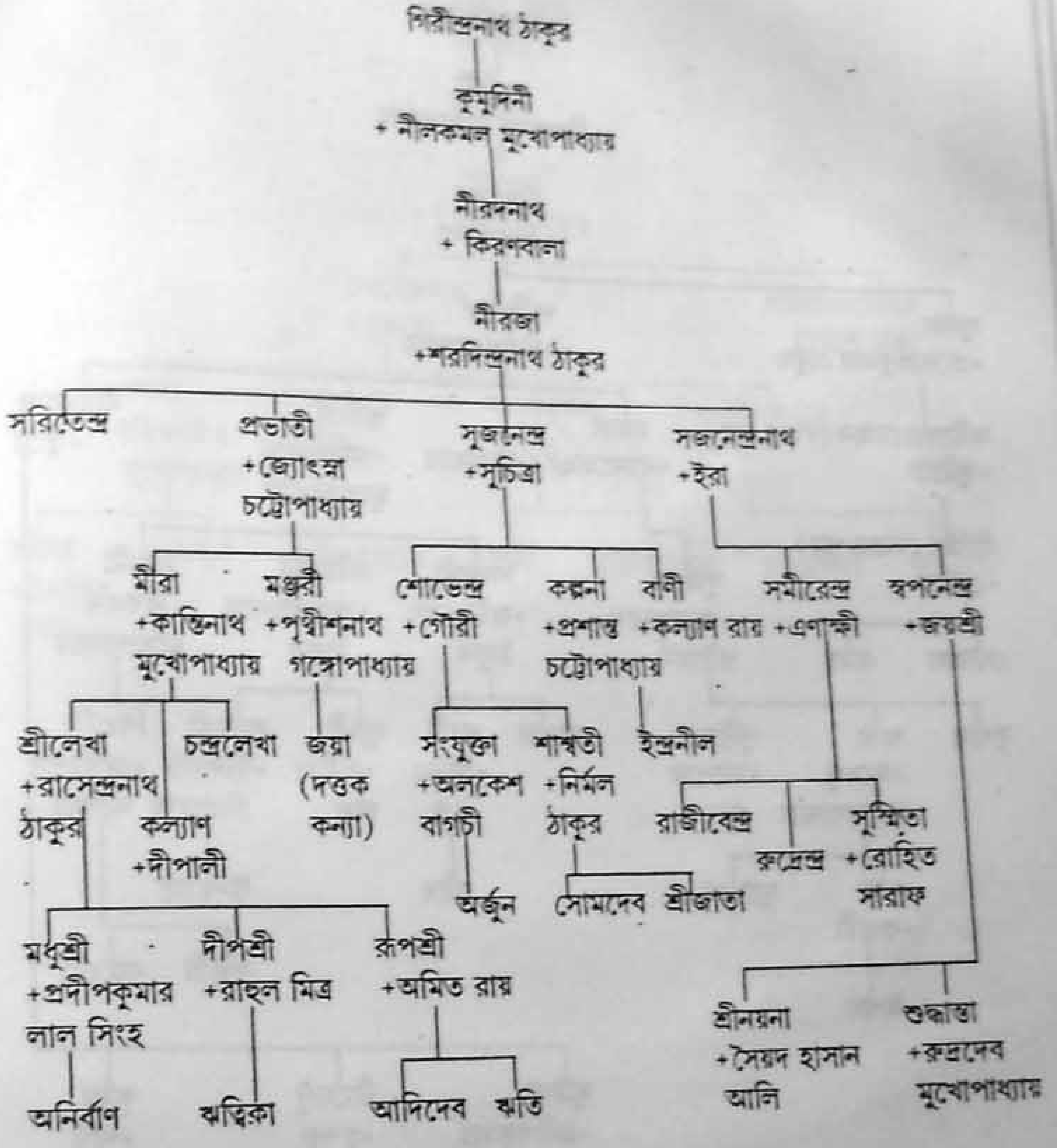
গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর
কুমুদিনী
+ নীলকমল মুখোপাধ্যায়
নীরদনাথ
+ কিরণবালা
নীরজা
+শরদিন্দুনাথ ঠাকুর
সরিতেন্দ্র
প্রভাতী +জ্যোৎস্না চট্টোপাধ্যায়
সুজনেন্দ্র +সুচিত্রা
সজনেন্দ্রনাথ +ইরা
মীরা +কান্তিনাথ মুখোপাধ্যায়
মঞ্জরী +পৃথ্বীশনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
শোভেন্দ্র +গৌরী
কল্পনা +প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়
বাণী +কল্যাণ রায়
সমীরেন্দ্র +এণাক্ষী
স্বপনেন্দ্র +জয়শ্রী
শ্রীলেখা +রাসেন্দ্রনাথ ঠাকুর
চন্দ্রলেখা
কল্যাণ +দীপালী
জয়া (দত্তক কন্যা)
সংযুক্তা +অলকেশ বাগচী
শাশ্বতী +নির্মল ঠাকুর
ইন্দ্রনীল
রাজীবেন্দ্র
রুদ্রেন্দ্র
সুস্মিতা +রোহিত সারাফ
অর্জুন
সোমদেব
শ্রীজাতা
মধুশ্রী +প্রদীপকুমার লাল সিংহ
দীপশ্রী +রাহুল মিত্র
রূপশ্রী +অমিত রায়
শ্রীনয়না +সৈয়দ হাসান আলি
শুদ্ধান্তা +রুদ্রদেব মুখোপাধ্যায়
অনির্বাণ
ঋত্বিকা
আদিদেব
ঋতি

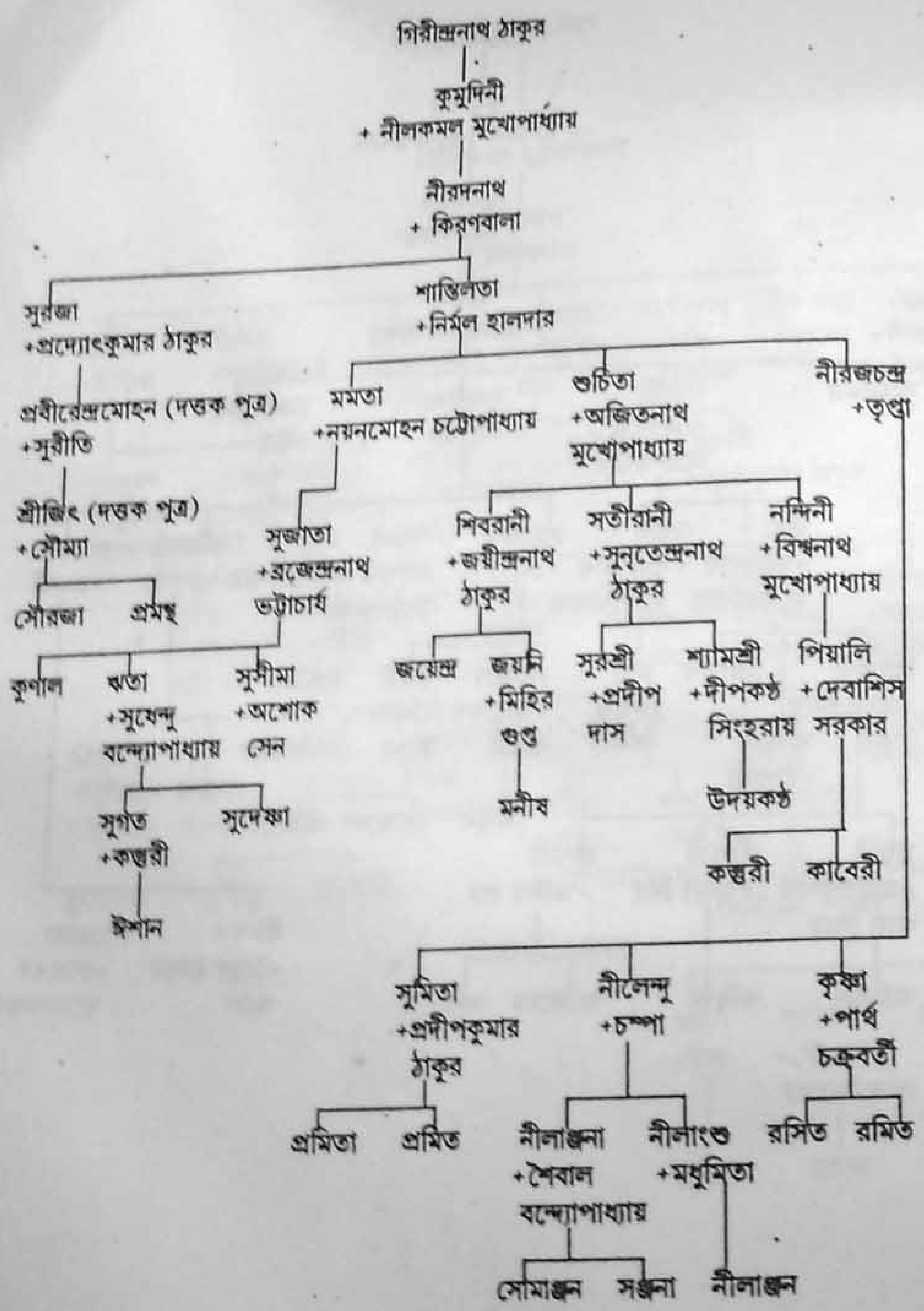
গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর
কুমুদিনী
+ নীলকমল মুখোপাধ্যায়
নীরদনাথ
+ কিরণবালা
সুরজা
+প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর
শান্তিলতা
+নির্মল হালদার
প্রবীরেন্দ্রমোহন (দত্তক পুত্র)
+সুরীতি
শ্রীজিৎ (দত্তক পুত্র)
+সৌম্যা
সৌরজা
প্রমন্থ
মমতা
+নয়নমোহন চট্টোপাধ্যায়
শুচিতা
+অজিতনাথ
মুখোপাধ্যায়
নীরজচন্দ্র
+তৃপ্তা
সুজাতা
+ব্রজেন্দ্রনাথ
ভট্টাচার্য
কুণাল
ঋতা
+সুখেন্দু
বন্দ্যোপাধ্যায়
সুসীমা
+অশোক
সেন
সুগত
+কস্তুরী
সুদেষ্ণা
ঈশান
শিবরানী
+জয়ীন্দ্রনাথ
ঠাকুর
সতীরানী
+সুনৃতেন্দ্রনাথ
ঠাকুর
নন্দিনী
+বিশ্বনাথ
মুখোপাধ্যায়
জয়েন্দ্র
জয়ন্তী
+মিহির
গুপ্ত
মনীষ
সুরশ্রী
+প্রদীপ
দাস
শ্যামশ্রী
+দীপকণ্ঠ
সিংহরায়
উদয়কণ্ঠ
পিয়ালি
+দেবাশিস
সরকার
কস্তুরী
কাবেরী
সুমিতা
+প্রদীপকুমার
ঠাকুর
প্রমিতা
প্রমিত
নীলেন্দু
+চম্পা
নীলাঞ্জনা
+শৈবাল
বন্দ্যোপাধ্যায়
সৌমাঞ্জন
সঞ্জনা
নীলাংশু
+মধুমিতা
নীলাঞ্জন
কৃষ্ণা
+পার্থ
চক্রবর্তী
রসিত
রমিত

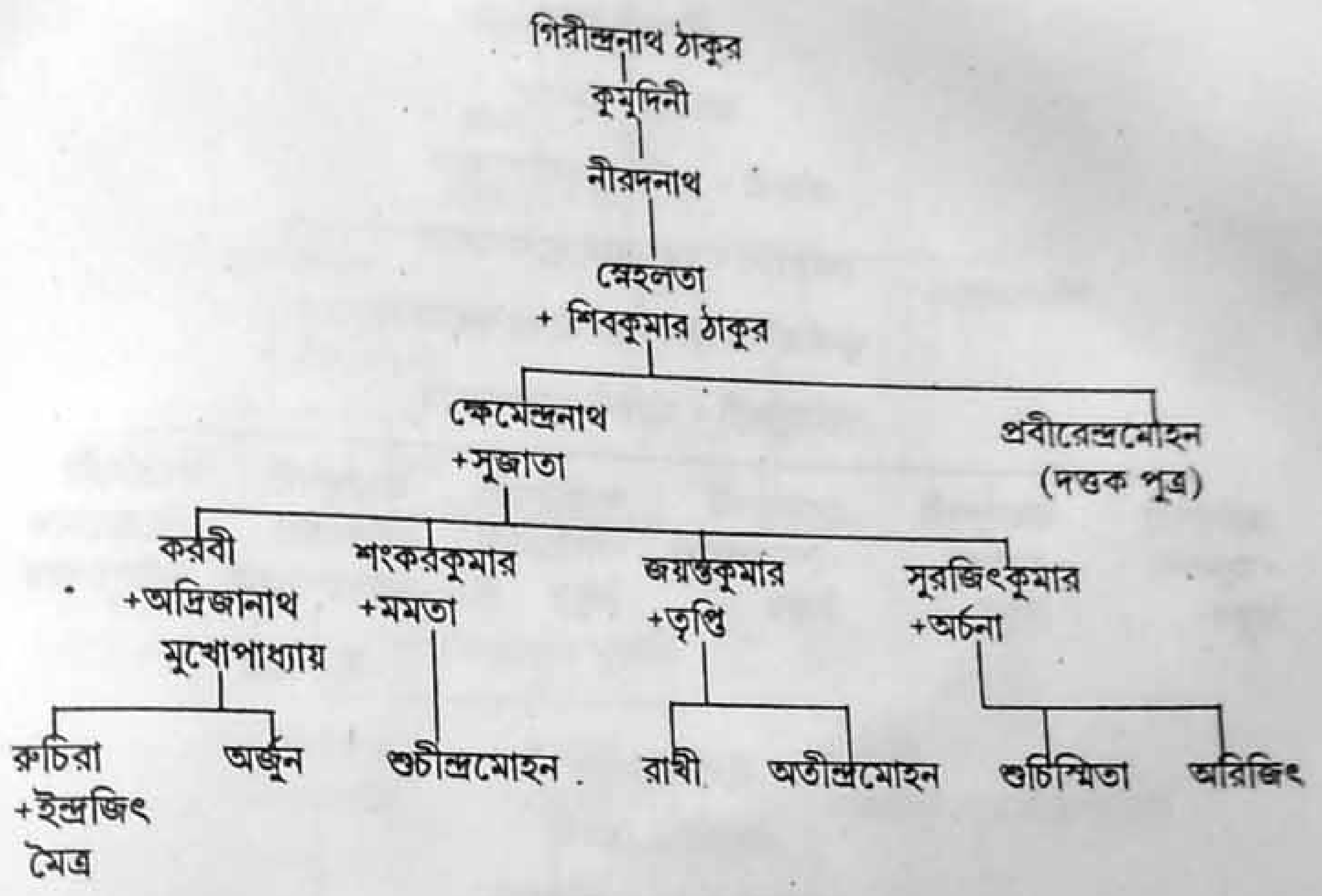
গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর
কুমুদিনী
নীরদনাথ
স্নেহলতা
+ শিবকুমার ঠাকুর
ক্ষেমেন্দ্রনাথ
+সুজাতা
প্রবীরেন্দ্রমোহন
(দত্তক পুত্র)
করবী
+অদ্রিজানাথ
মুখোপাধ্যায়
রুচিরা
+ইন্দ্রজিৎ
মৈত্র
অর্জুন
শংকরকুমার
+মমতা
শুচীন্দ্রমোহন
জয়ন্তকুমার
+তৃপ্তি
রাখী
অতীন্দ্রমোহন
সুরজিৎকুমার
+অর্চনা
শুচিস্মিতা
অরিজিৎ

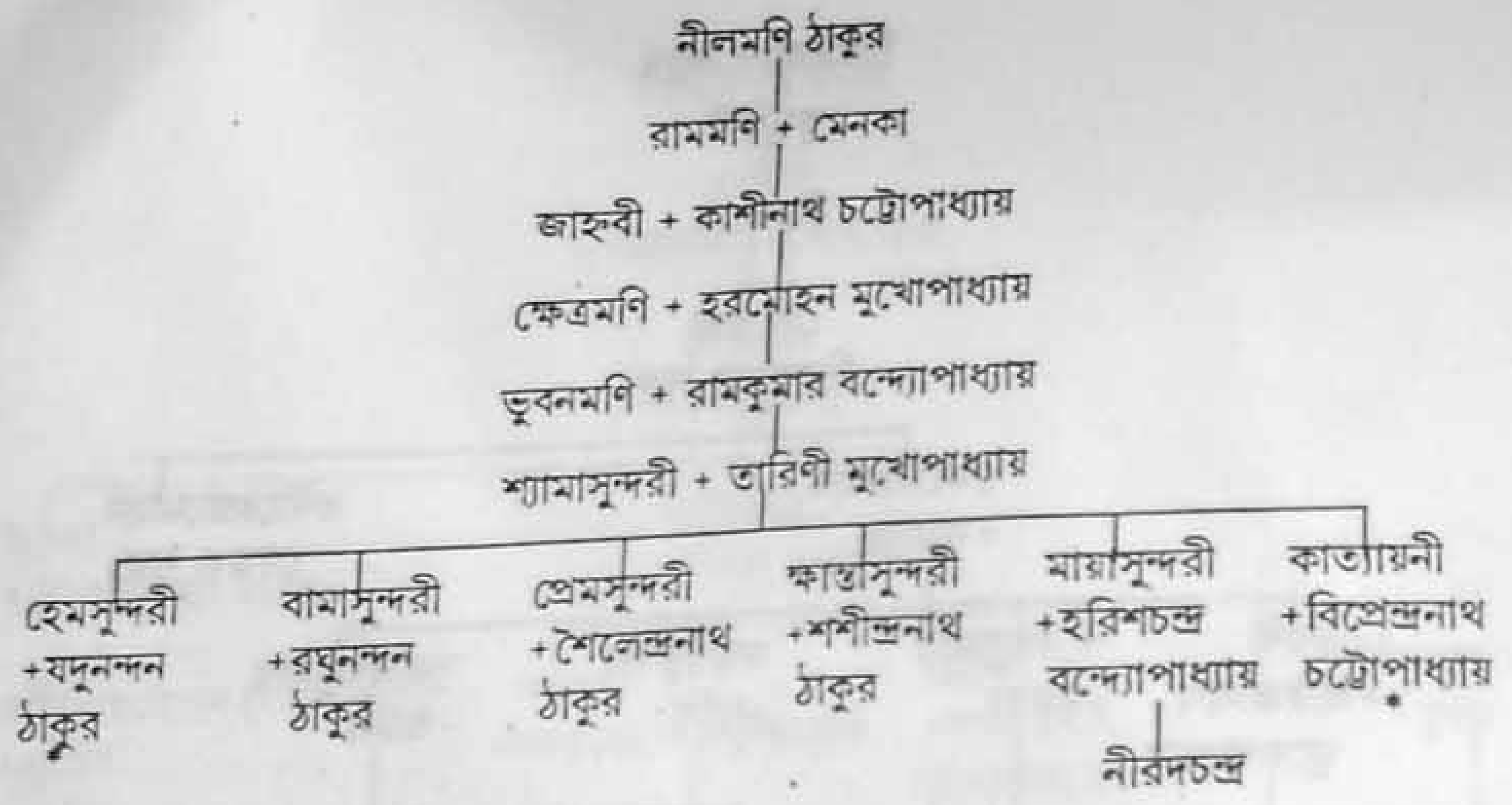
নীলমণি ঠাকুর
রামমণি + মেনকা
জাহ্নবী + কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়
ক্ষেত্রমণি + হরমোহন মুখোপাধ্যায়
ভুবনমণি + রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্যামাসুন্দরী + তারিণী মুখোপাধ্যায়
হেমসুন্দরী +যদুনন্দন ঠাকুর
বামাসুন্দরী +রঘুনন্দন ঠাকুর
প্রেমসুন্দরী +শৈলেন্দ্রনাথ ঠাকুর
ক্ষান্তসুন্দরী +শশীন্দ্রনাথ ঠাকুর
মায়াসুন্দরী +হরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
নীরদচন্দ্র
কাত্যায়নী +বিপ্রেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

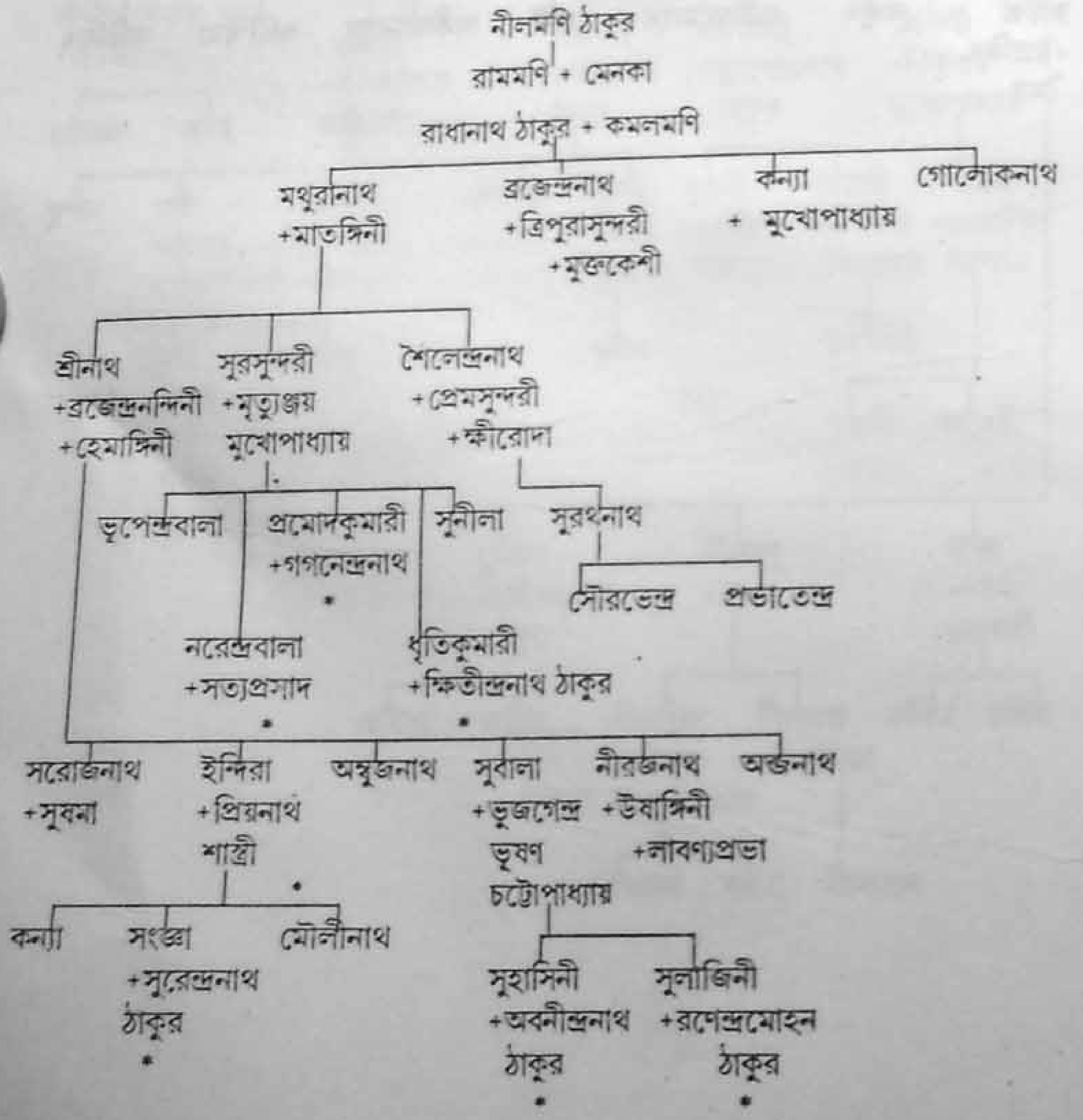
নীলমণি ঠাকুর
রামমণি + মেনকা
রাধানাথ ঠাকুর + কমলমণি
মথুরানাথ +মাতঙ্গিনী
ব্রজেন্দ্রনাথ +ত্রিপুরাসুন্দরী +মুক্তকেশী
কন্যা + মুখোপাধ্যায়
গোলোকনাথ
শ্রীনাথ +ব্রজেন্দ্রনন্দিনী +হেমাঙ্গিনী
সুরসুন্দরী +মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়
শৈলেন্দ্রনাথ +প্রেমসুন্দরী +ক্ষীরোদা
ভূপেন্দ্রবালা
প্রমোদকুমারী +গগনেন্দ্রনাথ
সুনীলা
সুরথনাথ
সৌরভেন্দ্র
প্রভাতেন্দ্র
নরেন্দ্রবালা +সত্যপ্রসাদ
ধৃতিকুমারী +ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সরোজনাথ +সুষমা
ইন্দিরা +প্রিয়নাথ শাস্ত্রী
অম্বুজনাথ
সুবালা +ভুজগেন্দ্র ভূষণ চট্টোপাধ্যায়
নীরজনাথ +উষাঙ্গিনী +লাবণ্যপ্রভা
অজনাথ
কন্যা
সংজ্ঞা +সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
মৌনীনাথ
সুহাসিনী +অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সুনাজিনী +রণেন্দ্রমোহন ঠাকুর

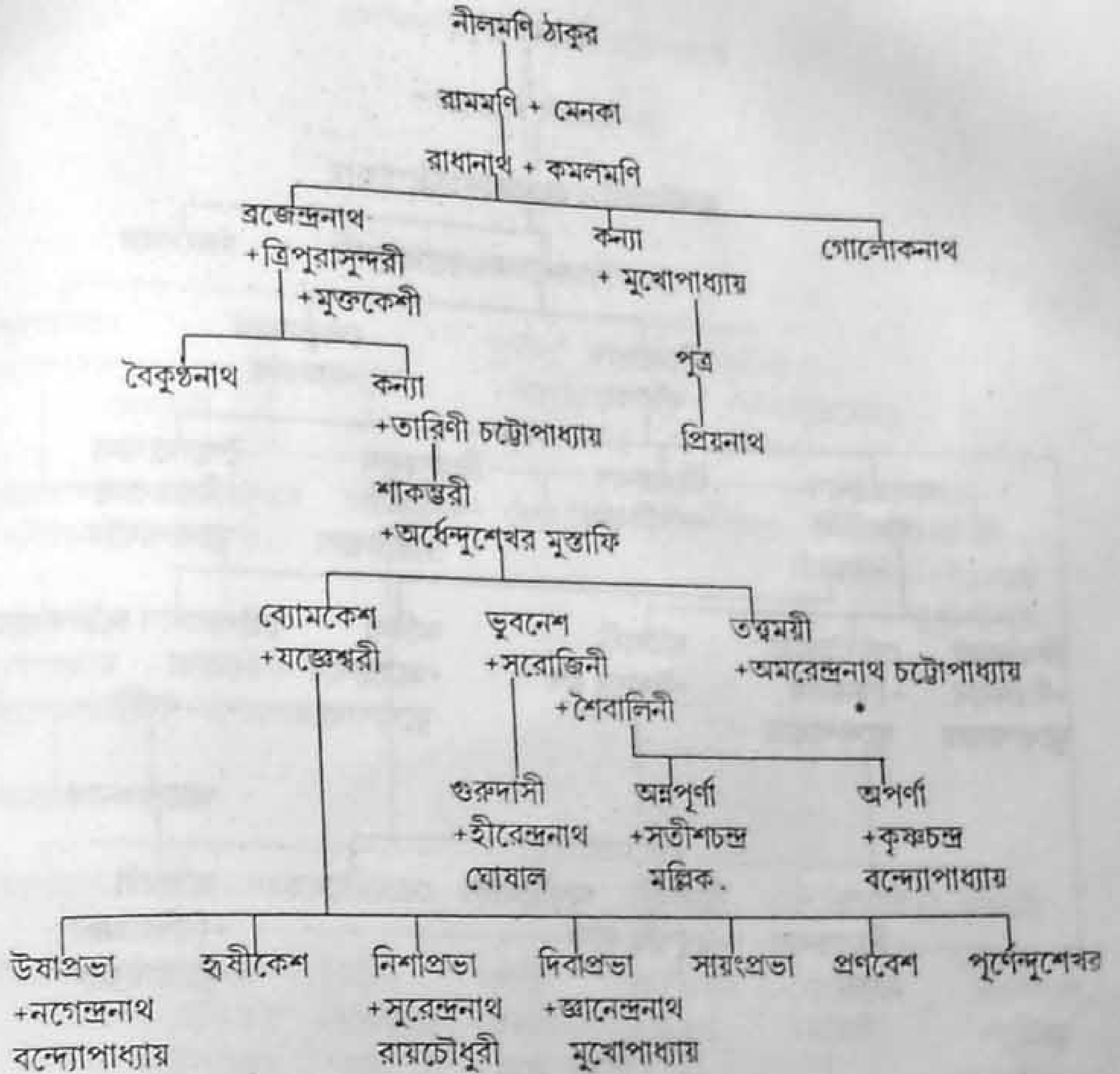
নীলমণি ঠাকুর
রামমণি + মেনকা
রাধানাথ + কমলমণি
ব্রজেন্দ্রনাথ +ত্রিপুরাসুন্দরী +মুক্তকেশী
কন্যা + মুখোপাধ্যায়
গোলোকনাথ
বৈকুণ্ঠনাথ
কন্যা +তারিণী চট্টোপাধ্যায়
পুত্র
প্রিয়নাথ
শাকম্ভরী +অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি
ব্যোমকেশ +যজ্ঞেশ্বরী
ভুবনেশ +সরোজিনী +শৈবালিনী
তন্ময়ী +অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাসী +হীরেন্দ্রনাথ ঘোষাল
অন্নপূর্ণা +সতীশচন্দ্র মল্লিক.
অপর্ণা +কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
উষাপ্রভা +নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
হৃষীকেশ
নিশাপ্রভা +সুরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী
দিবাপ্রভা +জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সায়ংপ্রভা
প্রণবেশ
পূর্ণেন্দুশেখর

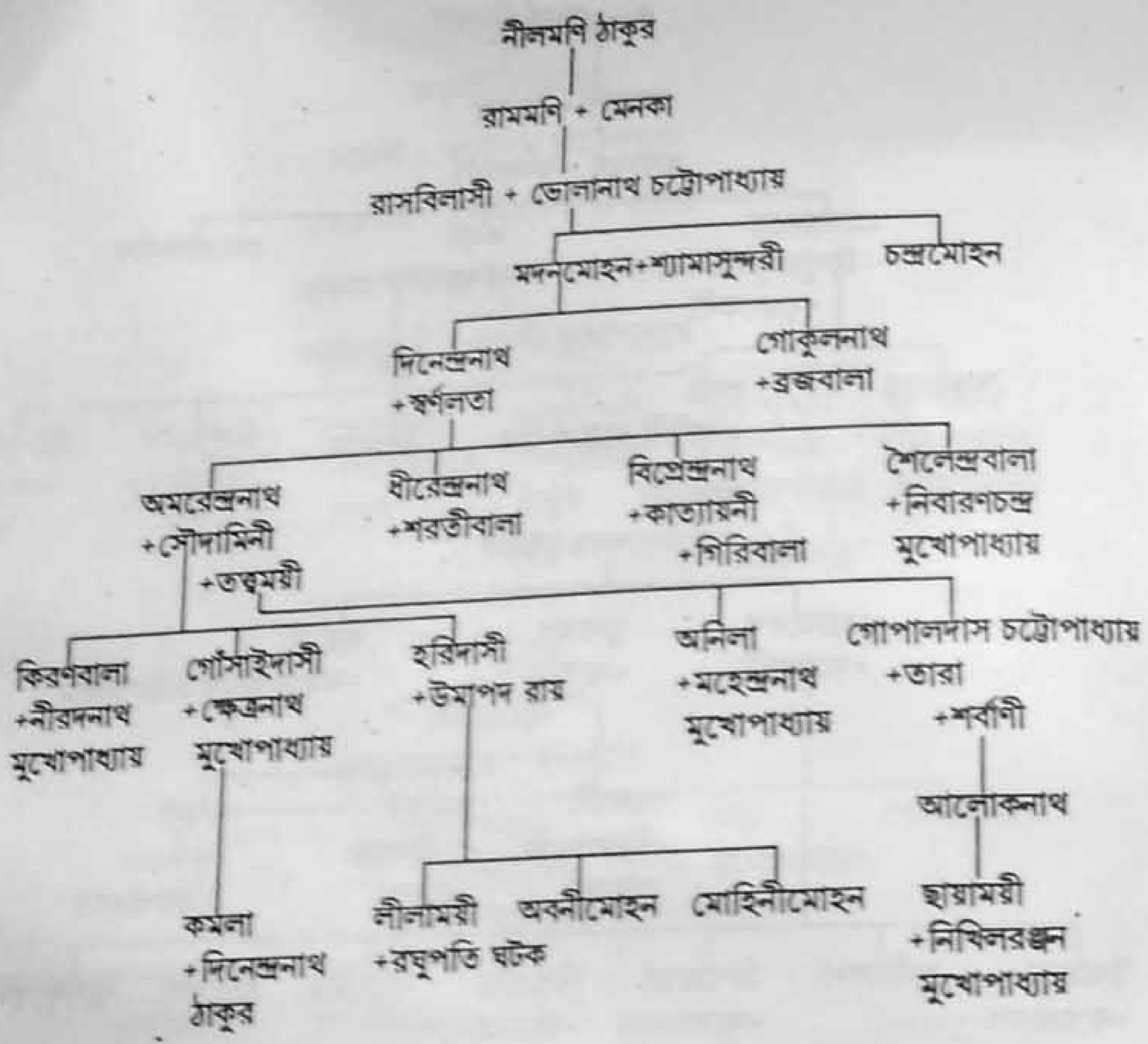
নীলমণি ঠাকুর
রামমণি + মেনকা
রাসবিলাসী + ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়
মদনমোহন+শ্যামাসুন্দরী
চন্দ্রমোহন
দিনেন্দ্রনাথ +স্বর্ণলতা
গোকুলনাথ +ব্রজবালা
অমরেন্দ্রনাথ +সৌদামিনী +তন্ত্রময়ী
ধীরেন্দ্রনাথ +শরতীবালা
বিপ্রেন্দ্রনাথ +কাত্যায়নী +গিরিবালা
শৈলেন্দ্রবালা +নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
কিরণবালা +নীরদনাথ মুখোপাধ্যায়
গোঁসাইদাসী +ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়
হরিদাসী +উমাপদ রায়
অনিলা +মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
গোপালদাস চট্টোপাধ্যায় +তারা +শর্বাণী
আলোকনাথ
কমলা +দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
নীলাময়ী +রঘুপতি ঘটক
অবনীমোহন
মোহিনীমোহন
ছায়াময়ী +নিখিলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

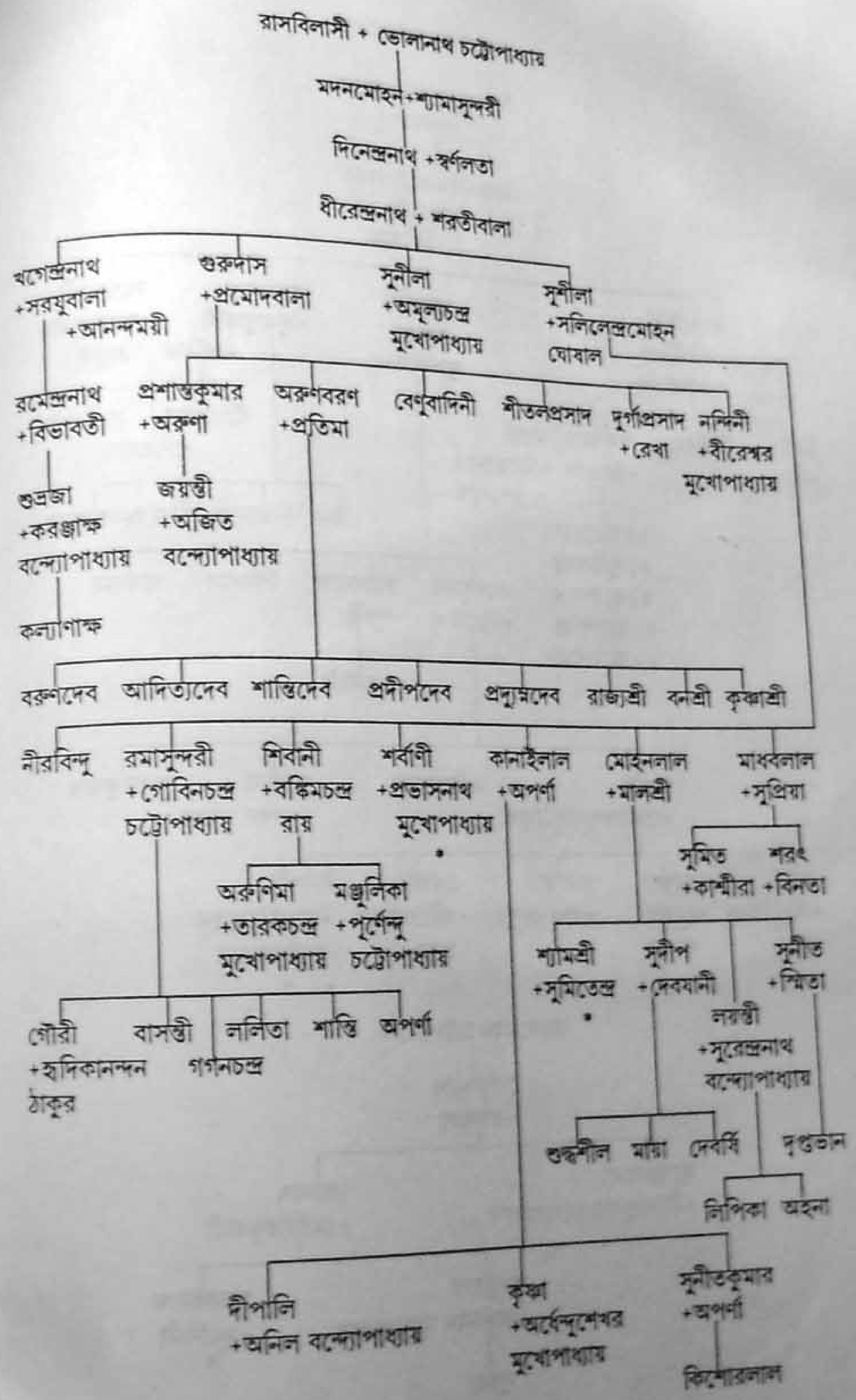
রাসবিলাসী + ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়
মদনমোহন+শ্যামাসুন্দরী
দিনেন্দ্রনাথ +স্বর্ণলতা
ধীরেন্দ্রনাথ + শরতীবালা
খগেন্দ্রনাথ +সরযুবালা +আনন্দময়ী
গুরুদাস +প্রমোদবালা
সুনীলা +অমূল্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
সুশীলা +সলিলেন্দ্রমোহন ঘোষাল
রমেন্দ্রনাথ +বিভাবতী
প্রশান্তকুমার +অরুণা
অরুণবরণ +প্রতিমা
বেণুবাদিনী
শীতলপ্রসাদ
দুর্গাপ্রসাদ +রেখা
নন্দিনী +বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়
শুভ্রজা +করঞ্জাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়
জয়ন্তী +অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়
কল্যাণাক্ষ
বরুণদেব
আদিত্যদেব
শান্তিদেব
প্রদীপদেব
প্রদ্যুম্নদেব
রাজশ্রী
বনশ্রী
কৃষ্ণাশ্রী
নীরবিন্দু
রমাসুন্দরী +গোবিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শিবানী +বঙ্কিমচন্দ্র রায়
শর্বাণী +প্রভাসনাথ মুখোপাধ্যায়
কানাইলাল +অপর্ণা
মোহনলাল +মালশ্রী
মাধবলাল +সুপ্রিয়া
সুমিত +কাশ্মীরা
শরৎ +বিনতা
অরুণিমা +তারকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
মঞ্জুলিকা +পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়
শ্যামশ্রী +সুমিতেন্দ্র
সুদীপ +দেবযানী
সুনীত +স্মিতা
নয়শ্রী +সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
গৌরী +হৃদিকানন্দন ঠাকুর
বাসন্তী
গগনচন্দ্র
ললিতা
শান্তি
অপর্ণা
শুদ্ধশীল
মায়া
দেবর্ষি
দৃপ্তভান
লিপিকা
অহনা
দীপালি +অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়
কৃষ্ণা +অর্ধেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়
সুনীতকুমার +অপর্ণা
কিশোরলাল

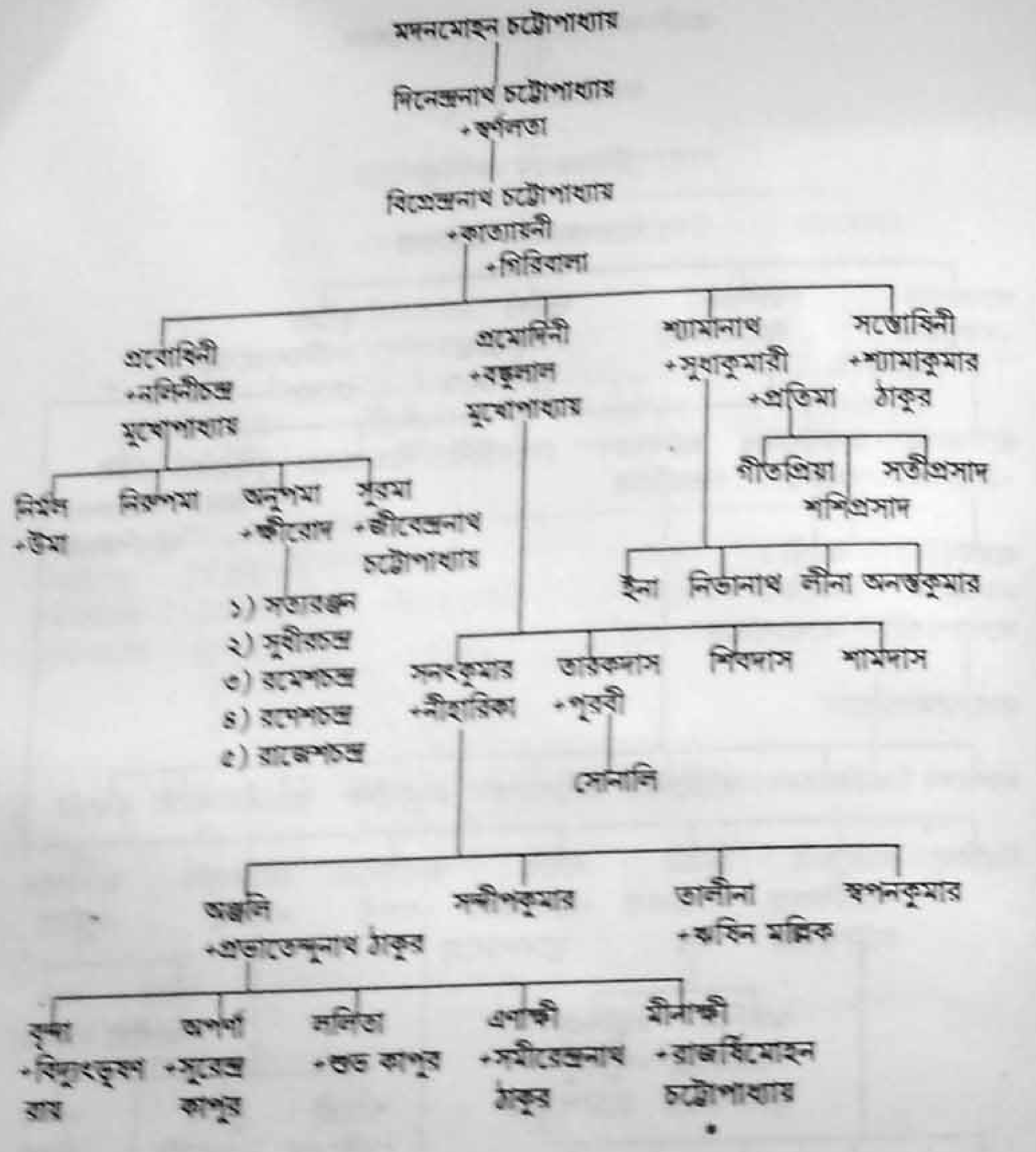
মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়
দিনেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
+স্বর্ণলতা
বিশ্বেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
+কাত্যায়নী
+গিরিবালা
প্রবোধিনী
+নলিনীচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
প্রমোদিনী
+বঙ্কুলাল মুখোপাধ্যায়
শ্যামানাথ
+সুধাকুমারী
+প্রতিমা
সন্তোষিনী
+শ্যামাকুমার ঠাকুর
নির্মল
+উমা
নিরুপমা
অনুপমা
+ক্ষীরোদ
সুরমা
+জীবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
১) সত্যরঞ্জন
২) সুধীরচন্দ্র
৩) রমেশচন্দ্র
৪) রমেশচন্দ্র
৫) রাজেশচন্দ্র
গীতপ্রিয়া
শশিপ্রসাদ
সতীপ্রসাদ
ইনা
নিতানাথ
লীনা
অনন্তকুমার
সনৎকুমার
+নীহারিকা
তারকদাস
+পূরবী
সোনালি
শিবদাস
শ্যামদাস
অঞ্জলি
+প্রভাতেন্দুনাথ ঠাকুর
সন্দীপকুমার
তালীনা
+ফণিন মল্লিক
স্বপনকুমার
বৃন্দা
+বিদ্যুৎভূষণ রায়
অপর্ণা
+সুরেন্দ্র কাপুর
ললিতা
+শুভ কাপুর
এণাক্ষী
+সমীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
মীনাক্ষী
+রাজর্ষিমোহন চট্টোপাধ্যায়

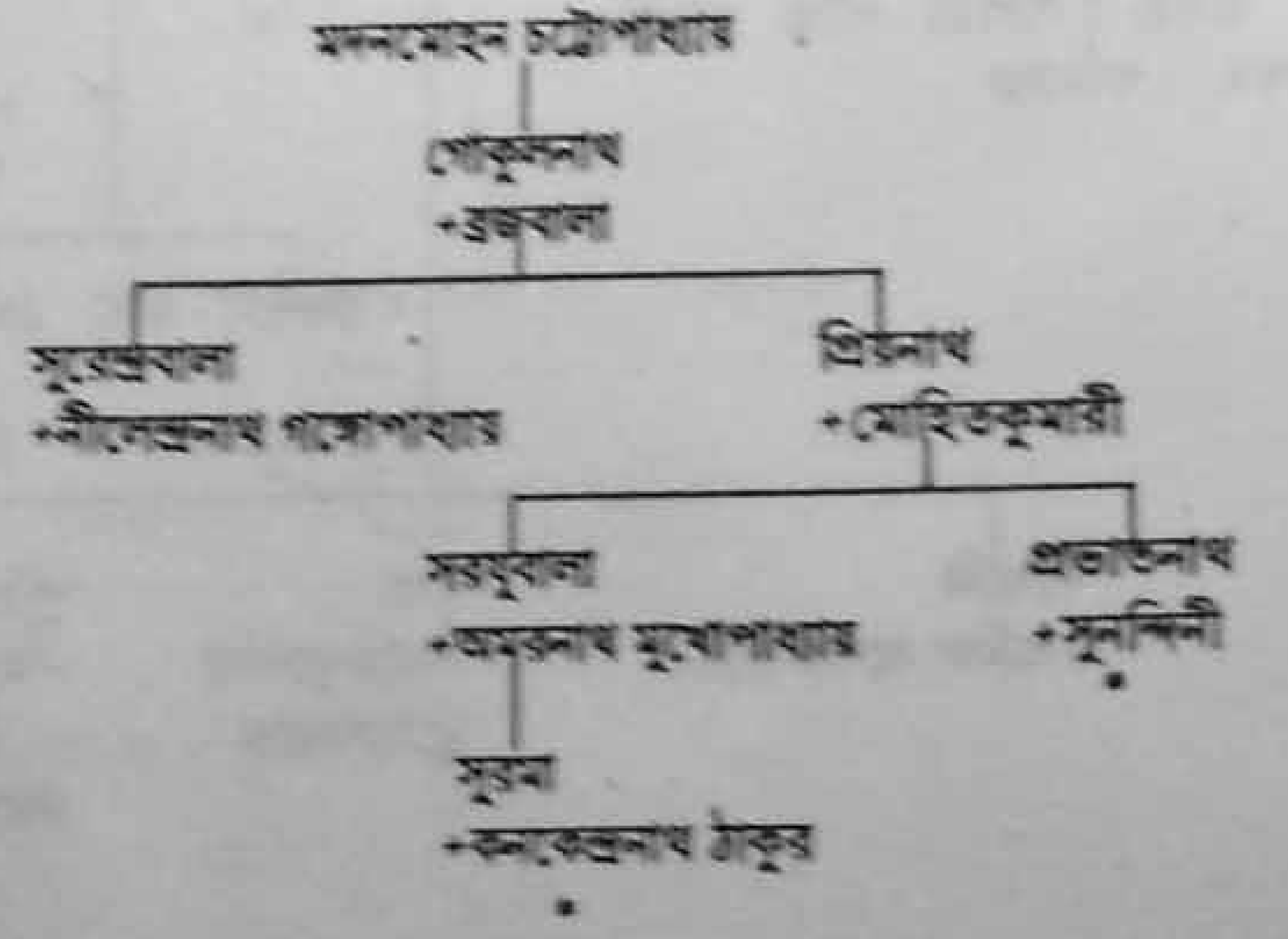
মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়
গোকুলনাথ
+ব্রজবালা
সুরেন্দ্রবালা
+নীলেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
প্রিয়নাথ
+মোহিতকুমারী
সরযূবালা
+অমরনাথ মুখোপাধ্যায়
প্রভাতনাথ
+সুনন্দিনী
সুরমা
+কনকেন্দ্রনাথ ঠাকুর

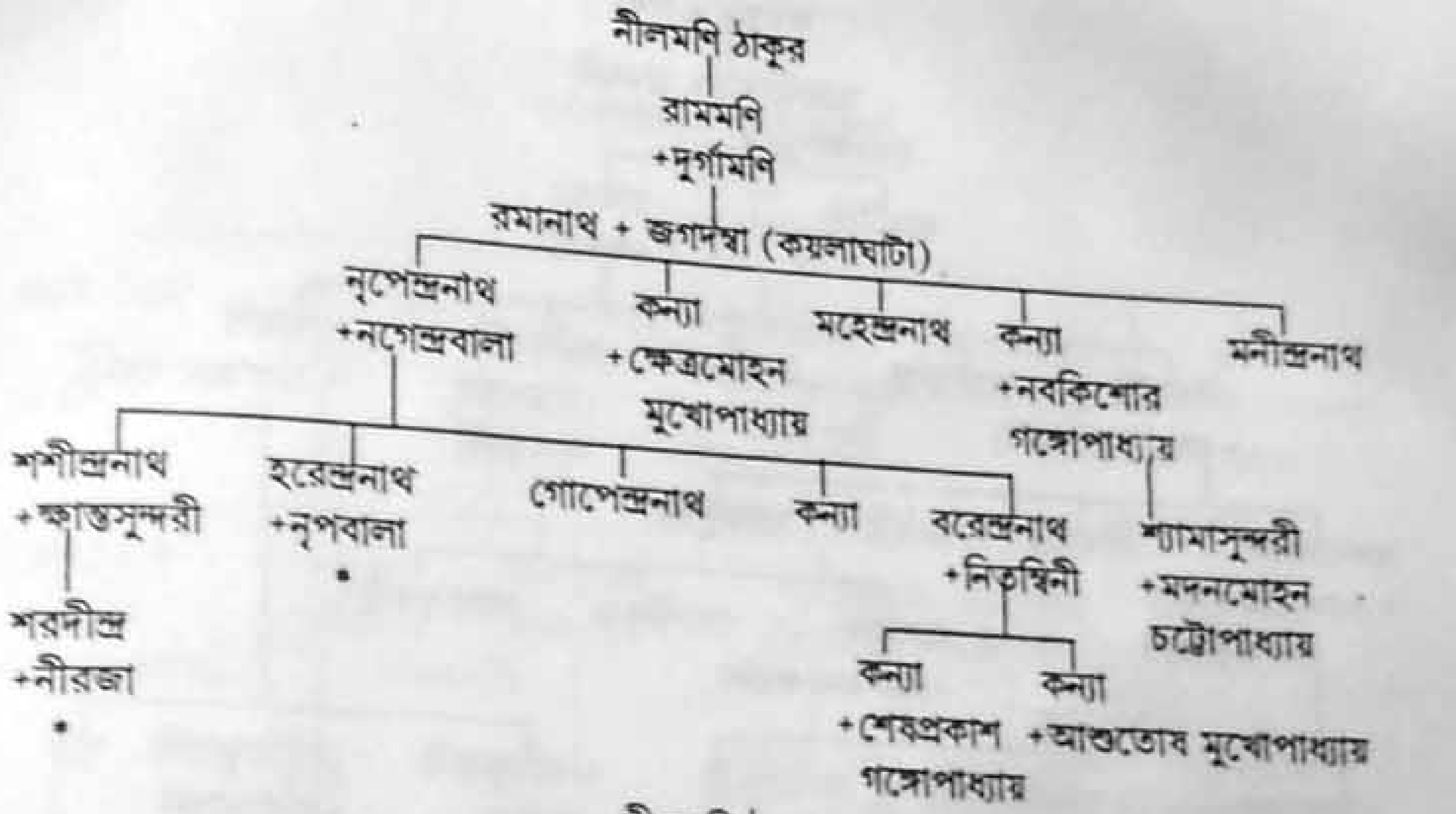
নীলমণি ঠাকুর
রামমণি
+দুর্গামণি
রমানাথ + জগদম্বা (কয়লাঘাটা)
নৃপেন্দ্রনাথ
+নগেন্দ্রবালা
কন্যা
+ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়
মহেন্দ্রনাথ
কন্যা
+নবকিশোর গঙ্গোপাধ্যায়
মনীন্দ্রনাথ
শশীন্দ্রনাথ
+কান্তসুন্দরী
হরেন্দ্রনাথ
+নৃপবালা
গোপেন্দ্রনাথ
কন্যা
বরেন্দ্রনাথ
+নিতম্বিনী
শ্যামাসুন্দরী
+মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়
শরদীন্দ্র
+নীরজা
কন্যা
+শেবপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
কন্যা
+আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

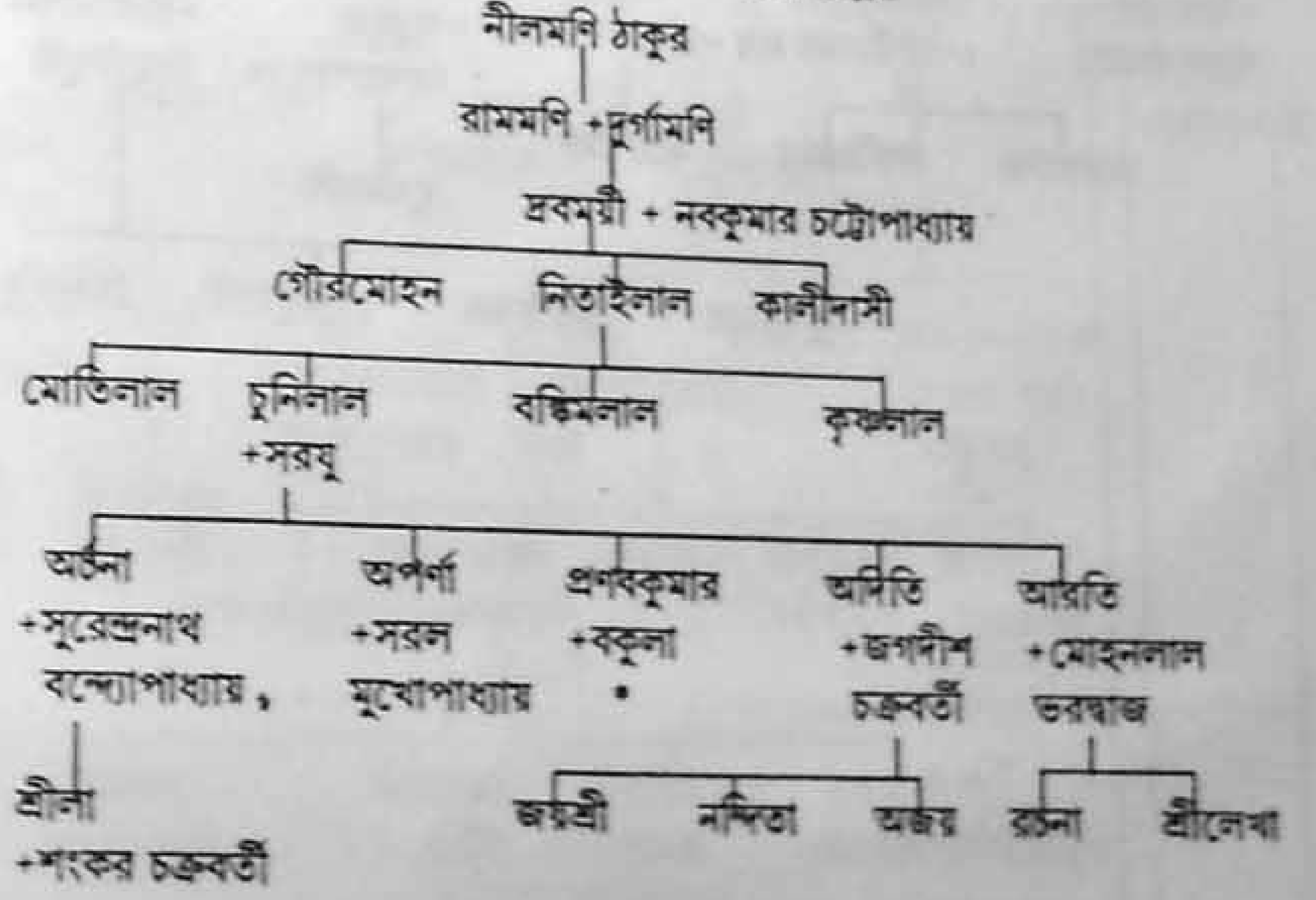
নীলমণি ঠাকুর
রামমণি +দুর্গামণি
দ্রবময়ী + নবকুমার চট্টোপাধ্যায়
গৌরমোহন
নিতাইলাল
কালীদাসী
মোতিলাল
চুনিলাল
+সরযূ
বঙ্কিমলাল
কৃষ্ণলাল
অর্চনা
+সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
অপর্ণা
+সরল মুখোপাধ্যায়
প্রণবকুমার
+বকুলা
অদিতি
+জগদীশ চক্রবর্তী
আরতি
+মোহনলাল ভরদ্বাজ
শ্রীনা
+শংকর চক্রবর্তী
জয়শ্রী
নন্দিতা
অজয়
রচনা
শ্রীলেখা

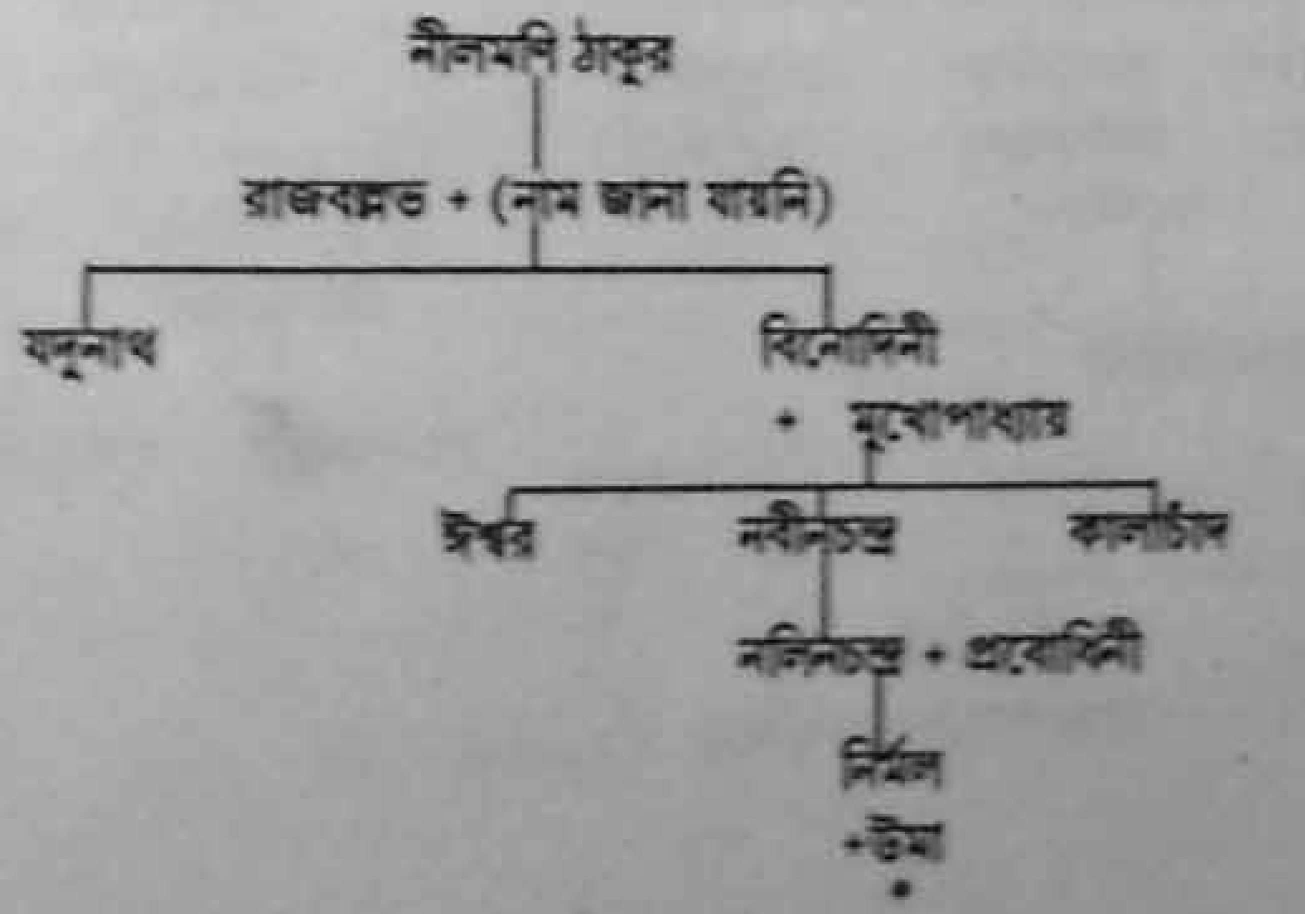
নীলমণি ঠাকুর
রাজবল্লভ + (নাম জানা যায়নি)
যদুনাথ
বিনোদিনী
+ মুখোপাধ্যায়
ঈশ্বর
নবীনচন্দ্র
কালাচাঁদ
নলিনচন্দ্র + প্রবোধিনী
নির্মল
+উমা

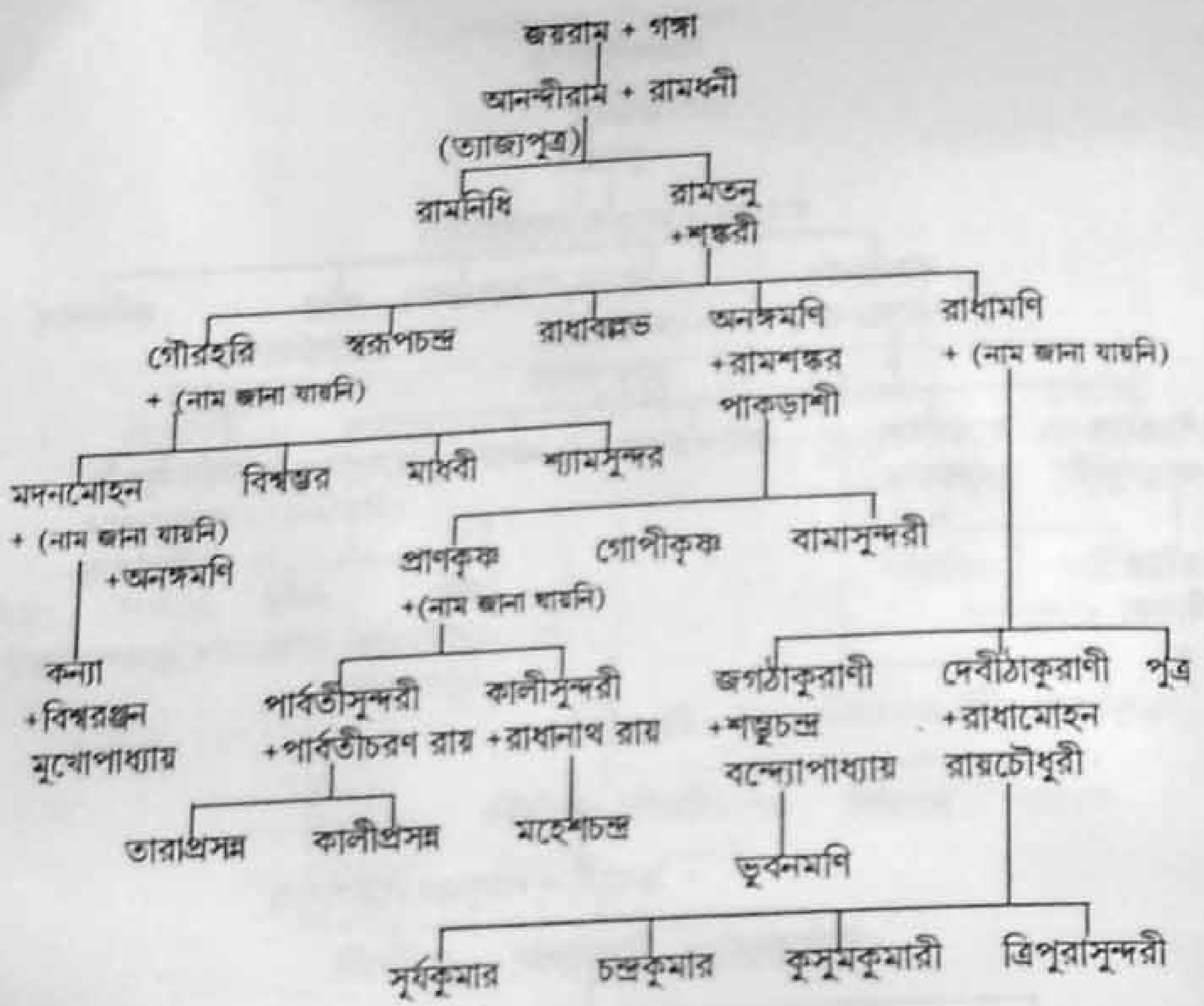
জয়রাম + গঙ্গা
আনন্দীরাম + রামধনী
(ত্যাজ্যপুত্র)
রামনিধি
রামতনু
+শঙ্করী
গৌরহরি
+ (নাম জানা যায়নি)
স্বরূপচন্দ্র
রাধাবল্লভ
অনঙ্গমণি
+রামশঙ্কর
পাকড়াশী
রাধামণি
+ (নাম জানা যায়নি)
মদনমোহন
+ (নাম জানা যায়নি)
+অনঙ্গমণি
বিশ্বম্ভর
মাধবী
শ্যামসুন্দর
প্রাণকৃষ্ণ
+(নাম জানা যায়নি)
গোপীকৃষ্ণ
বামাসুন্দরী
কন্যা
+বিশ্বরঞ্জন
মুখোপাধ্যায়
পার্বতীসুন্দরী
+পার্বতীচরণ রায়
কালীসুন্দরী
+রাধানাথ রায়
জগৎঠাকুরাণী
+শম্ভুচন্দ্র
বন্দ্যোপাধ্যায়
দেবীঠাকুরাণী
+রাধামোহন
রায়চৌধুরী
পুত্র
তারাপ্রসন্ন
কালীপ্রসন্ন
মহেশচন্দ্র
ভুবনমণি
সূর্যকুমার
চন্দ্রকুমার
কুসুমকুমারী
ত্রিপুরাসুন্দরী

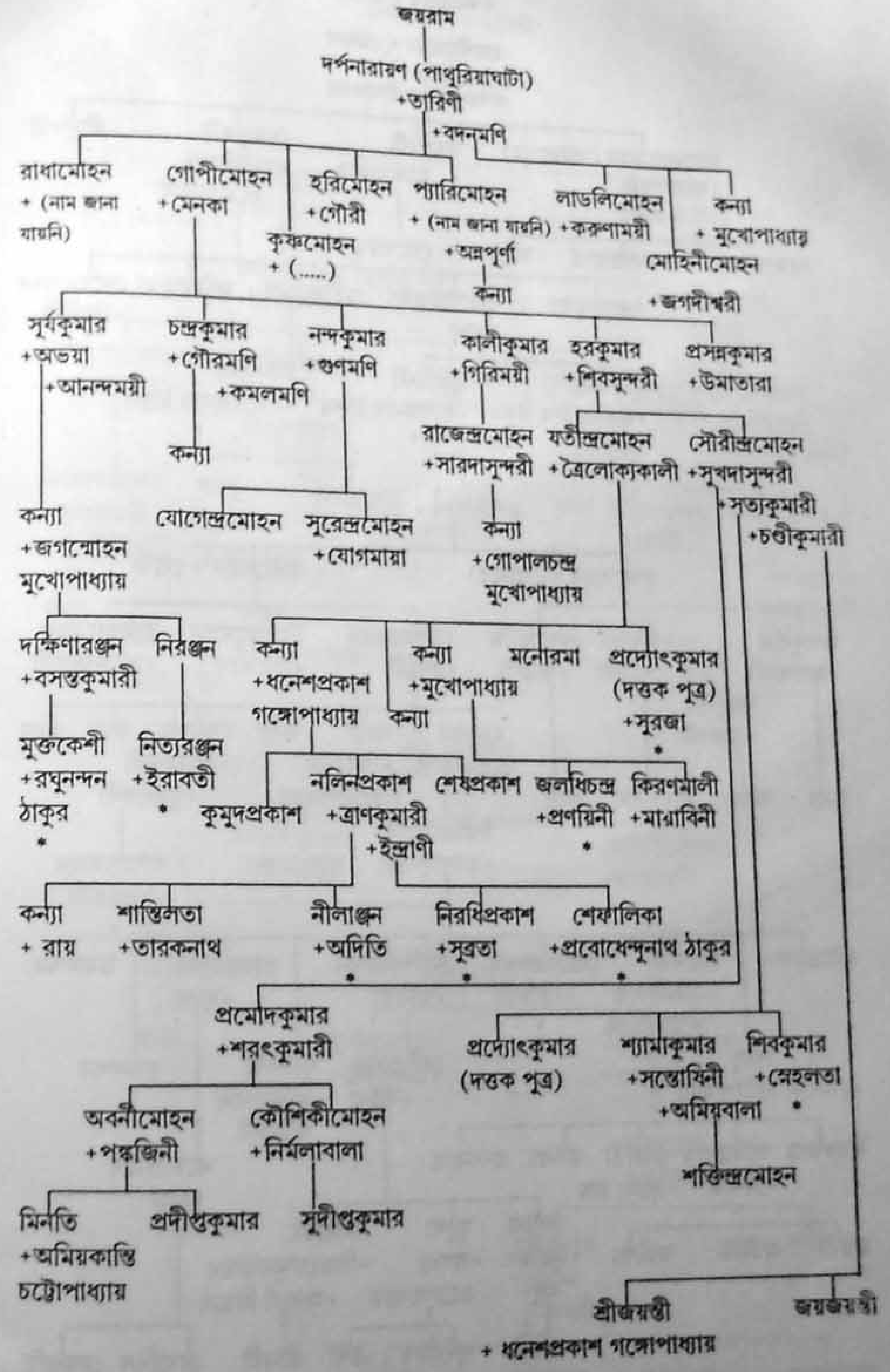
জয়রাম
দর্পনারায়ণ (পাথুরিয়াঘাটা)
+তারিণী
+বদনমণি
রাধামোহন
+ (নাম জানা যায়নি)
গোপীমোহন
+মেনকা
হরিমোহন
+গৌরী
কৃষ্ণমোহন
+ (.....)
প্যারিমোহন
+ (নাম জানা যায়নি)
+অন্নপূর্ণা
কন্যা
লাডলিমোহন
+করুণাময়ী
মোহিনীমোহন
+জগদীশ্বরী
কন্যা
+ মুখোপাধ্যায়
সূর্যকুমার
+অভয়া
+আনন্দময়ী
চন্দ্রকুমার
+গৌরমণি
+কমলমণি
নন্দকুমার
+গুণমণি
কালীকুমার
+গিরিময়ী
হরকুমার
+শিবসুন্দরী
প্রসন্নকুমার
+উমাতারা
কন্যা
রাজেন্দ্রমোহন
+সারদাসুন্দরী
যতীন্দ্রমোহন
+ত্রৈলোক্যকালী
সৌরীন্দ্রমোহন
+সুখদাসুন্দরী
+সত্যকুমারী
+চণ্ডীকুমারী
কন্যা
+জগন্মোহন
মুখোপাধ্যায়
যোগেন্দ্রমোহন
সুরেন্দ্রমোহন
+যোগমায়া
কন্যা
+গোপালচন্দ্র
মুখোপাধ্যায়
দক্ষিণারঞ্জন
+বসন্তকুমারী
নিরঞ্জন
কন্যা
+ধনেশপ্রকাশ
গঙ্গোপাধ্যায়
কন্যা
কন্যা
+মুখোপাধ্যায়
মনোরমা
প্রদ্যোৎকুমার
(দত্তক পুত্র)
+সুরজা
মুক্তকেশী
+রঘুনন্দন
ঠাকুর
নিত্যরঞ্জন
+ইরাবতী
কুমুদপ্রকাশ
নলিনপ্রকাশ
+ত্রাণকুমারী
+ইন্দ্রাণী
শেষপ্রকাশ
জলধিচন্দ্র
+প্রণয়িনী
কিরণমালী
+মায়াবিনী
কন্যা
+ রায়
শান্তিলতা
+তারকনাথ
নীলাঞ্জন
+অদিতি
নিরধিপ্রকাশ
+সুব্রতা
শেফালিকা
+প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর
প্রমোদকুমার
+শরৎকুমারী
প্রদ্যোৎকুমার
(দত্তক পুত্র)
শ্যামাকুমার
+সন্তোষিনী
+অমিয়বালা
শিবকুমার
+স্নেহলতা
শক্তিন্দ্রমোহন
অবনীমোহন
+পঙ্কজিনী
কৌশিকীমোহন
+নির্মলাবালা
মিনতি
+অমিয়কান্তি
চট্টোপাধ্যায়
প্রদীপ্তকুমার
সুদীপ্তকুমার
শ্রীজয়ন্তী
+ ধনেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
জয়জয়ন্তী

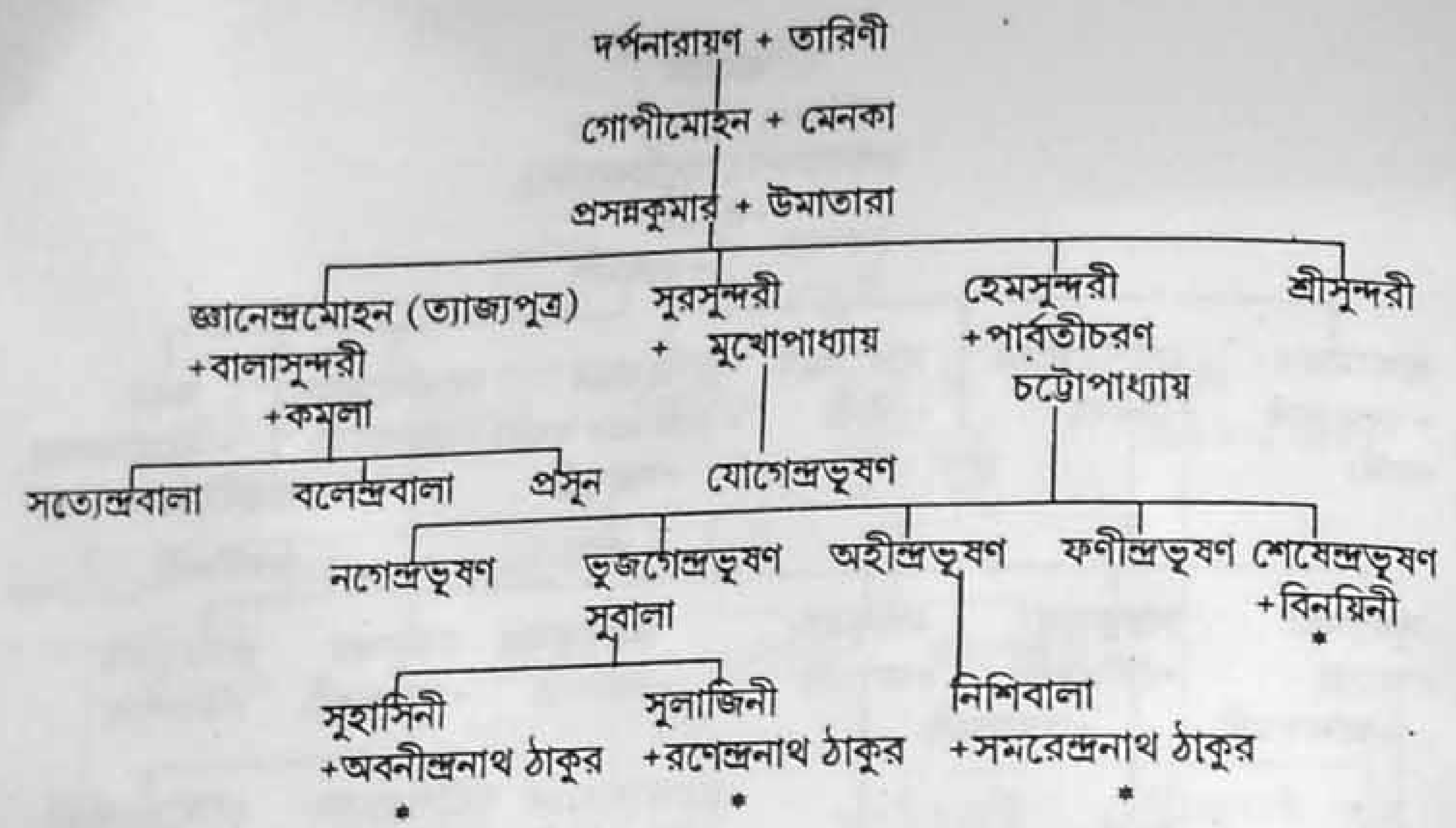
দর্পনারায়ণ + তারিণী
গোপীমোহন + মেনকা
প্রসন্নকুমার + উমাতারা
জ্ঞানেন্দ্রমোহন (ত্যাজ্যপুত্র)
+বালাসুন্দরী
+কমলা
সুরসুন্দরী
+ মুখোপাধ্যায়
হেমসুন্দরী
+পার্বতীচরণ
চট্টোপাধ্যায়
শ্রীসুন্দরী
সত্যেন্দ্রবালা
বলেন্দ্রবালা
প্রসূন
যোগেন্দ্রভূষণ
নগেন্দ্রভূষণ
ভুজগেন্দ্রভূষণ
সুবালা
অহীন্দ্রভূষণ
ফণীন্দ্রভূষণ
শেষেন্দ্রভূষণ
+বিনয়িনী
সুহাসিনী
+অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সুলাজিনী
+রণেন্দ্রনাথ ঠাকুর
নিশিবালা
+সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

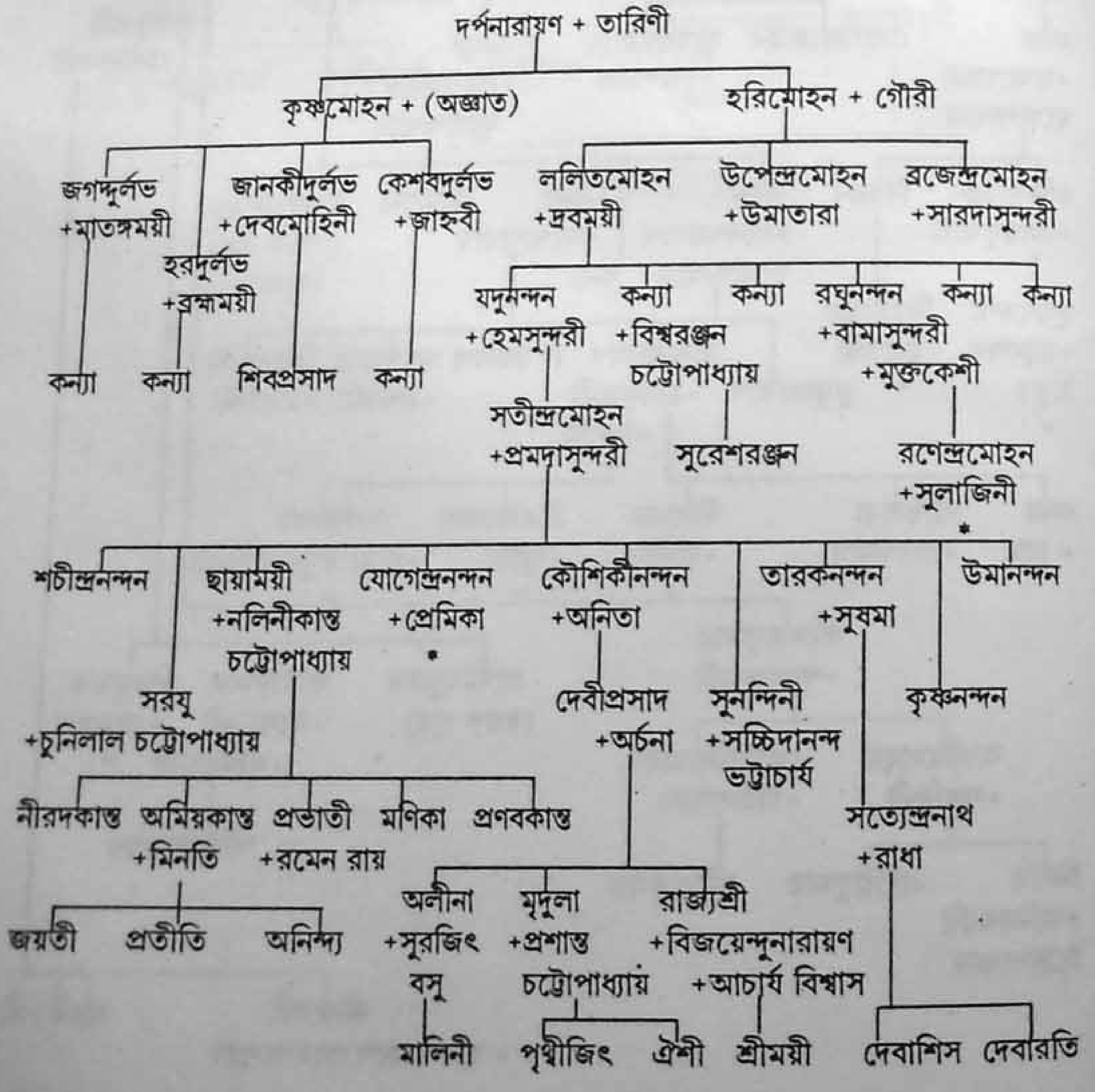
দর্পনারায়ণ + তারিণী
কৃষ্ণমোহন + (অজ্ঞাত)
হরিমোহন + গৌরী
জগদ্দুর্লভ
+মাতঙ্গময়ী
জানকীদুর্লভ
+দেবমোহিনী
কেশবদুর্লভ
+জাহ্নবী
হরদুর্লভ
+ব্রহ্মময়ী
ললিতমোহন
+দ্রবময়ী
উপেন্দ্রমোহন
+উমাতারা
ব্রজেন্দ্রমোহন
+সারদাসুন্দরী
কন্যা
কন্যা
শিবপ্রসাদ
কন্যা
যদুনন্দন
+হেমসুন্দরী
কন্যা
+বিশ্বরঞ্জন
চট্টোপাধ্যায়
কন্যা
রঘুনন্দন
+বামাসুন্দরী
+মুক্তকেশী
কন্যা
কন্যা
সতীন্দ্রমোহন
+প্রমদাসুন্দরী
সুরেশরঞ্জন
রণেন্দ্রমোহন
+সুলাজিনী
শচীন্দ্রনন্দন
ছায়াময়ী
+নলিনীকান্ত
চট্টোপাধ্যায়
যোগেন্দ্রনন্দন
+প্রেমিকা
কৌশিকীনন্দন
+অনিতা
তারকনন্দন
+সুষমা
উমানন্দন
সরযু
+চুনিলাল চট্টোপাধ্যায়
দেবীপ্রসাদ
+অর্চনা
সুনন্দিনী
+সচ্চিদানন্দ
ভট্টাচার্য
কৃষ্ণনন্দন
নীরদকান্ত
অমিয়কান্ত
+মিনতি
প্রভাতী
+রমেন রায়
মণিকা
প্রণবকান্ত
সত্যেন্দ্রনাথ
+রাধা
অলীনা
+সুরজিৎ
বসু
মৃদুলা
+প্রশান্ত
চট্টোপাধ্যায়
রাজ্যশ্রী
+বিজয়েন্দুনারায়ণ
+আচার্য বিশ্বাস
জয়তী
প্রতীতি
অনিন্দ্য
মালিনী
পৃথ্বীজিৎ
ঐশী
শ্রীময়ী
দেবাশিস
দেবারতি

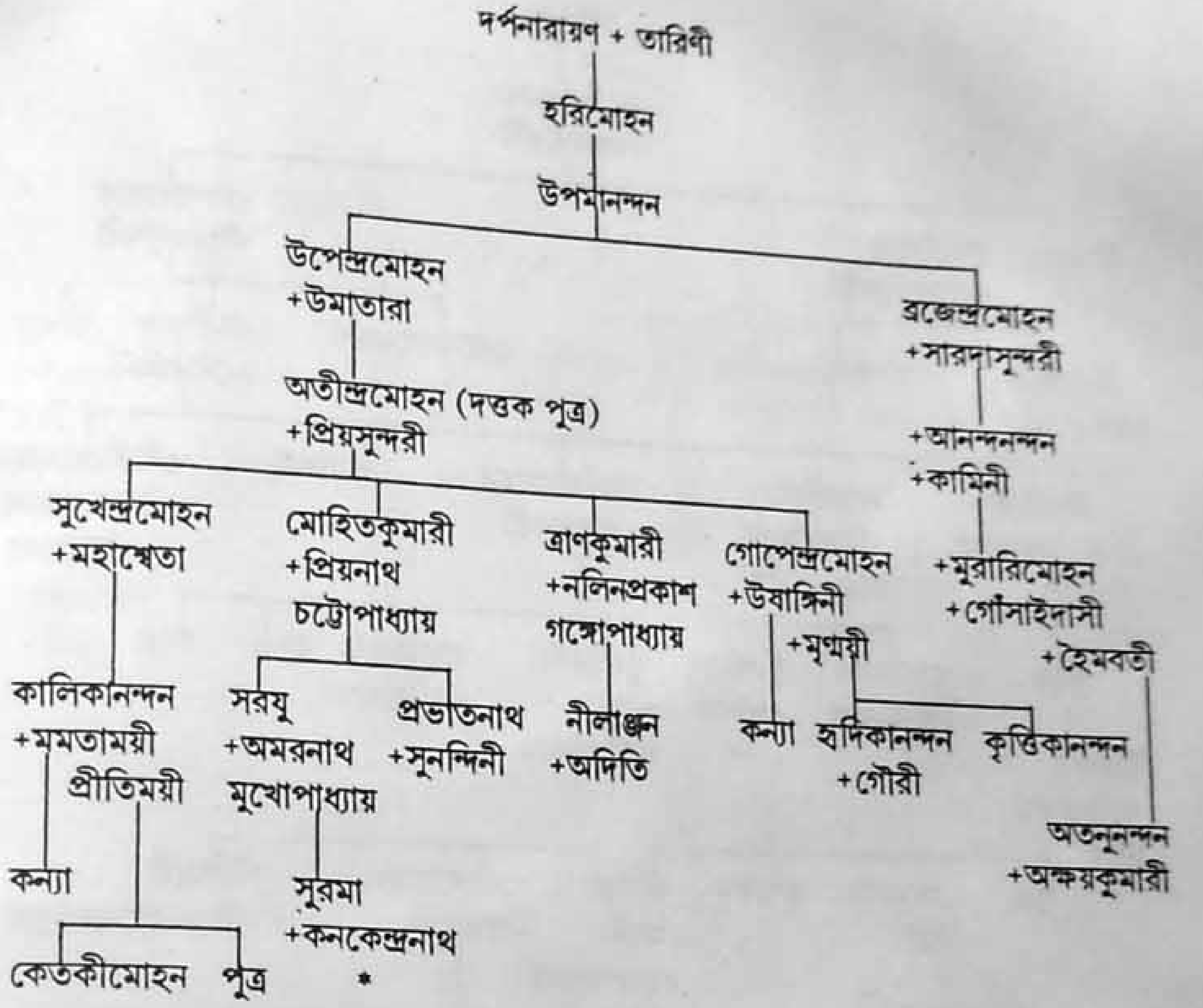
দর্পনারায়ণ + তারিণী
হরিমোহন
উপমানন্দন
উপেন্দ্রমোহন
+উমাতারা
ব্রজেন্দ্রমোহন
+সারদাসুন্দরী
অতীন্দ্রমোহন (দত্তক পুত্র)
+প্রিয়সুন্দরী
+আনন্দনন্দন
+কামিনী
সুখেন্দ্রমোহন
+মহাশ্বেতা
মোহিতকুমারী
+প্রিয়নাথ
চট্টোপাধ্যায়
প্রাণকুমারী
+নলিনপ্রকাশ
গঙ্গোপাধ্যায়
গোপেন্দ্রমোহন
+উষাঙ্গিনী
+মৃণ্ময়ী
+মুরারিমোহন
+গোঁসাইদাসী
+হৈমবতী
কালিকানন্দন
+মমতাময়ী
প্রীতিময়ী
সরযু
+অমরনাথ
মুখোপাধ্যায়
প্রভাতনাথ
+সুনন্দিনী
নীলাঞ্জন
+অদিতি
কন্যা
হৃদিকানন্দন
+গৌরী
কৃত্তিকানন্দন
অতনুনন্দন
+অক্ষয়কুমারী
কন্যা
সুরমা
+কনকেন্দ্রনাথ
কেতকীমোহন
পুত্র

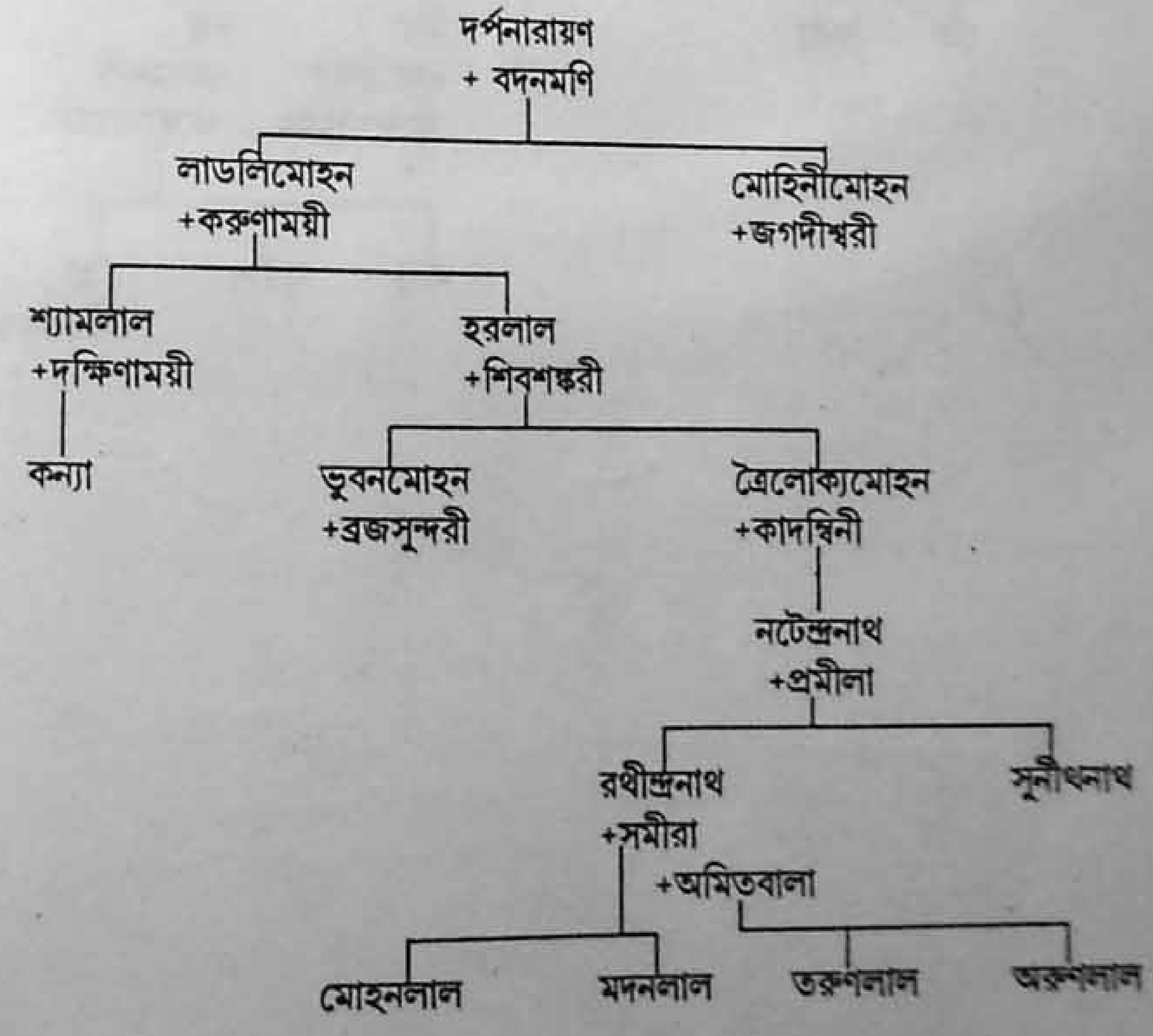
দর্পনারায়ণ
+ বদনমণি
লাডলিমোহন
+করুণাময়ী
মোহিনীমোহন
+জগদীশ্বরী
শ্যামলাল
+দক্ষিণাময়ী
হরলাল
+শিবশঙ্করী
কন্যা
ভুবনমোহন
+ব্রজসুন্দরী
ত্রৈলোক্যমোহন
+কাদম্বিনী
নটেন্দ্রনাথ
+প্রমীলা
রথীন্দ্রনাথ
+সমীরা
+অমিতবালা
সুনীথনাথ
মোহনলাল
মদনলাল
তরুণলাল
অরুণলাল

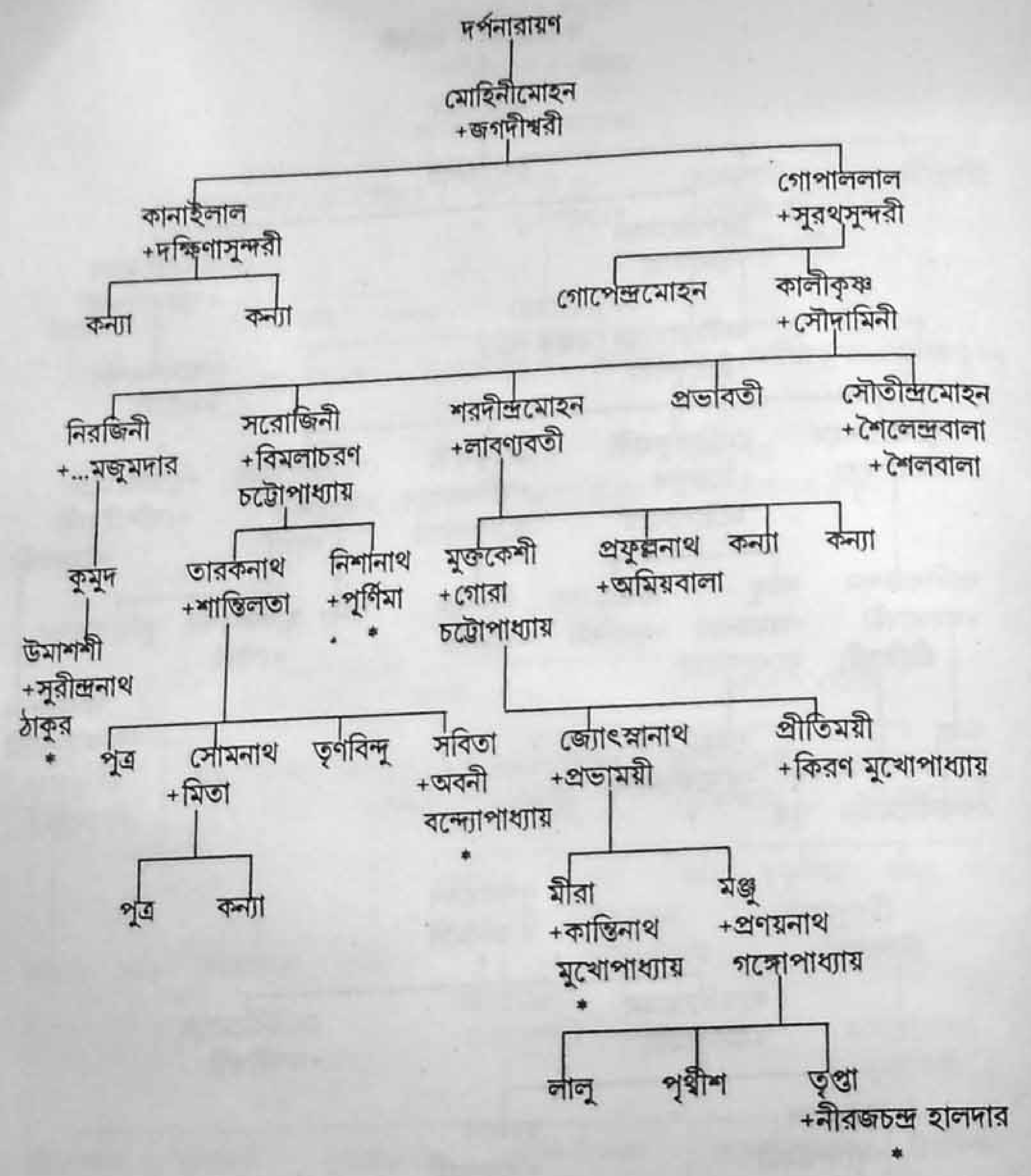
দর্পনারায়ণ
মোহিনীমোহন
+জগদীশ্বরী
কানাইলাল
+দক্ষিণাসুন্দরী
গোপাললাল
+সুরথসুন্দরী
কন্যা
কন্যা
গোপেন্দ্রমোহন
কালীকৃষ্ণ
+সৌদামিনী
নিরজিনী
+...মজুমদার
সরোজিনী
+বিমলাচরণ
চট্টোপাধ্যায়
শরদীন্দ্রমোহন
+লাবণ্যবতী
প্রভাবতী
সৌতীন্দ্রমোহন
+শৈলেন্দ্রবালা
+শৈলবালা
কুমুদ
উমাশশী
+সুরীন্দ্রনাথ
ঠাকুর
*
তারকনাথ
+শান্তিলতা
নিশানাথ
+পূর্ণিমা
*
মুক্তকেশী
+গোরা
চট্টোপাধ্যায়
প্রফুল্লনাথ
+অমিয়বালা
কন্যা
কন্যা
পুত্র
সোমনাথ
+মিতা
তৃণবিন্দু
সবিতা
+অবনী
বন্দ্যোপাধ্যায়
*
জ্যোৎস্নানাথ
+প্রভাময়ী
প্রীতিময়ী
+কিরণ মুখোপাধ্যায়
পুত্র
কন্যা
মীরা
+কান্তিনাথ
মুখোপাধ্যায়
*
মঞ্জু
+প্রণয়নাথ
গঙ্গোপাধ্যায়
লালু
পৃথ্বীশ
তৃপ্তা
+নীরজচন্দ্র হালদার
*

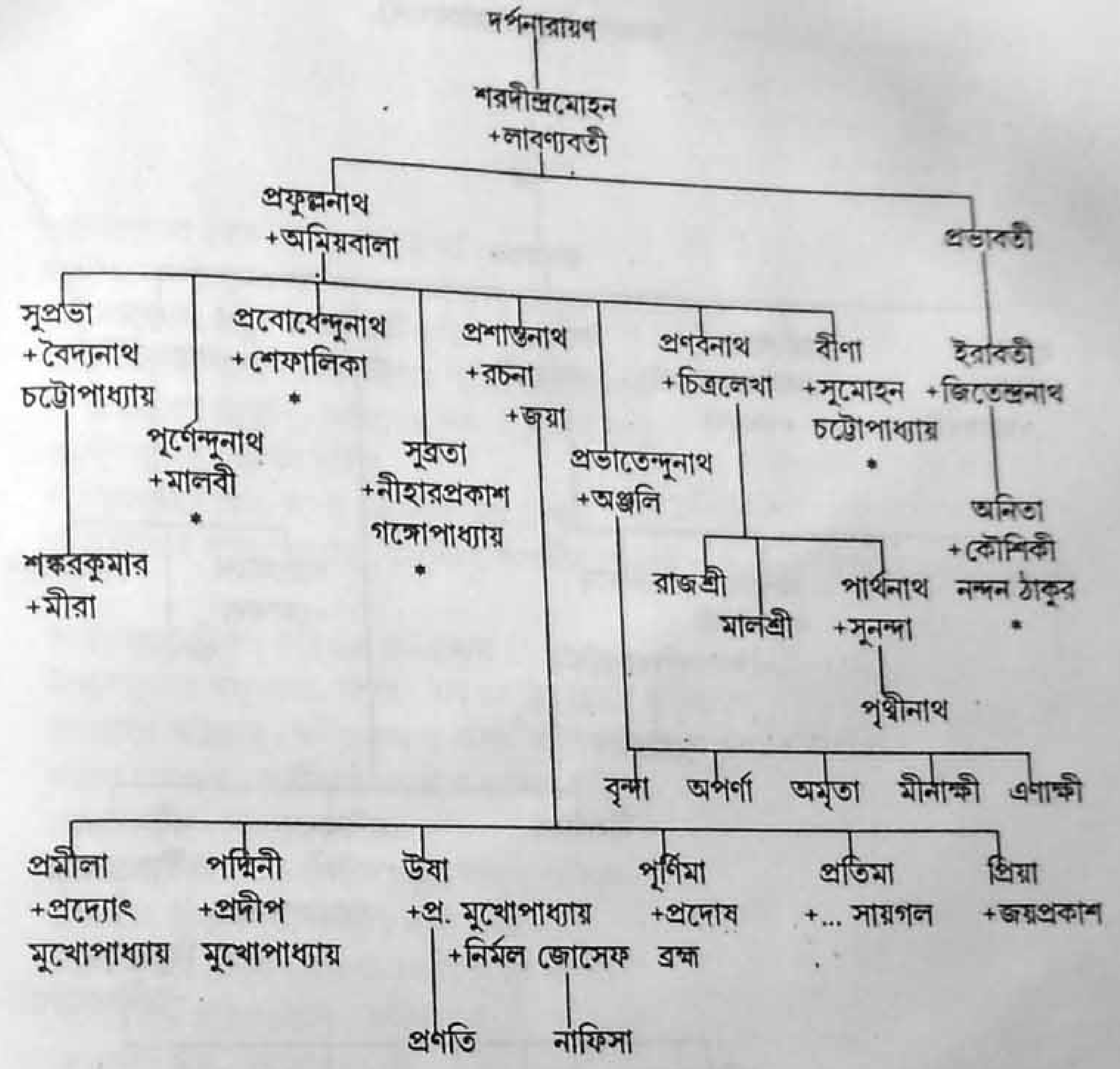
দর্পনারায়ণ
শরদীন্দ্রমোহন
+লাবণ্যবতী
প্রফুল্লনাথ
+অমিয়বালা
প্রভাবতী
সুপ্রভা
+বৈদ্যনাথ
চট্টোপাধ্যায়
প্রবোধেন্দুনাথ
+শেফালিকা
*
প্রশান্তনাথ
+রচনা
+জয়া
প্রণবনাথ
+চিত্রলেখা
বীণা
+সুমোহন
চট্টোপাধ্যায়
*
ইরাবতী
+জিতেন্দ্রনাথ
পূর্ণেন্দুনাথ
+মালবী
*
সুব্রতা
+নীহারপ্রকাশ
গঙ্গোপাধ্যায়
*
প্রভাতেন্দুনাথ
+অঞ্জলি
অনিতা
+কৌশিকী
নন্দন ঠাকুর
*
শঙ্করকুমার
+মীরা
রাজশ্রী
মালশ্রী
পার্থনাথ
+সুনন্দা
পৃথ্বীনাথ
বৃন্দা
অপর্ণা
অমৃতা
মীনাক্ষী
এণাক্ষী
প্রমীলা
+প্রদ্যোৎ
মুখোপাধ্যায়
পদ্মিনী
+প্রদীপ
মুখোপাধ্যায়
উষা
+প্র. মুখোপাধ্যায়
+নির্মল জোসেফ
পূর্ণিমা
+প্রদোষ
ব্রহ্ম
প্রতিমা
+... সায়গল
প্রিয়া
+জয়প্রকাশ
প্রণতি
নাফিসা

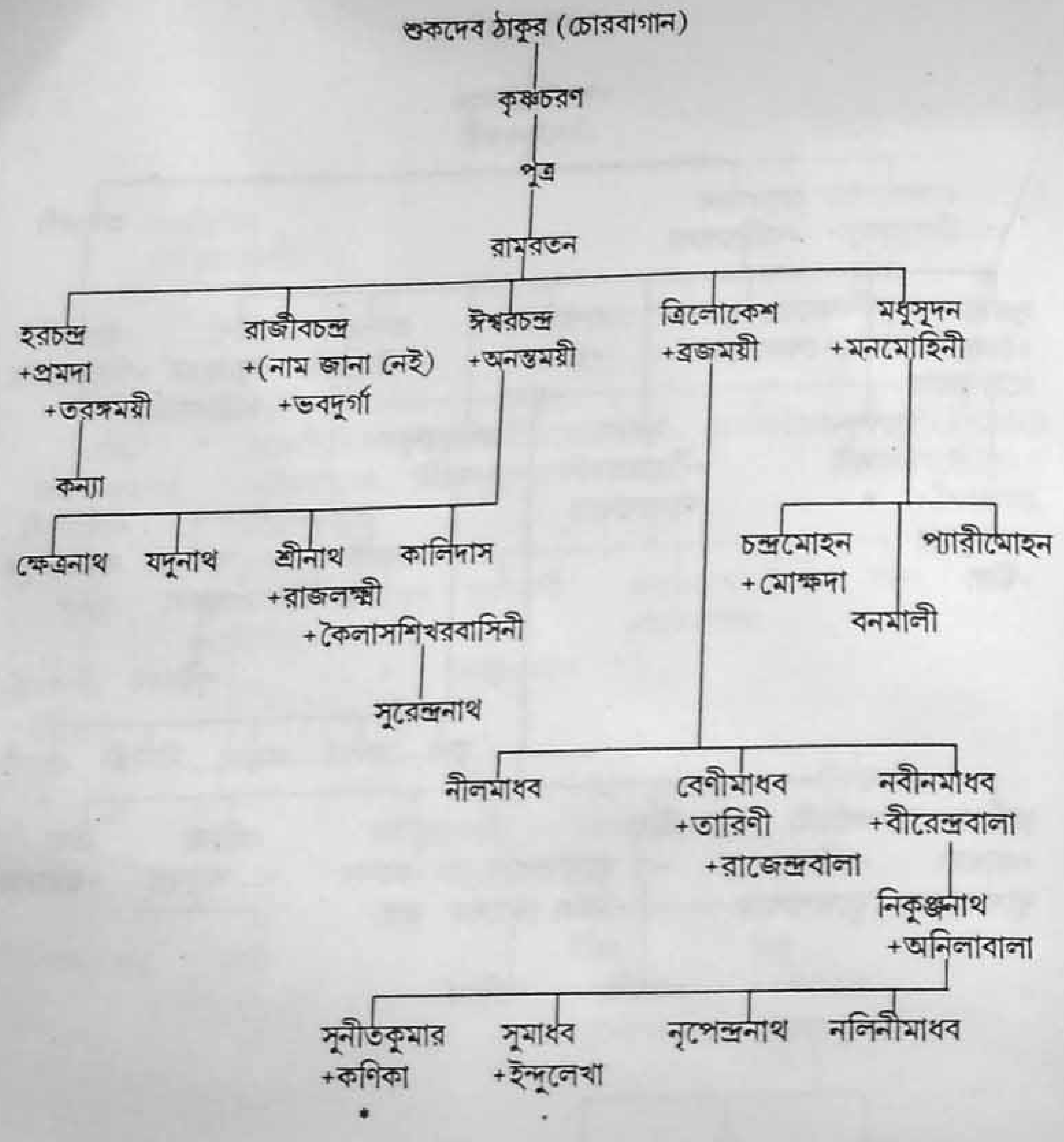

গ্রন্থঋণ

অজিতকুমার ঘোষ : ঠাকুরবাড়ির অভিনয়
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : আপনকথা, ঘরোয়া, জোড়াসাঁকোর ধারে
অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর : শ্রুতি ও স্মৃতি
অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় : মহিলাদের স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ
অর্দ্ধেন্দ্রপ্রকাশ গাঙ্গুলি : ভারতের শিল্প ও আমার কথা
অশোককুমার : জীবন নাইয়া
অশোককুমার মিত্র, সম্পা : ঠাকুরবাড়ির লেখা
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য, দুই নারী ও তিন নায়িকা
আবদুল আজীজ : কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ
উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, সম্পা : ঠাকুরবাড়ির চোখে রবীন্দ্রনাথ
উষাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য : রবীন্দ্রনাথ ও অসম, রবীন্দ্রনাথ আরু অসম (অসমিয়া)
কমলা দাশগুপ্ত : স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী
কল্যাণী দত্ত : পিঞ্জরে বসিয়া
কৃষ্ণ কৃপালনী : দ্বারকানাথ ঠাকুর বিস্মৃত পথিকৃৎ
কৃষ্ণকলি বিশ্বাস : এ নগরীর নারী কথা
ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর : দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী
খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় : রবীন্দ্রকথা
গুরুসদয় দত্ত : সরোজনলিনী
গোপালচন্দ্র রায় : রবীন্দ্রনাথের স্ফুলিঙ্গ
গৌতম চট্টোপাধ্যায় ও সুভাষ চৌধুরী, সম্পা : সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিক সংকলন
গৌরচন্দ্র সাহা : রবীন্দ্র পত্রাবলী তথ্যপঞ্জী
গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু : সোনার দাগ
জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য : কবিমানসী
জসীমউদ্দীন : ঠাকুরবাড়ির আঙিনায়
জ্ঞানেন্দ্রকুমার, সং : বংশ পরিচয় (চতুর্থ খন্ড)
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর : আমার জীবনস্মৃতি (বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় অনুলিখিত ও প্রশান্তকুমার পাল সম্পাদিত), জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনা-সমগ্র
জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ : হেমলতা ঠাকুর
দীনেশচন্দ্র সেন : ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য
দেবব্রত বিশ্বাস : ব্রাত্যজনের রুদ্ধসংগীত
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : স্বরচিত জীবনচরিত
দ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায় : ঘরের মানুষ গগনেন্দ্রনাথ
নগেন্দ্রনাথ বসু ও ব্যোমকেশ মুস্তফী : বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড (তৃতীয় ভাগ)
নির্মলকুমারী মহলানবিশ : বাইশে শ্রাবণ

নির্মলেন্দু ভৌমিক: সাহিত্য পত্রিকার পরিচয় ও রচনাপঞ্জী
নীরদচন্দ্র চৌধুরী : বাঙালী জীবনে রমণী
পশুপতি শাসমল : স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য
পার্থ চট্টোপাধ্যায় : বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ
পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, সম্পা : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংগৃহীত স্বপ্নের মোড়ক
পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় : কবিপত্নী মৃণালিনী, মাধুরীলতার চিঠি, রবীন্দ্রনাথের তিন কন্যা
পূর্ণেন্দু পত্রী : গত শতকের প্রেম
প্রজ্ঞাপারমিতা বড়ুয়া : মৃণালিনী দেবী রবীন্দ্র-কাব্যে ও জীবনে
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী (১ম-২য় খণ্ড), ফিরে ফিরে চাই, রবীন্দ্র জীবনী (১ম-৪র্থ খণ্ড), রবীন্দ্র বর্ষপঞ্জী
প্রমথ চৌধুরী : আত্মকথা
প্রশান্তকুমার পাল : রবিজীবনী (১ম-৮ম খণ্ড)
প্রসন্নময়ী দেবী : পূর্বকথা
বন্দনা সেনগুপ্ত : স্পন্দিত অন্তর্লোক
বাণী নিয়োগী : জীবনলেখ ইতিকথা
বামা রচনাবলী (প্রথম ভাগ)
বারিদবরণ ঘোষ : দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবন ও সাধনা
বাসব ঠাকুর : জোড়াসাঁকো থেকে পৃথিবীর পথে
বিনয় ঘোষ : কলকাতা কালচার, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (১ম-৫ম খণ্ড)
বিনয়ভূষণ রায় : অন্তঃপুরের স্ত্রীশিক্ষা, জেনানা মিশন
বিপিনচন্দ্র পাল : সত্তর বছর
বিপিনবিহারী গুপ্ত : পুরাতন প্রসঙ্গ
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গ সাহিত্যে নারী, বঙ্গীয় নাট্যশালা, সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম-৩য় খণ্ড), সাময়িকপত্র সম্পাদনে বঙ্গনারী
ভবতোষ দত্ত : বাঙালির সাহিত্য
ভারতী রায়, সম্পা : নারী ও পরিবার বামাবোধিনী পত্রিকা, সেকালের নারীশিক্ষা বামাবোধিনী পত্রিকা
মন্দ্রকুলা সেন : সেদিনের কথা
মানসী দাশগুপ্ত : রবীন্দ্রনাথ এক অনন্বিত দ্বন্দ্ব
মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় : গগনেন্দ্রনাথ, দক্ষিণের বারান্দা
মৈত্রেয়ী দেবী : মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ গৃহে ও বিশ্বে
যোগেশচন্দ্র বাগল : জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী, বাংলার স্ত্রীশিক্ষা, বেথুন সোসাইটি
রঞ্জিত চক্রবর্তী : দ্বারকানাথ ঠাকুর ঐতিহাসিক সমীক্ষা
রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পিতৃস্মৃতি
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চিঠিপত্র, ছিন্নপত্রাবলী, ছেলেবেলা, জীবনস্মৃতি, শ্যামলী, স্ফুলিঙ্গ
রমা চক্রবর্তী : ভরা থাক স্মৃতিসুধায়
রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় : রমেশদার আত্মকথা
রাজনারায়ণ বসু : আত্মচরিত, সেকাল আর একাল
রাণী চন্দ : আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ, সব হতে আপন
রাসসুন্দরী দেবী : আমার জীবন
লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া : আমার জীবনস্মৃতি (আরতি ঠাকুর অনূদিত)

লীলা মজুমদার : পাকদণ্ডী
শঙ্করীপ্রসাদ বসু : বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ (৪র্থ খণ্ড)
শরৎকুমারী চৌধুরাণী : শরৎকুমারী রচনাবলী
শান্তিদেব ঘোষ : জীবনের ধ্রুবতারা, রবীন্দ্র সংগীত, রবীন্দ্র সঙ্গীত বিচিত্রা
শান্তিপদ ভট্টাচার্য : মানসী, মর্মবাণী এবং মানসী ও মর্মবাণী রচনাপঞ্জী
শিবনাথ শাস্ত্রী : আত্মচরিত, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ
শেফালিকা শেঠ : বাংলার স্ত্রীশিক্ষা
শৈলসুতা দেবী : পরিণয়ে প্রণতি (১ম-৩য় খণ্ড)
শ্যামলী বসু : সেকাল ও সেকালিনী
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : আমার বাল্যকথা, বোম্বাই প্রবাস
সন্তোষকুমার দে ও কল্যাণবন্ধু ভট্টাচার্য, সম্পা : কবিকণ্ঠ
সন্দীপ ঠাকুর : জনদিশারী (সুধীর চন্দ অনূদিত)
সন্ধ্যা সেন : সুরের আগুন (১ম-২য় খণ্ড)
সমুদ্র চক্রবর্তী : অন্দরে অন্তরে
সমর ভৌমিক : রাণু মুখোপাধ্যায়ের জীবনালেখ্য
সাধনা বসু : শিল্পীর আত্মকথা (কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত)
সাবিত্রী (বামাবোধিনী রচনা সংকলন)
সাহানা দেবী : স্মৃতির খেয়া
সীতা দেবী : পুণ্যস্মৃতি
সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য়-৪র্থ খণ্ড)
সুতপা ভট্টাচার্য : বাঙালি মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য, মেয়েলি পাঠ, সে নহি সে নহি
সুধীরচন্দ্র কর ও সাধনা কর : শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গ
সুনীল দাস : ভারতী ইতিহাস ও রচনাপঞ্জী
সুপ্তি মিত্র : শান্তিনিকেতন : সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ (সম্পা)
সুব্রত রুদ্র : কাদম্বরী দেবী
সুমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর : ঠাকুরবাড়ির জানা অজানা
সুরমা মৈত্র : মার্কিন বিদুষী মহিলা
সোমেন্দ্রনাথ বসু : তবে তাই হোক, প্রবাসী : সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ (সম্পা)
স্মৃতিকথা (সম্পা)
সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর : যাত্রী
হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় : ঠাকুরবাড়ির কথা
হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর : আমার বিবাহ
Kishor Chatterjee : Sunayani Devi : a pioneer amongst Indian Woman painters
Lotika Ghosh : Social and Educational Movement
Malavika Karlekar : Voices from within
Sankar Sengupta : A study of Women of Bengal
Usha Chakraborty : Condition of Bengali Women

পত্রপত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা

অমৃত, আজকাল, আনন্দবাজার পত্রিকা, আনন্দসংগীত পত্রিকা, কিছুক্ষণ, কৃত্তিবাস, গীতবিতান পত্রিকা, ঘরোয়া, চতুরঙ্গ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, দেশ, পরিচয়, পুণ্য, প্রবাসী, বঙ্গলক্ষ্মী, বর্তমান, বালক, বিচিত্রা, বিভাব, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ভারতী, মহিলা মহল, মানসী ও মর্মবাণী, মাসিক বসুমতী, রবীন্দ্রচর্চা, রবীন্দ্র প্রসঙ্গ, রবীন্দ্র ভাবনা, শান্তিনিকেতন পত্রিকা, শ্রেয়সী, সংবাদ প্রতিদিন, সবুজপত্র, সমকালীন, সমতট, সমাজতান্ত্রিক জি ডি আর, সাহিত্য।

বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে দুটি রচনার

কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় : ঠাকুর পরিবার : কে-কী-কেন-কবে-কোথায়। দৈনিক বসুমতী, ৪ মে ১৯৮০, পৃ. ৭

সুমিত মজুমদার : ঠাকুরবাড়ির বংশধররা কে কোথায় আছেন? কী করছেন? শারদীয়া পরিবর্তন, সেপ্টেম্বর ১৯৮১, পৃ. ৫-৩৬

ঠাকুরবাড়ির মহিলাদের রচনা

পাণ্ডুলিপি

উমা দেবীর আত্মকথা : মেনকা ঠাকুর
কমলা দেবীর কবিতা : মুকুলা রায়
গীতা দেবীর স্মৃতিকথা : অস্মিতা ত্রিবেদী
পূর্ণিমা দেবীর 'ইন্দিরা দেবী চৌধুরানি' : পূর্ণিমা ঠাকুর
পূর্ণিমা দেবীর 'চাঁদের বুড়ি' : পূর্ণিমা চট্টোপাধ্যায়
বিনয়িনী দেবীর 'কাহিনী' : সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়
বীণা দেবীর কবিতা : সম্মোহন চট্টোপাধ্যায়
রমা দেবীর অপ্রকাশিত রচনা : এণা দেবী
সুচিত্রা দেবীর অপ্রকাশিত রচনা : গৌরী ঠাকুর
সুনয়নী দেবীর কবিতা : মণিমালা দেবী
সুরূপা দেবীর কবিতা : সুরূপা দেবী
সুষমা দেবীর অপ্রকাশিত রচনা : জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থ

অমিতা ঠাকুর : অঞ্জলি, জন্মদিনে

আরতি ঠাকুর : ছায়ারঙ্গ, লক্ষ্মীনন্দন বরার গাঙচিলের ডানা (অনু), লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার 'আমার জীবনস্মৃতি' (অনু)

ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী : জীবনকথা, নারীর উক্তি, রবীন্দ্রসংগীতে ত্রিবেণী সংগম, রবীন্দ্রস্মৃতি, গীত পঞ্চাশতী (সম্পা), বাংলার স্ত্রী আচার (সম্পা), হিন্দুসংগীত (প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে)

ইন্দিরা দেবী প্রমথ চৌধুরী পত্রাবলী (সম্পা : সুভাষ চৌধুরী) Tales for four friends (অনু), The Autobiography of Maharshi Devendranath Tegore (অনু : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে)

উমা দেবী : বাবার কথা

এইকো মাৎসুমতো ঠাকুর : গাধাকে মানুষ করা গেল না, দোল দোল দোলানি, ভারতের পাখি হিরামন—(বই তিনটি জাপানি ভাষায় লেখা) To India as a Japanise bride

কল্যাণী চট্টোপাধ্যায় : মৌনরেখা

কল্যাণী মল্লিক : নাথপন্থ, নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস দর্শন ও সাধন প্রণালী

জয়ন্তী দেবী : জীবনমুক্তি, মহামিলন

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী : টাক ডুমা ডুম, পুরাতনী (সম্পা. ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী), সাত ভাই চম্পা

তনুজা দেবী : পাঁচমেশেলি, বুনুনি

নন্দিনী দেবী : পিতাপুত্রী

পূর্ণিমা ঠাকুর : ঠাকুরবাড়ির রান্না

পূর্ণিমা দেবী : ঠাকুরবাড়ির গগন ঠাকুর

প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী : আমিষ ও নিরামিষ আহার, জারক

প্রতিভা চৌধুরী : আলোক

প্রতিমা ঠাকুর : চিত্রলেখা, নির্বাণ, নৃত্য, স্মৃতিচিত্র রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য

বাণী দেবী : Applied Music, Cultural Contact and Music. Indian Music and Simultaneous Harmony, Music and Diversional Therapy and Music, Music and Tagore, The Vedic Songs and the Tagore, Western Music and Ragraginies, The West and the East in Music they meet, Music in Basic Education Psychology, Psychology and Music, Psyco Music in war and after

মঞ্জু চট্টোপাধ্যায় : শ্রমিকনেত্রী সন্তোষকুমারী, Petition to Agetation, Bengal 1857-1885, Trail Blazing women Trade Unionist of India

মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায় : নয়া চীনে যা দেখেছি

মনোরমা দেবী : অনিরুদ্ধ মিলন, গৌরগীতিকা, পিতৃদেব চরিত, বিরাজমোহিনী, মানকুঞ্জ

মীরা দেবী : স্মৃতিকথা

মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায় : বাঁধন ছেঁড়ার সাধন

রমা দেবী : Lord Buddha and his Message (ed)

শিবসুন্দরী দেবী : তারাবতী

শীলা চট্টোপাধ্যায় : Shyamali (tr)

শোভনা দেবী : Indian Fables and Folklore, Indian Nature Myths, Tales of the Gods of India, The Orient Pearls, To Whom

শ্যামশ্রী সিংহ রায় : পাগলা দাশু ও হ য ব র ল (হিন্দিভাষায় অনু)

লীলা দেবী : কিশলয়, ধ্রুবা, নবঘন, রূপহীনার রূপ, শিঞ্জন

সংজ্ঞা দেবী : কৃপাকণা

সরলা দেবী : কালীপূজার বলিদান ও বর্তমানে তাহার উপযোগিতা, জীবনের ঝরাপাতা, নববর্ষের স্বপ্ন, বাঙালির পিতৃধন, বেদবাণী, ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল, শতগান (স্বর), শ্রীগুরু বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্মানুষ্ঠিত শিবরাত্রি পূজা

সুরভি ভট্টাচার্য : নানা রঙের দিনগুলি, বারো মাসে তেরো পার্বণ

সৌদামিনী দেবী : ভক্তিরস তরঙ্গিণী

স্বর্ণকুমারী দেবী : আদর্শ নীতি, কবিতা ও গান, কনেবদল, কীর্তি-কলাপ, কোরকে কীট, কৌতুকনাট্য ও বিবিধকথা, গীতিগুচ্ছ (১ম-২য়), ছিন্নমুকুল, জাতীয় সংগীত, দিব্যকমল, দীপনির্বাণ, দেবকৌতুক, ধর্মসংগীত, নবকাহিনী, নিবেদিতা, নিশীথসংগীত, পাকচক্র, পৃথিবী,

প্রথমপাঠ্য ব্যাকরণ, প্রভাতসংগীত, প্রেম পারিজাত, ফুলের মালা, বসন্ত উৎসব, বালবোধ
ব্যাকরণ, বাল্যবিনোদ, বিচিত্রা, বিদ্রোহ, বিবাহ-উৎসব, মালতী ও গল্পগুচ্ছ, মিবাররাজ,
মিলনরাত্রি, যুগান্ত কাব্যনাট্য, রাজকন্যা, সংগীতশতক, সখিসমিতি, সচিত্র বর্ণবোধ,
সন্ধ্যাসংগীত, সাহিত্য স্রোত, সেকেলে কথা, স্নেহলতা, স্বপ্নবাণী, হুগলির ইমামবাড়া, An
Unfinished Song, Short Stories. To Whom (tr : Shobhana Devi)

হেমলতা ঠাকুর : অকল্পিতা, অখন্ড সত্য বস্তু কি, আলোর পাখি, কাহার নাম সত্য, চৈতন্যময়
পূর্ণ ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বর কাহার নাম, জল্পনা, জ্যোতিঃ, দুনিয়ার দেনা, দু'পাতা, দেহলি, ধর্ম বা
মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতা কাহার নাম, পরমাত্মায় কি প্রয়োজন, মহর্ষিদেবের অন্তঃপুরে
মহিলাসমাজ, মেয়েদের কথা, শ্রীনিবাসের ভিটা, শ্রীমতী মোক্ষদাসুন্দরী দেবী, সত্য লাভের
উপায় কি, সার কথা, সৃষ্টি ও স্রষ্টা কাহার নাম।

অগ্রন্থিত কিছু রচনা

অরুণা মুখোপাধ্যায় : Lakshminath Bezbarua and the Tagores of Jorasanko

অমিতা ঠাকুর : কবির কথা, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রতিমা দেবী, মীরা দেবী, রবীন্দ্রনাথের
অভিনয়, শ্রীমতী দেবী

অমিয়া ঠাকুর : কী ধ্বনি বাজে (অনুলিখন সুভাষ চৌধুরী)

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী : আমাদের গান, ৪৯ নং পার্ক স্ট্রিট, দশদিনের ছুটি, বালিকার রচনা,
বির্জিতলাও, বিশুদ্ধ রবীন্দ্রসংগীত, রবীন্দ্রনাথের গান, রবীন্দ্রনাথের সংগীতপ্রভাত,
রবীন্দ্রসংগীতে তানের স্থান, রবীন্দ্রসংগীতের বৈশিষ্ট্য, রবীন্দ্রসংগীতের শিক্ষা, শান্তিনিকেতনে
শিশুদের সংগীতশিক্ষা, সংগীতে রবীন্দ্রনাথ, স্বরলিপি, স্বরলিপি পদ্ধতি, হারমনি বা স্বরসংযোগ,
আঁদ্রে জিদের ফরাসি গীতাঞ্জলির ভূমিকা (অনু), পিয়ের লোতির কমলকুমারিকাশ্রম (অনু),
মাদাম লেভির ভারতবর্ষ (অনু), রেনে গুসের ভারতবর্ষ (অনু)।

ঋতা বন্দ্যোপাধ্যায় : নানা রঙের দিনগুলি, বিষুবরেখায় নীল নদ

কমলা দেবী : গান

কল্যাণী মল্লিক : অলঙ্কার নির্বাচন, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আদর্শ শিক্ষা, কর্মজগতে নারী—
ভাঁড়ারঘর, কল্পতরু উৎসব, কাশ্মীরের ঈশানাথ, কাশ্মীরের পথে, কুমায়ুন ভ্রমণকারীর স্বর্গ—
শততাল, কে, চাচা নেহরুর জন্মদিন, জাতীয় পতাকা, দিদিমা ও মার কথা, নব্যভারতে শিক্ষিত
নারীর আদর্শ, নারী শক্তি সংঘ, প্রীতিমিলন, বইপড়া, বঙ্গসাহিত্যে গোরক্ষনাথের সাধনা, বঙ্গে
স্ত্রীশিক্ষার প্রসার, বসন্ত উৎসব, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশ, বুড়ো খোকা, ব্রহ্মানন্দ
কেশবচন্দ্রের সংকীর্তনপ্রীতি, ভ্রাতৃস্মরণে, মধ্যযুগের সন্ত ও নাথসাধনা, মাতৃতর্পণ, যুগাচার্য
শ্রীমদ বিবেকানন্দ, যোগীজাতির অতীত গৌরব, রমাগৃহে রসচক্রের বৈঠক, রবীন্দ্র স্মৃতিবার্ষিকী,
শিশুশিক্ষা, শিশুস্বাস্থ্য, সরোজিনী নাইডু, সিকিম যাত্রা, সেকাল ও একাল, স্ত্রীশিক্ষা, স্বর্গীয়া
জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী, Godhead in Sankhya,
Gorakhnath's Sadhana in Bengali Literature, Gradual Development of Women's
Education in Bengal. Indian State Railways Special Tour in 1929, Pramatha
Chaudhury, Saint Gorakhnath, Sri Sarada Devi as the living Embodyment of the
Devine Mother. Story of the Four Winds, The Brahma Samaj one world Felloship.
The thoary shrine of Gorakhnath, The Nath Yogis, Women as the living Embodiment
in the sadhana of Sri Ramakrishna, Women and university education, Visit of the
Taj.

গীতা চট্টোপাধ্যায় : শতবর্ষের প্রণাম সুনয়নী দেবী, সুনয়নী দেবী, কবিতা

জয়শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় : গ্রামবাংলার গল্প, নারী ও স্বাস্থ্য বৈষম্য আর অবহেলা

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী : আশ্চর্য পলায়ন, ইংরাজনিন্দা ও দেশানুরাগ, কিন্ডারগার্টেন, স্ত্রীশিক্ষা,

দীপিকা, সিস্টার : Lakshminath Bezbarua, the man and father

দীপ্তি চট্টোপাধ্যায় : এ ঘরে ফুরলো খেলা, ছাত্রীদের কাছে রাজপরিচয়, জয় পরাজয়, জয়ী,
ত্রিশ বছর পরে, নারীর স্থান, পথ চলাতেই আনন্দ, পরশমণি, পান্নাকুমারী, ফুল ফুটবে, বন্দীদ্বীপে
বিবাহ-প্রথা, বাঁচবার উদ্দেশ্য, বাধা, বিলাতের চিঠি, মোমের পুতুলের মনের কথা, রবিদাদা,
রায়বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, লক্ষ্মীদিদির কালো চশমা, লেখিকার বিপদ, শেষ
রাগিণী, সহধর্মিণী, সাধারণ শিক্ষা ও পারিবারিক জীবন, হিরের কণ্ঠী, সাধু বিয়াট্রিস (অনু)

নন্দিতা কৃপালনী : নির্দোষ, ব্রেজিলে এক বৎসর, সোনার দেশ

প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী : গোপালন

প্রতিভা চৌধুরী : আত্মকথা, তানসেন, বৈজুবাওয়া, নায়ক, শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, সহজ গান
শিক্ষা, সা সদারঙ্গ, সাংখ্যস্বরলিপি

প্রতিমা ঠাকুর : গুরুদেবের ছবি, মহাত্মাজি

প্রফুল্লময়ী দেবী : আমাদের কথা

মঞ্জু চট্টোপাধ্যায় : চটকল শ্রমিক আন্দোলন—দুই সংগ্রামী নারী, নারীমুক্তির
সেকাল-একাল, নারীশিক্ষা, উনিশ শতকের কিছু কথা, বন্দর শ্রমিক ধর্মঘট ও কম্যুনিস্ট নেত্রী
সুধা রায়, মরণসাগর পারে তোমরা অমর তোমাদের স্মরি

মনীষা দেবী : পুঁতির পর্দা

মাধবী দেবী : বাংলার স্ত্রী আচার পশ্চিমবঙ্গে

মীরা দেবী : জাতির স্বাতন্ত্র্য, ডাউলিং, দরিদ্র ঘটনা, ধর্ম ও বিজ্ঞান, পাঞ্জাবের বিবাহপ্রথা,
প্রাচীন ভারতে বিদেশি, ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল, ভারতের ভাগবত ধর্ম, মৌর্য সাম্রাজ্যের লোপ,
রণক্ষেত্রে কুকুর, শীলশিক্ষা, হাতির দন্তচিকিৎসা, হিন্দু মুসলমান সমস্যা, হিন্দুধর্ম ও রাষ্ট্রনীতি

মোহিতকুমারী দেবী : সাধুমার আত্মকথা

রত্না বরুয়া : শৈশবস্মৃতি (অসমিয়া), Lakshminath Bezbarua and Prajnasundari Devi

রমা দেবী : রবীন্দ্রসাহিত্যে নারী, সাপুড়ের গল্প

শিবানী ঘোষাল : ঠাকুরবাড়ির রান্না, রবীন্দ্র সান্নিধ্যে (অনুলিখন হেনা চৌধুরী)

শীলা চট্টোপাধ্যায় : রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি ছোটগল্পের অনুবাদ করেন—গুপ্তধন, চিত্রকর,
তপস্বিনী, তারাপ্রসন্নের কীর্তি, দান প্রতিদান, দালিয়া, দেনা পাওনা, প্রতিহিংসা, ফেল, মাল্যদান,
শান্তি, সম্পাদক

শোভনা দেবী : আনার রানী বা ডালিমকুমারী, কহাবৎ বা জয়পুরি প্রবচন, গঙ্গাদেব, ছেঁড়া
কাগজের ডোমলা, ফুলচাঁদ, মহাযুদ্ধের পরে প্যারী নগরীতে, য়ুরোপে মহাসমরের পরে লণ্ডনে,
রণক্ষেত্রে বঙ্গমহিলা, লক্ষ টাকার এক কথা, লুব্ধ বণিক তেজারাম

শ্রীমতী ঠাকুর : এখনকার নৃত্যকলা, ভরতনাট্যম, মণিপুরি নৃত্য, রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য

সংজ্ঞা দেবী : ইউরিশিমা, ওঁকে যেমন দেখেছি (অনুলিখন জয়শ্রী সেন), মৎসুয়ামার আয়না,
সেবিকার কৈফিয়ৎ

সতীরানী ঠাকুর : শেষযাত্রায় রবীন্দ্রনাথ যেন বিসর্জনের জয়সিংহ

সরলা দেবী : অকালে বাসন্তী পূজা, অগ্নিপরীক্ষা অনাথবন্ধু, অহল্যার শাপকথার দ্বৈধ,
অপরাজিতা, অভয়মন্ত্র, অরূপ অশ্বপৃষ্ঠে, অহংকার, আত্মতৃপ্ত, আমাদের উচ্চশিক্ষা, আমার
বাল্যজীবন, আমার শ্রোতা, আলোচনা ভাষা পুষ্টি সম্পর্কে, আহ্বান, আহিতাগ্নিকা, ইসলামের
ধর্মগোষ্ঠা, উদ্বোধন, এক গান তিন সুর (স্বর), একা, একালে সেকালে, ওমর খৈয়াম, কংগ্রেস
ও স্বায়ত্তশাসন, কংগ্রেসের কর্তৃত্ব, কবি সম্বর্ধনা, কাজের বোঝা, কালী পূজায় বলিদান ও

কুমার উদয়াদিত্য, কুমার লাইব্রেরীর বর্তমানে তাহার উপযোগিতা, কালের প্রবাহ, কুড়ান, কুমার উদয়াদিত্য, কুমার লাইব্রেরীর কুমারগণের প্রতি, খেয়ালের চৌহদ্দি, গাইকোয়াড় মহারাজের অভ্যর্থনা, গীতলিপি, গীর্বাণী, গোড়ায় গাফিলি, চিত্রাবলী—মায়াবতী কামনাবতীর পীঠ, চিরাগের মেলার পথে, চেতনা, ছায়ানট, জন্মস্মর, জাতীয় জীবন ও সাহিত্য পরিষদ, জাপানে ফুল-বিন্যাস, তদুত্তর, তারকেশ্বরে পূজা দেওয়া, তারুণ্যের অভিষেক, দিল্লির দরবার, দুর্গা ও চন্ডী, দুর্ভিক্ষ, নন-কো অপারেশনের আদিকর্তা কে, নববর্ষের স্বপ্ন, নবীন দূরস্থ সম্পাদকের নিবেদন, নাচঘর, নানাকথা, নারীর প্রতিদান, নূতন ধরনের উপন্যাস, নৈনিতালের পর, পলায়নপর ও পলায়নের পর, পলাশবন, পারস্য পুলক, পাষাণের আবেদন, পিতামাতার প্রতি কি ব্যবহার কর্তব্য, পিয়ের লোতি, পুষ্পাঞ্জলি বড়মামা, প্রত্যাগমন, প্রত্যাহার, প্রবাসীর দু'চার কথা, প্রভুর দান, প্রাণবাহিনী, প্রেমিকসভা, বকুলের গন্ধ, বঙ্কিমবাবু, বরফগলা, বর্ষামঙ্গল ও শেষবর্ষণ, বর্ষার গান (স্বর), বসন্তপঞ্চমী, বাইবেলের ইনজেকশান, বাঙ্গালা অ্যাকাডেমি, বাঙ্গালা রঙ্গভূমি, বাঙ্গালা সাহিত্যের মাসিক বিবরণী, বাঙ্গালার ইতিহাসের উপকরণ, বাঙ্গালার হাসির গান ও তাহার কবি, বাঙ্গালি পাড়ায় বাঙ্গালি ও বঙ্গভাষা, বাঙ্গালি ও মারহাট্টা, বাঙ্গালির পরীক্ষা চরিত্র গঠন, বাঙ্গালির পিতৃধন, বাবলা গাছের কথা, বারমাসা, বাঁশি, বিজয়া দশমী, বিভূতি, বিলাতি ঘুষি বনাম দেশি কিল, বিশ্ববিজয়ী, বীরবলের আত্মপরিচয়, বেদগান (স্বর), বৈজ্ঞানিক কৃষিকার্য, বোম্বাই সিগনালের ধর্মঘট, ব্যাপ্তি, ব্রতমন্ত্র, ব্রাউনিংয়ের একটি কবিতা, ভাদুড়ী মহাশয়ের খেতাব ত্যাগ, ভারত স্ত্রী 'মহামঙ্গল, ভারতীয় মহাজাতি সংঘ, ভারতের হিন্দু ও মুসলমান, ভালবাসা না চক্ষুলজ্জা, ভাষাতত্ত্ব, ভাষার ডোর, ভূত ও শুদ্ধি, মন-রথী, মহর্ষি, মহারাণীর অন্ত্যেষ্টি সমারোহ, মহীসূরী গান, মাঙ্গলিক, মানুষ-গড়া রাজনীতি, মারহাট্টা পান সুপারী, মালতী মাধব, মালবিকা অগ্নিমিত্র, মুদ্রারাক্ষস, মৃত্যুচর্চা, যুদ্ধগীতি, যোগাযোগ, রতিবিলাপ, রবীন্দ্র-বারমাস্যা, রাখীবন্ধনে, রাজায় প্রজায়, রুবায়াৎ, লাইব্রেরী, লানকরানের উজির, লালন ফকির ও গগন, লীলাধারী, শক্তিচর্চা, শিবগীতি, শুনঃশেফের বিলাপ, শ্রমিক ছাপাখানার শ্রমিক, শ্রাবণ, সংস্কৃত গান, সত্যাগ্রহ সেনাপত্য, সম্পাদকের চিত্রচয়ন, সাত পুরুষের কমে হিন্দু বিবাহ, সাধের তরণী আমার, সাহারা রাগ, সাহিত্যিকের প্রতি, সুরবাণী, সুর সরিৎ, সুরেশের উপহার স্বদেশি সভার সভাপতিত্ব, স্বয়স্বরগীতি, স্বরলিপি (স্বর), স্বাধীন স্বামী বিবেকানন্দ, ত্রিপুরার ঠাকুরগণ, হালী বিলাতি নাট্য, হিংসিতের অহিংসা, হিন্দু ও নিগর, হিন্দুস্থান, হিন্দোলা, হিমালয়, হিরণ্ময়ী দেবী, হৃদয় বীণ, A Problem of Indian girls school

সুজাতা দেবী : গগনেন্দ্রনাথ

সুদক্ষিণা দেবী : রান্না লক্ষ্ণৌপ্রণালী

সুনৃতা দেবী : ব্রহ্মে শূলীনাথ

সুপর্ণা চৌধুরী : দিনগুলি জোর

সুরশ্রী দাস : ঠাকুরবাড়ির রান্না

সুরূপা দেবী : অবনীন্দ্রনাথ, ডাকঘরের অভিনয়, সোমেন্দ্রনাথ।

সুষমা দেবী : আমেরিকায় বেদান্ত ধর্মের প্রভাব ও সমাদর, আমেরিকায় হিন্দুধর্মের প্রভাব, আধুনিক ছাত্রজীবন, প্রাকৃতিক দৃশ্য ও বন্য অধিবাসী, রাউলপিন্ডির পথে, রামপুরের পথে, মাদাম দ্য স্টেল, শ্রীনগর, শ্রীনগরের পথে, শ্রীনগরের প্রাকৃতিক দৃশ্য ও বন্য অধিবাসী, সুইডিস গায়িকা লিন্ডের জীবনী,

সৌদামিনী দেবী : পিতৃস্মৃতি (অনুলিখন রমা দেবী)

স্মিতা সিংহ : একটি অবহেলিত মানুষ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জোড়াসাঁকোর লাল বাড়ি বা বিচিত্রা বাড়ি, তপতীর প্রথম অভিনয় অজীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, নৃত্যের আঙিনায় ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা

স্মৃতি ঠাকুর : একটি ফুটকির জন্য, প্রতিভা

স্বর্ণকুমারী দেবী : অন্যান্য গ্রহগণ জীবের নিবাস ভূমি কি না, অবসর গ্রহণ, আমাদের কর্তব্য, আমাদের সমাজ, আরও একটি প্রস্তাব, ইংরাজদিগের ক্রীড়া কৌতুক, ইন্দ্রিয়ের সাহায্য বিনা মনের কথা জানা, উন্মেষণা, উপকথা, উর্বশী ও তুকারাম, একটি প্রস্তাব, কর্তব্য কোন পথে, কবি গিরীন্দ্রমোহিনী, কানহৌজি আংগ্রে, খসরুবাগ, গাজিপুর পত্র, গান্ধী পত্নীর সম্বর্ধনা, গিলটির বাজার, টর্কিটো ট্যাসো, তারকাগুচ্ছ, তারকাজ্যোতি, তারকাবর্ণ ও তারকার নির্মাণ উপাদান, তারকা-রাশি, দার্জিলিং পত্র, নীলগিরি, নীলগিরির টাডো জাতি, নীহারিকা, পরিবর্তনশীল তারকা, পান্ডারপুর, পুরী, পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব, পুষ্পাঞ্জলি বড়দাদা, পূজার তত্ত্ব, প্রয়াগ দর্শন, প্রয়াগযাত্রা, প্রয়াগে, প্রয়াগের কয়েকটি মন্দির, প্রয়াগের কয়েকটি দৃশ্য, ফুলের মালা, বাঙ্গালির রসবোধ, বিজ্ঞানশিক্ষা, বিদায়, গ্রহণ, বিধবা বিবাহ ও হিন্দুপত্রিকা, বিবাহ, বৈজ্ঞানিক সংবাদ, ভারতী-আরতি, মঙ্গলে জীব থাকিতে পারে কি না, মনের কুয়াশা, মহারাজ জগদীন্দ্রনাথ, মহারাজা সূর্যকান্ত, মহিলা মজলিশ, মেসমেরিজম বা শক্তিচালনা, যমক ও বহুসঙ্গিক তারকা, রমাবাঈ, রাজ্যের কথা, রাজ্যের কথা ও মন্তব্য, রানা বংশে ইরানীত্ব আরোপ, রানী জ্যোতির্ময়ী, রানী ভবানী বিদ্যালয়ে পুরস্কার বিতরণ, শরৎকুমার, শিল্পশিক্ষা, সখিসমিতি, সচিত্র হিন্দু পেট্রিয়ট, সমুদ্রে, সাত বৎসরে সখিসমিতি, সুজানদ্বীপ, সেকেলে কথা, স্ত্রীশিক্ষা ও বেথুন স্কুল, স্বদেশি সার্কাস

হিরণ্ময়ী দেবী : অন্তঃপুরবদ্ধা, অপেক্ষা, অর্ঘ্য, অশিক্ষিতা, আগমনী, আথেন্সের ব্যবস্থাবলী, আপেল-আঘ্রাণে, উদ্ভিদের জীবনরক্ষার নবাবিষ্কৃত উপায়, ঋণ পরিশোধ, একই গান, এ নহে বিদায়, একা, কত ভালবাসি, কবিতা, কাজ নেই, কাফ্রিগনৎকার, কিরণের মৃত্যু, কে, কেন ডাকি, কেন হাহাকার, কৈফিয়ত, খুলি নাই বা খুলি, গতবর্ষ ও নববর্ষ, গ্রীসের জাতীয় ক্রীড়া ও তাহার ফল, ঘুঘু, চন্দ্রালোক, ছবি, জানকীনাথ ঘোষাল, জেনারেল গর্ডন, ঝুমঝুমি, ডীন জোনাথান সুইফট, দৈব ঘটনা, ধর্মবিজ্ঞান, নকশা, নববর্ষের আকিঞ্চন, নবযুগ, নিউহ্যাম কলেজ, নীলাম, পাস্টের আবিষ্কৃত চিকিৎসা, পিথা গোরস, প্রেমফোটা, বউ কথা কও, বর্ষ, বর্ষবরণ, বর্ষের বিদায়, বসন্তের পাখি, বান্দেলের গীর্জা, বিলাতের পত্র, বিশ্ব, বিশ্বাস, ভাইফোঁটা, মনে মনে বার্তাবহন বা মেন্টাল টেলিগ্রাফি, মনের মানুষ, মরণ, মহিলা শিল্প সমিতি, মাতৃপূজা, মানী, মালঞ্চ কবি, মিনতি, রমণীর স্বদেশব্রত, রুসিয় ভাষা ও সাহিত্য, রুসিয়া, রুসিয়ার কারাগার, রুসিয়ার বাণিজ্য রুসিয়ার শাসনপ্রণালী, শারদগীতি, শ্রীপঞ্চমী, সংসার, সমারভিল হল, সরসী ও তটিনী, সসীম ও অসীম, সুরূপা ও কুরূপার খেদ, সূতিকাগৃহে বানরত্ব, হরপার্বতীর তপস্যা, হায়, হেঁয়ালি নাট্য

হেমলতা ঠাকুর : আশ্চর্য মানুষ রবীন্দ্রনাথ, কথা ও সাহিত্য, কালীমোহন ঘোষ, ঠাকুরঘর, ঘরোয়া ব্যাপারে রামমোহন, নতুনতর মানুষ দ্বিজেন্দ্রনাথ, পুরাতন স্মৃতি, পুষ্পাঞ্জলি, বাবামহাশয়, প্রাণের কথা, বৈশাখের রবীন্দ্রনাথ, ব্যবহারক্ষেত্র, মঙ্গল, মনের ছবি, মোক্ষের আভাস, যোগস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথের বিবাহ বাসর, রবীন্দ্রনাথের অন্তর্মুখীন সাধনার ধারা, শ্বশুর মহাশয়, সংসারী রবীন্দ্রনাথ।

পত্রপত্রিকা সম্পাদনা

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী : বালক

প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী : পুণ্য

প্রতিভা দেবী : আনন্দসংগীত পত্রিকা (যুগ্ম সম্পা. ইন্দিরা দেবী চৌধুরানি)

মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায় : ঘরে বাইরে, জয়া

সরলা দেবী চৌধুরানি : ভারতী, হিন্দুস্থান

স্বর্ণকুমারী দেবী : ভারতী
হিরণ্ময়ী দেবী : ভারতী
হেমলতা দেবী : বঙ্গলক্ষ্মী

চিত্র সংগ্রহে যাঁদের সাহায্য পেয়েছি

আনন্দবাজার পত্রিকা, ইন্দিরা সংগীত শিক্ষায়তন, বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রভারতী সংগ্রহশালা।

অধিকাংশ চিত্র সংগ্রহ করা হয়েছে ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে। পূর্বে এবং এবারে যাঁদের সংগ্রহ থেকে ফোটোগ্রাফ ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে তাঁরা হলেন :

অতসী বড়ুয়া, অমিতা ঠাকুর, অমৃতময় মুখোপাধ্যায়, অরুন্ধতী ঠাকুর, অস্মিতা বাগচী, ইরা ঠাকুর, ঋতা দেবী, ঋতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কিশোর চট্টোপাধ্যায়, গোপা মুখোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায়, চম্পা হালদার, চিত্রলেখা রায়, চিত্রা ঠাকুর, জয়ন্তমোহন চট্টোপাধ্যায়, দেবপ্রসাদ ঠাকুর, দ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায়, পদ্মা মজুমদার, পারুল ঠাকুর, পূর্ণিমা চট্টোপাধ্যায়, প্রসূন মুখোপাধ্যায়, প্রসেন মুখোপাধ্যায়, বাণী চট্টোপাধ্যায়, বাণী ঠাকুর, ভাস্কর মুখোপাধ্যায়, মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়, মেনকা ঠাকুর, মিতেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়, রত্না চট্টোপাধ্যায়, রেখা চট্টোপাধ্যায়, শুভশ্রী ঠাকুর, শুভা রায়, শ্যামশ্রী ঠাকুর, শ্রীমতী ঠাকুর, শ্রীলেখা চক্রবর্তী, সন্দীপ ঠাকুর, সমপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ চৌধুরী, সুমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরশ্রী দাস, সুরূপা দেবী, সুহিতা ঠাকুর, সৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌম্যা ঠাকুর, স্মিতা চৌধুরী, স্মিতা সিংহ।

ব্যক্তিঋণ

অক্ষয়কুমার কয়াল, অজিত পোদ্দার, অতসী বড়ুয়া, অমিতা ঠাকুর, অমিয়া ঠাকুর, অমৃতময় মুখোপাধ্যায় (ডঃ), অরুণ বসু (ডঃ), অরুণ বসু, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (ডঃ), ইরা সেনগুপ্ত, উমা দেবী, এণা রায়, কমলা মুখোপাধ্যায়, কল্যাণী মল্লিক (ডঃ), কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষিতীশ রায়, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, গৌর সাহা, গৌরী চৌধুরী, গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায়, চম্পা হালদার, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্রা ঠাকুর, জগমোহন মুখোপাধ্যায়, জয়ন্তমোহন চট্টোপাধ্যায়, জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়, জীমূতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, তপন দাস, দীপ্তি চৌধুরী, দ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, নমিতা দাশগুপ্ত, নৃপেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পারুল ঠাকুর, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, পার্থ বসু, পূর্ণিমা দেবী, পূর্ণিমা ঠাকুর, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রসূন মুখোপাধ্যায়, প্রসেন মুখোপাধ্যায়, প্রণতি ঘোষাল, প্রকৃতি ঘোষাল, বন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায়, বাণী চট্টোপাধ্যায়, বিপুল গুহ, বুদ্ধদেব গুহ, বেলা চৌধুরী, ভবতোষ দত্ত, ভাস্কর মুখোপাধ্যায়, মঞ্জুশ্রী দেবী, মুকুলা রায়, মেনকা ঠাকুর, মণিমালা দেবী, মীরা চৌধুরী, মিহিরেন্দ্র ঠাকুর, রত্না বড়ুয়া, শুভ্রা রায়, শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীপান্থ, শ্রীমতী ঠাকুর, সঞ্জয় দে, সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, সনৎ বাগচী, সবিতা দেবী, সুষীমা গুহঠাকুরতা, সমর ভৌমিক, সমরেশ্বর বাগচী, সুজাতা ভট্টাচার্য, সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়, সুধাময়ী মুখোপাধ্যায়, সুমোহন চট্টোপাধ্যায়, সুনন্দ সেন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল দাস, সুপ্রিয় ঠাকুর, সুভাষ চৌধুরী, সুরমা ঠাকুর, সুরূপা দেবী।

এই সংস্করণের জন্যে যাঁদের সাহায্য নিয়েছি

অতসী বড়ুয়া, অমিত মজুমদার, অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমৃতময় মুখোপাধ্যায় (ডাঃ), অমৃতা ভট্টাচার্য (ডঃ), অরুণ বসু, অরুণকুমার রায়, অরুন্ধতী ঠাকুর, অশোক উপাধ্যায়, অশোক দাস, আর্য মুখোপাধ্যায়, আলোমা চৌধুরী, ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী, ইরা ঘোষ, ইরা ঠাকুর, ঋতা দেবী, ঋতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কমলেন্দু সরকার, কমলা গঙ্গোপাধ্যায়, কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিশোর

চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়, গীতা চট্টোপাধ্যায়, গোপা মুখোপাধ্যায়, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, গৌরী ঠাকুর, চম্পা হালদার, চিত্রলেখা রায়, জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়, জয়ন্তমোহন চট্টোপাধ্যায়, জয়শ্রী ঠাকুর, দেবপ্রসাদ ঠাকুর, দেবব্রত সাঁই, দেবল হালদার, দ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায়, নিরবধিপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, নীলাক্ষী ঠাকুর, নীলাংশু হালদার, পদ্মা মজুমদার, পারুল ঠাকুর, পার্থ বসু, পার্শ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রণতি ঘোষাল, প্রণতি মুখোপাধ্যায়, প্রসেন মুখোপাধ্যায়, প্রিয়রঞ্জন রক্ষিত, বকুল দাশগুপ্ত, বাণী ঠাকুর, বিমল কুমার পাল, বিশ্বরঞ্জন সরকার, মঞ্জুরী চট্টোপাধ্যায়, মধুমিতা হালদার, মায়া গঙ্গোপাধ্যায়, মিলন দত্ত, মিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মিতেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়, মীরা ঘোষ, মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জন ঠাকুর, রমা কর, রত্না চট্টোপাধ্যায়, রাজশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়, রাতুল বন্দ্যোপাধ্যায়, রীণা বন্দ্যোপাধ্যায়, রেবা চট্টোপাধ্যায়, শঙ্করলাল ভট্টাচার্য, শক্তিপদ রায়, শিবদাস চট্টোপাধ্যায়, শীলা চট্টোপাধ্যায়, শুভ ভট্টাচার্য, শুভশ্রী ঠাকুর, শুভা ঠাকুর, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামশ্রী ঠাকুর, শ্যামশ্রী সিংহরায়, শ্রীলেখা চক্রবর্তী, শ্রীলেখা ঠাকুর, সঞ্জয় দে, সতীরানী ঠাকুর, সন্দীপ ঠাকুর, সম্মোহন চট্টোপাধ্যায়, সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়, সুদেষ্ণা বসু, সুনন্দ মৈত্র, সুপূর্ণা রায়, সুপর্ণা চৌধুরী, সুভাষ চৌধুরী, সুমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরশ্রী দাস, সুহিতা ঠাকুর, সৌম্যা ঠাকুর, সৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়, স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপ্না ভট্টাচার্য, স্মিতা চৌধুরী, স্মিতা সিংহ, হেনা চৌধুরী।

নির্দেশিকা

অকল্পিতা ১২৩
অকাদেমি অফ ফাইন আর্টস ২৩৮
অক্ষয় চৌধুরী ৩৩, ৪৩, ৪৫, ৪৭, ৫১
অক্ষয় বড়াল ৭৮
অক্ষয়বাবু ১০৬
অঘোরকামিনী রায় ১১৩
অদ্ভুত কন্যা ২৩৭
অজয় কর ২১৮
অজিত চক্রবর্তী ১৩৪, ১৩৫
অজিতকুমার ঘোষ ৫১
অজিতকুমার ঘোষাল ২৩৫
অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় ২১৯
অজীন্দ্রনাথ ১১৪, ১৪৬, ২১৭, ২৪৩
অঞ্জলি ১৪৭
অণিমা ১৬০, ১৮৯, ১৯৯
অতসী *দেখুন* মীরা
অতসী বড়ুয়া ২৩৮-২৩৯, ২৬৫
'অতিথি' ২১৮
অতীন্দ্রনন্দন ঠাকুর ১৯৩
অতুল গুপ্ত ১৫৯
অতুলপ্রসাদের গান ২৬৪
অদিতি ১৮০-১৮২
অদ্বৈত আশ্রম (মায়াবতী) ১০৪
অদ্রিজানাথ মুখোপাধ্যায় ২৬৮
'অনাদৃতা' ১১৪
অনিরুদ্ধ ২২৮, ২২৯
'অনিরুদ্ধ মিলন' ২৫
অনিল ভট্টাচার্য ২৬২
অনুজা ২০৭, ২৫৮
অনুভা ২২৩, ২৩৯
অনুরাধা ২২৯
অনুরূপা দেবী ১১৩-১১৫, ১৬৫
'অনুষ্টুপ' ২২০
অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সভা ২৩৪
অন্নদা ৩৫
অন্নদাচরণ খাস্তগির ১৯
অন্নদামঙ্গল ৯
অন্নদাসুন্দরী ৪১
অপরাজিতা দেবী ১৯০
অপর্ণা ১৫৯, ১৬০, ২০২, ২০৩
অপর্ণা (মজুমদার) ২৪৮, ২৪৯
অপর্ণা সেন ২৪০
'অপুর সংসার' ২৬৫
অপূর্ব ৭৪
অবন নার্সারি নুক ২৪৮
অবনীন্দ্রনাথ (অবন) ৯, ২২, ২৩, ২৭, ৪৫, ৫২, ৫৫, ৫৬, ৬১, ৭৯, ৮০, ৯৯, ১০৩, ১০৪, ১০৭-১০৯, ১৩২, ১৩৬, ১৪১-১৪৩, ১৪৬, ১৬৩, ১৭৩, ১৭৭, ১৮৯-১৯২, ১৯৮, ২০০, ২০১, ২০৪, ২০৬, ২১৮, ২৪০, ২৪৪-২৪৬, ২৫৯, ২৬১, ২৭১
'অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর' ২৪৭
অবলা বসু ৫৮, ৫৯, ৭৫, ৮২, ৮৩, ৮৯, ৯৭, ১২৫
'অবাক জলপান' ২৬২
অবিনাশ ১৯১
অভয়চরণ ঘোষ ২৪১
অভয়চরণ মুখোপাধ্যায় ৩
অভিজ্ঞা ৬২, ৭২, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮৭, ১৬৯
'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্‌' ৩৮
'অভিমানিনী নির্ঝরিণী' ৪৭
অভেদানন্দ (স্বামী) ৯২
অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৯৩
অমল হোম ৪৬
অমলা দত্ত ১৮৬
অমলা রায়চৌধুরী (কুইনি) ১৫০, ১৮৫
অমিত মজুমদার ২৪৯, ২৫০
অমিতা ১৪৬-১৪৮, ১৫০, ১৮৫, ২১৭, ২২২, ২৪১, ২৪২
অমিতেন্দ্রনাথ ২৪৬
অমিয় চক্রবর্তী ১৫২
অমিয়া (প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের স্ত্রী) ২৩৪, ২৩৫
অমিয়া ১৬৫, ১৬৮-১৭১, ২২১-২২৩
অমৃতবাজার পত্রিকা ২৫২

অমৃতময় মুখোপাধ্যায় (ডাঃ) ৩৭
অমৃতা ২৬৬
অযোধ্যানাথ পাকড়াশী ১৬
অরণি ১৮২
অরবিন্দ ১০২, ১০৩
অরবিন্দ বড়ুয়া ২৩৮
অরবিন্দনাথ ২৫৮
অরবিন্দমোহন ১১৮
অরু দত্ত ১৯
অরুণা ১৭৬, ১৭৭, ২২৯
অরুণা গঙ্গোপাধ্যায় (আসফ আলি) ১৮৬
অরুণেন্দ্র ৪৪, ১২৭, ১৪৫, ১৪৬, ২৪০
অরুন্ধতী ২৪৬, ২৪৭
'অরূপরতন' ১৮৫
অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ৫৬
অল ইন্ডিয়া একজিবিশন ১৯৭
অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স ২৪৯
অলকা ১৩১
অলকাসুন্দরী ৫-৮
'অলীকবাবু' ৪৪-৪৫
অলোকেন্দ্র ১৪৩, ২০৪, ২৪৭
অশেষদা ২২১
অশোককুমার ২৩৬, ২৩৭
অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪৭
অশোকা ১৬৫, ১৬৬, ২২৮, ২২৯
অশ্বিনীকুমার চৌধুরী ১৬৫
অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮১
অসহযোগ আন্দোলন ৯১, ৯৪, ১০৪
অসিত ঘোষাল ২৫৮, ২৫৯
অসিতকুমার হালদার ৬০, ১০৭, ১৪৯, ১৫৪, ২২৭, ২৩৮, ২৬৫
অসীমানন্দ সরস্বতী ১৩০
অস্মিতা ২০৯
অহল্যা ২৩২
অহীন্দ্র চৌধুরী ২৫৪
অহীন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায় ১৪১
অ্যাঙ্গলিকান চার্চ ১৭৯
অ্যাডভানটেজ...এরিয়ানস' ৯১
'অ্যান আনফিনিসড সঙ' ৩১-৩২, ৪৮
অ্যাপলায়েড মিউজিক' ১৭২
অ্যালবার্ট হল ৭২
অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ২১৯
অ্যালাইসি (সিস্টার) ৭৫
অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস ২৪১
'আইডিয়ালস...উয়োম্যানহুড' ৮৮
'আইন আছে অথচ' ১৭৬
আঁদ্রে জীদ ৭৪
'আকাশি' ১৭৫
আগা খান প্রাসাদ ২১৪
'আঙ্কল টমস কেবিন' ৮৮
আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু কলেজ ২২৮
আজাদ হিন্দ ফৌজ ২১৪
'আত্মকথা' ৭৩
'আদর্শ রন্ধন শিক্ষা' ৬৬
'আদর্শ সূচী চিত্র' ১৯০
'আদর্শ সূচী শিল্প' ১৯০
আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা' ৬৪, ১৬৬, ১৭৬
'আনন্দ সভা' ৬৪
'আনন্দমঠ' ২৫৪
আনন্দময়ী ১৩০
আনন্দমেলা ১২৭
আনা পাভলোভা ১৬৫
'আপনকথা' ৫৬, ১০৭
আবদুল ওদুদ (কাজী) ৪৭
'আবাহন' ১৭৪
'আবোল তাবোল' ২২৬
'আমাদের কথা' ৪০, ১৪৯
'আমাদের গান' ৭৪
'আমার খাতা' ১২৮
'আমার জীবনস্মৃতি' ৪৯, ২৪০
'আমার জীবনস্মৃতি' (লক্ষ্মীনাথ) ১৭৪
'আমার বিবাহ' ৩৬
'আমিষ ও নিরামিষ আহার' ৬৬, ৬৭, ৭২
'আমেরিকায়...সমাদর' ৯২
আর্কিওলজিক্যাল ইনস্টিটিউট (বেজিং) ২২০
আর্থার হবহাউস ৫৮
আর্যকুমার ১৬৩
আর্যদর্শন ৬০
আর্যসমাজ ১০৪
আরতি ১৭৪-১৭৫
আরতি ২৫১
আরব্য রজনী ৯
'আলমগীর' ২৫৪
'আলাপিনী সমিতি' (সভা) ১২৭, ১৪০, ১৪৫, ১৬০
আলি আকবর ২৪৭
'আলিবাবা' ১০৮, ১৩৯, ১৮৯
'আলোক' ৬৫

'আলোর পাখি' ১২৩
আশামুকুল ২০০
আশুতোষ চৌধুরী ৬২, ৬৪, ৭৫, ১৪৫, ১৫৫, ১৬৬, ১৭৭, ১৮২, ২৩৫
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (স্যার) ১১৯
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় গোল্ড মেডেল ১৬৮
'আশ্চর্য পলায়ন' ২২
'আশ্চর্য মানুষ রবীন্দ্রনাথ' ১২৬
আশ্রম বিদ্যালয় ৫৩
আসান করুণাকরণ পানিক্কর ২৩১
'আসাম বন্ধু' ২৪১
'আহিতাগ্নিকা' ১০০
'ইউরিশিমা' ১২৯
ইউরোপে মহাসমরের পরে ৮৫
'ইংরাজনিন্দা ও স্বদেশানুরাগ' ২২
ইডেন ফিমেল স্কুল ১৩৪
'ইন দি ল্যান্ড অফ জুয়েল' ২৪৬
'ইনডিয়ান নেচার মীথস্' ৮৪
'ইনডিয়ান ন্যাশানাল কংগ্রেস' ৩৫
'ইনডিয়ান ফেবল্স অ্যান্ড ফোকলোর' ৮৪
'ইনডিয়ান ফেয়ারি টেলস' ৮৫
'ইনডিয়ান ফোকলোর' ৮৫
'ইনডিয়ান...হারমনি' ২৪৮
ইন্টারন্যাশনাল নিটিং কম্পিটিশন ২৪৬
ইন্দিরা (বিবি) ১৬, ২০, ২২, ২৬, ৩১-৩৩, ৪৪-৪৯, ৫৭, ৬০-৬৪, ৭২-৮০, ৮২, ৮৩, ৮৫, ৯৪, ৯৭, ১১১, ১১৭, ১২৩, ১২৬-১২৮, ১৪০, ১৪৯, ১৬০, ১৬৬, ১৬৮, ১৭৩, ১৮০, ১৮১, ১৯৯, ২০২, ২০৩, ২২১, ২২৩, ২৩১, ২৬৭
ইন্দিরা (দেবী) ১২৮
ইন্দিরা গান্ধী ২১৯
ইন্দিরা সংগীত শিক্ষায়তন ১৭৪, ২২২, ২২৩
ইন্দুপ্রভা ১১৫
ইন্দুবালা দেবী ১৮৯
ইন্দুমতী ২০, ৫৭, ২৩৫
ইন্দ্রাণী ১৮১, ২০৪, ২৩৩, ২৩৪
ইন্দ্রাণী রহমান ২৩১
ইরা ২৬০, ২৬১, ২৬৯
ইরা (ঠাকুর) ১৯৮, ২৩৩, ২৪১-২৪৩
ইরাবতী ৩৭, ৫৭, ২০৪, ২৩৩
ইলাসট্রেড উইকলি ২১৫, ২৫২
ঈশিতা ২২২
ঈশ্বর গুপ্ত ১২
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ২, ১১, ২৯, ৩০, ৩৬, ১৩২, ১৯৭, ২৪১
'উইমেনস আর্ট ক্লাব' ১৮১
'উইমেন...ইন্ডিয়া' ৮৯
উইলসন (মিসেস) ১১
উদয়শঙ্কর ১৩৯, ২১৭, ২২৯, ২৩১
উদয়াদিত্য উৎসব ১০১
উপনিষদ ৫২, ৮৪
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ৮৫
উপেন্দ্রনাথ ২২৮
উমা ১৪৩, ১৭৩, ১৮৯-১৯৩, ১৯৬, ২০০, ২০১, ২২৩
উমা দেবী ১৫০
উমাশশী ২০৩, ২০৪
উর্বশী ২৫
উর্মিলা দেবী ১০৩
উষারঞ্জন ভট্টাচার্য (ড.) ২৪০
উষাবতী ৬১, ১০৮, ১৫৫
ঋতা (দেবী) ১৭৭, ২২৯-২৩৩
ঋতা গঙ্গোপাধ্যায় ২২৭
ঋতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২১৬, ২১৭, ২৬২, ২৬৩
ঋতেন্দ্র ৮১, ১৩১, ১৭৪, ১৭৬-১৭৮, ২২৭-২২৯
'ঋতুসংহারম' ২৩৩
'এ গ্রো অফ ডাইস' ২৩৩
'এ পিলগ্রিমেজ টু দি নাগাজ' ২৪৬
এইকো ২৬৩
এক পশলা ২০৯
'একটি অবহেলিত...ঠাকুর' ২১৮
'একটি দিন' ২০৮
এডোয়ার্ড ডিমক ১৭২-১৭৩
এণা ১৪৯, ১৫০, ১৬৯, ১৭০, ২০২, ২১৩, ২১৪, ২১৮
এন ঘোষ ৯৬
এন্ডুজ ১২২
এম এস নাম্বুদিরিপাদ ১৬২
'এমন কর্ম আর করব না' ৪৪, ৪৫
এমারেল্ড থিয়েটারে ২৩
এরিখ পমার ২৩৬
এলজি (মিস) ১১১
এলমহার্স্ট ১৪১
এসিয়াটিক সোসাইটি ১৭১, ১৭২
ঐন্দ্রিলা ২৪৩, ২৪৮, ২৬৫, ২৬৬
ওয়াই ডব্লিউ সি এস ২৬৭
ওবারয়ামারগাওয়ের প্যাশন প্লে ১৫৬, ১৫৭

'ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন... এডুকেশন' ৯১
ওয়েমন তাকেদা ৮৭
'ওয়েস্ট মিনিস্টার গেজেট' ৩২
'ওয়েস্টার্ন...রাগরাগিনীজ' ১৭২
ওরিয়েন্টাল ড্রেস ১৭
ঔরঙ্গজেব ৩৬
কংগ্রেস অধিবেশন ৩৫
ককশীটার (শ্রীমতী) ১০৯
ককুভ খাঁ ১৭৭
'কড়ি ও কোমল' ৬২
কণিকা ১৪৫, ১৪৬, ২৪১
কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬৮
'কথা ও কাহিনী' ১৪০
'কথাসরিৎসাগর' ৮৪
কনকেন্দ্র ২০২, ২২৩, ২৩৯
'কনটেমপোরারি রিভিউ' ২২
'কনসার্ন উইথ ফিয়ার...গ্রুপস' ২৪৬
'কনবেদল' ৩৪
কপিলমুনির মঠ ১৮৩
'কবিমানসী' ৮০
কবীন্দ্র ২৩৯
কমনওয়েলথ স্কলারশিপ ২২৯
'কমপ্যারেটিভ...মিউজিক' ১৭২
'কমলকুমারীকাশ্রম' ৭৪
কমলমণি ৪
কমলা ১২৭, ১৪০, ১৪৪, ১৪৫
কমলা (ঠাকুর) ১৫৫, ২৫৫, ২৫৬
কমলা ১৮৯, ২০০
করবী ২৩৯
করুণা ১৫৫
করুণা (অবনীন্দ্রনাথের মেয়ে) ১৮৯, ২০০, ২০৬, ২৪৪
করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭০
'কর্ম' ২৩৬
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৩৫, ৫৮, ৬২, ৯৭, ১১২, ১১৯, ১২০, ১২৪, ১৭৭, ১৮২
কলাভার৲ী ১১১
'কলির বৌ গাড়জ্বালানী' ১২
'কলির মেয়ে ও নবাবাবু' ১২
কল্পনা দত্ত ৮৯
কল্পিতা ২৬৫
কল্যাণ রায় ২৬৮
কল্যাণী এক্সরে ফাগু ২১০
কল্যাণী চট্টোপাধ্যায় ২০৭-২১০, ২৫০
কল্যাণী মল্লিক ৯৫, ১৮২-১৮৪
কল্যাণী দত্ত ১৩০
'কাইজার-ই-হিন্দ' ৯৩
'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ১৭০
কাত্যায়নী দেবী ৫
কাদম্বরী ১, ২৬-২৮, ৩৩, ৩৭, ৪১-৫১, ৬৫, ৭৫
কাদম্বিনী ৫৬, ১০৬, ১৫৩, ২০০, ২০৬, ২০৭, ২২৬, ২৪৩, ২৫৮
কাদম্বিনী বসু (গঙ্গোপাধ্যায়) ৩৩, ৫১, ৫৮, ৫৯, ৬৩, ৭৩, ৭৫, ৮২, ৮৯, ৯৭
কাননবালা দেবী ১৯০
'কানাই মাস্টার' ২৬২
কানাইলাল গঙ্গোপাধ্যায় ২২৬
'কাবুলিওয়ালা' ১১১, ২৪৮, ২৬৫, ২৬৬
'কাব্যপরিচয়' ১২৩
'কামিনীকলঙ্ক' ২৪
'কামিনীকুমার ৯
কামিনী দত্ত ২৫
কামিনী রায় (সেন) ৫৮, ১২৪
কামিনীসুন্দর দেবী ২৫
কারমাইকেল ২০০
'কারুসংঘ' ২৪৬
কার্তিকচন্দ্র নান ১১৮
কার্ল সারা ২৫০
'কালমৃগয়া' ৬০, ৬১, ৭৯
'কালচারাল...মিউজিক' ১৭২
কালিদাস ২৩৩
কালিদাস ২৪৮
কালিদাস পাল ৩৭
কালিপদ ঘোষাল ২১০, ২১১, ২৫৩
কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ২৫, ১৯৫, ১৯৭, ২০৩
কালীমতী ২৯
'কালী সিংহির মহাভারত' ১২২
'কাল্পনিক' ২৬৫
কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৫
কাশীশ্বরী ১০
'কাহাকে' ৩০, ৩১, ৮৪
কাহিনী ২৭, ১০৫-১০৭, ১৩৭
'কি কি কুসংস্কার...পারে' ২৫
'কিংশুক' ২৬৯
'কিন্ডারগার্টেন' ২২
কিরণলেখা রায় ৬৬
কিরণশশী ২১৬
'কিশলয়' ১৬৩

কিশোর ২৫৫
কিশোর শাহ্‌ ২৩৬
'কী ধ্বনি বাজে' ১৭৩
কীটস ৯৮
কুক অ্যান্ড কেলভি ১৯৪
'কুটুম কাটাম' ২২৫, ২২৯
'কুতমবালম' ২৭০
কুন্তলীন ৫২
কুন্দমালা ১১
কুবলা রস ২৪৭
কুমার ভীমসিংহ ৩২
'কুমারসম্ভব' ২৩৩
কুমুদ ২০৪
কুমুদিনী ১২, ৫৬, ১৩৩, ১৫৩, ১৫৫, ১৭৭, ২০৬, ২১৫, ২৫৮, ২৬০, ২৬১, ২৬৬
কুমুদিনী খাস্তগির (দাস) ৫৮, ৮২, ৯৮
কুরের মা ২১৬
কুলপ্রসাদ সেন ১৬৩
কুসুম (কুসমী) ১৯৩, ১৯৪
কুসুমকুমারী ২৩
কুসুমকুমারী দেবী ৩০
কৃতীন্দ্র ১২৭, ১২৮, ২৬৭
'কৃপাকথা' ১৩০
কৃষ্ণ কৃপালনী ১৮৫-১৮৭, ২১৩, ২৪০, ২৪৪
কৃষ্ণকামিনী দাসী ২৪
কৃষ্ণপদ ঘোষ ২৪৯, ২৫০
কৃষ্ণভাবিনী দাস ১০৩, ১২৫, ২০৯, ২১০
কৃষ্ণসুন্দরী ১০
কৃষ্ণা ১৭০, ২১৮-২২১
'কৃষ্ণা' ৮৩
কৃষ্ণাশ্রম ২৪১
কেলুচরণ মহাপাত্র ২৩২
কেশবচন্দ্র সেন (ব্রহ্মানন্দ) ১১, ১৬, ১৮-২০, ২৯, ৩৬, ৮৭, ১৩৯
কেশব সেন (স্বর্ণপদক) ১১২
'কোকিলদূত' ৯
কোরিওগ্রাফী ফেলোশিপ ২৩৩
কৌশিকী ২৬৪
'ক্যাফেট্রি' ২৫০
ক্যালকাটা স্কুল অফ মিউজিক ১৬৫
ক্যালকাটা গার্লস ২৪৭
'ক্রন্দসী' ৬৮, ৬৯, ৭২
ক্রিয়েটিভ আর্টিস্টস প্রোগ্রাম ২৩৩
ক্রিস্তভ জানুসি ২৪৭
ক্রিস্টিনা আলবার্স ৩০
ক্লাইভ (লর্ড) ১৬৩
ক্ষিতিমোহন সেন ৮০, ১২৭, ১৮৫, ২৬৭
ক্ষিতীন্দ্রনাথ ৩৭, ৩৮, ৮১, ১৭১
ক্ষিতীশ রায় ২৪৪
ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১৬১
ক্ষীরদা মিত্র ২৫
'ক্ষীরের পুতুল' ৫২, ১৯০
'ক্ষুধিত পাষাণ' ২১৭
ক্ষেমেন্দ্র ১৭৩
'খনা' ২৩৩
খাজা আহমেদ আব্বাস ২৩৬
খাপছাড়া ১৮৮
'খুদুর রামায়ণ' ১৯৮
গঙ্গানগর মহিলা শিল্পশিক্ষা মন্দির ২৫৯
'গগন কী রাগিণী' ২৩৭
গগনেন্দ্র ২১, ২৭, ৫৫, ৫৬, ৬১, ৯৫, ৯৯, ১০৪, ১০৭-১০৯, ১৩২-১৩৪, ১৪১, ১৪২, ১৫৯, ১৬১, ১৭৭, ১৮৯, ১৯৩-১৯৮, ২০২-২০৪, ২২৩, ২৩৯, ২৬৫
গগনেন্দ্র শতবার্ষিকী কমিটি ১৯৮
'গঙ্গাদেব' ৮৩
গডফ্রে ৩৪
গণেন্দ্রনাথ ২৭, ২৩৯
'গল্পগুচ্ছ' ১১৪, ১৪০
'গল্পসল্প' ৪
'গাঙচিলের ডানা' ১৭৪
'গান্ধর্বী' ২৬৯
গায়ত্রী ১৬৬-১৬৭, ১৯০
গায়ত্রী দেবী ১৯০
গার্গী ১৭১
গিরিধারী লালা ১৩৭
গিরিবালা ১০৩
গিরীন্দ্রনাথ ৮, ৯, ১৪, ৫৬, ৭৭, ১৫৩, ২০৬, ২৩৯
গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ৩২, ৩৩
গিলহার্ডি ১৩৬
'গীতগোবিন্দ' ৯
গীতা ঘটক ২২৭
'গীতাঞ্জলি' ২৪৪
গীতা (লোকমোহনের স্ত্রী) ২০৯, ২৫০, ২৫৩-২৫৫
গীতা চট্টোপাধ্যায় ১১০, ১১১, ১২৬, ১৫৩-১৫৮, ২১৪, ২১৫

গীতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৩৯, ২৪০, ২৪৩, ২৬৫
গুঞ্জন ২২৩
গুণাভিরাম বরুয়া ১৪৫, ২৪০, ২৪১
গুণেন্দ্রনাথ ২৭, ৫৪, ৬১, ১০৪, ১০৫, ১৩২, ২০৬
গুপী ১৯০
'গুরুদেবের ছবি' ১৩৫
গুরুসদয় দত্ত ১২৫
'গুলফম' হরি ২৩
'গেঞ্জি মনোগাতারি' ২৫
গেহেন্দ্র ১৩৪, ২০২, ২০৮, ২৩৯
গোখলে ৯৯
গোখেল (গোখলে) মেমোরিয়াল ৮৩, ১৮৪, ২১০, ২৫০, ২৫৬, ২৬৭
গোপা ২৬৯, ২৭০
গোপাল রায় ১৫০
গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৪, ১৬৭, ১৬৯, ১৭০, ১৭৩
গোমিস (মিস) ১১
'গোরা' ২৪৩
গোলাপমোহিনী দাসী ২৫
'গোলেবকাওলি' ৯
গোলোকমণি দেবী ১০
'গোড়ায় গলদ' ১৪৬
'গৌড়মল্লার' ২৬৬
গৌতম চট্টোপাধ্যায় ২২৪
'গৌর গীতিকা' ২৫
গৌরী ২৬৯
গৌরী বসু ১৩৯, ১৪০, ১৪৬, ১৫০, ১৫১, ১৮৫, ২৪৮
গৌরী (সুরমার কন্যা) ২৩৯
গৌরীদান ২০৭, ২০৮
গ্যেটে ২২৬
'গ্লিম্পসেস অফ বেঙ্গল' ২৪৭
গ্রিন বিউটি ২৫১
'গ্রোথ অ্যান্ড...বেবিজ' ২৫৬
গ্র্যাভেন ইমেন ২৪৭
ঘরোয়া ১০৭, ১২৭
'ঘরেবাইরে' ১৬২
চঞ্চলা ২১৬
'চণ্ডালিকা' ১৩৯, ১৪০, ১৮৫, ১৮৮, ২৩২
চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কার ১০
চতুর্ভুজ দামোদর ১৮৮
চন্দ্র ২০৩
চন্দ্রবাবু ১৩
চন্দ্রমুখী বসু ২৫, ৩৩, ৫১, ৫৮, ৫৯, ৬৩, ৭৩, ৭৫, ৮২, ৮৯, ৯৮
চন্দ্রা ২৬৪
চন্দ্রিমা ২০৬, ২৪৮
চম্পা ২৬৬-২৬৮
'চয়নিকা' ২৫৪
চলার পথে ২২৫
'চাঁদের বুড়ি' ১৯৭
'চাণক্য শ্লোক' ৮
'চার অধ্যায়' ১০০
'চার ইয়ারী কথা' ৭৪
'চারিত্রপূজা' ৫৪
চারু রায় ২৩৬
চারুবালা ৫২, ১২৭, ১৫৩
চারুশীলা দেবী ১২১, ১২৭
চার্চ অফ ইংল্যান্ড ১৭৯
'চিত্তবিলাসিনী' ২৫
চিত্তরঞ্জন দাশ (দেশবন্ধু) ১০৩
'চিত্রণ' ১৫৪
চিত্রলেখা ১৭৪, ২২৭, ২২৮
চিত্রলেখা চৌধুরী ২২১
চিত্রা ১৩৯, ১৫০, ১৫১
'চিত্রাংশু' ২৪৮
'চিত্রাঙ্গদা' ১৩৯, ১৪০, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৭, ২১৭, ২২২, ২২৪, ২২৫, ২৩২,
চিনু চোবেজী ২২১
চিন্তামণি কর ২৪৭
চিন্মোহন সেহানবীশ ২২৫
চিন্ময় আশ্রম ২৪৮
'চিরকুমার সভা' ৯৮, ১৪৬, ১৫১, ১৬০, ২২৪, ২৪৯
চিরপ্রভা ৬০, ১৮০
'চৈতন্যময়...নাম' ১২২
'চৈতালি' ৮০
'চোর' ১১৪
'চোখের বালি' ২৯
চ্যাপম্যান বালিকা বিদ্যালয় ১১৩
৩৬, চৌরঙ্গী লেন ২৪৩
'ছবি' ২৪
ছাতুবাবু ৬০
ছায়াময়ী ১৩৩, ১৩৪
'ছায়ারঙ্গ' ১৭৪
'ছিন্ন পত্রাবলী' ৭২

'ছিন্নমুকুল' ২৭
জওহরলাল নেহরু ২৪৩
'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' ৩৫
জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় ১৯
জগদীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০৭
জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য ৪৭, ৮০
জগদীশচন্দ্র বসু ১১৮
জগন্মোহন গঙ্গোপাধ্যায় ৪১, ৪৫
জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বিটন ১১
জন পার্কস ১৫৩
জন ম্যান্ডার ৮৭
'জন্মদিন' ১৪৭
জয়জয়ন্তী ২৫
জয়নুল আবেদিন ২১৩
জয়রাম ২৭০
জয়শ্রী (সেন) ১৬১, ১৬৩
জয়শ্রী ঠাকুর ২৬৯
জয়শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫৬-২৫৮
'জয়া' ১৬২
'জলখাবার' ৬৬
জলধিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৫৪, ২১২, ২৪৩
জসীমউদ্দীন ৭৫
জাঁ রিবুঁ ২১৯
জানকীনাথ ঘোষাল ৩, ২৬, ৩৫, ৪৩, ৪৭, ৭৬, ৯৪, ১০০
'জাপানযাত্রী' ৭৪
জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ড ১০৪
জাহ্নবী ৪
জীনপ্রকাশ ২৫৮
'জীবনকথা' ৭৫, ৭৬, ১৫৯
'জীবনমুক্তি' ২৫
'জীবনের ঝরাপাতা' ৯৯
জুভেনাইল স্কুল ১১
জেনানা মিশন ১১
জেনিফার ২৪৩
জেমস আর্চার ১৫৪
জৈন দিগম্বর ট্রাস্টি ২৩৯
জোড়াসাঁকো থিয়েটার ২৭, ৪৪
'জোড়াসাঁকোর ধারে' ১০৭
জ্বালাপ্রসাদ পাণ্ডে ৯৩, ৯৪
জ্যোৎস্নানাথ ৯৭, ১২৮, ১৮৩, ২৬৭
জ্যোতিঃ ১২৩
জ্যোতিরিন্দ্র ১-৩, ৯, ১৬, ১৮-২০, ২৩, ২৪, ২৭-২৯, ৩৯, ৪১, ৪৩, ৪৪, ৪৬-৫১, ৫৯, ৬০, ৬৩, ৬৪, ৭৯, ৮০, ১০৯, ১১৬, ১২৩, ১৩৩, ১৬৬, ১৭৩, ২০৮, ২৪০
জ্ঞানচাঁদ (ডাঃ) ১৬২
জ্ঞানদানন্দিনী ৩, ৫, ৯, ১০, ১৪-২৪, ২৬, ২৭, ৩৩, ৩৫, ৩৭, ৩৮, ৪২, ৪৫-৪৮, ৫০, ৫৪, ৫৭, ৬২, ৭২, ৭৪, ৭৫, ৮৮, ৯৬, ১০৮, ১১১, ১১৮, ১২৮, ১২৯, ১৪৭, ১৬১, ১৬৯, ১৮৩, ২৪৯
জ্ঞানদাভিরাম বরুয়া ১৪৫, ১৪৬, ১৭৭, ২৪০, ২৪১, ২৪৩
জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ ২৬৯
জ্ঞানাঞ্জন পাল ২২৫
জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস ৩৩
জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর ১১, ১৯
টড ১৮, ৮৩
টমসন ৩৪
টমাস ২২১
'টাইমস অফ ইন্ডিয়া' ১৭৫, ২১৫
'টাক ডুমাডুম' ২২
'টাকায় কিনা হয়' ১৭৫
টিঙ্কু ঠাকুর *দেখুন* ঐন্দ্রিলা
টিলক (লোকমান্য) ১০২
'টু হুম' ৩২, ৮৪
'টুনটুনির বই' ৮৫
'টেলস অব...ইন্ডিয়া' ৮৫
'টেলস অব্‌ ফোর ফ্রেন্ডস' ৭৪
'টেলস সেক্রেড অ্যান্ড সেকুলার' ৮৫
টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্স ২৩৬
ট্রিনিটি কলেজ অফ মিউজিক ৮১
'ঠাকুরবাড়ির গগনঠাকুর' ১৯৪, ১৯৭
'ঠাকুরবাড়ির নতুন ঠাট' ২৩
'ঠাকুরবাড়ির শাড়ি' ২০
'ঠাকুরমার ঝুলি' ৮৫
ডরোথি ১৪১
'ডাকঘর' ১৮৭, ১৯৬, ২০০, ২০১, ২২৬, ২৬৩
'ডালিমকুমারী' ৮৩
'ডাইভারসোনাল...মিউজিক' ১৭২
ডায়োশেসন ১৫৬, ১৭৬-১৭৮, ২১০, ২১২
ডি এন নিয়োগী ৮৫
ডেবাগেরিও মোগ্রিয়েভিচ ২২
'ডেলাইলা' ২০৩
'ডেলি টেকসাস' ৯০
ডোমলা শিল্প ৮৪
'ঢাকা যুবতী বিদ্যালয়' ১৩৪
'ঢাকা শুভসাধনা সভা' ১৩৪

'ঢাকা শুভসাধনী সভা' ১৩৪
তটিনী দাস (গুপ্ত) ৮৯
'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ২৭, ৮২, ৮৮, ১২০
তনুজা ১৭৯, ১৮০, ১৯০, ২১৫
'তপতী' ১৪৬, ১৪৭
তপন সিংহ ২১৮, ২৪৩, ২৬৫
তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় ১৫৩, ১৫৪, ১৫৭
তরু দত্ত ১৯, ২৬
তরুণ মজুমদার ২১৮
তরুণরাম ফুকন ১১৮
তানসেন ৬৪
তারকনাথ পালিত ৭৩, ৮৫
'তারকার আত্মহত্যা' ৪৭, ৪৮
'তারাচরিত' ২৪
'তারাবতী' ২৫
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৪
'তাসের দেশ' ১৮৫, ২২২, ২২৪
তিলোত্তমা ২৫৮
তৈলঙ্গস্বামী ১২২
ত্রাণকুমারী ১৮১
ত্রিপুরাসুন্দরী ৮, ৫০, ৫৪, ১৪২
থাকমণি দাসী ৩৩
থাকমণি মল্লিক ৩৩
৩৬, চৌরঙ্গী লেন (থার্টি সিক্স...) ২৪৩
থিয়সফিক্যাল সোসাইটি ২৪২
দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার ৮৫
দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (রাজা) ১১, ৫৭
'দক্ষিণী' ২২২, ২৪৮, ২৬৮
'দক্ষিণের বারান্দা' ২৪৪
'দময়ন্তী' ৮৮
দর্পনারায়ণ ৪, ১৩, ১৩৩, ১৯৪, ২১২, ২৭০, ২৭১
দয়া বৈষ্ণবী ৭
দয়া (ভগিনী) ৯২
দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার ২৩৮
দামোদর মিত্র ২৪৯
'দি অটোবায়োগ্রাফী অব...টেগোর' ৭৪
'দি ইটারনাল ফ্লেম' ২৩৩
'দি ইনডিয়ান ভিলেজ গার্ল' ৯৪
'দি ওরিয়েন্ট পার্লস' ৮৫
'দি ওয়েস্ট এ্যান্ড...মীট' ১৭২
'দি গার্ডেন অফ ইডেন' ২৩৩
'দি গার্ডেনার' ২৪৪
'দি গোল্ডেন থ্রেসোল্ড' ৮৫
'দি ফ্যাটাল গারল্যান্ড' ৩১
'দি বার্ড অব টাইম' ৮৫
'দি ব্রোকেন উইঙ' ৮৫
'দি ভেদিক সঙস্...টেগোর' ১৭২
'দি রোড টু ফ্রিডম' ১৫২
'দি লাইট অফ এশিয়া' ২৩৬
'দি লাইফ অফ বুদ্ধ' ২৩৯
'দি সঙ অফ সলোমন' ২৩৩
'দি স্নেক চার্মার্স ডটার' ২৩৬
দিগম্বরী ৫-৮
দিনকর কৌশিক ১৩৯
'দিনগুলি মোর' ২২১
দিনেন্দ্র ১২১, ১৪৩-১৪৫, ১৪৬, ১৪৮, ১৬৯, ১৭৩, ১৭৪, ২০১, ২০৭, ২১৬, ২২৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৯
'দিনেন্দ্র শিক্ষায়তন' ১৭৩
'দিব্যকমল' ৩২
'দিলীপ ও ভীমরাজ' ৮৩
দিলীপকুমার ২৩৬
দিলীপ মুখোপাধ্যায় ২১৮
দীনবন্ধু মিত্র ৪
দীনেন গুপ্ত ২১৮
দীপক ১০৪
দীপনারায়ণ সিং ৮৭, ১১৪
'দীপনির্বাণ' ২৪, ২৫, ২৭, ২৮
দীপিকা (সিস্টার) ১৭৬, ১৭৮, ১৭৯
দীপ্তি চট্টোপাধ্যায় ১২৬, ১৫৩, ১৫৫-১৫৯, ২১৪, ২১৫
দুকড়িবালা ১২৪
'দুকূলহারা' ২২৮
দুর্গামোহন দাস ১৯, ২০, ২৯, ৮৩
'দুর্গেশনন্দিনী' ২৪
দুলদুল ২৫৩, ২৫৪
দেবব্রত বিশ্বাস ১৭১
দেবমাতা (ভগিনী) ১৯
দেবিকারানি ১৭৫, ২৩৫-২৩৮
দেবেন্দ্রনাথ (মহর্ষি) ২, ৩, ৫, ৭-১০, ১২-১৪, ১৬, ১৮, ২৬, ৩০, ৩৫-৩৭, ৩৯, ৪১, ৪৩-৪৫, ৪৭, ৬৫, ৬৬, ৭৪, ৭৫, ৮১, ৯৪, ১১২, ১১৮, ১২১, ১২২, ১২৮, ১৩২, ১৪৯, ১৫৫, ১৫৯, ১৬৩, ১৯৪, ২৪০, ২৪১, ২৭০
দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৮১
দেবেন্দ্রনাথ সেন ১১১
'দেশ' ১৮৭

'দেশিকোত্তমা' ৭৮
'দেহলি' ১২৪
দ্বারকানাথ ২, ৪-৮, ১০, ১৯, ৪১, ৫৫, ১২৮, ১৪১, ১৪৩, ১৬০, ২০৪, ২৪৪, ২৪৭, ২৫১
দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৫৮
দ্বিজেন্দ্রনাথ ১৪, ১৯, ২৭, ৪৩-৪৫, ৬১-৬৩, ১১৪, ১২১, ১২৩, ১২৬, ১২৭, ১৪৩, ১৪৮, ১৫৩, ২৪০, ২৪১, ২৪৩, ২৬২, ২৬৭
দ্বিপেন্দ্র ৫২, ৬১, ১২১, ১২২, ১৪৩, ১৫৯, ১৬০
দ্রবময়ী ১০
দ্রবময়ী ১৪
ধীরবালা ১৬১, ২০০, ২২৬
ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৭৫, ১৭৬, ২৩৬, ২৩৭
ধৃতিমতী ১৩১
নগেন চৌধুরী ১৭৮
নগেন (নগনী) ১৯৩, ১৯৪
নগেন্দ্রনাথ ৮, ৫৪, ১৪২
নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১১৫, ১১৮-১২০, ১৩৪, ১৭৫, ১৮৪, ২০২
নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৮৩, ৮৬
নগেন্দ্রবালা ২০৪
নটরাজ ১৬৭
'নটীর পূজা' ১৩৯, ১৪৬, ১৫১, ১৬৯, ১৮৫, ২০১, ২২২, ২২৪
'নদীযাত্রা' ৮০
ননীবালা ৮৯, ১০৩
নন্দলাল ঘোষাল ৮৭, ১২৮
নন্দলাল বসু ১৩৬, ১৩৯, ১৪৬, ১৮৪, ১৮৬, ২০৫, ২২৭
নন্দিতা (বুড়ি) ১১৯, ১২০, ১৩৯, ১৪০, ১৪৬, ১৫০, ১৫১, ১৭৫, ১৮৪-১৮৮, ২৪৮
নন্দিনী (পুপে) ১৫০, ১৮৮, ১৮৯
নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ১৩৪
নবকুমার ১৫০
নবকৃষ্ণ (রাজা) ১১
'নবনাটক' ৫১
'নবনারী' ৯
নবনীড় ২২৯
নবীন ১৯১
নবীনকালী দেবী ২৪
নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৪১
নবেন্দ্র ১৫৯, ২০২
নরনাথ ২৬০
নরেন্দ্র ভট্টাচার্য ১৩৩
নরেন্দ্রনাথ রায় ২৬৯
নর্মান ৩৪
নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ১৮১
নলিনী ১২৮, ১৪৫, ১৫৯, ১৬৮, ২০২
নলিনীকান্ত ১৩৩, ১৩৪
নয়নতারা ২১৬
নয়নমোহন ১৫৩, ১৫৫, ২১৫
'নয়াচীনে যা দেখেছি' ১৬২
'নাগা আর্ট' ২৪৬
'নাতবউ' ১৪০
'নাথপন্থ' ১৮৩
'নানা রঙের দিনগুলি' ২১২
নাফিসা জোশেফ ২৭১
নারায়ণ মেনন (ড.) ২৪৩, ২৪৪
নারায়ণচন্দ্র শীল ৭২
'নারীকল্যাণ সমিতি' ১৬০
'নারীচরিত' ২৪
'নারীর উক্তি' ৭৬
'নারীশিক্ষা' ৯১
'নারীশিক্ষা সমিতি' ১২৫
'নিউ ওয়ার্ক সেন্টার' ২৩৯
নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪৭
নিখিল ভারত সামাজিক মহাসমিতি ১০৪
নিত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ৫৭
নিত্যানন্দ (নিত্যরঞ্জন) চট্টোপাধ্যায় ৫৭
নিবিসা চাসি ২৪৬
'নিবেদিতা' ৩০, ১৪০, ১৫০, ১৫১
নিবেদিতা (ভগিনী) ৯৯-১০১, ১২৯
নিম্বার্ক আশ্রম ১৩০
নিরঞ্জন পাল ২৩৬
নিরজিনী ২০৩
নিরধিপ্রকাশ ১৮২, ২৩৪
নিরুপমা (রানী) ৮২
'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' ৯৭
'নির্দোষ' ১৮৭
'নির্বাণ' ১৪০
নির্মলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৯
নির্মলাবালা সোম ৫৮, ৭৩
নির্মলা ১৭৪
নিশানাথ ১৯৫, ১৯৭
নিশিবালা ১০৮, ১৪১, ১৪২
নিস্তারিণী ১৮৩, ১৮৪
নীতীন্দ্র ১১৯, ১২০, ২৬৭
নীতীন্দ্রনাথ ৫২, ৬২, ১২৭

নীলময়ী ৩৫-৩৮, ৪৬, ৫০, ৬৩, ৬৫, ১০৮
নীরজচন্দ্র ২৬৮
নীরজা ২৬০
'নীরব বীণ' ১৪৫
'নীল চন্দ্রমল্লিকা' ২৪৬
নীলকমল মুখোপাধ্যায় ৭৭
'নীলদর্পণ' ৪
নীলমণি ৪, ১৪, ২১২, ২৭০
নীলরতন ধর ২২৯
নীলরতন সরকার (ডা.) ১৮৮
নীলাঞ্জন ১৮১, ১৮২
নীলানাথ ১৩২, ২০৬
নীলিনা ১৩৯
নীনু ১৯১
নীলেন্দু হালদার ২৬৭
নীহারমালা দেবী ৬৬
নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার ২২৮
'নৃত্য' ১৩৯
'নৃত্যকলা' ১৫৩
নৃপবালা ১৫৩, ২০৭, ২৫৮
নেটিভ ক্রীশ্চান...স্কুল ৫৮
নেলী *দেখুন* উমা
পঙ্কজচরণ দাস ২৩১, ২৩২
'পঙ্ককন্যা' ২৩২
'পঞ্চতন্ত্র' ৮৪
'পঞ্চশর' ১৭৫
পঞ্চানন ৪
পতৌদির নবাব (মনসুর আলি খান) ২৬৬
'পত্রপুট' ১৮৫
পদ্মা ২৩৪, ২৩৫, ২৪৮-২৫০, ২৬৪, ২৬৬
'পদ্মাবতী স্বর্ণপদক' ৭৩, ৯৭
'পপুলার টেলস অব বেঙ্গল' ৮৫
পরমানন্দ (স্বামী) ১৯, ২২
'পরমাত্মার কি প্রয়োজন' ১২২
পরাণ ঠাকুর ৭
'পরিণয়ে প্রগতি' ১৪৯
'পরিচয়' ২২২
'পরিশোধ' ১৩৯
'পলাতকা' ১১৬
'পাঁচমিশেলি' ১৮০
'পাকচক্র' ৩৪
'পাকরাজেশ্বর ১১১
'পাগলা দাশু' ২২৬
পাতঞ্জল যোগসূত্র ১০১
'পারানি' ১৭৩, ২৪৯
'পাল ও বর্জিনিয়া' ৯
পারুল ২০৪-২০৬, ২৪৪
পারুল (সিদ্ধিন্দ্রনাথের স্ত্রী) ১৭৪-১৭৬, ২২৮
পার্সনস (মিস) ১১১
'পাশ করা আদুরে বৌ' ১২
'পাশ করা মাগ' ১২
পাস্তুর ইনস্টিটিউট, শিলং ১৭৮
পি কে সেন ২৬৮
'পিকচারস ফ্রম বেঙ্গল' ২৪৬
'পিটিশন টু অ্যাজিটেশন' ২২৫
'পিতাপুত্রী' ১৮৮
'পিতামাতার...কর্তব্য' ১৬৫
'পিতৃদেব চরিত' ২৫
'পিতৃস্মৃতি' ১১, ১৩, ১০৫
পিয়ার্সন ১২২
পিয়ের লোতি ৭৪
'পুণ্য' ৬৩, ৬৬, ৮২-৮৪, ৮৭, ৮৮, ৯৩, ৯৮, ১০৮
'পুতনামোক্ষম' ২৩১
পুরাণ ৮৪
'পুরাণ প্রেমকথা' ৮৫
'পুরাতনী' ১৭
'পুরুবিক্রম' ৬০
পুরুষোত্তম ৪
'পুষ্পাঞ্জলি' ৪৮
'পূজারিণী' ১৩৯
পূর্ণিমা (চট্টোপাধ্যায়) ১০৭, ১০৯, ১৪২, ১৪৩, ১৮৯, ১৯৩-১৯৮, ২০১-২০৪
পূর্ণিমা (ঠাকুর) ৭৫, ১৫৯-১৬১, ২০২
পূর্ণেন্দুনাথ ২৬০, ২৬৭
পূর্ণেন্দু পত্রী ২১৮
'পূর্বকথা' ৬২, ৭৫
'পূর্বকালের সমাজ শাসন' ৯৯
'পৃথিবী' ৩৪
'প্যারাডাইস লস্ট' ৩৮
প্যারামল (ডা.) ৯৯
প্রকৃতি ১৭৫
প্রকৃতি ১৫৩-১৫৫, ২১২, ২১৩
প্রজ্ঞা ৩৩, ৬৫, ৬৬-৬৮, ৭০, ৭২, ৭৯, ৮৩, ৮৭, ৯৩, ৯৪, ১০৬, ১০৮, ১৪৫, ১৫৬, ১৬০, ১৭৬, ২২১, ২৩৩, ২৪০
প্রণতি ২৪৮
প্রণয়িনী ১৫৪
প্রতাপ মজুমদার ৮৯
প্রতাপাদিত্য ১০১
প্রতাপাদিত্য উৎসব ১০১
প্রতিভা ২২, ৩৩, ৫৭-৬০, ৬১-৬৫, ৭৫, ৭৭, ৭৯, ৮০, ৮২, ৮৩, ৯৪, ৯৭, ১০৬-১০৮, ১৫৫, ১৫৬, ১৬৩, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৮, ১৭৬, ২২৯
প্রতিভা (কুচবিহার) ৮৫, ৮৭
প্রতিভা বসু ২২৮
প্রতিমা (কল্পিতা) ২২, ৫২, ৫৫, ১০৫-১০৭, ১২১, ১২৭, ১৩১-১৪১, ১৪৫, ১৮৪, ১৮৮, ১৮৯, ২০২, ২০৬, ২১৭, ২২৩, ২৩১, ২৪১, ২৪৯, ২৬০
প্রথম বিধবা বিবাহ ২৯
প্রথম ব্রাহ্ম বিবাহ ১৩
প্রথম রবীন্দ্র জন্মোৎসব ২১
প্রদোষচন্দ্র ২৪৩
প্রদ্যোৎকুমার ২৬১
প্রফুল্লকুমার দাস ২২১
প্রফুল্লচন্দ্র চক্রবর্তী ২৪৬
প্রফুল্লনাথ ঠাকুর ১৯৭, ২১২, ২৩৩, ২৩৪, ২৬০
প্রফুল্লময়ী ১৪, ২১, ২২, ২৬, ৩৫, ৩৬, ৩৮-৪১, ১০৬, ১২১, ১৩১, ১৪৯
প্রবন্ধকুসুম ১২৮
'প্রবাসী' ৯৮, ১১৪, ১২০, ১৫৪, ২৪৩
প্রবীরেন্দ্র ১৫৩, ১৬০, ২৬১
প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর ২১১, ২৩৩-২৩৫, ২৪৯, ২৫০
প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী ২১৯
প্রভাত মুখোপাধ্যায় ২১৮
প্রভাত রায় ২১৮
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ৪৫, ৪৬, ৪৯, ১১৬, ১৮৫
প্রভাতনাথ ১৯৩
প্রভাতী ২০৭
প্রভাবতী ১৯৫
প্রভাবতী দাশগুপ্তা ২২৫
প্রভাবতী দেবী, সরস্বতী ১৪৯
'প্রভাসমিলন' ৯
প্রমথ চৌধুরী ১০, ২৩, ৭২, ৭৩-৭৫, ৮০, ৮১, ১০৫, ১৮৩
প্রমথনাথ বসু ২৩৬
প্রমদা চৌধুরী ৬৪, ৮২
প্রমোদকুমারী ১০৮, ১৪১-১৪৩, ১৯৫, ২০২
প্রশান্ত মহলানবিশ ১১৪, ১১৬, ১১৭
প্রশান্তকুমার পাল ৪১, ১১৭, ১৮০, ২৪১
প্রশান্তনাথ ঠাকুর ২১২
প্রসন্নময়ী ২৯
প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬৯
'প্রহাসিনী' ১৮০
প্রহ্লাদ দাস ২৬৯
'প্রাক প্রতীচি' ২৩৬
'প্রিন্স অব ওয়েলস' ১৯
'প্রিন্সেস কল্যাণী' ৩২
প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় ১৯৬
প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ১২৮, ১২৯
'প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর জীবনকথা' ১২৮
প্রিয়নাথ সেন ১১২
প্রিয়ম্বদা দেবী ২৩, ৮৩
প্রিয়ম্বদা মহান্তি ২৩২
প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ৮৯, ১৮৬
'প্রেমলতা' ৩০
'প্রেমাঞ্জলি' ৮৬
'প্রেমিক সভা' ৯৯
প্রেমিকা দেবী ১৭৫-১৭৬
প্রেসিডেন্সি কলেজ ৭২
'ফচকে ছুঁড়ির কীর্তিকাণ্ড' ১২
ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় ৯৫
ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী ২৫
'ফরাসি গীতাঞ্জলির ভূমিকা' ৭৪
'ফাউস্ট' ২২৬
ফিওয়ে ৩৪
'ফুলচাঁদ' ৮৩
'ফুলের মালা' ২৮, ৩১
'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' ২৫
'ফেমিনা' ২১৫
ফেলিসিতা ১৬৫
'ফোক টেলস্ অব বেঙ্গল' ৮৫
'ফ্রি চার্চ অব স্কটল্যান্ড' ৫৮
ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল ১৮১
বকুলা ২৩৯
বঙ্কিমচন্দ্র ২৫, ২৭, ২৮, ৩০, ৩৪, ৪৩, ৭৮, ৯৯, ১১১, ২৫৩
বঙ্গদর্শন ২৭
'বঙ্গবাসী পত্রিকা' ২৩, ৯৮
'বঙ্গ মহিলার জাপানযাত্রা' ৮৭
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ২২৫
বচন মিত্র (উত্তাপ) ১৭৩, ২৪৯
'বঙ্গলক্ষ্মী' ১২৩, ১২৬, ১৫৪, ১৫৭, ১৮৩, ২১৬

'বনবিবি' ৯০, ৯৯
'বন্দনা' ১৩৮
বনীলাল মুকুল ৭৭
বনবাসী ১৮৮, ১৮৯
বনলতা দেবী ৬৬
বনোয়ারীলাল চৌধুরী ৬৪, ৮২
'বন্দেমাতরম' ৭৮, ৯৮, ১০৩
বরদাসুন্দরী ঘোষ ৩৩
'বরবধূ' ১২
বর্ণাশ্রম, ভেদাভেদ ৩৬
'বর্ষার রক্ত' ৬৩
বর্ণকুমারী ১৬, ২৩, ৫৪-৫৭
'বর্ষাগমন' ৬২
'বর্তমান' ১৩৯, ১৭২, ২০৪, ২৩৯
বসন্ত ২২, ৩৯, ৪৪, ৫০, ৫২, ১২২, ১৬১, ২৩৭
বসুর ২০৫
'বসন্ত উৎসব' ২৭, ২৮, ৩৯, ৪৪, ৪৫, ৫৯
বসন্তকুমারী দাস ৩৩
বসন্তকুমারী বিধবা আশ্রম ১২৩
'বহুবল' ৯
বাওয়ার (মিস) ১৬১
বাঈজী ২১৭
বাণী ১৭১-১৭৩
বাণী ঠাকুর ২৬৮-২৬৯
'বাতায়ন' ২৩৩
'বাবার কথা' ১৬০, ১৬৩
বামাসুন্দরী দেবী ২৫
বারো মাসের বারো রাজা ২৪৩
বারীন্দ্রনাথ ঘোষ ১০২
'বালক' ২২, ২৩, ৬৩, ৭৪, ৯৫, ৯৮
বালাসুন্দরী ১১
'বালিকা শিক্ষাদর্শ' ৮৯
'বাল্মীকি প্রতিভা' ২৭, ৪৯, ৫৯, ৬০, ৬২, ৬৩, ৭৭, ৭৯, ৮৩, ১৩১, ১৩৮, ১৫৯, ১৬৩, ১৬৩, ১৬৮, ১৭৭, ১৭৮, ১৮২, ২২২
বাসন্তী ১৬১
বাসব (বাসবেন্দ্র) ৯৩, ৯৪, ১৬৭, ১৭৪, ১৭৬
বাসবদত্তা ৯, ১৫২
বি বি সি ২৩৬
'বিজ্ঞানরহস্য' ৫৪
'বিচিত্রা' ১৫৪
বিজয়লক্ষ্মী ২০২
বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ২৪৩
বিদ্যাপতি ৭৮
'বিদ্যাসাগরজীবনী কথা' ৫৯
'বিদ্বজ্জন সমাগম' ৫৯
'বিদায়' ২৮
'বিধবা শিল্পাশ্রম' ১৬০
বিধানচন্দ্র রায় ১৭৮, ১৮৮
বিধুমুখী বসু ৫৯, ৮৯, ৯৭
বিধুমুখী রায় ৩৩
বিনয়কৃষ্ণ দেববর্মা ১০৪
বিনোদিনী ২৬, ৫৩, ১০৪-১০৯, ১৪২, ২০৬, ২৫৮
বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ১৮৬
বিনোদিনী ৫৯, ৬৩
বিনোদিনী দেবী ২৫৪
বিপিনচন্দ্র পাল ২২৫, ২৩৩
বিভাস মুখোপাধ্যায় ৬৬
'বিবাহ উৎসব' ২৮, ৬১
বিবি হায়েরন নেছা ২৫
'বিবেক চেতনা' ২৪২
বিবেকানন্দ (স্বামী) ৮৮, ৯১, ৯২, ১০০-১০২, ১৮৩, ২৩৫
বিবেকানন্দ মেডিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট ২৫৮
'বিভাবরী' ১০৩
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫৯
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ২৫২
'বিরাজমোহিনী' ২৫
বিরাজমোহিনী ২৯
'বিরহ' ৮০
বিলায়েৎ খাঁ ২৪৭, ২৪৮
'বিশুদ্ধ রবীন্দ্রসংগীত' ৭৮
'বিশেষ বিবাহনীতি' ২৯
বিশ্ব বৌদ্ধ সম্মেলন ২৩৮, ২৩৯
'বিশ্বদূত' ১৫২
'বিশ্ব রবীন্দ্রায়ণ' ৯১
'বিশ্বভারতী' ৪৬
'বিষবৃক্ষ' ২৯, ৪২, ৫৭
বিষ্ণুপ্রিয়া ২৪১
বিষ্ণু চক্রবর্তী ৩৭, ৫৯
বিষ্ণুপুরাণ ১১১
'বিসর্জন' ১২৯, ১৩১, ১৬০, ১৬১, ২৩৯, ২৪৯
বিহারীলাল গুপ্ত ২০, ৪২
বিহারীলাল চক্রবর্তী ৪৩, ৪৪, ৫৮, ১১২
'বীজমন্ত্র' ২১১
বীণা ১৪০-১৪৪, ২০৭

বীণা দাস ৮৯
বীণা দে ২১৩
বীণাপাণি ২১১
বীরেন্দ্র ৫৮
'বুবুনি' ১৩৩
বুর্ট (মিস) ১৩৫
বুলবুল ঘোষ কাটারি ৮৭
বেঙ্গল টিউবারকুলোসিস অ্যাসোসিয়েশন ২১৩
বেঙ্গল থিয়েটার ৬০
বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল...কনফারেন্স ২৪৮
'বেঙ্গলী হাউসহোল্ড টেইলস' ৮৫
বেণীমাধববাবু ৫৮
বেণীমাধব রায় ৫০
বেথুন কলেজ ৫৮, ৯৬, ৯৭
বেথুন স্কুল ১১, ১২, ৯৬, ১৭২, ১৮৬
বেলতলা গার্লস স্কুল ২৪৮
'বেহদ বেহায়া' ১২
'বৈকুণ্ঠের খাতা' ৬৪
'বৈজ্ঞানিক বর্ষ' ৫৪
'বৈতালিক' ১৫৩, ১৭৩, ২১৭, ২২৮, ২৫৯
'বৈদিক সঙ্গীত' ৯১
বৈদ্যনাথ রায় (রাজা) ১১
'বোম্বাই শহর' ২৩
'বৌবাবু' ১২
'ব্যাপিকাবিদায়' ২১৭
ব্যারাকপুর ৫৪
ব্রজসুন্দরী ২৪১
ব্রহ্মচর্য আশ্রম ৫৪
ব্রহ্মবাদী ২০, ২৯
'ব্রহ্ম সঙ্গীতমালা' ৮৭
ব্রাউনিং ৯৮
'ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস' ১৭১
'ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়' ৮৩, ২৫৩
'ব্রাহ্মিকা শাড়ি' ২১
ব্রেবোর্ন কলেজ (লেডি) ২১০, ২৪৮
'ভক্তমাল' ৮৪
'ভক্তিরস তরঙ্গিণী' ২৬
ভগবতী ১০
'ভগ্নহৃদয়' ৬২
ভবতারিণী, দেখুন মৃণালিনী
ভাই বোন সংঘ ২৩৬, ২৩৭
ভাই-বোন-সমিতি ২৩৭
'ভাই আমাদের সময়' ২২
'ভাগবত' ৭
'ভারত প্রেমকথা' ৮৫
'ভারতবর্ষ' ৭৪
'ভারতবন্ধু' ৭৯
'ভারত ভ্রমণ কাহিনী' ৭৯
'ভারত মহিলা' ১০৩
'ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল' ১০৩, ১২৪, ১৪৫, ১৮৩
'ভারত স্ত্রী শিক্ষাসদন' ১০৪
'ভারতী' ২২, ২৭, ৩৩, ৪৩, ৪৪, ৯৫, ৯৬, ৯৮-১০৩, ১০২, ১০৩, ১১৪
'ভারতের আদর্শ' ৯১
'ভারতের ধর্ম' ৯১
'ভারতের নারী' ৯১
ভার্জিনিয়া মেরী মিত্র (দেবী) ৫৮, ৫৯, ৮৯, ৯১
ভাস্করাচার্য ২৫১
ভাস্বতী ২৫০
'ভিক্টোরিয়া' ১২৫
'ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন' ১৩৯
ভুবনমোহন ১৬১
ভুবনমালা ১১
ভুবনমোহিনী দাসী ৩৩
ভুবনমোহিনী ঘোষাল ৭৮
ভূপালের বেগম ১৮
'ভৈরবের বলি' ২০৩, ২৩৯
ভ্রাতৃদ্বিতীয়া মহোৎসব ২১৮
মঞ্জরী ২৫৮
মঞ্জু ২২৪, ২২৫
মঞ্জুশ্রী ১২৯, ১৬১-১৬৩, ২২৫
'মডার্ন এন্টিকোয়ারি' ৮৮
'মডার্ন রিভিউ' ৫১
'মদন ভস্ম' ১৩
মণিকা ৮৩, ১৭৫
মণিকা দেশাই ১৭০
মণিকুন্তলা সেন ১৬২
মণিমালা ১৩৮, ১৩৯, ২৫৫
মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ১৭৫, ২৩০, ২১৩
মতিলাল সুর ২৩
মদনমোহন তর্কালঙ্কার ১১, ১২
মধু বসু ১৩৯, ২১৭, ২৩৩, ২৩৭
মধুমালা ২৩৩
মধুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫
মধুমিতা মজুমদার ১৩৩
মনীষা ৮১, ৮২, ৮৬
মনীষী ১১০, ২০৯
মধুরা ২৫০

রমলা সিংহ ৪২, ৮২, ৮৫
রমলাদেবী ১৭৫, ১৭৬
রমা ৩৮, ১৪৮, ১৪৯
রমা চক্রবর্তী ১৮৫, ১৮৭
রমানাথ ঠাকুর ১৪, ২০৪
রমাবাঈ ৮৯
রমাসুন্দরী ঘোষ ২৫
রমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ২২৩
রমেশচন্দ্র দত্ত ২৫, ৪২
রয়্যাল আকাডেমি অফ ড্রামাটিক আর্টস স্কুল ২৩৫
রাখালদাস হালদার ১৩
রাজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯
রাজলক্ষ্মী ১১৮
রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ৪৪
রাজেন্দ্রচন্দ্র রায় ১৪৯, ১৫০, ২১৩, ২১৮
'রাজনর্তকী' ১৩৯
রাজনাথ ১৬৭
'রাজসিংহ' ২৮
'রাজস্থান' ৮৩
'রাজা ও রানী' ২৩, ৫১, ১৪৭, ১৬১
রাণু মুখোপাধ্যায় ১১৬, ১৬১, ২৬২
রাধা ১০৪
রাধা ফিল্মস ২৪৭
রাধাকান্ত দেববাহাদুর ১১
রাধানাথ ঠাকুর ১২৮, ১৪১
রাধাপ্রসাদ রায় ১২১
রাধিকা গোস্বামী ১৪৮, ২৩৪
রাণী চন্দ ৫৫, ১৮৬
রামকিংকর ১৮৬, ২২৭
রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ১২৩, ১৪৩, ১৮৩, ২১০
রামকৃষ্ণ মিশন ৯২, ১২২
রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান ২৫৬-২৬৮
রামকৃষ্ণ মিশ্র ২৬৮
রামগোপাল ঘোষ ১১
রামগোপাল মিশ্র ২৭০
রামতনু ২৭০
রামপ্রিয়া ২৭০
রামবল্লভ ২৭০
রামভজ দত্তচৌধুরী ৯৯
রামমণি ২৭০
রামমোহন রায় (রাজা) ১৯, ৬১, ১২১, ১২২
রামলাল ৪১
রামলোচন ঠাকুর ৫, ২৭০
রামসত্য মুখোপাধ্যায় ৮৫
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ৯৮, ১০৩, ১০৪, ১৪৫, ১৪৯
'রামায়ণ' ৮, ৫১, ৫২, ৫৬, ৮৪, ১১৪, ২৩২, ২৩৫
'রামায়ণী প্রেমকথা' ৮৫
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ৩৪, ১১
রাসবিলাসী ৪, ১৪, ২৪৭
রাসমোহন ২০৯
রাসসুন্দরী ১০, ২৫, ১০৫
রাস্কিন ৭৪
রুক্মিণী দেবী ১৫২
রূপ গোস্বামী ৪
'রূপকার' ২১৭
'রূপচাঁদ পক্ষী' ৭
'রূপজালাল' ২৫
'রূপম' ২৪৮
'রূপহীনা' ১০৯
রেখা ২৪৩, ২৪৪
রেণেগ্রুসে ৭৪
রেণুকা (রাণী) ২২, ১১১, ১১২, ১১৬-১১৮, ১৩৩
রেবা ২০৬, ২৪৪
রেবা রায় ১৩৯
রোকেয়া (বেগম) ১১৩, ১৪৯
রোটেনস্টাইন ৩১
রোমিলা ২৪৩
রোহিণীমোহন বরুয়া ১৭৭
রৌলট অ্যাক্ট ১০৪
লঙ (রেভারেন্ড) ৮৩
'লন্ডনে' ৮৬
'লক্ষটাকার এক কথা' ৮৩
লক্ষ্মীনন্দন বরা ১৭৪
লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া ৬৬, ১৭৪, ১৭৬-১৭৯, ২২৯, ২৪০
'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' ১৩৮, ১১৭, ২২২
'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' ১০২, ১০৩
লক্ষ্মীশ্রী ৬৬
'লজ্জাশীলা' ৩৪
লতিকা (ললিতা) ১৪৫, ১৪৬, ১৯৮, ২৪০, ২৪১
লতিকা ঘোষ ১০৩
লতিকা দেবী ৪
লরেন্স সাহেব ১১১, ১১৮, ১৩১

'লয়লা মজনু' ৯
'লর্ড ক্লাইভ' ৯৬
'লর্ড বুদ্ধ অ্যান্ড হিস মেসেজ' ১৪৯
ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ১২১
ললিতা রায় ৩৩
লা স্কালা থিয়েটার ১৬৫
লাকিয়ার ৩৪
লাপলাস ৩৪
'লাবণ্যবতী' ২৩৩
লাবণ্যলেখা ১৩২, ১৩৪, ১৪৬
'লাম্বসটেল' ৭
লালবিহারী দে ৮৫
লিটন (মিস) ১১১
'লিলিয়াথ' ২৩৩
লিলিয়ান পালিত ৭৩, ৮২, ৮৫, ৮৭, ৮৯, ১১৪, ১১৪, ১২৪
লীলা ১৬৩-১৬৫
লীলা (ঠাকুর) ১৬০
লীলা চৌধুরী ২৩৫
লীলা দেশাই ১৭০
'লীলা পুরস্কার' ১২৪, ১৬৫
লীলা বক্তৃতা ১৬৫
লীলা মজুমদার ১১০, ১৫৯, ২৫৫
লীলাবতী মিত্র ২৯
'লীলাবৈচিত্র্য' ১৫২
লু সুন ১৬২
লুই কেলগ ২১৯
'লুব্ধবণিক তেজারাম' ৮৩
লেডিজ কমিটি ১১৩
লেডিজ সোসাইটি ১১
লোকমোহন ২০৯, ২৫৪
লোরেটো কনভেন্ট (স্কুল/কলেজ) ৫০, ৫১, ৫৮, ৭৩, ৮০, ৮৭, ১১১, ১২৮, ১৩১, ১৫৬, ১৮২, ২০৬, ২১৮, ২৫৩, ২৬৫, ২৬৭
ল্যান্সডাউন (লেডি) ৬২
শংকরাচার্য (যোশিমঠ) ২৬১
শকুন্তলা ১৫৫
'শকুন্তলা' ১৩, ৮৮, ১১১, ১১৪
শচীকুমার (ড.) চট্টোপাধ্যায় ১৭১
শচীন রায় ২৬৯
শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ১৩৩, ১৯৯
শরচ্চন্দ্র ঘোষাল ৬০
শরৎকুমারী ১৪, ২৬, ৩৮, ৪৪, ৪৫, ৬৫, ২৩৮, ২৬৫
শরৎকুমারী চৌধুরাণী ৩০, ৩২, ৩৩, ৪৩, ৪৫,
শরৎকুমার চক্রবর্তী ১১২-১১৭
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৯৮, ৯৯, ২২৪
শরদিন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৬০
শর্মিলা ১৯৮, ২৪৩, ২৬৫, ২৬৬
শাকম্বরী দেখুন সারদা
'শাজাহান' ২৫৪
শান্তা ১২৭, ১৪৫
শান্তি ঘোষ ১৮৬
শান্তি ২৬৬
শান্তি পাল ২৪৯
শান্তি ঘোষ ১৮৬
শান্তিদেব ঘোষ ১৩৯, ১৮৪, ১৮৬, ২২২, ২২৪, ২২৭
'শান্তিনিকেতনে...শিক্ষা' ৭৮
'শান্তিলতা' ৩০
'শাপমোচন' ১৩৯, ১৬৯, ২৪০, ২৪১
শারাড ৩৪
'শাশ্বত প্রেমকথা' ৮৫
শাশ্বতী ২৬৯
'শাস্তি' ১৮৭
'শিক্ষিত বউ' ১২
শিঞ্জিতা ১৯৮
শিবকুমার ২৬১
শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ১১১
শিবনাথ শাস্ত্রী ১০, ২৯
শিবনারায়ণ স্বামী পরমহংস ৪০, ১২২
শিবরাণী ১৬১
শিবসুন্দরী দেবী ২৫
শিবাণী ঘোষাল ২৫৮-২৬০, ২৬৯
শিবানী ২৬০
শিরোমণি ৪১
শিশির ভাদুড়ি ২৫৪
শিশির মল্লিক ৮৭
'শিশু' ১১৬, ১১৭
'শিশুতীর্থ' ১৫২
শিশুতীর্থ (সংস্থা) ২২৩
'শিশুবোধক' ১৮
'শিশুমঙ্গল' ১১১
শীলা ২৫০-২৫২
শুক্লা ২৩৯
শুভ গুহঠাকুরতা ২৬৮
শুভশ্রী ২২৮
শুভ্রা ২২৩, ২২৪, ২৩৯

শূদ্রক ২৩০
শেফালিকা ২৩০-২৩২, ২৪৯, ২৫০, ২৬৩
শেলি ৯৮
'শেষ পর্বে' ২৫১
'শেষ প্রতিষ্ঠা' ১১৬
'শেষ বর্ষণ' ১৬৭, ২১৭
'শেষ রক্ষা' ২৫১
'শেষের কবিতা' ২০৫, ২১৭
শৈলেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ১০৫, ১০৪, ১৫১
'শৈলা' ৮৮
শৈলজারঞ্জন মজুমদার ১৭০
শৈলসুতা দেবী ১৫১
শোভনলাল ২৩১, ২৫৫
শোভনা ৩২, ৮৩, ৮৬, ৮৯, ১৬৬
'শোভনা' ৮৬
শোভেন্দ্র ২৬১
শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ২৫, ৫৯, ৬৪, ২০৪, ২৬০
শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায় ৫১
শ্যামলাল ঠাকুর ১৪
শ্যামলী ২৫০, ২৫২
শ্যামা ২২৫, ২২৬, ২৫৭-২৫৮, ২৬৬, ২৬৭
শ্যামসুন্দর মিশ্র ১৫৮, ১৯৭, ২০৫
'শ্রমিকনেত্রী সন্তোষকুমারী' ২২৫
'শ্রীকৃষ্ণ' ১৫১
শ্রীজয়ন্তী ২৫
শ্রীলালা ২৬৯
শ্রীনন্দ ২২৫
শ্রীনাথ ১৯১
শ্রীনাথ ঠাকুর ১২৮
শ্রীনাথ দাস ৩৩
শ্রীমদ্ভাগবত ১০৬
'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' ৬১
শ্রীমতী ১২৮, ১৩৯, ১৫০-১৫৫, ১৮৫, ১৮৬, ২১৭, ২১৮
শ্রীমোহন ২৫১
'শ্রীযুক্ত বোর্টিনি' ১২
শ্রীরূপা ২৬৪
'শ্রীলেখা' ২৬০, ২৬৫
শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ২৯
শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ৯৯
'শ্রেয়সী' ১৪১, ১৪৯
ষষ্ঠী মঙ্গল ২৫৮
সংগীত নাটক অ্যাকাদেমি ২৩২, ২৩৩
সংজ্ঞা (অরূপানন্দ সরস্বতী) ১২১, ১২৮-১৩০, ১৩২, ১৬১
সংযুক্তা পাণিগ্রাহী ২৩২
সংযুক্তা ২৬৯
'সংবাদ প্রভাকর' ১১
'সংসারী রবীন্দ্রনাথ' ১২৬
'সংস্কৃতি' ২২৫
'সখা' ৯৫, ৯৮
'সখিসমিতি' ২৯, ৩০, ৩২, ৩৩, ৫১, ৯৫, ১০০, ১০৩, ১২৪, ১২৫
'সঙ্গীত সম্মিলনী' ৬৪, ৮২, ১৩৯
'সঙ্গীত সার' ৬৪, ৮২, ১৫৫, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৮, ১৭৬, ১৭৭
'সঙ্গীত প্রকাশিকা' ৬৪
'সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ' ৭৮
সচ্চিদানন্দ সরস্বতী ১৩০
সজনীকান্ত দাস ৪৫
সজলেন্দ্র ২৬০
'সতী' ১৫৩
সতী ৮৮
সতীন্দ্রমোহন ১৩৩, ১৩৪
সতীরানী ১৬০, ১৬১, ২২৫
সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৪৪
'১৭ই ফাল্গুন' ২১৩
'সংলাপ' ১১৪
সত্যপ্রসাদ ১১৫
সত্যব্রত মুখোপাধ্যায় ১৭৭, ২২৯, ২৫০
সত্যজিৎ রায় ১৭০, ১৭৬, ২১৮, ২১৯, ২৪৫, ২৪৪, ২৬৫, ২৬৬
সত্যানন্দ ঠাকুর ১৫০
'সত্যনাথের উপায় কি' ১২২
সত্যেন্দ্রনাথ ২, ৩, ৯, ১০, ১৪-১৮, ২১, ২৫, ২৬, ২৭, ২৯, ৩০, ৪১, ৪২, ৪৭, ৪৯, ৫১, ৭২, ১১১, ১২৮-১৩০, ১৬৬, ১৭৩, ২২১
সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ১৩৩
সন্দীপ ঠাকুর ২৩৪, ২৩৫, ২৪৯, ২৬৩, ২৬৪
সন্ধ্যা সেন ১৭০, ২৫৮
সত্যেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫০, ২৫২
সন্তোষকুমারী গুপ্ত ১০৩, ২২৫
সবিতেন্দ্র ৯৪
সবিতা ১২৭, ১২৮, ১৯৮
সবিতাব্রত দত্ত ২১৭
'সবুজপত্র' ৭৯, ১১৪, ১২৬
'সময়' ৩৩
সমরেন্দ্র ৫৫, ১৩২, ১৩৩, ১৪১, ১৬১, ১৮

১৯৯, ২০০, ২০৩, ২৪৩
'সমাচার চন্দ্রিকা' ১১
'সমাজে ও সাহিত্যে নারীর স্থান' ১৬৫
'সমাপ্তি' ১৭৬
সমীরণচন্দ্র চক্রবর্তী (ড.) ২৬৪, ২৬৫
সয়াজীরাও গাইকোয়াড় ২২৯
সইফুদ্দিন কিচলু ১৬২
সরকার (মিস) ৩৩
সরযূবালা ২০২
সরলা ২০-২২, ২৬, ৩৩, ৩৫, ৫৭, ৬০, ৬১, ৭৫, ৮৩, ৮৯, ৯৪-১০৪, ১৫০, ১৫১, ১৫৯, ১৬০, ১৬৮, ১৮২, ২১৩, ২৬৭
সরলাবালা মিত্র ৮৯
সরলা রায় ৩৩, ৭৫, ৮২, ৮৩
সরোজ মুখোপাধ্যায় ১৯৭
সরোজনলিনী ১২৫
'সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি' ১২৩, ১২৫, ১২৬, ১৫৪-১৫৬
সরোজাসুন্দরী ৬১, ৬৫, ৯৪, ১০৮, ১৫৩-১৫৬, ১৭৯, ২১১, ২১৩, ২১৫, ২৬২
সরোজিনী ১২৭
সরোজিনী (হিতেন্দ্রর স্ত্রী) ১৩১, ১৪৭
সরোজিনী (কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের মেয়ে) ১১৫, ২০৩
সরোজিনী নাইডু ৮৫, ১০৩, ২৩৫
সরোজিনী বসু ১০৩
সর্বসুন্দরী ১৪, ২৬, ৩৮
'সহজ গান শিক্ষা' ৬৩
সা সনাতন ৬৪
'সাইকো...অ্যানালিটিক' ১৭২
'সাইকোলজি অ্যান্ড মিউজিক' ১৭২
সাগরিকা ১৬৫
'সাত ভাই চম্পা' …২
সাতারাম চামারকর ১[illegible]
'সাধন সমর' ১৩০
সাধনা বসু ১৩৯, ১৭৫
'সাধারণী' ২৪
সাধুরাম বাবা ১২৬
'সাবেক আমল' ৪৩
সাবরমতী আশ্রম ১২৬
সারা ২৬৬
'সাবিত্রী' ৮৮
'সাবিত্রী শিক্ষালয়' ১৪৯
'সামান্য ক্ষতি' ২১৭
সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ২৭
'সারদা মঙ্গল' ৪৩
সারদাসুন্দরী ১০৫
সারদা ৭-৯, ২৬
সারদা দাস ২১০
সাহানা দেবী (হীরা) ১৮৩
সাহানা (সুশীলা) ১৫১
সাহানা দেবী ৩৯, ১৬৩
সি. গোপালন ২৫৬
সিদ্ধার্থ ১৭৪-১৭৬
সিলভা ম্যাক্কার্টি ৭৭
সিপাহি বিদ্রোহ ৯৩
সিমলি ১৩৯
সিসিল বি ডে মিল ২৩৮
সীতা ৮৮, ১২৭, ১৪৫, ২৪০
সীমা ২৩৯
'সুইডিশ গায়িকা লিন্ডের জীবনী' ৮৮
সুকুমার রায় ৭৮, ২২৫, ২৬২
সুকুমার সেন ৩৩
সুকুমারী ১৩, ১৪, ৩৬
সুকুমারী দেবী ১৪০, ১৪১
সুকৃতি ৮৫, ১২৮, ১৮২
সুকৃতি ১৭৫, ১৭৬
সুকেশী ১২৭, ১২৮, ১৪০
সুচারু দেবী ২০, ৮২, ৮৩
সুচিত্রা ২৫০, ২৫১, ২৫৮, ২৬৯
সুচিত্রা মিত্র ২৫৮, ২৬৯
সুচেতা কৃপালনী ১৮৬
সুজনেন্দ্র ২৬০, ২৫৮
সুজাতা ভট্টাচার্য ১৭৯, ২১৫-২১৭, ২৬২
সুজাতা (মুখোপাধ্যায়) ৯৫, ১৩৭, ১৮৯, ১৯৭, ১৯৮
সুধাকেশ ১৬০, ২২৫, ২২৬
সুনন্দিনী (পুসিনা) ৯২-৯৭, ১৬৭
সুদীপ ২৬৪
সুনীত চট্টোপাধ্যায় ১৭৬
সুদেব ভট্টাচার্য ১৭৫, ২১৪
সুধা (বেলা) ২৪৮
সুধা রায় ২২৫
'সুধার স্মৃতি' ২০০, ২০১
সুধারানি ২৩৬, ২৩৭
সুধীন দত্ত ১৮৬
সুধীন্দ্র ২২, ৩৮, ৫২, ৯৭, ১২৭, ১৩৪, ১৩৮, ১৫০, ১৬৮, ১৯৯, ২০২, ২৬৭

সুধীরা ৮৫, ৮৭
সুনন্দন ১৩৭
সুনন্দা ২৪৮
সুনন্দিনী ২১, ১৮৯, ১৯৩-১৯৬, ২০২, ২০৮
সুনয়নী ১০৪, ১০৬-১১১, ১৪২, ১৪৩, ১৫৪, ১৫৫, ২০৩, ২০৭, ২০৯-২১২, ২৩৪, ২৫০, ২৫১, ২৫৩-২৫৫, ২৫৮, ২৬০
সুনীতি চৌধুরী ১৮৬
সুনীতি দেবী ২০, ৪২, ৮২, ৮৩, ৮৫, ১২৮
সুনীল জানা ১৩৭
সুনৃতা ৮৭, ৯৩
সুন্দরম ১৭৪, ২২৭, ২৬০
সুপূর্ণা ২২১-২২৩
সুপ্রকাশ ১৭৯, ১৮০, ২১৫, ২৬০
সুপ্রভা ৬০, ৭৭, ১০০, ২৩৮
সুপ্রিয় ৭৬, ২২৪
সুপ্রিয়া ১৮৯, ১৯৯
সুবর্ণপ্রভা বসু ৫৮
সুবীর (সুবীরেন্দ্র) ২২, ১৫৯, ১৬০, ২২১, ২২৪
সুবোধচন্দ্র মজুমদার ৭২
সুব্রতা ২১১, ২৩৪
সুভা দেবী ১৪১
সুভাষ চৌধুরী ২২২
সুভাষচন্দ্র বসু ১৫৮, ২১৪, ২২৮, ২৫০
সুভো ঠাকুর ১৭৪, ২১৯, ২২৭, ২৬০
সুমনা ২৬৪
সুমনা ১৫৫, ২১৪
সুমিতা ১৩৯, ১৫০
সুমিতেন্দ্র ২১, ১৪৩, ২০৫, ২০৬, ২৪৭
সুরঙ্গিনী দেবী ২৪
সুরজা ২৬১
সুরতীর্থ ২৬৯
সুরথসুন্দরী ১৯৩
সুরবালা দেবী ৩৩
সুরভি ৭৮, ১৭৬
সুরভি ভট্টাচার্য ১৪৯, ১৫০, ১৫৩-১৫৫, ১৭৪, ২১২-২১?, ২১৮, ২৬২
সুরমা ২০, ২২৩
সুরসুন্দরী ১৬১
সুরশ্রী ২২৫, ২২৬
সুরীতি ২৬১, ২৬২, ২৬৯
সুরূপ' ১৬০, ১৮৯, ২০০-২০২
সুরেন কর ২২৭
সুরেন গঙ্গোপাধ্যায় ৯৮
সুরেন্দ্র ৪৮, ৭৬, ১০১, ১০২, ১১৫, ১২৮-১৩০, ১৪৯, ১৫৯, ১৬১, ১৬৩, ২২৪, ২৬৭
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪২, ১২৩, ২০৪
সুরেশ সাংখ্যতীর্থ ১৬৮, ১৬৯
সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ১৪৫
'সুরো' ১১৪
সুলাজিনী ১৬৩
সুলেখা দেবী ১৯০
সুশীতলা দেখুন সাহানা
সুশীলা ২১, ৬১, ১২১, ১২৭
সুশীলা ৬০, ১৮০
সুশীলা দেবী ১৯০
সুশোভিনী ১২৭
সুষমা ৫৭, ৮৩, ৮৬-৯২, ১০১, ২৭০
সুহাসিনী ১০৮, ১৩১, ১৪১-১৪৩, ১৬৩, ১৭৩
সুহিতা ২২৬, ২২৭, ২৪৮
সুহৃৎ চৌধুরী ১২৮, ১৪৫, ১৯২, ২০২, ২০৫
সুহৃদ সমিতি ৭২
'সূচিচিত্রশিক্ষা' ১৯০
'সূচীরেখা' ১৯০
'সূচী লিখন' ১৯০
সূর্যকুমার (ডঃ গুডিব) চক্রবর্তী ৪১
সূর্যকুমার ৫৭
'সৃষ্টি ও স্রষ্টা কাহার নাম' ১২২
'সে' ১৮৮
'সেকেলে কথা' ১০৫
সেক্সপীয়র ৮১
'সেবিকার কৈফিয়ৎ' ১২৯, ১৩০
সেভিয়ার (মিসেস) ১০২
সেন্ট জন দি ব্যাপটিস্ট কনভেন্ট ১৭৯
সৈয়দ...হোসেন (খানবাহাদুর) ১১৩
'সোনার ঝিনুক' ১১৪
'সোনার ঢেউ' ৮৩
সোমনাথ লাহিড়ী ১৬১, ১৬২
'সোমেন্দ্রনাথ' ২০১
সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট ১৫৩, ২৪৮
সৌদামিনী ৩৫
সৌদামিনী (শ্রীমতী) ২৫
সৌদামিনী (গঙ্গোপাধ্যায়) ১০-১৪, ২০, ২৬, ৩৩, ৩৫, ৫৭, ৬৫, ১০৫, ১২১, ১৭৫, ১৭৯, ১৮১, ২০৪, ২১৫, ২৩৩, ২৩৫, ২৪৯, ২৬০
সৌদামিনী গুপ্ত ২০, ৩৩
সৌদামিনী (ঠাকুর) ৫৫, ৫৬, ১০৪, ১৩২, ১৪১, ১৪৩, ১৮৯, ১৯৩, ১৯৭, ২০০, ২০৩, ২০৪,

২০৮, ২৪৯, ২৬৩
সৌদামিনী দেবী ২৪
সৌম্যা ২৭০
সৌমেন্দ্রনাথ ১০০, ১২৯, ১৩৯, ১৪৮, ১৪৯, ১৫২, ১৫৪, ১৫৫, ১৭৩, ২১৭-২১৯, ২৪১
সৌরজা ২৭০
স্কারটর্স স্পিকস ২৪৭
স্কুল বুক সোসাইটি ৩৪
'স্টেটসম্যান' ২১৫
স্টেলা ২৩৫
স্টেলা ক্রামরিশ ১০৯
স্ট্যানভ্যাক হাউস ম্যাগাজিন ২১৫
'স্ত্রীর পত্র' ২১৮
'স্ত্রীশিক্ষা' ২২
স্নিগ্ধা ২২২
'স্নেহলতা' ২৯, ৩০
স্নেহলতা ২৬১
স্নেহলতা দেবী ১৪৯
স্থিরা ২৬৬
স্বদেশী স্টোর্স ১০২
স্বপনেন্দ্র ২৬৯
'স্বপ্নপ্রয়াণ' ৪৩
'স্বপ্নবিলাসী' ২১৩
স্বয়ম্প্রভা ৬০, ১৮০, ১৮১
স্বরলিপি পদ্ধতি ৭৮
'স্বর্গোদ্ধার কাব্য' ৮৩
'স্বর্ণকমল' পুরস্কার ২৪৭
স্বর্ণকুমারী ২, ৫, ৯, ১৪, ১৮, ২০, ২৪-৩২, ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৩৮, ৪৪, ৪৫, ৪৭, ৫০, ৫২, ৫৭, ৫৯, ৬১, ৭৩, ৭৪, ৮৩, ৮৪, ৯৪-৯৭, ৯৯, ১০০, ১০৫, ১২৪, ১২৫, ১৭৩, ১৮২, ১৮৩, ২৩৫
স্বর্ণলতা ২৪০, ২৪১
স্বর্ণলতা ঘোষ ২৫, ৩৩
স্বর্ণিলা ২৬৫
স্বেতস্লাভ রোয়েরিখ ২৩৭
'স্বাধীন জেনানা' ১২
স্মিতা চৌধুরী ২২৮, ২২৯
স্মিতা সিংহ ১৬৫, ২১৭, ২১৮, ২২১, ২২২
স্মৃতি ১৭৪, ১৭৬, ২২৮
'স্মৃতি' ৮০
'স্মৃতিকথা' ১২৫, ১১৯, ১২০
'স্মৃতিচিত্র' ১০৭, ১৩৫, ১৩৭
'স্রেটার' ৭৭
'হ য ব র ল' ২২৬
হটী বিদ্যালঙ্কার ১০
হটু বিদ্যালঙ্কার ১০
হটী তর্কালঙ্কার ১০
হরদেব চট্টোপাধ্যায় ৩৫-৩৬
হরদেব চট্টোপাধ্যায় ৩৫-৩৬
হর সুন্দরী ১১
হরিকুসুম স্তব ৪
হরিমোহন ১৩৩
হরিমোহন গোস্বামী ৫
হরিশ্চন্দ্র হালদার ৫৬, ১৪৩, ১৪৪, ২০১
হরিহরানন্দ স্বামী ১৮৩
হরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৫৮
'হতিমতাই' ৯
হাওড়া গার্লস স্কুল ৮৬
হাফিজ ৯৭
'হারমনি বা স্বরসংযোগ' ৭৮
হার্ডিঞ্জ, লেডি ১৬৬, ১৭৬, ১৭৭
হাসি দেখুন সুজাতা
'হিতকারী সভা' ১৯৬
হিতেন্দ্র ৬৩, ৮১, ৯৪, ১৩১, ১৬৬, ১৬৮, ১৭১, ১৭৭, ২৬৭
হিন্দি সঙ্গীত ৭৮
'হিন্দু ফিমেল স্কুল' ১১
'হিন্দুমেলা' ২৭, ১০০
'হিন্দুস্থান' ১০৪
হিমাংশু রায় ২৩৬-২৩৮
হিরণকুমার সান্যাল ২২
হিরণ্ময় রায়চৌধুরী ২১১, ২৩৪
হিরণ্ময়ী ২১, ৩০, ৩৩, ৬০, ৮০, ৯৪-৯৬, ১৮২
'হিরণ্ময়ী বিধবা শিল্পাশ্রম' ৩০, ৯৫, ১০৩, ১২৫
'হুগলীর ইমামবাড়া' ২৮
'হুতুকো বৌ-এর বিষমজ্বালা' ১২
হৃদিন্দ্রনাথ ১৬৯
হেগেল ২১৯
হেনরি কার্টিয়ার ব্রসন ২১৯
হেনরি ম্যাডার ৮৭
হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন ৩৯, ৫০
হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য ১১১
হেমলতা ৩৩, ৫০, ৫২, ৬১, ৭৮, ৮৩, ১১৭, ১২১-১২৮, ১৩৫, ১৫৫-১৫৭, ১৬০, ১৬২, ১৯২, ২১৬
হেমাঙ্গিনী দেবী ২৪
হেমেন্দ্র ২, ১৫, ৩৫-৩৮, ৪২, ৫৭-৬০, ৬৩, ৬৫, ৬৬, ৭২, ৭৭, ৭৯, ৮২, ৮৩, ৮৫, ৮৭, ১০৭,

১১১, ১৩১, ১৬৩, ১৭৬, ১৮৩, ২২৬, ২২৯
হেমেন্দ্রকুমার রায় ২৫৫
হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৩
হেরণ (রেভারেণ্ড) ৫৮
'হৈমন্তী ১১৭
হৈমন্তী ১৫২
'হান্ডস অফ কেরালা' ১৬২
'হ্যারিয়েট বিচার স্টো' ৮৮
হ্যারিয়েট মার্টিনো ৮৮

AEDTA 200
'All the year Round' 213
Beethoven 59
Clarion 53
Cecilia meireless 187
Cresecent Moon 148
Frere, Sir Bastle 18
Forward 150
Kuibyshev on the Volga 187
Maria 187
NFIW 224
Nazis 245
Niclini 64
'Niece of Tagore' 149
'Queues of Death in Calcutta' 161
Signor Manzato 128
'The Englishman' 150, 151
The First Asian...Conference 162
White (Mr) 37
World Art Competition 258

চিত্রা দেবের জন্ম ২৪ নভেম্বর ১৯৪৩, পূর্ণিয়ায়। শিক্ষা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে এম.এ ও পি-এইচ.ডি। গবেষণার বিষয় ছিল মল্লরাজ-সভাকবি শঙ্কর কবিচন্দ্রের মহাভারত।
বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে নারী ভূমিকা অনুসন্ধান লেখিকার প্রিয় বিষয়। 'অন্তঃপুরের আত্মকথা', 'মহিলা ডাক্তার: ভিনগ্রহের বাসিন্দা' সেই অন্বেষার ফসল।
কিশোরপাঠ্য গ্রন্থ 'বুদ্ধদেব কেমন দেখতে ছিলেন', 'সিদ্ধিদাতার অন্তর্ধান', 'অদ্ভুত যত হাতির গল্প' ইত্যাদিতে তাঁর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। এ ছাড়া লিখেছেন ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের অবিস্মরণীয় প্রণয়কাহিনী অবলম্বনে গল্পগ্রন্থ 'রাজকীয় প্রেমকথা'।
তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ সরলাবালা সরকার রচনাসমগ্র, কবিচন্দ্রের মহাভারত, বিষ্ণুপুরী রামায়ণ ইত্যাদি বিখ্যাত। অনূদিত গ্রন্থের মধ্যে প্রেমচন্দের গোদান, নির্মলা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। লেখিকার অন্যতম প্রধান শখ দেশ-বিদেশে ভ্রমণ।